

বর্তমান বর্ষের দেয় মুদ্রা পাঠাইরা অমুদ্রিত কল্পিবেন ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

(হিন্দুধর্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা ।)

শ্রীযুক্ত রায় যতুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
কর্তৃক সম্পাদিত ।



সূচী ।

১। মঙ্গলাচরণ—নববর্ষ-নিবেদন	১	৬। "গো-ব্রাহ্মণ"	২৬
২। 'তৈত্তিরিযাহম্-তৈববাহম্-স্বসেবাহম্'	৫	৭। খৃষ্টধর্ম ও আর্ষদর্শন	৩০
৩। কৈলাস	৭	৮। অষ্টকর্ম ও পঞ্চবর্গ	৩৬
৪। ঋজাবিবান সূত্র	৯	৯। উপায় কি ?	৪২
৫। শিলা	১২	১০। হরি-সংকীর্তন	৫০

যশোহর ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

গভীর বিশেষ বিশেষ পত্রিকা
শ্রীযুক্ত রায় যতুনাথ মজুমদার
কর্তৃক সম্পাদিত ।

হিন্দু-পত্রিকার গ্রাহকগণকে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শুলভমূল্যে উপহার দেওয়া হইয়া থাকে ।

- ১। ঋগ্বেদভাষ্যোপোদ্ভাবিত প্রকরণম্ ২ টাকা স্থলে ১, ২। আনিদের প্রসার দ০
খণ্ডে ১০, ৩। শাণ্ডিল্যপুত্র ১ স্থলে দ০, ৪। Three Gospels বা গীত্রাজয় মূল্য ১০
৫। Expansion of Self মূল্য ১০, ৬। বেদান্তসূত্র ১ম খণ্ড মূল্য দ০, ৭। Seven Gospels
গীতাসম্বন্ধ মূল্য দ০, ৮। ৬প্রভাবতী দেবীর রুত অমল-প্রস্নন ১ স্থলে দ০,
৯। শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত দার্শনিক মীমাংসা ১ স্থলে দ০, মোট
ঐহার ৯ খানা পুস্তক একগঙ্গে লইবেন, তাঁহার ৬ স্থলে ৫ টাকায় পাইবেন ।

শ্রীকালী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ম্যানেজার

বিজ্ঞাপন ।

চিন্তা-নির্বাহিণী ।

শ্রীকুমারবিক্রম গজুদার-প্রণীত :

সম্প্রতি হিন্দু-পত্রিকা আফিস হইতে “চিন্তা-নির্বাহিণী” নামক একখানি নূতন পুস্তক
প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অনেক প্রবন্ধ সুপ্রসিদ্ধ “বামাদেবদিনী” এবং “জগদ্ভূমি”
প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তক ‘ডুমাই ৮ পেঞ্জী ফর্মায়
শতাধিক পৃষ্ঠাখাপ্যী বৃহৎ পুস্তক। কাগজ উত্তম, মুদ্রণ পরিপাটি। মূল্য দ০ বার আনা
মাত্র। এই পুস্তক একাধারে দর্শন ও গণ্য কাব্যরূপ। ধর্ম, নীতি ও ‘বদেদী’ ভাবের
মূল ভিত্তিতে ইহার কল্পনা গঠিত। ইহাতে ভাষার এক বিশেষ মৌলিক ধরণ, ভাবের
অভিনব আবেগ, পদ-নির্বাচন ও বাক্যগঠনেরও একটু সুবৈচিত্র্য এবং কবিত্ব ও ভাবুক-
ত্বের বিশেষত্বে বঙ্গসাহিত্যসুরাঙ্গী মানসে ইহাকে মাতৃভাষার একখানি অভিনব ‘আভরণ
জ্ঞানে আনন্দিত হইবেন, আশা করি। হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণকে প্রতি খণ্ড
“চিন্তা-নির্বাহিণী” ১০ খানা মূল্যে প্রদত্ত হইবে; ইতি।

যশোহর।

শ্রীকালী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দু-পত্রিকা-কার্যালয়।

হিন্দু পত্রিকা কার্যালয়।

শ্রীযুক্ত ধর্মানন্দ মহাভারতীর পুস্তকাবলী ।

- ১। মুক্তমাপন নাটক। মূল্য আট আনা। মাস্তুল এক আনা। ২। ধর্মানন্দ-
প্রবন্ধাবলী। ১ম খণ্ড। মূল্য এক টাকা। মাস্তুল এক আনা। ৩। ধর্মানন্দ
প্রবন্ধাবলী ২য় খণ্ড। মূল্য ১ টাকা, মাস্তুল এক আনা। ৪। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র। এই
বিরাট গ্রন্থে ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সমুদয় হিন্দুজাতির পৌচীন ও আধুনিক ইতিহাস
সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। জাতিতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে এতাদৃশ গ্রন্থ কোন ভাষার আর নাই-
আপাততঃ ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১ম খণ্ডে গোপ, সদগোপ, গন্ধবর্ণিক ও মাহিন্দ্র
জাতির বিস্তৃত ইতিহাস আছে। ২য় খণ্ডে সুবর্ণবর্ণিক, ৩য় খণ্ডে বারুই, ৪র্থ খণ্ডে টবদ্য,
৫ম খণ্ডে তিলি, তাম্বুলি, উগ্রকজ্রি ও ময়রা জাতির ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে। ৬ষ্ঠ খণ্ডে
সাহা জাতির বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে।

৫। “বঙ্গের ব্রাহ্মণ-রাজবংশ” মূল্য ১ টাকা। মাস্তুল ১/০ আনা। এই নবপ্রকাশিত
পুস্তকে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণবংশসম্বৃত্ত যাবতীয় রাজা, মহারাজা, রাণী, মহারানী ও জমিদার
দিগের পৌচীন ও আধুনিক বিবরণ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ৬। ধর্মানন্দ-
প্রবন্ধাবলী। ৩য় খণ্ড। মূল্য ও মাস্তুল ঐ।

শ্রীহরিঃ ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনসভে রেজিস্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড,
১ম সংখ্যা ।

বৈশাখ ।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা ।

মঙ্গলাচরণ ।

—:~:—

সিদ্ধিদাত্রে নমস্তুভ্যং বুদ্ধিসমৃদ্ধি-
হেতবে ।

অশবে বিজ্ঞানাশায় গণেশায়
নমোনমঃ ॥

গত বর্ষ জ্যৈষ্ঠমাসে হিন্দুধর্ম-তত্ত্বরস
নিবেদনে নিয়মসংগ্রহে যথাশক্তি,
ভগবৎকৃপাভরে সাধু-ভক্ত স্ত্রী মনে
বিতরণি যবে যবে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি ;
নব চতুর্দশ বর্ষে, নবোদ্যমে—নববর্ষে
কর্মভূ ভারতবর্ষে ধর্ম-পত্রিকা —

অদেশ-সেবিকা ভণা,—স্বধর্ম-স্বকর্ম-কথা—
বহুক্ স্বপত্র-বহু এ “হিন্দু-পত্রিকা” ।

হরি-কৃপা-গন-স্পর্শে নবনবায়িকা
ইউক্ এ নববর্ষে এ “হিন্দু-পত্রিকা” ॥

নববর্ষ-নিবেদন ।

কৃপাসমুদ্রীভগবানের কৃপায়, সাধু-ভক্ত-
সম্মদয়—স্বদেশ ও স্বধর্মস্বায়ামী গ্রাহক-
অমুগাহক-পাঠক মহাশয়গণের সাগহ মহাহু-
ভূতি ও সাহুগহ সহায়তায়, আমাদের
“হিন্দুপত্রিকা” জ্যৈষ্ঠমাসবর্ষ অতিক্রম করিয়া
চতুর্দশবর্ষে উপনীত । দ্বাদশবর্ষে এক
নৈময়িক বা ব্যবহারিক যুগ হয় ; তাহার
পরেও এক বৎসর অতীত ; এই সুদীর্ঘকাল
“হিন্দু-পত্রিকা” হিন্দুসমাজের সাহিত্যিক
পরিচায়িকা রূপে যথাশক্তি ও যথাগন্তন শাস্ত্র-
ধর্ম-তত্ত্বগণ ও স্বধর্ম-সাহিত্য-সুধাধার পরম
বহু পরিবেশন করিয়াছে । অগবৎকৃপায়
আ-হিন্দাচল আশাসান্ ও আশ্রয়-সেবুট্‌হান,

বেখানেই বঙ্গভাষাভিজ্ঞ হিন্দুর হিত, সেইখানেই “হিন্দুপত্রিকা”র গতি। যে সমস্ত স্মৃতি সাধক লেখক মহোদয়গণের সুলিপি-সাহায্যে ইহার এই যে ভারতময় প্রসার ও প্রচার, নববর্ষান্তে তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান সর্বোৎকর্ষব্য। “হিন্দুপত্রিকা”কে হিন্দুধর্ম্মাহুতরাগী গ্রাহকগণ স্ব স্ব গৃহে গৃহে গ্রহণ ও পালন করিতেছেন এবং স্মৃতি সুলেখকগণ ইহাকে সাহিত্যসমাজে সমাদর লাভের সুযোগরূপে বিবিধ প্রবন্ধরূপ গল্প-বননে ও পঞ্চ ভূষণে সাজাইয়া দিতেছেন; সুতরাং আমরা সংপূর্ণ তাঁহাদেরই সহায়তার ইহাকে এ যাবৎ আমাদের প্রিয় পাঠকমণ্ডলীর পরিচর্যায় প্রেরণ করিতে পারিয়াছি। অতএব উপস্থিত নববর্ষ হইতেও তাঁহাদের তজ্জপ ও ততোধিক সদয় সাহায্যের আশা হৃদয়ে ধরিয়া, এবং সর্বোপরি সর্বসম্বাহাপূরণকারী শ্রীহরির শ্রীচরণরূপাশ্রয় সাধ করিয়া, আমরা হিন্দুপত্রিকার পরিচালনে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম। আদি-অন্তে ভগবানই সর্বময়। আদৌ নিরোজন ভগবানের, আরোজন আমাদের, প্রয়োজন গ্রাহক-পাঠকবর্গের। আবার চেষ্টা আনাদের, সহায়তা লেখকগণের ও সফলতা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় নির্ভর করিতেছে। পুরুষকার ও দৈবই জগতে সর্বকর্ম্মের প্রযুক্ত ও ফলদায়ক। আর “নচ দৈবাৎ পশুং বলম্।” সুতরাং এ পক্ষে— সাক্ষ্য-লক্ষ্যে দৈবই আমাদের সকল বল ও সার সম্বল এবং আমাদের পুরুষকারও সেই পরমপুরুষেরই ইচ্ছা ও রূপার ফল।

ফলে তিনিই সর্বময়; তাঁহাতেই সর্বোদয় ও তাঁহাতেই সর্বলয়, এবং তদনির্ভরতাতেই সর্বজয়! কর্ম্ম-বিচারে, ধর্ম্ম-প্রচারে ও শাস্ত্র-সাহিত্য-তত্ত্ব সঞ্চারে, এই শিক্ষা—এই সত্যই যেন তাঁহারই রূপার তচ্চরণ-চিরাশ্রিত। “হিন্দু-পত্রিকা”র চিরলক্ষ্য হয়।

হরিনাম ।

(পূর্বাহ্নবৃত্তি ।)

আমাদের এই শরীরই নয়ক তুল্য।
মাংসাস্বাদ পূরবিভুজ্ঞানায়ু মজ্জাহি সহভৌ।
দেহেচেৎ শ্রীভিমান্মুচোনরকে ভবিতাশি লঃ ॥
(বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ১৭ ।)

মাংস, মজ্জা, পুষ, বিষ্ঠা, মূত্র, মায়ু, মজ্জা, অস্থি-পরিপূর্ণ দেহে যদি লোকের শ্রীতি হয়, নয়কেও তাহাহইলে শ্রীতি হউক।

শ্রীভাগবতে, ব্রহ্মপুরাণে, গজুড়পুরাণ-দিতে নয়কের বর্ণনা আছে। উহা এ চক্ষুর অগোচর; সুতরাং তাহাতে যদি বিশ্বাস না হয়, দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব দেখিলেই নয়ক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

তজ্জন্তই শ্রীভাগবতে একাদশ স্কন্ধে অবধূত কহিয়াছিলেন, সংসারে অনাহা হইবার কারণ আমার দেহ—

দেহো গুরুসম বিরক্তি-বিবেক-হেতু
বিত্রংস সত্বনিধনঃ সততাস্ত্যাদুর্কম্ ।

১০ অধ্যায়ে ২৫।

দেহই আমার বিরক্তি ও বিবেকের কারণ; ইহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল ও ইহার উত্তর ফল ছঃখময়।

মন্ত্রকে বধ করিতে দর্শন করিয়া
সম্বাদ্য। সৌভরি মূনির প্রাণ কাঁদিরাছিল ও
তিনি কহিবাছিলেন যে, যদি গরুড় এই যমু-
নার মন্ত্র ভঙ্গ কর, তাহাহইলে সে অস্ত
ময়িয়া বাইবে—

অত্র প্রবিশ্ব গরুড়ো যদি মংস্তান্ স খাদতি।
সত্ত্বঃ প্রাণৈবির্যুজ্যোত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যাহম্ ॥

শ্রীভাগবতে : ০। ১৭। ১১।

শরীর সঙ্কণ্ডপ্রধান না হইলে, জীব-
হিংসার প্রাণ কাঁদে না; কারণ রঙ্গোণ্ডই
সংস্কার-ভঙ্গ-প্রবৃত্তির কারণ—

ক্রবাদান্ রাজগান্ বিদ্ধি জিহ্বারসপরারগান্।

অমুশাসনপর্কপি ১১৫ অধ্যায়ে।

জিহ্বারসপরারণ মাংসানীগণকে রাজস-
প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

হার! মংসানি! তোমার শরীর কি
পাষণে গঠিত? জীবের জীবনে কি
একটুও মমতা হয় না? সে স্বদয়-শোণিত-
শোষক দৃষ্ট দেখিয়া কি পাষণ-স্বদয় আজ
হয় না? যে দেহ পরিপোষণের জন্য এত
পাপ করিতেছে, সে দেহ কাহার, একবার
চিন্তা হয় না? সে দেহ যে অধির, সৃষ্টি-
কার কিবা শৃগাল-কুকুরের, একবার তাহা
ধারণও হয় না? রাজদেহ হইলেও যে
তাহার পরিণাম কৃমি, বিষ্ঠা (১) ও ভস্ম, এ
চিন্তা কি হৃদয়ে উদয় হয় না? বলিতে
বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িলাম, এক্ষণ
প্রস্তত বিষয়ের অনুসরণ করি—

পিপীলিকা প্রভৃতি ক্রম জীব বধের জন্যও
বহু দারী—

(১) স্তম্বেহ নধ্ব না হইলে, কৃমি-
শৃগালদির ভক্ষণে শেষ পরিণাম বিষ্ঠা।

আম্বনং সততঃ পশ্চেনপি কীট পিপীলিকম্ ॥
সুক্রনীতি: ৩ অধ্যায়ে ৯। অষ্টাদশময়ে
সুত্রস্থানে ২। ২৩।

কীট পিপীলিকাকেও মনুষ্য আপনার জ্ঞান
দর্শন করিবেন। কৰ্মফলে মনুষ্য তিৰ্যাক্
যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। (২)
এরূপও হইতে পারে, যে ভক্ষক যে জীব বধ
করিতেছেন, তিনি তাহার পূৰ্বপুরুষ!
সুতরাং জীবহিংসা হইতে বিরত থাকা
মনুষ্য মাত্রেয়ই কর্তব্য।

তথাচ সৰ্বভূতেষু বর্জিতব্যং বখায়নি ॥

শান্তিপর্কপি ১৬৭ অধ্যায়ে ৯।

বেরূপ নিজের প্রতি আচরণ করা বাধ,
তক্রম সৰ্বভূতের প্রতি আচরণ করা কর্তব্য।

যদিহবা উগ্রঃ পশুন্ পক্ষিণোবা প্রাণত
উপরক্ষয়তি তমণকরণং পুরুষাটৈরপি বিগ-
হিতমুস্রজ যমানুচরঃ কুস্তীপাকে তপ্তৈতলে
উপরক্ষয়তি ॥

শ্রীভাগবতে ৫স্কন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ১৬।

যে ব্যক্তি এ সংসারে উগ্রসৃষ্টি হইয়া
নিজের জন্য পশু অথবা পক্ষিকে রক্ষন করে,
সে নরোধম নির্দিয়কে রাক্ষসেরাও নিন্দ্য
করিয়া থাকে এবং পরকালে যমকিয়রূপ
তাহাকে কুস্তীপাকে তপ্ততৈলে রক্ষন করিয়া
থাকে।

ইচ্ছা করিয়া কোন জীব বধ করিলে,
প্রায়শ্চিত্তে তাহার পাপখণ্ডন হয় না;
কারণ সেই পাপে পুনরায় তাহার মতি
ধাবিত হয়—

৬: সক্রং পাপকং কুর্যাদি কুর্যাদেনং
ভতঃ পরং নাপগাঃ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৭ পত্রিকায়ং ৩। ৫৪

(২) ব্রহ্মপুরাণে ১০৭ অধ্যায়ে।

যঃ পুমান্ ধর্মশাস্ত্রভীতিরহিতঃ স কুৎ
পাপকং কুর্যাৎ স পুমান্ ততঃপাপাদম্ভৎ
এনৎ পাপং তদভ্যাসবশতঃ কুর্যাদেব ।

(ভাষ্যে সাগনাচাৰ্য্যঃ ।)

যে ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র-ভীতি-রহিত হইয়া
একবার পাপ করে, সে ব্যক্তি সে পাপ
হইতে অন্ত পাপ অভ্যাসবশতঃ করিয়া
থাকে ।

জ্ঞানকৃত পাপ যজ্ঞদ্বারাও খণ্ডন হয় না—

যথা পঙ্কেন পক্ষান্তঃ সুরয়া বা সুরাকৃতম্ ।

সুতহৃত্যাং ততৈথৈবৈকাংন যত্জৈমীষ্টুর্মহতি ॥

শ্রীভাগবতে ১। ৮। ৫২ ।

যে রূপ পঙ্ক-জলদ্বারা পঙ্ক ধৌত হইতে
পারে না, সুর্য্যবিন্দুস্পৃষ্ট অপবিজ্ঞ বস্ত্র বহু
সুরা দ্বারা পবিত্রীকৃত হইতে পারে না,
তজ্ঞপ একটা প্রাণী বধ প্রমাদবশতঃ হইলেও,
বুদ্ধিপূর্বক যে হিংসা, যজ্ঞাদি দ্বারা সে
পাপের মোচন হয় না ।

অজ্ঞানবশতঃ কীটাদি বধ করিলে,
চিত্ত অহুতাপানলে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত পাপ-
খণ্ডন হয় না—

অগ্নে বাপাথ শোচেত—

শান্তিপর্কণি ১৬৫ অধ্যায়ে ৫৭ ।

অজ্ঞানবশতঃ কীটাদি বধ করিলে, অহু-
তাপরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইবে ।

ধর্মের লক্ষণ পুনরায় মহাভারতে, যথা—

বাহুশ্ৰত্যং (৩) তপন্ত্যাগঃশ্রদ্ধাযজ্ঞক্রিয়াক্রমা ।

ভাবশুদ্ধিদর্শা সত্যং সংযমশ্চাস্তসম্পদঃ ॥

শান্তিপর্কণি ১৬৭ অধ্যায়ে ।

এখানেও সেই দ্বারার কথা । সুতরাং
যতক্ষণ মনুষ্যের মস্ত-মাংস ভক্ষণে লাগনা

থাকিবে, ততক্ষণ তিনি ধর্ম-ধর্মের আধি-
কারী হইতে পারেন না । যতক্ষণ মনু-
ষ্যের মনে জীবজোহী হওয়া পাপ জ্ঞান না
হইবে, ততক্ষণ তিনি ভাগবত ধর্মের
আধিকারী হইতে পারিবেন না । যতক্ষণ
মনুষ্যের মন জীবের জীবনে অহুকম্পা প্রদ-
র্শন না করিবে ও তাহার জীবন নাশে
চিত্ত না কাঁদিবে, ততক্ষণ মনুষ্য সেই
দয়াময়ের অহুগ্রহভাজন হইতে পারিবেন
না । হায়! যে দেশে দয়া নাই, মার
নাই, জীবের জীবনে অহুকম্পা নাই, সে
দেশে কত জন্মের পাপে যে জন্মগ্রহণ
করিতে হয়, বলিতে পারি না !

ধর্মের আরও লক্ষণ—

যতোহভূদর্শনঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্মঃ ।

বৈশেষিক দর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ আক্ষিক-
২ সূত্রম্ ।

যাহা হইতে অভূদর্শন (ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান)

ও মঙ্গলসিদ্ধি হয়, উহাই ধর্ম ।

মনুষ্যের মঙ্গল কি? হরিনাম ।

পুনরায় ধর্মলক্ষণ বলিয়াছেন—

চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ ।

নীমাংসাদর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ পাদে ২ সূত্রম্ ।

আচার্য্য কর্তৃক প্রেরিত হইয়া যে কর্ম
ও তদ্বারা যে অর্থসিদ্ধি, উহাকে ধর্ম বলে।

পরমেশ্বরই আচার্য্য ।

আচার্য্যং মাং বিজানীরাৎ ।

শ্রীভাগবতে ১১। ১৭। ২২ ।

শুকরূপী পরমেশ্বরের আদিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ
কর্ম কি? হরিনাম ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী ।

(৩) বাহুশ্ৰত্যং = বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন ।

যোগ-শাস্ত্র

(পূর্ণাঙ্গবৃত্তি।)

২৬। কর্মযোগ। “এষা তেহতিহিতা-সাংখ্যে” গীতার এই বচন হইতে কর্মযোগ-আরম্ভ। তাহার উপক্রমে শঙ্করাচার্য্য গীতার শাস্ত্রমূলক স্বাধুন্যার্থে শাস্ত্রের দুইটা বিভাগ দর্শাইয়াছেন। প্রথমতঃ সাংখ্য-জ্ঞান। ইহারই নামান্তর আত্মজ্ঞান। ইহা সাংখ্য পরমার্থ বস্তুত্বস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ম্প্রকাশ, সর্কোপাদিবিনির্মূলক, মনো-বুদ্ধি-ইঞ্জিয়াদির অগম্য এবং সাধননিরপেক্ষ আত্মস্বরূপের জ্ঞান।* ইহাই সর্কো-পনিষৎ-সম্মত শোক-মোহ-জনা-জরামরণাদি-জনিত ভবভয়ের সাংখ্য নিবৃত্তির কারণ

২৭। স্বকীয় ও স্বজনবর্গের দেহাদিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হওয়ার, তাহাদিগের বধ ও বিচ্ছেদ আশঙ্কায় অর্জুনের হৃদয়ে শোকমোহ জন্মিয়াছিল। ইহা ভগবান বুঝিতে পারিয়া, প্রথমেই তাঁহাকে সাংখ্য-জ্ঞান উপদেশ করিলেন। ইহাই বেদান্ত দ্বিবিধ ধর্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বিভাগ। ইহাই পরাবিত্তী এবং ‘ব্রহ্মজ্ঞান’—ব্রহ্মকে আত্মত্বে গ্রহণ।

২৮। শঙ্কর এই প্রথম বিভাগ প্রদর্শনা-নস্তর তাহার দ্বিতীয় বিভাগ বর্ণন করিয়া-ছেন। সেটা কি? না অর্জুনের প্রতি ভগবান কর্তৃক কর্মযোগের উপদেশ। সে

উপদেশ এই—“ও পার্থ! উত্ত সাংখ্যজ্ঞান শ্রবণে যদি তোমার স্বতঃসিদ্ধ আত্মত্ব প্রত্যক্ষ না হইয়া থাকে, তবে সাধনসাপেক্ষ কর্মযোগ ও সমাধিযোগ কহিতেছি শ্রবণ কর। যাহাতে ঐশ্বর্য্যপিত বেদ-স্মৃতি-বিহিত বুদ্ধিবৃত্ত কর্ম্যাত্মকান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইয়া, গোপপরম্পরা কর্মবন্ধন (অবিজ্ঞাপাশ) হইতে মুক্ত হইবে।

২৯। ভক্তিরোগ, ধ্যানযোগ প্রভৃতি এই কর্মযোগের অন্তর্গত। এ সমস্তই সাধনসাপেক্ষ, মঙ্গলমবায়ী ক্রিয়ালক্ষণ এবং ভগবানের রূপ-নাম-বিশেষণনিষ্ঠ। এই কর্মযোগের বাহ্য আকার, বেদ-স্মৃতি-আগম-বিহিত কর্ম্যাত্মকান; কিন্তু ইহার গুহ্য অবয়ব নিষ্কামভাব, কর্মফল ভগবানের চরণকমলে অর্পণ এবং অহৈতুকী-তত্ত্বলক্ষণা উপাসনা। শ্রীকৃষ্ণ আত্মজ্ঞানের ক্রম-পরম্পরা-সোপান স্বরূপে অর্জুনকে ইহার উপদেশ দিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়া দিলেন যে, ইহা বৈদিক ধর্মের দ্বিতীয় (গৌণ) বিভাগ†। অতএব ইহার কোন-টাও গীতার স্বকপোলকল্পিত নহে।

৩০। যদিও বেদাদি-শাস্ত্রবিহিত উক্ত কর্মযোগ বিভাগে সিদ্ধান্ত-বাক্য সকল গীতাতে বিস্তীর্ণরূপে প্রসারিত হইয়াছে, কিন্তু গীতার বিবৃত সাংখ্যযোগ ও কর্ম-যোগ, এ উভয় বেদভাগের মূলই উপনিষদ ও মন্বাদিস্মৃতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ফলে উপ-নিষদে সাংখ্যযোগের—অর্থ্যৎ আত্মজ্ঞানের

* Direct or objective knowledge of God as animating and illuminating soul.

† This indicates subjective or indirect knowledge of God by performance of religious ceremonies and meditation.

উপদেশই অধিক এবং শ্রেষ্ঠকর। তাহা দর্শন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কেবল এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, গীতার সাংখ্যজ্ঞান-প্রকরণে, যে কতিপয় বচনে (২।১১:৩০) সাক্ষাৎ মোক্ষজনক আত্মজ্ঞান প্রাপ্তিপাদন করিয়াছেন, তাহা প্রায়ই শব্দতঃ ও অর্থতঃ কঠোপনিষদের বিবৃত আত্মতত্ত্ব। ফলে সমস্ত উপনিষদেই আত্মজ্ঞানের যে সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয়, গীতার কথিত আত্মজ্ঞানেও তাহাই বর্তমান। বলা বাহুল্য যে, এই আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব, সাংখ্যজ্ঞান ইত্যাদি। † †

† † কেহ মনে করিতে পারেন যে, গীতার সাংখ্যজ্ঞানটী সম্ভবতঃ সাংখ্যদর্শন হইতে উদ্ধৃত। অতএব গীতা যখন কঠোপনিষৎ হইতে সেই জ্ঞানপ্রাপ্তিপাদক শ্রুতি সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং বিশেষতঃ যখন “আত্মানং রথিনং” অবধি “স্বা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ” পর্য্যন্ত এই নয়টী শ্রুতিতে প্রায় সাংখ্যদর্শনের ক্রম অবলম্বন পূর্বক “পুরুষকে” (উপাধিমুক্ত আত্মাকে) চরম-তত্ত্ব (The end) বলা হইয়াছে, তখন কঠোপনিষৎখানিকে সাংখ্যদর্শনের পর-বর্তী বলিতে হইবে। এরূপ সন্দেহ স্থলে আমাদের সিদ্ধান্ত উক্ত অমুমানের বিপরীত; কেন না, কঠ ও অজ্ঞাত উপনিষৎ সকল সনাতন। তৎসমূহে যেমন পুরুষবহুত্ববাচী শ্রুতি আছে, সেইরূপ পরমাত্মা-ব্রহ্মবাচী শ্রুতিও আছে। তন্মধ্যে সাংখ্যের দৃষ্টি বহুত্বে এবং বহুর কৈবল্যে; আর বেদান্তের দৃষ্টি একমোক্ষমতে।* তিনিই পরমাত্মা। এই বিবিধ পুরুষই নিকপাধিক অবস্থার চরমতত্ত্ব (The end) এবং নামরূপবিশেষণবর্জিত স্রীয়ার, সাগর-সঙ্গত নদীগণের স্রাব “এক-

৩১। আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি বেদ ও শ্রুত্যাদি মূলশাস্ত্রে কর্মযোগের ব্যবস্থা বর্তমান আছে, এবং কুরু-পাণ্ডবীয় সময়-সময়েও অবশ্য বর্তমান ছিল, তবে ভগবান অর্জুনকে কেন কহিলেন যে, “এই যোগ দীর্ঘকাল বশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তুমি আমার ভক্ত বিধায় তাহা অল্প তোমাকে কহিতেছি।” এ কথার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে থাকিলেও, “অমুষ্ঠাতৃণাং কামোদৃতবাৎ” (শকর) অমুষ্ঠাতৃ (বজমান) গণের মনেতে কল-কামনার উদ্ভব হওয়াতে, তাঁহারা কেবল কলাখী হইয়া কর্মামুষ্ঠান করিতেন। স্রুতরাং তাঁহাদের আচরণ নিকাম, দৈশ্বরাপিত, ভগবদাধারনারূপী ছিলনা। অতএব কথিত হইয়াছে যে, যোগধর্ম নষ্ট হইয়া

এব”। অতএব উপনিষৎ সকল উত্তর-দর্শনেরই মূলধন।
 Dr. Rajendra Lal Mitra in his— Introduction to the translation of the Chhandogya Upanishad, 1862, (Bibliotheca Indica) says at a foot note (page 24) “Dr. Roer argues the Katha upanishad to be posterior to the Sankhya, because its innumeration of the order of emanations for the absolute spirit accords, to some extent, not entirely, with the order followed by the latter. (But) The Katha has nothing of the scientific precision of the Sankhya, and it would, therefore, be much more natural to suppose that the latter (Sankhya) borrowed from the former (Katha)

গিরাছে। ভগবান ঐ সকল শাস্ত্রমূলক যোগেরই উপদেশ দিরাছেন। ইহাই তাঁহার “ধর্মসংস্থাপন”। অর্জুনকে উপলক্ষ করিয়া তিনি তৎপ্রতি লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার এই উপদেশ সকল কেবল শাস্ত্র-শয্যাস্থ মৃত ব্যবহারশির পুনরুদ্ধারের মাত্র। নতুবা শাস্ত্রের অভাব তাৎপর্য্য নহে।

৩২। মূলশাস্ত্র। এইরূপে আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপে, উপনিষদাদি কতিপয় শাস্ত্র হইতে— অধিকাংশতঃ কর্মযোগ সম্বন্ধে, কয়েকটি মূলবিধি প্রদর্শন করিতেছি।

৩৩। কঠোপনিষদে কহিলেন—

“সর্বে বেদা বৎপদমানন্তি।

তপাংসি সর্বাণিচ যদ্বদন্তি ॥

যদিচ্ছস্তো ব্রহ্মচর্য্যংকরন্তি।

তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ॥

ওমিত্যেত্যৎ। ২। ১৫

অর্থ। সকল বেদ যে পূজনীয়কে কীর্তন করেন, সকল তপস্বী বাঁহাকে ব্যক্ত করে, বাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের আচরণ করে, সেই পদকে সংক্ষেপে কহি—তিনি ঐ। “এতদ্ব্যাকরণং ব্রহ্ম এতদ্ব্যাকরণং পরম্।

এতদ্ব্যাকরণং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্ত তৎ ॥”

১। ১৬।

অর্থ। এই অক্ষরই অপরব্রহ্ম, এবং এই অক্ষরই পরব্রহ্ম। এই অক্ষরকেই জানিয়া যিনি বাঁহা ইচ্ছা করেন, তাঁহার তাহাই হয়। (অপরব্রহ্মই হউন বা পরব্রহ্মই হউন।)

তাৎপর্য্য এই যে, ঐ শব্দ, একই ব্রহ্মের দুই প্রকার ভাবকে বুঝায়। একটা অপর-

ব্রহ্মভাব। অশ্রুটি পরব্রহ্মভাব। যেটা অপর-ব্রহ্মভাব, সেই ভাবে ব্রহ্ম সর্ববেদ-বিহিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকর্ম্মের কীর্তনীয়। সকল তপস্বী, সন্ন্যাসিন্দনা, যোগাচার এবং দেবার্চনাদির উদ্দিষ্ট। কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদ সকল সেই পদকে কীর্তন করেন। অতঃপর সেই ভাবকে ইচ্ছা করিয়া সর্ব প্রকার ব্রহ্মচর্য্যের অমুষ্ঠান হয়। এই দুইটা শ্রুতি, গীতার অষ্টম অধ্যায়ের একাদশ বচনের তুল্যার্থবীচী। এই শ্রুতিদ্বয়—সমস্ত যজ্ঞ, তপস্বী, দেবার্চনা এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি অমুষ্ঠানকে ব্রহ্মের সহ সংযুক্ত করিয়াছেন। এই সংযোগই কর্ম্মযোগ। গীতার উক্ত বচনের শাকরভাষ্যে ঐ শ্রুতিদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে।

অতঃপর যেটা পরব্রহ্মভাব, তাহাই বিজ্ঞের। উপরিউক্ত কর্ম্মযোগ সমূহ দ্বারা তাহাই কালান্তরে প্রাপ্যীয়। সেই আত্মজ্ঞান, পর শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। তাহাই মোক্ষ। যথা—

“ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ত্বুঃশ্চিন্ন-
বভূব কশ্চিৎ।

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো ন হস্ততে
হস্তমানে শরীরে”। ১। ১৮।

অর্থ। সেই আত্মা জন্মেন না, মরেন না, তিনি অপমিলুপ্তটোতন্ত্র্যভাব; তিনি কোন কারণান্তর হইতে উৎপন্ন হন না এবং আপনিও কিছু হন না। অতএব ইনি জন্মবিহীন, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত কোন শরীর বিনাশে তিনি বিনষ্ট হন না। তিনি আকাশের স্তর হস্ত

ও বিকারবিহীন। এই আত্মজ্ঞান-প্রতি-
পাদক শব্দটী সামান্ত শব্দ-পরিবর্তনের
সহিত গীতার সাংখ্যজ্ঞান-প্রকরণে (১২০)
দৃষ্ট হয়। কর্মযোগাগুষ্ঠানের অন্তিম উদ্দিষ্ট
যে পররক্ষণ, তাহাই এই আত্মজ্ঞান। *

৩৪। ছান্দোগোপনিষদে কহিলেন —

তেনোভো "কুরুভো" মনৈশ্চ তদেবং বেদ

নবেদ। নানাতু বিজ্ঞাচা বিজ্ঞাচ। যদেব
বিজ্ঞয়া কুরোতি শ্রুক্রোপনিবদা। তদেব

বীর্গ্যবত্তরং ভবতীতি। ঋষেত মৈবাকর-
জ্ঞোপ-প্যাখ্যানং ভবতি।" (অঃ । ১ম খঃ
১০ শ্রঃ ।)

অর্থ। ঐকারই পরাপর ব্রহ্ম। সমস্ত
বর্ণাশ্রমধর্ম, নিত্যনৈমিত্তিক ও সঙ্ক-দেবা-
র্চনাদি অমুষ্ঠান এই অক্ষয়-প্রতিপাদ।
ঋত্বিক ও মঙ্গমান এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বে
ঐ গুরুক জিয়াগুষ্ঠান করেন। ফলে তাঁহা-
দের মধ্যে বাহারা এই মন্ত্রে ব্যুৎপন্ন, অপর,

* মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্তের
"তত্ত্ব সমন্বয়ং" স্থলের এই তাৎপর্য লেখেন—
"ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রাতিপাদ্য হইলেন।
সকল বেদের তাৎপর্য ব্রহ্মে হয়। "সর্গে
বেদান্তপদমাগনস্তি" ইত্যাদি শ্রুতি ইহার
প্রমাণ। কর্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায়
ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্রবহিত
কর্মে প্রযুক্ত থাকিলে, উত্তর কর্ম হইতে
নিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়; পশ্চাত জ্ঞানের
উচ্ছাদন"। মহাত্মা রাজার এই ব্যাখ্যা
উপাদেয়। শাস্ত্রবহিত যে সকল অমুষ্ঠান
চিত্তশুদ্ধির জন্য, তাহারই নাম "কর্মযোগ"।
শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি "সর্গে বেদা"
বাক্যের অর্থস্থলে কেবল "সর্গ-বেদান্ত"
গ্রহণ করিয়াছেন। ("namely part of
the Vedas, the Upanishads"—Bibli-
otheca Indica Katha Upanishad.)

বাহারা ইহার প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত নহেন,
তাঁহারা উভয়েই সমভাবে ইহার দ্বারা জিয়া-
গুষ্ঠান করেন। কিছু বিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা
পরম্পর বিভিন্ন। ধর্মক্রিয়া, বাহ্য বিজ্ঞা
(জ্ঞান), শ্রুক্রা (ভক্তি) এবং উপনিষদ
(উপাসনা) যোগে অমুষ্ঠিত হয়, তাহাই
বীর্গ্যবত্তর (অধিক ফলদায়ক) হয়। ইহাই
ঐকার-রূপ অক্ষর, ব্রহ্মের নিশ্চিত উপ-
ব্যাখ্যান। *

এই ঐকার কেবল মাত্র কর্ম্যাক নহেন।
ফলে পুরোহিত ও মঙ্গমাগণ তাহাই মনে

* "Both, those who are versed
in the letter (om) thus described
and those who are proficient in
mere ritual performances, but
know not its exact nature, perform
ceremonies, (Question) Since both
are entitled to fruition from their
capability in ritual works, of what
import then is a knowledge of the
exact nature of this letter, it being
evident that the succession of cause
and effect is invariable and alto-
gether irrespective of the knowledge
of such succession ; thus, the use of
myrobolans causes purgation to all,
whether apprized of its effects or
otherwise ? (Answer) But that
cannot apply here ; for "knowledge
and ignorance are unlike each
other" i e they are distinct in their
natures and cannot lead to a
similar fruition (Bibliotheca In-
dica, Chhandogya Upanishad, Chap
I Sec I verse 10. Footnote by
Dr. Rajendra Lal Mitra.)

করেন। এই অক্ষরের মহিমা তদপেক্ষাও অধিক। তাহাই পরব্রহ্মভাষ। তাহাই ব্রহ্মজ্ঞান রূপ উচ্চতম রস। অতএব বেদ সকল বৈদিক অঙ্গুষ্ঠান, এই অক্ষর-প্রতিপাদ্য সেই উদ্দেশ্যটী সহকারে ক্রিয়রাপ্যবুদ্ধিতে অর্পিত হয়, তাহা ক্রিয়াই অঙ্গ কর্মীর অর্পিত ক্রিয়োগেক্ষা অধিক বীর্ষাবান। “অধিক” শব্দ হইতে ইহাই বুদ্ধিতে হইতে যে, অঙ্গকর্মীরও ক্রিয়ী বীর্ষাবান বটে, যদিও তত নাহে। কেননা, যেহাচারী বা ক্রিয়া-হীন ব্যক্তি অপেক্ষা অঙ্গ শাক্তবিত্তিকর্মী শ্রেষ্ঠ। (এ সম্বন্ধে ব্রহ্মপুত্র গণ্ডাতে উষ্টব্য।)

ছান্দোগ্যের এই শ্রুতি তারতম্যরূপে সর্বপ্রকার কাম্যোগের উপদেশ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতির “যদেব বিদায়া কেরোতি শ্রদ্ধাযোগনিষদা” ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্মই এই যে, যে ধর্ম্মাভ্যাসে, বিদ্যা, শ্রদ্ধা, ভগবদাধ্যয়াদি উদ্ভিষ্ট, তাহা সাধারণ নোকে রক্ষিত হইতে অধিক বীর্ষাবন্তর, তাহা মহানোক্ষের অধু-কুণ কাম্যোগ। তাহাই গীতার উপদেশ। “বাসিমাং গুপ্তিতা বাচং” প্রভৃতি গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের দশটী বচনে এই শ্রুতির মর্ম্ম বিদ্যমান।

৫৫। খেতাখতর-উপনিষদে কহিলেন।—

“আরভ্য কর্ম্মণি গুপ্তম্বিতানি।

ভাবাংশ সর্ভান্ বিনিবোজয়েৎ যঃ।

ত্বেবাসভাবে কৃতকর্ম্মনাশঃ,

কর্ম্মকরে ষ্টি সতত্ততোহন্ত

(৬ অঃ ৪ শ্রুতি)

যে ব্যক্তি বেদাগমবিহিত সবগুণাখিত ক্রিয়া সকল এবং তদগীভূত স্বকীয় (নিকাম)

মনোভাব সকল ঈশ্বরে যোজনা করেন, তাঁহার কোন ক্রিয়াতে স্বার্থ থাকে না; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কৃতকর্ম্মের ফল বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মকরে তিনি প্রাকৃতিক-পন্থা অতিক্রম করেন—অর্থাৎ ব্রহ্মলাভ করেন। এই শ্রুতিতে কাম্যকামনা ত্যাগ-পূর্ণক কাম্যমস্তকে ঈশ্বরে অর্পণ করিবার বিধি দিয়াছেন। অতএব ইহা কর্ম্মযোগ। গীতার কাম্যযোগ-প্রতিপাদক বচনসমূহের ভূগার্থ্যবাচী। *

৩৬। ভগবৎকার উপনিষদে আছে—

“তৈজসপোদমঃ কশেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ
সক্সাঙ্গানি সত্যামারতনঃ” (৩ঃ ৩ঃ)

যেই উপনিষৎ (অর্থাৎ তৎপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম) প্রাপ্তির উপায় ‘তপঃ’ মানসিক কামনা ও

“* তত্ততোহন্ত” খেতাখতরীয় এই বাক্য টার শঙ্করকৃত ভাষ্য এই, যথা—“কর্ম্মকরে বিশুদ্ধমহো যাত ততোহন্তত্তবেত্যঃ প্রকৃতি-ভূতেভ্যোঽটিন্যহুচাবিদ্যাভংকার্যবিনির্গম্ম-শিৎ সদানন্দাহুতীয়ব্রহ্মাত্মনোবগচ্ছান্ত্য-র্থঃ”। কর্ম্মকর হইলে পর বিশুদ্ধমহু ব্যক্তি প্রাকৃতিক তত্ত্বশ্রেণীর—অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিক্রান্ত—অবিদ্যার অতিক্রান্ত—সদানন্দ অধিতীয় ব্রহ্মাত্মভাব লাভ করেন। অথবা “তত্ত্বোভ্যো যদন্তদ্বক্ষ তদনাতীতি”। তত্ত্বশ্রেণী হইতে অস্ত্র যে ব্রহ্ম, তাঁহাতে গমন করেন। খেতাখতরের “আরভ্য কর্ম্মণি গুপ্তম্বিতানি” প্রভৃতি এই শ্রুতিটী যে সকল গীতাবচনের ভূগার্থ্যবাচী, তাহা শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা।—“যং কেরোবি মদম্মাসি” ইত্যাদি ৯ অঃ। “গুভাস্তত্ত্বফলৈরেবং” ইত্যাদি ৯ অঃ। “ব্রহ্মণ্যাদায় কর্ম্মণি” এবং “কায়েন মনসা” ইত্যাদি ৫মঃ অঃ। গীতাশাস্ত্রে ভাষ্যের সহিত এই সকল বচন পাঠ করিলেই তৎসমস্ত এই শ্রুতির সহ লগ্ন হইবেক।

ইন্দ্রিয়সংযমরূপ তপস্বী, 'দমঃ' বহিরিন্দ্রিয়ের লক্ষণরূপ উপশম, 'কর্ষ' অগ্নিহোত্র ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মহুষ্ঠান; অতঃপর 'বেদাঃ' বেদাদ্ সহিত চারিবেদ, ইহঁার প্রতিষ্ঠা, এবং সত্য ইহঁার আধার। এই সমস্ত অহু-ষ্ঠান ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কাবনাশুচ্য এবং ব্রহ্মোদ্দিষ্ট কর্ম্মযোগ। যাহা কিছু চিত্তশুদ্ধিকর, তাহা কর্ম্মযোগ।

৩৭। সুগুণোপনিষদে কহিলেন—

"তদেতদ্ভোগভুক্তঃ ক্রিরাবন্তঃ শ্রোত্রিয়া-ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ। স্বয়ং জুহ্বন্ত একর্ষি শ্রুতয়ন্তঃ তেবামেবৈবতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্ভৈস্কচীর্ণঃ ॥" ১০শ্রু।

এই পরাব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদানের বিধান বেদ-মন্ত্রেতে এইরূপ অস্তিত্বপ্রকাশিত আছে। ষাঁহার ক্রিরাবান শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ (অর্থাৎ অপরাব্রহ্মেতে অভিব্যক্ত এবং পরব্রহ্ম লাভার্থ সচেত) এবং ষাঁহার শ্রদ্ধাপূর্বক অগ্নিতে স্বয়ং হোম করেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্ম-বিদ্যা কহিবেক, ষাঁহাদের দ্বারা অগ্নিধারণ লক্ষণরূপ বেদব্রত আচরিত হইয়াছে।

সংক্ষেপ ভাষণ এই যে, ষাঁহার ব্রহ্ম-নিষ্ঠার সহিত নিষ্কামভাবে ঈশ্বরারাদনার্থে অগ্নিহোত্র, গিত্ত্বকর্ম্ম ও দেবার্চনাদি কর্ম্ম-হুষ্ঠানে যোগ্য এবং 'শ্রোত্রিয়' (শ্রুতির মন্ত্রজ্ঞ) তাঁহারাই কর্ম্মযোগী। তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিবেক। তাঁহার তাহার অধিকারী। এই বর্তমান সময়ে অগ্নিহোত্র অস্তি বিরল। শ্রদ্ধাপূর্বক নাগা-রূপের স্বেদা এবং ছর্জীৎসবাদি তাহার অহু-কল্প। তদহুষ্ঠাতৃগণ চিত্তশুদ্ধির যোগে ক্রমে ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেন।

৩৮। তৈত্তিরীরোপনিষৎ—শিলাবলী, ১১শ অহুবাচ।

"বেদমহুচাচার্যোহিবাসিনমহুশান্তি।

সত্যায় প্রমদিতব্যঃ, ধর্ম্মায় প্রমদিতব্যঃ, কুশলায় প্রমদিতব্যঃ, দেবপিতৃকার্য্যাত্মাং ন প্রমদিতব্যঃ।"

"প্রাগ্ভুক্তস্বিচ্ছানামিরগেন কর্ত্তব্যানি শ্রৌত স্মার্ত্তকর্ম্মণীভ্যেবমর্থঃ। পুত্রস্ব সংসারার্থত্বাৎ। সংস্কৃতস্ত হি বিশ্বক গমস্তায়জ্ঞাত মন্ত্রসৈ-বোৎপত্তেত" ইত্যাদি ১১।

ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের পূর্বে শ্রৌত (বেদ-বিহিত) এবং স্মার্ত্ত (স্মৃতিবিহিত) নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ও যজ্ঞদেবার্চনাদি ক্রিয়া-কলাপের অহুষ্ঠান করিবে। এখানে ঈশ্বরার্থ নিষ্কাম অহুষ্ঠানই উদ্দেশ্য। কেননা তাহা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে শীঘ্রই ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অতিপ্রায়ে আচার্য্য শিষ্যকে ধর্ম্মোপদেশ করিতেছেন, যথা—

সত্য হইতে পতিত হইও না, ধর্ম্ম হইতে বিরত হইও না, আত্মরক্ষাদি কুশলকর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইও না, দেবার্চনা ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি অহুষ্ঠান হইতে স্বলিত হইও না।

এই সমস্ত বৈদিক উপদেশ, নিত্য। এখানে আচার্য্য ও শিষ্যের উল্লেখ ব্যক্তি-পুরুষসর নহে। এই সকল উপদেশ চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত। তৎসমস্তই ঈশ্বরার্থ, স্মরণঃ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ।

৩৯। স্মৃতি ও বেদান্তস্বত্রেও যোগো-পদেশ আছে।

ভগবান্ মহু প্রথমেই আত্মজ্ঞানরূপ নিবৃত্তিধর্ম্মের উপদেশ করিরা, পশ্চাৎ তাহার

অঙ্গীভূত সংস্কারাদিরূপ ধর্মশাশন আরম্ভ
করিয়াছেন, এবং তদুপক্রমেই নিকটম কর্ম-
যোগের অবতারণা করিয়াছেন, যথা—

“কামাশ্রিতা ন প্রশস্তা নটৈচেবেহাস্ত্যাকামতা ।
কাশ্রোহিবেদাধিগমঃ কর্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ॥”
২ । ২ ॥ মমু ।

বলমানের ‘কামাশ্রিতা’ অর্থাৎ ফল-
কামনা পূর্বক ক্রিয়াক্ষেত্রান করা প্রশস্ত
নহে । নিকাম হইয়া আশ্রয়ানোদ্যে
বেদবোধিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম
করিলে কর্মাদান রহিত হইয়া অস্তে মোক্ষ
হয় ।

“বৈদিক কর্মযোগেহু সর্বাণোত্যাক্রমেষতঃ ।
অমৃতভাস্তি ক্রমশস্ত্যঃস্তম্ভিন্ ক্রিয়াদিভৌ ॥”
মমু ২ । ৮ ৭ ।

বৈদিক কর্মযোগ, পরমায়-উপাগনাধিপী ।
বেদান্ত্যাদি তানৎকর্ম ঐ কর্মযোগ—
অর্থাৎ ঐ উপাগনার অন্তর্ভূত ।

“প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম বৈদিকং ॥”
ঐ ৮ ৮ ।

স্বর্গাদি মুখপ্রাপ্তিকর বৈদিক কর্মের
নাম প্রবৃত্তকর্ম (কামাকর্ম), আর মোক্ষ-
প্রাপ্তিকর যে বৈদিক কর্ম, তাহাই নিবৃত্ত-
কর্ম । গীতার কর্মযোগও নিবৃত্ত কর্ম ।
বৈদিক কর্ম এই দ্বিবিধ —

“ইহচামুন বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম কীর্ত্যতে ।
নিকামং জ্ঞানপূর্বকং নিবৃত্তমুপদিশতে ॥”
ঐ ৮ ৯ ॥

ঐহিক-পারজিক ফলার্থ যে কাম্য কর্ম কৃত
হয়, তাহাই প্রবৃত্তকর্ম । আর দৃষ্টাদৃষ্ট ফল-
কামনারহিত ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস পূর্বক যে
বৈদিককর্ম অমুক্তিত হয়, তাহাই নিবৃত্ত-কর্ম ।

“সর্পভূতেষু চাত্মানং সর্পভূতানি চাত্মনি ।
সমং গশ্রদ্রাশ্রয়াজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি ॥”

মমু ২২ । ১০ ।

সর্পভূতে পরমাত্মা এবং পরমাত্মাতে
সর্পভূত, এইরূপ জ্ঞানে (ব্রহ্মার্পণজ্ঞানের)
সাঁহার জ্যোতিষ্টোমাদি করেন, তাঁহার
আশ্রয়রাজ্য লাভ করেন ।

“যথোক্তান্তপি কর্ম্যপি পরিহার বিজ্ঞাতমঃ ।
আশ্রয়জ্ঞানে শমে চ স্ত্রাবেদান্ত্যাসে চ যত্ববান্”
ঐ ২২ ॥

ব্রাহ্মণ যথোক্ত অগ্নিহোতাদি কর্ম পরি-
তাগ করিয়াও আশ্রয়জ্ঞানে ইঞ্জিরসংবাদ
এবং প্রণব-উপনিষদাদি বেদান্ত্যাসে বিশেষ
যত্ববান হইবেন । “এতট্টেবাং মোক্ষা-
পায়ান্তরঙ্গোপায়ত্ব প্রদর্শনার্থং নত্বমিহোতাদি
পরিতাগ পরতয়েত্বাকং ।” (কুল্লকভট্ট) ।
এই শাসনটী মোক্ষের অন্তঃসঙ্গ উপায়
প্রদর্শনার্থ উদ্ভিত হইয়াছে, নতুবা অগ্নিহো-
তাদি কর্মের পরিতাগার্থ নহে । অর্থাৎ
আশ্রয়জ্ঞানে এবং ইঞ্জিরদমন ও বেদান্ত্যাসে
যত্ন স্থিরতর রাখিয়া, ব্রহ্মার্পণজ্ঞানের অগ্নিহো-
তাদি বা দেবার্চনাদি কর্ম্যাক্ষেত্রান করিবেন ।
এ সমস্তই কর্মযোগ । কর্মযোগের বন্ধকত্ব
নাহি ।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও স্বীয় স্মৃতিতে নিম্ন-
লিখিত বচনে কর্মযোগের উপদেশ করি-
য়াছেন—

“ইজ্যাতারোদমোহহিংসাদানঃ স্বাধ্যায় কর্মচ ।
অমৃত পরমোধর্ম যদ্যোগেনাশ্রয়দর্শম্ ॥”

যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায়,
এই সমস্ত ধর্ম অমুঠের । কিন্তু এই সমস্তের
যোগে যে আশ্রয়দর্শন হয়, তাহাই পরম ধর্ম ।

অর্থাৎ আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভাবনাপনাতে উদ্দেশ্য হির রাধিমা, নিকাম ভাবে যখন ঐ সমস্ত অহুষ্ঠিত হয়, তখনই তৎসমস্ত পরমপর্শ সংজ্ঞা লাভ করে ।

মহর্ষি ব্যাসদেবও নিম্নস্থ কতিপয় ব্রহ্ম-সূত্রে (বেদান্তসূত্রে) কর্মবোধগণর বেদ-ব্যাক্যসমূহের মীমাংসা করিয়াছেন—
“সর্গাপেক্ষাচ বজ্রাদি শ্রুতেরখবৎ” (৩ অঃ ৪ পা ২৬)

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তে বজ্রাদি অহুষ্ঠান অপেক্ষিত । ফলে তৎসমস্ত জৈমিরার্থে অহু-
ষ্ঠিত হইলেই চিত্তশুদ্ধি জন্মে । যেমন গৃহপ্রাপ্তি পর্ষান্ত অশ্বের প্রয়োজন থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ পর্ষান্ত ঐরূপ কর্মের প্রয়োজন । বেদে তাদৃশ কর্মাহু-
ষ্ঠানকে ব্রহ্মবিচার হেতু কহিয়াছেন । শ্রুতিতে আছে “তস্মৈতং (আত্মানং) বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিধিবিস্তৃত্য যজ্ঞেন দ্বানেন উপমা নাশকেন” । সেই যে এই আত্মা, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের বেদপাঠ, বজ্র, দান, তপস্যা এবং উপবাসের দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন । অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিরাই এই সকল অহুষ্ঠান করেন ; অন্য ফল ইচ্ছা করিয়া নহে । সুতরাং এ সকল কর্মযোগ ।

“বিহিৎসাক্ষাপ্রমকর্ম্মাপি ।” ব্রহ্মসূত্র ৩। ৪। ২।
“সহকারিষ্মেনচ” । ৩। “সর্গাপিতত্ত্রবেভ্যন্ন
লিন্দাৎ । ৩। “অনভিত্তবক্ষদর্শনতি” ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানী হইতেও বর্ণাশ্রমপর্শ—পর্ষাৎ
মিত্য-নৈমিত্তিক অহুষ্ঠানাদি কর্মকাণ্ড
পালন করিবেক । তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের সহ-
কারী । শুভকর্ম্মীর সূক্তি হয়, অন্তর্ভাট্যদীর

হয় না, উভয় নিদর্শনই বেদে আছে ।
নিরোচন আর ইঞ্জ, উভয়কেই ব্রহ্মা আত্ম-
জ্ঞান করিয়াছিলেন । নিরোচন বজ্রাদি
ধর্ম্মাহুষ্ঠানের অভাবে জ্ঞানপ্রাপ্ত হন নাই ।
কিন্তু ইঞ্জ বহু বহু বজ্রাদির অহুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন, সেজন্য সহজে জ্ঞান লাভ করিলেন ।
ধর্ম্মাদি শুভকর্ম্মাহুষ্ঠানে মানবের দৃষ্টাব শুভ
হয় । বেদে তাচার ‘অনভিত্তব’ অর্থাৎ
আদর দর্শিতরাছেন । এই কর্মকাটা ব্রহ্মসূত্র
উপলক্ষে “অমিকরণমালা” গ্রন্থে লেখেন—
“নিশ্চার্যমহুষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মভিরাপ্রমপর্শমিত্যতু” ।
‘নিশ্চার্য’ ব্রহ্মাদিষ্টে (জৈমিরার্থ) বজ্রাদি
কর্ম্মাহুষ্ঠান দ্বারা আশ্রমপর্শ সিন্দু হয় । এই
সমস্ত মীমাংসা যে কর্ম্মযোগ-পন, তাহা বর্ণা
নাহণ্য ।

“বদেব নিশ্চার্যেতিহি” ৪। ১। ১৮ ব্রহ্মসূত্র ।
যে সকল ব্রহ্মোপাসনাদি বেদনিষিদ্ধ
কর্ম্ম, ব্রহ্মনিষ্ঠাকে উৎপন্ন করেন এবং
ব্রহ্মনিষ্ঠাতে (বা ভগবচ্চরণে) উদ্ভিষ্ট ও মুক্ত
সে সকল কর্ম্মকে জ্ঞান-সাধন (বা চতুর্থী-
ভক্তিমাধন) কর্ম্ম বলা যায়, তাহা কামা
কর্ম্ম নহে ; সুতরাং কর্ম্মযোগ । মহর্ষি
ব্যাসদেব এই সূ-টা দ্বারা ইতিপূর্কের উক্ত
“তেনোভৌ” প্রভৃতি ছান্দোগ্য শ্রুতির
উল্লিখিত যোগপর্শের মীমাংসা করিয়াছেন ।
এ সম্বন্ধে “অধিকরণমালা” গ্রন্থে এই বচনটা
দৃষ্ট হয়—“কেবলং বীর্ষ্যবিদিত্যা সংযুক্তং
বীর্ষ্যবস্তরং । ইতিশ্রুতেস্তারতমাদ্ভূতরং জ্ঞান-
সাধনঃ” । ক্রিয়ারবিত্ত ব্যক্তিগণের অপেক্ষা
অল্পকর্ম্মী শ্রেষ্ঠ । তাহার অহুষ্ঠিত ক্রিয়া
জৈমিরার্থনারণী না হইলেও, বীর্ষ্যবান্-
কেননা কালান্তরে তাহা শুভ ফল এবং

ক্রমে জ্ঞান উৎপন্ন করিলেই। কিন্তু যে ক্রিয়াগুলির বিজ্ঞা (ব্রহ্মজ্ঞান) উদ্দেশ্য, সোপাসন-কৰ্মরূপে অগ্রসৃত হইয়া, তাহা অজ্ঞ কৰ্ম্মীর ক্রিয়া হইতে বীৰ্য্যবহর (অমিক ফলজনক); অতএব শ্রুতিতে নিরূপাসন ও সোপাসন উভয় প্রকার অজ্ঞানের জ্ঞান-সাম্পাদন তারতম্যরূপে উক্ত হইয়াছে। সোপাসন-কৰ্ম্মমাত্রই ঐশ্বর্য্যার্থ বিধায় কৰ্ম্মযোগ শব্দের বাটী। গীতার কথিত কৰ্ম্মযোগের ইহাই লক্ষণ।

৪০। সমাহার। এই বর্তমান সময়ে অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের অনুসরণ পূর্বক উপনিষৎ, স্মৃতি, বেদান্তের উৎপত্তি-কালের সহিত মহাভারত ও গীতার রচনা-কাল ধরিয়, এই সকল শাস্ত্রের অগ্র-পশ্চাৎ কাল সম্বন্ধ তর্ক করিতে পারেন। কিন্তু আমরা তাদৃশ তর্ক ভালবাসি না। আমাদের স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, উপনিষৎ সকল অপৌরুষেয় এবং স্বতঃসিদ্ধ। স্মৃতি সমস্ত বেদমূলক এবং বেদান্ত। “বেদান্ত-দর্শন” উপনিষদের সীমাংসাস্বরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গীতাতে মহুর প্রাচীনত্ব (৪।১) এবং ব্রহ্মজ্ঞানের (বেদান্তদর্শনের) অপারক সাংখ্যদর্শনের পূর্ববর্তিতা (১০।৪) ঘোষণা করিয়াছেন। সুতরাং আমরা অন্ত তর্ক মানি না। আমাদের মতে যোগোপদেশ সকল নিত্য।

৪১। অতএব ভগবদ্গীতা, অজ্ঞাত গীতা, মহাভারত, পুরাণশাস্ত্র, স্মৃতি সকল, বেদান্তস্বত্র সকল, যোগশিষ্ট-রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রে কৰ্ম্মযোগ, তত্ত্বযোগ, জ্ঞান-যোগ, ধ্যানযোগ, সমাধিযোগ আদি সম্বন্ধে

যত বিধি ও উপদেশ আছে, সে সমস্তই বেদমূলক ও সনাতন। তন্মধ্যে ভগবদ্-গীতার জ্ঞান শ্রেণীবদ্ধ বিচীর্ণ যোগোপদেশ অল্প কোন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু উক্ত শাস্ত্রসমূহে-এবং গীতাতেও সে সকল যোগের কৰ্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি নাই।

৪২। এই বর্তমান যুগে মন্যক্রিয়া সকল দুইভাগে বিভক্ত। বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে কোন কোন পদ্ধতি পৌরাণিক মতে মিশ্রিত। সামাজ্যতঃ উভয় প্রকার ক্রিয়াই ব্রহ্মার্পণছায়ে অগ্রসৃত হয়। কৰ্ম্মফল শ্রীনিযু বা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, অপনা ক্রিয়াবিশেষে শ্রীকালিকা দেবীর চরণকমণ্ডে অর্পণের নাম ব্রহ্মার্পণছায়া। এই ব্রহ্মার্পণছায়াটী যেমন বেদ, আগম ও পুরাণের বিধি, সেইরূপ ভগবদ্গীতারও বিধি। ফলে বেদই মূল।

৪৩। তন্ত্রশাস্ত্রে যে কৰ্ম্মযোগের পদ্ধতি মাজই আছে, তাহা নহে। তাহাতে তাহার বিধিও বিস্তারিত। তন্মধ্যে কৰ্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ প্রণালী, পাতকসংস্কারাদি ক্রিয়া অতি বিস্তীর্ণরূপে বর্তমান। তদন্তর প্রাণাধামাদি সমাধিযোগ, এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যরূপ যোগের বিধান, তাৎপর্য্য এবং পদ্ধতি সকল ভূরিপরিমাণে আছে।

৪৪। - পঞ্চাশতাব্দ পূর্বে সাধারণ ভক্ত-লোকদিগের মধ্যে অবশ্য এখনকার মতন গীতাশাস্ত্রের পাঠ ছিলনা বটে, কিন্তু পুরাণ-প্রবণ, তন্ত্রপ্রবণ এবং স্বতঃসিদ্ধিমা ও পৈতৃককর্মের অনুষ্ঠান, সকল ভক্তগৃহেই দৃষ্ট হইত। অতএব গীতার কৰ্ম্মযোগ, ধ্যান-যোগ

ও ভক্তিমোগ্য সকল কার্যতঃ আচরিত হইত।

৪২। কিন্তু এই বর্তমান কালে শাস্ত্র-জ্ঞানচীন বর্ণাশ্রমচারশব্দী নবীন গীতা-পাঠীরা কন্দমোগের অর্থস্থলে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী ক্রিয়ার পরিবর্তে কেবল আত্মবিক পুরুষকারকে গ্রহণ করতঃ দেবার্চনাদি কণ্ডের সম্বন্ধে কুঠায়াঘাত করিতেছেন, এবং দেশ-দেশান্তরে তন্মার্গে উৎসাহিতাসায় বহুত্যা করিয়া শাস্ত্রার্থনিমুচ্চ স্বজাতীয় সভ্যসমাজে অধবা আদির লাভ করিতেছেন। আশ্চর্য্য কাণ্ডের গতি! আশ্চর্য্য শিক্ষার ফল!! আশ্চর্য্য নিষ্ঠাভিত্তমান!!! টা।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ব্রাহ্মণ-মহাত্ম্য ।

(প্রথম প্রস্তাব ।)

শ্রোতব্রতীদিগের মধ্যে যেমন পতিত-পাবনী গঙ্গা, তৎকবর বৃন্দের মধ্যে যেমন মহামহীকর অশ্বখ, তেজোময় পদার্থ পুঞ্জের মধ্যে যেমন বৈশ্বানর অথবা গিরিসালা মধ্যে যেমন হিসাচল সর্কাগোক্ষা শ্রেষ্ঠ, সমগ্র পৃথিবী মধ্যে তেমনি পুণ্যময় ভারত-বর্ষ মহাদেশ সমুদয় স্থানাপেক্ষা সর্ব বিঘরে পুণ্যতম ও শ্রেষ্ঠতম। বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, ধন্ত সেই মানব, যাহার পুণ্যধাম ভারতবর্ষে জন্ম, তাপ্যবান সেই মহত্ম-কুলভূষণ পুরুষ, যিনি স্মৃতি-বলে পবিত্রতম ভারতভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়া মানবসমাজে

শীর্ষস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ মহাদেশে জন্মগ্রহণ করা অতীব প্রাধান্য বিষয় ও ঐকান্তিকী স্মৃতিয় ফল বলিতে হইবে। গরীরগী ভারতমাতার সন্তান-সন্ততি রূপে জন্ম গ্রহণ করা নিতান্ত গৌরব ও মৌরভের বিষয় বটে, তৎসম্পর্কে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভারতবর্ষ মহাদেশে হিন্দুকুলে জন্ম গ্রহণ করা অধিকতর গৌরব, অধিকতর পুণ্য এবং অধিকতর মহত্বের পরিচয়, ইহা প্রব সত্য। ধন্ত সেই পবিত্র পুরুষপুত্র, যাহার ভারতে জন্ম; ধন্ততর সেই পতিতপাবন পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাহার হিন্দু-কুলে জন্ম, এবং ধন্ততম সেই জগদ্ব্যূষণ ও জগৎ-পুরুষশ্রেষ্ঠ, যাহার ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম। বাস্তবিক বহুপুণ্যফলে ও নিতান্ত সৌভাগ্য-বলে মনুষ্যেরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে অথবা ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবন চরিতার্থ করে। প্রকৃত ব্রাহ্মণ পুরুষ সদাই পবিত্র ও সদাই পূজ্য, তিনি নরাকারে দেবতা এবং মহাপুরুষরূপে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার।

শাস্ত্রবেত্তা মহামহর্ষিগণ এই পুণ্যধাম ভারতবর্ষের বহুপ্রাশংসা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষিবৃন্দের অভিমতে জম্বু, মল্ল, শাক, ক্রৌঞ্চ, কুশ, শাক এবং পুরুষ, এই সপ্তদ্বীপ-পরিবেষ্টিতা বঙ্গুকরা মধ্যে ভারতবর্ষ সর্ব শ্রেষ্ঠ।* ভুলোক, ভুবলোক, স্বলোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক এবং

* সম্ভবতঃ জম্বুদ্বীপ প্রাচীন ভারতবর্ষ, মল্লদ্বীপ মিডিয়া দেশ, শাকদ্বীপ সিরিয়া, ক্রৌঞ্চদ্বীপ সিন্ধুদেশ (Asia Minor), কুশদ্বীপ চীনমাল্য, মল্লদ্বীপ সিরিয়া, পুরুষ

সত্যলোক, এই সপ্তবর্গ মধ্যে, শাস্ত্রকর্তা মহর্ষিগণ ভারতবর্ষকে অতি পবিত্র স্থানে সমাবিষ্ট করিয়াছেন এবং অতল, বিতল, স্তম্ভল, তলাতল, মহাতল, রগাতল ও প্রাতল, এই সপ্তবিধ পাতালের কর্তা বলিয়া ভারতভূমিকে নির্দেশ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, ভারতবর্ষ সমগ্র জগৎ মধ্যে সম্পূর্ণ আদর্শ মহাদেশ। প্রকৃতির সম্পূর্ণ নৈচিহ্ন্য কেবল ভারতবর্ষেই সম্পূর্ণভাবে আছে, এইজন্যই ভারতকে ভৌগোলিকেরা "Epitome of the whole world" (সমগ্র পৃথিবীর সারসংগ্রহ স্বরূপ) ক'হিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ প্রকৃতির সম্পূর্ণ লীলাস্থল। অত্রভেদী অতুল অটল, বহুবোজনব্যাপী বিশাল অরণ্য, উন্মুক্ত বেলাকুলান্দোলিত মহানদ, কুলু কুলু বাহিনী নদী বা নির্মালিনী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর,

বীণ মঙ্গোলীয়া হইতে মালয় উপসাগর। তৎকালে এই কয়েকটি দেশ লইয়াই সভ্য জগৎ বর্তমান ছিল। অত্যাশ্রয় দেশ অসভ্যতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল বলিয়া প্রাচীনতম ভৌগোলিকেরা এই তালিকার মধ্যে সেগুলিকে তুচ্ছ করেন নাই। পুরাকালে জম্বুদ্বীপ অর্থে ভারতবর্ষ বুঝাইত। বর্তমান কালে বাঁহাকে (কাম্বার রাজ্যাস্তর্গত) জম্বু কথা বীর, প্রাচীন সময়ে তাহার সঙ্গে আরও ছয়টি প্রদেশ একত্র করিয়া 'ভারতবর্ষ' নামকরণ করা হইয়াছিল। "দ্বীপ" অর্থে দেশ বা প্রদেশ বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালে জম্বুদ্বীপ বা জম্বুপ্রদেশ এই সপ্তবর্গের প্রকটতম ছিল বলিয়া, জম্বুদ্বীপ অর্থে এখনও ভারতবর্ষ বুঝায়। হিন্দুর ক্রিষ্টাব্দে "সকল" কালে "জম্বুদ্বীপে" "ভারত খণ্ড" এইরূপ শব্দ এখনও উচ্চারিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অতুল মহীরুহ, শোভাসমী শত-শতিকা, মন-প্রাণ তৃপ্তকর প্রসন্নপুঞ্জ, রসমানন্দ-দায়ক ফল, বহু প্রকারের বিচিত্র ভাষা, বহুপ্রকারের নর-নারী, বহুবিধ বিজ্ঞা ও কৌশল, নানাবিধ আকৃতি ও প্রকৃতি, বিবিধ প্রকারের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, ভারত ভিন্ন আর কোথাও নাই। ভারতবর্ষ ভিন্ন বড়খড়ু আর কোথাও ক্রমাগত নিয়মিতরূপে শোভা ও প্রভাব বিস্তার করে না। আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সামাজ্য-ঐহিক তত্ত্বগুলি পর্য্যন্ত ভারতে সম্পূর্ণভাবে আলোচিত হইয়া গিয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভারতই সম্পূর্ণ গৌলাস্থল। শিক্ষার এমন স্থান আর কোথা পাইবে? দেখিবার, শিখিবার, জানিবার, বুঝিবার, পড়িবার, চিন্তা এবং আলোচনা করিবার এমন দেশ আর কোথায়? পৃথিবীর অনেক দেশ-প্রদেশ-পারভ্রমণ করিয়া আসিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষে বাহা দেখিবার ও শিখিবার আছে, অজ্ঞতা তাহা কোথায়? সম্পূর্ণ আদর্শ—প্রকৃত মহুয়া হইবার জন্ত যে সব শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা ভারতেই একাধারে বর্তমান। ভারতে বাহা আছে, অজ্ঞতা সম্পূর্ণভাবে তাহা নাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের পূর্ণতা সম্পাদিত হইলে আদর্শ দেহ হয়; হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্পূর্ণতার নাম মন; আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণতার নাম আত্মিক সম্পূর্ণতা; স্তম্ভরূপ পাঠকেরা বুঝিতে পারিলেন, আদর্শ দেহ, আদর্শ মন ও আদর্শ আত্মিক মানব বাস্তব নাম আদর্শ মহুয়া (Ideal man)। এই সম্পূর্ণ আদর্শের মানব কেবল ভারতবর্ষেই

জন্মগাছেন। ভারতভূমি ভিন্ন আর কোথাও আদর্শ মানব জন্মগ্রহণ করেন নাট। রাজর্ষি জনক, রমুকুলভিগক ঐরামচন্দ্র, মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, বীরাদিক বীর অর্জুন, ধর্মকল্পত্রয় বৃন্দাষ্টিগ, আদর্শ দ্বিতৈশ্বর্য মহাত্মা ভীষ্মদেব, কল্পিতাদিক কল্পিত ঠাকুর লক্ষ্মণ পভূতি অগামাত্ম গুণা-দর্শ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ পূরক এই প্রাচীন মহাদেশকে পবিত্রতম ও শ্রেষ্ঠতম করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক আদর্শ মানব কেবল ভারতবর্ষেই জন্মিয়া গঠন এবং কেবল ভার-তেই জন্মিতে পারেন। সম্পূর্ণ আদর্শ উৎপন্ন করিবার জন্ত যে গুণ, যে উপাদান ও যে সামর্থ্যের প্রয়োজন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাহা নাই।

ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া আদর্শ হইবার চেষ্টা করিলে, সমুদয় সহজেই তাহাতে সিদ্ধ-কাম হইতে পারেন। হিন্দুকূলে জন্মগ্রহণ করিলে ইহা আরও সহজ হইয়া উঠে। সনাতন হিন্দুধর্ম পৃথিবীর সমুদয় ধর্মোৎসে-কেন্দ্র আদিতমতম ধর্ম নহে, পরন্তু ইহা সর্বাঙ্গিক শ্রেষ্ঠতম ধর্ম এবং সম্পূর্ণ আদর্শ ধর্ম। এই ধর্মকে দীর্ঘতমত পালন করিতে শিক্ষা করিলে, মনুষ্য "আদর্শ মানব" হইতে পারেন। এই ধর্ম বিশ্বজনীন উদার ধর্ম; ইহা মহাসমুদ্রের জায় অসংখ্য রত্নে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় বিদ্যা-বুদ্ধি, সম্পূর্ণ উন্নতির সম্পূর্ণ উপাদান, এক হিন্দুধর্মেরই একত্বভাবে পরিস্ফুট হয়। এমন অপূর্ণ গুণাণী ও সামর্থ্যশালী ধর্ম পৃথিবীর আর কোন জাতিতে বর্তমান নাই। হিন্দুধর্ম হইতেই শাখা বা উপশাখারূপে

অন্যান্য ধর্মসমূহ নিঃসৃত হইয়াছে। হিন্দু-ধর্ম মানবীর বুদ্ধির বা কল্পনার ধর্ম নহে, ইহা ঐশ্বরিক; এইজন্য ইহা সনাতন ও শাস্ত। প্রথাতানায়ী মাদাম ব্লাভাট্‌স্কী কহিতেন "Blessed be the man who calleth himself a Hindoo" যন্ত্র সেই মানব, যিনি হিন্দু বর্ণিয়া পরিচয় দেন।

অতীব পুণ্য বর্ণে যেমন ভারতে জন্ম লাভ হয়, পুণ্যাদিক পুণ্য বর্ণে যেমন হিন্দু-কূলে জন্ম হয়, তেমনই জন্ম-জন্মান্তরীণ অগণ্য সুকৃতি-ফলে ভারতবর্ষবাসী এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের বংশে মনুষ্যের জন্ম হইয়া থাকে। প্রকৃত কথা এই, অতীব পুণ্য-প্রভাব না থাকিলে ব্রাহ্মণ অর্জন করা অপব্য ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করা সম্ভব। তপঃ-প্রভাবে, পুণ্য-প্রভাবে ও সুকর্ম-ফলে অ-ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণ-কূলে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন এবং সুকর্ম-ফলে ব্রাহ্মণও জন্মান্তরে জঘন্য চণ্ডাল বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহার লক্ষ লক্ষ অকাটা শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে। কেবল জন্মান্তরে কেন, ইহা জন্মেই অনেক ব্রাহ্মণকুল-কলঙ্ক পাপায়া, চণ্ডাল অপেক্ষাও জঘন্য-তর অবস্থার পরিণত হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করা যায়। শাস্ত্রকর্তারা এই জন্মেই কল্পিয়া গিয়াছেন যে, যিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ ঐহাতে প্রকৃত ব্রাহ্মণধর্ম বিস্তারকারে বর্তমান, তিনিই পবিত্র ও পূজ্য এবং নমস্ত। কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ কাহারও নমস্ত নহে। ইহলোকে ইহাও দেখা যায়, অনেক অ-ব্রাহ্মণ পুণ্য-প্রভাবে ও ধর্ম-বলে ব্রাহ্মণ লাভ করিয়া

সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার পূর্বক
 আক্রমণেরও নমস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। পুরা-
 কালেও বহুসংখ্যক অত্রাক্ষণ, তপোবলে,
 পুণ্য-বলে এবং স্মৃতি-ফলে ব্রাহ্মণ জাতি-
 মধ্যে পরিগণিত হইয়া গিয়াছিলেন, উহারও
 শত সহস্র পৌরাণিক বৃত্তান্ত বর্তমান আছে।
 শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাপক মহোদয়েরা সর্বপ্রথমে
 পরমহংসকে সর্বোচ্চতম স্থান দান করেন।
 তাঁহাদের মতে, যিনি প্রকৃত পরমহংস, তিনি
 সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। তিনি আদিতে
 যে কোন জাতি বা যে কোন বর্ণের লোক
 হইউন না, প্রকৃত পরমহংস সকলেরই পূর্য
 ও নমস্ত। তিনি আদিতে অত্রাক্ষণ থাকি-
 লেও, ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত পুরুষ ও রমণীর পূজা
 এবং নমস্ত। পরমহংসের নিম্নে সন্ন্যাসীর
 স্থান; ইহারও পৈত্রিক জাতি বা বর্ণের
 বিচারের আরোপন নাই; উনিও গৃহী ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের পূজ্য এবং নমস্ত।
 তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মচারী ও ব্রাহ্মণ। অধুনা সন্ন্যাসী-
 সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের প্রায় পার্থক্য
 নাই। বৃগিহটুক, এই তিন শ্রেণীর
 মহাপুরুষের নিম্নে (গৃহস্থ) ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ-
 গণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; মতোত্তম,
 উত্তম; অধম এবং অধমাদম। ইহার সদ্-
 ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া গার্হস্থ্য ধর্মের
 সহিত ব্রাহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যাধির বহু স্ত্রীমম
 প্রতিপালন করেন এবং সচ্চরিত্রতার সহিত
 বিশ্বদ্রব্যে হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ রক্ষা করেন,
 একশ্রমকার সাত্বিক, সদাচারী, সাধুচেতা
 ও বিদ্যান ব্রাহ্মণগণ মহোত্তম ব্রাহ্মণ নামে
 অভিহিত হইবার যোগ্য। ইহার সদ্-
 ব্রাহ্মণকূলে জন্ম লাভ করিয়া, সাধারণ ভাবে

বিদ্যান ও সাধারণ ভাবে শাস্ত্রাভিজ্ঞ, কিন্তু
 সদাচারী, সচ্চরিত্র ও সংস্কারবসম্পন্ন এবং
 ব্রাহ্মণ-ধর্মের প্রতিপালক তাঁহার উত্তম
 ব্রাহ্মণ। ইহার কেবল ব্রাহ্মণ পিতার ঔরসে
 ও ব্রাহ্মণী মাতার গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছেন
 এবং উপবীত ধারণ করেন, অথচ কোন
 গুণ, কোন বিদ্যা বা কোন সামর্থ্য নাই, এমন
 ব্রাহ্মণগণ কেবল নামমাত্র ব্রাহ্মণ; ইহার
 অধম ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত। আর ইহার
 ব্রাহ্মণ-বংশীর হইয়া চৌর্য্য, হিংসা, সুরাপান,
 পরস্রী-গমন, বেস্ত্রাগমন, প্রবঞ্চনা, অসত্য-
 কথন, মূর্খতা, স্লেচ্ছতা প্রভৃতি দোষে ছষ্ট,
 একশ্রমকার জঘন্য ব্রাহ্মণগণ অধমাদম ব্রাহ্মণ
 মধ্যে গণ্য। ইহাদের অপেক্ষা অতি নিম্ন
 জাতীর ধার্মিক, সদাচারী ও সদ্ভাজনী পুরুষও
 শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠতর। অধম ও অধমাদম
 ব্রাহ্মণ বৃন্দকে নমস্কার বা প্রণাম না করিলেও,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের অপরাধ হয় না।
 জ্ঞান, ভক্তি ও শৌচহীন ব্রাহ্মণ সর্বদা
 উপেক্ষার যোগ্য। ভগবান কহিয়াছেন—
 “ভক্তিহীন আমি ব্রাহ্মণেরও নই।

ভক্তিতে ডাকিলে চণ্ডালেরও হই।”

দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শুদ্ধ-
 তার নাম শৌচ। কেবল বস্ত্রের বা গায়ে
 মলিনতা পবিহার করার নাম শৌচ নহে।
 শৌচাচার ও সাত্বিক-ব্যবহার দ্বারা দেহের
 নির্মলতা, বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা মনের
 নির্মলতা এবং পূজা, তপ, জপ, সাধনা, পুণ্য-
 কর্ম^{১০} ও সচ্চরিত্রতা দ্বারা আত্মার নির্মলতা
 সাধন করাই পূর্ণ শুচিতা। যিনি বলেন,
 “আমি শূদ্রের বাটীর জল পর্য্যন্ত পান করি
 না অথবা শূদ্রের হস্তের দান গ্রহণ করি না

কিঞ্চাৎ স্নেহাদির দ্বারা পর্যন্ত স্পর্শ করি না এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে গন্ধান করি” তিনি যদি মিথ্যা কথা, সুরাপান, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি পাপে লিপ্ত থাকেন, তিনি কদাচ শুচি পুরুষ নহেন। শাস্ত্রে শৌচ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অসংখ্য উৎকৃষ্ট উপদেশ নিহিত আছে। একটি প্রাচীন বাঙ্গালা প্রবাদ-পত্র এই—

“শুচি হয়ে মুচী হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে।

মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে ॥”

এখানে “শুচি” শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ। “কৃষ্ণ ত্যজে” শব্দের লক্ষণার্থে সদাচার, সাবিত্ততা, ধর্মপরায়ণতা, সচ্চরিত্রতা ও তত্ত্বজ্ঞান এবং ঐকান্তিকী ভগবদ্ভক্তি। ইহার বিপরীত হইলেই “কৃষ্ণ ত্যজে” কথা বার। কমা, লতা, দম, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, অংহিমা, ঔকসেবা, তীর্থপর্যটন, দয়া, ঋজুতা, লোভ-ত্যাগ, বজ্রন, বাগ্নন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এই গুলি ব্রাহ্মণের সাধারণ ধর্ম। বেদা-ভিজ্ঞতা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্যের বিশেষত্ব। যিনি সমুদয় বেদ অধ্যয়ন করিতে না পারেন, বেদের কিয়দংশও তাঁহার পক্ষে জানা আবশ্যিক। যিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নহেন, তিনি অত্রাহ্মণ; তাঁহার কৃত ক্রিমা-কলাপাদি অশুদ্ধ, অগ্রাহ্য ও অপ্রয়োজনীয়। ব্রহ্মচর্য পালন করা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। যে কোন স্থানে বা যে কোন অবস্থায় ব্রাহ্মণ অবস্থান করুন, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য পালন করিতেই হইবে; তিনি ব্রহ্মচর্য পালন করিতে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য। গৈরিক বসন ধারণ করা অথবা স্ত্রীসংযোগ পরিত্যাগ করার নামই ব্রহ্মচর্য

নহে। স্ত্রীসংযোগ পরিত্যাগ করা ব্রহ্মচর্যের প্রধান নিয়ম বটে, কিন্তু এখানে ব্রহ্মচর্য শব্দের অর্থ স্মৃতি: শুদ্ধতা, সাবিত্ততা ও সচ্চরিত্রতা বুঝাইতেছে। বৈধ স্ত্রীসংযোগ গৃহীর ব্রহ্মচর্য-বিরোধী নহে। পদে পদে মনুষ্যকে পাপপঙ্কে নিপতিত হইতে হয়; বস্তুরা নিশ্চয় পাপকর হয়, তাহারই নাম প্রারম্ভিক। বাবতীর শূভিশাস্ত্রে প্রারম্ভিকের বহল ব্যবস্থা আছে; সেই সমস্ত ব্যবস্থারই মূল উদ্দেশ্য তপস্বী বা ব্রহ্মচর্য।

“দেব বিজ্ঞ গুরু প্রাজ্ঞ পূজনঃ শৌচমার্জবন্ম।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শাস্ত্রীর তপ উচ্যতে ॥”

মনুষ্যের বীর্ঘ্য মনুষ্যের দেহ-রাজ্যে অধিপতি। এক বিন্দু বিপুল গুরু সহস্র বিন্দু বিপুল শোণিতের সমতুল্য। বীর্ঘ্যকরে দেহ, মন ও আত্মার অবনতি হয়; স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট হইয়া যায়। শাস্ত্রমতে বিবাহিতা সহ-ধর্মিণীতে বখানিরমে উপগমন পাপ বা অপরাধ বা ব্রহ্মচর্যব্যাঘাতক নহে; তত্তির অশ্লিষ স্ত্রীসংযোগ মহাপাপ বলিয়াই গণ্য। কেবল যে স্ত্রীলোকে উপগত হইলেই ‘মৈথুন’ হয়, তাহা নহে; সুবতী রমণীর রূপ দর্শন করিবা মাত্র যদি বীর্ঘ্যকর হয়, রমণীর রূপ-গুণাদির বর্ণন বা শ্রবণ বা কীর্তন করিলে যদি বীর্ঘ্যকর হয়, স্ত্রীসংযোগ ও যদি স্ত্রীকর হয়, তাহাও মৈথুন এবং পাপ-জনিত মৈথুন।

“শ্রবণ কীর্তনং কেলিং স্ত্রীসংযোগে ওহত্যয়ন।
সকলোধ্যবসারান্ত ক্রিয়ানিশ্চিয়েব চ।
এতমৈথুনমষ্টাং প্রবর্তি সনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমস্তুতং সুস্মৃতিঃ ॥”

শাস্ত্রকর্তারা ব্রহ্মচর্য্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রায়-
শ্চিত্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

"ন তপতপ উচ্যতে ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্"।

বাহাইউক, সর্কবিধি! অমঙ্গলজনক ও
সর্কবিধি পাপ ও অপরাধজনক কর্ম ব্রাহ্মণের
পক্ষে নিষিদ্ধ; কিন্তু নিরলিখিত পাপগুলির
জন্ত ব্রাহ্মণ সাধারণতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও
পাপ হইতে মুক্ত হইবেন না। নিরলিখিত
পাপে অভিযুক্ত হইয়া পাপী বলিয়া প্রমাণিত
হইলে, তদনুসারে ব্রাহ্মণকে "পতিত" জ্ঞান করা
উচিত এবং তাহার সহিত সর্কবিধি সম্পর্ক
একেবারে পরিত্যাগ করা উচিত। যে কেহ
তাহা না করে, সে ব্যক্তিও অত্রাহ্মণ এবং
পতিত বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ঐ সমস্ত
হ্রদ্যনের পাপের তালিকা—গোহত্যা, গোহ-
ত্যার সহায়তা, গোমাসতক্ষণ বা বিক্রয়
অথবা জ্ঞানপূর্ব্বক স্পর্শ করা, অহিন্দুকে গাভী
বা বলদ কিম্বা বৎস বিক্রয়, শূকরমাংস ভক্ষণ,
গোখাদকের সহিত একত্রে আহার অথবা
তাহার উচ্ছিন্ন ভোজন, স্নেহ-গৃহে অবস্থান
এবং তাহার সহিত ভোজন, স্নেহের
উচ্ছিন্ন স্পর্শন, স্নেহকর্তৃক প্রস্তুত অন্নাদি
আহার, সুরা-বিক্রয়ের ব্যবসায়, চুরি বা
ডাকাইতি দ্বারা জীবিকানির্ভার, বেস্তা-গৃহে
অবস্থান ও তাহার অন্নাহার, বিশ্বাসঘাতকতা
এবং মাতৃকতা। শাস্ত্রকর্তারা লিখিয়াছেন,
চৌর্য্য, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, স্নেহাচার,
বেস্তাসক্তি, সুরাপান, শাস্ত্রনিন্দা, পরনিন্দা,
ঈর্ষ্যে অবিধাং এবং অ-হিন্দু ব্যবহার
ব্রাহ্মণের পক্ষে সর্কবিধি ও সর্কবিধি পরিত্যাগ্য।

(ক্রমশঃ)

ঐশ্বর্য্যনিধি মহাতারতী।

কঃ পক্ষা ?

(পূর্কাহুতি।)

স্বাধীনতা-বিখাগ কৃত্তিম।

মানুষ অহংকার-বশে যে স্বাধীনতার এক
বড়াই করে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ সেই
স্বাধীনতার তিল মাত্র বিশ্বাস করে না।
জীব স্বাধীন, ইহা যদি হৃদয়ের অঙ্গুল-
হইতে মানুষ বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে
এই বিশ্বাসের অঙ্গুল হইত। কাহারও
কার্য্যার্থে কাহারও বিশ্বাস স্থাপন
করিবার হুল না হওয়ার, কোন বিষয়েই
মানুষ নিশ্চলবুদ্ধি হইতে পারিত না।
পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার দেহ-মনতার
অনিশ্চয়তা জন্ত কেহ কাহাকেও বিশ্বাস
করিতে পারিত না। মানুষ মাত্রেই কার্য্য-
কারণের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে বিশ্বাস করে। বিনা
কারণে কোন কার্য্য হইতে পারে, কিম্বা
অবাধ কারণ বিদ্যামানে কার্য্য হইল না,
ইহা কেহই বিশ্বাস করে না—করিতে পারে
না। জেদের মুখে যে বাহাই বলুক, পক্ষ-
পাতশূত্র হইয়া স্থির মনে ধীরভাবে কেহই
ইহা বিশ্বাস করে না যে, উপযুক্ত কারণ
ব্যতীত যে সে বা তা একটা ইচ্ছা করিতে
বা কার্য্য করিতে পারে। বিনি যে কোন
কার্য্যই করুন, তিনি হয় ইচ্ছাপূর্ব্বক, না
হয় অনিচ্ছার বা অজাতসারে সে কার্য্য
করেন। অরের চমকে কিম্বা হিষ্টিরিয়ার
ধবকে লোকে অজ্ঞানে স্বেচ্ছাত-পা ছোড়ে,
বা অলাপ অলাপ করে, তাহা যে রোগীর
স্বাধীনতার রূপক নহে, তাহা বোধ করি

সকলেই বুঝে। তাহার পর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্ষের হঠাৎ আক্রমণে লোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া যে সকল কার্য করে, তাহাও কর্তার ঠিক স্বাধীনতার পরিজ্ঞাপক নহে। মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া নেশার খোঁকে লোকে যে সকল কার্য করে, সে গুলিকেও কর্তার স্বাধীনতার পরিচায়ক বলিয়া তোমরা স্বীকার কর না। কেবল গুটিকত স্থলে, তুমি সজ্ঞানে ও সজাগে কর্তব্যাকর্তব্য বিচার করিয়া, পরে সে কার্য কর, সেই সকল কার্যে তোমার স্বাধীনতার কতদূর পরিচয় দেয়, তাহার বিচার করা ষাউক।

কর্তব্যাকর্তব্য বিচারপূর্বক কৃত কার্যকে যদি তুমি তোমার স্বাধীনতার প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত কর, তাহা হইলে তুমি বরং তোমার স্বাধীনতা পরাধীনতায় পরিণত হইবে। কারণ বিচারে কার্যাকার্যের যে পক্ষের জয় হইয়াছে, তোমার কার্য যে সেই পক্ষের অধীনতায় কৃত হইবে, বা হইয়াছে, তাহা তুমি অস্বীকার করিতে পারিবে না। ফলকথা, বিনা উদ্দেশ্যে জ্ঞানপূর্বক কেহ কোন কার্য করে না। আপনার শক্তি-সামর্থ্যের অভাবে, কার্য সম্পাদনে কৃতকার্য হটক বা নাই হটক, সকলেই একটা না একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য করিয়াই কার্য করিতে ইচ্ছা করে, এবং সকলেরই ইচ্ছা যে উদ্দেশ্য দ্বারা শাসিত হয়, তাহাও স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

“প্রয়োজনমহুঁদ্রশ্চ ন মন্দোহপি প্রবর্ততে।”
বিনা উদ্দেশ্যে কেহ আপনার অনিষ্টও করে না! আমাদের উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা আবার

দেশ-কাল-পাজ্জগত শিক্ষা-দীক্ষা, নীতি-নীতি, ধর্ম কাম্বাদি বহু অবস্থা দ্বারা অস্থায়িত হইয়াছে। এতদূর যে, একজনের শিক্ষা-দীক্ষাদি বিষয় জানিতে পারিলে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার কার্যাকার্যের একটা চলনসহী আভাস পূর্বকই আঁচিয়া রাখিতে পারেন। তুমি গোঁড়া বৈষ্ণব, সুতরাং আমিও তদ্রূপে তোমার কৃতি সহজে হইবে না; তিনি প্রকৃত শাস্ত্র, সুতরাং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া মদ্য-মাৎস্যের উপরও কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে ভাল হয়। মার্কিন মূল্যে মার্কিন সাহেবের সহিত রেলের এক কামরার যাইতে বাঙ্গালির ভয় নাই, কিন্তু ভারতে ফিরিঙ্গির সহিত একই কামরায় যাওয়া বাঙ্গালির পক্ষে নিরাপদ নহুে। আজ কাল ‘স্বরাঙ্গা’ কথাটা বণা তথা শুনা ষাইতেছে, যে সে কাগজে গড়া ষাইতেছে, কিন্তু কনগ্রেসের দাবিশ্ৰিতম অধিবেশনের পূর্বে অভিধান ভিন্ন একথাটার স্থান দেখা যায় নাই, কেন বল দেখি?

ফলতঃ বিনা কারণে কোন কার্য হয় না এবং কারণ উপস্থিত হইলে, তন্নির্ভর্য কার্য হইবেই হইবে। যাহা অবশ্রুজাবী, তাহা কখনও স্বাধীন নহে। বাহারা দেখিবার—শুনিবার—বুঝিবার শক্তিহীনতা লক্ষ্য কারণকে দেখিতে শুনিতে জানিতে পারে না, তাহার কর্তার অন্তরংহানিহিত—সুতরাং ‘অদৃষ্ট’ কারণকে দেখিতে না পাইয়া বাহ্যিক কর্তাকে স্বাধীন মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বাহ্য কর্তার হৃদয়ংহানিহিত মহাপুরুষই প্রকৃত কর্তা। তিনিই অধিষ্ঠান-পাজের দেহ-সমিবিষ্ট হইয়া, জন্মাবধি ভ্রাসু

পর্ষাঙ্গ জীব দ্বারা তাঁহার আপনাই ধত
কার্য্য করাইয়া লইতেছেন ; অর্থাৎ—

“অহংকারবিশুদ্ধায়া কৰ্ত্ত্বীহমিতিমন্ততে।”

দণ্ডবিধির সাক্ষ্য ।

তুমি মনে করিতে পার যে, যদি জীবা-
জ্বার কোন প্রকৃত স্বাধীনতা—স্বেচ্ছাচারিতা
না থাকে, তবে পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক,
এসকল কি জন্ম ? মানুষের স্বাধীনতা না
থাকিলে, গবর্ণমেণ্টই বা দণ্ড বিধান করেন
কেন ? এ যে “রাবণ-অপরাধে জলধি-
বন্ধন।” যে স্বেচ্ছায় করে বা করায়,
তাঁহার কিছুই হয় না, যে বাধ্য হইয়া করে,
তাঁহারই সকল কর্মভোগ !

আশঙ্কা অমূলক । কারণ, স্বেচ্ছাচারিতা
প্রকৃত হইলে, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বা
পুরস্কার-তিরস্কার নিরর্থক । গতাহুশোচনা
নিষ্ফল । লোকে দ্রুকার্য্য করিলে তাঁহার
শাস্তি দিতে হইবে এবং সুকার্য্য করিলে
তাঁহার পুরস্কার দিতে হইবে, স্বর্গ-নরক-
শাসনের লক্ষ্য তেমন গতাহুশাসন নহে।
পরন্তু ভিক্ষাকার্য্যাহুশাসন । শাস্তির ভয়ে
এবং পুরস্কারের লোভে লোক দ্রুকার্য্য না
করিয়া সংকার্য্য করিবে, এই উদ্দেশ্যেই
পাপ-পুণ্য, নিন্দা-স্তুতি, তিরস্কার-পুরস্কারের
ব্যবস্থা । রাজবিধানেরও মূল উদ্দেশ্য
ততটা অপভিতকার্য্য অতীতের প্রতিকার
নহে ; পরন্তু নিবার্য্য ভবিষ্য বিশৃঙ্খলতার
নিবারণ । খুনের বদলে খুন করিব কেন ?
যে খুন হইয়াছে, সে কি তাহাতে বাঁচিবে ?
না—খুনিকে ঐগদণ্ড দিয়া, ভবিষ্যৎহননেচ্ছ
গণকে নিরুৎসাহ করার জন্মই খুনের বদলে
খুনের ব্যবস্থা ।

রাজশাসনের ভয়ে মানুষসমাজের
হৃদমনীর চক্রবৃত্তির দমন হইতে পারে, এই
বিশ্বাসে দণ্ডবিধির ব্যবস্থা । পরলোকে
দুঃসহ নরকগল্পনা ভোগ করিতে হইবে,
এই ভয়েই মানুষ পাপ করিতে ইতস্ততঃ
করিবে, এই উদ্দেশ্যেই শাস্ত্রের শাসন ।
সুতরাং নর-নারীর স্বাধীনতার উপর ধর্ম্মশাস্ত্র
বা রাজবিধানের ভিত্তি রচিত নহে ; পরন্তু
পরতন্ত্রতা দ্বারা সংযত দৃঢ় বিশ্বাসভূমির
উপর ধর্ম্ম ও রাজশাসন সংস্থাপিত ।

ব্যবসায়-বাণিজ্য-জগতের শিথাস ।

মানুষসমাজের অত্রস্ত কার্য্যের গতি
লক্ষ্য কর । সুবিধা পাইলে লোকে এই
পথেই গতায়ত করিতে প্রলোভিত হইবে
এবং আনার মগেঠে অর্থ লাভ হইবে, এইরূপ
হিসাব করিয়াই ধনী অকাতরে তাঁহার
ধনরাশি ঢালিয়া দিয়া, স্থলে লৌহবন্ধ
এবং জলে ধুমতরী রাখিয়াছে। শত মুদ্রা
পাইলেও তুমি আমি যে কার্য্য করিতে
প্রবৃত্ত হই না, মাত্র একটা পরসী লইয়া
সুচতুর সেই কার্য্যটি করিতেছে। শত মুদ্রার
যে কার্য্য হয় না, তাহা এক পরসীর হইতে
দেখিলে, লাখে লাখে বাঁকে বাঁকে লোক
আসিয়া আমার সাহায্যার্থী হইবে, আর
“দেশের লাঠী একের বোঝা” নীতিমূলে
দেশের টাকা কাঁড় দিয়া লইতে পারিব ;
এই হিগাব করিয়াই গবর্ণমেণ্ট পত্র-প্রতি
এক পরসী লইবার জন্ম লক্ষ লক্ষ মুদ্রা
ব্যয় করিয়া ডাক ব্যবস্থা করিয়াছেন ।

ফলতঃ এই জগতে প্রাণীও কাহারও
স্বাধীনতা নাই । বৃক্ষশাখা হইতে পক-ফলটি
মাটিতে পড়িল ; অস্ত শিশু যে, সে তাহাতে

পারে যে, ফণটী বেচ্ছাপূর্বক মাটিতে পড়িল! মাংসাবৃত খড়ীস গিলিয়া, বস্ত্রপায় মস্ত্র ছটফট করিতেছে, অজ্ঞ বাগক ভাবিল যে, মাছটী বেচ্ছার কাঁটা গিলিয়া কাণাটা ভাল করে নাই। কিন্তু নিজ গাঞ্জ সাঁহারা, তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, মাংসাকর্ষণ ফণটীকে টানিয়া পাড়িয়াছে, তাই ফণটী মাটিতে পড়িয়াছে। মাংস-গন্ধ মস্ত্রকে মোহিত করাত্তেই মস্ত্র সুপ্রাসন্ন গরল খাটয়াছে।

অদৃষ্টবাদ অলসের সহায় নহে।

তুমি হয়ত পুরুষকার হারাটবার আশঙ্কার অদৃষ্ট সহাজনের নির্দেশ মত কার্য করার বিশ্বাসকে অলস ব্যক্তির মানসিক বিকার মনে করিতেছ। তুমি অহঙ্কার বশত: অদৃষ্টবাদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছ। তোমাকে অপরিণামদর্শী কতকগুলি ব্যক্তি বুঝাই-
য়াছে যে, অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস করিলে, মানুষ ক্রমে অলস—উত্তমসহীন হইয়া পড়ে। কিন্তু যে ব্যক্তি সত্য সত্যই অদৃষ্টবাদ বুঝে এবং বুঝিয়া সুঝিয়া অদৃষ্টবাদ মানে, সে কখনই অলস ও উত্তমসহীন হয় না। বরং যে ব্যক্তি অদৃষ্ট মানে না, ব্রাহ্ম পুরুষকারের সেবা করে, সেইই অলস উত্তমসহীন হইয়া থাকে। আসল কথা এই যে, জগতে কেহই স্বাধীন নহে—তাঁহা অদৃষ্টবাদই মানুষকে আর স্বাধীন পুরুষকারই মানুষক। যে ব্যক্তি অলস উত্তমসহীন হয়, সে অদৃষ্ট-কারণাধীনভাবেই ভেদন হয় কিন্তু অদৃষ্ট মানে বলিয়া নহে। ভেদনই উত্তমসহীন পুরুষও—বেচ্ছাবশত: নহে, প্রত্যক্ষ অদৃষ্টকারণাধীনই নিরলস হয়। অদৃষ্টে সত্য সত্যই বিশ্বাস থাকিলে, লোক অলস না হইয়া বরং উত্তমসহীন হয়; আর

অদৃষ্টে বিশ্বাস হারাইয়াই লোক নিকলভোগী হয়। আশাতত: কথাটা অসম্ভব মনে হইতে পারে; কিন্তু তা নয়। যোর অদৃষ্টবাদী দ্বিধাশ্রমী নেপোলিয়নের জীবন ইহার দৃষ্টান্ত। উপযুক্ত কারণ বিনা কোন কার্য হয় না। সুতরাং বাহার M. A. পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার সক্ষম প্রবল হইয়াছে, তাহাকে M. A. পাস করিবার যোগ্যতা লাভের অল্প বে সক্ষম কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তাহার সক্ষমগুলি আরম্ভ করিতে হয়। কারণ সে বুঝে যে, যোগ্যতা লাভ বাতীত, উপযুক্ত কারণ বাতীত, তাহার M. A. পাস করা যটিন না। ফলত: M. A. পাস করার উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকিতে, অদৃষ্টবাদী কখনও অলস বা পাঠে উদাসীন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, স্বাধীনতার বাহার পূর্ণ বিশ্বাস, ইচ্ছা মাজ্জেই যে হাগিতে খেলিতে—বে সে কার্য সম্পাদন করিতে পারে, সে কেন M. A. পাস করার অল্প ব্রণা আরম্ভ স্বীকার করিবে? অদৃষ্টবাদী জানে, বিবাহ না করিয়া পুত্র-মুখ দর্শনের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং পুত্র মুখ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া সে কখনও বিবাহে উদাসীন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পুরুষকারের পূর্ণ বিশ্বাস বাহার, সে ইচ্ছা মাজ্জেই পুত্র-প্রাপ্তির অধিকার প্রাপ্ত হইয়া বিবাহে উদাসীন হইতে পারে।

ফলকথা, এই সারামর জগতে কোথাও কাহারও স্বাধীন পুরুষকার নাই। জগতে কোটা কোটা জড়াজড় পীদার্থের মধ্যে তুমি-আমি-তিনি নগণ্য এক একটা। কোটা কোটার সংস্রবশূ হইয়া কি ভোঁসার—

আমার—তাহার ভিত্তিবার সম্ভাবনা আছে ? জগতে লৌকিক হিসাবে যে টুকুকে আমি 'আমার' বলি, তাহাও পরমার্থতঃ আমি বা আমার নহে। বৃষ্টির ফুলে সেগুলিকে আমার বলি বটে, কিন্তু পূর্বেই বলিরাছি যে, আমার সেই স্বর্ক্সবধন জ্ঞান-কর্মেজ্রিম-গম্পন এই দেহটী, আদৌ আমার নিজের নহে। ইহার মালসম্ভার সংস্থাপন ও সংরচনার উপর আমার কোন কর্তৃত্ব ত ছিলই না, পরন্তু আমার vote বা মতামতও কেহ লয় নাই। এ হেন গৃহে যে আমি বাস করিতে আসিরাছি, ইহাও যে আমার ইচ্ছাভাবী, তাহাও নহে। কেহ বাড়ি ধরিয়া আমাকে এই পিঞ্জরে ভরিয়াছে, ইহা জোর করিয়া বলিতে না পারিলেও, ইহা নিশ্চয় যে, আমি ইচ্ছা বা সাধ করিয়া এ কারাগারে আবদ্ধ হই নাই। আমি এই গৃহে আবদ্ধ হইবার পর হইতে ইহার যে অপচর-উপচর হইরাছে—হইতেছে, যে সকল পরিবর্তন হইরাছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা আমার অধিক শাসনাধীন নহে। এক কালে আমার দেহে দস্ত ছিল না, ক্রমে দস্ত উঠিরাছে। আমার ইচ্ছানিচ্ছার দস্তো-দপসের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই। এক সময়ে এরূপ দাঁড়ী-গোঁক ছিল না, আমার ইচ্ছানিচ্ছার প্রতীকা না, করিয়া আপনা আপনি দাঁড়ী-গোঁক হইরাছে। মাথার কেশ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল; এখন শাদা হইতে আরম্ভ করিরাছে; কত নিবেদন করি, সে নিবারণ মানেন না। তবু বলিতে ছাড়ি না যে, দেহ আমার; আমার দেহ আমার কণা রাখে না, দেহের কবে কোথায় কি

করিয়া কি কি পরিবর্তন হইরাছে, তাহারও সকল গুলির খোঁজ খবর রাখি না, তবু বল যে দেহ আমার !

দেহকে ছাড়িরা তোমার মনের কার্য্য-কার্য্যও একবার সমালোচনা কর দেখি। তোমার স্থিতি-বিস্থিতি কি তোমার ইচ্ছা-ধীন ? তোমার মন সর্বদাই সুখ চায়, কিন্তু কর্মদোষে এত হুঃখের আসদানি হয় কেন ? পুঞ্জের মুহাসংবাদে তুমি কান্দিয়া আকুল হইতেছ কেন ? তোমার মৃত পুত্র কান্দি-তেছে না—তুমি কান্দিয়া আকুল হইতেছে কেন ? তোমাকে কেহ মারে নাই, ধরে নাই, তুমি কান্দ কেন ? পুঞ্জের মুহাসংবাদে সুখী হইতে ইচ্ছা না করিয়া তুমি হুঃখিত হইতেছ, ইহা কি তোমার স্বাধীনতার প্রমাণ ?

শাল স্রাকড়া দেখিলে মহিষাসুর কেপিয়া-হিতাহিত জ্ঞানশূণ্ড হয়, তোমাকে বৃকাল শূঁ দেখাইলে তুমি মহিষের অধিক কেপিয়া বাও কেন ? তোমার পদে আমার মাথাটা ঠেকাইলে তুমি বড় ভুট্ট হও, কিন্তু তোমার মাথায় আমার পাখানি ছোঁয়াইলে তুমি এত রুট হও কেন ? তুমি দিগম্বর হইয়া জন্মিরাছ, দিগম্বর হইয়া স্বর্গারোহণ করিবে, তবে আজ দিগম্বর হইয়া চলাফেরা করিতে পার না কেন ? নির্দিষ্ট নির্ধন হ্রস্ব জগাই-মাগাই কি আপন খুশীতেই পরম বৈকল্য হইরাছিল ? তুমি তাহাদের এই শুভ পরি-বর্তনকে শতযুখে প্রশংসা করিয়াও কেন তাহাদের অহুকরণে উত্তোষী নহ ? কেন বল দেখি—তোমার মহাজন এখনও তোমাকে সে পথে লইতেছেন না ?

মহাজনাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয় ।

তুমি হয়ত মহাজন-প্রদর্শিত পথে গমন করিতে বাধা থাকার বিধানকে একরূপ স্বেচ্ছাচারিতা ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবে, এবং মনে মনে ভাবিবে যে বহুত্ববাদ জঙ্গ যদি বেদ-স্মৃতি সঙ্গাচার পথ অনিশ্চিত—সুতরাং অগণ্য হয়, তাহা হইলে জনে জনে বহু সঙ্গাজন হওয়ার, কে কোন মহাজনের নির্দেশ সত্তে চলিবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা থাকে না; অতএব কার্যক্ষেত্রে ঐরূপ মহাজন-নির্দিষ্ট পথে গমন অসম্ভব ব্যাপার ।

এ আশঙ্কা অমূলক এং অজ্ঞান-সম্মত । বস্তুতঃ মহাজন-নির্দিষ্ট পথই একমাত্র পথ— বাহার সঘকে সতভেদ তটতে পারে না । বেদ-স্মৃতি ইত্যাদি বহুত্ববাদতটে, কিন্তু মহাজন প্রতিষ্ঠান-পাত্র সঘকে একটে । সেই জঙ্গ শ্লোকের বেদাদি পদ বহু বচনান্ত এবং মহাজন পদটা এক বচনান্ত । যেমন সকলেই কর্ণে শুনে, চক্ষে দেখে, কিন্তু কেহই পায়ের চক্ষে দেখে না, পায়ের কর্ণে শুনে না । তেমনই সকলেই নিজ নিজ জন্ম-গুহাস্থিত মহাজনের নির্দেশ সতই কার্য করে তিন্ন কেহই অপরের সঙ্গাজনের ইচ্ছাসত্তে চলে না—চলিতে পারে না ।

তুমি হয়ত মহাজন-নির্দিষ্ট পথে চলার বাধা-বাধকতাকে স্বেচ্ছাচার দোষে কলঙ্কিত মনে করিবে । তুমি কিছুকণ পূর্বে যে স্বাধীনতার প্রধান স্তাবক হইয়াছিলে, এখন তুমি স্বেচ্ছাচারিতার সূত্র ধরিয়া সেই স্বাধীনতার ভয়েই শিহরিয়া উঠিতেছ । না হেঃ! মহাজন-পর্যায়ের সারিক স্বেচ্ছাচারিতা ভ্রম হইলেও, পরমার্থতঃ এই

স্বেচ্ছাচার জীবের স্বেচ্ছাচার নহে, পরন্তু মহাজনের স্বেচ্ছাচার । তোমাকে যে পথে চালাইলে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তোমাকে তিনি সেই পথে চালাইতেছেন; আমাকেও আমার পথে চালাইতেছেন । অজ্ঞ যে, সেই মনে করে, তুমি-আমি-তিনি, সকলে নিজ নিজ বার্থসাধন করিতেছি; কিন্তু সে বুকে স্মৃকে ও গোড়ার খবর রাখে, সে জানে যে—“জানামি ধর্মঃ ন চ মে পবুস্তি জ্ঞানামাধর্মঃ ন চ মে নিবুস্তিত্ত্বা জীবীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিবুস্তোহস্মি তথা কামোমি ।”

“নৈব কিঞ্চিকরোমীতি বুদ্ধো মনোভ-
ত্বনিং । পশ্চান্ শূরান্ স্পৃশন জিত্ররশন গচ্ছন
শ্বপন্থ শ্বসন্থ শ্বলপন্থ নিশ্বজন্থ গৃহ্নন্থ শ্বিবশ্বিধ-
শ্বপি ইশ্বিরাগীশ্বিরাধেযু বর্তন্ত উতি ধারন্থ ।”
অতএব কোন পথে বাইব, কি করিব, সে সব কিছুই ভাবনা চিন্তা করিবার তোমার প্রয়োজন নাই । সে ভাবনা বাহার করি-
বার, তাহা তিনিই করিতেছেন । অজ্ঞানের
রণের সারণির সত্ত তিনি—সেই মহাজনই
তোমার দেহ-রণের সারণ্য গ্রহণ করিয়া,
তোমার মনোরজ্জু ধরিয়া, রাখা সকলকে
সংসার-বুদ্ধ-ক্ষেত্রের যথা তথা চালনা করি-
তেছেন । তুমি সর্বথা তাহারই শরণাপন্ন
হও—তমের শরণে গচ্ছ সর্বভাবেন মানব । তৎ-
প্রসাদাৎ পরং শান্তিহানং প্রাপ্যাদি শ্বাখতম ॥
এ তিন্ন আর উপার নাই—পথ নাই ।
“নাঙ্গপহা বিস্ততেহরনার ।” ইহাই নিত্য
সত্য সনাতন শান্ত শান্তি-পহা ।

শ্রীউনেশচন্দ্র মৈত্র্য ।

একদেশদর্শী কে ?

গত অগ্রহায়ণ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় বন্ধুর শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয় “একদেশদর্শীর ভ্রম” শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে মল্লিখিত “কাহার ভ্রম ?” শীর্ষক প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। আমি হিন্দুপত্রিকার প্রোহক নহি, সুতরাং এ পর্য্যন্ত ঐ প্রতিবাদ পাঠ করিতে পারি নাই; সম্ভ্রতি বদুচ্ছাক্রমে অবগত হইয়া, প্রতিবাদ-প্রবন্ধের ভ্রমপ্রদর্শন আনন্দক মনে করিয়া, তাহাতে সত্য নির্ণয় হয়, সেই জন্তই লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। কাল-বিলম্ব হইলেও, বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ইহার প্রকাশ পরোক্ষনীয় মনে করি।

চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রবন্ধে আমার মত খণ্ডিত হয় নাই, নূতন তত্ত্বও আলোচিত হয় নাই। বিখ্যাতের ‘পুরাণ’ শব্দ হইতে নিজের সত্ত্বাকুল অংশ উদ্ধৃত করিয়াই চক্রবর্তী মহাশয় কর্তব্য শেষ করিয়াছেন; পরন্তু আমার প্রবন্ধও তিনি বৃষ্টিতে চেষ্টা করেন নাই। যতটুকু বৃষ্টিতে প্ররাস পাইয়াছেন, তাহা একদেশ মাত্র। তাঁহার বিবেচনায় আমার “প্রবন্ধে প্রতিপাত্ত বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণের খ্যাতি ও দেবীভাগবতকে পুরাণ হইতে বহিষ্করণ।” হিন্দু-পত্রিকার পাঠকবর্গের নিকট বিনীত নিকেদন, যোগীন্দ্র বাবুর এ কথা সত্য নাই। আমি দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ বলিতে অনিচ্ছুক, তবে উহাকে পুরাণ-শ্রেণী হইতে

বহিষ্কৃত করিতে চাহিনা। আমি বলিয়াছি, অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে যে ভাগবত নাম আছে, তাহা দেবীভাগবত নহে, শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতকে বাহার্য্য ঋষিপ্রণীত বলেন না, বোপদেব-রচিত বলেন, তাঁহাদের মতখণ্ডনই আমার প্রবন্ধের মূল মন্ত্র। আমার বিবেচনায় ‘দেবীভাগবত’ উপপুরাণ মাত্র। আমি পূর্বাধিক এই মতই প্রচার করিয়াছি।

চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রতিবাদ পাঠে বুঝিলাম, তিনি কৌণ্ড সিন্ধাস্ত প্রচার করেন নাই। যখন যাহা ইচ্ছা, তাহাই লিখিয়াছেন। তিনি প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ-বহিষ্কৃত উপপুরাণরূপে বর্ণন করিয়াছেন। পরে “নহুম্বাঙ্গন-শ্রুতিঃ”র বলে বোপদেব-প্রণীত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। আবার সমাধান সম্পর্কে বলিয়াছেন, “কৌণ্ড পুরাণের মতে দেবীভাগবত মহাপুরাণ, কৌণ্ড পুরাণের মতে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ।” অবশেষে এক হাত্তকর সিন্ধাস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া তাঁহার নিজ মত জগতের কাছে রহস্তময় করিয়া রাখিয়াছেন।

সে মতটী এই—শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত, কোনখানিই আগল মহাপুরাণ নহে। আদিত্তে একখানি ভাগবত ছিল, তাহার কিয়দংশ লইয়া দেবীভাগবত ও কিয়দংশ লইয়া শ্রীমদ্ভাগবত রচিত হইয়াছে। দেবীভাগবতের উত্তরার্দ্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের পরে লিখিত; দেবীভাগবতের পূর্বার্দ্ধ প্রাচীন। ইহার কোনখানি “সাবেক” ভাগবত মহাপুরাণ নয়।

পাঠক মহোদয়গণ ! এ মন্তগুলির কোনটা তাঁহার নিজস্ব, তাহা বুঝিতে পারি নাই। আশা করি, আপনারা বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। যদি সকলগুলিই সভ্য হয়, তবে ছন্নদৃষ্ট। আমি দেখাইব, তাঁহার উক্ত রূপ বিরুদ্ধ কথন একদেশদর্শনেরই পরিচায়ক।

প্রথমতঃ শ্রীমদ্ভাগবত উপপুরাণ নহে, মহাপুরাণ, ইহাই প্রদর্শন করিব। পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়, “৩য় পদ্মপুরাণঞ্চ প্রথমংস প্রণীতবান্। ততোহস্তানি পুরাণানি কৃৎবা ষোড়শত্ ক্রমাৎ। অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাক্রম্য সর্কৃতঃ। কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাগঃ শুককথাযাপরং সূতং।” ইহা কি দেবীভাগবত ? শুকদেব পিতৃসকাশে শ্রীমদ্ভাগবতই অধ্যয়ন করেন। পদ্মপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় আরও স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। “পুরাণেবুচ সর্কেষু শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কৃষ্ণেণ ভাবিতং। পরীক্ষিতঃ কথাং বক্তুঃ সন্তারং সংস্থিতে শুকে।” এই কৃষ্ণলীলাগীতি শ্রীমদ্ভাগবতের নিজস্ব। নারদীয় পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বিশেষ পরিচয় দিয়া, তাহাকেই মহাপুরাণ বলিয়াছেন। এখন পাঠকমহোদয়গণ বিবেচনা করুন, শ্রীমদ্ভাগবত উপপুরাণ হওয়া সম্ভব কি না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব-প্রণীত নহে; উহা আর্ষগ্রন্থ। চিংস্বখাচার্য্য ‘পুরাণার্ণব, গ্রন্থে লিখিয়াছেন, “স্কন্ধো দ্বাদশ এবাজ কৃষ্ণেণ বিহিতাঃ স্তুতাঃ। দ্বাত্রিশৎ ত্রিশতং পূর্ণং অধ্যায়ঃ পবিত্রীকীর্তিতাঃ।” চিংস্বখাচার্য্য যে ভাগবত দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতে ৩০২ অধ্যায় ও দ্বাদশ স্কন্ধ ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যায় ও স্কন্দসংখ্যাও ঐরূপ।

দেবীভাগবত দ্বাদশস্কন্ধ হইলেও, তাহাতে ৩১৮ অধ্যায় আছে; অতএব চিংস্বখ-বর্ণিত ভাগবত দেবীভাগবত হইতে পারে না। দেবীভাগবত স্বয়ংই বলিয়াছেন, “পুরাণ-মুক্তসং পুণ্যং শ্রীমদ্ভাগবতভিধং। স্কন্ধো-দ্বাদশ এবাজ কৃষ্ণেণ বিহিতাঃ স্তুতাঃ। ত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়ঃ; অষ্টাদশযুতাঃ স্তুতাঃ।” এই শ্লোকে বুঝা যেন, দেবীভাগবতে ৩১৮ অধ্যায় আছে। চিংস্বখাচার্য্য মুক্তবোপ-পরিচয়তা বোপদেবের পূর্বে আবির্ভূত হন, ইহা পুরাতত্ত্ববিদগণের সিদ্ধান্ত। একপা-বহুয় চিংস্বখ যে শ্রীমদ্ভাগবতের পরিচয় প্রদান ও প্রামাণ্য—প্রমাণ স্বীকারে বদ্ধ-পরিচয়, সে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব-প্রণীত কলা উন্নত প্রমাণ ভিন্ন অল্প কিছু নাই। যদি প্রতিবাদী বলেন, অল্প বোপদেব ভাগবত-প্রণেতা, তবে তাহার প্রামাণ্য-প্রয়োগ উচিত ছিল না কি? যদি বোপদেব ‘ভাগবত’ নামে কোনও গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন, ইহা প্রামাণ্যিত হয়, তথাপি শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনযুক্ত এই চিরপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমদ্ভাগবত তাহা নহে। প্রত্যুত ইহা যে মহাপুরাণ, তাহা পূর্কোক্ত পৌরাণিক প্রমাণ-পটল-সাহায্যে উজ্জ্বল দিবালোকে রাজবস্ত্রে করিকর্ষ-বৃষ্টি-রবে ঘোষণা করা বাইতে পারে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বোপদেব-প্রণীত ভাগবত কাব্যের উপক্রম-ভাগ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহা যে শ্রীমদ্ভাগবত নহে, ইহা সুনিশ্চিত।

তৃতীয়তঃ, সাম্প্রদায়িকভাষ্যতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবত, উভয়কেই মহাপুরাণ বলা চলিতে পারে, কিন্তু তাহিকের চক্

তাহাতে চাকিতে পারে না। অবশ্য এক পক্ষের প্রমাণ-বচনাদি প্রক্ষিপ্ত হইবেই। আমরা টেহার আলোচনা করিব।

চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত যে মহাপুরাণ, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে লেখা নাই। চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার “বঙ্গবাসী” সংস্করণের পুঁথীখানি খুলিয়া দ্বাদশস্কন্ধ পাঠ করুন। “দশভিলসর্গে যুক্তঃ পুরাণং তদ্বিদো বিজ্ঞঃ। কেচিৎ পঞ্চবিধং ব্রহ্মণ মহদম্ভব্যবস্থয়া ॥” পুরাণ দশলক্ষণ, কাহারও মতে পঞ্চলক্ষণ, এই মতভেদের মীমাংসায় বলিতেছেন— “মহদম্ভ ব্যবস্থয়া।” মহাপুরাণ দশলক্ষণ ও অল্প বা উপপুরাণ পঞ্চলক্ষণ, ইহাই ব্যবস্থা। ভাগবতে দশলক্ষণ আছে, ইহা ভাগবত-পাঠক মাজেই জানেন। অতএব ভাগবত নিজকে মহাপুরাণ বলেন নাই, ইহা এক-দেশদর্শীর অমূলক সিদ্ধান্ত। স্বয়ং দেবী-ভাগবতই বলিতেছেন, “সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ। বংশাহুচরিতং বিধ পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্।” দেবীভাগবতে পঞ্চলক্ষণ বিন্ধ্যমান। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের নির্দেশানুসারে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ ও দেবীভাগবত উপপুরাণ। শ্রীব্রহ্মবৈবর্তে শ্রীকৃষ্ণঋষয়ে লিখিত আছে,— “সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণিচ। বংশাহু-চরিতং বিশ্র পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ এতদুপপুরাণানাং লক্ষণঞ্চ বিদ্ববুধাঃ। মহতাঞ্চ পুরাণানাং লক্ষণং কথয়ামি তে ॥ সৃষ্টিশাস্তি বিসৃষ্টিশ্চ হিত্তে তেভ্যঞ্চ পালমং। কর্ণশ্চৈব বাসনা বার্তা মনুনাঞ্চ ক্রমেণচ। বর্ননং প্রলয়ানাঞ্চ মোক্ষশ্চ নিরূপণং। উৎ-কীর্ণনং হরেরেব দেবানাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।

দশাধিকং লক্ষণঞ্চ মহতাঃ পরিকীর্ণিতম্।” সর্গ-প্রতিসর্গ প্রভৃতি পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত হইলে উপপুরাণ এবং দশাধিক লক্ষণাক্রান্ত হইলে মহাপুরাণ নামে কথিত হয়। এতদপেক্ষা স্পষ্টনির্দেশ আর কি হইতে পারে? পুরাণের পঞ্চলক্ষণ সম্বন্ধে চক্রবর্তী মহাশয় দুই একটা কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার ক্রটি হয় নাই। মহাপুরাণেও পঞ্চলক্ষণ আছে, উপপুরাণেও আছে। মহাপুরাণে আর পাঁচটা অধিক থাকিলে, সাধারণতঃ “পুরাণং পঞ্চলক্ষণং” বলার বাধা নাই। যদি চক্রবর্তী মহাশয় দেখাইতে পারেন, মহাপুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ও উপপুরাণ দশলক্ষণাক্রান্ত, তাহাই হইলে আমাদের মত-খণ্ডনের সুবিধা হইবে। যে বৌদ্ধসিংহ অভিধানকার হইয়াও পর্যায়শব্দ সম্বন্ধে অশেষ ভ্রম করিয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান লইয়া পণ্ডিত-সমাজে উপস্থিত হওয়া হাস্যকর। “পুরাণং পঞ্চলক্ষণং” লেখার আমাদের ক্রটি নাই, পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্তকে চক্রবর্তী মহাশয় অসরসিংহের পরবর্তী বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, প্রমাণ দেন নাই। আমরা বলি, তাঁহার মতে যে ব্রহ্মবৈবর্ত আধুনিক, তাহারই নেপাল হইতে আনীত—এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত হস্তলিপি কত দিনের, একবার অনুসন্ধান করুন। প্রবৃত্তত্বের কথার গবেষণাই প্রাশং-সুনিয়, বাস্তাশিতা আদরণীয় নহে। চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, “প্রধান ২ পুরাণের মতে মহাপুরাণ পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত, ইহা সর্ববাদী-সম্মত।” মত প্রচারের পূর্বে লেখক কিকি প্রমাণীকার করিয়া পুরাণগুলি পাঠ

করিলে আর আমাদের প্রতিবাদ করিতে হইত না। পুরাণের যে পঞ্চলক্ষণ লেখা আছে, ইহা পুরাণ-সাম্রাজ্যে প্রযোজ্য। মহা-পুরাণের পঞ্চলক্ষণ এবং উপপুরাণের দশলক্ষণ কোনও স্থানে দৃষ্ট হয় না। “পুরাণং পঞ্চ-লক্ষণং” না বলিয়া “পুরাণং দশলক্ষণং” বলিলে ভ্রম হইত, কারণ উপপুরাণও পুরাণ, তাহাতে দশলক্ষণ নাই। সকল মহা-পুরাণেই দশ লক্ষণ বিদ্যমান; যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এ সংবাদ নূতন নহে। দশলক্ষণাক্রান্ত উপপুরাণ ও পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত মহাপুরাণ, একপ কোন বচন যদি সত্ত্বোক্ত সংহিতাদিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা অক্ষিপ্ত বা বিক্ষিপ্ততার পরিচায়ক, ইহা স্মরণ বিবেচনা করিবেন।

শ্রীনীলকণ্ঠ-ধৃত গরুড়পুরাণের তত্ত্ব-রহস্যের বিতীর্ণাংশে ধর্মকাণ্ডে লিখিত আছে,—“পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দি-প্রোক্তং তথৈবচ।” এখানে নন্দিপ্রোক্ত পুরাণের সাহচর্যে হর্গামাহাশ্বাসুক্র ভাগবত উপপুরাণই হওয়া সম্ভব।

চক্রবর্তী মহাশয় যে একদেশদর্শী, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইলাম। নীলকণ্ঠ দেবী-ভাগবতকে মহাপুরাণ বলিয়াছেন, ইহা তিনি জানেন। কিন্তু শ্রীধরবতার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যে শ্রীমদ্ভাগবতকে মহাপুরাণ হিঁস করিয়াছেন, ইহা তিনি গোপন করিয়াছেন।

চক্রবর্তী মহাশয়ের মতে কোনও স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতকে পঞ্চম, কোনও স্থানে অষ্টম বলা অন্তায় হইয়াছে। পুরাণের নামোচ্চ-ক্রম সর্বত্রই যথোচ্চক্রমে লিখিত হই-

য়াছে। কোনও পুরাণে উৎপত্তিক্রমাসারে নামোচ্চক্রম নাই। তবে কোনও স্থানে দৃষ্ট হয়, পদ্মপুরাণ প্রথম প্রণীত হয়, অন্ত্যজ দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণই সর্বশেষে রচিত। এ দোষে যদি শ্রীমদ্ভাগবত যারা যায়, তবে কোনও পুরাণের রক্ষা থাকে না, তাহা প্রামাণ্য করা বাইতে পারে। একটা দৃষ্টান্তোচ্চক্রমের পোভ গহ্বরণ করিতে পারিলাম না; আশা করি, পাঠকগণ বিরক্ত হইবেন না। বায়ু-পুরাণে আছে,—“প্রথমং সর্গশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা রুতং। অনস্তরঞ্চ বক্তে ভাঃ বেদান্তস্ত নিনিঃসৃতঃ।” সর্গশাস্ত্র ব্রহ্মা পুরাণ রচনা করেন, তৎপর তাঁহার বদন হইতে বেদ নিনির্গত হয়! আরও দেখুন, পদ্মপুরাণে “পুরাণং সর্গশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা রুতং। ব্রহ্মণস্ত সমাদেশাৎ বেদান্ আহৃতবান্ অসৌ।” প্রথমে ব্রহ্মা পুরাণ রচনা করেন, পরে ব্রহ্মার আদেশে নারায়ণ বেদ সংগ্রহ করেন। এই সকল পারম্পর্য্য লইয়া যাহারা প্রবৃত্ত আশোচনা করেন, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব! যোগীশ্র বাবু অবশ্য ইহার নিদান জানেন।

দেবীভাগবতের প্রথম শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া যোগীশ্র বাবু তাহাকে ‘গায়ত্রী’ বলিয়াছেন। গায়ত্রীছন্দস্ব মন্ত্র গায়ত্রী নহে। দাশভূমি পরিপত্রিত “তৎসবিতুর্ভরগণ্যং” ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রটীতে ‘গায়ত্রী’ শব্দ রুত, ইহা বৈদিক মীমাংসার আলোচনাকারী পণ্ডিত-গণ জানেন। মহাশয় গায়ত্রী প্রভৃতির ত্রায় লৌকিক গায়ত্রীছন্দস্ব শ্লোক শ্লোক শাস্ত্রে গায়ত্রী বলা হয় নাই। গায়ত্রীর্থ-ব্যাক্যরূপ শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতেই আছে।

ଦେବୀଭାଗବତର ଐ ଶ୍ଳୋକଟୀତେ ଗାୟତ୍ରୀର ଅର୍ଥ ବିସୂତ ହର ନାହିଁ । ଯାହାରା ଗାୟତ୍ରୀତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରିଯାଛନ୍ତି, ଠାହାରା ଅବଗତ ଆଛନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟବେଦାର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ ସଂକ୍ଷେପେ ଗାୟତ୍ରୀତେ ବଳା ହୈୟାଛେ ; ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକେ ଓ ତାହାହି ଆଛେ । ଗାୟତ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ପାଠିକ୍ଷିତେ ପାୟେ ନା, କାଞ୍ଜେହି 'ଗାୟତ୍ରୀ' ବଳିତେ ଗାୟତ୍ରୀଅର୍ଥ-ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ଳୋକ ବୁଝି ।

ତତ୍ତ୍ୱପରେ ବ୍ରହ୍ମବଧ କଥାର ଆଲୋଚନାୟ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରବାବୁ ବଲେନ—ଦେବୀଭାଗବତେ ଓ ଦେବୀ କର୍ତ୍ତୃକ ବ୍ରହ୍ମବଧବ୍ୟାପାର ବିଧିବନ୍ଧୁ ଆଛେ । ଆମରା ଜାନି, ବେଦାର୍ଥବିରୁଦ୍ଧ ଉପାଧ୍ୟାନ ସହ-ପୁରାଣେ ଧାଠିକ୍ଷିତେ ପାରେ ନା । ବେଦେ ଆଛେ, “ହିନ୍ଦ୍ରୋ ବ୍ରହ୍ମାଣି ଶ୍ୱବନେ” ବେଦେ ଅଗଂଧାନ୍ତାନ୍ତେ ହିନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତୃକ ବ୍ରହ୍ମବଧ ଆଛେ, ଓହା ବେଦାନ୍ତୁସୋ-ଦିତ । ଦେବୀଭାଗବତର ଉପାଧ୍ୟାନ ବେଦ-ବହିର୍ଭୂତ । ଓହାତେ ଦେବୀଭାଗବତକେ ସହାପୁରାଣ ବଳା ସାୟ ନା । ପୁରାଣ ପ୍ରାକ୍ଷିତି ମକଲ ଶାନ୍ତ୍ରୁହି ବେଦାନ୍ତୁଗତ । ବେଦ ‘ବ୍ରହ୍ମବଧ’ ବଳିତେ ସାହା ବୁଝେନ, ସହାପୁରାଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଗବତ ତାହାହି ବୁଝିରାଛେନ । ଦେବୀଭାଗବତ ଉପପୁରାଣ, ତାହାତେ ଶକ୍ତିପ୍ରଭାବେ ଆଜ୍ଞାଗବୀ ଗଜ ପାଠିକ୍ଷି-ତେ ଓ ପାରେ ।

ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଦିତ୍ୟପୁରାଣେର ପ୍ରମାଣ ଉକ୍ତ କରନ୍ତା ଦେବୀଭାଗବତକେ ଭାଗବତ-ଭୂଷିତ ସହାପୁରାଣ ବଳିତେ ଠାହେନ । ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଗବତେ ଭାଗବତ ନାହିଁ, ଦେବୀଭାଗବତେ ଆଛେ । ଅତଏବ ଦେବୀଭାଗବତ ଆଦିତ୍ୟପୁରାଣସନ୍ତେ ସହାପୁରାଣ, ହିନ୍ଦ୍ରାହି ଠାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ । ସମାଧାନେ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଲିଖିରାଛେନ, ଦେବୀଭାଗବତର ଉତ୍ତରାଦି ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଗବତର ପରେ ରଚିତ, କାରଣ ତାହାତେ ଗାଧାର କଥା ଆଛେ । ଏଧନ ଠାହାର ବୁଝି-

ତେହି ଠାହାର ସତ ଧଂଘନ କରାର ଠେଟା କରା ସାଉକ୍ । ଆଦିତ୍ୟପୁରାଣ ଦେବୀଭାଗବତର ଉତ୍ତରାଦି ରଚନାର ପରେ ରଚିତ, ଅତରାଂ ଠାହା-ରତେ ମତେ ଓହା ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଗବତର ପରବର୍ତ୍ତୀ । ସହାପୁରାଣଧାନିର ଉତ୍ତରାଦି ରଚନାର ପୂର୍ବେ ଉପପୁରାଣଧାନି ରଚିତ ହୈୟ, ଓହା ଅପେକ୍ଷା ହାତ୍ତକର ମତ ଆର କି ହୈତେ ପାରେ ? ଆଦିତ୍ୟପୁରାଣ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରାଗବତକେ ଜାନିତେନ, ଓହା ଅୟଂ ଶେଷକେରତେ ସ୍ୱୀକୃତ, ଅତରାଂ ତିନି ଯେ ଭାଗବତାନ୍ତୁକ ଦେବୀଭାଗବତକେହି ସହା-ପୁରାଣ ବଂଶିୟାଛେନ, ଓହା ପାଠିକ୍ଷିତ୍ୱ ବଳାୟ ଆଗାଧିକ୍ଷି କି ? ଆର ଏକ କଥା, ରାଧା ନୁହନ ଦେବତା ନହେନ ; ନୈମିକ୍ଷିକ ଦେବତା । ଶକ୍ତୀ ସେମନ ଶକ୍ତିପରିଶିଷ୍ଟୋକ୍ତ ଦେବତା, ରାଧା ଓ ତେମନି । ଶକ୍ତିପରିଶିଷ୍ଟେ ଦୃଷ୍ଟ ହର—“ରାଧାୟା ସାଧବୋ ଦେବୋ ସାଧବେନ ଚ ରାଧିକା ।” ଏ ପୁସ୍ତକଧାନିକେତେ ବ୍ରହ୍ମନୈବର୍ତ୍ତେର ଦଳେ ଫେଲା ଠେଲେ ନା । ଏତଦ୍ୱାରା ବୁଝା ସାୟ, ଠେକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସହାଶୟେର ବୁଝି ଠାହାର ପକ୍ଷ ସମର୍ଥନେ ଶକ୍ତ ନୟ ।

“ଶୁକପୋକ୍ତଂ” କଥାର ଅର୍ଥ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁର ମତେ “ଶୁକର ପାଠିକ୍ଷିତେ ପୋକ୍ତଂ” । ଏରୂପ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାକରଣ-ସମ୍ମତ ନହେ । ଏ ଠେଡ଼ୁର୍ଣ୍ଣା-ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶ ସମାସ କରିତେ ବ୍ୟାକରଣେର ଆଗାଧିକ୍ଷି ଆଛେ । “ଶୁକେନ ପୋକ୍ତଂ” ଏତେରୂପ ତୃତୀୟ-ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରକାଶ ସମାସ କରିତେ, କାରକ-ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମାସ ହର । କାରକ-ବିଭକ୍ତି ଧ୍ୟାଗ କରିତା, ଉପପଦ ବିଭକ୍ତିର ଦ୍ୱାରା ସମାସ କରା ଅହୁଂଶାସନ-ବିରୁଦ୍ଧ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ହିନ୍ଦ୍ରା ଜାନେନ କି ? ଆକ୍ଷି ଏକ କଥା, “ଅଷ୍ଟଶୀଘ୍ନ ଓ ଶୁକପୋକ୍ତଂ” ହିନ୍ଦ୍ରାଦି ବଚନଟୀ ମନ୍ତ୍ରପୁରାଣେର । ଐ ମନ୍ତ୍ର-ପୁରାଣେରହି ପୂର୍ବୋକ୍ତ “ପୁରାଣେଷୁ ଠେକ୍ରବୁ” ହିନ୍ଦ୍ରାଦି ବଚନ ଏବଂ “ଶୁକମଧ୍ୟାପାୟଂ ଅତଂ”

এক পদ্মপুরাণীয় বচন পাঠ করিলে 'শুক' অর্থে শকী বলিতে সাধ হয় না, 'ভাগবত' অর্থেও দেবীভাগবত বলিতে ইচ্ছা হয় না। পদ্ম-পুরাণ সম্বন্ধে 'শুক' বলিতে বেদবাসপুত্র বুঝিরা, তৃতীয়াসমাস-পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। বাকরণ শাস্ত্রও তাই পমাণ করে। এখন বোধ হয় বলা যায়, যোগীন্দ্র বাবুর ব্যাখ্যায় পদ্মপুরাণের নিজেরই আপত্তি।

চিন্তসুখ ভাগবতের টীকা না লিখিলেও, ভাগবতের প্রামাণ্য পরিচয় দিয়াছেন। 'পুরাণার্থ' টীকা না হইলেও, টীকার জায় ভাগবতের কাঞ্চে লাগিয়াছে। চিন্তসুখ-প্রণীত ভাগবতের টীকার কথা বিখ্যকোষে নাই বলিয়া গোস্বামীগণ ভ্রান্ত, এ কথা বলা অজ্ঞায়। বিখ্যকোষে বিখ্যের—বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্রের তথ্য অল্পই আছে। যাহা আছে, তাহাও বহুতরনে সাস্তি-পূর্ণ। পুস্তক সিংহ-ইয়া দেখিলেই চক্রবর্তী মহাশয়ের ভ্রম দূর হইবে। গোস্বামীরা হয়ত চিন্তসুখপ্রণীত ভাগবত-টীকা দেখিয়াছিলেন; হয়ত তাহা অধুনা অক্ষকারে আছে, একরূপ মনে করাতেইবা বাধা কি? বোপদেব ভাগবত-টীকাকার, ইহা সত্য। যোগীন্দ্র বাবুর মতে তিনি স্কৃত ভাগবতেরই টীকা লিখিয়াছেন। একরূপ দৃষ্টান্ত নাকি ভূরি ভূরি! ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা গ্রন্থকার লিখিতে পারেন, কিন্তু ভাগবতের জায় বিরাট অধিতীয় গ্রন্থ লিখিয়া, নিজে যে তাহার টীকা লিখিয়াছেন, ইহার হই একটা প্রমাণ প্রীর্খনা করি। ভূরি ২ নাইও, দিতেও পারিবেন না; হই একটাই যথেষ্ট। "ভাগবত-ভাষ্যকৌ ভ্রমঃ" দেখিয়া যদি বোপদেব

ভাগবত লিখিয়াছেন, মনে করা যায়, তবে আর "কাহার ভ্রম" বা "একদেশদর্শী কে?" বুঝিবার বাঁকী থাকিল কৈ?

বাগম্ তত্ত্ব একজন দিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ভাগবত-সম্বন্ধে কথা বলা তাঁহার পক্ষে যোগীন্দ্র বাবুর জায় অনধিকারচর্চা। শ্রীধরস্বামী সময়ে ভাগবতসময়ের মহাপুরাণকে বিন্যাস ছিল বুঝা যায়, ইহা চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার যুক্তপর্থাৎবেক্ষণে নীলকণ্ঠের সময়েও যে ঐ বিবাদ ছিল, তাহা আবিষ্কৃত হয় নাই কেন?

সকল পুরাণ এক হস্তের রচনা নহে, এ তত্ত্বের স্থানিকারে যোগীন্দ্র বাবু আমাদিগকে কি শিখাইয়াছেন? মহাভারতাদি গ্রন্থেরও সর্ব্বাংশ এক হাতে লেখা কি না, তাহার কিছু চিন্তা করিয়াছেন কি? শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষা কঠিন, অলঙ্কৃত, বিবিধ ছন্দ-নিশিষ্ট, সুগভীর চিন্তাপ্রসূত, ইহাও যোগীন্দ্র বাবুর মতে শ্রীমদ্ভাগবতের দোষ! ফলে দোষ আমাদের অদৃষ্টের। ভাগবতের কাঠিন্ত মহাভারতে, রামায়ণে, বাশিষ্ট, রামায়ণে বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত সুগভীর চিন্তায়—দার্শনিকতায় প্রায় একইরূপ। মহাভারতের অশ্লিষ্টতা প্রভৃতি পাঠ করিয়া যাহারা ভাষার সারল্যে মুগ্ধ হন, তাঁহাদের নিকট আমরা নিরুত্তর। ভাষার সারল্য ভাগবতেও যথেষ্ট। কতকগুলি শ্লোক কঠিন; মহাভারতাদিতেও তাহার অভাব নাই। মহাভারতেও শ্রীমদ্ভাগবত অপেক্ষা খুব অল্প ছন্দে রচিত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ২।১টী নূতন ছন্দ আছে; তেমনি মহাভারতেও আর্ঘ্যাদি নূতনের অভাব নাই।

যোগীশ্বর বাবু বলেন, দেবীভাগবতকে পণ্ডিতেরা মহাপুরাণ বলিয়া আসিতেছেন। আমরা এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সংবাদ পাই নাই। ভাগবতের টীকাকারেরা অপণ্ডিত ছিলেন কি? আশা করি, যোগীশ্বর বাবু তাঁহার পণ্ডিতবর্গের তালিকা প্রকাশ করিবেন।

চক্রবর্তী মহাশয় মনে করেন, রঘুনন্দন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া, আমি শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণ প্রমাণ করিতে চাহি; ফলে পনক পাঠে মনোযোগ না করার তিন ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আমার উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আর্ষিক-স্থাপন; তজ্জন্ম বলিয়াছি, রঘুনন্দনও ইহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন। রঘুনন্দন অনাৰ্ঘ্য গ্রন্থের শ্লোক প্রমাণে বলেন নাই। যোগীশ্বর বাবু বলেন, “অষ্টোবিংশতিতমো অধুনিক পণ্ডিতগণের মত ও বচন যথেষ্ট উদ্ধৃত হইয়াছে।” তিনি শাস্ত্রাবগম্যী নহেন, সূত্রাং এরূপ উক্তিতে অপরাধ নাই। পণ্ডিত-সমাজ জানেন, আধুনিকগণের মত আছে, কিন্তু ঋষিপ্রণীত তিন্ন “বচন” প্রমাণ হয় না। সংগ্রহকর্তাদের উদ্ধৃত বচনগুলি, তাঁহাদের রচিত শ্লোক বা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থের বচন, এবিষয়ে যোগীশ্বর বাবুর জ্ঞানের পরিধি আমাদের পরিচিত নহে। রঘুনন্দন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য স্বীকার করার, উহার আর্ষিক তৎকালে সন্দেহ ছিল না, ইহাই আমার অভিপ্রায়। আজ কাল অনেকে বলেন “রঘুনন্দনের বচন” “মিতাকরার বচন”—এসব কথার অর্থ কি, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকগণ বিচার করুন। দেবী-

ভাগবতের ‘ভাগবত’ খ্যাপনে যোগীশ্বর বাবুর যুক্তিপ্রমাণ সমর্থ, কিন্তু মহাপুরাণজ্ঞাপনে অসমর্থ। দেবীভাগবতকে উপ-পুরাণ ভাগবত বলা আমাদের মত, সূত্রাং তাঁহার অনশিষ্ট প্রমাণ কল্পটিকে আক্রমণ করিয়া ঐতিবাদ-কলেবর বৃদ্ধি করিবেন না। মংপ্রদর্শিত প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্ব স্থির করিয়াছে কি না ও যোগীশ্বর বাবুর যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব প্রতিপন্ন হয় কি না, পণ্ডিত পাঠকগণ বুঝিবেন। “হয়গ্রীবাণতার” বগাথেই “হয়গ্রীবা ব্রহ্মবিজ্ঞা” অর্থাৎ হয়গ্রীবের ব্রহ্মজ্ঞান বা ঈশ্বরত্ব প্রদর্শন সিদ্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞা অর্থে জ্ঞান, প্রমাণ বেদ—উপনিষৎ। সারস্বত কল্পের কথা দ্বারা দেবীভাগবতকে ‘ভাগবত’ বলা হইয়াছে, মহাপুরাণ বলা হয় নাই। ‘সারস্বত’ অর্থ পদ্মও হইতে পারে। সারস্বতকল্পকে যদি পৌরাণিক কল্প বলিয়াই বুঝি, তথাপি ক্ষতি নাই। সারস্বতকল্পের দেবনয়-বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে থাকিতে আপত্তি নাই। সারস্বতকল্পের বর্ণনা থাকিবার দরকার বুঝি না। উদ্ধৃত শ্লোকে তাণ্ডা বুঝায় না। শ্রীমদ্ভাগবত পাদ্যকল্পাশ্রিত পুরাণ নহে। পাদ্যকল্পের কথা আছে; সে শুধু সৃষ্টি-বর্ণন প্রদে। অল্প কল্পের বৃত্তান্তও শ্রীমদ্ভাগবতে আছে। আবশ্যক হইলে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইবে। এখন বোধ হয় বলিষ্ঠ পারি, শ্রীমদ্ভাগবতের মহাপুরাণত্বের প্রমাণ দিয়াছি। যোগীশ্বর বাবু ঐ সব প্রমাণের একদেশ দর্শন করিয়াই ‘বিষকোব’ নকল করিয়াছেন। তাঁহার শেষ মত

অর্থাৎ “ক্রমানাট নকশ ভাগবত”—এই মত
প্রমাণশূন্য—কোনও বহুনা মান। বৌদ্ধ
বিপ্লবের নাম করিলে চলেনা, প্রমাণ দিতে
চয়; পূর্ণাপর মধ্যক চিন্তা করিয়া বলিতে
চয়। যোগীন্দ্র বাবুর পবন্ধে আমার
মতের খণ্ডন পাটলাম না, তাঁতার মতের
সমর্থনও পাওয়া গেল না। তিনি প্রমাণ-
শূন্যকে নিজের ভাবদেই দেখিয়েছেন; উহা
একদেশে দর্শন কি না, পাঠকগণ বিচার
করুন।

শ্রীকৃষ্ণভূষণ তর্কনাগীশ ।

(পাননা—দর্শন-টোল ।)

মাতৃপূজা

(১)

এম বঙ্গবাসি! এম মনে ভাট,
আজি উচ্চ নীচ কোন ভেদ নাট;
ত্রিগুণ কোটী কর্ণে মিলি এম গাই
ভারত মাতার বিজয়ের গান।

(২)

অনন্ত আনন্দে হৃদয় ভাসিবে,
নিমাদ বদনা দূরে পলাটাবে,
ভুক্তি জাগ্রিত, শক্তি আসিবে,
মুছিয়া যাউবে দুঃখ-অপমান ॥

(৩)

জাগ, জাগ আজি অর্থা স্মরণ!
তের সমুদিত জাতীয়-তপন;
'মাতৃ পূজা-মন্ত্র' কররে গ্রহণ,
মায়ের মৈসবায় সঁপ প্রাণ-মন ।

(৪)

ভারত-গৌরব অর এইবার,
অর অর্থাংকর্ত, সভ্যতা-বিস্তার,

ভীমার্জুন-ভীষ্ম—বীর-অবতার,
কুরুক্ষেত্র মহা সমর ভীষণ ॥

(৫)

অর রত্নাকর পরাশর, বায়ু,
স্বরী ভবভূতি, মায়, কালিদাস,
চতুর্বেদ, তন্ত্র, পুরাণ প্রকাশ,

উপনিষদাদি জ্যোতিষ, দর্শন ।

(৬)

অর হিন্দুকুল-গৌববের ধান—
মহারাত্রি-পতি শিবাজির নাম,
প্রতাপ-আদিত্য, রাজা সীতারাম,
অশ্বমেধ, রাজসূয়-উদ্‌যাপন ॥

(৭)

খনা, মীলানভী, দময়ন্তী, সীতা,
মানিকী, দ্রৌপদী, গার্গী, নচিকেতা,
চণ্ডী, ভাগবত, মন্ত্র, স্মৃতি, গীতা,
মঞ্জীত, মাতিত্য, শিল্পবিবরণ ।

(৮)

অর চিন্দুধর্ম, জ্ঞান-মোক্ষদার,
পূণ্য-তপোবনে 'মায়ের' বন্ধার,
হৃদয়ে জাগিলে মহিমা অপার,
নবীন উজ্জ্বল মাতিলে জীবন ॥

(৯)

জালাও ভারতে উৎসাহ-অনল;
সিংহের তনয় কেন হতবল?
স্বজাতি-স্বধর্ম—জীবন-সম্বল;
জনমভূমির সাধক কলাণ ।

(১০)

বহে অমুকুল অদৃষ্ট-পবন,
কর সবে মিলি একতা-বন্ধন;
সুখে বল মুখে “বন্দে মাতরম্”!—
মকল-মঙ্গল-মহিমা-নিদান ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুম্ভ ।

শ্রীহরিঃ ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।



১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড,
২য় সংখ্যা ।

জ্যৈষ্ঠ ।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমঙ্গ
দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ।
প্রথম পরিচ্ছেদ ।

[ঠাকুরের গলায় অন্নুখের সূত্রপাত ।]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে
সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন ।

আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ ;
জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ তিথি ; জ্যৈষ্ঠ মাসের
সংক্রান্তি । বেলা তিনটা হইবে । ঠাকুর
গাওয়ার দাঁড়ায়ার পর ছোট খাটটিতে একটু
বিশ্রাম করিতেছেন ।

পশ্চিমদিকী মেঝের উপর সাত্তরে বসিয়া
আছেন । একটা শোকাভূরা ব্রাহ্মণী ঘরের
উত্তরের দরবার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন ।
ত্রিমোহী আছেন ।

মাঠার আগিয়া প্রণাম করিলেন । সঙ্গে
বিজ ইত্যাদি । অখিল বাবুর প্রতিবেশী
বসিয়া আছেন । তাঁহার সঙ্গে একটু
আগামী হোকরা ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একটু অন্নুখ আছেন ।
গলায় বীজি হইয়া শর্দীর ভাব । গলায়
অন্নুখের এই প্রথম সূত্রপাত ।

বড় গরম পড়তে মাঠারের শরীর
অন্নুখ । ঠাকুরকে সর্কণা দর্শন করিতে
দক্ষিণেশ্বর আসিতে পারেন নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । (মাঠার দৃষ্টে) । এই
যে ভূমি এসেছ । বেশ বেগুটা ।

ভূমি কেমন আছ ? — বড় গরম পড়েছে ।
ভূমি একটু একটু বরফ খেও ।

মাঠার । অ্যাঙ্কে, আগেকার চেয়ে একটু
তাল আছি ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আমারও বাপু বড় গরম প'ড়ে কষ্ট হয়েছে । গরমতে কুন্নি-বরফ— এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল । তাই গলায় বীচি হয়েছে । গরমের এমন বিস্ত্রী গন্ধ দেখি নাই !

মাকে বলেছি 'মা ! ভাল করে দেও, আর কুন্নি খাবনা ।'

তার পর আবার বলেছি বরফও খাবনা ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্যাকথা]

শ্রীরামকৃষ্ণ । মাকে যেকালে বলেছি খাবনা, সেখানে আর খাওয়া হবে না ।

"তবে এমন হঠাৎ ভুল হয়ে যায় । বলেছিলাম, রবিবারে মাছ খাবনা ; এখন এক দিন ভুলে খেয়ে ফেলেছি ।

"কিন্তু ঘেনে শুনে হবার যো নাই । সে দিন গাড়ু নিয়ে একজনকে বাউতলার দিকে আসতে বললুম । এখন সে বাহ্যে গিচ্ছল ; তাই আর একজন নিয়ে গেল । আমি বাহ্যে করে এসে দেখি যে আর একজন গাড়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । সে গাড়ুর জল নিতে পারলুম না । কি করি ? মাটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—বতসুপ না সে এসে জল দিলে ।

"মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে বখন সব ভ্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম "মা ! এই লেও তোমার শুচি, এই লেও তোমার অশুচি, আমার শুদ্ধভক্তি দেও ; এই লেও তোমার ধর্ম, এই লেও তোমার অধর্ম ; এই লেও তোমার পাপ, এই লেও তোমার পুণ্য ; এই লেও, তোমার ভাল, এই লেও তোমার মন্দ । কিন্তু, এই লেও তোমার সত্য, এই লেও তোমার মিথ্যা, একথা বলতে পারলাম না ।

একজন ভক্ত বরফ আনিয়াছিলেন । ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মাষ্টারকে লিজাঙ্গা করিতে লাগিলেন, "ইঁগা খাব কি ?"

মাষ্টার বিনীত ভাবে বলিলেন "মা'র সঙ্গে পরামর্শ না করে খাবেন না ।" ঠাকুর অবশেষে খাইলেন না ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানীর অবস্থা ও ভক্তের অবস্থা ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ । শুচি অশুচি,—এটা ভক্তি ভক্তের পক্ষে । জ্ঞানীর পক্ষে নয় ।

"বিজয়ের শান্তী বুললে, 'কই আমার কি হয়েছে ? এখনও আমি সকলের খেতে পারি না !'

"আমি বললাম "সকলের খেলেই কি জ্ঞান হয় ? কুকুর যা তা খায় ; তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী ?

(মাষ্টারের প্রতি) আমি পাঁচ ব্যারুন দিয়ে খাই কেন ? পাছে একঘেয়ে হলে এদের (ভক্তদের) ছেড়ে দিতে হয় ।

"কেশব সেনকে বললাম, "আরও এগিরে কথা বললে তোমার দলটল আর থাকে না ।

"জ্ঞানের অবস্থার দলটল মিথ্যা।—সপ্রমাণ ।

"মাছ ছেড়ে দিলাম । প্রথম প্রথম কষ্ট হ'তো ; পরে তত কষ্ট হ'ত না ।

"পাখীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দেয়, সে উড়ে উড়ে বেড়ায় ; আকাশ আশ্রয় করে । দেহ, জগৎ—যদি, ঠিক মিথ্যা বোধ হয়, তাহলে আত্মা সমাধি হ'য় ।

"আগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল । লোক ভাল লাগতো না । অমুক হাটবোলায় একটা জ্ঞানী আছে, কি একটা ভক্ত আছে, এই শুনলাম ; আবার কিছু দিন পরে শুন-

লাম, ঐ সে মরে গেছে! তাই আর লোক ভাল লাগতো না।

“ভারপর তিনি (মা) মনকে নাশালেন ; ভক্তি-ভক্তিতে মন রাখিরে দিলেন।

মাষ্টার অবাক হইয়া ঠাকুরের অবস্থা পরিবর্তনের বিষয় শুনিত্তেছেন। এইবার ঠাকুর মাহুৎ হয়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বলিত্তেছেন।

[নরলীলার গুহু অর্থ।]

ঐরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। মাহুৎ-লীলা কেন লান ? এর ভিতর তাঁর কথা শুন্তে পাওয়া যায় ; এর ভিতর তাঁর বিলাস ; এর ভিতর তিনি রসাস্বাদন করেন।

আর সব ভক্তদের ভিতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ। যেমন জিনিস অনেক চুসতে চুসতে একটু রস , সুগ চুসতে চুসতে একটু মধু।

(মাষ্টার প্রতি) তুমি এটা বুঝেছ ?

মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ, বেশ বুঝছি।

[বিজ্ঞ ও পূর্বসংস্কার।]

ঠাকুর বিজ্ঞের সহিত কথা কহিত্তেছেন। বিজ্ঞের বয়স ১৫। ১৬ হইবে। তাঁহার বাপ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন। বিজ্ঞ আর মাষ্টারের সঙ্গে আসেন। ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন।

বিজ্ঞ বলিত্তেছিলেন, যে তাঁর বাবা তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে আনিত্তে যেন না।

ঐরামকৃষ্ণ (বিজ্ঞর প্রতি)। তোর ভাইরাও ? আমাকে কি অবজা করে ? পবিত্র চূপ করিয়া আছেন।

মাষ্টার। সংসারের আর ছ চার ঠাকুর

খেলে, বাদের একটু আধটু বা অবজা আছে, চলে যাবে।

ঐরামকৃষ্ণ। বিমাতা আছে, যা (blow) ত থাকে।

সকলে একটু চূপ করিয়া আছেন।

ঐরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) একে (বিজ্ঞকে) পূর্ণের সঙ্গে দেখা করিরে দিওনা। মাষ্টার। যে আজ্ঞে।

(বিজ্ঞর প্রতি) পেনেটীতে যেও।

ঐরামকৃষ্ণ। হাঁ; তাই সবাইকে বলছি,—একে পাঠিরে দিও, ওকে পাঠিরে দিও।

ঠাকুর পেনেটীর মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভক্তদের সেখানে যাবার কথা বলিত্তেছেন।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি যাবে না ?

মাষ্টার। আজ্ঞে, ইচ্ছা আছে।

ঐরামকৃষ্ণ। বড় নৌকা হবে, টল টল করবে না।

“গিরীশ ঘোষ যাবে না ?

[“হাঁ” “না” ; the Everlasting “yea” and Everlasting “Nay” *]

ঠাকুর বিজ্ঞকে একদৃষ্টে দেখিত্তেছেন।

ঐরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি) আজ্ঞা এত ছোকরা রয়েছে, এই বা আসে কেন ? তুমি বলা, অবশ্য আগেকার কিছু ছিল। মাষ্টার। আজ্ঞে হাঁ।

ঐরামকৃষ্ণ। সংসার। আগের জন্মে কর্ম-করা আছে। সবল হয় শেব জন্মে। শেব জন্মে খাপাটে তাব থাকে।

“তবে কি জান—তার ইচ্ছা। তার
“হ্যাঁ”তে অগতের সব হচ্ছে; আর তার
“না”তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে।

“মানুষের আশীর্বাদ করতে নাই কেন ?
মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না ;
তারই ইচ্ছাতে হয়—যায়।

“দে দিন কাপ্তেনের ওখানে গেলাম।
রাত্তা দিয়ে ছোকরারা বাচ্ছে দেখলাম।
তারা এক রকমের।

“একটা ছোকরাকে দেখলাম, ১১। ২০
বছর বয়স, বাঁকা সিন্ধে কাটা, শিশু দিতে
দিতে বাচ্ছে।

“কেউ বাচ্ছে বলতে বলতে,—“নগেন্দ্র !
কীরোদ !”

“কেউ দেখি যোর তমো;—বাঁশী বাজাচ্ছে,
তাইতেই একটু অহকার হয়েছে।

(বিজয় প্রীতি) যার জ্ঞান হয়েছে, তার
নিদার ভয় কি ? তার কুটুহ বুদ্ধি—কামা-
নের নেমাই; তার উপর কত হাতুড়ীর বা
পড়ছে, কিছুতেই কিছু হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আসি একবার—বাপকে
দেখলাম রাত্তা দিয়া বাচ্ছে।

মাষ্টার। লোকটা বেশ সরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু চোক রাদ।

[কাপ্তেনের চরিত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

পুরুষ-প্রকৃতি-যোগ।]

ঠাকুর কাপ্তেনের বাড়ী গিয়াছিলেন—
সেই গল্প করিতে লাগিলেন। যে সব ছেলেরা
ঠাকুরের কাছে আসেন, কাপ্তেন তাহাদের
নিদা করিয়াছিলেন। হাজরা মহাশয়ের
কাছে বোধ হয় তাহাদের নিদা গুলিয়া-
ছিলেন।

। কাপ্তেনের সঙ্গে কথা
হছিল। আমি বললাম ‘পুরুষ আর প্রকৃতি
ছাড়া আর কিছু নাই। নারদ বলেছিলেন,
হে রাগ, যত পুরুষ দেখতে পাও, সব তোমার
অংশ, আর যত স্ত্রী দেখতে পাও, সব
সীতার অংশ।

কাপ্তেন শুনে খুব খুশী। আর ব’লে,
‘আপনারই ঠিক বোধ হয়েছে,—সব পুরুষ
রামের অংশে রাম, আর সব স্ত্রী সীতার
অংশে সীতা।

এই কথা এই বলে; আবার তারই পরে
ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ করলে। বলে
‘ওরা ইংরাজী পড়ে,—বা তা খায়,—ওরা
তোমার কাছে সর্দদা যায়,—সে ভাল নয়।
ওতে তোমার খারাপ হতে পারে। হাজরা
বা একটা লোক যায়, খুব লোক। ওদের
অত বেতে দেবেন না।

আমি প্রথমে বললাম, যার তা কি
করি ?

তার পর প্যাণ্ (পাণ) খেঁতলে দিলাম।
ওর মেয়ে হাঁসতে লাগল। বললাম, ‘বেণোকের
বিষয়বুদ্ধি আছে, সে লোক থেকে ঈশ্বর
অনেক দূর। বিষয়বুদ্ধি যদি না থাকে, সে
ব্যক্তির তিনি হাতের ভিতর,—অতি
নিকটে।

কাপ্তেন রাখালের কথা বলে, যে ও
সকলের বাড়ীতে যায়। বুদ্ধি হাজরার
কাছে শুনেছে। তখন বললাম, ‘লোক হাজার
তপ অপ করুক, যদি বিষয়বুদ্ধি থাকে, তা
হ’লে কিছুই হবে না; জারি পুরুষ-মাংস
খোর যদি ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যক্তি ধর্ম
তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা

এত জগতপ করে; কিন্তু ওর মধ্যে দালালি কর্ণবে—এই চেষ্টার থাকে।

তখন কাপ্তেন বলে, হাঁ, তা ও বাং ঠিক হয়। তার পরে আমি বললাম, এই ভূমি বলে, সব পুরুষ রাসের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে সীতা, আবার এখন এমন কথা বলছে!

কাপ্তেন বলে, তা তো;—কিন্তু ভূমি সকলকে তো ভালবাসে না।

আমি বললাম, ‘আপো নারায়ণঃ’; সব জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া যায়, কোন-টাতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শোচ করা যায়। এই যে তোমার মাগ, মেয়ে ব’সে আছে, আমি দেখছি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী!

কাপ্তেন তখন বলতে লাগল ‘হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হয়।’

তখন আবার আমার পায়ে ধরতে যায়। এই বলিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কত গুণ, তাহা বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কাপ্তেনের অনেক গুণ। রোজ নিত্যকর্ম;—নিজে ঠাকুর পূজা;—স্নানের মন্ত্রই কত!

কাপ্তেন খুব একজন কর্মী;—পূজা, জপ, আরতি, পাঠ, স্তব, এ সব নিত্যকর্ম করে।

[কাপ্তেন ও পাণ্ডিত্য; কাপ্তেন ও ঠাকুর
[শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থা।]

আমি কাপ্তেনকে বক্তে লাগলাম; বললাম, ভূমি পড়েই সব খারাপ করেছে! আমার প’ড়ো না।

আমি অবস্থা কাপ্তেন বলে, উত্তীর্ণমণি ভাব;—জীবাত্মা আর পরমাত্মা; জীবাত্মা

যেন একটি পাবী, আর পরমাত্মা যেন আকাশ,—চিদাকাশ; কাপ্তেন বলে, ‘তোমার জীবাত্মা চিদাকাশে উড়ে যায়,—তাই সমাধি।’

কাপ্তেন বাঙ্গালীদের নিন্দা করলে। বলে, বাঙ্গালীরা নির্দোষ! তা না হ’লে কাছে মাণিক রয়েছে, চিনলে না!

কাপ্তেনের বাপ খুব ভক্ত ছিল। ইংরেজের ফোঁড়ে সুবাদায়ের কাজ করত। বুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত;—এক হাতে শিবপূজা, একহাতে তরবার-বন্দুক! [গৃহস্থভক্ত ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ।]

(মাষ্টারের প্রতি) তবে কি জান, সাত-দিন বিষয় কর্ম!—মাগ, ছেলে বিরে রয়েছে, যখন যাই দেখি। আবার লোক জন হিগাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। এক একবার জঁঝরেও মন যায়। যেমন বিকারের রোগী; বিকারের ঘোর লেগেই আছে, এক একবার চটকা ভাঙ্গে। তখন ‘জলখাব, জলখাব’ বলে টেঁচিয়ে উঠে; আবার, জল দিতে দিতে অজ্ঞান হয়ে যায়,—কোন হ’স্ থাকে না!

[কর্ম কত দিন?]

আমি তাই একে বললাম—ভূমি কর্মী।

কাপ্তেন বলে, আজ্ঞা, আমার পূজা এই সব কর্তে আনন্দ হয়। জীবের কর্ম বই আর উপায় নাই।

আমি বললাম, কিন্তু কর্ম কি চিরকাল কর্তে হবে? নোমাছি তন্ তন্ কর্তকণ করি! যতকণ না ফুলে গড়ে। মধুপানের সময় তন্ তনানি চলে যায়।

কাপ্তেন বলে, ‘লাগনার মত আসন্ন কি

পূজা আর আর কর্ম ত্যাগ করিতে পারি ?
তার কিন্তু কথা ঠিক নাই ;—কখনও
‘বলে, ‘এ সব জড়’ ; কখনও বলে, ‘এ সব
চৈতন্য’। আমি বলি, জড় আবার কি ?
সবই চৈতন্য ।

[পূর্ণ ও মাষ্টার ।]

পূর্ণের কথা ঠাকুর মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা
করিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । পূর্ণকে আর একবার
দেখলে আমার ব্যাকুলতা একটু কম
পড়বে।—কি চহুর!—আমার উপর খুব
টান ; সে বলে, আমারও বুক কেমন করে
আপনাকে দেখবার জন্য ।

তোমার স্কুল থেকে ওকে ছাড়িয়ে
নিরছে ; তাতে তোমার কি কিছু ক্ষতি
হবে ?

মাষ্টার । যদি তাঁরা (বিদ্যাসাগর)
বলেন, তোমার জন্য ওকে স্কুল থেকে
ছাড়িয়ে নিলে, তা হ’লে আমার জবাব
দেবার পথ আছে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । কি বলবে ?

মাষ্টার । এই কথা বলব, সাধুগণকে ঈশ্বর-
চিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ নয় ; আর
আপনারা যে * বহি পড়াতে দিয়েছেন,
তাতেই আছে—ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল
বাগবে ।

ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন ।

* With all thy soul love God
above (Vidyasagar's Poetical Se-
lections.)

And as thyself they neigh-
bour love.

শ্রীরামকৃষ্ণ । কাপ্তেনের বাড়ীতে ছোট
নরেনকে ডাকালুম । ব’লান, তোর বাড়ীটা
কোথায় ? চল্ বাই।—সে বলে, ‘আম্মন ।
কিন্তু ভরে ভরে চলতে লাগল সবে,—
পাছে বাপ জানতে পারে ।’ সকলে হাসিতে
লাগিলেন ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (অখিল বাবুর প্রতিবেশীর
প্রতি) হাঁগা, তুমি অনেক কাল আস নাই ।
সাত আট মাস হবে ।

প্রতিবেশী । আজ্ঞা, এক বৎসর হবে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তোমার সঙ্গে আর একটা
আসতেন ।

প্রতিবেশী । আজ্ঞা হাঁ, নীলমণি বাবু ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । তিনি কেন আসেন
না ?—একবার তাঁকে আসতে বলো,—
তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিও ।

(প্রতিবেশীর সঙ্গী বালক দৃষ্টে) ; এ
ছেলেটা কে ?

প্রতিবেশী । এ ছেলেটার বাড়ী আসামে ।

শ্রীরামকৃষ্ণ । আসাম কোথা ? কোন্
দিকে ?

[জোর করে বিবাহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

বিজ্ঞ আশুর কথা বলিলেন । আশুর
বাবা তার বিবাহ দিবেন । আশুর ইচ্ছা
নাই ।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি) দেখ
দেখি,—তার ইচ্ছা নাই,—জোর করে
বিয়ে দিচ্ছে !

ঠাকুর একটা ভক্তকে কোঠ ভ্রাতাকে
ভক্তি করিতে বলিতেছেন, কোঠ ভাই,
পিতা সম—খুব মান্‌বি ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পণ্ডিতজী বসিরা আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে মাষ্টারের প্রতি।)

খুব ভাগবতের পণ্ডিত।

মাষ্টার ও ভক্তেরা পণ্ডিতজীকে এক
বুট্টে দেখিতে লাগিলেন। তিনি উত্তর
পশ্চিমাঞ্চলের লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রতি)। আচ্ছা
জী! বোগমার কি?

পণ্ডিতজী বোগমার ব্যাখ্যা করিলেন।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা-তব্ব]

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাধিকাকে কেন বোগ-
মার বলে না?

পণ্ডিতজী এই প্রশ্নের উত্তর এক রকম
দিলেন। তখন ঠাকুর নিজেই বলিতেছেন,—

“রাধিকা বিগ্ৰহস্বয়; প্রেমময়ী। বোগ-
মার ভিতরে তিন গুণই আছে, স্বয়, রজঃ
ও তমঃ। শ্রীমতীঃ; ভিতর বিগ্ৰহ স্বয় বই
আর কিছু নাই।

(মাষ্টারের প্রতি) নরেন্দ্র এখন শ্রীমতীকে
খুব মানে; সে বলে, সচ্চিদানন্দকে যদি
ভালবাসতে শিখতে হয়, তা হ'লে রাধিকার
কাছে শেখা বার।

সচ্চিদানন্দ নিজে রসাস্বাদন করবার
জন্ত রাধিকার সৃষ্টি করেছেন। সচ্চিদানন্দ
কৃষ্ণের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন।
সচ্চিদানন্দকৃষ্ণই ‘আধার’। আর তিনি
নিজেই শ্রীমতী রূপে ‘আধের’—নিজের
রস আবাদন ক’রতে,—অর্থাৎ সচ্চিদা-
নন্দকে ভালবেসে আনন্দ সন্তোষ কর্তে।

“তাই বৈকুণ্ঠের গ্রহে আছে, রাধা
অন্যত্রাং ক’রে চোক খুলেন নাই;—অর্থাৎ

এই ভাব যে—এ চক্রে আর কাকে দেখব?
যখন দেখতে মেয়ে মণোদা কৃষ্ণকে কোলে
ক’রে নিলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্ত
রাধা চোক খুললেন। কৃষ্ণ খেলার ছলে
রাধার চক্রে হাত দিচ্ছিলেন।

(আসামী বাণকের প্রতি) এক
দেখেছ, ছোট ছেলে চোকে হাত দেয়?
[সংসারী ব্যক্তি ও শুদ্ধাত্মা ছোকরার
প্রত্যেক]

পণ্ডিতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইবেন।
পণ্ডিত। আমি বাড়ী যাচ্ছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (সম্মেহে)। কিছু হাতে
হয়েছে?

পণ্ডিত। বাজার বড়া মলা হার!—
রোজ্গার নেহি।—

পণ্ডিতজী কিরংক্ষণ পরে ঠাকুরকে
প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)। দেখো,
—বিষয়ী আর ছোকরাদের কত ভকাং!
এই পণ্ডিত রাত দিন টাকা টাকা করছে।
কল্কাতার এসেছে, পেটের জন্ত,—তা না
হলে বাড়ীর সে গুলির পেট চলে না। তাই
এর ঘারে ওর ঘারে বেতে হয়। মন একাগ্র
করে ঈশ্বর-চিন্তা ক’রবে কখন? কিন্তু
ছোকরাদের ভিতর কামিনী-কাকন নাই।
ইচ্ছা করলেই, ঈশ্বরেতে মন দিতে পারে।

“ছোকরারা বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে না।
রাখাল মাঝে মাঝে বলত ‘বিষয়ী লোক
আসুত্রে দেখলে ভয় হয়।’”

“আমার বখন প্রথম এই অবস্থা হ’ল,
তখন বিষয়ী লোক আসুত্রে দেখলে ঘরের
দরজা বন্ধ ক’রতাম।

[পুত্র-কর্তা বিরোগ জন্ত শোক ও ঠাকুর
শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

দেশে শ্রীরাম সন্নিকটে অত ভালবাসা-
তাম ; কিন্তু এখানে যখন এগ, তখন ছুঁতে
পারলাম না ।

শ্রীরামের সঙ্গে ছেলে বেলায় খুব প্রণয়
ছিল । রাতদিন এক সঙ্গে থাকতাম ।
এক সঙ্গে গুয়ে থাকতাম । তখন ১৬। ১৭
বৎসর বয়স । লোকে বল'ত, এদের ভিতর
একজন মেয়ে মানুষ হ'লে দুজনের বিয়ে
হ'ত । তাদের বাড়ীতে যখন দুজনে বেলা
ক'রতাম, তখনকার সব কথা মনে প'ড়ছে ।
তাদের কুটুমেরা পাকী চ'ড়ে আ'গত ;
বেরারান্তগো 'হিজোড়া' 'হিজোড়া' বলতে
থাক'ত ।

শ্রীরামকে দেখ'ব বলে কতবার লোক
পাঠিয়েছি । সে এখন চানকে দোকান
ক'রেছে ।

সে দিন এসেছিল ; দু দিন এখানে
ছিল ।

শ্রীরাম ব'ললে, ছেলে পিলে হয় নাই ।
ভাইপোটিকে মানুষ করছিলাম ; সেটা
মরে গেছে ।

এই কথা বলতে বলতে শ্রীরাম দীর্ঘ-
নিশ্বাস ফেল'লে ; চক্ষে জল এল ; ভাই-
পোর জন্ত খুব শোক হ'য়েছে ।

আবার বল'লে, ছেলে হয় নাই বলে স্ত্রীর
বক্ত স্নেহ ঐ, ভাইপোর উপর পড়েছিল ;
এখন সে স্বেচ্ছাক্রমে জমীর হ'য়েছে । আমি
ক্লান্তক বসি, কেপি ! আর শোক করলে
কি হবে ? তুই কান্দী ঘাবি ?

বলে 'কেপি' ;—একবারে ডাইলিউট

(dilute) হয়ে গেছে ! তাকে ছুঁতে পার-
লাম না । দেখলাম, তাতে আর কিছু নাই ।

ঠাকুর শোক সত্বে এই সকল কথা
বলিতেছেন ; এ দিকে ঘরের উত্তরের দরজার
কাছে সেই শোকাভূরা ব্রাহ্মণীটি দাঁড়াইয়া
আছেন । ব্রাহ্মণী বিধবা । তাঁর একমাত্র
কন্তার খুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছিল ।
মেয়েটার নামী রাজা উপাধিদারী,—কলি-
কাতানিবাণী,—স্বামিদার । মেয়েটা যখন
বাপের বাড়ী আসিতেন, তখন সঙ্গে সেপাই
শাকী—আসিত ;—নায়ের বুক, যেন দশ
হাত হইত । সেই একমাত্র কন্তা কয়দিন
হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে !

ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিরোগ জন্ত
শ্রীরাম সন্নিকের শোকের কথা শুনিলেন ।
তিনি কয়দিন ধরিয়া বাগবাজার হইতে
পাখলের স্থায় ছুটে ছুটে ঠাকুর রামকৃষ্ণকে
দর্শন করিতে আসিতেছেন ; যদি কোন
উপায় হয় ;—যদি তিনি এই দুর্ভাগ্য শোক
নিবারণের কোনও ব্যবস্থা করিতে পারেন ।

ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন ।—

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণী ও জন্মদেব প্রভি) ।
একজন এখানে এসেছিল । খানিকক্ষণ
বসে ব'ল'ছে, 'মাই একবার ছেলের চাঁদমুখটা
দেখিগে' ।

আমি আর থাকতে পারলাম না ।
বললাম, 'তবে রে শালা !' ওঠ, এখান
থেকে ;—ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের
চাঁদমুখ ?

[জন্ম-মৃত্যুতত্ত্ব ; রাজীকর্মের তেলুকী ।]

(মাষ্টারের প্রভি) কি জান, ঈশ্বরই
সত্য, আর সব অনিত্য ।

[অম-বৃত্তা ভেলুকী ।]

“নীচ, জগৎ, বাড়ী-বর-বার—ছেলে-পিলে—এসব বাজীকরের ভেলুকী ! বাজী-কর কাটি দিলে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বনুছে, লাগ, লাগ, লাগ ! টাকা খুলে দেখ কতকগুলো পাখী ! আকাশে উড়ে পেল ! বাজীকরই সত্য, আর সব অনিত্য ! এই আছে এই নাই !

“টেকলাসে শিব বসে আছেন; নন্দী কাছে আছেন। এমন সময়ে একটা ভাঙ্গি শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ‘ঠাকুর ! এ কিসের শব্দ হ'লো ?’ শিব বললেন, ‘রাবণ জন্ম গ্রহণ করল, তাই শব্দ’। খানিক পরে আবার একটা ভয়ানক শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে—‘এবারে কিসের শব্দ ?’ শিব হেসে বললেন, ‘এবার রাবণ বধ হলো !’

“অম-বৃত্তা—এসব ভেলুকীর সত্য। এই আছে, এই নাই ! ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জগৎই সত্য, জগৎর ভূড়ভূড়ি,—এই আছে, এই নাই,—ভূড়ভূড়ি জলে নিশিরে ঝর;—বে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয়।

“ঈশ্বর, বেন মহাসমুদ্র; জীবেরা বেন ভূড়ভূড়ি; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়।

“ছেলে, মেয়ে,—যেমন একটা বড় ভূড়ভূড়ির সঙ্গে ৪টা ৬টা ছোট ভূড়ভূড়ি।

“ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপর কিরূপে ভক্তি হয়, তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর; শোক করে কি হবে ? * সঙ্গমে চূর্ণ করিয়া আছেন, ব্রাহ্মণী বলিলেন, ‘তবে আমি আমি।’

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রাহ্মণীর প্রতি, সম্বোধে)।

তুদি এখন বাবে? বড় ধূপ!—কেন, এঁদের সঙ্গে গাড়ী করে বাবে।

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা-আর তিনটা চারটা হইবে। ভাঙ্গি গ্রীষ্ম। একটা ভক্ত ঠাকুরকে একখানি নূতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর পাখা পাইয়া আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন “বা”। “বা”।—“ও তৎসৎ।—কালী !” এই বলিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওরা করিতে লাগিলেন। তাহার পরে মাষ্টারকে বলিলেন, দেখ দেখ কেমন হাওরা ! মাষ্টারও আনন্দিত হইয়া দেখিতেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

কাপ্তেন ছেলোদের সঙ্গে করিয়া আসি-রাছেন।

ঠাকুর কিশোরীকে বলিলেন, ‘এদের সব-দেখিয়ে এস তো,—ঠাকুরবাড়ী।’

ঠাকুর কাপ্তেনের সহিত কথা কহিতে-ছেন।

মাষ্টার, বিজ ইত্যাদি ভক্তেরা যেরূপে বলিয়া আছেন। সমসয়ার মাষ্টারও আসি-রাছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট পাটটাতে উত্তরাত্ত হইয়া বসিয়াছেন। তিনি কাপ্তেনকে ছোট পাটটার একপার্শ্বে তাঁহার সম্মুখে বসিতে বলিলেন।

[পাকা-আসি বা দাস-আসি]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি) তোমার কথা এদের বলিছাশু; কত ভক্তি, কত পূজা, কত রকম আরাতি।

কাপ্তেন (সমজ্ঞভাবে) আমি কি পূজা—আরাতি কোরবো? আমি কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ। বে 'আমি' কামিনী-কাকনে আসুক, সেই আমিতেই দোষ। আমি দীঘরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আর বালকের আমি;—বালক যেমন কোন ভয়ের বশ নয়; এই ঝগড়া করছে, আবার ভাব; এই খেলা-সর করলে, কত বর করে, আবার তৎকথাং ভেঙ্গে ফেললে।

"দাস আমি—বালকের আমি, এতে কোন দোষ নাই। এ আমি আমার মধ্যে নয়; যেমন মিছরি মিষ্টের মধ্যে নয়। অল্প মিষ্টে অল্প খেয়ে; কিন্তু মিছরিতে খরং অন্ননাশ হয়; আর যেমন ঔঁকার শব্দের মধ্যে নয়।

[গোপীদের 'আমি']

"এই অহং দিয়ে সচ্চিদানন্দকে ভাল-বাগা বার। অহং তো যাবে না;—তাই 'দাস আমি' 'ভক্তের আমি'; তা না হলে মাছব কি নিয়ে থাকে।

"গোপীদের কি ভালবাগা! (কাপ্তেনের প্রতি) তুমি গোপীদের কথা কিছু বল। ছুঁই অত ভাগবত-পড়ো।

কাপ্তেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, —কোন ঐশ্বর্য নাই—তখনও গোপীরা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসে ছিলেন। তাই কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমি তাদের ঋণ কেমন করে তত্ব?—বে গোপীরা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছে,—বেহ-মন-চিত্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বিস্তার হইতেছেন। 'গোবিন্দ!' 'গুণাবিন্দ!' 'গোবিন্দ'! এই কথা বলিতে বলিতে আবিষ্ট হইতেছেন। আর বাহুপূত।

কাপ্তেন সবিস্ময়ে বলিতেছেন, 'ধস্ত!' 'ধস্ত!'

কাপ্তেন ও সমবেত ভক্তগণ ঠাকুরের এই অদ্ভুত প্রেমাভঙ্গ্য দেখিতেছেন। বতকণ্ণ না তিনি প্রকৃতিহ হন, ততকণ্ণ তাঁহার চূপ করিয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাপ্তেনের প্রতি) তার পর? কাপ্তেন। তিনি যোগীদিগের অগম্য— 'যোগিত্তিরগম্যম্'—আপনার জ্ঞান যোগীদের অগম্য; কিন্তু গোপীদিগের গম্য। যোগীরা কত বৎসর যোগ করে ঠাকে পায় নাই, কিন্তু গোপীরা অনায়াসে তাঁকে পেয়েছে!

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্তে)। গোপীদের কাছে ঝাওয়া, খেলা, কাঁদা, আশ্বাস করা, এ সব হয়েছে।

[শ্রীযুক্ত বক্রিম ও শ্রীকৃষ্ণচরিত্র ও অবতারবাদ।]

একজন ভক্ত বলিলেন 'শ্রীযুক্ত বক্রিম কৃষ্ণ-চরিত্র লিখেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ। বক্রিম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না।

কাপ্তেন। বুকি শীলা মানে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার বলে নাকি কামাদি—এ সব দরকার!

দমদমার মাষ্টার। নবলীঘনে বক্রিম লিখেছেন—খশ্বের প্রয়োজন-এই বে, ওতে শারীরিক, মানসিক, প্রকৃতি সব বৃদ্ধির ক্ষুদ্রি হয়।

কাপ্তেন। 'কামাদি দরকার',—তবে শীলা মানে না? জীবন মাছব করে বৃন্দাবনে

এসেছিলেন, তা মানেন না? রাখাক্ক-
লীলা মানেন না।

[পূর্ণব্রহ্মের অবতার বা নরলীলা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্ত্রে) ও সব কথা বে
থবরের কাগজে নাই; কেমন করে মানা
যায়।

“এক জন তার বন্ধুকে এসে বলে “ওহে!
কাল ও পাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় দেখে-
লাম, সে বাড়ীটা ছড়মুড় করে পড়ে গেল।”
বন্ধু বলে, “দাঁড়াও হে, একবার থবরের কাগজ
খানা দেখি।” এখন থবরের কাগজে বাড়ী
ছড়মুড় করে পড়ার কথা কিছুই নাই।
তখন সে ব্যক্তি বলে, ‘কই থবরের কাগজে
ত কিছুই নাই।—ওসব কাজের কথা নয়।’
সে লোকটা বলে—আমি বে দেখে এলাম?
ও বলে “তা হোক, যে কালে থবরের
কাগজে নাই, সেকালে ও কথা বিশ্বাস
করুন না।” জৈবর মাহুব হয়ে লীলা করেন,
একথা কেমন করে বিশ্বাস করবে? একথা
যে ওদের ইংরাজি লেখা পড়ার ভিত্তর
নাই।

(কাণ্ডেনের প্রতি) পূর্ণ অবতার বোঝানো
বড় শক্ত; কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর
অনন্ত আস্য।

কাণ্ডেন। ‘কৃষ্ণস্ত ভগবান্ অম্বা।’
বলবার সময় পূর্ণ ও অংশ বলতে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পূর্ণ ও অংশ;—যেমন
অরি ও তার ফুলিদ। অবতার ক্রমের
জন্ম;—আনীর জন্ম নয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে
আছে—হে রাম! তুমিই ব্যাপ্য, তুমিই
ব্যাপক, ‘বাচ্য বাচক ভেদেই যমের পর-
মেবর।’

কাণ্ডেন। “বাচ্য-বাচক” অর্থাৎ ব্যাপ্য-
ব্যাপক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ‘ব্যাপক’ অর্থাৎ যেমন
ছোট একটা রূপ; যেমন অবতার মাহুবরূপ
হয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সকলে বসিয়া আছেন। ঠাকুর কাণ্ডেন
ও ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।
এমন সময়ে ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত জরগোপাল
সেন ও জৈলোক্য (সাম্যাল) আসিয়া
শ্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।
ঠাকুর সহাস্ত্রে জৈলোক্যের দিকে তাকাইয়া
কথা কহিতেছেন।

[অহঙ্কারই বিনাশের কারণ ও জৈবর-
লাভের বিষয়।]

শ্রীরামকৃষ্ণ (কাণ্ডেনাদি ভক্তদের প্রতি)
অহঙ্কার আছে বলে জৈবর দর্শন হয় না।
জৈবরের বাড়ীর দরজার সামনে এই
অহঙ্কাররূপ গাছের গুড়ি পড়ে আছে।
এই গুড়ি উন্নত্বন না করলে তাঁর ঘরে
প্রবেশ করা যায় না।

“একজন ভূতসিক হয়েছিল। সিন্ধু হ’য়ে
বাই ডেকেছে, অমনি ভূতটা এসেছে। এসে
বলে “কি কাজ করতে হবে বল। কাজ
বাই দিতে পারবে না, অমনি তোমার বাড়
ভালব।” সে ব্যক্তি—বত কাজ দরকার
ছিল, সব ক্রমে ক্রমে করিয়ে নিল। তার
পর আর কাজ পার না; ভূতটা বললে, “এই
বার তোমার বাড় ভালি।” সে বললে,
“একটু টুনবেন, আমি আসছি।” এই বলে
ওকলে গিয়ে বললে, “সহাস্ত্রে
তারী বিগনে পড়েছি, এই এই বিগনে।”

এখন কি করি ?” শুধু তখন বললেন, “তুই এক কর্ন কর, এই চুলগাছটা সোজা করিতে বল।” ছুটী দিন রাত ঐ করিতে লাগিল। চুল কি সোজা হয় ? যেমন বাঁকা, তেমনি রইল।

“অহংকার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের রূপা হয় না।

“কর্ণের বাড়ীতে যদি একজনকে তাঁড়ারি করা যায়, বতকর্ণ তাঁড়ারে সে থাকে, ততকর্ণ কর্তী আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা করে তাঁড়ার ছেড়ে চলে যায়, তখনই কর্তী যত্নের চাবি দেয় ও নিজে তাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে।

“নাবাশকেরই অঙ্গী হয়। ছেলেমানুষ— নিজে বিশ্ব রক্ষা করতে পারে না;— তখন রাজা তার ল’ন।

“বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। লক্ষ্মী পদ-সেবা করছিলেন, বলেন, “ঠাকুর কোথা যাও ?” নারায়ণ বলেন, “আমার একটা ভক্ত বড় বিপদে পড়েছে; তাই তাকে রক্ষা করতে বাচ্ছি।” এই বলে নারায়ণ বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরলেন। লক্ষ্মী বলেন, “ঠাকুর এত শীঘ্র ফিরলে যে ?” নারায়ণ হেসে বলেন, “ভক্তটা গ্রেমে বিহ্বল হতে পথে চলে বাচ্ছিল; খোপাটা কাপড় শুকোতে দিচ্ছিল, ভক্তটা মাড়িয়ে বাচ্ছিল; তাই বেখে খোপাটা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে বাচ্ছিল। তাই আমি তাকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।” লক্ষ্মী অইতের বলেন, “কিহর এলেন কেন ?” নারায়ণ হাঠাতে হারিয়ে বলেন, “সে ভক্তটা নিজে খোপা-

দের মারবার ভক্ত ইট তুলেছে, বেংলায়।” (সকলের হাস্য)।

[অহংকার ও কেশব সেন।]

“কেশব সেনকে বলেছিলাম, “অহং ত্যাগ করতে হবে”।

তাতে কেশব সেন বলে—“তা হলে মহাশয়, দল কেমন করে থাকে ?”

“আমি বললাম, ‘তোমার একি বুদ্ধি!— তুমি ‘কাঁচা আমি’ ত্যাগ কর,—যে আমিতে কামিনী-কাকনে আসক্ত করে; কিন্তু পাকা-আমি, দাস-আমি, ভক্তের আমি, ত্যাগ করতে বল্ছি না। আমি ঈশ্বরের দাস; আমি ঈশ্বরের সন্তান,—এর নাম পাকা আমি। এতে কোনও দোষ নাই।

নৈলোক্য। অহংকার যাওয়া বড় শক্ত। লোকে মনে করে, বুকি গেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ। পাছে অহংকার হয় বলে শৌরী ‘আমি’ বলত না;—বলত ‘ইনি’। আমিও তার দেখাদেখি বলতাম ‘ইনি’; ‘আমি খেরেছি’ না বলে, বলতাম ‘ইনি খেরেছেন।’ সেজো বাবু তাই দেখে এক দিন বলে, “সে কি বাবা, তুমি ওসব কেন বলবে ? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহংকার আছে। তোমার ত আমি অহংকার নাই; তোমার ওসব বলার কিছু দরকার নাই।”

“কেশবকে বললাম, “আমি তো যাযে না;— অতএব দাস ভাবে থাক;—যেমন দাস।”

“প্রহ্লাদ হই তাবে থাকতেন। কখনও খোষ করতেন—‘তুমিই আমি’ ‘আমিই তুমি;—‘সোহবো’। আবার বধন অহং-বুদ্ধি আস্ত, তখন দেখতেন, ‘আমি দাস, তুমি প্রভু।

“একবার পাকা “সোহহং” হলে পর, তাঁর পর দান-ভাবে থাকি;—যেমন আমি দাস।

[ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ]

(কাপ্তেনের প্রতি) “ব্রহ্মজ্ঞান হলে কতকগুলি লক্ষণে বুঝা যায়। শ্রীমৎগাগবতে জ্ঞানীর ১টা অবস্থার কথা আছে — ১—বালকবৎ, ২—জড়বৎ, ৩—উন্মাদবৎ ৪—পিণ্ডাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অনস্থা হয়। আবার কখনও পাগলের মতন বাসহার করে।

“কখনও জড়ের স্থায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম করিতে পারে না, কর্মভাগ হয়। তবে যদি বল জনকাদি কর্ম করেছিলেন; তা কি জান, তখনকার লোক কর্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিত হ’ত। আর তখনকার লোকও খুণ বিশ্বাসী ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মভ্যাগের কথা বলিতেছেন; আবার যাদের মধ্যে আসক্তি আছে, তাঁদের অনাসক্ত হতে চেষ্টা করিতে বলছেন; অনাসক্ত হ’লে কর্ম করিতে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। জ্ঞান হ’লে বেশী কর্ম করিতে পারে না।

জৈলোক্য। কেন? পাণ্ডহারি বাবা এমন বোগী পুরুষ, কিন্তু লোকদের স্বগড়া-বিবাদ মিটিয়ে দেন,—এমন কি, মোকদ্দম নিষ্পত্তি করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, হাঁ, তা বটে। দুর্গাচরণ ভক্তিশর এতো মাতাল, ২৪ ঘণ্টা মদ খেয়ে ধীকৃত, কিন্তু কালের বেলা ঠিক,—চিকিৎসা করবার সময় ফোনও ফুল হবে না।

“ভক্তি লাভ করে কর্ম করলে দোষ নাই। কিন্তু নড় কঠিন খুণ ভগ্নতা চাই।

[ভক্তের আশ্রয়]

ঈশ্বরই সব করছেন আমরা বহুব্রহ্মণ। কাগী-বরের সামনে শিখরা বল’ল, ‘ঈশ্বর দয়াময়’। আমি বললাম, দয়াকারীদের উপর?

শিখরা বললে ‘কেন মহারাজ? আশ্রয় দেয় সকলের উপর।

আমি বললাম, “আমরা সকলে তাঁর ছেলে; ছেলের উপর আশ্রয় দয়াকার? তিনি ছেলেদের দেখছেন;—তা তিনি দেখবেন না তো বাসুঁন পাড়ার লোককে এসে দেখবে?”

(কাপ্তেনের প্রতি)। “আজ্ঞা, যারা ‘দয়াময়’ বলে, তারা এটা ভাবে না, যে আমরা কি পরের ছেলে?

কাপ্তেন। আজ্ঞা হাঁ, এত আপনার বলে বোধ থাকে না।

[ভক্ত ও পূজাদি। ঈশ্বর ভক্তবৎসল]

শ্রীরামকৃষ্ণ। তবে কি ‘দয়াময়’ বলে না? ব্রহ্মণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ বলবো তাঁকে লাভ হলে তবে ঠিক আপনার বাপ, কি আপনার মা, বলে বোধ হয়। ব্রহ্মণ না ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ বোধ হয়—আমরা খুণ-দুরের লোক,—পরের ছেলে।

“সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই বলতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একদিন বল’ছিল ‘ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত। তিনি কি আর সন্দেশ কলা—খাচ্ছেন? না তিনি গান শুনেবেন? ওসব মনের ভুল।’

“নরেন্দ্র অমনি মশ হাত নেমে গেল। তখন আমি হাজরাকে বললাম, ‘হুঁসি কি

পাজী! ওদের অমন কথা বললে ওরা দাঁড়ার কোথা? ভক্তি গেলে মানুষ কি নিরে থাকে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য, তবুও তিনি ভক্তাধীন!

“বড় মানুষের দ্বারবান একদিন এসে বাবুর সভার একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কি একটি জিনিষ আছে, কাপড়ে ঢাকা। অতি সঙ্কোচভাবে আছে। বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, “কি দরবান, হাতে কি আছে?” দরবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার করে বাবুর সামনে রাখলে,—উচ্চা বাবু ওটি খাবেন। বাবু দ্বারবানের ভক্তিভাব দেখে আতাটি খুব আদর করে নিলেন, আর বললেন, “আহা! এটি বেশ আতা, তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট করে আনলে?”

তিনি ভক্তাধীন। দুর্বোধন অত বহু দেখালেন, আর বললেন, এখানে খাওয়া দাওয়া করুন; ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিহ্বরের কুটীরে গেলেন! তিনি ভক্ত-বৎসল;—বিহ্বরের শাকার তিনি সুখার স্তায় খেলেন।

“পূর্ণ জ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ—পিশাচ-বৎ। খাওয়া দাওয়ার বিচার নাই—সুচি-অসুচির বিচার নাই।

“পূর্ণজ্ঞানী আর পূর্ণমূর্খ, দুজনেরই বাহিরের লক্ষণ এক রকম! পূর্ণজ্ঞানী হস্ত পক্ষ্মারানে মন্ত্র পাঠ করলে না; ঠাকুরপূজা করার সময় ফুলগুলি হয় ত এক সঙ্গে ঠাকুরের চরণে দ্বিগুণে চলে এল, কোনও মন্ত্র হয় নাই।

[কর্মী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

“ততদিন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা

থাকে, ততদিন কর্তব্য ভাগ করিতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্তব্য।

“একটি পাখী জাহাজের মাস্তলে মস্ত-মনস্ক বসে ছিল। জাহাজ পক্ষ্মার ভিতরে ছিল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীটির চটকা ভাঙলো, সে দেখলে চতুর্দিকে কূল কিনারা নাই। তখন ড্যাঙার ফিরে বাবার জন্ত উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল, তবু কূল-কিনারা দেখতে পেলো না। তখন কি করে—ফিরে এসে আবার মাস্তলে এসে বসল।

“অনেক ক্ষণ পরে পাখীটা আবার উড়ে গেল;—দ্রবার পূর্ব দিকে গেল। সে দিকে কিছুই দেখতে পেলো না; চারি দিকে কেবল অকূল পাথর। তখন ভারী পশ্চিম-শ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মাস্তলের উপর বসল। অনেক ক্ষণ জিরিয়ে এইবার দক্ষিণ দিকে; এইরূপে আবার পশ্চিম দিকে গেল। যখন দেখলে কোথাও কূলকিনারা নাই, তখন সেই যে মাস্তলের উপর বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোন বাস্তব-ভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিত হয়েছিল, আর কোনও চেষ্টাও নাই।

কাণ্ডেন। আহা কেরা দুষ্টান্ত!

[ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও দৈবরসাত ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। সংসারী শোকেরা বখন সুখের জন্ত চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, আর পায় না, আর শেবে পরিশ্রান্ত হয়; বখন কামিনী-কাকনে আসক্ত হয়ে কেরল-দুঃখ পায়; তখনই বৈরাগ্য আসে, ভাগ

আসে। অনেকের ভোগ না করলে ভাগ হয় না। কুটীচক আর বহুদক। সাধকদের ভিতরও কেউ কেউ অনেক তীর্থে ঘোরে; এক জায়গার স্থির হয়ে বসতে পারে না; অনেক তীর্থের উদক—কিনা জল খায়। যখন ঘুরে ঘুরে ক্ষোভ মিটে যায়, তখন এক জায়গায় কুটীর বেঁধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টামুদ্র হয়ে ভগবানকে চিন্তা করে।

“কিন্তু কি ভোগ সংসারে ক’বে? কামিনী-কাঞ্চন ভোগ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ! এই আছে, এই নাই!

“প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগে আছে, সূর্য্য দেখা যায় না। হুংখের ভাগই বেশী। আর কামিনী-কাঞ্চনমেঘ সূর্য্যকে দেখতে দেয় না।

“কেউ কেউ আমাদের লিজ্জাসা করে ‘মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার কর’লেন? আমাদের কি কোনও উপায় নাই?

“মাসি বলি, উপায় থাকবে না কেন? ঠা’র শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হ’রে পার্থনা কর, বাতে অহুকুল হাওরা বর,— বাতে শুভবোগ ঘটে। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন।

“একজনের ছেলেটা বার বার হরেছিল। সে ব্যক্তি ব্যাকুল হয়ে এর কাছে ওর কাছে উপায় লিজ্জাসা করে বেড়াচ্ছে। একজন বলে “তুমি যদি এইটা বোগাড় করতে পার তো ভাল হয়,—বাতী নক্ষত্রের জল পড়বে মড়ার মাথার খুলির উপর। সেই জল একটা ব্যাঙ খেতে বাবে। সেই ব্যাঙকে একটা সাপে ভাড়া ক’বে।

ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়বে, আর ব্যাঙটা পালিয়ে যাবে। সেই বিষ জল একটু নিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে।

“লোকটা অমানি ব্যাকুল হয়ে সেই ঔষধ খুঁজতে বাতী নক্ষত্রে বেরুল। এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটা মড়ার খুলি, তাতে বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা ক’রে বলতে লাগল, দোহাই ঠাকুর। এইবার আর দুইটা জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ ও সাপ! তার যেমন ব্যাকুলতা, তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটা সাপ ব্যাঙকে ভাড়া ক’রে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল।

“ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি শুনবেনই শুনবেন,— সব সুযোগ ক’রে দেখেন।

কাশেন। কেরা বৃষ্টান্ত!

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ তিনি সুযোগ ক’রে দেন। হয় ত,—বিষে হ’ল না, সব মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে। হয় ত তারেরা রোজগার ক’রতে লাগল বা একটা ছেলে মানুষ হ’রে গেল; তা হলে ভোমার আর সংসার দেখতে হল না। তখন তুমি অন্যরূপে বোলমানা মন ঈশ্বরকে দিতে পার।

“তবে কামিনীকাঞ্চন ভোগ না হ’লে হবে না। ভোগ হলে, তবে অজ্ঞান, অবিজ্ঞা নাশ হয়। আতঙ্গ কাঁচের উপর স্বর্ষোর কিরণ পড়লে কত দিমিগ পুড়ে

বার। কিন্তু ঘরের ভিতর ছায়া, সেখানে
আত্মস কাঁচ নিয়ে গেলে ধী হইয়া না।
যদি ভাগ্য ক'রে বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়।
[ঈশ্বরলাভের পর সংসার—জনকাদির ।]

"তবে জ্ঞান লাভের পর কেউ কেউ
সংসারে থাকে। তারা ঘর-বার দুইই দেখতে
পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর
পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিভা, অ'নিত্য,
এ সব সেই আলোতে দেখতে পায়।

"যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না অগত
সংসারে আছে, তারা যেন মাতীর ঘরের
ভিতর বাস করে। স্ত্রী আলোতে শুধু
ঘরের ভিতরই দেখতে পায়। কিন্তু যারা
জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে,
তার পর সংসারে আছে, তারা যেন সারসীর
ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও
দেখতে পায়, ঘরের বাহিরের জিনিসও
দেখতে পায়। জ্ঞানসুখের আলো ঘরের
ভিতরে খুব প্রবেশ করে। সে ব্যক্তি ঘরের
ভিতরের জিনিস খুব স্পষ্টরূপে দেখতে
পায়,—কোনটী ভাল, কোনটী মন্দ, কোনটী
স্থিত্য, কোনটী অনিত্য।

"ঈশ্বরই কর্তা আর সব তাঁর বস্তুস্বরূপ।
[ব্রাহ্মসমাজ ও গুরুগিরি ।]

"তাই জানীরও অহংকার করবার যো
নাই। বাহির সব যে লিখেছিল, তার অহংকার
হয়েছিল। শিবের বাঁড় বখন দাঁত বার
করে দেখালে, তখন তাঁর অহংকার চূর্ণ
হয়ে গেল। তেঁলে এক একটী দাঁত এক
এক মরা। তার মানে কি জান? এ সব
মর অধ্যাতিকাল ছিল। তুমি কেবল
জ্ঞান করলে।

"গুরুগিরি করা ভাল নয়। ঈশ্বরের
আদেশ না পেলে আচার্য হওয়া যায় না।

"সে নিজে যথেষ্ট 'আমি গুরু' সে হীনবুদ্ধি।
ধাঁড়িপান্না দেখে নাই? হালুকা দিক্কা উচু
হয়।

"যে ব্যক্তি নিজে উচু হয়, সে হালুকা।
সকলেই গুরু হতে যায়।—শিষ্য পাওয়া
যায় না।

ত্রৈলোক্য ছোট খাটটার উত্তর ধারে
সেখানে বসিয়াছেন। ত্রৈলোক্য গান
গাইবেন। ঠাকুর ঈশ্বরমহাক্ষ বলিতেছেন,
'আহা! তোমার কি গান!' ত্রৈলোক্য
তানপূরা লইয়া গান করিতেছেন:—

গান ।

তুকে হামনে মিলুকা লাগারি।
যো কুচ ছার সব তুঁহি ছার ॥

* (দ্বিতীয় ভাগ, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

গান ।

তুমি সর্বত্র আমার (হে নাথ) প্রাণাধার
সার্বধার ।

নাহি তোমা বিনে কেহ জিজ্ঞাসনে আপনার
ধন্যধার ॥

তুমি ইহকাল, তুমি পরিত্রাণ, তুমি পরকাল,
তুমি সর্বধারি ।

তুমি হে উপার, তুমি হে উদ্ভেদ,
তুমি মষ্টা—পাতা, তুমি হে উপাত্ত ।

বগুদাতা পিতা, দেহময়ী মাতা,
তবাবধে কর্ণধার ॥

ঠাকুর ঈশ্বরমহাক্ষ গান শুনিয়া তাহে
বিতোর হইতেছেন। গান বলিতেছেন,
'আহা! তুমিই সব। আহা! পায়।

[[ল সযাও হইল। হুটী ব্যতির।

নিরাছে। ঠাকুর মুখ দুইতে ঝাউতলার দিকে বাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার।

ঠাকুর হানিতে হানিতে গল্প করিতে করিতে বাইতেছেন। হঠাৎ বলিলেন 'কই তোমরা খেলে না? আর ওরা খেলে না?' ঠাকুর ভক্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন।

[নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ।]

আজ ঠাকুরের সন্ধ্যার পর কলিকাতার বাইবার কথা আছে। ঝাউতলা থেকে ফিরিবার সময় মাষ্টারকে বলিতেছেন, 'তাই ত কার গাড়ীতে বাই?'

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঠাকুরের ঘরে প্রদীপ জ্বালা হইল ও মুন্য দেওয়া হইতেছে। ঠাকুর-বাড়ীতে সব স্থানে ফরাস আলো জ্বালিয়া দিল। রৌমনাচৌকি বাজিতেছে। এবার ষাদশ শিব-মান্দরে, বিষ্ণুঘরে ও কালীঘরে আরতি হইবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটীতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম কীৰ্ত্তনান্তর মা'র ধ্যান করিতেছেন।

আরতি হইয়া গেল। কিরংকণ পরে ঠাকুর ঘরে এদিক্ ওদিক্ পারচারি করিতেছেন ও ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে নরেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে শরৎ ও আরও দুই একটি ছোকরা। তাঁহার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের মেহ যেন উৎলাইয়া পড়িল। বেগন কঁচি ছেলেকে আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখে হাত দিয়া আদর করিতে লাগিলেন ও মেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'ভূমি এসেছ।'

কিরংকণ পূর্বে কলিকাতার বাইবার জন্য মাষ্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন।

ঠাকুর ঘরের মধ্যে পাশ্চাত্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর কয়টা ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া পূর্বাভ হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিতেছেন,—'নরেন্দ্র এসেছে, আর বাওরা বার? লোক দিগে নরেন্দ্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলান; আর বাওরা বার? কি বল?

মাষ্টার। যে আজ্ঞা, আজ্ঞা তবে থাক।

শ্রীরামকৃষ্ণ। আচ্ছা কাল বাব, হম নৌকাম, নর পাড়ীতে। (অস্বস্ত ভক্তদের উক্তি) 'তোমরা তবে এস আজ্ঞা;—রাত হল।' ভক্তেরা সকলে একে একে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

সেবা-গীতা ।

["ব্রহ্মজারিণ্" (ইংরাজী) মাসিক পত্র হইতে পদ্যানুবাদিত ।]

- ১। শুন দীন-নিবেদন ভারত-সন্তান !
এ তবে সেবাই শুদ্ধ সাধু অহুতান ।
- ২। পরসেবা করহে সাধন ।
সেবাথেই জীবন-ধারণ ॥
- ৩। পরসেবা করহে সাধন ।
সেবাতেই বিশ্বের স্থাপন ॥
- ৪। পরসেবা করহে সিন্ত ।
আত্মসেবা পরসেবা-গত ॥
- ৫। পরসেবাধারণ রহ নিরন্তর ।
প্রতি বস্ত সেবানীল বিধে পরম্পর ॥

- ৬। পরসেবা কর সম্পাদন।
তোমাগেরও পরে সেবি রক্ষিছে জীবন ॥
- ৭। পরসেবা সাধ অনিবার।
সেবাই যে স্বভাব তোমাগ ॥
- ৮। পরসেবা প্রত্যেকেরি কর্তব্য নিশ্চয়।
সেবাক্ষেত্রে কেহ কারে! প্রভু কভু নয় ॥
- ৯। পরসেবা কর অনিবার।
মুঠ জীবে সেবে যেবা,
শ্রষ্টারে সে করে সেবা;
সেবাতীত স্বরূপ তাঁহার ॥
- ১০। দেখে ঐ আকাশে চরের, রবি-শশী-তারি—
বিশ্বের সেবার সদা ঘুরিতেছে তারি ॥
- ১১। নিম্নে চেয়ে দেখে এ ধরায়।—
পশু-পক্ষী-তরু-লতা,
গিরি-সিঙ্ঘ-গিরিমুতা,
সবে রত জগৎ-সেবার ॥
- ১২। পরসেবা কর নিরন্তরে।—
বহুি দহে, বায়ু বহে,
রবি রৌদ্র দিতে রহে,
নদী ছোটে, বৃষ্টি-হিম বরে।
সবাই জগৎ-সেবা করে ॥
- ১৩। কি অর্থ তরুণ,
কি ক্ষুদ্র তুলসীগাছ,
সকলেই অবিরত—
জগৎ-সেবার রত;
অর্থ-তুলসী, তুমি যার তুল্য হও,
যথাসাধ্য পরসেবা-ব্রতরত রও ॥
- ১৪। কুটীরে বা প্রাসাদেই রও,
পরসেবা-ব্রত-রত হও ॥
- ১৫। পরসেবা ধর, সেবা তুচ্ছিওনা কাজে।
উচ্চ-তুচ্ছ সেবাকার্য্য যা তোমাগে সাজে ॥
- ১৬। পরসেবা কর, ভেবনা ভাই!
তোমাগ সেবার নিয়োগ নাই;
প্রত্যেকেরি এই পৃথিবী-মাঝ,
আছেই কিঞ্চিৎ সেবার কাজ ॥
- ১৭। পরসেবা করিবে নিশ্চয়;
ভেবনা সে যোগ্য তুমি নয়।
নেহাৎ কিছুনা কার্য্য পাও,
পথ হতে কাঁটাটি মরাও ॥
- ১৮। পরসেবা কর অহরহ;
ভেবনা সক্ষম তুমি নহ।
নেহাৎ ভাবিলে কার্য্যভাণ,
কৌশল হাতে রাখা কর সাফ ॥
- ১৯। সেবা কর করি দান,
যদি হও বিত্তবান।
সেবা কর দিয়ে জ্ঞান,
যদি হও জ্ঞানবান।
সেব দিয়ে সদৌষধি,
চিকিৎসক হও যদি।
না হও তহপযোগী,
শুশ্রূষার সেব রোগী ॥
- ২০। পরসেবা কর;
আর কিছু না পার,
মিষ্ট বাক্যে সবে
ভুট কর ভবে ॥
- ২১। পরসেবা কর;
আর কিছু না পার,
সাধু-চিত্তা সহ,
বিশ্ব-হিতে রহ ॥
- ২২। পরসেবা-রত থাক,
প্রতিদান চেয়োনা ক।
পরসেবা-রত থাকি,
আত্মতৃপ্তি পাওনা কি ?
- ২৩। পরসেবা কর প্রতিক্ষেপে।—

- উচ্চতম প্রভু যিনি,
সেবেন সতত তিনি—
নীচাদপি নীচতম জনে ॥
- ২৪। পরসেবা কর সর্বদাই।—
ধরা-নরাধিপ যারা,
সর্বোচ্চ সেবক তাঁরা—
যীশ্ব স্মীর সাত্বাদ্যো সবাই ॥
- ২৫। পরসেবা কর নিরন্তর।—
ভবে কার প্রভু কেবা ?
একে অস্ত্রে করে সেবা ;
সবাই সেবক পরম্পর ॥
- ২৬। পরসেবা কর মন দিয়া।—
সেবার্থে কেহই করে
অগ্রে আদেশিতে নায়ে,
পরসেবা নিজে না সাধিয়া ॥
- ২৭। পরসেবা কর সম্পাদন।—
সেবা-ধর্ম বিনা হার !
কেহ কভু নাহি পায়
সর্গীর সুখের আবাদন ॥
- ২৮। পরসেবা কর, সেবা অবনীতে অত্র—
স্বর্গদ্বার-প্রবেশের প্রবেশিকা-পত্র ॥
- ২৯। পরসেবা কর সবে তবে।
পরসেবা-রত জন
লভে আশ্ব প্রসারণ,
এক হতে সর্বভূতে
সম অমৃতবে ॥
- ৩০। পরসেবা কর সম্পাদন ;—
সেবা-ধর্ম সর্কার্থসাধন।
অনৈক্যেতে ঐক্য জানে,
শান্তি ইয়ে শান্তি দানে,
বিবাদে প্রসাদ জানে,
দৈন্ত্রে জানে ধন ॥
- ৩১। পরসেবা কর অমুরাগে।—
সেবার সম্মুখ হতে হিংসা-শেষ ভাগে ॥
- ৩২। প্রভু হতে ইচ্ছা ধর,
সেবকের সেবা কর ॥
- ৩৩। আচার্য্যত্ব ইচ্ছা কর,
শিষ্যের সেবন ধর ॥
- ৩৪। সুপতিত্ব চাহ যেন,
প্রেমে কর পত্নীসেবা ॥
- ৩৫। সুপিতৃত্ব চাহ যেন,
স্নেহে কর পুত্রসেবা ॥
- ৩৬। পরসেবা নিত্য নিকাম থাক।
লাগারোনা তার কামের দাগ ॥
- ৩৭। ভ্রাতৃত্বাবে সেবা কর সবার।
প্রভু-ভৃত্য-ভাব ভেবনা তার ॥
- ৩৮। পরসেবা কর সবে।
পরেশ-পিতৃত্ব, নরের ভ্রাতৃত্ব—
সেবাতেই সিদ্ধ হবে ॥
- ৩৯। পরসেবা-রসে রম।—
সেবা-রাজ্যে তুচ্ছ
হয় সর্ব-উচ্চ ;
উচ্চ হয় নীচতম ॥
- ৪০। পরসেবা সদা করহে সবে।—
বিহঙ্গ-পতঙ্গ—
করে সেবা-সঙ্গ,
তঙ্গ-লতা তার ফল প্রসবে ॥
- ৪১। পরসেবা কর, জাননাকি হার !
কাদা-জল আদি সাধীর সেবার,
কলক-কণিকা হীমকুশ পায় ?
- ৪২। পরসেবা কর, জাননাকি হার !
জল-বালি আদি সাধীর সেবার,
অম্নে নীলমণি বর্দন-কণার ?

- ৪০। পরসেবা কর, জ্ঞাননাকি হার।
কামা-কাল আদি সাথীর সেবায়,
বালুবিন্দু রত্ন-উপলব্ধ পায় ?*
- ৪৪। পরসেবা কর গবে।—
পরসেবা-বলে,
আত্মপ্রতি-ফলে,
সাপুত্রা-স্বদীপ্ত হবে ॥
- ৪৫। পরসেবা কর সদা।—
সেবা-ধর্মে কেন
সেনো না কখনো
জাতি-কুল-বর্ণ-ক্ষমা ॥
- ৪৬। পরসেবা কর গবে সদা।
সেবাধর্ম বরাভঙ্গদাতা ॥
- ৪৭। জীবন সার্থক কর পরসেবা করি।
পরসেবা-পরিতৃপ্ত পরাংগর হরি ॥

- ৩। জানহে আত্মাকে আপনার,—
অস্ব-মুহূ নাহিক ইহার।
অমিতে না পোড়ে উলা,
জলেতে না বোড়ে ।
অন্ধেতে না ফাঁড়ে ইহা,
শুলিতে না ফোঁড়ে ॥
- ৪। আত্মজ্ঞানে আত্মা চিনিয়া লও ;
স্ব-আত্মশাসনে স্বরাট হও।
সম্রাট হও সে সম্রাজ্যে গবে ;
অনন্তে সাহার সীমান্ত হবে ॥
- ৫। আত্মজ্ঞানে চেন আপনার ;
মহাশক্তি পাবে তুমি তামি।
অনশুই হইবে তোমার
স্বারাজ্য-সাম্রাজ্য-অধিকার ॥
- ৬। সিংহ তুমি, জানিও বিশেষ ;
আপনারে ভাবিওনা মেঘ।
অনশুই হইবে তোমার—
স্বারাজ্য-সাম্রাজ্য-অধিকার ॥

স্বারাজ্য-গীতা ।

("ব্রহ্মচারিণ" নামক ইংরাজী সাঙ্গিক-
পত্র হইতে পত্রানুবাদিত ।)

- ১। শুন মম নিবেদন ভারত-গম্ভীর !
ওধু স্বারাজ্যেই তব মুক্তি বর্তমান ॥
- ২। আত্মজ্ঞানে চিনি আত্মা আপনার,
আত্মশাসনের লভ অধিকার ॥

৪১। ৪২। ৪৩। সংখ্যাহ গীতা-স্বত্রের
পরিষ্কার অর্থ-বোধ রসায়ন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব-
বিশেষের আভ্যর্চনা-সাপেক্ষ। ফলে খুল
শিক্ষাটি এইরূপ যে, সেবা-শুণে অধম উত্তম
হয়, তুচ্ছ উচ্চ হয়, নগণ্য মগ্ণ্য হয়। সেবার-
আধায সিদ্ধ হয়, অসম্ভব সম্ভব হয়।

- ৭। সারা-মোহ-মেঘ-মুক্ত হয়ে ভবে,
স্বরাট-সম্রাট হও সগৌরবে ॥
- ৮। দূর কর ইন্দ্রিয়-নিকার ;
অজানতা, ভ্রাস্তসংস্কার ;
হিংসা-বেষ-গোঁড়াগী এড়াও।
স্বারাজ্যে—সাম্রাজ্যে শোভাপাও ॥
- ৯। ভ্রাতৃত্বাবে ভালবেসে সবে,
লভ আত্মশাসন এ ভবে ॥
- ১০। প্রভুশিক্ষাশীলী বেন অল্প জন
না করে তোমাকে প্রভুবস্থাপন।
স্ব-আত্মা স্বায়ত্ত করিয়া লও ;
আপনার প্রভু আশ্বনি হও ॥
- ১১। ক্লীবৎ—কাপুরুষত্ব পরিহারি, তব।
স্বরাট সম্রাট-স্ব স্বারাজ্যে লভ ॥

- ১২। তব আত্মগত নিত্য এ বিশ্ববিরাট,
আত্মজ্ঞানে জেনে হও পরাট্-সম্রাট্ ॥
- ১৩। না হইলে আত্মজ্ঞানোন্নতি,
দীন দাম হন পৃথ্বী পতি ।
ভূগ্য তাঁর আত্মজ্ঞান-বলে—
স্বরাট্-সম্রাট্ পরাতলে ।
- ১৪। আত্মজ্ঞ অতীত র'ন
রাজসভা-রণস্থলে ।
স্বরাট্—সম্রাট্ হন
নিত্য আত্মজ্ঞান-বলে ॥
- ১৫। ঐহিক স্বারাজ্যে ইচ্ছা যদি থাকে,
অপায় স্বারাজ্য উপার্জ্জবে আগে ॥
- ১৬। কারমনোবাক্যে পবিত্র যে জন,
পাবে সে স্বারাজ্যে স্বায়ত্তশাসন ॥

তত্ত্ব-চিন্তা ।

(জীব ভাগ ।)

পূর্বে বলা হইয়াছে যে—সমুদয়ের কার্য আছে, কার্যও আছে, সুতরাং “জীব” অভিমান বা বোধ আছে। ঈশ্বরের প্রাকৃত কার্য নাই, কার্য আছে, জীবাত্মিয়ান নাই, সর্ব-অমুভব আছে। ব্রহ্মের কার্য নাই, কার্যও নাই, সুতরাং জীবাত্মিয়ান এবং সর্ব-অমুভব নাই। তিনি সংসত্তা, স্বাধা হইতে সমস্ত উদয় বা প্রকাশ হইয়াছে, তিনি সাক্ষী-স্বরূপ।

জীবের বিষয় অধিক, আরম্ভ সম।

ঈশ্বরের বিষয় স্বত, আরম্ভও স্বত।

০ ব্রহ্মের বিষয় নাই, সত্তা বলিয়া আরম্ভই সমুদয়।

জীবের বিষয়—বুদ্ধি, মন, ইঞ্জিয়, ও
ভূত, অর্থাৎ বুদ্ধি, মন,
ইঞ্জিয় ও ভূতগণকীয়
সমুদয় বিষয়।

ঈশ্বরের বিষয়—জীব ও জীবের বাহ্যিক
বিষয়।

ব্রহ্মের বিষয় নাই, তিনি বিষয়ী নহেন,
স্বরূপ, সর্ব বিষয়ের সত্ত।

সর্ব বিষয়ের সত্তা বলিয়া তাঁহাকে পূর্ণ
বিষয়ী বলিতে চাও, বলা; কিন্তু এ কল্পনা
মিথ্যা, কারণ তাঁহার অধিকার বোধ নাই।
সতক্ষণ তাঁহাকে অধিকার-বোদ্ধা ভাবিলে,
ততক্ষণ তাঁহাকে ঈশ্বর বলা; আর সতক্ষণ
সেই অধিকার-বোদ্ধা ঈশ্বরকে বিষয়ভোগী
মনে করিলে, ততক্ষণ তাঁহাকে জীব বলা।
অর্থাৎ অনাগত জীবই ঈশ্বর, ভোগশূন্য
অমুভবস্বরূপ ঈশ্বরই ব্রহ্ম।

স্থানে স্থানে বুদ্ধি ও চৈতন্তের উল্লেখ
করা হইয়াছে। ইহারা একাধিক প্রকার
বলিয়া, বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য শুধুরা
বলেন—

(১) বুদ্ধি তিন প্রকার—দেহবুদ্ধি, জীব-
বুদ্ধি, আত্মবুদ্ধি।

(২) চৈতন্ত চারি প্রকার—জীবচৈতন্ত্য,
ঈশ্বরচৈতন্ত্য, কুটস্থচৈতন্ত্য, ব্রহ্মচৈতন্ত্য।

৪। দেহ-বুদ্ধিতে কেবল “তুমি প্রভু”
এই বোধ হয়। জীব-বুদ্ধিতে
“তুমি-আমি” (সখ্যতাব) বোধ
থাকে।

আত্মবুদ্ধিতে কেবল “স্বয়ং” বোধ হয়।

৫। (ক) জীবচৈতন্ত্যে “অলাকাশ”
বোধ।

জীব জলকে দেখিতেছে—জল সম্বন্ধে

তাহার প্রত্যক্ষ বোধ ।

—মেঘ দেখিতেছে না, জলে
তাহার প্রতিবন্দ দেখিতেছে :

মেঘ সম্বন্ধে আনুমানিক বোধ ।

—জল ও মেঘের প্রত্যাংগকে
সে দেখাইতেছে—অর্থাৎ সূর্য্য,
তৎসম্বন্ধে বোধ আনিতেনে
না ।

—জল, মেঘ ও সূর্য্য যে আকাশে
আছে, তৎসম্বন্ধে কোন বোধই
নাই ।

(খ) ঈশ্বর-চৈতন্তে “মেঘাকাশ”
বোধ ।

—জীব মেঘকে দেখিতেছে, তৎ-
সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ বোধ ।

—জীব সূর্য্যকে দেখিতেছে না,
তৎসম্বন্ধে আনুমানিক বোধ ।

—সূর্য্যাধার আকাশ সম্বন্ধে বোধ
আনিতেনে না ; বোধ নাই
তাহা নহে ।

(গ) কুটর চৈতন্তে “ঘটাকাশ”
বোধ ।

—জীব সূর্য্যকে দেখিতেছে, তৎ-
সম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষ বোধ ।

—জীব আকাশকে দেখিতেছে
না, তৎসম্বন্ধে তাহার আনু-
মানিক বোধ ।

(ঘ) ব্রহ্মচৈতন্তে “আকাশ” বোধ ।

—জীব আকাশকে দেখিতেছে,
তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বোধ ।

ভাষা—কল্পনা ।

যে রূপে, যে ভাবে, যে অবস্থায় অহং-

প্রকাশ, তৎসম্বন্ধে গুহ্য ও বাহ্য দুইই থাকে ।

গুহ্য প্রকাশ করিবার একটা উপায় ভাষা ।

গুহ্য উপলব্ধি করিবার একটা উপায় কল্পনা ।

ভাষায় প্রকাশিত গুহ্য বিষয় সাধারণতঃ

বোধগম্য হয় না । কল্পনাশক্তিও সকলের

নাই ; সুতরাং শাস্ত্র বা শাস্ত্র-উল্লিখিত

বিষয় সমুদয় সকলের বুদ্ধির আয়ত্ত নহে ।

দেবতার বিষয় বা পশুর বিষয় (গুহ্য

বিষয় অগত হইবার মনুষ্যের একমাত্র

উপায় কল্পনা । বাহার যেরূপ কল্পনা,

তাহার ধারণাও তদনুযায়িনী । আমরা

দেবতাকে দেবতা বলিয়া কল্পনা করি,

পশুকে পশু বলিয়া কল্পনা করি । পশুরা

আমাদিগকে পশু-বোধ হইতে কি ভাবিয়া

থাকে, তাহা আমরা জানি না, তাই বলিয়া

পশুদিগের মনুষ্য সম্বন্ধে কোন বোধ নাই,

তাহা প্রকৃত নহে । পশু-বোধ আমাদের

নাই, তাই আমরা জানি না—তাহার আন-

দিগকে কি বলিয়া জানে ।

৭। মনুষ্য কল্পনার “ব্রহ্ম” সুতরাং

কল্পনা মাত্র । ব্রহ্ম সম্বন্ধে বাহার যেরূপ

কল্পনা, তাহার ধারণাও তদনুরূপিনী । একের

ধারণার ব্রহ্ম বাহ্য, অপরের ধারণার তাহাই,

তঁহা স্বীকার্য্য নহে । এই হেতু “বুদ্ধিতেব”

নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

৮। কল্পনা অমুত্তব-প্রসূত । এই

অমুত্তব, অমুত্তবস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত সকলেরই

আছে, তবে সদৃশ নহে ।

৯। বোধ অপরোক্ষ—সহজ ; বেধি

পরোক্ষ সহজ নহে—শিক্ষা দ্বারা উপলভ্য ।

অপরোক বোধ সত্য, পরোক বোধ সত্য-
মিথ্যা-মিশ্রিত। সমস্ত জন্মে জন্মে পরোক-
বোধ সংগ্রহ করে—করিতে করিতে তাহার
অপরোক বোধ পরোক-বোধে ডুবিয়া যায়।
শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গুরু-দীক্ষা হইতে যে বোধ
জন্মে, উহাও পরোকবোধ, তবে শাস্ত্রে
কথিত বিষয়-উপলক্ষি ও মন্ত্রনাশন করিলে
অপরোক বোধ আপনা আপনি জন্মিয়া
থাকে। অপরোক বোধ উদয়েই যেন বহি-
মুখ অহং অন্তর্মুখ ধাবমান হয়। তখন
সেই অহং ভাবের চিত্ত্বিক্তিকে “মুক্তি-
আকাজ্জা” কহে।

১০। আত্মজ্ঞ অহংকে যে অর্থে “সৎ-
স্বরূপ” কহিয়াছেন, তাহা এখন সাধারণতঃ
বোধগম্য হয় না, কারণ সাধারণ স্তোভা
পরোক বোধ বশতঃ সত্য কল্পনা বা সত্য
ধারণা করিতে অক্ষম। সেই “সৎ-স্বরূপ”
কথা যার তার মুখে শুনা যায়। মুখ
দেখিয়া বুদ্ধিতে পারা যায়, কোনও ব্যক্তি
উহা প্রকৃত ধারণা করিতে পারে নাই।
“ঈশ্বর” শব্দ অমুরাগের সহিত প্রয়োগ এক,
আর ভরপ্রদর্শন করাইতে বা ভরে বা অমু-
রাগবিহীন হইয়া প্রয়োগ করা এক। “রাম”
শব্দ উচ্চারণ করিয়া সমস্ত প্ৰসন্নতা লাভ
করিত, এখন বিষ্ঠায় পদস্পর্শ হইলে “হা
রাম!” বলিয়া উঠে। একরূপ পরিবর্তনের
হেতু পরোক-বোধে সত্য কল্পনা—সত্য
ধারণা স্থান পায় না, উদয়ও হয় না।*

* “রাম” নামের কল চিত্তপ্রসন্নতা
সর্বত্রই। ষিষ্টাংশ্পর্শনিত অপ্রসন্নতা “হা
রাম!” বাক্যই বিবৃত্ত হয়। সে স্থলেও
“রাম” নামই অচিঁতার চিঁচিব—অপবিজ-
তার প্রারচিত্ত। (১১)

১১। অবস্থা—

জীব চারি প্রকার অবস্থায় থাকতে পারে।

১। জাগ্রত, ২। স্বপ্ন, ৩। সুস্থিৎ,
৪। তুরীয়া।

(১) জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ (অর্থাৎ
কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানোদ্রিয়গণ) জাগ্রত (কর্ম
করিতে প্রস্তুত) থাকে মন সঙ্কনাড়ীতে
বিচরণ করে; সুতরাং স্বপ্ন ঙ্খৎ হুইত ভোগ
হয়। মনের জাজ্ঞা সত সঙ্গণ টঞ্জিয় কার্গা
করিলেও, তাগাতে বুদ্ধির দৃষ্টি থাকে। জাগ-
তিতে তিন অংশ বিকার, উগাতে তামসিক
মোহ। জাগ্রতিতে “আমি” জ্বগুগে থাকেন।

(২) স্বপ্নাবস্থায় “আমি” কঠে
থাকেন। মন স্বপ্ননাড়ীতে নিচরণ করে।
ঐ নাড়ী জ্বদয়ের চত্ব্বিক্তিকে গোলক ধাঁচার
স্তায় বেটন করিয়া আছে। স্বপ্নে হুই অংশ
বিকার। উক্ত নাড়ীতে বিচরণ কাগে
সুখ থাকে না, কেবল ঙ্খৎ বোধ হয় বা
ভোগ হয়। স্বপ্নে সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গণ
কাজ করে না, কেবল মন কাজ করে।

(৩) সুস্থিৎতে এক অংশ বিকার।
সুস্থিৎতে “আমি” জ্বগুগে থাকেন। তখন
মনও কার্গা করে না, বুদ্ধির সহিত আনন্দ-
সর কোবে অরূপের আভাস দর্শন করে।
দর্শনে এত সুখ পার যে, উহার জন্ত প্রত্যহ
লালায়িত হয়। (ভাল নিজা নহিইলে
আমরা ভাল থাকি না)।

৪। সুস্থিৎর অতীত যে অবস্থা, তাহার
নাম তুরীয়া। ইহা নির্লীকান স্বরূপ অবস্থা।
ইহা জাগ্রত-সুস্থিৎবৎ অপূর্ক অবস্থা। এই
অবস্থায় সমাধি পূর্ণ হয়; ইহাতে প্রকৃত
ব্রহ্ম-যোগ হয়।

১২। যুগ—শুকরা বলেন—সং স্বয়ং, স্বরূপ অহংকে জানা আর ব্রহ্মকে জানা একই কথা। “সত্যো” অর্থাৎ যখন সত্য পূর্ণ ছিল—তাহাতে মিন্যা স্পর্শ করে নাই, তখন পূর্ণ চৈতন্য হেতু অহংব্রহ্ম—অর্থাৎ অহংএ আর ব্রহ্মে প্রভেদ নাই—এই ভাব ছিল। তখন ঈশ্বর ও মায়া বা প্রকৃতির প্রয়োজন হয় নাই। দেবতা হন নাই।

১০। কর্মযোগে সেই সত্যো মিন্যা বা ভ্রম স্পর্শ করিল। ধারণা লভ, ক্রমে এক পাদ মিন্যাজ্ঞান উপস্থিত হইলে, মনুষ্য ‘অহংব্রহ্ম’ ভাব ধারণা করিতে পারিল না। এই অবস্থার নাম ত্রেতা; এই সময়েই “ত্রেতা” যুগ। তখন ব্রহ্ম হইতে অহংকে পৃথক করিয়া, ব্রহ্মকে “প্রভু” ভাবিয়া, অহং “দাস” ইতি জ্ঞান আরম্ভ। এই সময় হইতে দুই মার্গ—অর্থাৎ “জ্ঞানমার্গ” এবং “ভক্তিমার্গ” নির্ধারিত হইল। ষাঁহাম। সত্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন, তাঁহার জ্ঞানমার্গী, ষাঁহার ত্রেতাভাবাপন্ন হইলেন, তাঁহার ভক্তিমার্গী হইলেন।

১৪। দুইজনে থাকিলে, আমরা “আমি” ও “তুমি” প্রয়োগ করি। সুতরাং ভক্তেরা প্রভুকে “তুমি” প্রয়োগ আরম্ভ করিল। প্রভু বলিল “আমি তোমার”। জ্ঞানমার্গী বলিল “আমি তুমিই” (অর্থাৎ ভক্তিমার্গীর “তুমি”)। এ দুইটাই একই কথা না হউক, একই কথা নহী। কেন না “আমি তোমার” বলিলে আত্মীয়স্বজনকে “আমি” টা থাকে না; আর “আমি তুমিই” বলিলেও “আমি” টা থাকে না।

১৫। “অহং ব্রহ্ম” বলিতে এখন আমরা

দিগের গা শিহরিয়া উঠে। বহু অবতরণ হেতু অপরোক্ষ জ্ঞান অভাবে আমরা উহা বলিতে ও ধারণা করিতেই অক্ষম হইয়াছি। ষ্মিদিগের মধ্যে কেহ কেহ অন্তঃকরণে “অহংব্রহ্ম” বুঝিতে পারিয়াও, ব্রহ্মকে পৃথক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। একপদ না করিয়া, তাঁহার অগ্রসর হইতে পারেন নাট, ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন। এ টুকুও সংস্কারজ বলিয়া বোধ হয়। জ্ঞান দ্বারা ঐ সংস্কার তিরোহিত হইলে আর পার্থক্য রক্ষা করেন নাই; তখন আবার “অহং-ব্রহ্ম” বাক্যই বলিয়াছেন।

১৬। ত্রেতাভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্য “দ্বাপরে” উপস্থিত হইল; তখন সত্য দুইপাদ, মিন্যা দুইপাদ। তখন ‘অহংব্রহ্ম’ ভাব অধিকতর বিস্তৃত হইয়া, ঈশ্বর সহ নানা স্বরূপের সৃষ্টি হইল, এবং অর্ধাধিকার অসত্যপূর্ণ ও সাধন-শূণ্য হইয়া পড়িল।

১৭। দ্বাপর অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আমরা “কলিতে” উপস্থিত হইলাম। কলিতে ত্রিপাদ মিন্যা, একপাদ মাত্র সত্য। সুতরাং আভিমানিক “আমি” সর্বক্ষণ এবং কদাচ “সেবা, প্রভু বা ব্রহ্ম”। ব্রহ্ম আছেন বা ঈশ্বর আছেন, ইহা জ্ঞান প্রায়ই মনে আইসে না।

১৮। বাহার পক্ষে যখন যে যুগ, তাহার পক্ষে সেই যুগের উল্লিখিত ভাবের উদয় হয়। অর্থাৎ তোমার যখন সত্য-উদয়, তখন তোমার “আমি” আর (ব্রহ্মজ্ঞাপক) “তুমি” একই হইয়া যায়। যখন ভোমাত্তে ত্রেতা-উদয়, তখন তোমার “আমি” দীর্ঘ আর সেই “তুমি” প্রভু ইতি জ্ঞান হয়।

আবার যখন তোমাতে স্বাপর-উদয়, তখন
জ্ঞান-সখাদি বিবিধ ভাব এমং যখন
তোমাতে কলির উদয়, তখন তুমি আর
তোমার সেই “তুমি”কে গ্রাহ্য কর না,
আতিমানিক “আমি”ই সর্লকর্তা জ্ঞান কর।

১৯। যদি এখন এক কলিতে পাদ
সাজ। সত্য জ্ঞান, তবে কলি হইতে
সত্যের উদয় কিরূপে সম্ভব? উত্তর—
(১) এক কলিতেই বাহ্য সত্য, তাহা পূর্ণ।
যথা “মাতা” শব্দে সত্যেও যে ভাব
বুঝাইত, ত্রৈত্যের ও স্বাপরে, আর এখন
কলিতেও তাহাই বুঝায়। অর্থাৎ মাতাকে
অন্য কেহ বলিয়া বোধ হয় না। (২) বছ-
কাল ‘অজ্ঞানে’ থাকিয়া, একটামাত্র কথায়
‘জ্ঞান’-উদয় হয়! সেই জ্ঞান আর
অজ্ঞানে পরিণত হয় না। কলিতে সত্য-
জ্ঞান উদয় সত্য উহা পূর্ণ হইবে; পূর্ণজ্ঞান-
যুগই সত্যযুগ।

২০। বাহাদিগের অন্তরে সত্যের ‘অহং-
ব্রহ্ম’ জ্ঞান বা উহার আভাস এখনও পর্য্যন্ত
আছে, তাহারাই এখনও জ্ঞানমার্গী, তদ্ব্যতীত
ত্রৈত্যাদি অবস্থাপন্ন সকলেই তক্তিমার্গী।

তক্তিমার্গ সহজ। তক্তিমার্গী আরম্ভ
হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনা হইতে শ্রেষ্ঠকে
ধরিয়া থাকেন। শুভাশুভের ভার তাহাতেই
অর্পণ করিয়া নিশ্চিত হইতে পারেন।
শুভব্রহ্মতপনানে অহুরাগ—অহুধ্যান করিতে
করিতে শুভাশুভের প্রভেদ দেখিতে পান
না। ক্রমে নিরতিমানী হইয়া সেই শ্রেষ্ঠের
অহুগত রহেন। ইনি ‘লয়’ হওয়া চাহেন
না; শ্রেষ্ঠের অহুগত থাকিয়া গেবা করিবেন,
ইহাই ইহার প্রার্থনা।

২১। জ্ঞানমার্গ অপেক্ষাকৃত কঠিন।
জ্ঞানমার্গীর অবলম্বন জ্ঞান, লক্ষ্য ‘সোহং’
স্বরূপ। এই মার্গে সাধকের স্বাবলম্বী হইয়া,
শুভাশুভের দারী আপনাকে মনে করিয়া
অহুষ্ঠান করিতে হয়। দ্রঃখে খেদ বা অপরে
দোষারোপ করিবার যো নাই।

২২। জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড।

জ্ঞানমার্গী জ্ঞানকাণ্ড—এবং তক্তিমার্গী
কর্মকাণ্ড লইয়া থাকেন, সাধারণতঃ এই
ক্রম জন্মিতে পারে। জ্ঞানালোচনার থাকিয়া
ব্রহ্ম বা আত্মচিন্তার মহৎ হওয়া দায় সত্য,
কিন্তু জ্ঞানমার্গীও কর্ম ত্যাগ করিতে
পারেন না। তপস্বীরা, ঋষিরা, যোগীরা,
সকলই কর্মী; তাই বলিয়া তাহারাই নিব্রহ্মকর্মী
নহেন। তক্তরিগের কর্ম নিব্রহ্মকর্ম না
হটুক, তাহা অবশ্য সম্বন্ধে কর্ম নহে। ঋষি-
দিগের কর্ম অবশ্য-সম্বন্ধীয়।

২৩। জ্ঞানমার্গীর উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ
বার “বাহ্য তাহাই” হওয়া। (ব্রহ্মে লীন
বা পরিণত হওয়া)। ইহারও সাধনাব-
লম্বন কর্ম। তক্তিমার্গীর উদ্দেশ্য প্রভুর
সহবাস, অবলম্বন—কর্ম। জ্ঞানমার্গী কর্মকে
জানিয়া কর্ম করেন, তক্তিমার্গী কর্মকে
না জানিয়া কর্ম করেন। অন্তর্ভুক্ত বলা
হইয়াছে—জ্ঞানমার্গী কর্মদারী, তক্তিমার্গী
দারী নহে।

২৪।—যখন উত্তর মার্গে ‘কর্ম’ অবলম্বন,
তখন উত্তর-মার্গেই ‘যোগ’ ব্রহ্মব, এ কথার
প্রতিশ্রুতি করা উচিত নহে। যোগের কথা
পরে বলা হইবে। যোগের একটা অবস্থার
নাম ‘ধ্যান’। তক্তিমার্গীও ধ্যান করেন
বলিয়া আপনাকে ‘যোগী’ মনে করিতে

পারেন। জ্ঞানমার্গী ব্রহ্মকে ধ্যান করেন, তত্ত্বমার্গী ভগবানকে ধ্যান করেন। এই দুই প্রকার ধ্যানে বিভিন্নতা কি, তাহা বিচার্য।

২৫। ব্রহ্মোপাসক জ্ঞানমার্গী নিরাকার নিষ্ঠুর অনন্তকে কল্পনা করিয়া ধ্যান করেন। ইহাতেও সম-নিয়মাদি 'যোগ' ক্রিয়ার প্রয়োজন। ঐ ক্রিয়াগুলি অনারাম-সাধ্য নহে। তত্ত্বমার্গী রূপযুক্ত, গুণযুক্ত অধরমখারী প্রভৃৎকে ধ্যান করেন। ইহাতে উল্লিখিত 'যোগ' ক্রিয়ার সাপেক্ষতার প্রয়োজন হয় না। কেমন না একবার দৃষ্ট সূক্তি মনে করিলেই মনে আইসে। কিন্তু ব্রহ্মপূজনার নিরাকার স্বরূপধ্যান সুলভ নহে; মনে করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় না।

ঊহার পর, তত্ত্বমার্গী ধ্যান মাত্র আপনার তাঁকুরকে দেখিতে পান, অমনি ঊহার কাজ কুরার। ইহাতে জ্ঞানমার্গীর 'যোগ' হয় কি? তাঁকুর ও তত্ত্ব ত পৃথক থাকেন।

জ্ঞানমার্গীকে ব্রহ্মযুক্ত হইতে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। শ্রবণ-মননাদির পরে 'ধ্যান' উল্লেখ করা হইরাছে। একে ইহার 'ধ্যান'ই হু:সাধ্য, তাহাতে অবস্ত—অদৃষ্ট—মনহুঁত বলিয়া 'ধ্যান'কে 'ধারণা' করাও কঠিন। ধারণা করিয়া ঊহাতে 'বৃত্ত থাক' আরও কঠিন। সিদ্ধিধ্যান ব্যতীত ইহা বটিতে পারে না। স্তত্রায়ৎ ওস্তত্র স্বপ্ন 'ধর্মন'—প্রকৃত স্বপ্ন 'যোগ' তত্ত্বমার্গীর নহে, উহা জ্ঞানমার্গীর।

(ক্রমশঃ)

ঐবামাচরণ বহু।

বর্ণ-ভেদ ও জাতি-ভেদ।

যেমন হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম এক কথা নহে, তেমন বর্ণ-ভেদ ও জাতি-ভেদ এক কথা নহে। বর্ণভেদ বৃহ-পূর্ব ঘটনা, জাতি-ভেদ বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী ঘটনা। বর্ণ-ভেদ হিন্দুধর্মেরই এক প্রকার অবস্থা; জাতি-ভেদ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিশেষত্ব। বর্ণ-ভেদ-কালের শেষভাগে যদিও বিবাহ অনেকটা নিয়মিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে হিন্দু খণ্ড খণ্ড হইয়া, পুরুভূজের খণ্ডগুলির স্তায় বিভিন্ন হইয়া পড়ে নাই। আদান-প্রদান নিয়মিত হইলেও রহিত হয় মাই; স্পর্শ-দোষ প্রথা ছিল না। হিন্দু আর্ঘ্যানার্থ্য-মিশ্রিত এক মহাজাতি, রক্ত-মাংসে এক। ইহার আত্মবস্থা অবশ্য অতি পবিত্র হিন্দুত্ব, পরবর্তী অবস্থায় জাতি-ভেদের স্তায় যোগ-নাশক নহে। ইহার আশ্রয়ই বেদগম্ভ হারা শাসিত। জেতা-জিত উভয়েই হিন্দু-স্থানবাসী এক অভিন্ন জাতি, বিবাদ বিস-বাদ থাকিলেও তাহাদের জন্মগত তুল্য। সকলেই স্বদেশী, প্রত্যেকে প্রত্যেকের সমান। জাতি-ভেদে এই স্বজাতীয়তার স্বদেশীত্ব নাই। জাতি-ভেদ ব্রাহ্মণ-প্রাধাত্তের হুর্গ; ইহাতে পানাহার বর্জিত; বিবাহ ত না-ই, কেবল অটনকোর উপর অটনকোর স্তর জমাট বাধিয়া আসিতেছে। আমরা বৌদ্ধধর্মের পর হইতে এই জাতি-ভেদের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছি; একত্ব তৎবধি আমাদের ধর্ম-কর্ম, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ-সামর্থ্য, সকলই ক্রমশঃ ক্রমশঃ ক্ষয়

পাইতেছে। এই অবস্থার পরিণতন না ঘটিলে আমাদের অস্তিত্বও যে থাকিবে না, জনসংখ্যার রিপোর্ট দ্বারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা কালের ত্তেরীর এই শোকজনক নিনাদের পূর্বতান অবশ্রই উনিরাছেন। এলক্ত বর্ণ-ভেদ ও জাতি-ভেদ সম্বন্ধে ছুটি একটি কথা বলা নিতান্ত অসাময়িক না হইতেপারে। বিশেষতঃ দেশের লোক স্বদেশী আন্দোলনে যে ভাবে ব্যাপৃত হইরাছে, তাহাতে জাতি-ভেদের সহিত ইহার বিরূপ যাত-প্রতিযাত হইবে, সে ভাবনাও অনিবার্য।

আর্য্যজাতি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আগিয়া বসবাস করিতে লাগিলে, তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব সমাজপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বেদমন্ত্র পাঠে তাহার অনেকটা জ্ঞান বাইতেছে। অনার্য্য জাতির সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ কম ছিল না; কিন্তু যে অনার্য্য তাঁহাদের বশভাগন হইত, তাহাদের জন্মসম্পূর্ণরূপে আর্য্যগণের জন্মসম্বন্ধে সঙ্গে মিশিয়া বাইত। কদে অধুনা ইংরেজ নামক 'আর্য্যজাতি' দেশীর খৃষ্টান ও অজ্ঞান লোককে যে অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ভারতের পূর্বতন জেতা আর্য্যজাতি, জিত অনার্য্যের প্রতি তদগণের উচ্চ অধিকার দিয়াছিলেন। আমি জানি না, বৃটিশ ভারতে কোন ভারতবাসী—তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বাহাই হউন, পঞ্চদশবাসী সুবাসের অধিকার ও সমাদর পাইয়াছেন।

এইরূপই হিন্দু জাতির আশ্রয় গঠন; ইহাতে আর্য্যানার্য্য রক্তপ্রবাহের মিলন নিবিদ্ধ হয় নাই; স্পর্শ-দোষ প্রথা সমাজের উপর

এত কর্তব্য স্থাপিত করিতে পারে নাই।* কিন্তু একপ হইলেও গাজলখের বর্ণায়ুসারেও দুটি বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়।

"সোমাসবর্ণ মধরং শুকাক" (ঋগ্বেদ ২।২২।৪)

এই স্থলে আমরা দাসবর্ণের লোকের উল্লেখ দেখিতেছি। দাসগণকে অনেক সময় দসু্য ও বলা হইয়াছে।

"হিরণ্যরসুত ভোগং সপান হৃষী দস্মান্
প্রায়বর্ণমানং" (ঐ ৩।৩৪।১)

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে "দস্মাদিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছিলেন।" সুতরাং দ্বিবিধ বর্ণের লোকের উল্লেখ দেখিতেছি;—দাসবর্ণ ও আর্য্যবর্ণ।

"অদেদিত্তে ব্রহ্মহা গোপতির্গা অংতঃ কৃক্কা
অকুবৈর্ধামতির্গাৎ।" (ঐ ৩।৩১।২১)

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইন্দ্র আক্কা-দিগকে গাভী দান এবং দীপ্তিবৃক্ক তেলধারী কৃক্কদিগকে বিনাশ করন।

"পক্ষাশংকৃক্কা নিঃবপ সম্ভা" (ঐ ১।১৩।৩)

এ মন্ত্রে দেখা যায়, ইন্দ্র ৫০ হাজার কৃক্ককে অর্ধাৎ কৃক্কবর্ণের লোককে বধ করিয়াছিলেন। দাসবর্ণ যে কৃক্কবর্ণ ছিল, তাহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। "সনৎ ক্ষেত্রং সধিত্তিঃ ষিত্যোতিঃ সনৎ সূর্য্যৎ
- সনদপঃ সুবজ্রঃ" (ঐ ১।১০।১৮)

* বিদ্যময়ী, ইন্দো-ইউরোপিক, অর্য্য, ব্যাল্টিসি, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সংক্রমণ ইত্যাদি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সহিত বাহ্যিক হিন্দু-স্বাভিমানের "স্পর্শ-দোষ" বিধির তত্ত্ব-রহস্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা স্পর্শ-দোষকে নিরবচ্ছিন্ন (invariably) দোষ দিতে পারেন না। (সঃ)

এই মন্ত্রে বলা হইতেছে—ইজ্ঞা খেতবর্ণ
সিত্রাদিগের সহিত ক্লেত্র ভাগ করিয়া লই-
লেন। সুতরাং ইজ্ঞাহুগৃহীত আর্ঘ্যবর্ণ
খেতবর্ণের লোক ছিলেন।

“ঋষিহাস্যো নিধিনিবাণ গুড়ুহুয়ুদর্শতাহুণথু-
বন্দনাম।” (১:১১৩:১১)

বন্দন ঋষি কূণে নিপতিত হইয়া নিধি
আর্ঘ্য রত্নবৎ দৃষ্ট হইতেছিলেন। সুতরাং
ঐহার গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল।

“খিত্যং চো মা দক্ষিণতক্ষপর্দাঃ” (ঐ ৭.৩১১)

এই মন্ত্রে বিশিষ্টদিককে খেতবর্ণের লোক
দক্ষিণ দিকে কপর্দধারী বলা হইয়াছে।

সুতরাং আর্ঘ্যবর্ণ সাধারণতঃ খেত,
গৌর বা উজ্জ্বল বর্ণ; কিন্তু দাসবর্ণ কৃষ্ণবর্ণ।
বেদের মন্ত্র হইতে এ বিষয়ে আরও প্রমাণ
উদ্ধৃত করা যায়। তবে বোধ হয় সে
সময়ে কেতু আর্ঘ্যবর্ণের সহিত তদানীন্তন
ভারতবাসী দাসবর্ণের সম্বন্ধ অধুনা বিজেতৃ
ইংরেজদিগের সহিত দাস ভারতবাসীর
সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিল না।
দাশ্য ভাই নোরোজী সমগ্রাণ করিয়াছেন
যে, ব্রটিশ রাজত্বের মধ্যে সকল প্রকার
জন্ম-সম্ব এক।

সেই অতিপ্রাচীন ভারতে অনাগ্য দাসেরা
আর্ঘ্যবর্ণী ও আর্ঘ্যবর্ণের বন্ধু হইতেন;
ঐহাদের আদান-প্রদান ও ভোজ্যায়ত্তা
চলিত এবং গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ থাকিলেও
অনার্যেরা সর্বাংশে ক্রমণঃ আধ্য হইয়া
স্বীকৃতন।

* বর্তমান ভারত-বিজেতা খেতবর্ণ জাতির
সহিত ভোজ্যায়ত্তা ও আদান-প্রদানে
আমরা—‘কানা আদ্যমরা’ নিধিয়া উন্নতি

“উত কণুঃ নৃষদঃ পুত্রগাহুকত শ্রাব ধনমানত
বাজী।

প্রকৃত্ত্যার কশদপিষতোধকৃতমজ্ঞ নিকরস্মা
অপীপেং ॥”

(ঐ ১০৩১:১১)

এই ঋকের ১ম অর্ধে কণুকে শ্যাব
(কৃষ্ণ) ও পর অর্ধে পরিষ্কাররূপে কৃষ্ণ
বর্ণা হইয়াছে। ইহার দ্বারা কণুকে এক
জন দাসবর্ণের খাসি মনে করা অসম্ভব
নহে। অন্ততঃ দাস ও আর্ঘ্যবর্ণের সংযোগে
কণুর উৎপত্তি, একথা স্বীকার করিতেই
হইবে।

কণু অতি প্রাচীন ঋষি; বোধ হয়
প্রাচীনত্রে অঞ্জিরার পরই কণুর স্থান।
ভরদ্বাজ প্রভৃতি বহু ঋষি স্ব স্ব মন্ত্রের মধ্যে
কণুর উল্লেখ করিয়াছেন। এই যে অতি
হৃদয়গ্রাহী উনামন্ত্রগুলি ঋষেদের গৌরব,
তাঁহা প্রায়শঃ কণুগোত্রীয়দিগের। উনাম
কেবল ভারতবর্ষের দেবতা, এমত নহে, সমু-
দায় আর্ঘ্যজগতের দেবতা। এই যে আর্ঘ্য-
জগৎ আজ কালিদাসের শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে
মুগ্ধ হইয়াছে, এ শকুন্তলা আর কেহই
নহেন, কণুদের সেই অতুল্য রূপগাণনাবতী
উনাদেবী। পুরাণের মধ্যদিগ্য শরীরিণী
হইয়া আসিয়া ‘শকুন্তলা’ হইয়াছেন।*

মাহাহটক কৃষ্ণবর্ণ কণু ঋষি কি খেতবর্ণ

লাভ করি। ইহা আশা করি, আমাদেব
প্রবন্ধকার মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে। (সঃ)

* শকুন্তলার তত্ত্ব ঐতিহাসিক কি-রূপক-
কাজনিক, যে বিচারের এ স্থান নহে।
লেখক প্রসঙ্গতঃ স্বকীয় সিদ্ধান্তই লিখিয়া-
ছেন। (সঃ)

বশিষ্ঠাদির তুলনায় প্রাচীন ভারতে কোনরূপ
হীন ছিলেন?

“সোমানং সুরগং বৃগুহি ব্রহ্মগম্পতে।

কক্ষিবং তং ব ঔশিজঃ” ॥১৥ ১১৮১

দীর্ঘতমা ঋষি উশিজ্ দাসীগর্ভে কক্ষি-
বান্ ঋষিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, এমন্ত
কক্ষিবান্ ঔশিজা। কক্ষিবান্ মূগতঃ দাসবর্ণ
কি আর্ষ্যবর্ণ হইয়া ঋষিগমাজ শোভিত
করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায়
নাই। তবে তাঁহার মিশ্রোৎপত্তি সম্বন্ধে
সন্দেহ কি? কিন্তু এই মিশ্রোৎপত্তি বশতঃ
আর্ষ্যসমাজে কি তিনি কোন অংশে হীন
ছিলেন? বরঞ্চ স্বময় রাজা কক্ষিবান্কে
শ্রীমান দেখিয়া, তাঁহাকে আপন ১০টি কন্যা
সম্প্রদান করেন এবং যৌতুক স্বরূপ
১০০ নিষ্ক, ১০০ বৃষ, ১০৬০ টি গাভী ও
১১ খানি রথ প্রদান করেন। (১১২৫১)
সারণের টীকা।) ইহা কি দাসবর্ণের সংস্রবে
জন্মস্বের ভারতমোর পরিচায়ক?

কেবল ইহাও নহে, কক্ষিবানের কন্যা
অতি সুন্দরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।
তিনি বিদূষী; তাঁহার নাম ঘোষা। তিনি
১০ম মণ্ডলের ৩২৪০ সূক্তের ঋষি বলিয়া
খ্যাত। “বুং স্বস্তার কশতী মদন্তঃ”
(১১১৮) উজ্জলবর্ণা ঘোষাকে কুম্ভবর্ণ
পতিকে প্রদান করিলেন। ইহাতে দাস-
বর্ণ ও আর্ষ্যবর্ণে রক্তবিনিময়ের বিলক্ষণ
প্রমাণ পাওয়া যায়। বোধহয় ইহার কিছু
পুরবর্তী কালে এরূপ বিবাহে কতক আপত্তি
উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কুম্ভ-গৌর বর্ণ-
ভেদে-তথ্য দাস-আর্ষ্য-ভেদ ছিল না;
তথাপি কুম্ভবর্ণ কুম্ভ ও অর্জুন বর্ড সংজ্ঞে

‘কশতী’ অর্থাৎ উজ্জলবর্ণা কক্ষিণী ও মূহুভ্রাকে
বিবাহ করিতে পারেন নাই। তাহা হইলেও,
এগময়েও দাসবর্ণে ও আর্ষ্যবর্ণে বিবাহ
রাহিত্যের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কেবল কণু কেন? আরো অল্পেক
দাসবর্ণের ঋষি ছিলেন। তন্মধ্যে আজিরস
কুম্ভের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বক্রিম বাবুর পাঠকেরা অবশ্যই অবগত
আছেন, ছান্দোগ্য উপনিষদের আজিরস
কুম্ভই মহাভারতের যুদ্ধনেতা। কপাটা
নিভান্ত অসম্ভব নহে? কিন্তু এই কুম্ভ কে?
“ক্রীশিশতাত্তবতাং সহস্রাদশগোনাম্।

দহস্পশ্চায় মায়ৈ।”

“উদানট্ ককুহো দিবমুদ্রান্ চতুর্ষুকো দদৎ
শ্রবণাবাধংজনঃ” ঐ ৮.৬.৪৭৪ ঋক্।

এই দুই মন্ত্রে বলা হইতেছে, তিরিঙ্গির
রাজা পজ্জ ও সাম নামক ঋষিষয়কে ৩০০
অখ ও ১০০০ গো প্রদান করিয়াছিলেন।
এবং ইনি (সেই তিরিঙ্গির) ৪ উষ্ট্রধন
এবং দাস স্বরূপে বহুগণকে প্রদান করিয়া
কৌর্ডি দ্বারা স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন।

পজ্জ আজির-গোক্রীম ঋষি। ইনি যে
কতকগুলি বাদকে দাসস্বরূপে পাইয়া-
ছিলেন, তাহা উপরোক্ত মন্ত্রে পরিকার
রূপে বুঝা যাইতেছে। সুতরাং আজিরস
কুম্ভ—যিনি একজন বিখ্যাত বাদক, তিনি
পজ্জ ঋষির দাসগণ হইতে উৎপন্ন কিনা,
তাহা সন্দেহের বিচার্য ও আলোচ্য। ফলে
মুগ্ধ যেমন এক জীবনে কৃশ, ক্ষয় ও ঋষি;
আজিরস কুম্ভও সেইরূপ হয়ত এক জীবনে
দাস, বশ; ক্ষয় ও ঋষি। আবেশিকার
যেমন কোন প্রেসিডেন্ট হুগ চালনাশরিতমগ

করিয়া দেশের সর্বোচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; আজিরগ কক্ষের উন্নতি শুধুপক্ষে বড় বেশী বিশ্বাস করা নহে।

এই উপলক্ষে আমরা জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখও করিতে পারি। জ্যোতির্বিদ্যার রক্ষণও ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ তিনি যোদ্ধা। তাঁহার উৎপত্তি হরত খেত-রক্ষা সংযোগে অগ্নি রক্ষণ পিতা-মাতা হইতে। কিন্তু জ্যোতির্বিদ্যার কি কোন আর্ঘ্যসেই বঞ্চিত ছিলেন ?

আমরা এক্ষণে ক্রমের কথা উল্লেখ করিতেছি।

“প্রা তদুঃ শীমে পৃথিবানে নেনে প্রা রামে
নোচমস্তুরে মঘবৎসু।” ১০।২৩।১৪

এই মন্ত্রে রামকে ‘অম্বর’ বলা হইয়াছে। অম্বর শব্দ অগ্নি-প্রায়শঃ বল-বান অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সত্য; কিন্তু কোন কোন স্থলে টঙ্ককে “অম্বর” শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে। এমন স্থলে অম্বর শব্দের অর্থ গায়ন রাক্ষস অর্থাৎ অনাধ্য-দম্বা করিয়াছেন। অমরা যদি উপরোক্ত মন্ত্রের অম্বর শব্দ এই অর্থে গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমরা ঐ রামকে অক্লেশে দামবৎ-জাত বলিয়া পরিচয় দিতে পারি। ফলে দামবৎ রামেরও গাজচর্মের যেরূপ বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়—নবদুর্গাদান-শ্রামবর্ণ, তাহাতে তাঁহাকে মূলবর্ণতবে মিশ্রোৎপত্তি-বিশিষ্ট বাকি বলিতে হইবেই। ফলে তখন খেত-রক্ষণ-বর্ণনায় আর্ঘ্যভাষিত্তে অম্বরে মিশ্রিত হইয়াছিল।

সুধাবাহীরা বাহাই বৃহস্পতি, যদি বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ রামের সহচর হন, তবে রাম

সুদাসের সমসাময়িক, একথা বলিতেই হইবে; কেননা উক্ত দুই প্রসিদ্ধ ঋষি সুদাসের যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। ‘একজ্ঞ’ রাম বৈদিক যুগের অন্তর্গত, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগে সে সময়ে দাম-বর্ণের অনেকে আর্ঘ্যায়িত হইয়া এমন প্রভাবশালী হইয়াছিলেন যে, আর্ঘ্যবর্ণের লোকেরা তাঁহাদিগকে নিজের প্রধান নেতা বলিয়াও স্বীকার করিতেন এবং নিজের কার্যে নিযুক্ত করিতেন। সুদাস এইভাবে পঞ্চাশে ১০ জন রাজাকে আর্ঘ্যবর্ণের বশীভূত করেন। অযোধ্যার রামের নিজের কাহিনীতে অনেকেই জানেন।*

ফলে বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের সময়ে—অর্থাৎ ঋষিযুগের মধ্য সময়েই দাম ও আর্ঘ্যবর্ণের মিশ্রণ বশতঃ অনেক আর্ঘ্য দাম-বর্ণের সহায়তার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সুদাসের আর্ঘ্য ও অনাধ্য উভয়বিধ শত্রু ছিল। (৭।১৮।৮) শুনহোত্র ঋষিও (৮।৩৩।৩) দাম ও আর্ঘ্যশত্রুর যুগপৎ উল্লেখ করিয়াছেন। ১০।১৮।৩ ঋকে দেবতন্ত্র-শূত্র আর্ঘ্যবর্ণের লোকের উল্লেখ দেখা যায়।

* যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাম সমগ্র হিন্দুত্বের তত্ত্বগততার রূপে চিরপূজিত; বাহারা যোগীগণের সাধা, ঋষিগণের আরাধ্য, মুনিগণের ভাষা ও ভক্তগণের সেবা, তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গের শ্রাম ও রক্ষণবর্ণের-ভুলতা পার্থিব কোন শ্রাম-রক্ষণ পদার্থে অসম্ভব। অতএব সেই বর্ণের কথা তুলিয়া এবং দু-একটি বেদ-বাক্যের কষ্টকমিত ব্যাখ্যা করিয়া, তাঁহাদিগকে ‘দাম-বর্ণজাত’ বুঝাইতে চেষ্টা করা অন্তর্ভাব্য সাকারোপাসক পাত্রক হিন্দু-বিচারে নিতান্তই ব্যর্থ, বিড়ম্বিত ও বাস্তব-স্পর্শীভূত। (সঃ)

তাহারা যে দাসবর্ণের সংযোগে আৰ্য্যবর্ণের শ্রেষ্ঠতা করিত, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে। যেসকল 'ফ্রাঙ্কোফ্রান্সিস্‌য়ান্' বুদ্ধের অনেক পুস্তক হইতে অলসেস্ লোরেনের অনেক যুগন্তী জাৰ্ম্মাণ পতি গ্রহণ করিয়া, তত্তৎ দেশবাসী-দিগকে জাৰ্ম্মানিগের পক্ষাপলম্বী করিয়া-ছিলেন, সেইরূপ হয়ত অনেক আৰ্য্যরমণী দাস-বর্ণের পত্নীত্ব গ্রহণ করিয়া অনেকগুলি আৰ্য্য-বংশকে দাস-পক্ষ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই অবস্থাই ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কতিপয় পুরুষ পরে—অর্থাৎ মহাভারতের বুদ্ধের সময়ে এমন ভাবধারণ করিয়াছিল যে, তখন আৰ্য্যানাগ্য পক্ষ প্রায় সমতুল্য। পরম্পর বিমিশ্রণে ইহাই বর্ণভেদের আশ্রয়স্থান—বিশুদ্ধ হিন্দু—আৰ্য্যানাৰ্য্য-মিশ্রিত ভারতবাসীর স্বদেশীত্ব ও সমানত্ব; রক্তে মাংসে—জগৎ মরণে তুল্যা-ধিকারিত্ব।

কিন্তু মহাভারতের বুদ্ধের পর বর্ণভেদ একটু রূপান্তরিত হয়। এ সময় বাজক, বোদ্ধা, শিল্পী ও কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবীগণের মধ্যে বিবাহ কতকটা নিয়মিত হয়। যথা বাজক বোদ্ধার, বোদ্ধা শিল্পীর, শিল্পী শ্রমজীবীর কস্তা অসংকোচে বিবাহ করিতে পারিবে এবং তত্তৎপন্ন সন্তান সমাজে প্রতিষ্ঠা-শূন্য হইবে না; বিপন্নীতভাবে বিনাহোৎপন্ন সন্তান নিন্দাভাজন হইবে। এই সকল নিবেদন সত্ত্বেও, শাস্ত্রে উত্তরবিধ অল্পলোমজ ও প্রতিলোমজ) বহু সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে; সুতরাং বাধৎ এতাদৃশ ব্যবহার ছিল, তাবৎ দাসবর্ণে ও আৰ্য্যবর্ণে রক্তপ্রবাহ সম্যক্ রূদ্ধ হয় নাই। বৌদ্ধবংশেও এতাদৃশ অল্প-

লোমজ ও প্রতিলোমজ জন-সংখ্যার উল্লেখ ও অল্পসোদন দেখিতেছি। সংকিত্তা-সাহিত্যে ভাগীর নিদর্শন। বৌদ্ধধর্মের লোপের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের লোপ ও জাতি-ভেদের উৎপত্তি। পরবর্তী পঞ্চাধ্যায় জাতিভেদের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমধুসূদন সরকার ।

কবিতার প্রতি ।

(১)

আজি এট মধুময় দিনে,
কবিত্তে গো, জন্মের সখি!
দাঁড়াইরা জীবন-পুলিনে,
বিশ্বময় রূপ তব দেখি।

(২)

অশ্রীতের নেপথ্য হইতে
অস্বাচিত করণার মত,
এসেছিলে হাসিতে হাসিতে,—
তুলাইরা শোক-দুঃখ বত।

(৩)

কি জানি, কি রহস্য-জড়িত,
এই স্বপ্ন মানব-জীবন!
কোন্ দিব্য-প্রেমে স্মিত্তিত,
পর কেন হয় গো আগন ?

(৪)

কে আমি ? কোথায় ছিলে তুমি ?
কাম-স্নেহে তাসিয়ে তাসিয়ে,

কত মন-সিন্ধু অতিক্রমি
তুমি আমি মিলিত্তু আগিয়ে !

(৫)

অজ্ঞানিত অগ্নিগির কাছে
মুগ্ধ করি' হৃদয়-ভাণ্ডার,
সুখ, দুঃখ,--সঞ্চিত মা' আছে,
মগাদরে দিলে উপহার !

(৬)

আশাতীত স্মৃতি করি পান,
(তুন্ডিত, ভাপিত, আমি, বাবা !)
নহুদিনে জুড়াইলু পোণ,
নিভাইলু হৃদয়েব জ্বালা ।

(৭)

সুশালে কি সম্মোহন গান,
নিম্মোহিতা আশার স্বপনে ।
নবভাবে জাগাইয়া প্রাণ,
ঘুরাইলে প্রান্তরে—কাননে ।

(৮)

অসম্ভল-কর-পরশনে
খুলে দিলে স্বর্গের দয়ার ;
দেখাইলে সাদরে যতনে—
প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার ।

(৯)

নিরাশার হ'রে পতিহত,
স্তব-পাশে আসিছু স্বপন ;
সায়ামনী, জননীর মত
নেহাঙ্কলে করিলে ব্যজন ।

(১০)

নবভাবে নবরূপ লয়ে,
জীবনের প্রত্যেক দিবসে,

অতীত গৌরব-কথা করে,
ডুবাইলে ভাবামৃত-রসে ।

(১১)

কবে, কোন্ বিশাতার বরে
লভিয়াছ'এ চির-স্বরূপ ?
কোন্ ব্রহ উদ্‌ঘোষন তরে
এ সংসারে'ভ্রমিছ একরূপ ?

(১২)

পুণ্যতোয়া তমসার তীরে,
সেই দূর-অতীত-সীমার,
আশ্রয় করিলে বাল্মীকিরে,
শরাহতে ক্রৌঞ্চের মায়ার !

(১৩)

সে অবধি এ বিশ্ব-মাঝার
মুর্ছিতমতী মমতার প্রায়
লমিতেছ, সঙ্গীত তোমার
ছুটিয়াছে সহস্র ধারার !

(১৪)

যদি এই আশ্রিতে তোমার,
হেরিয়াছ স্নেহের নয়নে ;
তবে এরে ভুলিওনা আর—
জন্মান্তরে, যুগ-আবর্তনে !

(১৫)

নহু তুমি সাধনার ধন,—
দীপ্ত দৃষ্ট তপোবল-ফল ;
'দান'-রূপে করিলা প্রেরণ
জগদীশ—দীনের সখল ।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুম্ভারী

শ্রী হরি:

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।

১১০

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড,
৩য় সংখ্যা ।

আষাঢ় ।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা ।

ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং তাহার অনুশীলন ।

১। বে বিজ্ঞা হারা মোক্ষের অভিন্ন স্বরূপ, নিকণ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নিরঞ্জন, নির্দ্বন্দ্বিতার পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ হর, তাহার নাম ব্রহ্মবিজ্ঞা। সুত্বকোপনিষদের উপক্রমে আছে "ব্রহ্মবিজ্ঞাং সর্কবিজ্ঞাপ্রতিষ্ঠাং" অর্থাৎ "ব্রহ্মবিজ্ঞাং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো বিজ্ঞাং সর্ক-বিজ্ঞাপ্রমাং।" ব্রহ্মবিজ্ঞা সকল বিজ্ঞার আশ্রয়। তাহা ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমাত্ম-স্বকীয় বিজ্ঞা। ব্রহ্মহৃদের আরম্ভেই আছে—"অখা-ভো ব্রহ্মদিক্কাণা। চিত্ততচ্চি হইতে ব্রহ্ম-বিচারের ইচ্ছা জন্মে, একত্র ব্রহ্মহর নামক বেদান্ত শাস্ত্রের অবতারণা। "তন্মাং বেদান্তবাক্যবিচার সুখেন ব্রহ্মণো বিচারার্থ-ত্বং" অতএব বেদান্ত (অর্থাৎ উপনিষৎ)-বাক্য বিচারবারা পরব্রহ্মের স্বরূপ বিচার

অবশ্য কর্তব্য। এই সমস্ত বাক্যই ব্রহ্মবিজ্ঞা এবং তাহার বিচারই ব্রহ্মবিজ্ঞার অনুশীলন। তদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হর। মহাসংহিতাতে আছে—"সর্কেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং সূতং। তন্মাং সর্কবিজ্ঞানং প্রাপ্যতে হসুতং ততঃ।" ১২। ৮৫। "এখাং বেদা-ত্যানাদীনাং সর্কেষামপি মধ্য উপনিষদ্বক পরমাত্মজ্ঞানং প্রকটং সূতং বন্মাং সর্ক-বিজ্ঞানং প্রধানং। অত্রৈব হেতুনাং বভো মোক্ষতন্মাং প্রাপ্যতে।" (ব্রহ্ম-তট্ট)। বেদান্ত্যাদি বস্ত কর্ব, তন্মধ্যে উপনিষদ্বক আত্মজ্ঞান সর্কোপেক্ষা উৎকট; যে হেতু তাহা হইতে সর্কাং মোক্ষ লাভ হর। ইহা সমস্ত বিজ্ঞার প্রধান। আত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান, পরমাত্মবিজ্ঞা ও

ব্রহ্মবিজ্ঞা একই কথা। ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের সূচনার ভগবান এই পরমজ্ঞানকে “জ্ঞাতম” শব্দে আদরপূর্বক “রাজবিজ্ঞা” আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। “উদং জ্ঞানং-রাজবিজ্ঞা—বিজ্ঞানাং রাজা।” ইহা সকল বিজ্ঞার রাজা।

২। সমস্ত উপনিষদের মধ্যেই ব্রহ্মবিজ্ঞা দেবীপায়মান। পরমারাধ্য বাসুদেব সাদ্ধিপক্ষপত যজ্ঞধারা ব্রহ্মমীমাংসা শাস্ত্রে তাঁহার বিচার করিয়াছেন এবং শকরাচার্য্য, আনন্দগিরি, বিজ্ঞানগা, ভারতীতীর্থ, মধ্বাচার্য্য, রামাঙ্কনামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ তাঁহার ভাষ্য ও টীকা প্রভৃতি করিয়াছেন। সেই সকল যজ্ঞের উপলক্ষিত যত শ্রুতি আছে, তাঁহার জৈশ, কেন, কঠ, প্রহ্ন, সুওক, মাণ্ডুকা, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক এবং খেতাশ্বতর, এই একাদশখানি উপনিষৎ এবং মন্ত্র ও ব্রাহ্মণবর্ণের বিশেষ বিশেষ স্থল হইতে তৎ সমস্ত স্ব স্ব ভাষ্যাদিতে উদ্ধৃতি পূর্বক দেখাইয়া দিয়াছেন। অতএব বেদান্তবিচারে এই সমস্ত উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রই প্রামাণ্য। এই গুণি এবং ভারত সহিত বেদান্তাদিকরণমালা, বেদান্তসার, পঞ্চদশী এবং ভগবদ্গীতা প্রভৃতি করেকখানি গীতা হইতে, ব্রহ্মবিজ্ঞার অমুশীলনে বিস্তর সাহায্য পাওয়া যায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু-ভক্তসন্তানদিগের কর্তব্য, নিয়মপূর্বক উপনিষৎ এবং তৎসহভাবী ঐ সকল শাস্ত্র প্রণয় করেন।

৩। ব্রহ্মবিজ্ঞা অমুষ্ঠান-নিরপেক্ষ। মর্শক্রিয়া যেমন পুরোহিত, মন্ত্র, নৈবেদ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার, আমন্ত্রণ,

অশিবাগ, হোম, জপ, দক্ষিণা ও দানাদি-সাপেক্ষ, ব্রহ্মবিজ্ঞার অমুশীলন সেরূপ পদ্ধতি-গর-ক্রিয়া-সাপেক্ষ নহে। অপরক্ষ, এই অমুশীলন কর্তৃ-ভাক্ত্ অভিসান-লক্ষণ-মনো-বৃত্তি-নিঃসৃত কোনরূপ জ্ঞানক্রিয়াও নহে। ইহা ‘অগ্নিসা লঘিমা’ প্রভৃতি যোগৈগম্বা এবং ব্রহ্মলোকাদি পূর্ণকামনার্থেও অশ্রুতি হইল না। এই মহাবিজ্ঞার উদ্দেশ্য কেবল আত্ম-সাক্ষাৎকার।

৪। ইহার শ্রুতি-বেদান্তনিহিত অমুশীলন সম্পূর্ণরূপে অকত্রাজ্ঞ জ্ঞানমর্শী। ব্রহ্মবিজ্ঞা আর ব্রহ্মজ্ঞান—একই কথা। তথাপি ইহা বলা যায় যে, ব্রহ্মবিজ্ঞার আশেচনা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ তেদ উপচারিক মাত্র; অথবা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিজ্ঞার সহিত জ্ঞানরূপ ব্রহ্মের প্রমাণ-প্রসঙ্গ-সম্বন্ধ-ব্রহ্মক। নতুবা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর চিত্তের শাস্ত্রবিহিত নিশ্চিন্দ বশতঃ তাহা কর্তৃক যৎকালে ব্রহ্মবিজ্ঞার অমুশীলন হয়, তখন যুগপৎ তাঁহার আত্মাতে স্বরশ্মকাশ জ্ঞানার্শরূপ পরমাত্মার শাস্ত্রিতমপঞ্জ-পন্নমজ্যোতি, সন্দীপিত হইল থাকে। এইরূপ শ্রুতিপ্রতিপাত ব্রহ্মবিজ্ঞার অনকুৎ আবৃত্তিই জ্ঞানামুষ্ঠান এবং ‘অপরোক ব্রহ্মোপাসনা’ শব্দের বাচ্য।

৫। একই ব্রহ্মকে বিভিন্ন অধিকারী-গণ নানাভাবে গ্রহণ করেন। বেদব্যব-সারীগণ তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন। সেই অধিকারে “ব্রহ্ম” শব্দের অর্থ “বেদ” অর্থাৎ “শব্দব্রহ্ম”। তাহা নিখিল কর্মকাণ্ডের ও বজীর দেবতা সমূহের প্রতিপাদক, এবং ঋষি ও ব্রহ্মসানগণের উপকারক। অতঃপর

জ্ঞানযোগীগণ (ব্ৰহ্মজ্ঞানীরা) উঁচাকে পরমাৰ্ছা বলেন। সে অধিকাৰে তিনি দেৱতাদি ব্যক্তিক এনং ক্ৰিয়া, কাৰক ও কৰ্মসম্বন্ধ বিৱৰ্তিত আৰ্ছাসংৰূপ। অতঃপৰ ভক্তৱা উঁচাকে 'ভগৱান' বলেন। সে অধিকাৰে তিনি ৰূপ, স্ত্ৰণ, নামাদি বিশিষ্ট উপাঙ্গনাৰ বিষয়।

৬। তদ্বাখ্যে উপনিষৎ পতিপাণ্ড সে পরমাৰ্ছাভাব, তাহাই ব্ৰহ্মবিষ্ঠাব বিষয়। ব্ৰহ্মজ্ঞানীগণ ব্ৰহ্মবিষ্ঠাব অমুশীলন দ্বাৰা তাঁচা সাক্ষাৎ উপলক্ষিত পত্ৰ কৰিয়া থাকেন। আৰ্ছাসংৰূপে ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকাৰ হইলে অধিকাৰ নিবৃত্তি হয়।

৭। এট অমুশীলন, সাক্ষাৎ ব্ৰহ্মাৰ্ছা-জ্ঞান স্থিৰীভূত না হওৱা পৰ্য্যন্ত "যোগ" শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এ যোগ কৰ্ম-যোগ নহে। উঁচাকে পৰোক "ব্ৰহ্মা-পীঙ্গনা" বলা যাইতে পারে। উঁচাৰ অগ্ৰষ্ঠান ও আবৃত্তি দ্বাৰা ব্ৰহ্মবিষ্ঠাতে ব্ৰহ্মপতি অৰ্ছা। "যোগ" শব্দে নানা অৰ্থ। যথা ভগৱদ্গীতাৰ তৃতীয় অধ্যায়ের আৰম্ভে কৰিয়াছেন— "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম-যোগেন যোগিনাং।" অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপাণ্ডিৰ উপাৰ দ্বিবিধ। প্ৰথমতঃ "জ্ঞানযোগ"; ইহা সাক্ষাৎ উপাৰ (Direct means)। এই উপাৰটী "সাংখ্যানাং" অৰ্থাৎ জ্ঞানী-দিগের। এখানে সাংখ্য এনং বেদান্ত, উঁচৰ শাস্ত্ৰসম্বন্ধ জ্ঞানীই অভিপ্ৰেত। দ্বিতীয়তঃ কৰ্মযোগ; ইহা ব্ৰহ্মপাণ্ডিৰ গৌণপৰম্পৰা উপাৰ (Indirect means)। এই উপাৰটী কৰ্মীদিগের। কৰ্মীরা শাস্ত্ৰবিহিত দেৱাৰ্ছনাদি কৰ্মদ্বাৰা যখন দেৱাৰ্ছাৰ্ছা

করেন, তখন সেই সকল কৰ্ম "কৰ্মযোগ", আৰ্ছা লাভ করে, এনং উঁচাৰা "যোগী" অৰ্থাৎ "কৰ্মযোগী" নামে উঁচ হন। এই উঁচৰ স্থলে "যোগ" শব্দ যেখন "উপাৰ" অৰ্থে গৃহীত হয়, তদুপ "গ যোগ" অৰ্থেও সঙ্গত হইতে পারে; অৰ্থাৎ যে জ্ঞান ব্ৰহ্মেতে যুক্ত—কিনা ব্ৰহ্মজ্ঞানে অধিত, তাহাই "জ্ঞানযোগ"। আৰ যে কৰ্মকাণ্ড ব্ৰহ্মেতে উঁচিষ্ট, তাহাই "কৰ্মযোগ"। অতএৱ ব্ৰহ্মবিষ্ঠাব অমুশীলন, প্ৰেণসাবস্থাব ব্ৰহ্ম-পাণ্ডিৰ জিৱানিৱৰ্ণেক্ষু, সাক্ষাৎ উপাৰ; ৰূপী "যোগ" বা "ব্ৰহ্মোপাঙ্গনা" তাৎপৰ্য্যে গৃহীত হয়। ইহা পৰোকলক্ষণবিশিষ্ট, এনং সিদ্ধাবস্থাব সাক্ষাৎ জীবনমুক্তিবৰূপ পরমাৰ্ছাজ্ঞানে পরিণত হয়। তখন আৰ তাহাকে "উপাৰ" বা "যোগ" বলা যায় না। কিন্তু আৰ্ছাবৰূপের অট্টেতুক প্ৰেমা-স্পন্দন বিধায়, সেই পরমাৰ্ছাজ্ঞানকে অপ-ৰোক্ষ ব্ৰহ্মোপাঙ্গনা বলা যাইতে পারে। ইহাই গীতাৰ জ্ঞানলক্ষণা চতুৰ্থীভক্তি।

৮। বাহাৰা কৰ্মযোগী, অৰ্থাৎ দেৱাৰ্ছ-দিগের ও দেৱাৰ্ছীগণের উঁক্ষেণে বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম পালন ও যজ্ঞ-দেৱাৰ্ছনাদি কৰ্মাৰ্ছাৰ্ছা কৰেন, তাঁহাদের তদতিরিক্ত ব্ৰহ্মবিষ্ঠাব— অৰ্থাৎ আৰ্ছাবিষ্ঠাব অমুশীলন দ্বাৰা ব্ৰহ্মো-পাঙ্গনা কৰাও শাস্ত্ৰবিহিত। কেননা ঐ সকল কৰ্মই ব্ৰহ্মবিষ্ঠা লাভের সহায়। ঐ ক্ৰতি কহেন— "তত্তৈ তপো দমঃ কৰ্মেতি" তপঃ, দম এবং অগ্নিহোত্ৰাদি কৰ্ম ব্ৰহ্মবিষ্ঠা প্ৰাপ্তিৰ উপাৰ। (তলবংকাৰ ৩০) "আৰ্ছা বা অৱে ব্ৰহ্মব্যঃ শ্ৰোতবো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (ঐ ক্ৰতিঃ) আৰ্ছাব

দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবেনক । ব্রহ্মসূত্রে কহেন “কৃৎসনতাবাত্তু গৃহিণোপ-
সংহারঃ ।” (৩। ৪। ৪৮) বেদবিহিত
সকল কর্মের উত্তম গৃহস্থের (অর্থাৎ কর্ম-
যোগীর) অবিকার আছে । অতএব
পূর্বোক্ত রূপ আশ্রয় দর্শন-শ্রবণাদি বিধিও
ঐরূপ গৃহস্থের প্রতি স্বীকার করিতে
হইবেক । যহু কহিলেন—“বখোক্তান্তপি-
কর্মানি পরিহার্য দ্বিষোক্তমঃ । আশ্রয়জ্ঞানে
পনেনচ স্ত্রাষেদাত্যাসে চ যত্ববান্” (১২। ১২)
কথিত অগ্নিহোত্ৰাদি কর্ম (বরং) পরি-
ত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আশ্রয়জ্ঞানে, ইন্দ্রি-
সংঘর্ষে ও বেদান্ত্যাসে যত্ববান হইবেন ।
কুম্ভকট্ট এ বচনের টীকার কহেন—“এত-
চ্চৈবাং মোক্ষোপারান্তরমোক্ষোপারম্ব প্রদর্শনার্থং
নত্বরিহোত্ৰাদি পরিত্যাগ পরতরেত্বাকং ।”
এই বচনটি মোক্ষের অন্তরঙ্গ উপায় প্রদর্শ-
নার্থ উদ্ভূত হইয়াছে, নতুবা অগ্নিহোত্ৰাদি
কর্মের পরিত্যাগার্থ নহে । বাস্তবত্যা
সংহিতার আছে—“অরম্ব পরমো ধর্মো
যদ্ব্যাপেনাশ্রয়দর্শনঃ” । বহু-আচার-দানাদি
পরম ধর্ম, বাটার যোগে আশ্রয়দর্শন চর ।
শঙ্করাচার্য্য কহেন, “সামনচতুষ্টিসম্পত্ত্যাত্বে-
হপি গৃহস্থানামাশ্রয়বিচারে ক্রিয়মাণে
সতি তেন প্রত্যবারো নান্তি কিম্বতীন
শ্রেয়ো ভবতি ।” (আশ্রয়ানুবিবেকঃ)
সামনচতুষ্টির সম্পত্তির অভাবেও গৃহস্থদিগের
কর্তৃক আশ্রয়বিচার কৃত হইলেও, তাহা
যদি প্রত্যবার হয় না ; অতএব সমস্ত কর্ম-
যোগিগণের উক্ত মহাবিদ্যার অঙ্গীকরণ
করা উচিত ।

অগ্নিহোত্ৰে, তাঁহাদেরই কথায় নাই ।
কেননা তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গীকরণে
এবং আশ্রয়ানুবিবেকে কৃতঃ যত্ববান্ ।
অতঃপর বাঁহারা শাস্ত্রবিধি উন্নতরূপে
এবং হিন্দু-বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক
“ব্রাহ্মধর্ম” নামে বাস্তবিক একেশ্বরবাদ
আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাও যদি
শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মবিদ্যার আরাধনা করেন,
তবে তাঁহারা একদিকে ব্রহ্মবিদ্যার
রূপ এবং তৎসাহায্যে অন্তর্দিকে হিন্দু-
ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারি-
বেন । কেন না ব্রহ্মবিদ্যা যেমন আশ্র-
য়জ্ঞানের প্রসূতী, সেইরূপ হিন্দুধর্মেরও
জননী । আমাদের সম্মুখে অনেক ব্রাহ্ম
উপনিষৎ, গীতা এবং অন্যান্য পরমার্থশাস্ত্র
শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বেদবিহিত ধর্মসেবক
এবং আশ্রয়হীন হইয়াছেন ।

১০। অতএব কর্মযোগী, ব্রহ্মজিজ্ঞাসু-
কর্মনিষ্ঠগৃহস্থ, এবং ব্রাহ্ম—সকলেরই উপ-
নিষাদাদি শ্রবণ পূর্বক ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ-
ীকরণ করা কর্তব্য । কিন্তু আশ্রয়ের
হল বিস্তর । উপনিষুক্ত ধার্মিক ও জ্ঞানী
ব্যক্তিদ্বিগের মধ্যেও অনেকে বিধব সেবার
বিকল্পিত । তন্মিত্তি কেবল মাত্র বিধব-
কর্মীলোক অনেক । আবার পাশ্চাত্য
বহুবিধ বিদ্যাতে নিপুণ অসংখ্য ব্যক্তি দৃষ্ট
হন, বাঁহারা জ্ঞান-ধর্মের কথা ভালবাসেন
না ; অথবা বাঁহারা বিদ্যা-বুদ্ধি দ্বারা অশাস্ত্র-
ীকরণ রচনা করতঃ তাঁহারা গুণ ও কৌশল
বর্ণনা মাত্র করিয়া নিশ্চিত করেন । শাস্ত্রীয়
জ্ঞান-ধর্ম তাঁহাদের ভাল লাগে না । সুতরাং
একদিকে বর্ণাশ্রমবিচার ও বহু-দেবার্জনা

১১। যে সকল কর্মীর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

কর্মের এবং অত্রদিকে ব্রহ্মবিদ্যা ও আত্মতত্ত্ব অহুণীশনের পাত্রাভাব ।

১১। পঞ্চদশী ধ্যানদীপে আছে—
 “পাসরণাং ব্যবহৃতকরং কর্ণাদাহুষ্টিতিঃ ।
 ততোপি সঙ্করণোপাস্ত্রিনিস্ত্রণোপাসনং ততঃ ।
 যান্বিজ্ঞান সানীপ্যঃ তাবৎ শ্রেষ্ঠাং বিব-
 র্ত্তে । ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নিস্ত্রণো-
 পাসনং শনৈঃ ॥” (১২১ ও ১২২ শ্লোক)
 অজানীদিগের অশাস্ত্র-ব্যবহারোপেক্ষা শাস্ত্র-
 বিহিত কর্মকাণ্ডের অহুষ্ঠান শ্রেয়ঃ । তদ-
 পেক্ষা সঙ্করণোপাসনা শ্রেষ্ঠ । আর সর্বা-
 পেক্ষা নিস্ত্রণোপাসনা অতিশয় শ্রেষ্ঠ ।
 এই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশঃ বুদ্ধিপ্রাপ্ত
 হইয়া, ইহা ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হয় ।
 এই করেকটা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ । সুতরাং
 শাস্ত্রীয় কর্মভূমিতে ঐহাদের স্থিতি নাই,
 অথবা শাস্ত্রবিহিত সঙ্করণ বা নিস্ত্রণোপাসনা-
 রূপ শ্লোগ বা ব্রহ্মচিহ্নরূপ ধ্যান-সমাধিতে
 ঐহাদের সতি নাই, কিম্বা উপনিষদাদি
 সৌক্ষ্যশাস্ত্র শ্রবণে ঐহাদের উৎসাহ নাই,
 ব্রহ্মবিদ্যাতে ঐহাদের রতি অসম্ভব ।
 অতএব ব্রহ্মবিদ্যা ও পরমাত্মজ্ঞান সাধনের
 পাত্র অতি দুর্লভ । এই দৌর্লভ্য চির-
 কালই অন্ন-বিস্তার আছে । তথাপি সম্ভা-
 বিত অধিকারীকে প্রবেশিত করিতে শাস্ত্র
 উপেক্ষা করেন নাই ।

১২। আত্মার বর্ত্তা অতীব দুর্জয় ।
 প্রতি কহেন—“আশ্চর্য্যো বক্তাকুশলোত্তমজ্ঞা-
 শ্চর্য্যোজ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ।” (কঠ) ইহার
 বক্তাও আশ্চর্য্য, লক্ষ্যও আশ্চর্য্য এবং
 সিপুণ আচার্য্যদ্বারা অহুশিষ্ট হইয়াছেন,
 এত জ্ঞাতাও আশ্চর্য্য । তপস্বদগীতাতেও

এই শ্রুতির তুণ্যার্থ বচন দৃষ্ট হয় । “আশ্চর্য্য-
 বৎ পশুতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবহুদতি তপৈব-
 চাক্তঃ । আশ্চর্য্যবট্টেনমতঃ শূণোতি শ্রুত্বা-
 পোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ” ২। ২২।
 এই আশ্চর্য্যকে কেহবা শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও
 আশ্চর্য্যবৎ বোধ করেন, কেহবা আশ্চর্য্য-
 বৎ বর্ণন করেন, কেহবা আশ্চর্য্য হইয়া
 শ্রবণ করেন এবং কেহবা শ্রবণ করিয়াও
 জানিতে পারেন না । বক্তা ও শ্রোতা-
 দিগের দেহাত্মবুদ্ধিরূপ নিপরীত ভাবনাই
 এই বিষয়ের তেত । কেবল ব্রহ্মবিদ্যার
 অহুণীশন দ্বারা উক্ত বিপরীত ভাবনা
 ক্রমশঃ তিরোহিত হয় । সাংখ্যদর্শনেও
 আত্মার দুর্জয়ত্ব কথিত হইয়াছে । যথা—
 “নশ্রবণমাত্রাত্তংসিদ্ধিরনাদিবাসনারাবল-
 যতঃ” (কপিলাসুত্র ২। ৩৯) প্রকৃতি হইলে
 আত্মা বতন্ত্র, এই মোক্ষজনক আত্মতত্ত্বের
 শ্রবণ সকলের ভাগ্যে সমানে ঘটে না ;
 কেননা যে সকল শাস্ত্রে সেই সকল তত্ত্ব-
 কথা আছে, তাহা শ্রবণে অনেকেরই সতি
 হয় না । কেবল ঐহাদেরই হয়, ঐহারা
 বহুজন্মের শাস্ত্রবিহিত কর্মহুষ্ঠান দ্বারা
 চিত্তভূমিকে প্রস্তুত করিয়াছেন । তথাপি
 অনাদিবাসনা বলবতী বিধায়, কেবল শ্রবণ
 মাত্রে ফল হয় না । শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে
 পুনঃ পুনঃ আত্মচিন্তন ও ধারণার প্রয়োজন ।
 তদ্বারা বহুজন্মের পর উক্ত অনাদিবাসনা
 ও অবিবেকতা তিরোহিত হইয়া, আত্ম-
 জ্ঞানরূপ মৌল অহুভূত হয় ।

১৩। সাংখ্য-মতে ব্রহ্ম বীজত্ব হয় না ।
 প্রত্যেক “আত্মাই” মোক্ষাবস্থার বতন্ত্র
 বতন্ত্র “ব্রহ্ম” । বেদান্তদর্শনের মতে,

একসাত অধীকার একত্ব সকল মুক্ত আত্মার
 মোক্ষরূপী পরমাত্মা। তাঁকে আত্মা
 বসিমা জানাই অজ্ঞান। প্রতীক্ষিত
 (Scriptures) উভয় ধর্মের মূল শ্রুতি-
 প্রতীক্ষিত। "আত্মা" শব্দটিকে সাধা,
 "অসংখ্য আত্মা" রূপে গ্রহণ করিয়াছেন ;
 আত্মবোধক সাংখ্যিক অনুসার "অসংখ্য
 বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ" বীকান কবিনাও, মোক্ষা-
 বতার একমাত্র পরমাত্মকে তাঁরদের
 মার্কান্দনীয় আত্মকে গ্রহণ করিয়াছেন।
 উভয় ধর্মের মতেই গায়ত্রীমন্ত্রাদি শ্রুতিমূলক ;
 স্মৃতিবা তাতার অধীনগন, আত্মার ধ্যান,
 ধারণা, বিচার প্রভৃতি যোগজনক। তদ্বারা
 প্রকৃতিব নিকাররূপ দেহাদিতে অজ্ঞানবৃত্ত
 এবং অনাদি অবিবেকতা, অজ্ঞান, অবিদ্যা
 প্রভৃতি বাসনা নিঃশেষে ধ্বংস হয়। বেদান্তের
 বিশেষ বাক্য এই যে, উক্ত পাজেতে
 স্বরূপকারণ-প্রকৃতি আত্মরূপে দুই হইয়া
 থাকে এই সমস্ত অজ্ঞানাকার ধ্বংস হইয়া
 থাকে। অতএব একমাত্র ব্রহ্মই বিজ্ঞানার
 মিত্য। অশেষ বস্তুবিচার নিশ্চয়োজন।
 একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই সর্বপ্রতিবন্ধকশূন্য
 প্রকৃতিপাদিবিবিধমুক্ত মোক্ষরূপ-
 প্রজ্ঞানজ্ঞানের আকর-তান যোগ, উপা-
 সনা, আত্মচিন্তা, বিচার প্রভৃতি বতলকার
 উপায়দ্বারা ঐ জ্ঞান, মুক্ত পুরুষের আত্মাতে
 প্রকাশিত হয়, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার
 স্মরণীয়তার অত্যন্তরে সে সমস্ত উপায়ই
 নিষ্ফল আছে। তৎসবকে উপনিষৎ,
 কথ্যশাস্ত্রীতা এবং পঞ্চশী প্রভৃতি শাস্ত্রে
 বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা। তাহার কতিপয়
 শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি। বস্তু পরমাত্মা,

তৎসমস্তের একবাক্যপ্রাপ্ত প্রদর্শন করিলাম।

১৪। তৃতীয় মুক্তকে পদম শব্দে
 চতুর্থ শ্রুতিতে ব্রহ্মবিদ্যাকে "ক্রিয়াবান"
 বলিয়াছেন ; যথা—

(১) "প্রাণোহেবরঃ সর্বভূতৈর্কীর্তাতি।
 বিজ্ঞানব্রহ্মান্ ভবতে নাতিবাদী। আত্ম-
 ক্রৌড় আত্মরতিঃ ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাঃ
 বরিষ্ঠঃ।"

(২) অর্থ—ইনিই প্রাণ, যিনি
 সর্বভূতে (আত্মরূপে) প্রকাশ পাইতে-
 ছেন। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে জানিয়া
 ব্রহ্মভিত্ত অস্ত্র রূপা করেন না। ইনি আত্মা-
 তেই ক্রৌড় করেন, আত্মাতেই রমণ করেন,
 তাঁনই ক্রিয়াবান, এবং ব্রহ্মবিদ্যার মর্মে
 পরিষ্ঠ।

(৩) এই শ্রুতিতে যে "ক্রিয়াবান্"
 শব্দ আছে, শব্দবাচ্য তাহার এই তাৎপর্য-
 লেখেন, যথা—

(৪) "জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া
 যন্ত মোহং ক্রিয়াবান্। •• কেচিৎকু
 আত্মহোত্রাদি কর্মক্রিয়াদ্যয়োঃ সমুচ্চমার্থ-
 সিদ্ধান্তি তৈসেব ব্রহ্মবিদাঃ বরিষ্ঠঃ। ইত্যনেন
 মুখার্থে পচনেন বিরুদ্ধতে। নহি বাহুক্রিয়
 আত্মরতশ্চ ভবিতুঃ শক্তিঃ কাশ্চৎ। বাহু-
 ক্রিয়ানিবৃত্তঃ আত্মকৌড়ে ভবতি। বাহু-
 ক্রিয়াত্মকৌড়য়ো বিরোধাত্। নহি তমঃ
 প্রকাশয়ামুপপদে ক্রিয়িতঃ সমুৎপতি। তস্মা-
 দ্ভসৎ প্রাপিতমেব তদনেন জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চর
 প্রতিপাদনং।"

(৫) অর্থ—জ্ঞান-ধ্যান-বৈরাগ্যাদি
 ক্রিয়া বাঁহার, তিনিই (এই শ্রুতির কথিত)
 ক্রিয়াবান। কেহ কেহ আত্মহোত্রাদি কর্ম

(অর্থাৎ নজ্জ-দেবার্চনা ও ভোমাদি কৰ্ম) ও ব্রহ্মনিষ্ঠা, এ উভয়ের সমুচ্চয়ার্থ ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ ভীতাবা মনে করেন, উভয়ে একত্রে অগ্ৰেষ্ঠের ও ভারতমারিত সমসঙ্গজনক। কিন্তু সেকপ মনে করা ভ্রম; কেননা ভাতাতটলে, ভাতাব এই মুখাণনচনে যে "ব্রহ্মনিষ্ঠা বশিষ্ঠঃ," ইত্যব সত নিবেদন পাড়ে। যেহেতু কোন নাক্তি যুগপৎ নাজ্জ-ক্রিয়াতে আনক ক্রিয়াবান এণং সেই সঙ্গে আত্মাতে রতিবিশিষ্ট ক্রিয়ানান, উভয়ই হইতে পারে না। বহুক্রিয়া হইতে বিনিবৃত্ত ও আনকিশুণ্য হইলে আত্মাকে লইয়া জীড়া কবিত্তে পারে। ভাতাব কারণ এই যে, বহুক্রিয়া ও আত্মকীড়া, এ উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ। তসঃ সান লোকশ এ দুই একসময়ে একত্রে স্থিতি কবিত্তে পারে না। অতএব এই জ্ঞান (আত্মরতি) আনকৰ্ম (বাহুক্রিয়া), এ উভয়ের সমুচ্চয় প্রতিপাদন অসৎ-পলাপ মান।

(৬) ভাৎপর্যা।—এখানে সমুচ্চয় শব্দা নিবারণই শব্দের উদ্দেশ্য। কিন্তু আত্ম-রতি ও বাহুক্রিয়া কি অল্প পরস্পর বিরুদ্ধ, এ কথার উত্তর এই যে, বাহুক্রিয়ার লক্ষণ বিশিষ্ট; মঙ্গলর এবং মনোবুদ্ধাদির ব্যাপার-বিশিষ্ট। যথা বজ্রাদি ক্রিয়া। তাহা একদিকে মঙ্গলসম্বায়ী, অত্রদিকে কর্তার মনোবুদ্ধাদির কাৰ্য্য। অনেক লোক এমন আছেন, বাহারা ব্রহ্মনিষ্ঠার অহুগীলন-ক্রম ও এই শ্রেণীর ক্রিয়ার মধ্যে আনয়ন করেন। তাহাতে ব্রহ্মের উদ্দেশে নৈবেদ্য ও ভোমাদির উৎসর্গ করেন না বটে; কিন্তু কতিপয়সক এককারণ মঙ্গলার্থেই

গণ্য করেন, এবং ব্রহ্মচন্দ্রকে মানসিক উক্তির এং বুদ্ধিবিরচিত কর্তৃ-সজ্ঞানের ব্যাপার বলিয়া করেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও আত্মরতি, উক্ত উক্তর লক্ষণেরই অতিক্রম। কেননা আত্মরতির ভুলনাম উভয়ই বাহুক্রিয়া। তত্তপদাদি মন উক্তির যেমন বশিষ্ঠঃ, মনোবুদ্ধিও সেইরূপ বশি-নিময়নিষ্ঠ। সগত চিত্তবৃত্তি যাত্ত আত্মরতি প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং বিকল্প-চিত্তে ব্রহ্মনিষ্ঠার অহুগীলন হয় না।

(৭) ভপাচ গীতান ৩-১৭।—"নস্বা-রতিরেন সাদাৎতুপশ্চ মানসঃ। আত্ম-জ্ঞে চ সংতুষ্টশ্চ কাগাং ম নিদাতে।" অর্থাৎ—যাচাব আত্মাতেই রতি, বিনি আত্মা-তেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সম্বষ্টে তাঁহার কোন কৰ্ম (অর্থাৎ ভোমাদি) করণীর নাই। কৰ্মসাধনে ভাতাব পুণ্য হয় না, নাকরিলেও প্রত্যায় হয় না। এই গীতাবচনে আত্ম-রতিকে কৰ্ম হইতে সংপূর্ণ বিশিষ্ট কৰ্মসা-ছেন। অতএব শাস্ত্রবিদ্যার অহুগীলন কিছুমায় ক্রিয়ামুপবেশ নাই। কাঙ্-ব্যাপারও নাই, মানস ব্যাপারও নাই। এ সবক্কে গচ্ছাৎ আরো বুঝা বাইবে।

(৮) কিন্তু বিজ্ঞান কবিত্তে পার কে— "আত্মা নঃ ময়ে স্তেভাঃ শ্রোত্রবাঃ সন্তপাঃ নিদধ্যাসিতবাঃ।" এগুলি কি মানসিক ক্রিয়া নহে? এ কথার উত্তরে শব্দের উক্তি গ্রহণ করা বাইতেছে, যথা—শ্রবণরং অব-গতার্থায়নন'নিদধ্যাসনকঃ;" শ্রবণ-বেদন জ্ঞান মাজের অভিজ্ঞাপক, তবং মনন, সিদ্ধিলাসন ও কৰ্মন শব্দেরও অবগত। অর্থাৎ জ্ঞান মায় অভিজ্ঞার; কিন্তু শ্রোত্রসি

মানসিক ক্রিয়া নহে। “নজু জ্ঞানং নাম মানসীক্রিয়া, ন, বৈলক্ষণ্যং, ক্রিয়া হি নাম সা। বজ বস্তুবরূপ নিরপেক্ষ্যব চোদ্যতে পুরুষ চিন্ত্যাপারাদীনা চ।” যদি বল— ব্রহ্মজ্ঞান মানসিক ক্রিয়া? সেকথা খাটে না। কেননা ক্রিয়ার লক্ষণ আর ব্রহ্মজ্ঞানের লক্ষণ পরস্পর বিপরীত। ব্রহ্ম সরং পরমবস্তু (substance and self-illuminating real entity)। সেই বস্তুবরূপ জ্ঞানিবার অপেক্ষা না করিয়া, কোন অলৌকিক ফলের নিমিত্তে যে দর্শন, শ্রবণ, ধ্যান ও মননাদি পুরুষের আভ্যন্তরীণ চিন্ত্যাপার, তাহার নাম ক্রিয়া। (শারীরক ভাস্ক ১।১।৫) তথাচ তলবকার ঋতি। “ব্রহ্মদেব তদিত্যাদর্থো অবিদি-তাদধি।” তিনি বিদিত কি অবিদিত—তাবৎ জ্ঞান হইতে তিন্ন। অতএব তিনি “বিদিত-ক্রিয়ার”—জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তৃপদ নহেন।

১৫। এতাবত উপরিউক্ত ঋতি-প্রতিপাদিত যে “ক্রিয়াবান্” শব্দ এবং জ্ঞানান্ত-বিবৃত যে জ্ঞান, ধ্যান, বৈরাগ্যাদি ক্রিয়া, তৎসমস্ত একমাত্র নিজ্জিম ব্রহ্ম-বস্তুতে পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে ব্রহ্ম-দর্শনের উপায় বরূপ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য যোগানুশ্রুতি করেকটী দৃষ্টান্ত বরূপে গৃহীত হইতেছে। সেই সকল-যোগোপদেশ এবং তদ্ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যা কতদূর ক্রিয়ালক্ষণাক্রান্ত, তাহা ক্রমে বোধগম্য হইবেক।

১৬। কর্তৃপনিষদের বর্তমানীতে আছে।
যথা—

(১) “নদীকূশে তিষ্ঠতিতপসত্ব ন চক্ষুযা পশতি কশটেননং। হৃদামনীষা মনসাতি-কংথোর এতবিদ্বদ্বৃত্ততে তবতি” ১০।

অর্থ।—বাহ্য দর্শনের বিষয়, সেই প্রত্যগাত্মার * বরূপ তদন্তর্গত নহে। অত-এব সেই প্রকৃত আত্মাকে কেহ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পার না। তাৎপর্য এই যে, তিনি কোন ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন। “বিকল্প বর্জিতয়া মনসা মনন রূপেণ সমাগুদর্শনেন অভিকংপুঃ অতিসমর্থিতোক্তিপ্রকাশিত ইত্যোতৎ। আত্মা জাতুং শক্যতে ইতি বাক্যশেষঃ।” বিকল্পবর্জিত (সংশয়শূন্য) মননরূপ সমাগুদর্শনাধারে সেই সুপ্রকাশ আত্মা প্রকাশিত হইলে, সাধক তাঁহাকে জানিতে পারেন। বাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহারা অমৃত হন।

(২) সেই বিকল্পবর্জিত মননরূপ সমাগু-দর্শন-সামর্থ্য কি প্রকারে জন্মে, তদ্বৃত্তরে পয়ের দুইটা ঋতিতে যোগ রূপ ক্রিয়া কহিতেছেন।—

(৩) “বদা পকাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তমাহঃ পরমাত্মিঃ ১।১০। তাং যোগমিতি মন্ত্রস্তে হিরানিঙ্গ্রিয়ধারণাঃ। অগমন্তস্তদাত্তবতি যোগোহি প্রত্যত্বাপারো” ১১।

অর্থ।—যখন মন সহিত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বীয় বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া “আত্ম-জ্ঞেব অবতিষ্ঠন্তে” আত্মাতে স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধিও স্বীয় ব্যাপারে বিচেষ্টিত না হয়, তখন তাদৃশ অবস্থাকে জ্ঞানীরা পরমগতি বণেন। এই যে স্থিরা ইন্দ্রিয়-ধারণা, ইহাকেই যোগ কহে। তৎকালে প্রমাদবর্জিত সমাধানের প্রতি বস্তু কর্তব্য।

* “প্রত্যগাত্মা” Animating and illuminating universal soul.

কেননা যোগের যেমন উৎপত্তি আছে, সেই-
রূপ অপারও আছে। অপার পরিহার্য
ঐশ্বর্য্যাদ কর্তব্য। এই অবস্থার, আত্মা
“অবিদ্যাধারোপণবর্জিত” পরমাত্ম-রূপে
প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তাঁহাতে অবিদ্যার
আরোপিত মনোবুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার
নিবৃত্ত হয়। (শঙ্কর)†

(৩) যোগ—ক্রিয়ারূপী বটে; কিন্তু
চিত্তবৃত্তিকে নিবৃত্ত করা তাহার উদ্দেশ্য।
তাঁহা নিবৃত্ত হইলেই, মন বিকল্পবর্জিত ও
ক্রিয়ারূপ হইয়া থাকে। তাহাতে অখিল অজ্ঞান
নষ্ট হয় এবং পরমাত্মরূপ দৃষ্ট হয়। সেই
বিকল্পবর্জিত ও নিষ্ক্রিয় মন, পরমাত্মরূ-
পের উদয়ে আপনিও বিনষ্ট হয়। তখন
আত্মা পরমাত্মাতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ
করেন। অতএব যোগক্রিয়া প্রত্যগাত্মাকে
প্রকাশ করণে অঙ্গসর্গ। তাহা কেবল

† “অবিদ্যাধারোপণবর্জিত” এই
বাক্যটির তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা স্বরূপতঃ
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত পদার্থ। তাঁহাতে যে মনো-
বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, স্থলদেহ এবং সংসার-ব্যবহার
স্পৃষ্ট হইরাছে, তাহা “অবিদ্যা-অধারোপণ”
মাত্র। অন্যাদি অবিদ্যা, কাম, কর্ম
তাঁহার বটক। তৎসমস্ত আত্মাতে আরো-
পিত অর্থাৎ অধ্যাত্ত হয় মাত্র। এই অধ্যা-
রোপণ বেকান্তের “রজ্জু-সর্প-স্তায়” এবং
সংখ্যায় “জ্বাফটিক-স্তায়” লক্ষণাত্মক।
আত্মা, মনোবুদ্ধ্যাদি উপাধি হইতে বিনি-
মুক্ত হইলে পরে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।
সেই স্বরূপাবস্থা “অবিদ্যাধারোপণবর্জিত”
i. e. free from the beginningless
imputations imposed upon it (the
soul) by ignorance in the shape
of mind, intellect, senses and
matter. C. S. B.]

আত্মগাথীর অজ্ঞান নষ্ট করে মাত্র।
কেননা প্রত্যগাত্মা স্বরশ্মপ্রকাশ।

১৭। অতএব যজ্ঞ-দেবার্চনাদির স্তায়
কোনরূপ বাহ্যক্রিয়া এবং চিত্তবৃত্তির নিরোধ
ও ইন্দ্রিয়ধারণা রূপ কোন প্রকার মান-
সিক ক্রিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারেনা।
তিনি সর্বপ্রকার ক্রিয়ার অবিষয়। কেননা
“বস্তুনসান মনুতে” মনের দ্বারা বাহ্যকে
মনন করা যায় না, কিন্তু বাহ্যদ্বারা মনের
প্রত্যেক মনন সুপরিচ্ছাদিত, তিনি ব্রহ্ম।
এইরূপ ক্রিয়ামুখপ্রবেশশূন্য ব্রহ্মজ্ঞানই হিন্দু-
শাস্ত্রের গৌরব। অত্র কোন দেশের শাস্ত্রে
ও দর্শনে এপ্রকার বিস্তৃত ব্রহ্মবিদ্যা দৃষ্ট
হয় না। তৎ সর্বত্রই মনোবুদ্ধি—এমন কি,
শরীর-ইন্দ্রিয়াদির আধিপত্য বিরাজমান।
সুতরাং মোক্ষ লক্ষণ অদৃশ্য। কিন্তু হিন্দু-
শাস্ত্র মতে, আত্মারূপ দর্শনে, চিত্তবৃত্তি
সমস্ত এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি, বিকল্পিত
মগ্নস্বরূপ। ব্রহ্মবিদ্যার আশ্রয় লইয়া, তৎ-
সমস্তকে বেষণ করিয়া মুছিয়া ফেলা, তখন
সেই নির্মূল্য দর্শনে স্বরশ্মপ্রকাশ ব্রহ্মকে
মুখ্যাত্মরূপে দর্শন পাইবে। এই আত্ম-
সাক্ষাৎকারই হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-লক্ষণ। সে
আত্মদর্শন তোমার ক্রিয়া নহে; কিন্তু সেই
পরমাত্মার আত্মপ্রকাশ মাত্র। পরের ছুটি
শ্লোকে এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতেছেন।—

(১) নৈব বাচ্য ন মনসা প্রাপ্তুং লক্ষ্যং
স চক্ষুরা।

অতীতি ক্রমতোহিত্তজ্জ কথং তদ্ব্যপলভ্যতে ॥

অতীতোব্যোপলক্ষ্যত্বং তাবৎ চৈতন্যমোঃ ॥

অতীতোব্যোপলক্ষ্যত্বং তাবৎ প্রসীদতি ॥

(১২ এবং ১৩)

(২) শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বগমক করেন—
 “মুক্তাদি চেষ্টাবিবরণং চেচ্চ ব্রহ্ম” ? যদি বল,
 ব্রহ্ম মনোবুদ্ধি-ইঞ্জিয়াদি চেষ্টার কি
 বিপরীত ? ইহার উত্তর এই যে, তাহা
 নহে। কেননা, এই দুইটা ক্রমিতে তাহা
 নিবেদ্য করিতেছেন। যথা—ঐহাকে না
 বাক্য, না মন, না চক্ষু দ্বারা পাওয়া যায়।
 বাঁহারা বলেন—তিনি আছেন, ঐহারাই
 ঐহাকে পান। তত্ত্ব কি প্রকারে ঐহাকে
 পাওয়া বাইতে পারে ? তিনি আছেন, এই
 প্রকার প্রত্যয়েও ঐহাকে পাওয়া যায়,
 আর তত্ত্বভাবেও ঐহাকে জানা যায়।
 উত্তরের মধ্যে বাঁহারা ঐহার অস্তিত্ব
 বলেন, ঐহারাই তত্ত্ব-ভাবেও ঐহাকে পান।

(৩) এখন প্রশ্ন এই যে, এই অস্তিত্ব-
 প্রত্যয়টা কি মনোবুদ্ধি-ইঞ্জিয়াদির কার্য্য
 নহে ? এ কথাটির উত্তর এই যে, তাহা নহে।
 হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ প্রাকৃতিক লোকের
 পক্ষে হুঁকর। ভারতবাসীগণ যে স্বাভাবিক
 চিত্তবৃত্তি ও ইঞ্জিয়াদি লইয়া জন্ম গ্রহণ
 করেন, তাহা প্রথমতঃ উপনয়ন, মন্ত্রদীক্ষা ও
 ব্রহ্মদীক্ষাদি দ্বারা সংস্কৃত হয়, পরে কামনা-
 ভ্যাগ হইলে, নিকাম ধর্ম্মদ্বারা অধিকতর
 পুত হয় এবং পশ্চাৎ জ্ঞানপথাবলম্বী হইলে,
 পরমার্থ-শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানে পরিণত হইয়া
 যায়। ইহার প্রত্যেক অবস্থায় মনোবুদ্ধি-
 দির স্বাভাবিকী গতি রোধ করা ও তৎ-
 পরিবর্তে ব্য়াদিকার শাস্ত্রীয় বুদ্ধি অথবা
 ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।
 অতএব উপরিউক্ত অস্তিত্ব-প্রত্যয়টা শাস্ত্র-
 অনুসারী, কিন্তু স্বাভাবিক চিত্তবৃত্ত্যাদির
 কার্য্য নহে।

(৪) শঙ্করাচার্য্য লেখেন—“অন্তিবাদিন
 আগমার্থানুসারিণঃ” বাঁহারা বেদার্থানুসারি-
 অন্তিবাদী, ঐহারাই ঐহাকে পান।
 তত্ত্বের বাঁহারা নাস্তিবাদী অথবা অশাস্ত্র-
 স্বাভাবিক জৈববাদী, ঐহারাই কি প্রকারে
 ঐহাকে জানিতে পারেন ? স্বাভাবিক
 জৈববাদীগণ স্বাভাবিক জগৎ দর্শনে সৃষ্টি-
 কর্তা স্বরূপ একজন জৈবের অস্তিত্ব অনু-
 মান করেন। কিন্তু বেদান্ত বলেন—জগৎ
 ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাই-
 তেছে। যেমন সন্তারজ্ঞকে আশ্রয় করিয়া
 মিথ্যা-সর্প সত্যবৎ প্রতিকলিত হয়। ইহাই
 আগমার্থ* এই জ্ঞান দ্বারা, অন্তিবাদী
 পুরুষ ব্রহ্মের তটহ ও সোপাধিক লক্ষণ
 ভেদ পূর্ব্বক ঐহার স্বরূপ-লক্ষণ ও তত্ত্বভাবে

* মিথ্যা দুই প্রকার। এক প্রকার
 একেবারে অণীক ও অস্তিত্বশূন্য; যেমন
 আকাশ কুহুম, শশশূন্য ও বন্ধার পুত্র। অস্ত্র-
 প্রকার মিথ্যা অণীক নহে, কিন্তু এক
 বস্তুর অস্ত্র বস্তুর ভ্রম। যেমন রজ্জুতে
 সর্প এবং গুক্তিতে রজত-ভ্রম। ইতাকে
 ‘অধ্যাস’ কহে। পরমায়া ভ্রাসভা ও কুটত।
 একেবারে অস্তিত্বশূন্য শশবিবাগবৎ অণীক
 পদার্থ ঐহাতে অস্থিত হয় না। স্মরণঃ
 এ জগৎ সেক্ষণ মিথ্যা পদার্থ নহে। কেননা
 ইহা সেই সংস্করণে অস্থিত হইয়া সন্তোর
 ভ্রায় প্রকাশ পাইতেছে। জীবের ‘কর্ম্ম,
 বাসনা, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি, এই গুলি
 জগতের বীজ। সেই বীজ ‘অভাবরূপী
 নহে (not a nonentity); কিন্তু তাবরূপী
 (is an entity)। বাহু জগৎ, সূন্য শরীর’ ও
 সূক্ষ্মদেহ তাহারই কার্য্য। আত্মা, অবিদ্যা-
 বশতঃ তৎসমতকে ‘আমি’ ও ‘আমার’ মনে
 করেন। পরমাত্মদর্শনে ঐ ভ্রম তিরোহিত
 হয়। ইহা কেবল মুক্তার্থীর পক্ষে।

লাভ করেন। ফলে বাঁহারা অগৎরূপ কার্য দেখিরা, বাস্তাবিক বুদ্ধিবৃত্তিধারা ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তাঁহারা পেরূপ পারমাণ্বিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। অতএব ঐশ্বর্য এই অস্তিত্ব-প্রত্যক্ষী মনোবুদ্ধি-ইঞ্জিরাদির কার্য নহে; কিন্তু আগমার্থ-অস্বীকারী।

(৫) “বতোবা ইমানি” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “জন্মানাত্ত বতঃ” ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র যদিও অগৎ-কার্যরূপ তটস্থলক্ষণ ও ঔপাধিক-নির্দেশ দ্বারা ব্রহ্মনিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু “তবিত্ত্বজ্ঞানস্ব” প্রভৃতি উপদেশ দ্বারা তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে আদেশ দিয়াছেন। সেই সকল উপদেশের উদ্দেশ্য এই যে, সেই সংস্করণ ব্রহ্মেতে এই অগৎ অধিত হওয়ার সত্যের জ্ঞান প্রকাশ পাইতেছে। বাঁহার জ্ঞানোদয় হয়, তাঁহার দৃষ্টি হইতে ঐ তটস্থ ও উপাধি-লক্ষণ অস্ত-গত হয় এবং ব্রহ্ম কেবল তত্ত্বভাবে প্রকাশ পাবেন।

(৬) “তত্ত্বাহুপাধিকতাস্তি প্রত্যয়েনো উপসংকৃত্ত পুশ্চাৎ প্রত্যন্তরিত সর্কোপাধি-রূপাশ্চক্ৰ তত্ত্বভাবে বিদিতাবিদিতাত্যাম-ভোহবর বতাবে নেতি নেতিহুলমনপুহুব-মদৃশ্চে অন্যভোহনিলয়নে ইত্যাদি শ্রুতি-নির্দিষ্টঃ তত্ত্বতাবঃ প্রসীদতি অতিমুখী তবতি আত্মপ্রকাশনার পূর্বমস্তীতাপলকবতঃ ইত্যে-ত্ত্ব”। (শাকর ভাষ্য।)

(৭) অর্থ।—যে সাধকের -সেই শাস্ত্র-স্বয়ং উপাধিকৃত অস্তিত্ব-প্রত্যয়ে অগতের সূক্ষ্মরূপ আত্মার উপলব্ধি হয়, তাঁহারই স্বয়ং-পুশ্চাৎ সর্কোপাধিবিশিষ্টক বস্তুত্ব-

স্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্বতাব আপনা হইতে প্রকাশিত হয়।—সেই তত্ত্বতাব কিপ্রকার, তাহা কহিতেছেন। যিনি বিদিত ও অবি-দিত হইতে অস্ত, অপরতাব; ইহা নহে, ইহা নহে, বাঁহার নির্দেশ; যিনি হুল নহেন, অণু নহেন, হুব নহেন; যিনি অদৃশ, অশ-রীরী, নিরামায়, ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য তত্ত্বতাব। এই তত্ত্বতাব, ঐ পূর্বঅস্তিত্ববিধানী ব্রহ্মবাদীর আত্মাতে পরমাত্মাকে প্রকাশ করিয়া দিবার নিমিত্ত অতিমুখ হয়।

১৮। এই অপর তত্ত্বতাব, ক্রিমা-লক্ষণা বাস্তাবিকী চিত্তবৃত্তির অতিক্রান্ত; এ পর্যন্ত তাহা বুকান গেল। যদি বল, যান-বোগ দ্বারা তাহা লাভ হয়, একথাও সংপূর্ণ রূপে লয় হয় না। কেননা, চিত্তচাক্ষ্য-রাহিত্য ও চিত্তবৃত্তির নিরোধাবস্থার নামই বোগ। সে বোগ দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষীর অজ্ঞান নষ্ট হয় মাত্র; কিন্তু তাহা অপর ব্রহ্মতাবকে প্রকাশ করিতে পারে না। যেহেতু সে ব্রহ্মতাব বরশ্রকাশ। বোগ ও তপত্বাদি দ্বারা বাঁহার সত্ত্বত্ব (চিত্তত্ব) হয়, তাঁহার আত্মাতে ঐ ব্রহ্মতাব, অপর আত্মা রূপে দৃষ্ট করেন। সেই অপর আত্মাই সাধকের নিখিল চুঃখংগবোগের বিরোধরূপী বোগগঞ্জিত। এই অবস্থার জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যরূপ পরমবোগ সিক্ত হয়। তখন জীবাত্মা, কর্তৃব-ভোক্‌ত্বাদি ক্রিমা-লক্ষণবর্জিত হইয়া, সর্কোপাধি-বিশিষ্টক অপর পরমাত্মতাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯। কিন্তু যদিও এই ক্রিয়ালক্ষণবর্জিত অপর ব্রহ্মতাব উপলব্ধিদ্বারা সর্কোপাধিতের মুখ্য উপদেশ এবং তাহাই ‘ব্রহ্মবিদ্যা’ জ্ঞানে

অভিহিত হয়, তথাপি তৎসহভাবী বিধায়, হ্রাদোগ্য ও খেতাবতর প্রভৃতি কোন কোন উপনিষদে এবং পঞ্চদশী ও বেদান্ত-সার প্রভৃতি গ্রন্থে নানা প্রকার ক্রিয়ালক্ষণা ধ্যান-ধারণা এবং ব্রহ্মোপাসনার বিধি দিয়াছেন। সেগুলি যজ্ঞ-দেবার্চনাদি ক্রিয়ার জ্ঞান মঙ্গলমহারী কর্ণযোগ নহে; কিন্তু অমূর্ত ব্রহ্মের পরোক উপাধিক ও সাবলম্ব উপাসনা। তৎসমূহের আশোচনা ও অনুষ্ঠানও ব্রহ্মবিজ্ঞা সাধনে উপকারী। সেগুলির বিচারে বিশেষ বস্তু কর্তব্য। এই সমস্ত উপাসনার এবং তৎপ্রতিপাদক প্রতি অর্থাৎ বেদবাক্য সমূহের সামাজ্যতঃ দ্বিবিধ অন্তর। এক পক্ষে ক্রিয়ামহী বিধায়, সেগুলিকে যেন ব্রহ্মসাধন ক্রিয়াক্রম বোধ হয়, পক্ষান্তরে জানের অন্তরঙ্গ বিধায়, ব্রহ্মজ্ঞানের সদৃশ বলিয়া অনুভূত হয়। এই সমস্ত ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, আত্মাহেবণে মতি এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সমুৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ সেগুলি বহুবিধ অবলম্বনযুক্ত। যথা—মন, প্রাণ, প্রাণব, পায়ত্রী, আকাশ, সূর্য্য প্রভৃতির বৈরাটিক অঙ্গ ইত্যাদি। শাস্ত্রে এই সমস্ত অবলম্বন নির্দিষ্ট থাকিতে এবং ক্রিয়ামহী বিধায়, লোকে এই প্রকার অনুষ্ঠান ভালভাবে। কেননা অবলম্বন-যুক্ত ধ্যানাদিরূপ ক্রিয়াতে এবং উপাসনার উন্নতির অন্তর। এই হেতু উপনিষদাদি ব্রহ্মশাস্ত্রে, জানের অন্তরঙ্গ উপায় রূপে এগুলির বিধি দিয়াছেন। এগুলিকে মন, উপাসনা বা যোগ, বাহ্য ইচ্ছা বলিতে পারি। কিন্তু তৎসমস্ত বাহ্যিক ক্রিয়ামহী নহে। ক্রিয়ামহী তৎসমস্ত জানীদমাত্র;

এবং ব্যক্তিকিং ক্রিয়াজাগ বাহ্য ভাবাতে আছে, তাহা অবলম্বন মাত্র।

(ক্রমশঃ)°

শ্রীচন্দ্রশেখরবহু।

ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য।

প্রথম প্রস্তাব।

(পূর্নানুবর্তি)।

পৃথিবীর সমুদয় সৃষ্টি সমাজে সূত্রাক্রমের প্রাশংসা প্রদান ও পাঠ করা যায়; কুত্রাক্রমের প্রশংসা কোথাও নাই। কুত্রাক্রমের উপনীতির কোন সূত্র্য নাই এবং কুত্রাক্রমের আলীন্দ্রাদে কোন প্রকার লাভ বা অভিধানে কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে না। হিন্দুশাস্ত্রে সূত্রাক্রম-মাহাত্ম্য সহজে অসংখ্য উক্তি পাঠ করা যায়। বস্তুতঃ বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি কর্তৃক পৃথিবীর কত স্থানে কত প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার সহজে ইয়ত্তা করা যায় না। আধিদৈমিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ ভাগ হইতে মুক্ত হইবার লজ্জা বাহ্য কিছুই প্রয়োজন, মানব-কুলগৌরব, সূত্রাক্রমবর্ণ তাহা একান্তরে দাতা কর্ণের জরি অগংকে দান করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞান-বৈশিষ্ট্য-ব্রাহ্মণ জাতির অতুলনীর প্রতিভা-বলে, অন্যভিচারিণী ভক্তি-মাহাত্ম্যে, অনন্তসাধারণ তপঃপ্রভাবে এবং বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞান-বীরামিক বীর মহাবলী ক্রিয়ের মরণবিধি প্রকৃতক পায়ত্রয়-শিতর জার আশ্বিক

বশীভূত হইয়া থাকিতেন এবং ব্রাহ্মণের ইচ্ছিতানুসারে সমুদয় গুরুতর ও প্রয়োজনীয় নৈবেদ্যিক ব্যাপারাদি সম্পাদন করিতেন। ব্রাহ্মণ জাতি কোন কালেই ধর্মের নিনিম্নে ধনাকাঙ্ক্ষাকে ছদ্মবেশে স্থান দেন নাই। অর্থও আনন্দ-প্রদায়ক মোক্ষধনের পরিবর্তে কণিক খণ্ডসুখকে পার্থিব ধনকে ইহারা কখনই গ্রহণ করেন নাই। ধর্মতত্ত্ব, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, সমাজতত্ত্ব, কৃষি, অর্থব্যবহার, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা, কুটিল রাজনীতি, জটিল গণিত, ব্যবস্থাসাজ্য প্রভৃতি বাহা লইয়াই আলোচনা করি, সর্ববিধেই ব্রহ্মকুলোদ্ভূত ব্রাহ্মণের অসাধারণ প্রতিভা, পরিশ্রমপারায়ণতা, কার্যকুশলতা এবং আধ্যাত্মিক তেজ অবলোকন করিয়া সন্তোষিত হইয়া পড়ি। দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণের এতটা সামর্থ্য না থাকিলে, দেবগুরু স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচক্র তাঁতাদের পদপ্রক্ষালন সেবা-সম্পাদনে সন্তুষ্ট হইতেন কি? বস্তুতঃ জগতে যদি সুব্রাহ্মণের জন্ম না হইত, এই সারাসম্রাট ও পাপসম্রাট মর্ত্যভূমি যদি সুব্রাহ্মণের পদস্পর্শ পবিত্র না হইত, যদি সুব্রাহ্মণের পূর্ণ আশীর্বাদে পাপী মানব বিগতকায় হইতে না পারিত, তাহা হইলে কবির ভাষায় আমি কহিতাম—

দেবার উৎস, জ্ঞানের আকর,

বিরেকের দীপ, ভক্তি-বারিষি।

হইত। নরনার সব চরাচর,

না জানিত্তে তুমি জগতে যদি ॥

উপরোক্ত কুলবারিষ্ট শ্রীমৎ মহর্ষি মহা মহোদয় বোধহয় এই লজ্জাই লিখিয়া গিয়াছেন—

“ব্রাহ্মণঃ দশবর্ষক শতবর্ষক ভূমগম্।
শিতা-পুত্রোবিজ্ঞানীয়াংব্রাহ্মণস্ত তরোঃশিতা।”
(মহুগংহিতা)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যদি দশবর্ষবয়স্ক হইলে, আর ভূমিগ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়) যদি শতবর্ষবয়স্ক হইলে, তথাপি উভয়ের মধ্যে রাজ্য বিষয়ে শিতা-পুত্রের জায় পৃথক জানিতে হইবে। মহর্ষিগণ আরও লিখিয়াছেন—
“যং শিষ্টা ব্রাহ্মণা ক্রয়ঃ সদর্শ সাদশক্তিঃ”
অর্থাৎ সুশিষ্ট ব্রাহ্মণসুল্য বাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা নিঃসন্দেহে ধর্মবাক্য বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। ভাগবতের মহাত্মজ মহর্ষি মহাশয় কহেন, “ব্রাহ্মণবর্ণ জগতের গুরু এবং সৃষ্টিকর্তা ব্রাহ্মণ শ্রীমুখারবিন্দ হইতে নিঃসৃত, সূতরাং ব্রাহ্মণেরা পৃথিবীর আলোক ও মানবরূপে দেবতা।” মহর্ষি বায়্বিক তাঁহার সদাশুখপাঠ্য সারসংক্ষেপে লিখিয়াছেন, “শতাব্দিক হস্ত দূর হইতেও ব্রহ্মসৃষ্টির অপূর্ণ জ্যোতির্ময় ব্রাহ্মণেরা জ্ঞাপনা হইতেই সুপরিচিত হইয়া থাকেন।” বেদে, উপনিষদে ও শ্রীমৎভাগবতাদি শাস্ত্রে, ভগবানের অপর নাম ব্রাহ্মণ। সর্ব শাস্ত্রের মূল বেদে, ব্রাহ্মণই ভগবানের নামান্তর বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফরাগী দেশের মুসোলি জেকলির অল্পমান করেন, ব্রাহ্মণের দেহে, মনে, মস্তিষ্কে, আত্মার সর্ববিধ সাত্ত্বিকতার প্রভাব দেখা যায়। ফলতঃ নানাবিধ কারণে বর্তমান কালে ব্রাহ্মণ-সমাজের পবিত্রতায় হ্রাস ঘটনা থাকিলেও, এখনও ব্রাহ্মণেরা সর্ববিধে সর্বশ্রেষ্ঠ পদবী ও সামর্থ্য অধিকার করিয়া আছেন। সুব্রাহ্মণবর্ণচিত্রকালই পুণ্য

ও নমস্। তত্কাধিকতম দাপরধি রার
পাছিয়াছিলেন—

“মন-মানসে সদা তজ বিজ-চরণপত্নজ।
বিজরাজ করিলে দরা নামনে পরে বিজরাজ ॥”
—(অপিচ) “এ রোগের ঔষধি কেবল
ব্রাহ্মণেরি পদরজ।” উতাদি।

মহাভারতে লিখিত আছে, সুরাক্ষণের
পরামর্শ আয়ুর্ধক ও বিনিম কল্যাণের
আকর। যে ব্যক্তি সুরাক্ষণের বাক্যে
অবহেলা করে, তাহার পরমায়ু থাকিলেও
অপরায়ণ আয়ুষ্কর হয়।

“দীপনির্দীপগন্ধক ব্রহ্মবাকাসকন্ধণীম্।
ম জিহ্বান্তি ন শৃণুন্তি ন পশ্যন্ত গত্যুযঃ ॥”

মহামহর্ষি মহু লিখিয়াছেন—
“ভূতানং প্রাণিনঃশ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনঃবুদ্ধিজীবিনঃ।
মুচ্ছিনং সূ নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু নাক্ষণাঃ সূ তাঃ ॥”

হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ সংহিতায় লিখিত আছে—
“নাক্ষাৎ ধর্মত মৃষ্টিভাঃ পুত্ৰত্যাঃ সর্বসংস্কৃতেঃ।
শুকত্যাঃ সর্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণেভ্যো নমোনমঃ ॥”

বলের জাতীয় ইতিহাস-গণেতা সু প্রসিদ্ধ
প্রাকৃতবিদ্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বহু লিখিয়া-
ছেন—“ব্রাহ্মণগণ পূর্বাগর হিন্দুসমাজের
শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আসছেন। রাজ-
প্রাসাদবাণী মহাসমৃদ্ধিশালী রাজাধিরাজের
যে সম্মান নাই, কুটীবাণী তিকাধীণী
ব্রাহ্মণের তদপেক্ষা অধিক সম্মান। এ
অপূর্ব ও অবিকলিত সম্মান কিরূপে ব্রাহ্ম-
ণেরা উপার্জন করিলেন, হিন্দুদিগের সকল
ধর্মপাত্রেই তাঁদের বখেই পরিচর প্রেরিত
হইয়াছে,—সজ্জনিতা, ইন্দ্রনিগ্রহ, যদা-
চর, উত্তম ও সজ্জনিতাই তাঁহার সুখা-
করণ”। বহুসংখ্যক লিখিত আছে,

বিজ্ঞা-তপঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণের মুখ অমৃতত্বা—
“বিজ্ঞাতপঃ সমৃৎকমু হতঃ বিপ্রমুখাশিবু।”
মহু ইহাও কহেন, ব্রাহ্মণ মহাদেবতা বরণ—
“ব্রাহ্মণো দৈবতঃ মহৎ”। মহু মহর্ষি
ইহাও কহিয়াছেন যে—

“বস্ত্রাভ্রন সদাপ্রতি হন্যানি জিহিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিছুতমধিকং ততঃ ॥”

অর্থাৎ, দেবতাপণ যে ব্রাহ্মণের মুখে
হনীর জবাশি ভোজন করেন, পিতৃলোক
সকল বাহাদিগের মুখে শ্রীকাদি-প্রদত্ত
অন্নাদি ভোজন করেন, সৈদৃশ ব্রাহ্মণ হইতে
কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন।

“বাখ্যাঞ্জনজঠৈর্হোমৈর্জৈবিত্তেনেজ্যারাজুঠৈঃ
মহামৈজ্ঞৈশ্চ যৈজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীরঃ জিরতে তমুঃ ॥”

মহুঃ নতে উপরি উক্ত শ্লোক দ্বারা মহুঃ দ্বারা
ব্রাহ্মণ-সম্মান প্রাপ্ত হয়।

“শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ বস্ত চ প্রিয়মাক্ষনঃ।
সম্যক্ সক্রমজঃ কামো ধর্মমূলমিদং সূ তমু ॥”

বেদজ্ঞান, স্মৃতিজ্ঞান, সদাচার প্রভৃতিতে
সমলভ্যত পুত্রবই ব্রাহ্মণ। “ব্রহ্মবেদঃ জ্ঞ
যো অধ্যয়নং করোতি স ব্রাহ্মণঃ”। “ব্রহ্মবিৎ
স ব্রাহ্মণঃ।” “নিচ্যত্রতী সত্যব্রতঃ সর্বৌ
ব্রাহ্মণ উচ্যতে।”

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবার গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।”
অজিনহিতার ধ্বনি কহেন, ব্রাহ্মণগণ
অপহোমের দ্বারা অগ্নির ন্যায় তেজস্বী
হয়েন। “পাবকাইব দীপ্যন্তে অপরহোমৈঃ
দিকোত্তরাঃ।” মহাত্মা মহু, ব্রাহ্মণ-সাহায্য
বর্ণনা করিয়া, অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের
মধ্যে নিম্নলিখিত দোক দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব
করিয়াছেন।—

“ব্রাহ্মণেযু চ বিধাৎসো বিধংসু কৃতবুধরঃ ।
কৃতবুদ্ধিযু কর্তারঃ কর্ত্বু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥”

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সর্বাঙ্গেকা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ব্রাহ্মণের মধ্যে বিধান ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠতর। বিধানের মধ্যে শাস্ত্রীর কর্তৃত্বতানে যাঁহাদের কর্তব্য-বুদ্ধি আছে, তাঁহারা আরও শ্রেষ্ঠ; কৃতবুদ্ধিদিগের মধ্যে যাঁহারা কর্তব্য কর্ম গালামে কদাচ পরাধুখ নহেন, তাঁহারা সর্বাংগেই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মবিৎ জানী ও সচরিত্র ব্রাহ্মণ সকলের পিরোনমি। এরূপ ব্রাহ্মণ সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী।

ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবা মাত্রই পৃথিবীর সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন, যেহেতু সকলের ধর্ম সমূহের রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের জন্ম হইল।

“ব্রাহ্মণো জারমানোহি পৃথিবীমধিজারতে ।
ঈধরঃ সর্বভূতানাঃ ধর্মকোষস্ত ওপরে ॥”

ব্রাহ্মণের দেহ ধর্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্তি; ধর্মের অস্ত্র উৎপন্ন ব্রাহ্মণ মোক্ষলাভের উপযুক্ত করেন।

উৎপত্তিরেব বিপ্রস্ত মূর্তি ধর্মস্ত শাখতী ।
সহিধর্মার্থবুৎপন্নো ব্রহ্মভূমার বলতে ॥
উত্তমাত্মোত্তম জ্যোত্যাঃ ব্রহ্মগঠনং ধারণাৎ ।
সর্বস্ত বাস্ত সর্বস্ত ধর্মতো ব্রাহ্মণঃ পতুঃ ।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার সুখারবিন্দু হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে বলিয়া এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রের অঙ্গে ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে বলিয়া, ব্রাহ্মণ সকলের প্রভু।

“আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্তিঃ পিতামূর্তিঃ প্রজাপতেঃ ।
মাতা পৃথিবী মূর্তিঃ ভ্রাতা বসুধিরাশ্বতরঃ”

১. ব্রাহ্মণ নামেই আচার্য্য (উপদেশক ও শিক্ষক), ২. ব্রহ্মণ আচার্য্য ব্রাহ্মণের মূর্তি,

পিতা প্রজাপতির মূর্তি; গর্ভদায়িনী মাতা পৃথিবীর মূর্তি এবং সচোদর ভ্রাতা আপন্যার দ্বিতীয় মূর্তি। ব্রাহ্মণ মর্ত্যে কেবল দেবতা নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। “ব্রহ্মাবদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”—ব্রহ্মবিৎ সয়-ই ব্রহ্ম।

হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের সাহস্য্য বর্ণনায় বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ইহাও লিখিয়াছেন—

“সর্বভূক্ত্যরতিমিত্যাঃ সর্বকর্মকরোহুত্তিঃ ।
ভাক্তনেন্দ্রনাচার সঃ সৈ শূত্র ইতি শূত্রঃ ॥”

অর্থাৎ, যে ব্রাহ্মণের খাদ্য খাদ্যের নিচার নাট, জীবিকা-নির্মাহার্থে ব্যবসায়ের নিচার নাট, এবং দেহ ও মন অস্ত্রি, অথবা যে ব্রাহ্মণ নৈম পরিভ্যাগ করিয়াছে এবং আচারম্রষ্ট হইয়াছে, সে ব্রাহ্মণ নিশ্চরই (এই শূত্রগন্ধক জন্ম) শূত্র। “আমিষের প্রসার” নামক পুস্তকে চিন্তাশীল গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

“ত্বাম সাহাবাদৌ, ত্বমি প্রস্র করিবে যে, ব্রাহ্মণ তোমার শ্রেষ্ঠ কিম্ব? আচ্ছা, আমি তোমার বলি, ঐ যে উচ্চশূত্র গিরি-রাজ হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত অধিকার করিয়া আছে, উহার সহিত কি অন্যান্য পর্বতের সমকক্ষতা চলে? লক্ষতবন্ধা পুত্রসলিলা ভাগীরথীর সহিত কি অন্যান্য নদীর সমকক্ষতা চলে? অত্রতেদী সহস্র বোজনব্যাপী হিমালয়কে পদচূত করিয়া, যদি তোমার আশ্রয়-সমূহবিত উচ্চ বন্দীক-কর্ণপকে তাহার স্থানে বসাত, তাহা কি কখনও লালো? ভীষ্মবাহিনী, বাশিষ্কনবাহিনী, কেজয়-সর্বভাভাহিনী, প্রভৃৎ-মর্ত্তিও-ভাপবদিত

ভূক্যানিবারিণী, সমগ্র-আর্য্যাবর্তব্যাপিনী, জিত্তাপনামিনী, পত্তিতপাবনী গঙ্গার পদ-বীতে শৈবালবিশিষ্টা, অসাহ্য-মলিলা, কোন শ্রোত্র-বিরচিতাকে স্থাপন করাইলে কি কখনও সাধে ? বাহার ভিতরে চৈতন্য-শক্তি বহু অধিক পরিমাণে থাকে, সে ভূত বড় হটবেই হটেবে ; কিছু-ই তাহার বাহার ঘটবে না। একটি অশ্বখীজ এক স্থানে রোপণ কর, আর একটি নারিকেল উহার নিকটে আর এক স্থানে রোপণ কর। অশ্বখীজ একটি মর্ষপ অপেক্ষাও বহুগুণে ক্ষুদ্র। এখন এই দুই বস্তুর শক্তির বিচার কর। ক্ষুদ্র অশ্বখীজোদ্ভূত বৃক্ষ, কাণ্ড-শাখা-পত্রবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষই বা কেন, আর বৃহৎ নারিকেলোদ্ভূত বৃক্ষ কাটুকমান একটি সরল দণ্ড—সামান্য নারিকেল বৃক্ষই বা কেন ? উভয় বীজই সমানভাবে তাপ, জল, বায়ু দ্বারা পরি-বর্ধিত হইয়া, একই ক্ষেত্রে এইরূপ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষের কারণ হয় কেন ? নারি-কেল যেখানে রোপণ কর না কেন, উহা অশ্বখীজের দ্বার শক্তিসম্পন্ন হইবে না। অতএব 'সিদ্ধান্ত হইল যে, অশ্বখীজের এমন একটা শক্তি আছে, যে উহা ক্ষুদ্র হইলেও, উহার মূর্তিকা-রম্যকর্ষণী শক্তি নারিকেলের বীজের শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক, এবং শক্তিদ্বারা সে মূর্তিকার সার-ভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া সে অত বড় ; নারিকেল তাহা পারে না বলিয়া সে উহা অপেক্ষা অত ছোট। সকল নদীই গঙ্গা নর, সকল দার্শনিকই কণ্ঠস্বর, সেইরূপ সকল

মহুয়াই ব্রাহ্মণ নর। জড়জগৎ যে নিরসে নিরসিত, মানব-জগৎ তাহা নহে। জড়-জগতের নিজ ক্রিয়া নাই; মানব-জগতের উন্নতি-অবনতি স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া-সাপেক্ষ। সকল মহুয়া-ই 'ব্রাহ্মণ' হইবার শক্তি-বীজ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু বাহার সেই শক্তি পরিবর্ধিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ হয়; বাহার হয় না, সে ব্রাহ্মণও হয় না; সেই-ই-তর মহুয়া রহিয়া যায়। প্রাণ্ডুক্ত উদা-হরণ অরণ করিয়া দেখ, যেমন নারিকেল-বৃক্ষের বীজ অপেক্ষা তাবৎ অশ্বখ বৃক্ষের বীজ অধিক শক্তিসম্পন্ন, তেমনই অশ্বখ বৃক্ষের বীজসমূহের মধ্যেও শক্তির অস্বাধিক্য আছে। সৃষ্টিই বৈবস্বায়; আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, বৈবস্বাই সৃষ্টি।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্রামানন্দ মহাতারতী।

'স্বদেশী'-সমস্যা

ভগবানের কি ইচ্ছা, জানিনা; কলে দিন দিন দেশে 'স্বদেশী' সমস্যা বিবম হইয়া উঠিল। স্বদেশভক্তি-ভাবুকগণ তাবিয়া দেখিবেন, দেশে কি সঙ্কটকাল উপস্থিত। একদিকে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়ার দেশ-বিদ্ধ-সিনী বিলোল রসনা, আর দিকে দারুণ-দুর্ভিক্ষ-রাকসী লক্ষ লক্ষ নরমৃত্যুতরুণে ভীষণ-দশনা। দুঃসহ দুর্খল্যাতার দাউ দাউ অগ্নি-পিখা। দারিদ্র্যের বিকট-বিভীষণ। মর্কোপরি এই 'স্বদেশী'-সমস্যা-সঙ্কটে দেশ-স্বয়ং-স্বার্থ-সংঘর্ষণ- (স্বতরায়) রক্ষা-প্রক্রিয়া

রাজ-রোষের বহু বর্ষণ। একেণ উপায় কি ?
‘বদেশী’ আমাদের ‘জীবন-কাঠি—সমগ-কাঠি’
হইরাছে। বদেশী ছাড়িলে এখন আয়তন
কমিতে হয়, আপন দোষে মরিতে হয়।
আমার বদেশী বাঁচাইতেও দেখি কর্মদোষে
রাজরোষে মারা গাঠি। কবির ভারতচন্দ্রের
কবিগণা আজ ভারতবাসীর প্রাণের
কথা।—

“না ধরিলে রাজ্য বশে, মরিলে ভূদল।

সীতার হরণে যেন মারিচ-কুরঙ্গ ॥”

এ উত্তর সন্ধটে উপায় কি ? দেশের
বর্তমান স্বাভাবিক সঙ্কট অবস্থাকে এই
‘বদেশী’-সমস্যা আরও নিকট করিয়া তুলি-
রাছে; কেননা সন্ধটের সকল অংশেই বদেশী-
সাদনার কার্যকারিতাই ধার্ম্য হইরাছে।
প্লেগ প্রভৃতি রোগাধিকার কারণ প্রধানতঃ
কারিত্যা এবং ‘বদেশী’ই ভারতবর্ষের
উপায় বদিয়া নিজ অভিভ্রমণের অভি-
সত প্রকাশিত হইরাছে। বস্তুতঃ উপযুক্ত
খাওয়া পরার অগংহান ও অসুপযুক্ত দাস-
ত্যানাদি দোষেই সংক্রামক ব্যাধির সর্ব-
সংহারিণী* মূর্তি প্রকাশ পায়। প্লেগ
প্রভৃতিতে করটা সাহেবলোক বা বড়লোক
বরে ? দেশের দুঃই অগস্তরহ জনসমাজেই
মারী-মরণ বিস্তারিত। সুতরাং দারিদ্র্যের
মহিভাই এই দেশ-টুচ্ছেদক রাক্ষসের অনেকটা
অধিকার-সম্বন্ধ, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ
নাই। তারপর হুর্ভিক-চর্যুলাতার এই দারুণ
করাসমতঃ দারিদ্র্যের কঠোর হস্ত হইতেই
বহুস্থিত। শতপ্রকার অন্নতা এই হুর্ভিক—
চর্যুলাতার পান্যিক গৌণ কারণ হইলেও,
সংক্রামক ব্যাধির সংক্রামক হইতে। সত্য

বটে, সেই “এক টাকার আটদশ চাউলের”
দেশে আজ আট টাকার একদশ চাউল
হইরাছে, কিন্তু অস্বদেশের তুলনার বিলাসিত
প্রভৃতি দেশে স্বভাবতঃই খাদ্য শস্ত-কলাদির
বিশ্বগ-চতুর্গণ মূল্য বারমাস বর্ধমান;
অশচ হুর্ভিক—চর্যুলাতার হাহাকার নাই;
কেননা সর্বস্বস্তাব-সম্পূর্ণক ধনের অভাব
নাই।

“উপবাসী ভারতবাসী অর্থ-অন্নতার।

গড়ে মাসে একটিলোকের দেড়টিটাকা আয় ॥”

ইহা কিন্তু কবি-কল্পনা নহে; ইহা রাজ-
নীতি, অর্থনীতি, বাস্তা-তত্ত্বজ্ঞান ও গণিত
বিজ্ঞানের দৃক আবিষ্কারের স্বীকৃত সত্য।
এরূপ শোচনীয় দৈনন্দিন্য সাধারণের
“পেটের দানা—পরনের তেনা” ঘোঠাই কষ্ট;
তাতে উপযুক্ত খাওয়া-পরা, উপযুক্ত বাড়ী-
ঘর করার কল্পনা কেবল চর্যুলাতার দুঃস্বপ্ন,
মাত্র,—আকাশ-কুহুম চরনের আয়োজন
মাত্র। অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অবোগাশনে
স্বভাবতঃই আমাদের রক্তের জোর কম,
জীবনী শক্তি ক্ষীণ। দেহরাজ্য আক্রমণ-
কারী সংক্রামক রোগবীজের সঙ্গে কে আর
সংগ্রাম করিয়া তাহাকে নির্বীণ্য বা নিকা-
শিত করিবে ? সুতরাং বেই আক্রমণ,
সেই অধিকার। কাজেই ভারতে হুর্ভিক-
মৃত্যু ও রোগ-মৃত্যু পৃথিবীর সর্ব সত্যদেশ
হইতেই অসুপযুক্ত অধিক হইয়া পড়ি-
রাছে। কি শোচনীয় ! কি নৈরাশ্রিক !

অতএব উপায় কি ? উপায়—‘বদেশী’
অধুনা যে দিক দিরাই দেব, দেবিবে—
আমাদের সকল অপায়ের উপায়ই এই
‘বদেশী’। এই ‘বদেশী’ ধরই কেবল হুর্ভিক

হইয়া, আমাদের সকল কর্ম নিজ বৃত্তে নিরস্ত্রিত করিতেছে। 'স্বদেশী' সাধনার আমাদের পরদারে ভিক্ষা হ্রাস পাইবে, স্বাবলম্বন-শিক্ষা হইবে। আমাদের গোলামী ছাড়িবে, কৃষিকাৰ্যাদি বাড়িবে; শিল্প বজার থাকিবে, ব্যবসায়—বাণিজ্য জাঁকিবে। ইহাতে নবউদ্ভাবন উঠিবে, নবপ্রতিভা ফুটিবে। আর, আয়ু, বল, বুদ্ধি,—ক্রমে সর্বসম্পদ বৃদ্ধিবে। বিত্ত-বিস্তার সুবৃষ্টি—অর্থাৎ লক্ষী-সরস্বতীর সুবৃষ্টি, ভারতবক্ষে শত ধারার ছুটিবে। • সংক্ষেপতঃ 'স্বদেশী' সাধনাই—আমাদের স্বদেশ-প্রেমমানন্দ-নন্দনের কল্যাণ-কল্ললতিকা, আমাদের সর্বকল-দায়িকা। আমাদের দারিদ্র্য, রোগ, অনশন, অন্নায়তা, চর্কলতা, ভীকতা, ঐক্যহীনতা, লক্ষ্যহীনতা—ফলে সর্ববিষয়েই একান্ত দীনতার একমাত্র প্রতীকার—কেবল কার-মনোবাক্যে 'স্বদেশী' সাধনাদিকার।

আমাদের এ হেন 'স্বদেশী' সাধন বজায় রাখা আজ বেজার কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। স্বর্গীয় সুধার ঞ্চার, অমৃতকুণ্ডের বারি-রিন্দুর ঞ্চার—ভগবানের রূপা-প্রসাদ রূপ জিনিগটি আমরা ঠিক সময়ে পাইয়াছিলাস সত্য; কিন্তু এখন সেবন করিতে যে জীবন নিরা টান পড়িতেছে, তার উপায় কি? বলিয়াছি ত, 'স্বদেশী'কে মরিতে দিলে আমরা আপন দোবে মরিব, আবার ব্যস্ত—অব্যস্ত ভাবে বাঁচাইতে গেলেও হয়ত রাজস্বোবে মরিব; সুতরাং এই 'স্বদেশী'-সমুদায় "স্বার্থের করায়"-সকটে পরিভ্রাণ-প্রতিবিধানই শুধুনা আমাদের একমাত্র প্রাণীকর্মণ্য।

বাঁহারা "Extremest" আধা আগ্রহে আকাজক করেন, অর্থাৎ বাঁহারা চরমপন্থী গরম দল, তাঁহাদের মত—অর্গে অলুক রাজস্বোব, আগে আমুক অসন্তোষ।—জরিমানা, জেলখানা, দ্বীপান্তর, কাঁসী, কিছুতে না ছাড়িবে 'স্বদেশী' বঙ্গবাণী। আমুক পুলিস, গুর্খা, বন্দুক, কামান, 'স্বদেশী' না ছাড়িবে থাকিতে দেহে গাণ। "বন্দে মাতরম্" গল্প, 'বরকট' গল্প—সাধনে প্ররাজ-সিদ্ধি পাবে প্রজাতন্ত্র। স্বাবলম্ব-অবলম্বে অবিলম্বে ভবে, স্বায়ত্ত শাসন লাভ অবশ্যই হবে। শক্তি স্বাধ, বুক বাঁধ, প্রাণদিতে শেষ; ভবিষ্যৎ ইতিহাস হৃদিরক্তে লেখ। রাজস্বোব—মসন্তোষ - যা হবার হোক; লাজপত—অজিত বা নির্দাসিত মোক; একে শত লাজপত পাইব নিশ্চিত। একটি অজিতে পাব সহস্র অজিত ॥

চরমপন্থী দলের এই ভাবের গরম মন্তব্য—সংযমপন্থী নয়ম দল ঐ ভাবে ও ঐ সুরে স্বীকার করেন না; অগচ স্বদেশী অর্জনে ও বিদেশী বর্জনে আগ্রহ ও অবশ্যকতা-বোধ ঠিক সমান; অন্ততঃ অন্ন নহে। তবে গরম দলের স্বদেশী অর্জনে অপেক্ষাও যেন বিদেশী বর্জনেই কোঁকটা বেশি। 'নরম' দলের অর্জনেই অধিক টান। অনেকে বিধেবমূলক বোধে 'বরকট' শব্দটাই পছন্দ করেন না। ফলে গরম দলের কথার ধরণে ও 'রকম সকম' পূর্ণমেট রাজস্বোব-উত্তেজক রাজবিবেষ দেয় পাইতেছেন এবং ক্রমশঃ উগ্রতর শাসনে কলঙ্ক হইতেছেন। ভারত-ভাগ্যের গিরাণী

বিধাতা স্বয়ং মর্নি সাহেবত ঐ কারণে 'শত্রু' শব্দ পর্যাঙ্ক বলিয়া বসিয়াছেন । শত্রু যারে জানা যায়, তাহাে ফাঁসে কুলাইতে বা তোপে উড়াইতেইবা কতক্ষণ ? কণা সহজ নয়; অবস্থা বাস্তবিক সঙ্কটময় । গরম দলের অতি-গরমেরা ভীরাই বলুন আর কাপুরুষই বলুন, সাধে সাধে একপ একটা অগ্রসর ও আশাবিত জাতিকে 'সর্বশক্তিমানপ্রায়' গণপর্নমেন্টের কোপ-কবলে ফেলিয়া নিম্পোষিত ও উৎসাদিত করার সম্ভাবনা সংঘটন সংঘত দল কিছুমাত্র বুদ্ধিমানের কার্য বলিয়া মনে করেন না । প্রবলের সহিত দুর্বলের বিরোধিতা যে বাধার, সে দুর্বলের মিত্র নহে । ফাঁপা-দুস্তের ফাঁকা আওয়াজে কোন ফল নাই । বরং বাতে দুর্বলও সবল হয়, মানুষ হয়, অজ্ঞাচারে—অবিচারে—প্রবলের পদদলন-প্রতীকারে সক্ষম হয়, বৈধ ও সংঘত ভাবে 'বদেশী' সাধনপ্রভাবে সেই শিগার চেষ্টা করাই বহুদর্শী প্রাণী সংঘত সম্প্রদায়ের অতিমত । সমস্বার আবধানে ভ্রুণরক্ষণ বা সবজান্ত শিশুর সতর্কসংপালন যেরূপ প্রয়োজনীয়, আমাদের এই সুকুমার সন্তজাত সুদেশ-সেবাত্রতকেও রাজা, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের কোপ হইতে শত সতর্কতার সতত রক্ষা করা তরূপ প্রয়োজনীয় ও প্রাধিকার । সুতরাং অসংঘন, ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও বিবেক-বিরোধিতা সর্বথা বর্জনীয় । "স্বার্থানুকরণপ্রাপ্তঃ" এ নীতি হাদিকা, আশাভাউকীপনার দেশার প্রবলকে স্মরণ্য । "বদেশী" দুর্বল চেষ্টাকে আহত করিয়া—কল্যাণকামি করা বৃন্দসমূহ ।

এই যে রাজরোষে আমরা লাজপত ও অজিতকে হারাইতে বসিয়াছি, ইহাতে লাভ মনে করা ভুল । 'এক লাজপতে শত লাজপত বা এক অজিতে সহস্র অজিত লাভ' ফাঁকা বাগাড়ম্বরে সম্ভব হইলেও কল্পবতার বিপরীত । পুরুভূজের দৃষ্টান্ত, রক্তনীজের উদাহরণ সাহিত্যে সাজে ভাল, কিন্তু ইতিহাসের কাজে আসা কঠিন । যেমন যায় তেমন আর হয় না । এই দেশেই দেখুন, তেমন একটি গৌরাজ, একটি রামপ্রসাদ বা রামকৃষ্ণ, একটি বিনয়ানাগর বা বঙ্কিম, একটি রাজেন্দ্র বা হেমচন্দ্র, একটি কেশব বা দেবেন্দ্র, একটি বিজয়কৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ আর পাওয়া যাবে কি ? এ সব দেশ-দ্বীপকের শ্রুতাসন আর পূর্ণ হবে কি ? দেখুন না করুন, যদি আমাদের বর্তমান স্বদেশ-গৌরব সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, অখিনীকুমার, রবীন্দ্রনাথ, রমেশ, যোগেশ (অধিক নামোন্মেষ নিম্পুরোজন) প্রভৃতি রাজরোষে নির্কাসিত, নির্কৃত, নির্কাক না নিশ্চেষ্ট হইতে বাধা হন; তবে কি সেটা দেশের পক্ষে—'বদেশী' সাধন-লক্ষ্যে শুভার্থ হইবে ? কেহ হয়ত "এক সুরেন্দ্রে শত সুরেন্দ্র" প্রভৃতি আকাশ-কুসুম দেখাইবেন, কেহবা—

"বতই ওরা মারবেরে যা,

ততইরে চেউ উঠবে ।

"বতই ওরা চোক রাঙাবে,

আমাদের চোক ফুটবে ॥"

ইত্যাদি পস্তের ভাব-বদ্যের দেশার দোষে আশার বাণী শুনাবেন, কিন্তু সাবধ সাধনের অজ্ঞানে কবির ভবিষ্যৎ-বাণী হিন্দুকীর্ণি-

উহা হস্ত সাহিত্যের স্বপ্ন-স্বর্ণাসন ছাড়িয়া সত্যের কঠোর কার্যক্ষেত্রে নামিবেইনা। আবার ঐরূপ সাহিত্য-সম্ভোগটুকুরও সাহিত্য-সম্ভাবনা সংঘটিতপ্রায়। চৌচৌটির পাঁতা, কলমের মাথা, কাগজ চালানো, মগজ খেলানো প্রায় বন্দ হবারই সন্দেহ উপস্থিত। এদিকে দারুণ চর্ভিক-হুর্দ্বলাভার কথাবার্ত; অন্যভাবে—অর্থাভাবে, অনশনে—অপমানে 'জাহি জাহি' আর্ন্তনাদ; তছপরি সামলা-মোকদ্দমার, প্লেগ-কলেরা-ম্যাণেরিয়ার দেশ যায় যায়! আবার মাঝে হতে ভ্রাত ভ্রাতৃবিরোধে শুণ্ডার কাঁজ—লুট-ভঁরাজ, খুন-নিম্খুন, ঘরে আগুন, বিতনাশ, লতীঘনাশ, এক কথায়—সর্বনাশ! দেখুন একবার দেশের কি দশা! উহার উপর আবার রাজরোষের দিগন্তদাহী ছরস্তু বক্ষি-বর্ষণ, রাজনৈতিক পাশব বলের প্রদল পীড়ন! পুলিশের স্থল, 'সুপ্রা'র ফণা, 'মুচলেকা'-ধরা, বেতমারা, জরিমানা, ছেলুখানা, উচ্চন-নির্ধাসন, নির্দাক-নিশ্চেষ্টী-করণ! এ জীর্ণ বিশীর্ণ, নিঃস্ব, নিরস্ত, নিরন্ন নিরজীব দেশে এত কি সহ্য হয়? কাজেই বলি, দেশ যায়-যায়! মহী-গাজে বা মান-চিজে অস্তিত্ব থাকিলেও, আমাদের জাতীয় জীবন-ক্ষেত্রে তাহা নাস্তিত্বপ্রায়! বাহাদুরের কথায়, কাজে, মেজাজের কাজে, শুদ্ধ সাহিত্যিক কাঁকা আওয়াজে সেই আসন্ন উৎ-পন্নতার অহুর্কূলতাই বটে, তাহার আশায়, ভাবায় ও চেষ্টায় দেশের মিত্র হইলেও, কার্যতঃ খেবটা-বাহাদুর-শক্ততাই দাঁড়ায় বটে।

আমাদের ছেলেরা ও কতকটা বালাবরসের উদ্বোধন-প্রিয়তা ও উচ্চ-দশীণ বতাবের ফলে

অনেকেই ধীর, গভীর, সংযত ও সুভাব্য ভাবে স্বদেশী সামনার ব্রতী হইতে পারি-তেছেন না। এই নিত্য চঞ্চল জগতের কোন কার্যটি কিন্তু বিশৃঙ্খল চঞ্চল ভাবে হইবার নহে। চাঞ্চল্যের মধ্যেই আবার পাঞ্জীর্ষ্য, শৃঙ্খলা, সংযম ও সুনিয়ম। আমাদের নবীক গণ স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রে এই সত্য-স্মৃতিটী না ভোলেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়। তাঁহারাই আশায় আমাদের উচ্চল অতীতের পুনরাবি-র্ভাব, উৎসাহে মুক্তিমান বর্তমান এবং ভবিষ্য-তের ভরসা স্বরূপে, স্বদেশে স্ব-স্ব-সাথে, আমা-দের সুভাষী-পীর্দে আবু আরোগা-মোগাতার ভাগবান। তাঁহারাই ভবিষ্য-সমাজের সেনক, নেতা ও কর্তা। তাঁহাদেরই মতে, কথায় ও কাজে ভবিষ্য-সমাজ চলিত, পালিত, পুষ্ট বা নই, উন্নত বা অযোগ্য হইবে। তাঁহারাই 'স্বদেশী' জাতীয় জীবন গড়াইতে, বাড়াইতে, সুন্দর ও সমৃদ্ধ করিতে, আমা-দেরই আয়োজন-উপকরণ মত্রে উত্তরাধিকারী ও দায়িত্বে সর্বকার্য-ভারপারী। উদ্যম-অধ্য-বসায়, দৃঢ়তা ও দক্ষতার সহিত তাঁহাদিগকে ধীর, গভীর সংযত ও সুশৃঙ্খল হইতেই হইবে। উচ্ছলতা ও চঞ্চলতার কর্মযোগীর কদাচ সিদ্ধিলাভ সম্ভবেনা। অন্যত্র অপ্রেম ও বিবেক মনুষ্ট কোন অতীষ্ট কার্যেই উপরের কৃপা-সাহায্য পাওয়া যায় না।

জাতীয় জীবন গঠনে আদর্শ ও উচ্চ, উদার ও মহৎ হওয়া চাই। এতদিন 'জাতীয় জীবন' শব্দ আমরা ইংরাজীর অমুবাদ রূপে সাহিত্যে ব্যবহার করিলেও, উহার প্রকৃতার্থ অবধারণে অক্ষম ছিলাম। জিনিগরী সাহিত্যে ছিল, কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রেই যে

ছিল না! ব্যক্তিগত বাষ্টি জীবন ছিল, কিন্তু বহুলাল বাবত্ গমষ্টিগত জাতীয় জীবন ছিল না বলিলেই হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে শব্দেই সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে। তাই অধুনা এই 'স্বদেশী' আন্দোলন-উপলক্ষে, জাতীয় বক্ষে নিম্পন্দ হৃদপিণ্ডে গুনঃ শোণিতসঞ্চারণ ও নবস্পন্দন অমুভূত হইতেছে।

হিন্দুর জাতীয় জীবন একদিন ছিল। যে অপার্থিব অধ্যাত্ম জীবনের ভূমণাবনী শক্তিতে হিন্দু একদিন অগহুজ্ঞান পতিভায় অগতে প্রতিষ্ঠিত ছিল; যে সর্কজ্ঞান-বিধায়িনী—পূর্ণ মানবত্বপদায়িনী শক্তিতে হিন্দু একদিন বিশ্বাচার্য্যের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিল। আজ তাহার কীর্ণ ইতিহাসের দীন আভাস মাত্র কথকিং বর্তমান। "তেহিনো দিবসা গতাঃ" কিন্তু তথাপি সেট অতুল্য অসামান্য উচ্চাদর্শের নিদর্শন আজ আমাদের কীর্ণ স্মৃতিস্মৃজে—শাস্ত্রাদির জীর্ণ-বক্ষে অড়িত ও লুকায়িত!

হিন্দুর আদর্শ বিশ্বোদার। "আত্মবৎ সর্কমুচেবু" হিন্দুর সর্কপ্রধান ধর্মনীতি। হিন্দুর কেহ শত্রু নহে। হিন্দুর কাচারও প্রতি বিদ্বেষ নাই। আবার "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" ইহাও হিন্দুর নিত্যস্মরণীয় নীতিস্মৃতি। আত্মরক্ষার অপরিসীম অহু-রোধে আদর্শ হিন্দু কাহাকেও কষ্ট দিতে বাধ্য হইলেও, তাহা রাজসিক শত্রুভাবে বা আত্মসিক বিদ্বেষ বৃদ্ধিতে নহে; পরন্তু সাংসিক নিকাম সর্কব্যবোধে। নিকাম সাংসিক সর্কব্যবধানই মূলনীতি বলিয়া, আত্মরক্ষার অবশ্যবর্তব্যতাবলে আততায়ী

ব্রাহ্মণকে বধ করিলেও "ব্রহ্মহত্যা" মহা-পাপ ঘট না। "জিবাংসমুঃ জিবাং-গীয়ামতেন ব্রহ্মণা ভবেৎ"। অর্জুন ভগবত্‌রূপ দর্শে হইয়া, গুরুত্বত্যা—ব্রহ্মহত্যা করিয়াও, নিকাম সর্কব্যবুদ্ধির সাংসিক শক্তিতে অশুভ কাম্যবন্ধ বা পাপের নামগন্ধ হইতেও মুক্ত ছিলেন, গীতাতক হিন্দু টেগা বিশ্বাস করেন। সাংসিকতার নিকাম অধিকারে আদর্শ হিন্দুর অকরণীয় বা অসংখ্য কিছুই নাট; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার রাজসিক নৈসর্কিক-বুদ্ধির লেশ বা তাসমিক পবনিন্দেব পাকিতে পাব না।

হিন্দুব পতি ইংরাজের রাজত্বোচের সন্দেহ ভুল; কেননা, নৈতিক আদর্শ ইংরাজের প্রতি হিন্দুর শত্রুতা বা বিদ্বেষবুদ্ধি থাকিতে পারে না; তবে সাংসিক আত্মবক্ষা-নীতির অবশ্য সর্কব্যবতার হিন্দু স্বদেশী অর্জুন ও বিদেশী অর্জুনে ধর্মতঃ বাধ্য। উভাতে ইংরাজ বধিধু-ক্তিতে সর্কিতগত হইয়া কষ্ট বোধ করিলে নাচার। "বয়কট" বা বিদেশী অর্জুন বাদ দিয়া, শুধু স্বদেশী অর্জুন যদি মিটে সাহেবের "Honest স্বদেশী" হয়, তবে তাহা অসম্ভব ও অসংভাবিক। "কাপ টানিলেই মাথা আসে।" 'স্বদেশী' টানিলেই "বয়কট" আপনি আসে। এ হুয়ের বৃগপৎ কার্য-কারিতা বা অবিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। "বয়কট"-শত্রু স্বদেশী যদি সত্ত্ব হয়, সেকস-পিররের সাইলকের রক্তশূন্য বাস-সর্কনও অসম্ভব নয়। অথবা ঐ হুয়ের সর্করক্ত-মাংস অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠতর। হুটটই একই বস্তুর দুই পিঠ বরণ; পরস্পর সাংসিক (Co-relative)। একের অভাবে অপর

অস্তিত্বই অগস্ত্য । একটি পৌরুষ-কবিতা
এইরূপ,—

“কাঁটা বেছে না ফেলে করত মংগ্ৰাহার ।

উকুন না মেরে মাথা রাখ পদিকাব ॥

কুপথাটি না ছাড়িয়া রোগ দূর কর ।

মল মূত্র না তাজিয়া পানাতাব ধর ॥

ঐশ্য নাশ ব্যকনে, তাকনা নহি গাপ ।

ধর্মকর্ম কর, কিন্তু ছাড়ি নো পাপ ॥

নাও নেয়ে হাও নেয়ে, জাশেরে ঠেগনা ।

নিখাসে বাঁচাব পাপ, পখাস ফেলনা ॥”

এই মন উপচাস্টপদেশ যদি সম্বল ভব,
তবেই “বয়স্কট”বিশুদ্ধ “Honest স্বদেশী”
অগস্ত্য নমঃ স্মৃতবাং উকু পঞ্চটির শেষে
আর দুটি পংক্তি পক্ষেপ করা যায় যথা—

বাক্য যদি ‘Honest স্বদেশী’-নিশেষণ,

বিদেশী না তাজি কর স্বদেশী গ্রন্থে ।

ফলে চক্কাঁ মাড়-দেওয়া কাপড় গুণ্ডা এবং
শুকর-গরুর ছাড় রক্তবুদ্ধ লুণ চিনি পাওয়া
প্রভৃতি আজ আদর্শ হিন্দুর অমাথা চইয়া
পড়িয়াছে। উচাতে রাজার জাতি ন্যকার
চন, নাচার! রাজার খাতিরে, গরুর
খাতিরে, কি বাপ মার খাতিরে, কারো
খাতিরেই ধর্মের খাতিরে—ভগবানের খাতিরে
ভ্যাগ করা যায় না ।

কেবল যে হিন্দুর অস্পৃশ্য শূকর-গরুর
শোণিতাদির সংস্রব জন্তই ‘ধর্মের খাতিরে’
মলা গেল, তা নয়। হিন্দুর যে সবই ধর্ম ।
‘হিন্দু-জীবনের’ ঐহিক-পারত্রিক, পারি-
বারিক-সামাজিক-বৈবরিক, শারীরিক-মান-
সিক-আধ্যাত্মিক, সমস্ত ‘ইকু’গুলির সমস্ত
কর্তব্যই ধর্ম । পূর্বেই বলিয়াছি, স্বদেশী
অর্জন ও বিদেশী-বর্জন ব্যতীত আমাদের

উচ্ছেদ-উদ্ধৃৎ জাতীয় জীবনে অস্বরকার
আর উপারাস্তর নাট ; স্তরাস্তর সর্কাগ্রসাধ্য
নিতাদর্শ অস্বরকার অরুরোধে ভারতবাসী
উচাতে যথাযথা একান্ত বাধ্য । ইংরাজ
ধৃৎরত ও কৃত পতিজ্ঞ ‘স্বদেশী’ সাধকবর্গকে
জেগে না পুরিলে আর তাগাদের প্রাণ-
পণ পাণা এই অর্জন বর্জন ব্রত বিসর্জন
করাইতে পারিবেন না । কেননা, জেলের
কয়েদারই কেবল খাওয়া-পাওয়া স্বাধী-
নতা নাট ; আর সকলের অস্ব আছো

যে এদেশী হইয়া ‘স্বদেশী’-বিরোধী, সে
দেশ-দ্রোহী, মাতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃদ্রোহী, আশ্র-
দ্রোহী । ‘স্বদেশী’র বিরুদ্ধাচরণ পরিষ্কার
আম্বচনন । অনপরাধে পনের হাতে
অপঘাতে মরা অপেক্ষা জাম্বচত্যা অধিক-
তর আপত্তি-নিপত্তি-জনক । বাহা হউক,
শান্তি দিয়া—হয় দেখাটয়া; ‘স্বদেশী’ দমনে
ইংরাজরাজ কতদূর কৃতকার্য হইবেন,
তাগা বিশ্বরাজ ঈশ্বরই জানেন । ফলে
আস্তিক ‘স্বদেশী’দের আন্তরিক বিশ্বাস
যে, ঈশ্বরেচ্ছাই এ দেশে ‘স্বদেশী’বেশে
অনর্থাৎ ; নচেৎ এত কালের নীরব—
নিষ্পন্দ—নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যু-নিদ্রা হইতে চঠাৎ
এরূপ অজ্ঞ—জীবন্ত জাতীয় জাগরণ
কিরূপে সম্ভব হইল? তাবিলে আশ্চর্য্য
বোধ হয় যে, বঙ্গোদ্ভূত এই অদ্ভুতশক্তি-
শালী সূত্র “বন্দে মাতরম্” সূত্রটি একেবারে
আগমুত্র-অচলেশ ও আত্রক-সিদ্ধেশ ব্যাপির
স্বদেশী-প্রমোদোপনার কি তুলু তরল তুলি-
রাছে! অতএব যদি এই ‘স্বদেশী’ সাধন
বিশ্বরাজেরই অভিপ্রোভ হয়, তবে এই বৈকি-
রাজের বিরুদ্ধাচরণে ইহা রুদ্ধ হইবার নক

ভগবদ্বিচ্ছায় আমাদের ঐশ্বর্যের
যে ক্ষয়ক্ষতি মাত্রই নাই, তাহা নহে ;
বরং আবেগিক ভাবে বিলক্ষণই আছে ।
নচেৎ সমাগরী ভারতভূমির এমন অভূত-
পূর্ব একছত্র সাম্রাজ্য-সম্ভোগ নিশ্চিন্দিতা
যে নেহাৎ অযোগ্যকে দিবেন, এমন
অযোগ্য বিবেচক তিনি নহেন । বিপুল
বৈশ্বত্বের পাছেও ক্ষতিগ্রস্ত না থাকিলে,
ভগবান কাহারও রাজ্যলাভ বিধান ও
রাজ্যপালন-শক্তি প্রদান করেন না ।
অগতে পাতীন নিপুল ইন্দ্রনী জাতি
চিরকাল মুর্ত্তমান বৈশ্বত্ব রূপে বর্ত্তমান
থাকিয়াও, মাত্র ক্ষতিগ্রস্তের একমুখ
অভ্যন্তরেই অগতে কোথাও কোন রাজ্যলাভ
বা একটা স্থায়ী মূল বাসস্থান লাভ
করিতেও পারিলনা ! উহারা পাবুদের
পানাপুকুরের পান্য-রাশির ছায় পৃথিবীময়
ভাসিয়া বেড়াইতেছে । খৃষ্টান জাতি
ভেমন বৈশ্ব নহে । উহারা ক্ষত্র বৈশ্ব ।
চীন জাপানী ক্ষত্র বিমিষ্ট বৌদ্ধ
জাতিও ক্ষত্র বৈশ্ব । বিংশ শতাব্দীর
বিগতভাগ্য হিন্দুজাতিট কেবল বৃষ্টি
পূর্ণ শ্রুত্বের প্রান্তসীমায় সমাগত । তবে
কিনা, “হারিরে হারিরে কাশ্রপ গোত্র”
গোছ ব্রাহ্মণ্যও যদি কিছু থাকে,
তবে তাহাও এই জাতিতেই আছে ;
আর কোথাও নাই । ভারতে মুসলমানের
আমলেও ক্ষত্র যে কিছু ছিল, ক্রমে
কমিতে কমিতে এই ইংরাজের আমলে
এখন তাহার কেবল স্মৃতি-সাক্ষ্য মাত্র
ইতিহাসের বকে রক্ষিত ; কিন্তু প্রত্যেকে
কিছুই লক্ষিত হয় না । কেবল ঐ হতাবশেষ

ব্রাহ্মণ্যের বেশই আমাদের—পতিভেদ
একমাত্র পুনরুত্থান-ভরসাহস ।

অতএব এই স্বদেশী সাধনে, এই
পূর্ণশ্রুত্ব পতিত জাতির ব্রাহ্মণ্যকেই
চরমাদর্শ করিয়া, আত্মসম্মান অগ্রসর
করিতে গেলেই বৈশ্ব ও ক্ষত্র ধর্মের
ভিত্তি দিয়াই ব্রাহ্মণ্য পৌত্তে হইবে ।
পর্যায়ক্রমে অতিক্রম করিয়া কক্ষ-গতির
ফল প্রায় পদভঙ্গিতে পর্যাবসিত হয় ।
তাই আমাদের কৃষি শিল্প বাণিজ্য রূপ
বৈশ্ব ব্রহ্ম, অর্থ ও অয়ে যেমন সমর্থ
ও সুসম্পন্ন হইতে হইবে, তেমনি ব্যাধি-
মাদি বলাচর্চায় বাহুবল, মাহিম, উত্তম,
অশ্বাসাম, নীবর, মহর, প্রভৃতি, দান,
দয়া, প্রভৃতি কাক্ষণ্যও লাভ করিতে
হইবে ; এবং সমুদায়ের পূর্ণ পরিণামে
আমাদের অন্তঃসাম্রাজ্য অমূল্যধনের
অবশেষ-বেশ, পূর্ণা পবিত্রতা জ্ঞান-বৈরাগ্য-
প্রেমানন্দ-বীজ স্বরূপ ব্রাহ্মণ্য লাভার্থ আত্ম-
নির্ভরতার অনিরোধে ভগবানে নির্ভর
রাধিতে ও যোগিকার ভগবদভজনা-
পর থাকিতে হইবে । এইরূপ বিচার-
বিহিত শাস্ত্রসম্মত স্থগণালীতে অটল—
অচঞ্চল, সংযত, সুগম্ভীর মাত্তিক ভাবে
‘স্বদেশী’ সাধন চালাইলেই, আমরা এই
সঙ্কটসঙ্কুল স্বদেশী-সমস্যার সমুত্তীর্ণ হইব,
সন্দেহ নাই । তাহাই হইলে, অমৃত্যু, অলসতা,
ভীকতা, কাপুরুষতা, প্রভৃতি ভাবনিক
দোষরাশিও থাকিবেনা, আবার রাজনিক
ঔদ্বত্যের ভারসা-ভরসে রাজ্যের সঙ্গে যোগা-
কৃষি—অদ্যকালেও লাগিবেনা । মাত্তিক
পথে চলিলে, জীবন ও মৃত্যু ও সহায় হইবে ।

অনিবেদন, উদারতা প্ৰেম ও পবিত্রতার সর্ব-
সংরক্ষণী স্বর্গীয়শক্তি অতিক্রম করিয়া,
ইংরাজরাজ রাজদ্রোহের চিত্র ধরিতে পারি-
বেন কি? তবে যদি একেবারে সাধারণ
সভ্যতার ঘোমটা খুলিয়া প্ৰচণ্ড পাশব
দলে নেতৃত্ব কোর করিয়া 'স্বদেশী' ভাড়া-
টেতে ও নিবেদনী পরাটতে চাছেন, তবে
যে ভারতের ভবিষ্যৎ কি প্ৰসন্ন করিবে,
কি মুক্তি ধরিবে, তাহা ভারতের দেহে
চিত্রআরাধনের কীভঙ্গনানষ্ট জানেন। সে
যাহাই হউক, গালাগালি-দলাদলি, নিরাগ-
নিবেদন, নিকপ-নিশুশ্রমা, অসৌদার্য-
ঐক্যতা চর্চিতে ভগবৎরূপায় মুক্ত ও শুদ্ধ
স্বদেশী সাধনার কায়ামনোবাক্যে যুক্ত
আকিতে পারিলেই আমাদের পুনর্জীবন,
পুনরুত্থান ও সর্বসিদ্ধি-সমৃদ্ধির সমাধান
হইবে। ঈশ্বর-নির্ভর-নিরাপদ স্বাবলম্ব
কর্মযোগ-পথে ধর্মকে সঙ্গী—প্ৰত্যেক
পন্থপদস্বর্ক পাইলে, গন্তব্যদেশে পৌঁছিতে
চিন্তন বিন্দুমাত্র সমস্যের বিষয় নাই।

'স্বদেশী সমস্ত' আর কিছুই নহে,
এই স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে রাজা-
প্রজা উভয় পক্ষের স্বার্থ-সংঘর্ষণ-সমাধানের
সমস্ত। 'স্বদেশী' টিকিলে ও জাঁকিলে,
ভারতবাসী টেকে, জাঁকে, ওঠে, জাগে,
সম্মুখ হয়। নচেৎ রোগে শোকে, হর্ভিক্ষ-
ভ্রুতোগে, দৈন্য-দৌর্ভাগ্যে, অনশনে, অপ-
মানে অচিরে উচ্ছন্ন বার। আর 'বরকট'
ব্রাহ্মণের বিকট আঘাতে ভারতের বণিক-
রাজাইংরাজের বাণিজ্য বিপন্ন হয়।
স্বাধিকার—স্বাধিকার—নিবারণে হাহা-
কার ওঠে, অক্রমার ছোটে; কলে অতি

ক্ষতি ঘটে। কাজেই ইংরাজরাজ স্বজাতি-
স্বার্থক্ষার্থ—অর্থাৎ আত্মক্ষার্থতৎপ্রতীকার
কল্পে, 'স্বদেশী' বিকার-কল্পিত রাজ-দ্রোহ-
দ্বির অভিব্যোগে, স্বীয় সমস্ত রাজশক্তি-পরি-
চালিত পাশবশক্তি প্রয়োগে—ক্রমণঃ প্রয়ো-
জনানুরূপ প্ৰস্তুত হইতেছেন ও হইবেন।
ভারতের জন্তই ভারতশাসন ইংরাজ-
আমলে অসম্ভব! ভারত রাজত্ব-স্বার্থ-
শ্রোতের মুখা প্রবাহট 'সাত সমুদ্র তের
নদী' বাহিয়া বিলাত অভিমুখে ধাবিত;
গোপ প্রবাহও ইংরাজের ভারতীয় স্বার্থের
অস্তিত্ব ভাবেই ভারতবাসীর কণ্ঠস্থ জীবন
ধারণে অবশেষিত। এট জন্তই ভারত-
শাসনের সঙ্গে ভারত-শোষণ ইংরাজ-
রাজত্বের অনিবার্য্য অপরিহার্য্য কল।
৭ ৮ শত বৎসরের সুদীর্ঘ মুসলমান রাজ-
শাসনে আর যত দোষই থাকুক, ভারত-
অর্থের ও ভারত-স্বার্থের বিদেশে টান না
পড়াতে 'শোষণ' মোটেই ছিলনা। বরং
ভারত সম্বন্ধে ভারতেই সঞ্চিত থাকিতে,
শোষণের পরিবর্তে পোষণই হইত। বর্ত-
মানে, স্বদেশী সাধনে, ভারত-প্রজা চার
ভারত-পোষণ, আর স্বজাতি-স্বার্থসাধনে
ইংরাজরাজ চান ভারত-শোষণ। পোষণ
যাহা চান, তাহাও পোষণার্থে। যেমন
ছদ্ম খাঁর গো-পোষণ। উভয়ের উদ্দেশ্যই
পোষণ ধরিয়া নিদেও, প্রাধানিতঃ প্রজার
উদ্দেশ্য পোষণার্থে পোষণ এবং রাজার
উদ্দেশ্য শোষণার্থে পোষণ। ইহাই 'স্বদেশী'
সমস্ত। ভারতবাসী এক দিন ইহা
ভাল বোধে নাই। সাময়িক ভবিষ্যৎ
কখনও হয়ত কিছু বৃদ্ধিও, সাধারণতঃ

মোহান্তিভূত—নির্জিত ছিল। এই স্বদেশী আন্দোলন রূপ স্বর্গীয় অমৃত কুণ্ডের ছিটাব গোটা দেশটা যেন চঠাৎ 'আড়া মোড়া' ছাড়িয়া, গা বাড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। তাই আবার ঘুম-পাড়ানোর দরকার। নেচাৎ না ঘুমাইতে চাহিলে, রাজ-অবাধ্যতা বা রাজদ্রোহিতা-দোষে—সারিয়া ধরিয়া, জন্ম, নিঃশব্দ, নিশ্চেষ্ট ও নির্জিত করিয়া রাখা আনন্দ্যক। আর ঘুমেয় সম্ভাবনা কম দেখিয়া ও সমাজগ্রহের অঙ্গ-বিক্ষেপ রাজবিদ্-ভঙ্গ ভাবিয়াই মারা ধরা আরম্ভ হইয়াছে। এখন ভারতবাসীর পক্ষে বৈধ প্রতিস্থান কি? এ স্বদেশী সমস্যার শুভ সমাধান কি?

'স্বদেশী' পরিত্যাগ অবশ্য উপায় নহে; বরং ঘোর অপায়। উচ্চাভে আত্মনাশ—মর্কনাশ—সহাপাপ। তবে প্রবলের সহিত দুর্বলের প্রতियোগিতাস্থলে আত্মরক্ষার্থ হুঃসাহস, হুরাশা, অসংযম, ঔদ্ধতা, চপলতা ও ব্যাপকতা যথাযথ পরিহার পূর্বক, ধীর, গম্ভীর, সংযত, বৈধ, অগচ অদৃঢ়, সুদৃঢ়, সুশৃঙ্খল ভাবে স্বদেশী সাধন চালাইতে হইবে। সুসঙ্গ দেখিয়া জাগিয়া—আর ঘুমাইতে নাই। সুকর্মে লাগিয়া, ধরিয়া ছাড়িতে নাই। কর্তব্যের সুপথে এতদূর অগ্রসর হইয়া আর পিছাইতে নাই। পিছাইলে মৃত্যু নিশ্চয়; বরং সতর্ক-অগ্রসরণে বাঁচিবাই উপায় হয়। ধর্মনির্মিত কর্মপথে, আত্মনির্ভরতা-রণে, প্রীতি-গৈত্রীর পথ-প্রদর্শন মতে, সংযতবেগে ও ভগবন্তক্ৰিয়-যোগে অগ্রসর হইতে পারিলে, পুনর্জীবন—

পুনরুত্থান—শক্তি ও মুক্তিলাভ নিঃসংশয়—নিশ্চয়।

উপসংহারে ক্রিয়রোদেশে প্রার্থনা—
প্রবেদন,—জগৎ শাস্ত হউক, মুক্ত-বিগ্রহ
কান্ত হউক। প্রবলেরা পীড়ন ছাড়ুক,
দুর্বলেরা স্বাবলম্বে বাড়ুক। অতিস্বার্থ
সংযত হউক, মুমূর্ষুর জীবন রউক। উন্নত—
মহত্তে ফুটুক, পতিত—স্বায়ত্তে উঠুক।
ভগবৎরূপায় ভারত আবার উঠিয়া আপন
আচার্য্যামনে বসুক; জগৎ তাহার শিষ্য-
সম্বন্ধে জ্ঞান-ধর্ম্মানন্দে—পরমেশ-প্রেমানে
ভাসুক। ভগবৎরূপাবিধানে, স্বদেশী সমস্যার
শুভ সমাধানে—ভারতে অচিরে সে দিন
আসুক।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

বীণার শেষ তান।

আর বীণা বাজিলনা, ছিঁড়িয়া গিয়াছে তার;
আকাশে মিশিয়া গেছে করুণ স্বর তার!
জীবন-প্রতাতে বসি' প্রকৃতির নিকেতনে,
যে সুর-সশব্দে বীণা বেঁধেছিল সযতনে;—
সেই সুরে সারাদিন গাহিয়া বিষাদ-গান,
'তিনি' অশ্রুজলে, 'আহা হল' দিবা অবসান!
অই কা'র সুবাতাসে তরণী বাহিয়া যায়;
কেমন ইমন-সুরে উদাস-রাগিনী গায়!
আমার জীবন-তরী কর্ণহীন, 'জীর্ণতর,
অনন্ত আবর্ত-মাঝে ঘুরিতেছে নিরন্তর।
সন্ধ্যার আঁধার রূমে ঘেরিতেছে চারিদিক;
অভাগীর পুরোভাগে ভাসে অশ্রু-পারাবার!

অনিবার্য অমৃত্যু! এই বড় খেদ মনে,
বিশ্বাসের ক্ষীণজ্যোতি: পশিলনা এ জীবনে!
না হেরিল এ হৃদয় শাস্তির উজ্জ্বল আলো;
আঁধারে আসিয়ে, পুন: আঁধারেই যেতে হল!
এবার গাছিল বীণা—জীবনের শেষ গান,—
নীলবিল চিরতরে, ফুরাইল শেষ তান ॥

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুম্ভম।

বিশ্ব-প্রেম ।

বেদ, কোরাণ, বাইবেল, বিজ্ঞান, পুরাণ
ও ইতিহাস প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থ; হিন্দু, বৌদ্ধ,
খৃষ্টান ও মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম ও সকল
সম্প্রদায়, এমন কি, পদার্থবাদী বা নাস্তিক-
গণ পর্যন্ত মানবকে কর্তব্য কর্ম করিতে
উপদেশ দেন; এই কর্তব্য কর্ম কাহাকে
বলে বা কর্তব্য কি? ইহার উত্তর সংক্ষেপে
এক কথায় হওয়া বড়ই কঠিন; যে কেতু
মানবের সহস্র সহস্র কার্য আছে; কার্য-
ক্ষেত্রও অসীম। ইহার মধ্যে কোনটী কর্তব্য,
কোনটী অকর্তব্য, তাহা নির্ণয় করা অতীব
কঠিন। অনেকস্থানে সংকার্যের মধ্যেও
মন্দ কার্য আছে এবং অসং কার্যের মধ্যেও
উৎকৃষ্ট কার্য আছে। কার্যকাল ব্যতীত
তাহার ভ্রাব্যাক্রান্ত্যতা সহজে অবধারণ করা
বাইতে পারেনা। এমন কি, মিথ্যা বাক্য
কহা অতীব মন্দ কার্য, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে
এমন স্থলও আছে যে, মিথ্যা বাক্যই অতি
কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।
মনে করুন, একজন পথিকের নিকট প্রভূত

অর্থ আছে; ঐ পথিকের প্রাণনাশ করিয়া
অর্থ অপহরণ করিবার জন্য দস্যুগণ তাহার
পশ্চাতে ধাবিত হইয়াছে। পথিক অর্থ
সহ কোন এক তপোবনাশ্রমে একটা ঋষির
শরণাগত হইলেন। ঋষি দয়ালু, সত্যবাদী
জিতেন্দ্রিয়; ঋষি ঐ শরণাগতকে আশ্রয়
দিলেন এবং তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেন।
দস্যুগণ কিছুক্ষণ পরে আসিয়া ঋষিকে
পথিকের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। দস্যুগণ
সশস্ত্র; ঋষি তাহাদিগকে বলদ্বারা নিবারণ
করিতে পারেন না; নিকটে রাজপুরুষ বা
শাস্তিরক্ষকও নাই। ঋষি যদি বলেন যে,
আমি ঐ প্রাণের উত্তর দিবনা, তবে দস্যুগণ
তাহাকে বধ করিতে পারে; এস্থলে
ঋষির কর্তব্য কার্য কি? সত্য কথা
বলিলেও দস্যুগণ পথিকের প্রাণ নষ্ট
করিয়া অর্থ অপহরণ করে এবং তৎসহ
ঋষিরও প্রাণ নষ্ট করিতে পারে। আবার
পথিকের কোন সন্ধান জানেন না, বলিলে,
মিথ্যা কথা বলা হয়। অতএব এস্থলে
মিথ্যা কথা বলাই অতীব কর্তব্য কার্য
হইতেছে কিনা, পাঠক মহাশয় বিবেচনা
করিয়া দেখুন। বাহা হউক, কর্তব্যনির্ণয়ে
একটা কষ্টি-পাথর আছে; সেই কষ্টিপাথরের
নাম মহৎ বা সচ্ছন্দ্র। প্রকৃত পক্ষে
যদি কার্যের উদ্দেশ্য সং বা মহৎ হয়, তবে
বাহ্যত: যেরূপই হউক না কেন, উহাই
কর্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে। এই
সং ও মহৎ কথার মধ্যেও অতি কঠিন
সমস্যা আছে। একের মনে যাহা সংকার্য
বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, অন্যের নিকট
তাহা অসং কার্য বলিয়া বিবেচিত হইতে

যে না পারে, এমত নহে। মানবের মধ্যে সুস্পন্দার ভিন্নত ধর্ম ভিন্নত ব্যবহার ভিন্নত ; অতএব ভিন্ন ভিন্ন মানবের নিকট সং ও মতৎ কার্যের সংজ্ঞাও ভিন্নত হইতে পারে। তবে সর্বসম্মত হইতে পারে, সং কার্যের এমন একটা সংজ্ঞা অবশ্যই আছে ; ফলে ঐ কর্তব্য কর্ত্বের মধ্যেই মানবের একপ্রাণতা বা বিশ্বগ্রহের মূল আছে, দৃষ্ট হইবে। ইতিপূর্বে বলিয়াছি, যেমন আন্তিক-নাস্তিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ই মানবকে কর্তব্য কর্ত্ব করিতে উপদেশ দেন, সেই-রূপ মানবের স্থায়ী হিতজনক কার্যকেও তাঁহারা সর্বদেয়মূলক কর্তব্য কার্য বলিতে বোধ হয় অস্বীকার করেন না। কিন্তু এই স্থানে 'হিত' কথাটা লইয়া আত্মবাদী ও জড়বাদী বা নাস্তিকের মধ্যে মত-ভেদ আছে। আন্তিক বলিবেন—মস্তুষ্যের কিসের স্থায়ী হিত ? বাহা অস্থায়ী, তাহাতে কখনও স্থায়ী হিত হইতে পারেনা। অতএব দেহ, ইন্দ্রিয়, মনের বাসনা ও ইন্দ্রিয়ের এবং বাসনার বিষয়—অর্থাৎ গৃহ, দার, স্ত্রী, পুত্র, ধন, সম্পদ, সকলই অস্থায়ী ; সুতরাং তাহাতে স্থায়ীহিত বা উন্নতি কখনই হইতে পারেনা। বাহা স্থায়ী-পদার্থ, তাহারই স্থায়ী উন্নতি। আত্মা স্থায়ী, অমর, অতএব আত্মারই স্থায়ী উন্নতি বাহাতে হয়, সেই কার্যই সর্বদেয়-মূলক কর্তব্য কার্য। নাস্তিক আত্মা স্বীকার করেন না ; নাস্তিক বলিবেন—ব্যক্তির দেহ-ইন্দ্রিয় অস্থায়ী হইলেও, ইন্দ্রিয়ের বিষয়—অর্থাৎ ঐশ্বর্য, ধন, সম্পদ, ক্ষমতা অস্থায়ী হইবে কেন ? মানব ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত অস্থায়ী হইলেও, সমাজ বা সমষ্টিগত মানব-

জগৎ অস্থায়ী নহে। আমরা ধন, সম্পদ, রাজ্য, সম্ভ্রম, ক্ষমতা, বল, বীর্য প্রভৃতি তাহা সঞ্চয় করিব, তাহা আমরা ভোগ না করি, আমাদিগের বংশাবলি—স্বজাতিসম্প্রদায় পুরুষ-পরম্পরা ক্রমে তাহা ভোগ করিবে ; তবে ঐ সব উন্নতি স্থায়ী উন্নতি নহে কেন ? পলাশী-যুদ্ধজতা লর্ড ক্লাইব ইংরাজের ভারতসাম্রাজ্য সংস্থাপনের মূল ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান ; তাহার ফলভোগ ক্লাইব না করুন, কিন্তু ইংরাজ জাতি করিতেছেন। এমন কি, পৃথিবীতে বাণিজ্যাদি দ্বারা যে ধন-সম্পদ—সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইবে, তাহা পৃথিবীতেই থাকিবে এবং মানবজাতিই তাহা ভোগ করিবে এবং তাহার মানবকুল ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। অতএব সমাজের বা ব্যক্তির ধনৈশ্বর্য—অর্থাৎ বিষয়ের উন্নতি অস্থায়ী উন্নতি নহে। উহা দ্বারা যখন মানবসমাজেরই উন্নতি সাধিত হয় এবং মানবসমাজ যখন স্থায়ী, তখন ঐ উন্নতিই স্থায়ী ; এখানে আবার একটা অদৃশ্য আত্মার কল্পনা কেন ? আন্তিক বলিবেন—

কে বলিতে পারে আত্মা অদৃশ্য ? আত্মাই প্রত্যক্ষ ; তেমার বিষয়ই অদৃশ্য। যদি তোমার চৈতন্য বা জ্ঞান না থাকে, তবে বিষয়-সম্পদ—এমন কি, দৃশ্য জগৎ আছে, তুমি বলিতে পার ? অতএব তোমার চৈতন্য বা জ্ঞানের মধ্যে বিষয়-সম্পদ প্রভৃতি দৃশ্য জগৎভাসমান আছে ; চৈতন্য বা জ্ঞানের অভাবে দৃশ্য জগৎ নাই। ক্রথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যিক। একটু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি, যদি জীবকুল ধ্বংস পায় ও জগতে চৈতন্য না

থাকে, তবে কি দৃশ্য জগৎ আছে, বলিতে পারেন? জ্ঞান বা চৈতন্ত্যের অভাবে দৃশ্য জগতের অভাব; জ্ঞান বা চৈতন্ত্য আছে বলিয়াই জগৎ আছে; অতএব জ্ঞানই কর্তা, জগৎ কর্ম। জ্ঞানই স্থায়ী, জগৎ অস্থায়ী। জগৎ না থাকিলেও, জ্ঞান বা চৈতন্ত্য আত্ম-স্বরূপসত্তার থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞান বা চৈতন্ত্য না থাকিলে জগৎ থাকিতে পারে না। জ্ঞানই আত্মা; আত্মাই জ্ঞানবরূপ; অতএব জ্ঞানের উন্নতিই স্থায়ী উন্নতি।

ডারউইনের ঐতিহাসিক—বেদান্তদর্শনের বিবর্তবাদ বা মার্মাবাদের একাংশ (অর্থাৎ শুণ্ডভাব) মাত্র। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন বা পৃথিবীর কোন উচ্চতম স্থানে সিংহাসনোপরি আদীন নহেন; অথবা জগৎ হাতে গড়াইয়াও কেহ সৃষ্টি করেন নাই বটে, কিন্তু অনন্তের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানস্রোত প্রবাহিত আছে। বস্তুর অস্তিত্ব ব্যতীত কেবল রাসায়নিক সংযোগে তাহার বিকাশ হইতে পারে না। আজকালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সর্বত্রই তাড়িতশক্তি আছে; কিন্তু সকল পদার্থে তাহার বিকাশ নাই; সাধারণতঃ শুধু অবস্থার থাকে। তবে বিশেষ বিশেষ সংযোগে তাহার বিকাশ হইয়া থাকে; কিন্তু তাড়িতশক্তি দৃশ্যই হউক বা অবিকাশিতই হউক, যদি তাহার আদৌ অস্তিত্ব না থাকে, তবে কি রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা তাহা বিকাশ পাইতে পারে? বাহা আদৌ নাই, তাহার বিকাশ অসম্ভব ও অদর্শনিক (Illogical)। অনন্ত জ্ঞানময়ী নিরাকারী চিহ্নিত্বই আদি; উহাই জগতের

আদি প্রকৃতগত। সর্বাবস্থাতেই জ্ঞানের বা চৈতন্ত্যের অস্তিত্ব আছে; তবে বিষয়-সংযোগে বাহু জগতে উহার বিকাশ হয়। তাড়িত যেমন বস্তু-সংযোগ ব্যতীত বিকাশ পাইতে পারেনা, কিন্তু তড়িৎ ভড়িৎই থাকে; সেই রূপ জ্ঞান বা চৈতন্ত্য, তাহার আশ্রয় দেহ ও আশ্রিত বাহু বস্তু সংযোগব্যতীত বাহু-জগতে বিকাশ পায় না। অন্তর্জগতে নিরাকার চৈতন্ত্য স্বয়ংই বিকাশিত; অতএব উহা স্ফেজে—অর্থাৎ কারণ-স্বরূপাবস্থায় (Potential state) স্বয়ং বিকাশিত থাকে। ঐ জ্ঞান বা চিহ্নিত্ব অমাদি, পূর্ণ, অখণ্ড; তবে কাৰ্য্য-জগতে অর্থাৎ পঞ্চভূতে যাহা অমুপস্থিত হয়, তাহাই অংশ বা খণ্ড। ঐ চৈতন্ত্য বা জ্ঞান পঞ্চভূতোৎপন্ন মানব-মস্তিষ্কে আনন্দ হইয়া, তদ্-শুণ্যমুগ্ধী হয়। অতএব পঞ্চভূতের পরিণাম দেহ মধ্যে আনন্দ হইয়া সংকীর্ণ ও ব্যক্তিভাবাপন্ন হইয়া যায়। বেদান্ত বলেন—সদ্ব, রজ ও তমোগুণ প্রকৃতির চৈতন্ত্য; উহা আত্মার শুণ্ড নহে। অতএব রজশুণ্যোগুণের কাম-ক্রোধাদি শুণ্ড তমোগুণোগুণের বিষয় বিভব বাসনা দ্বারা জ্ঞান ও তদ্ভাবাপন্ন হইয়া সংকীর্ণ হয়। প্রত্যেকে আপন আপন সুখান্বেষণ করে, অর্থাৎ আত্ম-সুখে রত হয়; কিন্তু মানবে ঐ ত্রিগুণের বিকাশ আছে; তন্মধ্যে ঐ সইগুণ হইতে শুধু জ্ঞান বিকাশিত বা জ্ঞানের মণ্ডল পরি-বর্ধিত হয়; কিন্তু মানবের পরম্পরের মধ্যে সহানুভূতি ব্যতীত জ্ঞানের মণ্ডল বাস্তবিক পরিবর্ধিত হইতে পারে না। যেমন ক্ষুদ্র বস্ততেও তাড়িতাণু আছে, তাহা অল্প

বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইলে, ঐ উভয় বস্তুই তাড়িত একত্রিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ পরস্পরের প্রেম সংযুক্ত হইয়া, বহু 'আমি' একটা আমিত্বে পরিণত হইলে, ক্ষুদ্রজ্ঞান বৃহৎজ্ঞানে পরিণত হইতে থাকে। এইরূপে সংকীর্ণ আমিত্বের প্রসার হইলে, জ্ঞানের মণ্ডলও পরিবর্দ্ধিত হয়। যতই পরস্পরের মধ্যে প্রেম এবং একপ্রাণতা হইবে, বহু 'আমি' একটা আমিত্বে পরিণত হইবে, ততই যে আত্মার বা জ্ঞানের মণ্ডলও পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি ? প্রকৃত পক্ষে পরস্পরের মধ্যে একতা, প্রেম, একপ্রাণতাই আত্মার স্থায়ী উন্নতি। উহা আরো একটু বিশদ ভাবে না বলিলে কণাটা পরিষ্কার হইবে না। সেই পরমাণুজ্ঞান প্রত্যেক পদার্থে অল্প প্রাপ্ত হইয়া, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই অনন্ত জ্ঞানে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাসমান আছে। জগতের প্রত্যেক পদার্থে সেই সদ্ বস্তুর সত্তা আছে; তবে এই জড়জগৎরূপ অসং পদার্থের মধ্যে সর্বত্র তাঁহার বিকাশ নাই। যেখানে সেই জ্ঞানের বিকাশ হয়, তাহাও অসংপদার্থমিশ্রিত বিকাশ। জীব-জন্তুর দেহ ভৌতিক; অরূপ উহা অসং পদার্থ। উহার মধ্যে মানবেই ত্রিগুণের বিকাশ হওয়ার, মানবেই কিঞ্চিৎ অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের আধিক্য প্রকাশ পায়। ফলে উহা অসংমিশ্রিত ও ক্ষুদ্র আমিত্বের দ্বারা বেষ্টিত। কিন্তু সমগ্র জগতে যখন সূন্য জ্ঞান এক, তখন ঐ জ্ঞানের বিষয় বিভিন্ন হইলেও, জ্ঞান বিভিন্ন নহে। ঘট-জ্ঞান, পটজ্ঞান, ত্রজ্ঞান ইত্যাদি। ঘট,

পট, পুত্র চাড়িয়া দিলে জ্ঞান একই থাকে। "মাসাদ যুগ কল্পেযু গতা গমোস্বনেকধা। নোদোত নাস্ত্রাসেতোকা সম্বিদেবা স্বয়-স্প্রভা। ইমন্মাত্মাপরানন্দং পরমেমাঙ্গাদং যতঃ।" সেই অদ্বিতীয় পরমাত্ম অথও মুগ্ধজ্ঞানেই যখন এই অনন্ত জগৎ ভাসমান, তখন ঐ আমিত্ব-বেষ্টিত জ্ঞানের আগ্রহের সংকীর্ণ রেখা প্রসারিত করিয়া, উহার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পুরিতে পারিলে, আগাতেই অনন্ত জগৎ ভাসমান হইতে পারে। প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন—

"সর্বগত্বাদনন্তশ্চ স এবাহমবস্থিতঃ।

মন্ত সর্বমহং সর্বং সর্গি সর্বং সনাতনে ॥

অকমেবাক্ষয়ো নিত্যপরমাত্মাশ্চসংশ্রয়ঃ।

ব্রহ্মগংজ্ঞোহহমেবাগ্রে তথাস্তেচপরঃ পুমান্ ॥"

(বঙ্গার্থ)—এই অনন্ত জ্ঞান সর্বগামী ; সুতরাং সেই জ্ঞানই আমি ; আমি হইতে সমুদায় ; আমাতেই সমুদায় আছে ; আমি নিত্য, অক্ষয় ও অব্যয় ব্রহ্মজ্ঞান, আমি সৃষ্টির পূর্বে বিদ্যমান ছিলাম এবং পরেও থাকিব। অথ্য স্থানে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"রূপং মহন্তে স্থিতমত্র বিশ্বং।

ততশ্চ হৃদ্ম জগদেতদৌশ।

রূপাণি সর্বাণিচ ভূতভেদা

তেষস্তরাশ্চাত্মাখ্যাতীব হৃদ্মম্।

তস্মাচ্চ হৃদ্মাদি বিশেষণানাং।

অগোচরে বৎ পরমাত্মরূপং ॥

কিনপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি।

ভূমৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥"

প্রাণও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই তোমার মহৎ রূপ। এই জগৎ তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। এই বিভিন্ন জীব-জন্তু তোমার এক একটা

মূল রূপ; তাহাদের অন্তরায়্যাই তোমার
অভিসম্বন্ধ রূপ। এই মূর্ত্তাদি বিশেষের অবিসম্বী-
ভূত তোমার পরমাশ্রয়রূপ রূপ আছে।
আর এক স্থানে প্রহ্লাদ কহিয়াছেন—

দেব! যক্ষাঃ সুরাঃ সিন্ধা নাগা গন্ধর্কস্কিন্দরাঃ ।
পিশাচাৱাক্ষসাসৈশ্চ বস্তুশ্চাঃ পশবন্তথা ॥

পক্ষিগঃ স্থাবরাসৈশ্চ পিপীলিকাঃ সরিশ্বপাঃ ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দস্পর্শস্তথা রসঃ ।
রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরায়ী কালস্থণা গুণাঃ ।
এতৎবাৎ পরমার্থকং মর্কমেতৎ সমুচ্যতে ॥”

অর্থাৎ উপরোক্ত সমস্তই ভূমি এক চৈতন্য-
ময়। এরূপ বিপুল বিশ্বপ্রাণতা ও বিরাট
পেদ হিন্দুধর্ম্ম ন্যস্তিত আর কোথায়ও নাট।
আর্য্য মহাত্মা ও মহর্ষিগণ প্রত্যেক মানব,
জীব-জন্তু, উদ্ভিদ ও জড়জগৎ, সমস্তই আশ্র-
ময় দেখিতেন। আমাদের দেশের মধ্যে
‘শিত্তির অঙ্গ-পাত্যঙ্গ বহুগ লোমকূপ আছে;
তাহার একটীতে ‘লোমস্ফোট হইলে, সমস্ত
শরীর তাহার বেদনা অগ্রভব করে। জানীর
পক্ষে জগতের যে কোন জীবের কষ্টে তাঁহার
কষ্ট অগ্রভূত হয়। জানীর সমগ্র জগৎকে
তাঁহাদের এক একটা অঙ্গ মনে করেন;
উহারই নাম বিশ্বপেদ। রাম যদি শ্রামের
জমির আইল ঠেলিয়া লয়, শ্রাম তখন রামের
উপর খড়াহস্ত হয়; উহার কারণ, শ্রাম
হইতে রামের ভেদ জ্ঞান। যদি উভয়ই
একমন হয়, তবে বিবাদ দূরে বাউক,
উভয়ই এক হইয়া যায়! তোমার দেশের
মধ্যে কোটী কোটী দেহরক্ষক জীবাণু
আছে; তাহারা সৌহার্দ ভাবে এক
প্রাণে পরস্পরের সহায়ত্বভুক্তে স্বীয় স্বীয়
কার্য্য নির্বাহ করিয়া দেহ রক্ষা করিতেছে।

পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বা অসামঞ্জস্য নাই।
যখন অসামঞ্জস্য হয়, তখনই মানবদেশের
পীড়া উপস্থিত হয়। সেইরূপ এই পৃথিবীতে
মানবগণের মধ্যে বিবাদ ও অঐক্য ভাবই
মানবসমাজে পীড়া স্বরূপ। একপ্রাণতা ও
বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বাব সংস্থাপন ব্যতীত এই
ভয়ঙ্কর পীড়া আরোগ্যের কোনই উপায়
নাই। এক একটা মুন্সেফী আদালতে
বার্ষিক অনুন ২।৩ হাজার মোকদ্দমা
যে রকম হইতেছে, উহাও উপরোক্ত সারি-
পাতিক পীড়ার কার্য্য। যেমন অঙ্গ ফোট-
কাদি হটলে অঙ্গাঘাত করিতে হয়;
কোন অঙ্গ পচা ধরিলে, ঐ অঙ্গ ছেদন
করিতে হয়, সেইরূপ মানবের পরস্পরের
মধ্যে চৌর্য্য, দস্যুতা, নরহত্যা প্রভৃতি
অপরাধে কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত প্রভৃতিও
তদ্রূপ। সুতরাং পীড়াহার দেহের যেমন
হানি হয়, পরস্পরের মধ্যে একতার অভাব,
অসৌহার্দ, বিবাদ, কলহ, চৌর্য্য ও দস্যুতা
হার্য্য সেইরূপ মানব-সমাজের বিশেষ হানি
হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির সুস্থ দেহে শান্তি-
ভোগ যেমন সুখকর, জগতে মানবের মধ্যে
একপ্রাণতা ও ভ্রাতৃত্বাব মানব-জগতের
তদ্রূপ সুখকর। আর্য্য ঋষিগণের এক-
প্রাণতা কেবল মানব-জগতের মধ্যে
সীমাবদ্ধ ছিল না; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ,
বৃক্ষ, লতা, সকলের সহিত তাঁহাদের
একপ্রাণতা ছিল! আর্য্য ঋষিগণের ভপো-
বনে হিংস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ছাগ, মৃগ, পশু ও
পাখী পরস্পর পরস্পরের প্রতি হিংসাশূন্য
হইয়া, যেন বিরাট প্রেমের মত হইয়া, ভ্রাতৃত্বাব
সংস্থাপনপূর্বক শান্তিহুখে বিরাজ করিত।

সিংহ-ব্যাঘের যে স্বভাবজাত হিংসাবৃত্তি, তাহা ঋষিদিগের বিশ্বজনীন প্রোগের বলে অন্তর্হিত হইয়াছিল। আজকালকার দিনে ইহা অলৌকিক বলিয়া গদাখবদী-গণ বা তাঁহাদের শিষ্যগণ হস্ত অবিখাগ করিবেন; কিন্তু এখনও এই দুর্দিনে হিমালয়বাসী মহাশ্মাগণের আশ্রয় যদি একবার তাঁহারা দৃষ্টি করিয়া চর্ম-চক্ষুর সার্থকতা সাধন করিতে পারেন, তবে টহার সম্ভাব্য উপলক্ষ্য করিতে পারিবেন। তাঁহারা সংসারের কোলাহলে থাকেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কর্মে থাকিয়া, এট পীড়াগ্রস্ত মানব-জগতের জন্ত বাণিত চেষ্টা, পীড়া উপশমের নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাষন করিতেছেন। তবে বাতশ্লেশ্মা বিকার-গ্রস্ত বোগীর পক্ষে ঔষধ ধারণ অতি কষ্টিন। রোগ যেমন আপন কর্মফলে উৎপন্ন হয়, সমাজের রোগও সমাজের কর্ম-ফলে উৎপন্ন হয়। সহায়্য দূরে থাকুন, কর্মকল নিবারণ করিতে স্বয়ং ঔষধেরও যেন ক্ষমতা নাই! যেহেতু কর্ম ঐশিক (প্রাকৃতিক) নিয়মে উৎপন্ন হয়; অন্তএব কর্মফল লভন ঔষধও করিতে পারেন না বা করেন না। তবে শারীরিক রোগ হইলে, চিকিৎসক যেমন ঔষধ প্রদানরূপ কর্তব্য কর্ম করেন, সমাজের সামসিক রোগাদির ঔষধ প্রদান মহাশ্মাগণও সেইরূপ কর্তব্য কর্ম মনে করেন। অপর, চিকিৎসকগণ যেমন অগ্রে উপবাসাদি দ্বারা শরীর নীরস না করিয়া প্রায় ঔষধাদি প্রেরোগ করেন না, মহাশ্মাগণও সেইরূপ সময় উপস্থিত না হইলে ঔষধ প্রদান করেন না। অবশ্য তাঁহারা

এই জড়জগতে উপস্থিত হইয়া, ধারে ধারে লোকের হিতের জন্ত বেড়ান না বা চাঁদার খাতা খুলিয়া দ্রুতিক্রমপীড়িত জনগণের উপকার সাধন করিতে আসেন না। তাঁহাদের সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ অতি কম। তাঁহারা পৃথিবী উন্নতিকে উন্নতি বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিচরণ করেন ও সময়মত জগতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিতরণ ও শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। কিন্তু ক্ষেত্র উপযুক্ত না হইলে, বীজ কখনও উৎপন্ন হয় না; এই জগৎ ক্ষেত্র উপযুক্ত করিবার জগৎ, সময় উপস্থিত হইলে, জড়জগতের সহিত কখন কখন সংশ্লিষ্ট রাখেন। কালমর্মে ভারত-গৌরব অস্তমিত ও মুসলমান-রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে ভারত-রাজ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ার পর, পাশ্চাত্য শিকাররূপ উষা উদ্ভিত হইলে, ঐ অল্পষ্ট আলোকে প্রথমে যাহা দেখা যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া যেমন বোধ হয়, কিম্বা অজ্ঞান শিশু যেমন আপাত চাকুটিক্য দেখিয়া তাহাতে বিমোহিত হয় ও তাহাই উৎকৃষ্ট বস্তু মনে করে, আধুনিক বঙ্গবাসীর পক্ষে তদবস্থাই ঘটরাছে। বাহাই হউক, বাগকেরা যাহা দেখে, তাহা জানিবার ইচ্ছা তাহাদের বলবতী হয়; সেই সময় গুরুজন তাহাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে থাকেন— অর্থাৎ শিক্ষা দিতে থাকেন। সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে ভারত-সমাজ-রূপ বাগকের নানা বিষয়তত্ত্ব জানিবার ঔৎসুক্য দেখিয়া, ক্ষেত্র-প্রস্তুতির সমস্ত ব্যয়সা, মহাশ্মাগণতাবী বীজবপনের নিমিত্ত দুই চারিটা শিষ্যের প্রতি অনুকম্পাপুরঃসর তাহাদের

তত্ত্ববুদ্ধি প্রদান করিয়া, তাহাদিগের হারাই ভারতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশে শুদ্ধান্তঃপুরে পর্গাঙ্গ নাশ্বিকতা ও স্ত্রীদেবী প্রবেশ করায়, তৎসহচর উন্নততা ও অশ্লীলতার সঠিত অখণ্ডাদিগে চড়াচড়ি হইত; সেই স্থানে আবার এখন হোম, সস্তায়ন, শৌচাচার, দেবার্চনাদি স্থান পাউতেছে। বিদ্বাসুন্দর, লক্ষ্মণরত্ন, ডনকন্ গাভ্রির পরিবর্তে ভগবদগীতা, পঞ্চদশী, বেদান্ত— উপনিষদ প্রভৃতি তত্ত্ব স্থান অধিকার করিতেছে। ইহা কাহার পসাদে? সমুদ্রে জোয়ার হইলে, বড় বড় নদ-নদী দিয়া ঐ জল খাল-নিলে আসিয়া পৌছে। এই যে অল্প বিশ্বপোষের কথা লিখিতেছি, সে কাহার পসাদে? অবশ্য সাফাৎ-ভাবে মহাঋগণ কর্তৃক না হউক, তাঁহাদিগের শিষ্যপরম্পরাক্রমে সুক্ষফল এতদূর আসিয়াছে। গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্ত, চিরকাল ছিল, এখনও আছে; কিন্তু এতকাল তাহাদের অনাদর ছিল কেন? এখন ঐ সকল গ্রন্থের আদর ও আলোচনার বুদ্ধি কোথা হইতে আসিল? জানিবেন, সেই মহাঋগণের প্রমাদাৎ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশর্ষভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

ভগবন্! রূপা কর কাতর ভারত-প্রতি।
তোমা বিনে এ দুর্দিনে দুর্গতির কেবা গতি?
নানা রোগাঙ্করতায় ভারত উচ্ছন্ন যায়;
অনিবার অশ্রবার, হাহাকার—হার হায়!
হুর্ভিক্ষে মিলেনা ভক্ষা, অনশন—অর্দ্ধাশন;
আশ্রয় স্বদেশী চা'ল, রেঃ গুন্ রাখে জীবন!
নিরন্ন-নিঃশ্ব-নিরস্ত, পর-হস্তে অন্ন-বস্ত;
শক্রিকৌণ, দীন হীন, স্বদেশে বিদেশীগ্রস্ত!
এরো পরে রাজরোম—প্রচণ্ড 'থাণ্ডনদাহ'
জরিমানা, জেলখানা, নির্দাশন দুর্কিবহ!
হয়ত 'মার্সাল্ ল'ও অদূরে আগত প্রায়;
তা হলেই সঙ্কটের ষোলকলা পূরে যায়।
এ পূর্ণ বিপদে তুর্গ রক্ষ প্রভু পরমেশ!—
'ও অস্তর চরণে এ চিরাশ্রিত ভীত দেশ।
তোমারি রূপা-প্রসাদ এ শুভ 'স্বদেশী' ব্রত—
যথাশক্তি সাধি যেন রহি পদে ভক্তিরত।
শুভাশুভে সুখ-দুঃখে বিপদে সম্পদে আন,
যুগে যুগে ভারতের ভক্তিব্যোগ শক্তি-সার।
'স্বদেশী' সঙ্কটে তাই তব পোষাশ্রয় চাই;
ও পদ-প্রসাদ ভিন্ন এবে অল্প গতি নাই।
তব রূপা অবলম্বে স্বাবলম্ব-সাধনার,
সেবে যার, ভবে তারা অবিলম্বে সব(ই) পায়।
পালয়িতা পিতা তুমি—মাতৃরূপ নিরূপম—,
মাতৃভূমি রূপে বন্দি, গাই 'বন্দে মাতরম্' ॥

শ্রীঃ:—

শ্রীহরিঃ ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।



১৪শ বর্ষ, ১৪শ পণ্ড,
৪র্থ সংখ্যা ।

শ্রাবণ ।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা ।

বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ।

ভারতই মোক্ষ বা নির্কীণ-ধর্মের জন্মভূমি। যে অবস্থায় হৃৎকের একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়, সেই ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থাকে নির্কীণ মুক্তি কহে। নির্কীণসাধক আচরণসমূহ নির্কীণ-ধর্ম। নির্কীণ ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত অবস্থা বলিয়া, ইন্দ্রিয় ও মনকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করাই নির্কীণধর্ম সমূহের শেষ কল। সমাধি এবং ঐন্দ্রিয়িক ও মানস বিষয়ে সম্যক্ বৈরাগ্যই ইন্দ্রিয় ও মনকে নিরোধ করিবার উপায়। স্মৃত্যং সম্যক্ সমাধি ও সম্যক্ বিরাগ (বোগশাস্ত্রের ভাব্য নিরোধসমাধি ও পরবৈরাগ্য) নির্কীণের মুখ্য ও সাধারণ উপায়। অতএব বাহ্য ঐ হইয়ের বিরুদ্ধ, তাহাঁ নির্কীণধর্ম নহে; বাহ্য উহার অল্পগত, তাহাঁই নির্কীণধর্ম।

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগের কচিং কচিং এবং প্রধানতঃ উপনিষদে নির্কীণ-ধর্মের উপদেশ দেখা যায়। তদ্ব্যতীত বেদের অল্পগত সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্রে নির্কীণের উপদেশ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রেও নির্কীণধর্মেরই উপদেশ দেখা যায়। সমাধি ও বৈরাগ্য সম্বন্ধে সাংখ্যাদি আর্ষ্য-শাস্ত্রে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে যেরূপ উপদেশ আছে, তাহা যে বস্তুতঃ এক, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—

আর্ষ শাস্ত্র ।

১। তদেবার্থ মাজ্জনিম্বাসং স্কল্পপ শূন্তমিব সমাধিঃ । বোগহৃৎসম্ ।
খ্যান বা চিন্তের একতানতা পরিপূর্ণ হইয়া যখন কেবল ধ্যেয় বিষয় মাজ্জই বোধগোচর

থাকে, আয়নার আয় সেই ধ্যানই সমাধি।

১। সমাধি ফলভেদে দুই প্রকার; বিভূতি মাত্র ফল এবং কৈবল্য ফল। তন্মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কৈবল্যফল, আর কৈবল্য বিষয়ে অপ্রযুক্ত সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অননুবিদ্ব, সমাধি বিভূতি মাত্র হেতু। বৌদ্ধদের লোকীয় সমাধির ফলও সিদ্ধি বা দেবত্বপ্রাপ্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

৩। নির্বোধের উপায়সংগ্রহ যথা “শ্রদ্ধা-বীর্ঘ্যস্মৃতিসমাধি প্রজ্ঞাপূর্ককমিতরেবাং।

যোগসূত্র।

অর্থাৎ কৈবল্যকামী যোগীরা শ্রদ্ধা, বীর্ঘ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন। প্রজ্ঞা অর্থে সমাধিলা প্রজ্ঞা।

বস্তুতঃ শ্রদ্ধা হইতে বীর্ঘ্য, বীর্ঘ্য হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে সমাধি, এবং সমাধি হইতে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়।

৪। বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা, এই চারি পদার্থের অঙ্গুগম ভেদে সর্বাঙ্গ সমাধি চারি প্রকার। যথা “বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাঙ্গুগতঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ।

যোগসূত্র।

তজ প্রথমঃ চতুঃসংগতঃ সমাধিঃ সবি-
তর্কঃ। দ্বিতীয় বিতর্ক বিকল সবিচারঃ।
তৃতীয়ো বিচার বিকলঃ সানন্দ চতুর্থ স্তব্ধ-
কলো অস্মিতা মাত্র ইতি।

যোগভাষ্য।

অর্থাৎ সনিতর্ক এই চারিভাবের অঙ্গুগত।
সবিচার বিতর্করহিত। সানন্দ বিচাররহিত;
সাস্মিত এই আনন্দরহিত। বৌদ্ধদের ২য় ও
৩য় ধ্যানযোগের সানন্দ সমাধির অঙ্গরূপ।

সানন্দ সমাধি আনন্দানুভববিষয়ক, স্মৃতরাং
আধ্যাত্মিক। ইহাতে ‘দহর পুণ্ডরীকাদি’
ধ্যানে হৃদয়মূলা সর্কদেহব্যাপী সাত্বিকতা
বা স্মৃ অঙ্গুভূত হয়। পতঞ্জলি বলেন—
‘নির্কিঁচার বৈশারদ্যোহধ্যায় প্রসাদঃ’।
অনাস্ম-ভাবের চরমগীমা “অস্মি” বা আমি,
এইরূপ প্রত্যয়। এই প্রত্যয় বিষয়ক
সমাধিই যোগের সাস্মিত সমাধি। অনাস্ম-
বোধের ইহা চরম সীমা।

পঞ্চশিখাচার্য্য বলেন “তমগু মাত্রমাত্মা-
নমগু বিদ্যা—অস্মীতি তাবং সম্প্রজ্ঞানীতে”।

যোগভাষ্যে।

অর্থাৎ সেই স্মৃ বুদ্ধিতরকে অঙ্গুভব-
পূর্কক “আমি” এই প্রত্যয় মাত্র রূপে
জানা যায় ইহা অনাস্মবোধের চরমগীমা।

৫। সম্প্রজ্ঞাত যোগই কৈবল্যের
সাক্ষাৎ উপায়। সবিচারাদি সমাধিলাত
প্রজ্ঞা চিন্তের সম্যক্ নিরোধে প্রযুক্ত হইলে,
তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। যথা—
“মস্ত একাগ্রে চেতসি সতু তমর্থং প্রদ্যোতন্নতি
কিণোতি চ. ক্লেশানুকর্ষবন্ধানি শ্লগ্নতি—
নিরোধমতিমুখং কনোতি, স সম্প্রজ্ঞাতঃ
যোগঃ”।

যোগভাষ্য ১।১

অর্থাৎ একাগ্র ভূমিকার উৎপন্ন যে সমাধি—

(১) যথাভূত বিষয় প্রকাশ করে।

(২) ক্লেশ ক্ষয় করে।

(৩) কর্ষবন্ধন বিলম্ব করে।

(৪) নিরোধকে অতিমুখ করে—

তাহা সম্প্রজ্ঞাত যোগ। তাহার নির্ভা সপ্ত
প্রান্তভূমি প্রজ্ঞা। সেই প্রান্তপ্রজ্ঞা এবং
পন্ন বৈরাগ্য পূর্কক সম্যক্ নিরোধ হইলে,

তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। তাহারই ফল কৈবল্যা বা নির্বাণমুক্তি।

সে পঞ্জায় জ্ঞাতব্য, ক্রান্তব্য ও হাতব্য শেষ হয় ও যৎপরে আর জ্ঞাতব্য, ক্রান্তব্য ও হাতব্য-অবশেষ থাকে না, তাহাই প্রান্ত-ভূমি পঞ্জা।

ফলতঃ যোগশাস্ত্রের সম্প্রজ্ঞাত যোগে—

ক। যথাভূত প্রজ্ঞা হয়।

খ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ ক্লেশ ক্ষয় পায়।

গ। কর্মবন্ধন বা সংস্কার ক্ষীণ হয়।

ঘ। অনির্দ্যাতি সমস্ত প্ৰান্তভূমি প্রজ্ঞার ও পরটৈরাগোর দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হয়।

ঙ। সম্প্রজ্ঞাত যোগ সমাগচিত্রিত হইলে, নিরোধভূমিক, অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বা কৈবল্যা ভয়।

অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলে, জীবনেই বিদেহ-কৈবল্যা লাভ হয়। বৌদ্ধেরাও ‘উপাদিসেস’ এবং ‘অমুপাদিসেস’ এই দুই প্রকার নির্বাণ স্বীকার করেন। বৌদ্ধদের পরি-নির্বাণ * যোগের নিরোধ।

৭। যোগমতে, প্রথম কল্পিক, মধু-ভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতি এবং অতিক্রান্ত-ভাবনীর, এই চারি প্রকার-যোগী।

অতিক্রান্তভাবনীর, প্রান্তভূমি প্রজ্ঞাসম্পন্ন যোগীরাই কৃতকৃত্য হইয়া সাংক্য কৈবল্যা

লাভ করেন; অপরে দেহপাতে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া পরে মুক্ত হন।

যোগমতে প্রজ্ঞার অন্যতম প্রধান বিষয়—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপার। অর্থাৎ অনাগত দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখমুক্তি ও মুক্তির উপার।

সমাধি দ্বারা, সিদ্ধি বা অলৌকিক ক্ষমতা লাভ হয়।

৮। অনিশ্চাবন্ধনের মূল, তাহা অনাদি।

তাহার আদিসম্প্রয়োগ নাই।

৯। “যে চৈত্রে মৈত্র্যাদয়ো ধ্যায়িনাং নিভারাঃ” ইত্যাদি “যোগভাষ্যে প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্য-বচন—অর্থাৎ মৈত্রী, কক্ষণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই ধ্যায়ীদের বিহার।

• ১০। ধর্মচর্চ্যা বিবিধ, বাহু ও আশা-শ্লিক। ‘নাহং স্ততি, দানাদি, চিত্তমাত্রা-ধীনং প্রক্ৰাদ্যাধ্যাত্মিকং। * * * তয়োর্মানসঃ বদীয়ঃ’।

যোগভাষ্য ৪। ১১।

“পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রেয়চ্ছতি।” গীতা।

১১। সাংখ্যমতে জগৎ দৈবের কার্য্য নহে; কিন্তু অনাদি কার্য্য-কারণ-পরম্পরা মাত্র; কিন্তু ক্রেশ, কর্ম, বিপাক, আশয়-শূন্য বা অনাদি মুক্ত পুরুষ আছেন এবং হিরণ্যগর্ভাধ্যা ব্রহ্মাণ্ডাধিপতি আছেন।

১২। পাপ ও পুণ্য কর্মের দ্বারা নিরয় ও স্বর্গে গমন এবং প্রোক্তের উপকারার্থে দানাদি। •

* ‘পরিনির্বাণ’ শব্দ উত্তর কালে অর্হতের দেহনাশ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ধর্মপদের প্রাচীন গাথার টুহা বিদেহ-কৈবল্যের মত অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়; বধা “পরিনির্বাণ্য-নানবা ক্ষীণাসবাশ্চতে দোকে জোতিসং পরিনির্ব্ভাঃ।” • ১৪

* পুণ্য ও পাপ হইতে মুক্ত্যর পর দিব্য ও নারক শরীর গ্রহণ বৌদ্ধদেরও আছে, যথা—“যে কেচিবুদ্ধং সরণং গতাসে নতে-গমিস্শক্তি অপায়ং। পহায় সাহস্য়ং দেহং দেবকায়ং পরিপুবেস্শস্তীতি ॥

মহাসময়সুত্তং ।

বৌদ্ধ শাস্ত্র ।

১। “কুশলচিত্তে কগ্গতা সমাধি”
 “অবিক্ষেপ লক্ষণং” “অবিকম্পনং ।”
 বিশুদ্ধিমার্গ । ৩ অঃ ।
 উহা অবিক্ষেপ লক্ষণ এবং কম্পনরহিত ।

২। বৌদ্ধদেরও সমাধি গতি-তেদে
 দ্বিবিধ—লোকীয় ও লোকোত্তর । তন্মধ্যে
 “তিস্তু ভূমিস্তু কুসলচিত্তেকগ্গতা লোকিয়ো
 সমাধি । অরিয়মগসম্পবৃত্তা লোকুত্তর
 সমাধি ।”

বিশুদ্ধিমার্গ । ৩ অঃ ।

অর্থাৎ কামাবচর, রূপাবচর ও অরূ-
 পাবচর, এই তিন ভূমিতে লোকীয় সমাধি
 হয় । আর আর্ধ্যমার্গের সহগত সমাধি
 লোকোত্তর ।

৩। “সদ্ধার সীলেন চ বীরিয়েন চ সমা-
 ধিনা ধম্মবিনিচ্ছয়েন চ ।” ধর্মপদ ১০ । ১৬
 অর্থাৎ শ্রদ্ধা, শীল, বীর্ষা, সমাধি ; ধর্ম-
 বিনিশ্চয়পূর্নক এবং বিভ্রাচরণসম্পন্ন ও
 স্মৃতিবুদ্ধ হইয়া হৃৎখবিরোগ লাভ করে ।

শীল যোগীদের ঘম ও নিয়ম * ব্যতীত
 আর কিছু নহে । দীর্ঘ নিকায়ের সীলক-
 খন্দের প্রত্যেক সূত্রেই বৌদ্ধদের সীলবদ্ধ
 নিবদ্ধ হইয়াছে ।

* নিয়মের অন্তর্গত ঈশ্বর-প্রণিধান
 বৌদ্ধদের নাই বটে, কিন্তু বুদ্ধপ্রণিধান
 আছে । পুরুষের শরণাগতি ; বুদ্ধপ্রণি-
 ধানও তাহাই । ফলতঃ ঈশ্বরপ্রণিধান
 সমাধি-সিদ্ধির অন্ততম হেতু । “বীতরাগ
 বিষয়ং বা চিত্তং” এই যোগস্বাহাম্বারে
 বুদ্ধপ্রণিধানও যোগশাস্ত্রসম্মত ।

স্মৃতি একটি প্রধান সমাধি সাধন ।
 পাশ্চাত্যদের মতে বৌদ্ধশাস্ত্রাপেক্ষা যে সব

ধর্মবিনিশ্চয় এবং বিভ্রা যোগের প্রজ্ঞা ।
 সমাধির ফল যে প্রজ্ঞা, তাহা বুদ্ধদেবও
 বলেন, যথা বিশুদ্ধিমার্গে ১৪ অধ্যায়ে “সমা-
 ধিতো যথাভূতং পজ্ঞানান্তি পস্সতীতি বচন-
 তোপন সমাধি তস্মা (পঞ্ঞায়)
 পদট্ঠানং ॥”

৪। “সো বিবিচ্বেব কামেহি বিব-
 চেব অকুসলেহি ধম্মেহি সবিতক্কং সবি-
 চারং বিবেকজং পীতিসুখং পঠমং কানং
 উপসম্পজ্জ বিহরতি ।”

পোচ্ঠপাদসুত্তং ।

অর্থাৎ কাম ও অকুশল ধর্ম হইতে পৃথক্
 হইয়া, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ (পৃথক্-
 ভ্রজাত) শ্রীতিসুখযুক্ত প্রথমধ্যান ।

যুক্ত প্রথমধ্যান—

যোগশাস্ত্রের সবিতর্ক, সবিচার, নির্বিতর্ক,
 নির্বিচার সমাধির ত্রায় বৌদ্ধদেরও বিভাগ
 আছে । “অখমালিনির” চিত্তপ্লাদকণ্ডে
 ধ্যানের পঞ্চকনয় ব্রহ্মবা ।

প্রাচীন উপনিষৎ আছে, তন্মধ্যে ছান্দোগ্য
 একখানি । ছান্দোগ্যে আছে—“আহার-
 শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ জ্ঞানস্মৃতিঃ স্মৃতি-
 লভ্তে সর্লগ্রহীনাং বিপ্রমোকঃ” অর্থাৎ বিষয়-
 গ্রহণরূপ আহারশুদ্ধি হইলে, চিত্তশুদ্ধি হয় ;
 চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞানস্মৃতি হয় ; স্মৃতিলাভে
 সমস্ত গ্রহি হইতে বিপ্রমোক হয় । বৌদ্ধে-
 রাও বলেন—“একরনো অয়ং ভিক্ষুবে
 মগ্গো সত্তানং বিসুচ্ছিন্না * * * যদিদং
 চত্তারো সতি পট্ঠানা” ।

মন্ত্রিম নিকারে সতি পট্ঠান স্তুত্তং ।

অর্থাৎ হে ভিক্ষুকগণ ! এই বে চারি স্মৃতি-
 প্রস্থান, তাহাই সমাধির বিশুদ্ধির অন্ত এক
 মাত্র উপায় ; অন্তএব এই প্রধান স্মৃতিরূপ
 সাধন যে বৌদ্ধেরা প্রাচীন উপনিষৎ হইতে
 গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাবরে সংশয় নাই ।

বৌদ্ধদের দ্বিতীয় ধ্যান বিতর্ক-বিচার-
রহিত আধ্যাত্মিক “একোদিভাব” বা এক-
তানতা সহগত প্রীতিসুখস্বরূপ।

(হংসাবতী) ধর্মসঙ্গী। ২৮ পৃঃ।

তৃতীয় ধ্যান প্রীতিশূন্য বা চিন্তাগত
হ্লাদশূন্য। তাহাতে “সুখং কায়েন পটি-
সম্বেদেতি”।

বৌদ্ধদের নির্বীচার দ্বিতীয় ধ্যানও
“অজ্ঞাত্তং সম্পাদনং” লক্ষণে লক্ষিত।

বৌদ্ধদের চতুর্থ ধ্যান সংজ্ঞাগ্র বিষয়ক
যথা “ততোধো পোট্টপাদ ভিক্খুইষ সক-
সঞঞী হোতিসো ততো অমুত্র ততো অমুত্র
অমুপুবেবন সঞঞগুগং ফুসতি।”

সীলকথকের পোট্টপাদসুত্তং।

অর্থাৎ হে পোট্টপাদ, তদনন্তর ভিক্ষু
স্বকসংজ্ঞী (স্ব বা আত্মসংজ্ঞী) হইতে
থাকেন ও পরে ইহা হইতে পৃথক্” “ইহা
হইতে পৃথক্” (অর্থাৎ নেতি নেতি) এইরূপ
ক্রমে সংজ্ঞার (বাহ্য বোধের) অগ্র বা সীমা
স্পর্শ করেন।

৫। ‘লোকুত্তর’ মার্গ নির্বাণের সাক্ষাৎ
উপায়। ‘লোকুত্তর মার্গ চারি অবস্থায়
বিস্তৃত। তাহারাই সকলই “নির্ব্যানিক”
বা বন্ধন ছেদ করিয়া উর্দ্ধগতিশীল, “অপচয়-
গামী” বা সংস্কারক্ষয়কারী সমাধি; তাহার
প্রথম ভূমিতে “অনঞঞাতঞঞসমস্মামী-
ভিন্দিয়ং” অর্থাৎ “অজ্ঞাত জানিব” এইরূপ
ইন্দ্রিয় বা শক্তি নিশ্চয় হয়; এবং তাহা
“দিট্ঠিগতানাং বা অবণা জ্ঞানের প্রহান-
কারী দ্বিতীয় ভূমিতে কাম-রাগ এবং
ব্যাপাদ বা হিংসার তছুতাব বা ক্ষীণতা
হয়; তৃতীয় ভূমিতে কাম-রাগ ও

ব্যাপাদের অনবশেষ প্রহান বা সমূলঘাত —
নাশ হয়। চতুর্থ ভূমিতে রূপরাগ, অরূপ-
রাগ, মান, উদ্ধচ (চিন্তের ক্ষিপ্তাবস্থা) ও
অবিজ্ঞার অনবশেষ প্রহান হয়। ইচ্ছাতে
“অঞঞোন্দ্রিয়” অর্থাৎ জ্ঞাত, প্রাপ্ত, বিদিত
সমস্ত ধর্মের সাক্ষাৎকারবতী প্রজ্ঞা হয়।
বিশেষ ধর্মসঙ্গী ১। ৫ দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধশাস্ত্রের লোকুত্তর মার্গে—

ক। প্রজ্ঞা বা আজ্ঞা হয়।

খ। অবিজ্ঞা, ত্রিবিধ—রাগ, ব্যাপাদ,
অভিমান, বিক্ষেপ ক্ষয় হয়।

গ। সংস্কার ক্ষয় ও বন্ধন ভেদ হয়।

ঘ। উহাদের অনবশেষ প্রহান হয়।

• ৬। বৌদ্ধশাস্ত্রে এ বিষয়ের স্ফুট উল্লেখ
দেখা যায় না। তবে বৌদ্ধদের “সঞঞা-
বেদয়িত নিরোধ” সমাধি, যোগের নিরোধ-
সমাধির অনেক নিকট এবং বোধহয়
একই। কিঞ্চ “আকাশেচ সকুত্তানাং গতি
তেষং ছয়ন্নয়া” “সুঞঞাগর পবিট্টস্দ”
অর্থাৎ অর্হৎদের গতি আকাশে পক্ষীর
গতির স্তায় হুলক্ষ্য। শূভাগারে প্রবিষ্ট
ইত্যাদি বচন হইতে উহা অস্বীকৃত হয়।
ফলে যে চিন্ত সমাক্ রাগশূন্ত এবং সংজ্ঞা-
বেদয়িত নিরোধে অমুরক্ত, তাদৃশ চিন্ত
সমাহিত থাকিলে, যোগের নিরোধ সমাধি
ব্যতীত কি হইতে পারে?

৭। বৌদ্ধদের লোকুত্তর মার্গহৃদেরও
চারি ভেদ, যথা—স্নেহ, আপন্ন, সন্ধাগামী
অনাগামী ও অর্হৎ।

অর্হৎদেরই পরিনির্বাণ লাভ করেন।
অপরেরা ব্রহ্মলোকে বা উচ্চ স্বর্গে গমন
করেন ও পরে নির্বাণ-প্রাপ্ত হন।

বৌদ্ধ মতে সম্যক দৃষ্টির বিষয় চারি অর্গ্যগতা, যথা—দুঃখ, দুঃখহেতু, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধের পথ। মার্গবিশদ্য সূত্র জট্টনা।

সমাধির দ্বারা “ইন্ধি” (ঋদ্ধি) বা অলৌকিক শক্তি লাভ হয়।

৮। অবিজ্ঞা মূল সংযোজন ও মূল আসব।

অখণ্ডালিনিতে উদ্ধৃত বুদ্ধ-বচন হইতে জানা যায় যে—“অবিজ্ঞার আদি বা সাহার পূর্বে অবিজ্ঞা ছিল না, তাহা জানা যায় না।

৯। মৈত্রী আদিকে বৌদ্ধেরা বন্ধ-বিহার বলেন। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র মতে উহা অতি প্রাচীন সাধন। ব্রহ্মা ঐ সাধন সম্পন্ন।*

* যদিও নিকায় জাতকাদি সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্রের মতে ব্রহ্মবিহার বুদ্ধের পূর্বকাল হইতে বর্তমান (যেমন মহাসুন্দর্যন সূত্রে মহাসুন্দর্যন রাজা এই সাধন করিয়াছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি) তথাপি Rhys Davids সাহেব উহা বৌদ্ধদের উদ্ভাবিত বলিতে চান। তিনি আরও বলেন “But they have been found in any Indian book not a Buddhist work, and therefore almost certainly exclusively Buddhist.” কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। উপরিউক্ত প্রাচীন সাংখ্যাচর্গা-বচন এবং পাঠগুলি সূত্র তাহার প্রমাণ।

এতদ্ব্যতীত Rhys Davids সাহেব আরও কতকগুলি উদ্ভট তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পূর্বে ধ্যান ছিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধেরা ‘সমাধি’ আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহার মতে “Samadhi has not yet been found in any Indian book older than the

১০। এই সাংখ্যীয় তত্ত্বটি বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব। বস্তুতঃ চিন্তসাত্বাদীন ধর্মচর্চার অতি প্রচার করাই বৌদ্ধদের বিশিষ্টতা। তবে বাহুপূজাও তাঁহাদের সম্যক ত্যাজ্য নহে। যথা প্রজ্ঞাপারমিতায় “পুষ্পধূপ-গব্য মার্গাবিলেপনচূর্ণচিবরচ্ছত্রধ্বজঘণ্টাপতা-কাভি স্তবর্ণপ্যামঠৈশ্চ পুষ্পৈর্দিটমশ বাটৈদ্য” প্রভৃতি বচনে পূজা করা দেখা যায়। (৩০ বিবর্ত)।

১১। বৌদ্ধশাস্ত্রেও অগৎ সর্কর্ক নহে। অনাদি ঘটনা-পরম্পরা মাত্র। কিন্তু উদিত্য বা মহায়ান বৌদ্ধেরা ‘আদি বুদ্ধ’ নামে অনাদি মুক্তপুরুষ স্বীকার করেন এবং ‘অনলো-কিতেশ্বর, ব্রহ্মা, ইন্দ্রাদিও স্বীকার করেন।

১২। বৌদ্ধেরাও ইচ্ছা স্বীকার করেন। “পাপকুণ্ডলমঠৈব ইহ প্রোতা চ শোচতি। পুণ্যকুণ্ডলমঠৈব ইহ পেত্যচ মোদতে”।

মহাপদ ১। ১৫। ১৬।

Pitakes.” অথচ তাঁহার মতে ‘বৃহদারণ্যক উপনিষৎ’ পিটকাপেক্ষা বহু প্রাচীন। সেই বৃহদারণ্যকে আছে—“শাস্তো দাস্ত উপরত-স্তিতিক্ষু সমাহিতো ভূষা আর্জুন্তেবাআনং পশ্চেং” স্মরণঃ Rhys Davides যে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি, তদ্বিশয়ে নংশয় নাই। ধ্যান ও সমাধির তিনি যেরূপ ভেদ করিতে চান, তাহাও তবে না প্রবেশ করার ফল। বস্তুতঃ প্রগাঢ়তম ধ্যানই সমাধি। ঐ উভয় পদই নির্কেশেবে বৌদ্ধ ও আর্ষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। ব্রহ্মজাল সূত্রে শাখতাদিবাদীদের ধ্যানকে সমাধি পদের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। আর “মার্গবিশদ্য সূত্রে” বৌদ্ধদের চারি বান বা ধ্যানকে সমাধি বলা হইয়াছে, যথা—“ * * * চতুঃ বানং উপগমুজ্জ বিহরতি অরং বৃচ্চতি সম্মা সমাধি।”

এবম্বেব ইতোদিয়ং পেতানং উপকপ্পতি ।

তিরোকু ড্ড হত্তং ।

অর্থাৎ সেইরূপ উচ্চলোককে দত্ত দান (পেতের উদ্দেশ্যে) পেতের ভাল করে ।

এই তালিকা হইতে পাঠক দেখিবেন যে, তত্ত্বঃ বৌদ্ধধর্ম আর্ষ ধর্ম এক । তাহাদের সাদৃশ্য ও একত্ব আরও অনেক দেখান যাইতে পারে ; কিন্তু বাহুলা ভয়ে দেখান হইল না । অবশ্য বুঝাইবার প্রণালী, পদার্থের গুণ প্রভৃতি সামান্য বিষয়ে বহু ভেদ আছে, কিন্তু মূল ধর্ম-তত্ত্বে কিছু ভেদ নাই । ফলে প্রাচীন সংখ্যা ও যোগের উপর প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্ম স্থাপিত ।

কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধগণ ইহা সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না । তাঁহারা বলেন—সীল, স্মৃতি, ব্রহ্ম নিহার, সমাধি (চারি ধ্যান) রূপানচর ধ্যান, অরূপ ধ্যান, ইত্যাদি বুদ্ধ অপেক্ষা প্রাচীন বটে ; (কারণ সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রের তাহাই তাৎপর্য) + কিন্তু লোকোত্তর-মার্গ বুদ্ধদেবের নিজের আবিষ্কৃত, তিনিই উহার আদি শাস্ত্র । আর্ষ-শাস্ত্রে নির্বাণের কথা নাই । তাহার মুক্তি ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহরানন্দ অরণ্য ।

(কাপিশাশ্রম)

+ Rhys Davides সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন যথা—Now it is perfectly true, that of these thirteen (অর্থাৎ সীল সমাধি আদি হইতে লোকোত্তর মার্গ পর্য্যন্ত) consecutive proposi-

কর্ম ও ফলিত জ্যোতিষ ।

(পূর্ণিমুভূতি)

আর্ষাশাস্ত্রে এই শিশুমার অংশিতা ও কুণ্ডলীভূত । তাঁহার পুচ্ছাগ্রে ধ্রুব, লাক্ষ্মণে অশ্বিনী, ইন্দ্র, ধর্ম ও প্রজাপতি ; পুচ্ছমূল দাতা ও নিদাতা এবং কটিতে সপ্তর্ষি । তাঁহার দক্ষিণানর্ধ কুণ্ডলীভূত দেহের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বে সমসংখ্যক নক্ষত্র নিরাজিত । তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গনীপী এবং উদরে আকাশগঙ্গা ; তাঁহার দক্ষিণ নিত্যে পুনর্দশু, বাম নিত্যে পুয়া ; দক্ষিণ পদে আর্দ্রা—বাম পদে অশ্লেষা ; দক্ষিণ নাসিকায় অভিজিৎ—বাম নাসিকায় উত্তরাষাঢ়া ; দক্ষিণ নেত্রে শ্রবণা—বাম নেত্রে পূর্বাষাঢ়া ; দক্ষিণ কর্ণে—মনিষ্ঠা—বাম কর্ণে মূলা ইত্যাদি । তাঁহার হস্তে ক্ষেত্ররূপী অগস্ত্যা ও যম ; মুখে অঙ্গারক ; উপরে শটনচর ; শৃঙ্গাদিতে বৃহস্পতি, বক্ষস্থলে আদিভা, হৃদয়ে নারায়ণ, মনে চন্দ্র, নাভিতে শুক্র, স্তনে অশ্বিনীকুমার, গ্রাণ ও অপানে বুধ, গলদেশে রাহু, মর্দীক্ষে কেতু এবং রোমে মর্দী তারাগণ ।*

tions groups of propositions, it is only the last that is No. 13 (অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গ) that is exclusively Buddhist.

Dialogues to the Buddha P. 52.

* "যস্ত পুচ্ছাগ্রেহবাঙ্ক শিরসঃ কুণ্ডলীভূত দেহস্ত ধ্রুব উপরস্থঃ । তস্ত লাক্ষ্মণে প্রজাপতিরশ্বিনীর্দেহা ধর্ম ইতি পুচ্ছমূলে

শ্রীভগবান বাসুদেবের এই শিশুস্বরূপ অথবা তাঁহার যোগমারা তাঁহার অনন্ত শক্তির অংশবিশেষ কি না, তাহা পাঠকের আলোচনীয়। তাঁহার যে অনন্ত শক্তি পাতালে সঞ্চর্ষণ বা নাগরূপী, নভোমণ্ডলে সেই শক্তি শিশুস্বরূপ—সম্ভবতঃ আধিতৌতিক রূপে অভিহিত হইয়াছেন। যে শক্তি প্রভাবে এই মেদিনীমণ্ডল ধৃত রহিয়াছে—বসুন্ধরা—বৃক্ষ, লতা, গুল্ম ও নানাবিধ শ্রামল শস্ত উৎপাদন করিয়া জীবের জীবন-প্রবাহ রক্ষা করিতেছে—যে শক্তি প্রভাবে সমগ্র জীবমণ্ডলী অমুপ্রাপিত রহিয়াছে—সেই

ধাতা বিধাতা চ কট্যাং সপ্তর্ষয়ঃ। তস্ত দক্ষিণাবর্তে কুণ্ডলীভূত শরীরস্ত বাহ্যদগয়-নানি দক্ষিণপার্শ্বে নক্ষত্রাণি উপকায়তি। দক্ষিণায়নাদি তু সবে্যে যথা শিশুস্বরূপ কুণ্ডলাভোগ সন্নিবেশস্ত পার্শ্বরৌরুভয়ো-রণ্য বয়বাঃ সম সংখ্যা ভবন্তি। পৃষ্ঠেভুজ-বীণী আকাশগঙ্গা চোদরতঃ ॥ পুনর্কস্তু পৃথ্বী দক্ষিণ বায়রো পাদরোরভিজ্জিত্তরা-বাঢ়ে দক্ষিণ বায়রো নাসিকরোযথা সংখ্যঃ শ্রবণ পূর্ক্বাষাঢ়ে দক্ষিণ বায়রো লৌচনরো ধনিষ্ঠা মূলঞ্চ দক্ষিণ বায়রো কর্ণরো মঘা-দীজ্জটনক্ষরাণি দক্ষিণায়নাদি বাম-পার্শ্ব বজ্রিষু যজ্জীত। বধিষু অস্থিষু। তথৈব মৃগশীর্ষাদাহ্যদগয়নানি দক্ষিণ পার্শ্বেষু প্রাতি শোমোন যজ্জীত। শতভিবা জ্যোষ্ঠে স্বকরো দক্ষিণ বায়রো নসেৎ। উত্তরাহনাবগন্ত্যঃ অধরাহনৌ যগঃ মুখে চান্দ্রারকঃ শনৈশ্চর উপহে বৃহস্পতিঃ ককুদি বকুশাদিভ্যোঃ হৃদরে নারায়ণো মনসি চক্শো নাভ্যামূলনা স্তময়োরাবিনৌ, বুধঃ প্রাণাপানরো বৃহ-র্গলে কেতবঃ সর্ক্বাঙ্গেষু রোমেষু সর্ক্বে তার-গণাঃ * * * (শ্রীমহাভাবত মে স্বক, ২৩ অধ্যায়)

অনন্ত শক্তি কর্তৃক শূন্য আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রাদি ধৃত ও শান্ত ভ্রমণে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাড়িতাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণাদি যে শক্তির বিকাশ—পরমাণুর নিত্য সংযোগ ও বিয়োগ বাহার পরিণাম—যে শক্তিজ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তি বিশেষণে—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন নামে বিশেষিত; সেই অনন্ত শক্তি কর্তৃকই নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতির্গণ পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া অহরহঃ বিচরণ করিয়া থাকে—কখনও কক্ষচ্যুত হয় না। সেই একই শক্তি বিভিন্ন কার্য্য ও বিভিন্ন স্থলবিশেষে—বিভিন্ন নাম, উপাধি, ও মূর্ত্তি অবলম্বন করে।

আধুনিক প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিকগণের মত যে “There can be no independent force since all force is an inherent and necessary property of matter; consequently, there is no un-material creative power.” এ ভগতে স্বয়ম্ভু বা স্বয়ম্ প্রধান কোন শক্তি নাই; বাহা কিছু আমরা শক্তির পরিচয় পাই, তাহা কেবল পরমাণুর ধর্ম বা তাহার অন্ত-নিহিত শক্তির বিকাশ মাত্র। সুতরাং সৃষ্টিশক্তি বলিয়া কোন অজড়শক্তি নাই। তাঁহার আরও বলেন “Gravitation is the sole cause, the acting God and matter its prophet” কিন্তু জগৎপূজ্য মহাত্মা সার আইজ্যাক্ নিউটনের মত অন্তবিধ। তাঁহার মতে “that there is some subtle spirit, by the force and action of which all movements of matter are determined” এমন কোন স্বল্প চৈতন্তশক্তি আছেন যে, তাঁহারই শক্তি ও কার্য্যকারিতার পরমাণুর গতি

অনুশাসিত হয়। মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি এই যে "Gravity must be caused by an agent acting constantly according to certain laws, but whether this agent be material or immaterial, I have left to the consideration of my readers" ইহার ভাবার্থ এই যে, এমন একজন কর্তা আছেন, যিনি কতিপয় বিধিঅনুযায়ী নিরন্তর ক্রিয়া করিয়া থাকেন এবং তাঁহার কর্তৃক মাধ্যাকর্ষণ সংঘটিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই কর্তা জড় কি অজড়, তাহার বিচার-ভার আমি আমার পাঠকবর্গের হস্তে সমর্পণ করিলাম।

মাধ্যাকর্ষণশক্তি কর্তৃক এই পৃথিবী ধৃত রহিয়াছে এবং তজ্জন্ত তাহা পতিত হয় না এই ধারণার তদনুরূপ উত্তর প্রত্যাশায় জনৈক পরীক্ষক প্রশ্ন করেন "Why does not the earth fall? কেন এই পৃথিবী পড়িয়া যায় না? অধিকাংশ বালকই সম্ভ্রান্তজনক উত্তর দিতে পারে নাই। অবশেষে একটা বালিকা অস্ত্রবিধ প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষকের প্রশ্নের সমাহার করে। বালিকার প্রশ্ন এই যে "Where should the earth fall?" এই পৃথিবী পড়িবে কোথায়? বালিকার প্রশ্ন অতি সুন্দর। (১) কারণ এই শূন্য ও অনন্ত আকাশের উর্দ্ধ-অধঃ কোথায়? কত্বে কোথায় এই পৃথিবী পতিত হইবে?

(1) "Why does not the earth fall? He wanted to evoke answers about gravitation and so forth. Most of the children could not answer at all; a few answered,

আমরা তুলনাবৃত্তি দ্বারা উর্দ্ধ-অধঃ, ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ইত্যাদি তুলনা করিয়া থাকি। কিন্তু অনন্তের তুলনা সম্ভবনা; উর্দ্ধ-অধঃ থাকিতে পারে না। সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রাদি যেরূপ অনন্ত আকাশে পরিভ্রমণ করিতেছে, পৃথিবীও তদনুরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। আমরা এই পৃথিবীতে দণ্ডায়মান হইয়া পদমূলকেই অধঃভাগ দেখি; সুতরাং সম্ভ্রান্তকোণের আকাশ অতি উর্দ্ধ এবং চতুঃ পার্শ্বস্থ আকাশ তাহাহইতে জগন্নিম্ন হইয়া যেন সৃষ্টিকা স্পর্শ করিয়াছে, আপাত্ত দৃষ্টিতে পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে। আকাশের এই ক্ষিতি স্পর্শ-আকারে যে বৃত্ত দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকে "ক্ষিতিজ বৃত্ত" কহে। এই "ক্ষিতিজ বৃত্ত" তিন আমরা সম্পূর্ণ-আকাশ মণ্ডল দেখিতে পাইনা; বাহ্য-দেখিতে পাই, তাহা অর্ধ মণ্ডল বা অর্ধ বর্তুলাকার। আমরা যেমন আকাশ মণ্ডলকে শূন্যগর্ভ বর্তুলাকার দেখিতে পাই, আমেরিকা,

that it was gravitation or something. One bright little girl answered it by putting another question 'where should it fall.' Because the question is nonsense; There is no falling or rising for the earth. In infinite space, there is no up or down; that is only in the relative. Where is the going or coming for the infinite? Whence should it come and whither should it go (vide Lecture delivered in England on the real and apparent man by swami Vibekinand)

ইয়ুরোপ ও অন্যান্য ভূখণ্ডের তাবৎ মানবই সেইরূপ দেখিরা থাকে । আমাদের রত তাহাদেরও উর্দ্ধদিকে উন্নত আকাশ এবং পদমূলে ক্ষিতি । (২) এই পৃথিবী নিশ্চল বা স্থির নহে, সূর্যের চতুর্দিকে নিয়ত ভ্রমণ করিতেছে; সুতরাং সূর্যকে নিশ্চল ও স্থির কল্পনা করিলেও কখন সূর্যের একদিকে কখন বা বিপরীত দিকে—কখন দক্ষিণ পার্শ্বে কখন বা বাম পার্শ্বে অবস্থিতি করে । চক্রে পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে ।

(২) সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে উক্ত ভ্রমণ ব্যবস্থা এইরূপ আছে:—

“নিরক্ষ রেখাে ক্ষিতি মণ্ডলোপমৌ গ্রন্থৌ
 নমঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ ।
 ভদ্রাভিতং থে জলচক্রবৎ সদা ভ্রমন্তচক্রং
 নিজ মন্তকোপরি ॥
 উদগ্ দিশং বাতি যথা যথা মরুতণা তথা
 ধামিত মুক্ষমণ্ডলম ।
 ক্রমশ্ ক্রমং গভ্রতি চৌরুতং ক্ষিতেভদ্রস্তরে
 যোজননভাঃ পলাংশকাঃ ॥
 যোজন সংখ্যা ভাঃ শৈ ৩৬০ ভূপিতা
 কুণ্ডলিধি রুতৌ ৪২৬৭ ভবস্তুর শাঃ ।
 ভূনৌ কক্ষায়ং বা ভাগ্নেজ্যো যোজননপি
 চ যত্বতম ॥”

“Astronomers who see in gravitation an easygoing solution for manythings, and an universal force which allows them to calculate thereby planetary motions ; care little about the cause of Attraction. They call gravity a law, a cause in itself. We call the forces acting under that name Effects, and very secondary effects, too:oneday it will be found that scientific hypo-

পৃথিবীর জ্ঞান মঙ্গলাদি গ্রহও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে । সুতরাং পৃথিবী কখন অস্তিত্ত গ্রহগণের সহিত সূর্যেৰ এক দিকে সাক্ষাৎ করে কখন বিপরীত দিকে চলিরা যায় । এইরূপ অবস্থায় কে উপরে কে নিম্নে অবস্থিত, তাহা কদাপি স্থির করা যাইতে পারে না । সুতরাং কে কাহার উপর গতিত হইবে ?

পরম মনীষিনী বর্গীরা ম্যাডাম ব্লাউট্‌স্কী মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে বাহা বলিরাছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ।

বাহাহউক শিশুমাররূপী ভগবান বাসু-দেবের যোগ-মায়ার আশ্রয়ে অনিমিষ ও অব্যক্ত কালের গতি ক্রমে জ্যোতির্বিগ্ন আকাশান্ত আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিরা থাকে ; এবং তাহাদের গতি অল্পসারে অনিমিষ ও অব্যক্ত কাল, নিমিষ, দণ্ড, মাস, অন্নন, বৎসর ইত্যাদিতে ব্যক্ত হইরা থাকে । উক্ত জ্যোতিষচক্র কাল-চক্র নামে অতিহিত হয় ।

জ্যোতিষ শাস্ত্রে বলে—“নীম্বোচ্চ”, “মন্ডোচ্চ” ও “পাত” নামে আকাশ মণ্ডলে তিনটা স্থান আছে তাহাদের কর্তৃক গ্রহাদির গতি অনুশাসিত হয় । যে প্রদেশের প্রতি মণ্ডল (কক্ষ) পৃথিবী হইতে অনেক দূরে

thesis does not answer after all and then it will follow the corpus eular theory of light, and be con- signed to test for many scientific causes in the archives of all exploded speculations.” Vide secret Doc- trine Vol I.

অবস্থিত, তাহাকে “উচ্চ” কহে। গতিজঃ সুনীমীগণ এই ভূঙ্গ স্থানেরও গতি কর্তন্য করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত গতির ইত্তর বিশেষে এই উচ্চ স্থান “সীল্লোচ্চ” ও “সল্লোচ্চ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন গ্রহের কক্ষ অন্ননান্তবৃন্তের বে স্থান কর্তন্য করে তাহাকে “পাত” কহে। এই স্থানত্রয় গ্রহাদির গতির হেতু

এই পৃথিবী হইতে ষাটশ বোজন পর্য্যন্ত বে বায়ু প্রবাহিত তাহাকে “ভূবায়ু” কহে।* মেঘ, বিছাৎ ইত্যাদি এই বায়ুতে বিরাঞ্জিত। উদূর্কে “প্রবহবায়ু”—এই প্রবহানিলে গ্রহগণ বিচরণ করিতেছে। দুই দিকে দুইটা ক্রব তারা মধ্যস্থলে গ্রহাদি বাত-রশ্মি কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া শূন্তসার্গে পরিভ্রমণ করিতেছে। বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে; পশ্চাতে যখন বে স্থানের নিকট-বর্তী হর সেই স্থানের গতি অনুসারে তাহা-রাও গতিশীল হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)
শ্রীবহুনাথ দে।

* “ভূবায়ু”র অপর নাম “আবহ”। ইহার উর্কে প্রবহবায়ু তাহারপর “উবহ”, তাহারপর “সাবহ”, তাহারপর “ভুবহ”, তাহারপর “পরিবহ”, তাহারপর “পরাবহ” বায়ু যথাক্রমে উর্কসার্গে প্রবাহিত। এই সপ্ত-বিধ বায়ুক উল্লেখ সিদ্ধান্ত শিরোনামি গ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়।

লেখক।

অস্তিত্ব বা বৌদ্ধদর্শন।

যে বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণাদি পারমার্থিক বিষয়ের বিশেষ লক্ষণ ও প্রভেদাদি বর্ণিত আছে তাহার নাম অস্তিত্ব। “পরমার্থ-তাবেন অস্তিবিসিট্টা ধম্মাখাতি আদি না অস্তিধম্মো ধম্মসঙ্গনি আদি;” অর্থাৎ ধর্মসঙ্গনি বিভঙ্গ, কথাবন্ধু, পুণ্ণগণি পঞ্ক্রুতি, ধাতুকণা বসক ও পট্টঠাম এই ছে গ্রহ সকলে পরমার্থভাবে বিশিষ্ট ধর্ম ও সকল আছে তাহার নাম অস্তিত্ব। এই গ্রহ সকলের মধ্যে ধর্মসঙ্গনি বোধ হর সর্কীপেক্ষা প্রাচীন এবং সারবান্। কথ-বস্ত অশোকের সময় ভিত্ত কর্তৃক পাটলি-পুত্রে রচিত হর।

* ধর্মশব্দের অর্থ বৌদ্ধশাস্ত্রপাঠীদের বিশেষরূপে জ্ঞদয়ঙ্গম হওয়া আবশ্যিক। ‘দহতি পবত্তেতি সম্পাপুণেতুবাদেতি তস্মা ধম্মোতি ‘বুদ্ধতি’ অর্থাৎ বাহা প্রবর্তন করার বা পাওয়ারইরা দেয় তাহা ধর্ম। অস্তিত্ব আছে বাহা স্বভাব ধারণ করে তাহা ধর্ম। পঞ্চ পদার্থকে ধর্ম বলা হর, যথা—কলনিবর্তক হেতু, অর্থ্যসার্গ, তামিতার্থ, কুশল ও অকুশল। তত্ত্বাতীত জ্ঞণ এবং নিঃসত্তা-নির্জীবতা (শূন্ততা) অর্থে ও ধর্ম-শব্দ প্রযুক্ত হর। পরিমতি বা ধর্মশাস্ত্র ও ধর্ম। স্বভাব ধারণই ধর্মের লক্ষণ। ইহাতে বোধ হর বাহ ও মানস এক তত্ত্বাতীত (নির্কীর্ণ রূপ) সমস্ত তাবপদার্থই ধর্ম। বিশেষ্য বিশেষণ ও ক্রিয়া বাচক প্রায় সমস্ত তাব পদার্থই ধর্ম। ‘তিনি’ ‘তুমি’ প্রকৃতি বে সমস্ত সর্কীর্ণ বা তৎসঙ্গ পদ স্বভাব ধারণ করে না তাহাদের অর্থ ধর্ম নহে।

অভিধর্মের চারিটি অর্থ আছে যথা
অভিধর্মার্থ-সংগ্রহে। +—

তথ ব্রহ্মাভিধর্মখা চতুর্থা পরমখতো।
চিত্তং চেতনিকং রূপং নিরূপানমিতি সর্বথা ॥
ক, চিত্তং চৈতনিক রূপং ও নিরূপাণ ইহার
অভিধর্মের অর্থ। "বৌদ্ধধর্মের অর্থ শব্দের
কানে হেতুগম্যভাব। "হেতু অমুসারেন
অভিধর্মতি" অভিধর্মতি সম্প্রাপ্তিগতি"।
(বিদ্য ১৪)। অর্থাৎ হেতুর দ্বারা যাহার
অভিধর্ম অথবা প্রাপ্তি হয় তাহাই অর্থ।
কেনে কতকগুলি হেতু হঠতে নিরূপাণ
প্রাপ্তি হয় অতএব নিরূপাণ এক অর্থ।

১. চিত্তং, চৈতনিক এবং রূপট বৌদ্ধদের
পঞ্চ স্কন্ধ। তন্মধ্যে চিত্ত-বিজ্ঞান স্কন্ধ;
চৈতনিক বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার স্কন্ধ।
এই প্রবন্ধে আমরা পঞ্চ স্কন্ধ ভাবেই বাণী
করিব। বিজ্ঞানাদি চারি স্কন্ধ ইতরেরতর
নির্মিত তজ্জন্তু প্রথমত রূপস্কন্ধ বর্ণিত
হইতেছে।

রূপস্কন্ধ।

স্কন্ধ অর্থে সমূহ, রূপসমূহের নাম রূপ
স্কন্ধ। "তথ যং কিঞ্চিৎ গীতাদিহি রূপশণ
লক্ষণং ধর্মজাতিং সর্বত্রং একতোক্তা রূপ-

+ অ = অভিধর্মার্থসংগ্রহে। নি = নিরূপ-
সংক্রমণ। ধ = ধর্মসঙ্গনি। ব = বুদ্ধবোধ।
বিভা = বিভাবিনী টীকা। এই সঙ্কেতগুলি
পাঠক স্মরণ রাখিবেন। এতমধ্যে বুদ্ধবোধ
রচিত্তি বিমুক্তিমার্গ গ্রহ হঠতে এই প্রবন্ধে
অনেক বিষয় বর্ণনায় অসুবিধিত হইয়াছে।
এই গ্রন্থ বৌদ্ধধর্মের অতি উৎকর্ষ সাহ
সংক্রমণ ইহার এক সিংহনী ভাবার ব্যাখ্যা
আছে, কিন্তু এটি ও পশ্চাত্তি কোন
ভাবার ইহা অনির্দিষ্ট হইয়াছে।

কথকোতি বেদিতব্যং" (বি ১৪)। অর্থাৎ
গীতাদিঃ দ্বারা যে ধর্মজাত লক্ষণ (পীঠন
অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিধাতক) লক্ষণক হয়,
তাহারা একত্র রূপস্কন্ধ। সাংখ্যের ইন্দ্রিয়
ও বিষয় সমস্তই বৌদ্ধধর্মের রূপ। রূপ সূত্র
দ্বিবিধ ভূতরূপ ও উপাদায়রূপ। পৃথিবীদাতু,
আপোদাতু, তেজোদাতু বায়োদাতু এই
চারি দাতু ভূতরূপ। "মহাভূতে উপাদায়
পবত্ত্বং রূপং উপাদায়রূপং"। (বিভা।
৬)। অর্থাৎ মহাভূতকে উপাদান বা গ্রহণ
বা আশ্রয় করিয়া যাওয়ার প্রবৃত্ত হয় তাহার
উপাদায়রূপ। উপাদায়রূপ বা উপাদায়রূপ
চক্ষণ সংখ্যক। অতএব সাকল্যে রূপ
অষ্টাধিকারিত প্রকার হইল। তাহার
সলক্ষণ উক্ত হইতেছে।

(১) পৃথিবীদাতু = "যং কক্খল্লহং ধরগহং
কক্খল্লহং কক্খল্লহতাবো অম্মত্তং বা বহিদ্ধা
বা উপাদিন্নং বা অমুপাদিন্নং বা" (ধঃ রূপ-
কণ্ঠে, পঞ্চকং)। অর্থাৎ যাহা কঠিন,
ধরমূর্শ, কাঠিগ্র সংহতভাব এবং যাহা আধ্যা-
য়িক (শারীর দাতু) বা বাহির ও উপাদিন্ন
হয় (কক্ষয়মুখান) বা অমুপাদিন্ন তাহা
পৃথী দাতু।

(২) আপোদাতু = আপো (তরল),
আপোগত (তারণ্য সংকীর) সিনেহো
(স্নেহ) সিনেহগতং (বন্ধনত্বং, সংখাত
অথবা সফান) এবং আধ্যাত্মিক বা বাহির
ও উপাদিন্ন বা অমুপাদিন্ন *।

বৌদ্ধমতে আপোদাতুর অষ্টাধিকারিত
উহাতে যে শৈত্য আছে তাহা একেবারে
কারণ শৈত্য বস্ত্ত এক প্রকার উক্ত।
কিন্তু তরলতা বৈধিকেন স্পষ্টব্য মতে তাহার

(৩) ভৌতজোধ্যাতু = তেজ, তেজোগত, উগ্রা, উগ্রীগত, উক, উকগত এবং আধ্যাত্মিকাদি।

(৪) বারোধ্যাতু = বায়ু, বায়ুগত (প্রাণমিতা), পশ্চিত্তত্ত্ব (বাতস্কীততা, নলাদির জায়) এবং অধ্যাত্মিকাদি। ইহারা চারি ভূতরূপ, অবশিষ্ট অষ্টাদশ উপাদারূপ, যথা—

(৫) চক্ষু = "তথ রূপভিষাতারত ভূত-পূর্ণসাদ লক্ষণং। দর্শকামনিদান কন্ম-সমুট্ঠান ভূতপ্ৰসাদ লক্ষণং বা চক্ষু" বি। ১৪। অর্থাৎ রূপভিষাতের দ্বার-স্বরূপ, বা দর্শন কামনামূলক কর্মসমুখিত যে ভূতপ্রসাদ বা ভৌতিক প্রকাশভাব তাহাই চক্ষুর লক্ষণ।

সহুত্তর নাই। বস্তুত তরলতা কাঠিঞ্জের জায় স্পর্শ করিয়া জানা যায় ॥

† প্রসাদ বা উপাদির চারি ভূতের প্রকাশভাব উক্ত হওয়ারতে চক্ষু বস্তুত অনিদর্শন (অগোচর) ও মাংস চক্ষুর অতীত। ইহা বুদ্ধবোধ বলেন। অখমালনি আদি গ্রন্থে তিনি সমস্তর চক্ষুর এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন। "নীলোৎপল সন্নিত, নীল (কৃষ্ণ) পদ্মসমাকীর্ণ, শ্বেতকৃষ্ণসঙল বিচিত্র মাংসপিণ্ড চক্ষুবস্তু বা চক্ষুর আধার। তৈলাসক্ত সপ্ত পিচু পটলের বা তুলার পাতকের জায় সপ্তরূপপটলে ইহা (চক্ষু) ব্যাপ্ত। যেমন ক্ষত্রিয়কুমারকে চারিজন ধাত্রী, ধারণ স্বাপন, মণ্ডন ও বীজন করে সেইরূপ উহাকে চারি ভূতধাতু সন্ধারণ, বন্ধন, পরিপাচন ও স্ফূরণ (চালন) করে। উহা মূল-আহাতি ও চিত্তাহারের দ্বারা উপতপ্তিত, আস্থার-ধারা পরিপালিত, বর্ণগন্ধরসাদি-পরিবৃত্তা-ধারসৈন্যপতি (সারিপুত্র) বসেই উপরিভুক্ত হইয়া এবং ক্রীড়া-সি-সমূহনং অর্থাৎ উহা ক্রম, ক্রম, ক্রীড়া

(৬) শ্রোত্র। (৭) স্রাণ। (৮) জিহ্বা।

(৯) কার = ইহারাও এইরূপ যথাক্রমে শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের অভিযাতের দ্বারভূত ভূতপ্রসাদ। অথবা শব্দাদি জ্ঞানের কামনা মূলক কর্মোখ ভূতপ্রসাদ।

চক্ষুগাদি ৫টি রূপের নাম প্রসাদরূপ। "কর্মই উহাদের বিশেষের কারণ। ভূতের বিশেষ হইতে উহাদের বিশিষ্টতা হয় না কারণ তাহা হইলে "প্রসাদ" উপর তটত না। পৌরাণেরা বলেন সমানদেরই প্রসাদ হয় বিসমানদের নয় না" (বু)।

(১০) রূপ = "চক্ষু পটিতনন লক্ষণং রূপং" (বি। ১৪)। অর্থাৎ চক্ষুর পতিষাত করা দৃশ্য রূপের লক্ষণ। উহা চক্ষু বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত এবং চতুর্মহাত্ম্যে শ্রিত।

(১১) শব্দ (১২) গন্ধ। (১৩) রস = ইহারা যথাক্রমে শ্রোত্রাদির পতিতননকারী ও শ্রোত্রি বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত।

এই চারিরূপ গোচর বা বিষয় রূপের অন্তর্গত। তদ্বতীত আণ্ডা তিন সল-ভূত ও গোচর রূপ। নীল পীত; ভেরি-শব্দ, মৃদঙ্গশব্দ; মূলগন্ধ, স্বকগন্ধ; মূলরস, স্বকরস প্রভৃতি রূপাদির বহু ভেদ আছে।

(১৪) জীজির। (১৫) পুরুবেজির = জী ও পুরুষের কার ও কার্যগত যে সমস্ত বিশেষত্ব তাহারাই জীজির ও পুরুবেজিরের লক্ষণ। জীদের সমস্ত অঙ্গপত্যঙ্গ, চালচলন, ক্রীড়াপরিচ্ছদাদির বিশেষত্বই জীজির। পুরুবেজিরও তদ্রূপ। উহার সকল শরীর ব্যাপী

কীটের শির সঙ্গী। শ্রোত্রাদির ও এইরূপে বিবরণ আছে বাহ্যভরে উক্ত হয় নাই।

এই চুটটি রূপের নাম ভাবরূপ ।

(১৬) জীবিত্ত্রয় = “মো তেঙ্গং রূপীনং
ধম্মানং আয়ুট্ঠিত্তি, যপনা, যাপনা, ঠিরিয়না,
বত্তনা, পালনা, জীবিতং জীবিত্ত্রয়ং”
(ধা। রূপকণ্ডে) । অর্থাৎ শরীর—ধর্ম
সকলের যে আয়ুষ্কৃতি, ক্রিয়া, ক্রিয়া-
নিষ্পাদন, বর্জন, বর্তন (সন্ততি), পালন
ও জীবন তাহাটী জীবিত্ত্রয়ঃ ।

‘ধাত্তী যেমন কুমার পালন করে, জল
যেমন উৎপাদকে রক্ষা করে, সেটরূপ সহজ
রূপের (শরীরের) অল্পপলনই জীবিত্ত্র-
য়ের লক্ষণ’ (বু) । ইহার নাম জীবিত-
রূপ ।

(৭) জদয়বস্ত = “মনোধাত্তু ও মনো-
বিজ্ঞান ধাত্তুর নিশ্রয় (আবাদ অথবা
organ) । জদয়ের অগ্রস্থিত লোহিতকে
অশ্রয়পূর্বক ইহা ভূতের দ্বারা সন্ধারিত,
স্থূল ও চিন্তাহারের দ্বারা উপস্তুত, আয়ুর
দ্বারা অল্পপালয়মান, মনোধাত্তু ও মনো-
বিজ্ঞান ধাত্তুর এবং তত্তৎ সহভাবী ধর্ম
সকলের ‘বস্ত’ ভাবে অবস্থান করিতেছে”
(বি। ১৪) ।

ইহার নাম জদয়রূপ । আধুনিক মতে
এই ‘বস্ত’ মন্তিকে স্থিত ।

(১৮) আকাশধাত্তু = “রূপপরিচ্ছেদ
লক্ষণা আকাশধাত্তু” (বি। ১৪) । অর্থাৎ
রূপের পরিচ্ছেদ বা পর্যায় বা অবধি প্রকাশ
লক্ষণক আকাশধাত্তু ।

(১৯) কারবিজ্ঞপ্তি । (২০) বাধি-
জ্ঞপ্তি = কার ও বাক্যের দ্বারা বিজ্ঞাপন বা
জানান। “সহজ রূপের বা শরীরের স্তম্ভন,
সন্ধারণ ও চালনপূর্বক যে আকার বিকার

তাহা কারবিজ্ঞপ্তি । চিত্ত সমুখিত বায়ু-
ধাত্তু হইতে এই সঞ্চালন সিদ্ধ হয় ।” (বু)

“বাক্যের ভেদ কারক যে চিত্তোখ্য পৃথিবী
ধাত্তুর দ্বারা উপাদায়িত্ত্ব ঘটন (কঠাদিতে
অভিঘাত) তাহা হইতে যে আকার বিকার
হয় তাহাই বাধিজ্ঞপ্তি ।” (বু)

এতদ্বস্তর অভিজ্ঞার জ্ঞাপন করে এবং
ইহাদের নাম বিজ্ঞপ্তিরূপ ।

(২১) রূপেরলঘুতা । (২২) রূপের
মুদ্রতা (অন্তরুতা বা অরোধতা) । (২৩)
রূপের কক্ষণাত্তা অর্থাৎ শরীর ক্রিয়ার অল্প-
কূল কর্মণাত্তা বা অর্হুলতা ।

এই তিন এবং বিজ্ঞপ্তিদের নাম বিকার
রূপ । ইহার রূপের এক এক প্রকার
বিকার । (মাংশপেশীর কর্মণাত্তাই উপরে
গৃহীত হইয়াছে, Steam engine আদির
কর্মণাত্তা বোধহয় বায়ুভূতের অন্তর্গত) ।

(২৪) রূপের উপচর (বর্দ্ধি বা পূর্ণতা) ।
(২৫) সন্ততি — * অর্থাৎ বর্দ্ধিত রূপের সন্তান
ভাব । (২৬) রূপের জরতা বা পরিপাক
অর্থাৎ স্বভাব ত্যাগ না করিয়া, অস্ত্র ভাব
ধারণ ; যেমন পুরাণ ধাত্ত্ব ।

(২৭) রূপের অনিত্যতা বা নাশ ।

এই চারিটির নাম লক্ষণরূপ ।

(২৮) কবলিকার আহার = ওজঃ নামক
অন্নের স্তম্ভতাগ । ওজের দ্বারা প্রাণীর
সজীব থাকে । ইহার নাম আহাররূপ ।

এই অষ্টাবিংশতি রূপকে অধ্যাত্তিক,

* কোন অপরূর্ণ উৎস জলপূর্ণ হইলে তাহা
সেই জলের উপচর পরে উপহারা বাইলেও
যেমন উৎস জলপূর্ণ থাকে তাহা সন্ততি ।
(বু)

বাহির; ওষাধিক (স্থূল), স্থূক্ষ; দুৰ্বে, সজ্জিকৈ; নিম্পন্ন, অনিম্পন্ন ইত্যাদি বর্ণে বিভক্ত করিয়া দেখান হয়, কিন্তু তাহাতে রূপের তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না।

বৌদ্ধমতে রূপ রস আদি তেজ আদি ভূতের গুণ নহে। বাহ্যারা ঐরূপ বলেন তাহাদিগকে বুদ্ধঘোষ এই উত্তর দেন—“যদি পৃথিবীর গুণ গন্ধ হয় তবে জলীর আগ্নেয় সমালোচনা অপেক্ষা পৃথিব্যাধিক কর্ণাসে অধিক গন্ধ হওয়া উচিত”। বৌদ্ধশাস্ত্রে কতকগুলিকে জ্ঞান্য (গুণ সমষ্টি) ও কতকগুলিকে গুণ বা জিরা রূপে এক জাতি সমন্বিত করা হইয়াছে। তাহাদের চারিভূত বস্তুর কঠিন, তরল, উষ্ণ ও বায়বীর অবস্থা হইলে সম্ভব হইতে পারে। তজ্জাত পৃথিবী ধাতু না বলিয়া কঠিনতা বলা উচিত। কঠিনতার অতিরিক্ত পৃথিবী ধাতু কি আছে তাহার বৌদ্ধ কি উত্তর দেন জানি না। এক তাপেরই তারতম্যানুসারে সমস্ত জ্ববা কাঠিন্যাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কঠিনধাতু বলিয়া কোন বিশেষ বস্তু নাই। সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে বৃক্ষ রূপাদির সহিত এক জাতিতে নিক্ষেপ করিয়া বৃক্ষান হইয়াছে। তাহাতে চক্ষুরাদি প্রসাদ রূপ কেবল প্রকাশশীল ভৌতিক গুণ বা (Sensory organ) হইবার সামর্থ্য মাত্র বলিয়া স্মৃতি হইতেছে। কিন্তু তাহার কার্য সুখান। কার্য আবার সুগুণ মানস ধর্ম। অতএব

মানস হেতুর দ্বারা ভূতের প্রসাদই জ্ঞানেঞ্জিয় হইল। ইহা সাংখ্যের অতিমান ও ভূতের দ্বারা নির্মিত জ্ঞানেঞ্জিয়ার প্রায় তুল্য হইল। বিশেষত বৌদ্ধের চক্ষুরাদির আনিদর্শন, সাংখ্যের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াতীত। দৃশ্য-রূপ চক্ষুর দ্বারা রূপগন করে, কিন্তু চক্ষু কিসের দ্বারা করে? ইহার দুই উত্তর হইতে পারে “আসি চক্ষুয়ান্” এই তাবের দ্বারা, অথবা এক চক্ষু গোলক দেখিরা উহার প্রসাদ ধর্ম চিন্তা করিরা। ইহার শেষ করাই নোধ হয় বৌদ্ধ সম্মত নচেৎ অন্তান্ত ধর্ম ও রূপগনের অন্তর্গত হয়।

‘মনোবিকার উৎপাদন করে’ এই হিসাবে জীজির ও পুরুষেঞ্জির রূপ হইতে পারে, চক্ষুরাদি বা জীবিত্তিজির যে জাতির ব্যক্তি, জীজির ও পুরুষেঞ্জির যে জাতির তত্ত্ব ব্যক্তি হইতে পারে না। “জননেঞ্জির” উৎপাদের সমতুল্য ব্যক্তি হইতে পারে। জননেঞ্জিরের দ্বিবিধ উপবিভাগ হইতে পারে; অথবা জীবে পুরুষব নামক রূপ শরীরের উপবিভাগ হইতে পারে। বস্তুত রূপ বিভাগ করিতে বাইরা “আমড়া, আম, পেড়ো, ববাই” এইরূপ বিভাগ করার উহা অন্ত্যাব্য।

লঘুতা ধরিলে গুরুতাও ধরা উচিত। শীতোষ্ণতাকে যে কারণে উষ্ণতা মাত্র ধরা হইয়াছে সেই কারণে একটি মাত্র ধরিলে গুরুতাব্যর্থই প্রোক্ত হয়। লঘুতা ও কর্দমতা উক্ত হইয়াছে কিন্তু অক্ষতা বা স্ক্রল কেন গণিত হয় নাই তাহা বুঝা যায় না।

আকাশ ধাতু ও কল্পিত পদার্থ। বস্তুত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের (সীত উষ্ণ)

দ্বারা ব্যাপ্ত বাস্তী ও বিস্তার করিয়াট করিতে পারিবে না। পার্থিব সমস্ত দ্রব্যের বাসধার মর্মাদিকে বায়ু, আলোকআদি থাকে; চক্রে চতুর্দিকে আলোক বা নীলবর্ণ থাকে। পর্ণাশুভ্র আকাশ কোথাও নাই। কেবল শব্দে সমাহিত হইলে যে শব্দময় বিস্তারের জ্ঞান হয় তাহাই সাংখ্যের আকাশভূত। এ আকাশের সহিত বৌদ্ধদের সম্পর্ক নাই।

বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক ও বাহির সাংখ্যের গ্রহণ (বাহ্য করণ) ও গ্রাহের সম্পষ্ট বিষ। সাংখ্যীয় বিভাগানুসারে প্রকাশ নীলভাব, ক্রিয়ানীলভাব ও স্থিতিনীলভাব ভেদে গ্রহণ ও গ্রাহ জীবন, পঞ্চজ্ঞানেক্রিয় প্রকাশ প্রদান, পঞ্চকর্মেক্রিয় ক্রিয়াপ্রদান, ও পঞ্চগাণ স্থিতিপ্রদান। আর গ্রাহ পদার্থেবও প্রকাশভাব, ক্রিয়া এবং জাড্যভাব আছে। গ্রাহ আধ্যাত্মিক চর্চয়া উক্ত গুণানুসারে জ্ঞানশক্তির, কর্মশক্তির ও প্রাণশক্তির অধিষ্ঠান হয় এবং বাহ্যরূপ গ্রাহে শব্দাদি প্রকাশভাব, ক্রিয়াভাব ও ক্রাতিগুণাদি ক্রিয়ানোন্ত জাড্যভাব পাওয়া যায়। সাংখ্যের জ্ঞানেক্রিয় বৌদ্ধদের প্রসাদ ভূতের সহিত তুল্য, কর্মেক্রিয় বৌদ্ধদের (আধ্যাত্মিক) কর্মশক্তি ও বিজ্ঞপ্তিবয়ের দ্বারা সম্পষ্টভাবে সূচিত। সাংখ্যের প্রাণ স্থূলত বৌদ্ধের জীবিতিক্রিয়। লঘুতাদি-ধর্ম তাত্ত্বিক বিভাগ নহে, উহারা আপেক্ষিক গুণ; সাংখ্যে তদ্রূপই উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধের লক্ষ্যরূপ সাংখ্যের (লক্ষ্যাদি) পরিণামের অন্তর্গত। ইহারিও তত্ত্ব বিশেষ-ধর্ম ভেদকরণ নহে সাধারণ ধর্ম সাত্র। বস্তুত জ্ঞানেক্রিয়, কর্মেক্রিয় ও প্রাণ এবং

বিষয়, ভূত ও তন্মাত্র (বৌদ্ধের আকাশাত্ম যতন ইহার কতক অঙ্গরূপ) নামক সাংখ্যের। যে বিভাগ করেন তাহা অনবদ্য ন্যায় ও সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাহার ন্যায় সরল সম্পষ্ট এবং পরমার্থ বোধের অঙ্গরূপ বিভাগ আর নাই।

বেদনা স্বরূপ।

“যং কিঞ্চিৎ বেদয়িত লক্ষণং সর্বস্তং একতোক্তব্যং বেদনা স্বরূপে বেদিতবেবা” (বি)। অর্থাৎ যাহা কিছু বেদয়িত লক্ষণ তাহা একম বেদনা স্বরূপ। বেদয়িত অর্থে সুখাদি বেদনা অর্থাৎ অনুভব। বেদনা ক্রান্তিবশে তিন প্রকার কুণল বেদনা, অকুণল বেদনা ও অব্যাকৃত বেদনা। কুণল ধর্মের (চিত্তের) সম্প্রযুক্ত (যে ধর্মেরা একত্র উৎপন্ন ও লয় হয়, এবং যাহারা একালখন ও এক বস্তুক বা একাধার তাহারাই সম্প্রযুক্ত ধর্ম) বেদনা কুণল, অকুণল— সম্প্রযুক্ত বেদনা অকুণল এবং অব্যাকৃত (স্থূলত যে যে অবস্থায় সুখ ও দুঃখ রূপ বিরুদ্ধ কোটির স্পষ্ট বোধ থাকে না তাহারি অব্যাকৃত ধর্ম) সম্প্রযুক্ত অব্যাকৃত বেদনা।

খতাব ভেদে বেদনা পঞ্চ প্রকার—সুখ, দুঃখ, মৌসনস্য, দৌর্শ্বনস্য, ও উপেক্ষা। ইষ্ট স্পৃশ্যের অনুভব সুখ। অনিষ্ট স্পৃশ্যের অনুভব দুঃখ। অতএব সুখ ও দুঃখ কায়িক। সেইরূপ ইষ্ট ও অনিষ্ট মনো বিষয়ের অনুভব মৌসনস্য ও দৌর্শ্বনস্য। মাধ্যস্থতা-বেদনা উপেক্ষা। মূলত এই পঞ্চ প্রকার বেদনাই বেদনা স্বরূপ।

সংজ্ঞা স্বরূপ।

“যাহা কিছু গুণান লক্ষণক তাহা

সব একজ সংজ্ঞা করুক (বি। ১৪)। এই সজ্ঞান 'সবক্' মিলিল পত্র গ্রাহে এইরূপ আছে—রাজা মিলিল বলিতেছেন "প্রভো নাগসেন! সংজ্ঞার কিরূপ লক্ষণা? নাগসেন বলিলেন—মহারাজ, সজ্ঞাননা লক্ষণা সংজ্ঞা। সজ্ঞানিনা কি? যেমন নীল সজ্ঞানন করে, পীত সজ্ঞানন করে, লোহিত, খেত, মঞ্জিষ্ঠা সজ্ঞানন করে। রাজা—উপমা করুন। নাগসেন—মহারাজ যেমন রাজার কোষাধাক ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রাজভোগ্যা সকল নীল, পীত, লোহিত, খেত ও মঞ্জিষ্ঠা বর্ণের দেখিয়া সজ্ঞানন করে তহাও সেইরূপ।

ইহা হইতে সংজ্ঞার তবু কিছুট স্থির হয় না। স্বর পিটক শব্দে সংজ্ঞা শব্দ অনেক অর্থে প্রযুক্ত দেখা যায়। অভিধানের সম্+জ্ঞা শব্দ নিম্নরূপ নানা পদ দিয়া সংজ্ঞার পর্যায় করা হইয়াছে। তবে বুদ্ধ যোগ বিজ্ঞানমার্গে সংজ্ঞা-প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞানের ভেদ মুগক এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন তাহা হইতে তৎকালীন সংজ্ঞা পদার্থ একরূপ নিশ্চয় হয়। সেই দৃষ্টান্ত এই—যেমন হৈরথ্যিকের কলকে স্থাপিত এক রাশি কার্বাপণ দেখিয়া একজন অজাতবুদ্ধি বালাক কেবল তাহার চিত্র, বিচিত্র, দীর্ঘ, চতুস্তম্ভ, পরিমণ্ডল ভাব মাত্র জানে। আর একজন সাধারণ মনুষ্য উহা দেখিয়া সেই চিত্র বিচিত্রতাদিও জানে এবং উহা যে মাতৃষের উপভোগ হেতু, রত্ন-ভূত তাহাও জানে। কিন্তু একজন হৈরথ্যিক (স্বর্গাদি মুক্তা ব্যবহারী) উহা দেখিয়া চিত্রবিচিত্রতাদি সমস্ত জানে, অধিকন্তু উহার কোনটা ছেক (খাঁটি বা মল) কোনটা কুট বা কুটিল

কোনটা অর্ধমার তাহা এবং ঐ কার্বাপণ মতাদি অন্যান্য বিষয়ও জানিতে পারে। সংজ্ঞা বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞাও সেইরূপ। সংজ্ঞা অজাতবুদ্ধি বালাকের জানার মত, বিজ্ঞান সাধারণ পুরুষের জানার মত ও প্রজ্ঞা হৈরথ্যিকের জানার মত। নীলাদি তাবে বিষয়ের আকার জানা সংজ্ঞা আর তদুর্দ্ধে লক্ষণ ও পটিনেধ বা তদ্বজ্ঞান পূর্বক জ্ঞান বিজ্ঞান।

"অখগানিনি তে" বুদ্ধ যোগ বলিয়াছেন সংজ্ঞা 'উপস্থিত বিষয়ক,' এবং যেমন সুত্রধর বিশেষ বিশেষ চিত্রের দ্বারা কাঁঠ অবগত হয় তেমনই ভেদক চিত্রের দ্বারা জানাই সংজ্ঞা।

অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে প্রাথমিক নীল পীতাদি জ্ঞান হয়, তাহা এক-ইন্দ্রিয় মাত্র-গৃহীত, তাহা অন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা অস্বীকৃত নহে, তাহাই সংজ্ঞা হইল।

সংজ্ঞাও কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত এই তিন ভাগে বিভক্ত। বস্তুত কিন্তু রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, ও স্পর্শ এই পঞ্চ ভাগে বিভক্তনীর। "নহিতং বিজ্ঞেয়ং অখিৎ সংজ্ঞার বিপ্লবুজং" (বু)। অর্থাৎ সংজ্ঞার অসহজ্যবী বিজ্ঞান হইতে পারে না।

এই সংজ্ঞাকে সাংখ্যেরা 'আলোচন' জ্ঞান বলেন। ইংরাজীতে সংজ্ঞাকে sense

এইখানে প্রসঙ্গ হইতে পারে আকাশ বিজ্ঞান কোন সংজ্ঞা সম্প্রযুক্ত? শব্দরূপাদি সৰ্ব চতুর্ভূতান্ত্রিত। চতুর্ভূতান্ত্রিত আকাশশব্দে কিসের দ্বারা সংজ্ঞিত হয়? কলত তদ্বিষয়ে বিকল্প বা অনবস্থিত বলনা হয় মাত্র।

perception না বলিয়া sense percept
বলা উচিত। কারণ নীল সংজ্ঞা যদি নীল
perception হয়, নীল বিজ্ঞান তাহা হইলে
কি হইবে। স্বত্র পিটকের “অভিসংজ্ঞা
নিরোধ” “সংজ্ঞা বেদনিত নিরোধ” ইত্যাদি
সংজ্ঞার অর্থ অন্যরূপ।

(ক্রমশঃ)

হরিহরানন্দ আরণ্য
কাপিগাশ্রম।

বেদ ও বেদান্তের জন্ম

(প্রথম প্রস্তাব)

বেদ অনাদি ও অপৌরুষের। বাহার
আদি নাই তাহাই অনাদি; ইহাই অনাদি
শব্দের অর্থ। পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিতে
পারেন যদি বেদ অনাদি হয় তাহাই হইলে
ইহার জন্ম কিরূপে সম্ভব? প্রবন্ধের শীর্ষ
দেশে আমি কেন “বেদের জন্ম” এইরূপ
শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, এবং ইহার প্রকৃত
ব্যাখ্যা কি, যথাস্থানে অতঃপর তাহা উল্লেখ
করিব। “অপৌরুষের” শব্দের অর্থে ইহাই
বুঝায় যে, বাহা পুরুষ বা মানব কর্তৃক
প্রস্তুত হয় নাই। বাহা মানবের কল্পনা
প্রস্তুত নহে অর্থাৎ বাহা পরমেশ্বর প্রণীত
তাহাই অপৌরুষের। বেদ এই জন্ত অনাদি
ও অপৌরুষের। বেদান্তের কথা পরে
কহিব।

বাহার জন্মের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন
তাহাদিগকে ইহাও বিশ্বাস করিতে হইবে

যে, জৈশ্বর অনাদি ও অনন্ত। পরমেশ্বরের
শক্তি ও গুণ তাঁহার সহিত নিত্য বর্তমান।
জৈশ্বর বা পরমেশ্বর “স্বয়ম্ভূ” স্মৃতরাং তাঁহার
আদি, অন্ত, জন্ম বা ক্ষয় নাই। জৈশ্বের
সর্বশক্তিমানত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বজ্ঞ বিজ্ঞমানত্ব,
দয়া, ভায়, নিরপেক্ষতা, এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান
তাঁহাতে অনাদিভাবে নিত্য বর্তমান।
বেদশাস্ত্র, ভগবানের জ্ঞানের বিকাশ।
তিনি পৃথিবীর কল্যাণ, কামনায়, লোক
শিক্ষার নিমিত্ত, যে জ্ঞানমহিমা প্রকটিত
করিয়া ছিলেন তাহারই সমষ্টি মাত্র বেদ
শাস্ত্র। স্মৃতরাং বেদে বাহা আছে তাহা
“মানবকল্পিত” বলিয়া উল্লেখ করিতে কেমনে
সাহসী হইতে পার? রাজদুত রাজাকর্তৃক
প্রেরিত হইয়া যে কথাগুলি ব্যক্ত করেন
তাহা রাজদুতের মুখ হইতে নিঃসৃত হইলেও
তাহার বাক্য বলিয়া পরিগণিত হয় না,
উহা রাজার বাক্য; দুত কেবল বাহক বা
কণক মাত্র। ধর্মশ্রুতিধিগণ যে সকল
নীতি অভিব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা
জগতে চিরকাল ব্রহ্মবাক্য বলিয়া সম্মানিত
হইয়া আসিয়াছে, এই জন্ত মুসা, জৈশ্ব,
মহম্মদ প্রভৃতির বাক্যকে তাঁহাদের অনু-
বর্তীগণ জৈশ্বরবাক্য ভিন্ন অন্য আখ্যায়
আখ্যাত করেন নাই। এই জন্ত কোরাণ,
বাইবেল, হিন্দুশাস্ত্র, জেন্দাবস্ত্র প্রভৃতি ধর্ম
শাস্ত্র অর্থাৎ “ভগবান দত্ত বাক্য সংগ্রহ”
বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে।

পরমেশ্বরকে অনাদি বলিয়া বিশ্বাস করিলে
তাঁহার জ্ঞানকেও অনাদি বলিয়া বিশ্বাস
করিতে হইবে; বাক্যগুলি জ্ঞানের প্রকাশ
জনক নহে মাত্র। ব্রহ্মবাক্যও স্মৃতরাং

অনাদি। এই জন্ত শাস্ত্রে শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এই জন্ত বাইবেলে যিশুখৃষ্টকে শব্দ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং এই জন্তই অপরাপর শাস্ত্রেও শব্দের এত সাহায্য দেখা যায়। তাহাই হইলেই বেদ অনাদি বলিয়া প্রমাণিত হইল, কারণ ইহা ব্রহ্মবাক্য। তাঁহারই প্রণিহিত, অনুমোদিত, অনুগৃহীত ও নির্দীচিত ভক্তাদিক ভক্ত ধর্মিগণ নিম্পাশ শরীরে ও নিঃশব্দ মনে, ঐ বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বেদশাস্ত্র প্রকটিত করিয়াছেন, স্মৃতরাং বেদ কেবল পবিত্র বা পুরাতন নহে, ইহা অনাদি ও অপৌরুষেয়।

পৃথিবীর পুরাতন ও সভ্য জাতি সমূহের ধর্মশাস্ত্রাবলী বেক্রমে সংগৃহীত হইরাছিল তাহা বুঝিতে পারিলে বেদসংগ্রহ সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করা যায়। প্রাণসে কোরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। এই গ্রন্থ মুসলমানদিগের নিকট ঈশ্বর বাক্য অর্থাৎ কালামুল্লা বলিয়া সম্মানিত। ইহার "কাতেছা" নামী প্রথম সূরা (অধ্যায়) হইতে আরম্ভ করিয়া একশত চতুর্দশ অধ্যায় (অর্থাৎ শেষ অধ্যায়) পর্যন্ত, মুসলমানদিগের মতে, ব্রহ্ম বাক্য। ঐতিহ্যেরা ইহা মহম্মদের নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হইয়া কঠিন করিয়াছিলেন, তদন্তর মুগচাশ্ব, শুভ্র প্রস্তরে, ধোয়াগাছের পাতার অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। মহম্মদের মৃত্যুর পরে জরু, এবনেকাব, ইবন হেজাজ প্রভৃতি অনেক বিদ্বান ব্যক্তি কর্তৃক কোরাণ পুস্তকাকারে লিখিত হয়। উপরিউক্ত একশত চৌদ্দ অধ্যায়ের মধ্যে সপ্তাশীতি অধ্যায়

মকানগরীতে এবং অবশিষ্ট মদিনা নগরীতে, পরমেশ্বর তাঁহার ভক্ত মহম্মদকে অভিব্যক্ত করেন এবং মহম্মদের নিকট হইতে আরবের বিদ্বানগণ তাহা প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এই জন্ত বলা বাইতে পারে, মুসলমানদিগের মতে কোরাণ ব্রহ্মবাক্য হইলেও ইহার জন্মস্থান বা উৎপত্তিস্থান মক্কা ও মদিনা। প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্বে কোরাণ সংগৃহীত হইয়াছিল। যিশু খৃষ্টের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্য ও ভক্তগণ কর্তৃক তাঁহার বাক্যাবলী, উপদেশ নিচয় ও ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সংগৃহীত ও বর্ণিত হইয়া যে গ্রন্থ প্রকটিত হইয়াছে তাহাই বাইবেল পুস্তকের দ্বিতীয় অংশ, ইহার নাম নিউটেস্টামেন্ট। মাথু, মার্ক, জন, লুক, পল, পিটার, জেমস ও জুদ (রিহদা) এই কয়েক জনে নিউটেস্টামেন্টের সংগ্রাহক, তন্মধ্যে মাথুর গ্রন্থ সর্কোপেকা পুরাতন। এই গ্রন্থ খৃষ্টের মৃত্যুর ৬১ বৎসর পরে প্রকটিত হইয়াছিল। যিশু কোথায় কি কথা কহিয়াছিলেন এবং কোথায় কি করিয়া ছিলেন, বাইবেলে তাহা লিখিত আছে। খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, যিশু বাহা কহিয়া বা করিয়া ছিলেন তাহা ঈশ্বরপ্রণোদিত। তিনি ভগবৎ শক্তিতে সামর্থাবাণ হইয়া এই সকল অলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিতেন এবং নীতি উপদেশ দিতেন। খৃষ্টের জন্ম প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে বাইবেলের প্রথমমাংশ "পুরাতন টেস্টামেন্ট" নামে প্রসিদ্ধ। খৃষ্টের প্রদত্ত বিদ্যদিগের মধ্যে এই গ্রন্থ পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব সাময়িক। পুরাতন টেস্টামেন্ট যিহুদিদিগের ধর্মশাস্ত্র,

তাহারা নূতন টেম্‌টামেন্ট কিম্বা যিশুখৃষ্টকে
নামে না, কিন্তু খৃষ্টানেরা নূতন ও পুরাতন
পুস্তককে মানিয়া থাকে। পুরাতন
বাইবেল পাঠ করিলে, রিহনীদিগের কোন্
সহাজুতবকে ভগবান কোন্ স্থানে কিরূপ
কথা কহিয়া ছিলেন তাহা অনেকটা বুঝা
যায়। পুরাতন বাইবেলের অনুবাদন বা
উৎপত্তি স্থান পালেস্টাইন (অথবা আসিয়া
মাইনর) দেশ। কিন্তু বেদ কত পাতীন ?
খ্রীভগবান কর্তৃক কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে
কোন্ স্থানের নিকটে লেখাদেশ দ্বারা
বেদোক্তি করিয়া ছিলেন ? এই প্রশ্ন
কয়েকটি যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তেমনি
অত্যন্ত কঠিনোত্তর সাধ্য। ইহার মিসাগুণা
হইলেই বেদের অনুবাদন অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান
এবং উৎপত্তির কাল কতকটা বুঝা বাইতে
পারে। এখানে ইহাও কহিয়া রাখা আব-
শ্যক, বেদোপেক্ষা পুরাতন শাস্ত্র পুরাতন
গ্রন্থ এবং বৃহত্তর গ্রন্থ অর্থে আর নাই।

পূর্ণাপাদ

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র কর্তা সহোদরগণ সমস্ত
অঙ্গতকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া
গিরাছেন, ইহাদের এক একটি অংশের নাম
“বর্ষ।” সমগ্রা পৃথিবীর চারি ভাগ বা বর্ষের
নাম এই—কিম্পুরুষ বর্ষ, হিরণ্য বর্ষ,
নাতিবর্ষ এবং ভারতবর্ষ। ইহার মধ্যে
প্রথমোক্ত দুটি বর্ষ বেদের জন্মের অর্থাৎ
উৎপত্তির অর্থাৎ সংগ্রহের স্থান। খ্রীভগবান
এই দুই স্থানে ঋষিগণকে বেদোক্তি করেন।
শান্তি বর্ষে বেদ সংগৃহীত হয় এবং ভারতবর্ষে
তাহা প্রকাশিত (Published) হইয়াছিল।
এখন তিন বর্ষ, বেদশাস্ত্র সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠভাবে

উপকারি করিয়াছে, সুতরাং উহা বেদের
প্রসূতি ভূমি। ভারতবর্ষ, বেদোক্তির জন্ম
দেশ। প্রথম তিন বর্ষে বেদোক্তির
উৎপত্তি হয় নাই এবং হইবার আবশ্যকও
ছিলনা। কেন ছিলনা তাহা পরে বুঝাইব।
এক্ষণে প্রশ্ন এট,

কিম্পুরুষ বর্ষ, হিরণ্যবর্ষ ও নাতিবর্ষ,
কোথায় ? উহা কি কেবল কল্পনা না
বাস্তবিক দর্শনীয় দেশ ? আসি দেখাইব,
ইহা কল্পনা নহে, ঐ তিন বর্ষ এখনও
বর্তমান। ভারতবর্ষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলো-
চনা করার আবশ্যক নাই, কারণ আমরা
এই পত্র, পাতীন ও অপ্রশস্ত দেশের
অধিবাসী; এই পূণ্যসম দেশ অসংখ্য প্রকার
সহাধিপদ সহ করিয়াও এখনও বর্তমান
রহিয়াছে। অপর তিনটি “বর্ষ” বা দেশ
অনেকের নিকট অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত
হইয়া রহিয়াছে। কাল প্রভাবে ভারতবর্ষের
সহিত অপর তিন বর্ষের সম্পর্ক রহিত হইয়া
গিরাছে। যে কথা পরে লিখিব। কাল
প্রভাবে অপর তিন বর্ষের লোকেরা ভারতের
সহিত সম্পূর্ণরূপে সতন্ত্র হইয়া বাইবার পরে,
শাস্ত্রকর্তাগণ ভারতবর্ষকেই বরাধাসে
একমাত্র পূর্ণাপাদ বলিয়া পরিগণিত করিয়া
লইয়াছেন। বাস্তবিক ভারতবর্ষ কেবল
অতীতপুরাতন ও অতীত পবিত্র দেশ নহে,
পরন্তু সর্ববিধ শক্তি, গুণ, জ্ঞান, ধর্ম ও
পুণ্যে ভারতবর্ষ অতিশয় পরাক্রান্ত মহাদেশ।
এই পূণ্যসম মহাদেশের বর্ণনার বিষ্ণু পুরাণ
লিখিয়াছেন—

“উত্তরং বৎ সমুদ্রস্ত হিমালয়েশ্চৈব দক্ষিণক্কা
বর্ষং বৃহত্তরতঃ সান্ধ ভারতী বজ্রপত্নিঃ।”

ইতিঃ স্বর্গভূত মোক্ষশ্চ মধ্যাশ্চাত্তশ্চ গম্যতে ।
নী শ্বশনাজ্ঞ মর্ত্যানাং কৰ্মভূমৌ বিদীরতে ॥

চত্বারি ভারতবর্ষে যুগানাজ মতামুনে ।
কৃতং জ্ঞেতা ধাপরঞ্চ কলিশ্চানাজ্ঞ ন কৃচৎ ॥
তপস্তপ্যাস্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাজ ব'জনঃ ।
দানানি চাজ দীরস্তে পরলোকার্থমাদরাৎ ॥
পুরুষৈর্বেগুপুরুষো জম্ব্বীণে সন্দেহাতে ।
যৈঃগেব'জ্ঞসময়ো নিফুরণা বীণেশু চালাযা ॥
অজ্ঞাপি ভারতং শ্রেইঃ কষ্ম্বীণে মতামুনে ।
যতো হি কৰ্ম'ভূয়েযা ততেঃইত্তা ভোগভূময়ঃ ॥
অজ্ঞ জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি গন্তম ।
কদাচিত্তন্তে জন্মমামুমাং পুণ্যসঞ্চয়ং ॥
গারস্তি দেবাঃ কিল গীতকানি, ধন্যাস্ত হে
ভার'ভূমিতাগে ।
স্বর্গাপবর্গল্পদমার্গভূতে, ভবস্তিভূমঃপুরুষাঃ
মুরযাং ॥

কর্মাণ্যসঙ্কলিততৎফলানি, সংশ্রুত বিক্ষৌ
পরমস্বায়ামপে ।
অবাণ্যাং কৰ্ম'মদীনস্তে, তন্মিল্লং য়ে
ভ্রমলাঃ প্রযাস্তি ॥
জানীম. নৈনতং কৃ বয়ং বিলীনে, স্বর্গপ্রদে
কৰ্ম'নি দেহবকম্ ।

প্রল্যাস ধন্থাঃ প্লুচে মনুস্যঃ যে ভারতে
নেত্রৈরবিপ্রতীনাঃ ॥”

মহানমুজের উত্তরে ও হিমালয়ের দক্ষিণে
দে বর্ষ অবস্থিতি করিতেছে, যেখানে ভারত-
সম্ভক্তিগণ বাস করিয়া থাকেন, তাহারই
নাম ভারতবর্ষ । এই ভারতবর্ষ হইতেই
মাদকপণ স্বর্গ, মোক্ষ, মধ্য ও অজ্ঞ অর্থাৎ
জন্মসংলোক ও মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হয় ।

ভারতবর্ষ বাতীত আর কোন স্থানেই মর্ত্য
মানব কৰ্ম'ভূমির সাভাষা জানেন না ও বুঝ
না । সুতা, মেতা, ধাপর ও কলি এই
যুগচক্রের কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ভিত্তি
ক'জিত হইয়াছে । অপর বর্গে যুগভেদের
পর্যোকন নাই । মর্ত্যালোকের মধ্যে এই
স্থানে বসিয়াই তপস্বীকনেনা তপস্তা করিতে
পারেন, এট স্থানে বসিয়াই সাজ্জিকেরা সজ্ঞ
আহুতি দিয়া থাকেন, এবং পর্যালোকের
আদরার্থে যে কিছু দানকার্য্য, ভাণ্ডা এই
স্থানে সম্পাদিত হইয়া থাকে । নিফুরে
যজ্ঞপুরুষ জানিরা, এট কষ্ম্বাণের লোকেরাই
যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন । অজ্ঞ
বীণের মানতা রূপ নহে । কষ্ম্বীণ মধ্য
আবার ভারতবর্ষই পারমৌকিক কার্য্যভূতান
পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ । পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র
ভাবতভূমিই কৰ্ম'ভূমি । অপর সমস্ত দেশই
ভোগভূমির জন্ম অবস্থিত রহিয়াছে । জাগী-
গণ সহস্র সহস্র জন্মের পর, কদা'চৎ পুণ্য-
বলে এট পুণ্যভূমি ভারতে মানবজন্ম লাভ
করিয়া থাকে । স্বর্গরাসী দেবভাবা বলিয়া
থাকেন, “ভারতবাসীগণ দেবগণ হইতেও
শ্রেষ্ঠ ও ধন্য । কেননা তাঁহাদের জন্মভূমি
স্বর্গ ও মোক্ষ, উভয় প্রাপ্তির হেত্বরূপ ।
ভারতের নিশ্চল ও নিশ্চাপ লোকেরা তাঁহা-
দের সমুদায় কৰ্ম'ফল পরমায়্যা স্বরূপ অনন্ত
বিম্বুতে সমর্পণ করিয়া, তাঁহাতেই বিলীম
হইয়া থাকেন” । স্বর্গপ্রদ পুণ্যকৰ্ম' কব
হইলে, আবার আমরা সমুদায় ইঞ্জিরবৃত্ত
হইয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিব, এইরূপ
কামনা দেবভারা সর্বদাই করিয়া থাকেন ।
পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতভূমিই

কর্ণকুমি ও এখানকার অধিবাসী আৰ্য-জাতির দেহট কৰ্মদেহ, এ কথাটা বিকৃত শিক্ষা গ্রাপ্ত, পাশ্চাত্যভাবে বিভোর, সুগ-দর্শী সাম্যবাদীগণের অন্তঃস্থ মনঃপুত্র হইবে না। কিন্তু বাহারা মনোবী ও সুদর্শী, বাহারা বানহারিক জগতের সর্সজ ছোট বড়, ভাল মন্দ, উচ্চ নীচ, ইত্যাকার বৈবম্য বা বৈচিত্র্যভাবট দেখিতে পান, তাঁহাদের নিকট হইতে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া পানীয়-মান হইবে। বস্তুতঃ ভারত ও ভারতের অধিবাসী আৰ্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব মনকে এই মাজ বলিলেই যথেষ্ট হইবে দে, জল, লায়ু জুমির গুণ এবং বড় ক্ষতুর নিয়মিত পরি-বর্তন, ইত্যাদি-বে চতুর্দশ প্রকার ভৌতিক কারণে মানব-প্রকৃতির পূর্ণতা সংগাধিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল ভারতেই সম্ভবে। ফলে এই ভারতবর্ষট বে, সমগ্র পৃথিবীর অমুকৃতি স্বরূপ এবং পৃথিবীর অন্তঃস্থ বাহা কিছু আছে তাহা ভারতেও আছে, এ কথা সম্ভাভাভিমानी পাশ্চাত্য জাতির মধ্যেও অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। আবার "বাহা মাই ভারতে, তাহা নাই মরতে" এইরূপ প্রবাদবচনও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্মানন্দ মহাভারতী।

ব্রাহ্মণ-মহাত্ম।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

পাঠকেরা স্ববিগণ লিখিয়াছেন, "হলা-হলেশ্বর বিশ্ব-বিদ্য মধ্যেই গণ্য নয়, অমির

তেজ তিজমধ্যেই গণ্য নয়, কিন্তু ব্রহ্মব হরণ করিয়া এবং ব্রাহ্মণকে নির্ধাতন করিয়া যে মহাপাতকী হয়, তাহাতে মহা-পাপরূপ যে নিবধর (সর্প) দর্শন করে, সেই প্রাণধাতী ও কুলধাতী বিবেক আর প্রতিকার নাই; অজ্ঞায় অপমানগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্রাহ্মণের মনোমধ্যে যে ছঃখাধি জন্মে, সেই অধিতে ব্রহ্মস্বাপহারীর ও ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যাচার কারীর ইহকাল, পরকাল, জন্মজন্মান্তর এবং সমগ্রকালকে জ্বালাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি কুন্ডীপাক নরকে যষ্টি সহস্র বর্ষ পর্যন্ত বিষ্ঠাতে ক্রমি হয়।" ফলতঃ ব্রাহ্মণবর্গ সর্বদা ও সর্বধা শ্রদ্ধার পাত্র। ভগবান শ্রীমদ্ভগবতের নিকট ব্রাহ্মণগণ সর্সদাই প্রথম্য ছিলেন। বেদে ব্রাহ্মণের নাম আৰ্য্য, শুক, শ্রেষ্ঠ, জানী, গুণী, তেজ ও আয়্য। উপনিষদে ব্রাহ্মণের নাম ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণের কৰ্ম ও স্বভাব উল্লেখ করিয়া শ্রীমৎ ভগবৎগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

শমোদমস্তপঃ শৌচঃ ক্ষান্তিরার্জ ব মেব চ।

জ্ঞানবিজ্ঞানমান্ত্রিক্যং ব্রহ্মকৰ্ম স্বভাবজং ॥

মহর্ষি বাস্কীক লিখিয়াছেন, ব্রহ্মভেদে বগীমান এবং জ্ঞান ও গুণে পরিপূর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণকে দর্শন করিলেই দূর হইতে চিনিয়া লওয়া যায়। গৌতমসংহিতার ঋষি, ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

দান্তঃ দান্তঃ জিতক্রোধঃ জিতান্ধানঃ
জিতেন্দ্রিয়ঃ।

তমেব ব্রাহ্মণং মজে শেবা পূজা ইতি স্বভাঃ ॥
হিন্দুশাস্ত্র কৰ্তাদিগের উক্তি পরিত্যগ করিয়া যদি অহিন্দুস উক্তি মিকে দৃষ্টি পায় করা

যায় তাহাহইলেও বুঝিতে পারি, হিন্দুধর্ম নিরোধীপন ও মুক্তকণ্ঠে ব্রাহ্মণের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। বহুশাস্ত্র ও বহুভাষাভিচ্ছ লগ্নধিখ্যাত পণ্ডিত (আচার্য্য) প্রফেসর মোক্ষমূলর (ম্যাক্সমুলর) এবং প্রফেসর কাওয়েল, হট্টার, উইলসন, মুর, রোয়েনবর, গোগ্‌জ্‌টুকর প্রভৃতি ইউরোপীয় বিদ্বানগণ লিখিয়াছেন—“ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা অসাধারণ প্রতিভাশালী। তাঁহাদের বুদ্ধি, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা, সিদ্ধান্ত ও ব্রহ্মজ্ঞান অপরিমেয় ও অপমোয়।” বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মবিনাশ করিবার জন্যই নিজের মত প্রচার করিয়া এক নূতন ধর্ম (বৌদ্ধধর্ম) স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বেদবিরোধী, ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও শাস্ত্রাবিরোধী ছিলেন। হিন্দুর হোম, যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপাদি নাশকরাই তাঁহার ধর্মের মতছিল। তিনি ও তাঁহার ধর্ম হিন্দুবিষেদী; কিন্তু তথাপি তিনি ব্রাহ্মণের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন “ব্রাহ্মণগণ পুজার পাত্র। সকলেরই উচিত তাঁহাদিগকে মান্য করা। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কখন পাপ করিতে পারেননা বা ব্রাহ্মণ কখন দোষী, অজিতেন্দ্রিয় ও পাপকাষ্যে লিপ্ত হইতে পারেন না।” তিনি আরও বলিয়াছেন—“প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণ ত্যাগী ছিলেন। তাঁহারা পকেজির গ্রাহ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণ হইয়া আত্মতর্পণে মনোনিবেশ করিতেন। তাঁহারা পো হিরণ্য ধাত্মাদির প্রতি প্রলুব্ধ হইতেন না। তাঁহাদের ধ্যানই একমাত্র ধন ছিল, সেই ধনই তাঁহারা সদয়ে রক্ষা করিতেন।

ব্রাহ্মণগণ কাজে কাজেই অজের ছিলেন, ধর্মই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেন। তাঁহারা সম্পদে অপ্রতিহত গতি ছিলেন। জীবনের অষ্টচক্রারিংশবর্ষ তাঁহারা ব্রহ্মচর্যাশ্রম করিয়া থাকিতেন। সেই সময়ে তাঁহারা চরিত্র রক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান লাভে যত্ন করিতেন। ব্রাহ্মণ তৎপরে পরবার পত্নী গ্রহণ করিতেন, কদাচ শুদ্ধধারা কস্ত্রাজয় করিয়া পলাতক করিতেন না। তাঁহারা কদাচ গোপতা করিতেন না; অসদ্ব্যবহার সমুদয় ভোগাদিই ভগবৎ প্রীত্যর্থে নিবেদন করিতেন। তাঁহারা প্রশান্ত, দীর্ঘকায়, সুন্দর ও প্রথিতযশা ছিলেন।” এই সকল বাক্যাদি, বুদ্ধ-দেবের ব্রাহ্মণের প্রতি কিরূপ প্রদী ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার “ধর্মপনের” স্বাক্ষর শ্লোক নিচেরে ব্রাহ্মণলক্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

“দেবতা গন্ধর্ক আর মানব নিকরে
ব্রাহ্মণের গতি বল বুঝবে কি করে ?
চিরদিন রিপুজয়ী ব্রাহ্মণ নিকর
পবিত্র অর্হৎ পদে স্থিত মিরস্তর।
নাহিক সমতা যার তিনিই ব্রাহ্মণ
ভৌতিক পদার্থ নাহি ভাধেন আপন।
সকলে আসক্তি নাই সাধতে যতন
পার্থিব কামেতে মুক্ত সেজন ব্রাহ্মণ।
আপনারে চির দিন সুদীন ভাবিয়া
কাটান জীবন যিনি পরার্থ লইয়া।
মহুশ্রুত, মনুষ, বীরত্ব, সুবিশ্বাস,
বিশ্বাসী সুপ্রবুদ্ধ আর মতিমান,
পূর্কায় আপনার বিদিত বেদন,
জ্ঞানী, পাপপুণ্যহীন সে জন ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ-জ্ঞান-সদা পরিপূর্ণ জ্ঞান ।

সূর্য্যাদির অন্তর্দর্শী সেই মতিমান ॥

পূ. পু. উক্ত চর্চায়, ক'জির বৈশ্বাণ্ড পুত্রের জন্মবার আগে ব্রাহ্মণের জন্ম চাইছিল বলিয়া ব্রাহ্মণগণ সর্ব্ব জোষ্ঠ এবং সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মার মুখারবিন্দ হইতে ব্রাহ্মণ নিঃসৃত হইরাছেন বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । বন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় শাস্ত্রের অতমত এই, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে নিঃসৃত হইরাছেন । "ভগবানের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্ম" এই শাস্ত্রীয় উক্তির যে কোন প্রকারেই অর্থ করা বাটক, অথচ সংযুক্তি সঙ্গত বলিরাই বোধ হয় । পরমেশ্বর অনাদি অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ দিব্যমান এবং সঙ্গ-শক্তিমান । তিনি সগুণ এবং নিগুণ, তিনি নিরাকারও বটেই আকার সাকারও বটেই; ইচ্ছা বা প্রয়োজন হইলে তিনি সগুণ অর্থাৎ সাকার হইয়ন । যঁহার শক্তির শেষ নাট, তিনি সাকার হইয়া স্রীমুখ হইতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিরাছেন, ইহাতে অসম্ভবত্ব কিছুই দেখি না । তিনি কি সগুণ নহেন ? ভগবান কি সর্ব্বশক্তিমান নহেন ? তিনি অনন্তসামর্থ্য বলে আপনায় মুখ হইতে প্রাণী সৃষ্টি করিতে পারেন ইহা অসম্ভব কথা কিছুই নয়; তিনি ইচ্ছা করিলে এক পর-মাণুর টুকটি অংশের একাংশ হইতে অনন্ত কোটি বিশ্বসংসার সৃজন করিতে পাবেন, সুতরাং ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণের জন্মের কথাই চমৎকৃত হইবার কথা কিছুই দেখি না । যদি সঙ্গতভাবে ইহার অর্থ করা যায়, তাহাই হইবে যে অর্থাৎ সংযুক্তি সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে । দেহের সত্যিক

হইতে জন্ম পর্য্যন্ত জ্ঞানেঞ্জির, তথাভীত যাহা কিছু তাহা অশুদ্ধির । তাহাই হইলেই, বুঝা গেল, ব্রাহ্মণের জন্ম জ্ঞানেঞ্জিরের গীমার মধ্যে । বস্তুতঃ জ্ঞানই ব্রাহ্মণের সর্ব্বমুখ । ব্রাহ্মণের অস্ত্র নাম জ্ঞান এবং জ্ঞানের অপর নাম ব্রাহ্মণ । এক্ষণে আর একদিক দিয়া, অর্থাৎ তৃতীয় ভাবে, কথাটির বিচার করা বাটক । হৃদয়ে, মনে ও মস্তিষ্কে যে কিছু চিন্তা ও ভাবের উদয় হয় তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায়; বাক্যের শক্তি কঠে, কঠের শক্তি জিহ্বায় এবং জিহ্বার স্থান মুখে । মুখ না থাকিলে বাক্য কথা যায় না । ব্রাহ্মণের কার্য্য বাক্য; যজন, যাজন, অধ্যায়ণ, অধ্যাপন, উপদেশ দান, শিক্ষা, দীক্ষা প্রভৃতি বাক্য-দ্বারা সম্পন্ন হয়; বাক্যের স্থান মুখ; সুতরাং ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ নিঃসৃত হইরাছেন ইহা রূপক স্থলেও বিচার করিলে শাস্ত্রের উক্তি অব্যুক্তি সঙ্গত হয় না । সুতরাং যে কোন ভাবেই বিবেচনা বা বিচার কর, সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ নিঃসৃত হইরাছেন, এই শাস্ত্রীয় বচন সম্পূর্ণ সত্য ও সম্পূর্ণ সঙ্গত ।

আমার বোধ হয়, বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রতি বর্ষে হ্রাস হইয়া আসিতেছে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত হীন হইয়া আসিরাছে । ব্রাহ্মণ জাতিমধ্যে আর পূর্ব্বকালের গুণ গরিমা নাই । যে সকল বরদীর্ণ ও প্রাশংসনীয় গুণ বস্তুতঃ ক'জির, বৈশ্বাণ্ড ও পুত্রবৃন্দ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিত এবং ব্রাহ্মণের পদধূলি ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবার সঙ্গ

লালায়িত থাকিত, যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণে
 • পৃথিবীর সত্য ও শিক্ষিত নরবর্গ তাৎতনবীর
 ব্রাহ্মণের বশকীর্তন করিতেন, বর্তমান কালে
 সেই সকল গুণসমাতায়া দেখাইতে পারেন,
 এমন ব্রাহ্মণের সংখ্যা কম জন? প্রকৃত
 কথা এই, উপবীতের আর মূল্য নাই;
 কেবল 'ব্রাহ্মণ' নামের আর গৌরব নাই;
 ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতি যথো ব্রাহ্মণা-
 পেক্ষা এক্ষণে শতগুণে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তি জন
 গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কুব্রাহ্মণদিগের
 বৃথা অহঙ্কার আর সাজে না এবং অতঃপরও
 সাজিবে না। ব্রাহ্মণেরা যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ
 দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়,
 বৈশ্য বা শূদ্রের নিকট হইতে তাঁহারা প্রণাম
 বা সন্মান পাইবার আশা করিতে পারেন
 না। আমি পরসারাদি পরমেশ্বরের নিকট
 প্রার্থনা করি, ব্রাহ্মণের আবার স্মৃতি হউক,
 ব্রাহ্মণগণ আবার প্রকৃত ব্রাহ্মণ হউন।
 দেহের শীর্ষস্থান সন্তিক; সন্তিক বিকৃত
 হইলে সমুদ্র পাগল হয়; হিন্দু সমাজের
 শীর্ষস্থান ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণ বিকৃত হইয়াছেন
 বলিয়াই হিন্দুসমাজও পাগলের স্তর
 বিশৃঙ্খল ও বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

প্রত্যেক প্রকৃত ব্রাহ্মণ শিক্ষক ও উপ-
 দেশক, এই জন্ত ব্রাহ্মণের অস্ত্র নাম
 আচার্য্য। এই আচার্য্য দিগকে তত্ত্বি, প্রজ্ঞা
 ও সেবা করিলে তাঁহারা রূপায়িত হইয়া
 জানোপদেশ দিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীভগবান
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমৎ অর্জুনকে ভগবৎগীতার
 চতুর্থ অধ্যায়ের ৩৪ শ্লোকে কহিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রাপিতেন
 পরিশ্রমেন সেবয়া ॥

উপদেশ্যন্তি ভেজানং
 জানিনস্তদর্শিনঃ ॥

অধিকারী পদবীতে আরোহণ করিবার
 পূর্বে শিষ্যকে আশ্রয়বস্ত্রে যে সমস্ত সৎগুণ
 অর্জন করিবার কথা ব্রাহ্মণশাস্ত্রোক্তে কথিত
 হইয়াছে, তন্ত্র ও প্রথমতঃ সেই গুলিকে লক্ষ্য
 করিয়া দীক্ষার পর ইষ্টমন্ত্র চৈতন্তের যে
 প্রেরাস—প্রকারান্তরে তাহাই অধিকারি
 মার্গের সাধন। কিরূপ শিষ্য দীক্ষার
 অধিকারী? ইহার উত্তরে গৌতমীয় তন্ত্র ও
 শারদাতিলক বলিতেছেন—

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্ধপরায়ণঃ ।

অধীতবেদকুশলঃ পিতৃ-মাতৃ-হিতোত্তমঃ ॥

• ধর্মবিদ্যুৎ ধর্মকর্ত্তাচ গুরুশ্রবণে রতঃ ।

সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো দৃঢ়দেহো দৃঢ়াশয়ঃ ।

হিতৈষী প্রাণিনাং নিত্যং পরলোকার্ধ-
 কর্ম্মকৃত্বং ।

অনিত্যকর্ম্মণ্যঙ্গী নিত্যানুষ্ঠানতৎপরঃ ॥

জিতেন্দ্রিয়ো জিতালস্তো জিতমেহে-
 বিষৎসরঃ ।

এবমিধো ভবেচ্ছিষ্যবিতরো গুরুহৃৎসদঃ ॥

গৌতমীয় তন্ত্র—৫ম অধ্যায় ।

শিষ্যঃ কুলীনঃ শুদ্ধাত্মা পুরুষার্ধপরায়ণঃ ।

অধিতবেদকুশলো দূরদুরমনোত্তমঃ ॥

হিতৈষী প্রাণিণাং নিত্যমাতিকত্যা-
 দাতিকঃ ।

স্বধর্ম্ম-নিরতো তক্ত্যা পিতৃ-মাতৃ-হিতোত্তমঃ ॥

বাধ্যনোকার বহুতি গুরুশ্রবণে রতঃ ।

• এতাদৃশ গুণোপেতঃ পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি নাশয়ঃ ॥

শারদাতিলক—২য় পটল ।

ইহার মর্ম্মার্থ এই :—বিনি সৎসংশ্রয় জাত,
 শুদ্ধাত্মা (নিত্য নিরর্থনবাস্তবঃ—বেদান্তদার)

ও পুরুষার্থপরায়ণ (যুক্তাৎসাহসমবিত—
গীতা) ; যিনি নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া
তাঁহাতে কুশলতা লাভ করিয়াছেন ও
যিনি সর্বদা শাস্ত্রার্থতত্ত্ব অবগত আছেন
(বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোহধি-
গতাধিল বেদার্থঃ—বেদান্তসার) ; যাহার
চিত্ত হইতে কাম দূরীভূত হইরাছে, যিনি
ধর্মবিদ ও ধর্মসুষ্ঠানকারী ও স্বধর্মনিরত,
যিনি দৃঢ়দেহ (শীতোষ্ণাদি ধন্যসচিকু)
যিনি দৃঢ়াশর (জয়জানার্ধনিশ্চর—গীতা)
যিনি ভক্তিপূর্বক পিতা মাতার হিতে রত ;
যিনি সর্বদাই সর্বপ্রাণীর ভিত্তিধী (অশেষ্টা
সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এতৎ—গীতা)
যিনি আন্তিক ও যিনি নাস্তিকের সঙ্গ ভ্যাগ
করিয়াছেন ; (অর্থাৎ যিনি ঐকবেদনাক্যে
শ্রদ্ধাবান) যিনি অনিত্য কর্মভাগ করিয়া-
ছেন ও নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন
(কাম্যানিবিদ্ধ বর্জন পুরঃসরঃ ইত্যাদি—
বেদান্তসার) যিনি পরলোকের জন্য কর্ম
করেন (অর্থাৎ যিনি এখনও সম্পূর্ণরূপে
কর্মভ্যাগ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু যে
কর্ম করেন, তাহা পরলোকের জন্য এবং
বাহার কর্ম ও দৃষ্টি স্নুলাভীত-গতি) যিনি
ইন্দ্রিয় বিজয় করিয়াছেন (অর্থাৎ বাহার
শর ও দম অর্জিত হইরাছে) ; যিনি
আলভকে জয় করিয়াছেন ও মোহকে
অতিক্রম করিয়াছেন (অর্থাৎ বাহার বিবেক
উৎপন্ন হইরাছে) ; বাহার কোন প্রকার
মাতংসর্ঘ্য নাই (অর্থাৎ যিনি অনসুর) ও
যিনি সর্বদাই শরীরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা,
মনের দ্বারা ও বিত্তের দ্বারা গুরুর শুভ্রদ্বার
রত, তিনি (এতৎগুলি গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই)

শিষ্য। বাহার এই সমস্ত গুণ নাই, সে
ব্যক্তি শিষ্য হইবার যোগ্য নহেন ;—হইলেও
কেবল গুরুর ছঃবদারক হইরা থাকেন।

এইরূপ গুণবিশিষ্ট শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ
পূর্বক তদ্রোক্ত শ্রাণাগীতে যে সাধনা আরম্ভ
করেন, প্রকৃত পক্ষে তাহা অধিকারি মার্গের
(Probationary Path) সাধনা ; অর্থাৎ
সেই সাধনাদ্বারা সাধন চতুষ্টয় অর্জিত
ও অধিকারিতার পূর্ণতা সমাধান হইবে।
যথা তন্ত্রমারে সিদ্ধিলক্ষণ প্রকরণে—
বৈরাগ্যঞ্চ মুমুকুৎস্যং ত্যাগিতা সর্ববশুভা।
অষ্টাঙ্গ যোগাত্যাসনঃ ভোগেচ্ছাপরিবর্জনঃ ॥
সর্বভূতেষুহৃৎকম্পা সর্বজ্ঞাদিগুণোদয়ঃ।
ইত্যাদি গুণসম্পত্তি মধ্য সিদ্ধেস্ত লক্ষণসু।

অর্থাৎ বৈরাগ্য, মুমুকুতা, ত্যাগিতা,
সর্ববশুভা, অষ্টাঙ্গ যোগাত্যাস, ভোগেচ্ছা
পরিবর্জন, সর্বভূতে অহৃৎকম্পা, সর্বজ্ঞাদি
গুণের উদয় ইত্যাদি গুণসম্পদ সিদ্ধির
মধ্যাবস্থা লক্ষণ। সিদ্ধির মধ্যাবস্থা অর্থাৎ
এই অবস্থার ভিতর দিয়া সিদ্ধির চরমাবস্থা
পরমাত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ হয়।

তত্যান্বেদা শ্রীমতী এনি বৈশান্ত প্রীত
পূর্বোক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে,
অধিকারি-মার্গে (Probationary Path)
সাধনার সময় সাধকের চিত্তশুদ্ধির ও চিত্তের
একাগ্রতা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সাধকের
কোষসমূহ অর্জিত হয় ; সাধকও স্বপ্রাবস্থার
অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ করেন ও স্থূল
শরীরের নিদ্রাবস্থার স্থলশরীরে অন্ত লোকে
বিচরণপূর্বক গুরুর নিদেশ মতে লোক-
হিতকর বিবিধ কার্যে নিযুক্ত থাকেন।
এ বিষয়ে পৌত্তদীয় তন্ত্রে দেখিতে পাই—

ততঃ প্রাতঃ সমুখায় কৃতনিত্যক্রিয়ো গুরুঃ ।
 কৃতকৃত্যোহপি শিষ্যস্ত নিবীদেদু গুরুসমিধৌ ॥
 কথং প্রোক্তো ব্রহ্মাস্তং শুভঃ বা বধি বা শুভঃ ।
 স্মরণলীতিনারীতিঃ সহ সংতোজনং মিথঃ ॥
 গিরিশৃঙ্গারোহণঞ্চ হস্তাশ্বরথারোহণং ।
 আরোহণং সৌধগেহে দেবোৎসব নিরীক্ষণম্ ॥
 মঙ্গলঞ্চ স্ববাসাংশ দর্শনং স্পর্শনং তথা ।
 মন্ত্র সিদ্ধস্ত লিঙ্গানি শ্লোকানি তব সূত্রত ॥
 অনাকুলানি কথং শৃণু নিন্দ্যানি সর্কতঃ ।
 কৃষ্ণবর্ণভট্টেঃ স্বপ্নে শহারট্টললেপনং ॥
 বিশাণাঃ রোষবাদেচ পরজ্ঞীণাঃ নিবেশনং ।
 সিদ্ধি বিয়ানি চোক্তানি অস্তানি নিন্দিতানি
 চ ॥

অনন্তর গুরু প্রাতঃকালে গাজ্রোখান
 করিয়া নিত্যক্রিয়াদি সম্পাদন করিবেন ।
 শিষ্যও প্রাতঃকৃত্যাদি সমাশন পূর্বক গুরুর
 নিকট উপবেশন করিবেন ও তাঁহার নিকট
 রাজির শুভাশুভ ব্রহ্মাস্ত বর্ণন করিবেন ।
 অভিশয় মঙ্গল চিহ্ন-খারিজী নারীগণের সহিত
 একান্তে সংতোজন, গিরিশৃঙ্গারোহণ, হস্তী,
 অশ্ব ও রণে আরোহণ, সৌধগেহে আরোহণ,
 দেবভাঙ্গিগের উৎসব দর্শন, নিজের বামাংশ
 দর্শন ও স্পর্শন মন্ত্রসিদ্ধি হটবার পক্ষে
 শুভ চিহ্ন । কৃষ্ণবর্ণ ভট্ট কর্তৃক প্রেহার,
 ব্রাহ্মণগণের প্রতি সজ্ঞোষ বাক্য প্রয়োগ,
 পরজ্ঞী নিবেশন ইত্যাদি মন্ত্রসিদ্ধির বিষয়কর
 অশুভ চিহ্ন । এই সকল চিহ্ন শিষ্যের
 অব্যক্ত অথচ সহস্র প্রজ্ঞা Subliminal
 selfএর অবস্থা ও গতি ইচ্ছিতে নির্দেশ
 করে । এতদ্বারা তাহার আভ্যন্তরীণ
 অবস্থা হিরীকৃত করিতে পারা যায় ।

সাধনা করিতে করিতে নিত্যবস্ত্র লাভের

অন্ত যখন ব্যাকুলতা হয়, তখন গুরুর করুণা
 হয় । গুরুর করুণা না হইলে অধিকারিতার
 পূর্ণতা হয় না ও তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয় না ।

যাংর গুরুকারণ্যং তাবৎ তত্ত্বকথা কৃতঃ ?
 কুগার্ঘব ।

কিন্তু এ গুরু কে ? রাজিশেষে নিজাতদ
 হইনামাজ্রই যে গুরুদেবের ধ্যান করা তন্ত্র-
 শাস্ত্রের আদেশ, “ধ্যায়ৎ শিরসি গুরুাজে
 দ্বিনেত্রং দ্বিত্বং গুরুং” ইত্যাদি মন্ত্রে বাঁহার
 ধ্যান করিতে হয়, সেই নরাকৃতি পরব্রহ্ম,
 সেই মানব ও ভগবানের সন্ধিস্থল ও সম্বন্ধ-
 স্থাপক, সেই পরম কীর্ত্তনিক পুরুষ বাঁহার
 করুণা অক্ষুণ্ণ জগৎকে প্রাবিত করিতেছে
 বলিয়া তন্ত্রে বাঁহাকে সর্কদাই সূপ্রমন্ন স্মেরা-
 ন্নন ও সাধকের অতীষ্টদায়ক বলিয়া বর্ণনা
 করিতেছেন, সেই পরম পুরুষই সেই গুরু ।

গুরুর করুণা লাভের দ্বারা অধিকারিতার
 পূর্ণতা সাধন হইলে, অধিকারীর যে অবস্থা
 হয়, গাঙ্কর্ক তন্ত্রে তাহা সংক্ষেপে বর্ণন
 করিয়াছেন ।

আতিকোহণ শুচির্দাস্তো দ্বৈতহীনো জিত-
 ত্তিরঃ ।

ব্রহ্মিষ্ঠো ব্রহ্মবাদী চ ব্রহ্মী ব্রহ্মপরায়ণঃ ॥

সর্কহংসাবিনিমুক্তঃ সর্কপ্রাণিহিতেরতঃ ।

সোহস্মিন্ শাস্ত্রেহধিকারী জ্ঞাৎ তদন্তো ব্রহ-
 সাধকঃ ॥

। যিনি আন্তিক অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে, গুরুতে
 ও পরতত্ত্বে বাঁহার শ্রদ্ধা অচলা, যিনি শুচি
 অর্থাৎ যিনি সর্কদা বাহ ও আভ্যন্তর সর্ক-
 প্রকার শৌচসম্পন্ন, এবং বাঁহার উপাধি
 সকল অগঠিত হওয়ার নির্মল এবং সম্বন্ধ
 প্রবল, যিনি দান্ত অর্থাৎ দমণ্ডলুক, বাঁহার

উপাধি সকল অন্তর্গত প্রজ্ঞার বশে নীত, যিনি ঐশ্বর্যহীন অর্থাৎ “বাসুদেবঃ সর্বমিতি” এই জ্ঞান বাঁহার হইয়াছে, যিনি জিতেন্দ্রিয় অর্থাৎ শমাদি গুণস্বাক্ষর, যিনি ব্রহ্মিষ্ঠ অর্থাৎ যিনি বহুপরিমাণে অর্থাৎ সর্বকণ ব্রহ্মভেদেই অবস্থান করিতেছেন, যিনি ব্রহ্মবাদী অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের কথা ভিন্ন যিনি অস্ত্র কথা বলেন না, যিনি ব্রহ্মী অর্থাৎ বাঁহার সর্বব ধনই ব্রহ্ম, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মই বাঁহার পরমগতি এতরূপ সর্বতোভাবে ব্রহ্মনিষ্ঠ, যিনি হিংসা, বিনিমুক্ত ও সর্ব প্রাণি হিতে রত, তিনিই এই তত্ত্বশাস্ত্রের অধিকারী; অস্ত্র যে সমস্ত সাধক তাঁতারা স্রমসাধক। উপরে অধিকারিতার পূর্বানুষ্ঠা, অধিকারিতার সাধনানুষ্ঠা ও অধিকারিতার পরিপাক অবস্থাত্তরে সাধকের যে যে গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, পাঠক দেখিবেন তদন্থো সর্বপ্রাণিহিতৈষণা একটি অপরিহার্য গুণ বটে। তাত্ত্বিক সাধক জানেন যে পরিমাণে তিনি বিশ্বহিতরত সাধন করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে সেই বিশ্বাত্মা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন; যথা মহানির্কাণ্ডত্রে পরমশুক্র শ্রীসদাশিব কহিতেন :—

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশেষঃ পরমেশ্বরি ।
শ্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বঃ তদাশ্রয়ম্ ॥

হে দেবি, হে পরমেশ্বরি, বিশ্বহিত সাধন করিতে পারিলে বিখের আত্মা বিখেশ্বর শ্রীত হইয়ন, কেন না বিশ্ব তাঁহাতেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

তাত্ত্বিক সাধক জানেন সেই পরম দেবতা, জীবের মঙ্গল সাধন অস্ত্র বিশ্বময় মহামঙ্গল-

ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া বসিয়া আছেন, যে সেই বিশ্বমঙ্গল প্রভে যোগ দান করিতে পারিবে, সেট পশু, সেট কৃতকৃত্য। তাই ব্রহ্মের শাসন, সর্বপ্রাণিহিতে রত হও; নতুনা অধিকারিতের ষাণোষাটিক হইবে না।

তাই প্রিজ্ঞাসা করি, যে শাস্ত্রের অধিকারী হইতে হইলে, সর্বপ্রাণিহিতেরত ও ব্রহ্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হয় সে শাস্ত্র ব্রহ্মবিজ্ঞা নহে ত কোন শাস্ত্র ব্রহ্মবিজ্ঞা? এই ব্রহ্মবিজ্ঞাই ব্রাহ্মণের ধর্ম ও ব্রাহ্মণের সাহায্য।

কিন্তু ব্রাহ্মণা ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ-সাহায্য দিনে দিনে যে লোপ পাইতেছে, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণেরা নিজের দোষেই নিজের সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। এখনও সময় আছে, এখনও তাঁতারা সাবধান হইলে তাঁহাদের গৌরব ও সৌরভ রক্ষা হইতে পারে। রঘুবংশ কাব্যের চতুর্দশ সর্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

উত্তিষ্ঠ বৎসে নমু সাহুজো সৌ ।
বৃন্তেন তর্জী শুচিনা তটৈব ॥

অর্থাৎ বান্দুক মুনি সীতাকে কহিতেন “হে বৎসে! উঠ; তোমারই বিমল চরিত্রগুণে তোমার স্বামী তাঁতার জাতার সহিত বিপদ-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আমিও ব্রাহ্মণদিগকে সাহায্যন করিয়া কহিতেছি “হে ব্রাহ্মণগণ! তোমারা পাপসাগর হইতে সমুদান কর, তজের জ্ঞান জীবন বাপন কর, এবং এক সময়ে তোমাদের পূর্ব পুরুষদিগের যে দেবদুর্ভট চরিত্রে

সমগ্র ভারতবর্ষ, সমগ্র জগৎ আলোকিত
হইয়াছিল, সেই চরিত্র আবার দেখাও-
সেই মন্ত্র, সেই শৌর্য্য, নীর্গা, ধর্ম্মবল ও
দেবোপম সত্য আবার দেখাও, আবার
সহৎ হইবার চেষ্টা কর।”

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভাবতী।

তত্ত্বচিন্তা।

(জীব ভাগ)

(পূর্ব্বাহ্নবৃত্তি)

২৬। অভ্যাস।—

অনন্যরত যুক্ত হইতে হইতে Magna-
tised হওয়া প্রযুক্ত যোগীতে ঐশ্বর্য্য
(শক্তি, চৈতন্য ও আনন্দ ভাব) আসে।
এই শব্দের নাম বিভূক্তি।

২৭। যোগীরা চতুর্বিধ।—

(১) চৈতন্যরূপকে ধ্যান করিয়া
চৈতন্য লাভ করেন।

(২) শক্তিরূপকে ধ্যান করিয়া
শক্তি লাভ করেন।

(৩) আনন্দরূপকে ধ্যান করিয়া
আনন্দ (প্রকাশভাব) লাভ করেন।

(৪) স্বকণ ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া শক্তি-
চৈতন্য-আনন্দ লাভ করেন।

১র দৃষ্টান্ত। বশিষ্ঠ।

২র ,, বিখ্যামিত্র।

৩র ,, নারদ।

৪র ,, অনকা।

২৮। অথবা প্রযোগে বিভূক্তি হ্রাস পায়।
বিখ্যামিত্রাদির গভন ইহার দৃষ্টান্ত। এইরূপ
বাহ্যতে বিভূক্তি প্রয়োগ না করিতে হইলে,
অনেক ঋষি এই ভাবে চক্রিয়া থাকেন।

২৯। ভক্তি—জ্ঞান।—ভক্তিমাগী বশিরা
তিনি জ্ঞানালোচনা করিবেন না, এমন কথা
নহে। জ্ঞানমাগী বশিরা তিনি ভক্তদিগকে
“অজ্ঞান” মনে করিবেন অথবা ভক্তদিগের
আরাধাদিগকে অবজ্ঞা করিবেন, এমন
কথাও নহে। ভক্তিমাগী হইয়া জ্ঞানালোচনা
হেতু ভগবদীদিগের শরণাগত হইবেন।
আবার, জ্ঞানমাগী স্বর্গের দেবতাদিগের
যথার্থ সম্মান করিয়া থাকেন। দেবতারের
উপস্থিত হইয়া ভক্তদিগের জ্ঞান জ্ঞানমাগীও
দেবতাকে গণ্যম করেন। নিজের
কুশলার্থে না করুন, লোকশিক্ষা হেতু
এবং দেবের সম্মান রক্ষা হেতু করিয়া
থাকেন।

৩০। জ্বরুরা বলেন, ভক্তিমাগী হইয়া
জ্ঞানালোচনা করা শ্রেয়। ভক্তিতে আরাধ্য
দেবতার যত নিকটবর্তী হইতে পারিবে,
জ্ঞানসংযুক্ত ভক্তিতে তদপেক্ষা অধিক
নিকটবর্তী হওয়া যায়। মনে কর, কোন
হস্তের উপাত্ত দেবতা “কালী”। তিনি
কালী অর্থ অথবা কালীমূর্ত্তির অর্থ কিছু
জানেন না। কেবল অঙ্কিত বা রচিত
প্রতিমা পূজা করিয়া এবং মনে মনে জপ
করিয়া, তিনি বিপদে রক্ষা করিবেন, তিনি
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দিবেন—ভাবিয়া
আসিতেছেন। বস্তুনি তিনি জ্ঞানালোচনার
কালী প্রতিমার অর্থ বুঝিতে পারেন, তখন
তিনি জানিবেন যে, অজ্ঞানাবস্থার বাহ্যকে

পূজা করিতে ছিলেন, তিনি শুদ্ধ তাঁহার "কালী"নন, কিন্তু ব্রহ্মের একটি গুণ।

৩১। তপস্বী।—কি জ্ঞানমার্গী, কি জ্ঞানমার্গী উভয়ই তপস্বী। প্রতি কর্ণের পূর্বে কর্মী তপস্বী। সঙ্কল্প ও তপস্বী, অমর্ত্যন ও তপস্বী। তবে ভক্তের তপস্বীর পার্থিব সুখ ভাগ করিতে হয় না, জ্ঞান-মার্গীর তপস্বীর পার্থিব সুখ আকাজকত হয় না, উপভোগও হয় না। উভয়ের তপস্বীর এই টুকু বিভিন্নতা। জ্ঞানমার্গীর দণ্ডী, ব্রহ্মচরী, ময়ামী, উদাসী ইত্যাদি।

৩২। আরাধার রূপ।—ব্রহ্মের রূপ নাট, ঈশ্বর, ভগবান, হরির রূপ আছে। ভক্তের ইচ্ছামুসারে ব্রহ্ম আরাধা রূপ ধরেন। ভক্ত যে রূপ কল্পনা করিয়া সাধনা করেন, আরাধা সেই রূপ ধরিয়া দেখা দেন।

আরাধা দর্শনে ভক্ত-কল্পনা হইতে কি ব্রহ্মের কি দেবতার আভাস ও প্রতিমা প্রকাশ পাউয়াছে। যাহার যে ভাব (তপস্বী কালে প্রকৃতি), তিনি সেই ভাব-রূপী আরাধা প্রতিমা কল্পনার দেখিতে পান। সেই কল্পনা-উদ্ভূত প্রতিমা হইতে আঁহিত, ক্রমে গঠিত, প্রতিমার প্রকাশ হইয়াছে।

কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রত্যেকই অপর হইতে বিভিন্ন, পৃথক্, ভিন্ন গুণ ও প্রকৃতিধারি। কিন্তু কালীতে দুর্গা-ভাব নাট, অথবা একে অস্ত্র ভাব নাট, তাহার প্রমাণ কোথা? পবন কালী-দুর্গা-জগদ্ধাত্রী মহাশক্তি রূপ হইয়া পরম বৈষ্ণবী। রাজ-সিক পূজা উপলক্ষে ছাগ মহিষাদি বলিদান

গ্রহণ শেষেও উঁহার বৈষ্ণবী বলিয়া উক্ত। এক ভক্ত বাহ্যকে কালী রূপে দেখিতেছেন, অপর ভক্ত তাঁহাকেই শিব রূপে দেখিতেছেন। তাঁহার তাৎপর্য—বস্তু একই। যাহার যে রূপ দৃষ্টি, ক্রটি ও তপস্বী, তিনি সেইরূপ দেখিতেছেন।

মনে কর, একজন ভক্ত কোমল প্রকৃতি, অথচ তীক্ষ্ণ নহে, পরের কথার থাকে না, বাড়াট সহ্য করিতে পারে না, সন্দেহবাহিত দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার আকাঙ্ক্ষার তপস্বী করে। সে ভক্ত ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিতে পার না। তাহার কল্পনার আরাধার শক্তি থাকিবে, শক্তি ভাব থাকিবে, সন্ত-বদন থাকিবে, তিনি কোমল প্রকৃতি হইবেন, অথচ সর্প দুর্গতি হইতে রক্ষা করিবেন। উক্ত গুণগুলি কল্পনার যে ভক্ত বাহ্য দর্শন করিবেন, তাহা হইতেই কি দুর্গা প্রতিমা রচিত নহে? কোমল প্রকৃতি হেতু—স্বীকৃতি, দশ দিক্ প্রতিপালন-শক্তিসম্পন্ন। বলিয়া দশভূজা, কম হস্তে অস্ত্র, কম হস্তে শাসন ও পালন, এক হস্তে অস্ত্র দান। দুর্গা প্রতিমা হস্ত বদনা—শাস্ত্র ভাব প্রদর্শিকা। তাহার পর দুর্গতি (মোহ) নাশিনী বলিয়া মোহরূপ কৃষ্ণবর্ণ গণ্ডজাত মহিষাসুররূপী দুর্গতিকে পশুরাজ সিংহবাহিনী হইয়া নাশ করিয়া ভক্ত কামনা পূর্ণ করিতেছেন। ভক্ত কল্পনার যে ত্রিক দুর্গাপ্রতিমাই দেখিরা-ছিলেন, তাহা বলা যায় না, কেন না কল্পনা হইতে বর্ণনা, বর্ণনা হইতে চিত্রাঙ্কন, এবং চিত্র হইতে মূল গঠনে একটু ক্রটিও হইতে পারে, একটু অলঙ্কারবৃদ্ধিও হইতে পারে।

৩৩। এইরূপে দেবতা রূপ কল্পনা হইতে

প্রতিমা রচনা হটরাছে সম্ভবতঃ কোন ভক্ত ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বরের নামে সাধনা করেন নাই, নচেৎ উঁহাদেরই প্রতিমা প্রকাশ পাইত। নরত ব্রহ্ম ভগবান ও ঈশ্বরের রূপ নাই, বলিয়া উঁহাদের ভক্তও নাই। বাঁহার রূপ নাই তাঁহার ভক্ত কে কি প্রকারে হইবে? কেন না যে সৰ্বক বশতঃ ভক্ত, সে সৰ্বক নিরাকার ও নিগুণের সহিত সম্ভব হয় না।

৩৪। তাই বলিয়া ব্রহ্ম ভগবান বা ঈশ্বরের ভক্ত নাই, একথাও নহে। উঁহাদের নাম জপিয়া, উঁহাদিগকে স্মরণ করা, উঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উঁহাদের অমুগত থাকা, কথিতে বিলক্ষণ প্রচলিত রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য—সত্য ধারণা অভাবে ব্রহ্মকে দেবতা বলিয়া আর দেবতাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছে। সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় “যে কালী সেই শিব, সেই কৃষ্ণ, সেই ভগবান” ইত্যাদি। বক্তা যদি সত্যবাদী হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এতগুলি নামকরণে তাঁহার প্রয়োজন কি? তিনি একজনের উপাসক হটরা অপরকে অবজ্ঞা করুন, তাহা বলি না, তবে কতকগুলিকে আরাধার সমতুল ভাবিলে ভগ্নতা জনিত “একাগ্রতা” তাঁহার লাভ হইবে না, কোনটাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন না, সিদ্ধ হইতে পারিবেন না। বস্তু একমাত্র। তিন তিন নাম তিন তিন গুণ বাচক। যিনি গুণাতীত, তাঁহাতে গুণা-রূপ করাও সত্যজ্ঞানবর্জিতে সম্ভব হইয়াছে।

৩৫। সিদ্ধি লাভের জন্ত “একাগ্রতা”

অভ্যাস প্রয়োজন। অনন্তমন হটরা এক বিষয় ধরিয়া থাকিতে থাকিতে “একাগ্রতা” অভ্যাস হয়। অভ্যাস কালে বিনয় বাঘাত ঘটনার সম্ভাবনা। অপর বিষয় সঞ্চীর বৃত্তি সমুদায় স্থির থাকে না, তাহাদিগের উদয়ে চিত্ত স্থির থাকে না, তাহাতে মন কর্মী সর্দঙ্গাট সন্তুঙ্গ, সর্দঙ্গাট চক্ৰঙ্গ, সর্দঙ্গাট পিঙ্গাঙ্গরসিঙ্গারী। কতকগুলি বাঘাতের উল্লেখ করিতেছি।

(১) সিদ্ধি লাভ সম্বন্ধে সংশয়।

(২) নিস্বাঙ্করে আঁগীততঃ সুখাসক্তি।

(৩) অগমতা।

(৪) পরাভুখতা।

৩৬। দৃঢ় সঙ্গ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাসে, সংশয় উদয় হইতে না দেওয়া কর্তব্য, সংশয় উদয় হইলে, নির্ভয়ে উঁহাকে অগ্রাহ্য করিতে হয়। সুখের বাগনা নিঃস্ববেও পূর্ণকৃত কর্ম হেতু সুখদ বিষয় মনমধ্যে উদয় হইলে, উঁহাতে অমুরাগ দেখাটতে নাই। “প্রত্যাহার” দ্বারা উঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। বিরোধী প্রবৃত্তি উদয়ে, অটল সংকল্প ধরিয়া একটু স্থির থাকিতে হয়। তাহার পর পুনরায় পূর্ণ ব্রতে প্রতী হইতে হয়। অগমতা হেতু সকল কর্মের পূর্কীভূরণ হ্রাস পায়, পরে পরাভুখতা আসিয়া পড়ে। এইরূপে সকল বাঘাত এড়াইয়া যিনি একাগ্রচিত্ত হইতে পারেন, ত্ত্বিই প্রকৃত একাগ্রচিত্ত হইবেন।

৩৭। লক্ষ্য।—

কি একাগ্রচিত্ততা অভ্যাসে, কি ঈশ্বর-স্মরণে, কি আশ্রয় তপস্বীর, এমন কি, চিন্তার, “লক্ষ্য” স্থির করা বিধি। লক্ষ্য স্থির না

করিলে মন স্থির হয় না; মন স্থির না হইলে উপরোক্ত কোন কার্যই হয় না। লক্ষ্য স্থির করিতে কল্পিত বিন্দু ধরা সুবিধা জন্মদেয় লক্ষ্য স্থির করা যায়। স্থূল পদার্থের মতো শালগাম শিলার ন্যায় লক্ষ্য স্থির-সুতরায় লক্ষ্য স্থির অভ্যাস কর। মন আর কিছুতে হয় না। তদ্রূপ পরিমাণে সূর্যো, চন্দ্র, নক্ষত্র ও দীপালোকে সম্ভব। তদ্রূপ পরিমাণে দূরস্থিত রক্তবর্ণে।

৫৮। সমাধি।—

কি তপস্কার, কি যোগে, সমুদ্র বেন দেহ তটতে পুণ্ড্র থাকে। উল্লিঙ্গগণ ও উচ্চাঙ্গের নেতা মন কার্য করে না, নয়ত যদিও কার্য করিতে থাকে, দেহী উচ্চাঙ্গ মন করে না। দেহীর এই অবস্থা: "সংকল্প" হইতে "তপস্কা বা যোগ" ক্রমায় অবসান পর্য্যন্ত থাকে। জ্ঞানার পূর্বেও থাকেনা, পরেও থাকে না। এই অবস্থাকে "সমাধি" বলে। এই অবস্থার দেহীর লক্ষ্য ব্রহ্ম বা কল্পিত ব্রহ্ম, দেহীর অবলম্বন জ্ঞান। স্বয়ং "জ্ঞাতা" রূপে "জ্ঞান" দ্বারা "জ্ঞেয়" অল্পমতানে প্রবৃত্ত থাকে। আপাততঃ বিষয় পরিত্যক্ত দেহীর জ্ঞান তখনও কল্পিত থাকে। সুতরায় জ্ঞাতাবৎ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞেয়কে ধরিতে পারে না। এই সময় চিত্ত স্থলিতে থাকে—অস্থিতান ঠিক হইয়াছে, লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে, কি না সন্দেহ উপস্থিত হয়। অভ্যাস দ্বারা জ্ঞান সার্জিত অর্থাৎ কল্প-বৃত্ত হইলে সিদ্ধি লাভ সম্ভব হয়।

আমরা অস্পষ্ট চিত্তায় রাজা হইয়া কত রাজার ভার মনে মনে বেন কত কার্য করিয়া কেলি—ইহা যেমন সঙ্গত, তপস্কার বা যোগে সিদ্ধি লাভ ততোধিক সঙ্গত।

৫৯। জ্ঞানমার্গাদিগের অধিকাংশই "পুরুষকার" বাদী এবং ভক্তিমার্গাদিগের "দৈব" বাদী। জ্ঞানমার্গা বিবিধ পান্থিক পথে পরামুখ হইয়া (আপনাদিগকে বঞ্চিত করিয়া) আশ্রয় সংঘে ও বিচারে অস্থিতান করেন। দৈববাদীরা জ্ঞেয় প্রকৃতি প্রকৃত অমুরাগ রক্ষা করিয়া বীর ব্রত নিযুক্ত থাকেন।

৬০। উল্লিখিত আছে "অতিমান" ভাগ না হইলে দৈব রূপা লাভ হয় না। অর্থাৎ "কর্তা" জ্ঞান গণে দৈব রূপা প্রাপ্তি সম্ভব নহে। আবার দৈবে যাঁহার বিশ্বাস তাঁহাতে অতিমানও ততক্রিয়াবান নহে। পুরুষকারবাদী অক্ষম হইয়া দৈববাদী হইয়া পড়েন। আবার দৈববাদীও মোহমগ্ন আপনাকে বড় মনে করিয়া পুরুষকারবাদী-বৎ হইতে চাহেন। দৃঢ় সংকল্পে স্থির থাকি অস্তিত্ব কঠিন।

৬১। আপাততঃ হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেরই না ভক্তিমার্গী না জ্ঞানমার্গী। বাহ্য ক্রিয়া দ্বারা ভক্তিমার্গী বলিয়া প্রচার করিলে কি হইবে? প্রকৃত ভক্তি অমুরাগ অভাবে সময় সময় অভক্তের ভার কার্য করিয়া ফেলেন। একে বিষয়ী, তাহাতে চিন্তা ও বিচার করিবার অবসর নাই, সুতরায় জ্ঞানমার্গী হইতে পারেন না বলিয়া মিনি বাহ্যে হুঃখ প্রকাশ করেন, তিনিও কপট। অস্থিতান করিবার সমরাত্যাব হইতে পারে, কিন্তু দেবতা বা ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে স্মরণ করিতে অবসর প্রয়োজন করে না। অল্প কাজ করিতে করিতে এ কাজ করিবার আশাদের শক্তি বিলক্ষণ আছে।

উক্ত হিন্দুদিগের ঈশ্বর অবস্থা বশতঃ সনাতন ধর্মের বিবিধ বিকৃত রূপ প্রকাশ পাইয়াছে ও পাইতেছে। পাছে কোন ধর্মবিরোধী হইতে হয়, তাই ঐ ধর্ম-বিকৃতির উল্লেখ করিলাম না।

(ক্রমশঃ)

জীবাত্মের বহু।

হিন্দু-পত্রিকা ।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড,
৫ম সংখ্যা ।

ভাদ্র ।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা ।

ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অনুশীলন ।

২০। যেতাঋতর উপনিষদে আছে,
যথা,—২য় অঃ ।

(১) জিরুগতং স্থাপ্য সমং শরীরং ।

হৃদীজিরাপি মনসা সন্নিবেশ্চ ।

স্বকোড়ুপেন প্রতরেষ ত বিদ্বান্ ।

শ্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ॥ ৮ ॥

প্রাণান্ প্রপীডোহ সংযুক্ত চেষ্টঃ

ক্ষীণে প্রাণেনাসিকরোচ্ছসীতঃ ।

হৃষ্টাখযুক্তমিববাহমেনং

বিদ্বান্ মনোপ্রারমতো প্রমত্তঃ ॥ ৯ ॥

সমেত্তেচৌ শর্করা বহিবালাকা

বিবর্জিতে শক্ জলাপ্ররাদিতিঃ ।

মনোহনকুলে নতু চক্ষু পীড়নে

ওহা নিবাতাপ্ররনে প্রবোজয়েৎ ॥ ১০ ॥

(২) বক্, জীবা ও মত্তক, উন্নত ও

শরীরকে সরল করিয়া উপবেশন, পূর্বক স্বপ্নে

ইন্দ্রিয় সকলকে মনের সহিত সংযোগ করতঃ
সংসার-সাগরে ভয়াবহ শ্রোত সকল ব্রহ্মরূপ
ভেলক দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি অতিক্রম
করিবেন । (খে ৮। ব্রাহ্মধর্ম ৭। ১৩।)

(৩) প্রাণাপান বায়ুকে সংযম করিবেন ।

আহার বিহারাদি দেহচেষ্টাকে নিয়মিত করি-
বেন । প্রাণবায়ু ক্ষীণ হইলে নাঙ্গাপুট দ্বারা
অন্ন অন্ন বায়ুত্যাগ করিবে । হৃষ্টাখযুক্ত রথকে
সংযমের দ্বারা বিদ্বান্ অপ্রমত্ত ভাবে মনকে
ধারণ পূর্বক মননে নিযুক্ত হইবেন । খে ৯ ॥

(৪) কক্ষর ও তপ্ত বাসুকী বর্জিত

সমান ও শুচিপেশে ; উত্তম জল, উত্তম মদ
ও আশ্রয়াদি দ্বারা মনোরম স্থানে ; প্রতি-
বাদীর অনভিযুখে ; মদ অদ্য বায়ুসেবিত
বিয়ল স্থানে পরমাস্বাদে চিত্তসমাধান
করিবেক । খে ১০। ব্রাহ্মধর্ম ৭। ১৪ ॥

২১ এই শ্রুতিগুলি, প্রাণারাম, ধ্যান, সমাধি এবং ব্রহ্মচিন্তন সব বৃত্ত ব্রহ্মোপাসনার প্রতিপাদক। প্রথম শ্রুতিটিতে “ব্রহ্মোড়ূপ” শব্দ আছে। শব্দর কহেন তাহার অর্থ প্রথম। “ব্রহ্মশব্দং প্রথমং”। ইহা প্রথমরূপ অবলম্বন। প্রথম যে ব্রহ্মোপাসনার অবলম্বন, তাহা সর্কোপনিষৎ-সিদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহে উক্ত প্রথম ও তৃতীয় শ্রুতি দৃষ্ট হয়। কলে এই সমস্ত উপদেশে যোগরূপ ক্রিয়ালক্ষণ বিস্তারিত। গুরু উপদেশ ব্যতীত তাহার অসুষ্ঠান সহজ নহে।

২২। ইতিপূর্বে ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মধ্যান বা ব্রহ্মচিন্তনরূপ যোগের মন-প্রাণাদি যে সকল অবলম্বনের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সমোবৃত্তির ব্যাপাররূপ ক্রিয়াধর্মী, এবং সোপাধিক ও পরোক উপাসনার উপায় মাত্র হইলেও, শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই যে, সাধক, নিজের, নিরূপাধিক এবং অপরোক ব্রহ্মজ্ঞানে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, ঐরূপ উপাসনা ও ধ্যানাদি ক্রিয়া করিবেন। তাহাতে ক্রমে নিরঞ্জন ব্রহ্মতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিবেন। নতুবা অন্ধবিশ্বাসে ঐরূপ ক্রিয়া করিবেন, এমন উদ্দেশ্য নহে। ব্রহ্ম-বিশ্বা সর্কপ্রকার ক্রিয়া, উপাধি ও অজ্ঞানের অতিক্রান্ত এবং প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রকাশক। কি জানি সাধক যদি, মনের ধর্মকেই ব্রহ্ম-রূপে মনে করেন, কি জানি-যদি প্রাণাদি বায়ুগণের-বৃত্তিকেই ব্রহ্মভাবে গ্রহণ করেন, যদি প্রথমকেই ব্রহ্ম বলিয়া স্থির করেন, যদি পরমাত্মাকেই ব্রহ্মপদে অভিযুক্ত করেন, যদি আকাশকেই ব্রহ্মের প্রতীমা মনে করেন, যদি অগ্নি, বৈশ্বানর, সূর্য, চন্দ্র,

প্রভৃতি অবলম্বনে ব্রহ্মধ্যান করিতে গিয়া সেই অবলম্বন গুলিকেই ব্রহ্মপদস্থ ক্রাবিয়া তাহাতেই সোপাধিক ও অজ্ঞতাবে চিরবন্ধ হইয়া থাকেন এই সম্ভাবিত ভ্রমগুলি নিবারণের নিমিত্তে উপনিষদে, বাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে, এবং আচার্যাদিগের ভাষ্য, টীকা ও গ্রন্থসমূহে পদে পদে প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিয়াছেন। তুমি বলিতে পার, যদি অবলম্বন গুলিতে তোমার ব্রহ্মবুদ্ধিরূপ বিশ্বাস থাকে, তবে তুমি তাহাতেই তরিতা বাটবে; কিন্তু তোমার বুঝা উচিত যে, ব্রহ্মোপাসনা, বিধিবিহিত মন্ত্রসমবায়ী দেবার্চনা নহে যে, মন্ত্র ও বিশ্বাসের বলে অভিলষিত আলৌকিক ফল লাভ করিবে। ইহার উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, নিঃসর্গ-ব্রহ্মবিশ্বা। এ সমস্তই জ্ঞান মাত্র এবং বিশ্বাসের অতিক্রান্ত। বিশ্বাস ও জ্ঞানে প্রভেদ এই যে, বিশ্বাস অজ্ঞাত-শক্তি ও আলৌকিক ফল-নিষ্ঠ; কিন্তু জ্ঞান প্রত্যক্ষ। শাস্ত্রে, অবলম্বন সমূহের যে তাৎপর্য নিজ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহা নিয়ে সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

(১) মন। “নপতীকে নহিসঃ” (ব্র সূ ৪।১।৪) মন বা আদিত্যাদিকে ব্রহ্মের প্রতীক (প্রতীমা) জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদে তৎসমস্তের উপাসনা করিবেক কি না? কেননা বেদে আছে “মনোব্রহ্মেত্ব্যুপাসীত”। মনঃ ব্রহ্ম, তাহার উপাসনা করিবেক? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ব্রহ্ম মন হইতে স্বতন্ত্র এবং মহান্। অতএব মন আদির অবলম্বনে ব্রহ্মেরই উপাসনা অতিক্রান্ত। নতুবা মন আদির উপাসনা নাই।

(২) প্রাণ। “প্রাণস্তথাহুগমাং” (ঐ ১।১।১৬৮) প্রাণবায়ু বা জীব (জীবাত্মা) উপাস্ত নহে। এখানে প্রাণশব্দে বায়ু নহে; কিন্তু ব্রহ্ম। অতএব যেখানে যেখানে প্রাণের উপাসনা অথবা প্রাণাবলম্বিত উপাসনার উপদেশ আছে, সেখানে ব্রহ্মোপাসনাই তাৎপর্য।

(৩) প্রণব। প্রণবাবলম্বিত ব্রহ্মোপাসনার সহিত ছান্দোগ্যোপনিষৎ উপক্রান্ত হইরাছে। বলা—“ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত”। এই উদগীথরূপী ঙ্কার অক্ষরের উপাসনা করিবেক। “বাচ্যঃ স ঙ্কারঃ প্রাক্তো বাচকঃ প্রণবঃ স্তুতঃ” (যোগিবাক্যবক্ষ্য)। এই অক্ষর পরমাত্মার বাচক, এবং পরমাত্মা ইহার বাচ্য। কিন্তু বাচকরূপ এই অক্ষরটী যে, বাচ্যবরূপ পরমাত্মার সহ এক, উদ্দেশ্য তাহা নহে। উক্ত উপনিষদে এ সম্বন্ধে এই বিশেষ উপদেশ আছে যে, “তেনোভৌ কুরুতে বশেচতদেনং বেদ বশ্চ ন বেদ। নানাতু বিভ্রাচাবিত্তা চ বেদেব বিভ্রায় কেরোতি শ্ৰদ্ধারোপনিষদা তদেব বীর্ষ্যবস্তরং ভবতীতি” (১।১।১০) হুই প্রকার লোকে এই উদগীথরূপী প্রণব অক্ষর দ্বারা জিহ্বা করে। কেহ অর্ধ বুঝিরা (ধান, ধারণা, উপাসনা দ্বারা) ব্রহ্মচিন্তা করে, কেহ বা এই প্রণব মন্ত্র-উচ্চারণ পূর্বক বজ্রদেবার্চনাদির অহুষ্ঠান করে, কিন্তু ইহার অর্থ জানে না। কিন্তু অর্ধ বোধই বিভ্রা, আর অর্ধানবগতিই অবিত্তা। যদি অর্থজ্ঞানের সহিত উপাসনাদি অহুষ্ঠিত না হয়, তবে কেবল মাত্র বিক্ষিপ্ত দ্বারা জ্ঞানকল লাভ হয় না। কেমনা বিভ্রা আর অবিত্তা পরস্পর তিন্ন। সুতরাং

সমকলজনক নহে। কেবল সেই জিহ্বা দ্বারা বিভ্রাধারা, জিহ্বার ব্রহ্মপজ্ঞান দ্বারা, প্রকাশহকারে, উপনিষৎপ্রতিপাদ ব্রহ্মজ্ঞানে লক্ষ্যাহির রাখিরা কৃত হয় তাহাই বীর্ষ্যবস্তর। পরমাত্মা বাসদেব, ব্রহ্মহুজে (১।১।৮) এই ক্রতির বিচার করিরাছেন, বলা—“বেদেব বিভ্রয়েতি হি।” যে উপাসনাকর্ম আত্মবিভ্রাতে যুক্ত, তাহাই জ্ঞানসাধনে বীর্ষ্যবস্তর। অতএব উদগীথাবলম্বনে ব্রহ্মোপাসনাই উদ্দিষ্ট।†

(৪) গায়ত্রী। ছান্দোগ্যে (৩।১২।৬) “তাবানন্ত মহিমা ততো অ্যারাম্শ্চ পুরুষঃ” গায়ত্রীকে ব্রহ্মবরূপ কহিরা তদপেঁসা ব্রহ্মকে মহান্ কহিরাছেন। বাসদেব ব্রহ্মহুজে (১।১।২৫) কহেন “হন্দোত্তিধানায়ৈতি চেন্ন তথা চেতোহর্পণ নিগদাত্তথা হিদর্শনং” ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রীই কেবল উপাস্ত নহেন। যে হেতু গায়ত্রীতে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান লোকের চিত্ত অর্পণের জন্য কণিত হইরাছে। এইরূপ অর্থ বেদে (উপনি-উক্ত ছান্দোগ্য ক্রটিতে দৃষ্ট হয়)। অতএব

† সামবেদের কোন বিশেষ অংশে প্রণব মন্ত্রের গান উদগীথ-সঙ্গীত নামে বিখ্যাত ছিল। তাহা সোমবাগে গীত হইত। তদনুসারে এখানে প্রণব অক্ষরের নাম উদগীথ শব্দে গৃহীত হইরাছে। উক্ত বাগে ইহা কত্রীজ অংগবরূপে ব্যবহৃত হইলেও এখানে ইহা পরমাত্মার উপাসনার অবলম্বন বরূপে গ্রহণ করিরাছেন। “স এষ রসামাং রসভৃদুঃ পরমঃ পরার্থোহুতম বহুদগীথঃ” (ছা ১।১।৩) এই উদগীথরূপী ঙ্কার সকল রূপের রসভূম। ইহা পরমাত্মার বোধক। ইহা পরমাত্ম চিত্তের সর্বোচ্চ অবলম্বন।

গায়ত্রী ধ্যান দ্বারা সাধক পরম পুরুষ ব্রহ্মের
সেই সহিয়া চিন্তা করেন তদপেক্ষা সেই
পুরুষই মহান্।

(৫) আকাশ। “আকাশোইখ্যাত্তরদ্বাদি
ব্যপদেশাৎ” (ব্রহ্মসূত্রে ১।৩।৪১)। ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে (৮।১৪।১) “আকা-
শো বৈ নাম রূপয়োনির্কাহিতা তে মদন্তরা
তৎ ব্রহ্ম তদমৃতং স আশ্বত্টি”। আকাশ,
নাম ও রূপের নির্কাহক। সেই নাম ও রূপ
ঐহার আশ্রয়ে স্থিত, তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত,
তিনি আশ্বা। শঙ্করাচার্য্য লেখেন যে,
ব্রহ্মকে উপাসনা বা চিন্তা করিবার অবলম্বন
নিমিত্তে প্রকৃতিতে তিনিই আকাশ নামে
সংজ্ঞিত হইয়াছেন। কেন না তিনি আকা-
শের স্থার নিরাকার এবং সূক্ষ্ম। ফলে
তিনি নাম, রূপ এবং ভূতাকাশ হইতে তির।
ঐহার নামও নাই, রূপও নাই। কিন্তু
ঐহার সারা-শক্তিতে নাম ও রূপ সর্ব
পদার্থের বীজরূপে লয় থাকার, তিনিই নাম-
রূপের প্রকাশক এবং নির্কাহক। “নির্কা-
হক” শব্দের অর্থ নিয়ন্তা। †

† ছান্দোগ্যোপনিষদে এই ব্রহ্ম আকাশ
মহান্ উদ্‌গীথরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। যথা।
(১।২।২) স এষ পরোবরীরাহুদ্‌গীথঃ
স এবোহনন্তঃ পরোবরীরো হান্ত ভবতি
পরোবরীরোগে হ লোকাজ্জরতি য এতদেবং
নিধান পরোবরীরাং সমুদ্‌গীথমুপাত্তে”।
ইনি (এই ব্রহ্মরূপ পরম আকাশ) মহোচ্চ
এবং উৎকৃষ্ট উদ্‌গীথ স্বরূপ। ইনি অনন্ত।
যিনি ইহা জানেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্যাতে
নিধান। ইহা জানিরা যিনি এই মহোচ্চ ও
উৎকৃষ্ট ব্রহ্মরূপ মহান্ উদ্‌গীথের উপাসনা
করেন, তিনি উর্ক উর্ক, বর্গলোক অর
করেন।

(৬) অঙ্গ। “অঙ্গেনু যশাশ্রয় তাবঃ”
(ব্রহ্মসূত্রে ৩।৩।৬) অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র
প্রভৃতি বিরাট পুরুষের অঙ্গ স্বরূপ। এই
সমস্ত অঙ্গ পদার্থের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাসনা
উদ্দিষ্ট নহে। কিন্তু সেগুলির অবলম্বনে
অঙ্গী-পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্মের উপাসনাই
অভিপ্রোক্ত।

(৭) জ্যোতিঃ। “জ্যোতির্দর্শনাৎ”
(ঐ ১।৩।৪০) যেখানে জ্যোতিকে
উপাস্ত করিয়া কহিয়াছেন, সেখানে বাস্তব
জ্যোতির উপাসনা অভিপ্রোক্ত নহে। ব্রহ্মোপ-
াসনাই উদ্দেশ্য। সূর্য্যজ্যোতিঃ অব-
লম্বন মাত্র।

(৮) অধিদৈবত। “অন্তঃস্বরূপদেশাৎ”
(ঐ ১।১।২০) যিনি সূর্য্যাত্তর্ভী অধি-
দৈবত পুরুষ, তিনি ব্রহ্ম। তিনি সূর্য্য
নহেন। সূর্য্য মণ্ডলাবলম্বনে সেই ব্রহ্মেরই
ধ্যান কথিত হইয়াছে। “য এবোহন্তরা-
দিতো হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে তিরণ্য-
শ্ৰু হিরণ্যকেশ ইতি” (ছান্দোগ্যে
১।৬।৬) এই আদিত্যের অন্তরে যে
হিরণ্ময়, হিরণ্য শ্ৰু ও হিরণ্যকেশ পুরুষ
দৃষ্ট করেন, তিনি ব্রহ্ম। এখানে “হিরণ্য”
কেশাদি শব্দ উচ্ছন্ন বোধক। নতুবা সূর্য্য-
ধাতু বোধক নহে। ইহা অধিদৈবত
উপাসনা।

(৯) বৈশ্বানর। (ব্রহ্মসূত্রে ১।২।২৪)
বেদে বৈশ্বানর অগ্নির উপাসনার বিধি
আছে। কিন্তু তাহা সামান্য অগ্নি নহে।
কেননা বৈশ্বানর পরমেশ্বর। †

† “বৈশ্বানর” শব্দের বাসবদায়িক অর্থ
“অষ্টরায়ি”। কিন্তু অষ্টরায়ি উপাসনা নহে।

২৩। অতএব সর্বপ্রকার অবলম্বন
কিষ্টিত্ব ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মচিন্তা, এবং ব্রহ্ম-
খান ও সমাধি প্রভৃতি যোগের চরমোদ্দেশ্য
নিরঞ্জন নিরাসন্ন জ্ঞানস্বরূপ অব্যবহৃত।
অনেক শ্রুতি, যেমন সুস্পষ্ট নিষ্কর্গ নিরূপা-
ধিক ব্রহ্মবোধক, সেইরূপ অনেক শ্রুতি,

সর্ব প্রাণীর জঠরাগ্নিতে প্রবেশ করিয়া যিনি
ভুক্তান পরিপাকের পান অপান প্রভৃতি
শরীরস্থ বায়ুগণের (vital airs) সহিত
উক্ত অগ্নিকে নিম্নমিত করেন, তিনি ব্রহ্ম।
“বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দবিশেষঃ” (বেদান্ত-
সূত্র ১।২।২৪) যদিও সাধারণতঃ “বৈশ্বা-
নর” শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্ত অগ্নিক
বুঝান, কিন্তু উপাসনার নিমিত্ত পরমাত্মা-
কেই বৈশ্বানর রূপে বর্ণন করিয়াছেন।
ছান্দোগ্যে বৈশ্বানর বিভ্রাতে ৫।১০।১)
বৈশ্বানর-আত্মার উপাসনার বিধি দিয়াছেন।
“আত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্ত উতি” (ঐ
অধিকরণমালা) বৈশ্বানররূপ আত্মার উপা-
সনা করিবেক। প্রামোপনিষদে প্রজ্ঞাপতির
মিথুনরূপ উক্ত হইয়াছে। একটা স্ত্রী
আকার, তাহার এই করেকটা নাম, সপা
রসি (পৃথিবী) সোম (চন্দ্র) এবং অন্ন।
ষষ্ঠীরা পুরুষ-আকার এবং তাহার নাম
প্রাণ, অগ্নি, আদিত্য ও অস্তা (ভোক্তা) এই
উত্তর স্তম্ভের মধ্যে যিনি প্রাণ, অগ্নি, ও
আদিত্য, তিনিই “বৈশ্বানর”। পরমাত্মা সর্ব-
জগতে পবিত্র। প্রাণিগণের জঠরস্থ যে পরি-
পাক শক্তি, তাহা অগ্নি ও আদিত্যের প্রভাব
এবং প্রাণ অপাণাদি সমাবৃত্ত বৈশ্বানরাণ্য
অগ্নি। সেই অগ্নিই সমগ্র ভুক্তানের “অস্তা”।
“অস্তা” শব্দে ভোক্তা-জীর্ণকারী। সমস্ত
ব্রহ্মচর্যের সেই আধ্যাত্মিক অগ্নি আদিত্য ও
প্রাণাপান বায়ু প্রবাহিত অন্ন-পরিপাক বস্তু
যিনি স্বরূপে আকর্ষ, তিনি পরমাত্মা;
অতএব অস্তাও অস্তাবে তিনিই ‘বৈশ্বানর’।
যেহে বৈশ্বানর আত্মার যে উপাসনার বিধি

সোপাধিক সন্তুণ অস্পষ্ট ব্রহ্মনাচক এবং
খান উপাসনাদি ক্রিয়াপতিপাদক। কিন্তু
সমুদয়ের অস্থিত্য তাৎপর্য নিষ্কর্গ-ব্রহ্মবিদ্যা।
তাছাড়া পরমাত্মা বাসনাদেব কর্তৃক সার্ক-
পঞ্চশত বেদান্তাধা ব্রহ্মসূত্রে স্থাপিত হই-
য়াছে। অতএব ব্রহ্মবিদ্যার অক্ষয়ীলনে

দৃষ্ট হইবে, সে তাঁহারই উপাসনা। সামান্ত
জঠরানল ও পাণাপানাদি বায়ুর উপাসনা
নহে। অন্ন পরিপাক মন্ত্র (যে অগ্নি ও
আদিত্যরূপমত) তাহার মিথুনাত্মক প্রজ্ঞা-
পতির পূজাক্রমিক তেজোময়রূপ। অতঃপর
অন্ন ও চন্দ্ররূপ স্ত্রী আকৃতি যে মাতৃ, তাছাড়া
ভোগ্যপদার্থকণী। যাঁতার জ্ঞানযুক্ত কর্ম-
বান, তাঁহার আদিত্যোপলক্ষিত দেবদান
স্বর্গে এবং যাঁতার প্রজ্ঞাকায়ী তাঁহার
চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃদান স্বর্গ গতিলাভ
করেন। (প্রামোপনিষৎ ১ প্রস্তা। গীতার
ভগবান কহিয়াছেন (১৫।১৪) “অহং
বৈশ্বানরো ভূম্বা প্রাণিনাং দেহমাত্রিঃ”।
প্রাণাপান সমাবৃত্তঃ পচাসন্নঃ চতুর্বিধঃ।
আমি বৈশ্বানররূপী হইয়া প্রাণি সকলের
দেহ মধ্যে প্রবেশ পূর্বক জঠরাগ্নির উদ্ভীর্ণ
পাণাপান বায়ু সমাবৃত্ত হইয়া প্রাণিগণের
ভুক্ত চতুর্কিণ অন্ন পরিপাক করি। মাণু-
কোপনিষদে (৩) এই বৈশ্বানর আত্মাকে
“স্বলভুক” বিশেষণ দিয়াছেন; অর্থাৎ তিনি
প্রাণিগণের হৃৎকন্ডে প্রবেশ করিয়া ভুক্তান
জীর্ণ করেন। তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মাই
বৈশ্বানর আত্মা। বৈশ্বানরাত্মার এই বিশুদ্ধ
জ্ঞানই তাৎপর্যতঃ পরমাত্মজ্ঞান। ব্রহ্মবিৎ
পুরুষ এই জ্ঞান দ্বারা সাক্ষ্য-বোধ্য লাভ
করেন। কিন্তু বেদবিহিত অগ্নিহোত্র বাগে
অগ্নির পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে সমস্ত
দেবতার উদ্দিষ্ট হোম অগ্নি-মুখে আহবানী।
সামান্ততঃ বহমান ও পুরোহিতগণ সেই
অগ্নিকে অগ্নি-দেবতা এবং প্রাণ-অপান
আদিকে বতস্র বতস্র দেবতা মনে করেন।

সামককে বিশেষ সাধন হইতে হইবে, বাহাতে জ্ঞানাগোক সম্বন্ধিত ব্রহ্ম-বিদ্যাকে অলৌকিক কলজ্ঞনক ক্রিয়াজগণে গ্রহণ না করেন। অধিকাংশ লোকেই অলৌকিক ক্রিয়া, ক্রিয়ার অলৌকিক কল, এবং ক্রিয়ার অলৌকিক গুরু ও অলৌকিক অমুষ্ঠাতা এবং তাঁহাদের কৃত অপ্রত্যক্ষ কলজ্ঞনক ধ্যান, ধারণা, যোগামুষ্ঠানাদিতে

কলে সেরূপ মনে করা ভ্রম। এট জজ ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৫।২৪।১-৫) অমু-শাসন করিয়াছেন, যথা—যিনি দই নৈখা-নররূপ পরমাত্মতত্ত্ব না জানিয়া হোম করেন, তিনি ভ্রম্মেতে হোম করেন কিন্তু যিনি তাহা জানিয়া অগ্নিতোত্র যজ করেন, সেট বিধান্ ব্যক্তির আত্মিত সকল সর্গ-ভূতে ও সকল আত্মাতেই অর্পিত হয় এবং সমস্ত বিশ্বকে তৃপ্ত করে। কেনন! পরমাত্মাই বিশ্বদেবতা। তিনি সেই যজ্ঞের অন্নদ্বারা আপনায় ও ব্রাহ্মগণেরই সেবা করেন না, কিন্তু চণ্ডালেরও সেবা করিয়া থাকেন। তাহাতে সেই সমস্ত অন্ন তাঁহার স্বীয় বৈখানর আত্মাতেই—সুতরাং সর্কৃত্বতেই অর্পিত হয়। সেই জজ বেদে এটরূপ উক্তি আছে। “বর্ষে কুধিতা বালা মাতরং পর্গাপাসত এবং সর্কপি তুতানি অগ্নিহোত্র মুশাসত ইতি (৫)” যেমন গৃহস্থ্যশ্রমে কুধিত বালকেরা মাতাকে বেটন করে, সেইরূপ সকল প্রাণী অগ্নিহোত্রকে অপেক্ষা করে। এটরূপে ছান্দোগ্যে প্রায় সকল ক্রিয়াতেই আত্মবিত্তার অমুশাসন দৃষ্ট হয় এবং সূর্য্য, অগ্নি, মোম, প্রাণ, অন্ন, সমস্তই ব্রহ্মরূপ উপাস্য দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানী কবি চাক্রায়ণ কৌন-রাজ্যার কল্পেতে বেদগানকারী ব্রাহ্মগণকে সযোজন করিয়া কহিয়াছিলেন, যিনি এই সমস্ত বেদগণের উদ্দিষ্ট দেবতা, তাঁহাকে

যত সোচিত হন, বিস্কন্ধ-ব্রহ্মবিদ্যা-সমুৎপন্ন অন্নর ও নিরঞ্জন জ্ঞানাগোক তত পসন্দ করেন না।

২৪। ব্রহ্মসূত্রমস্মত ঐত্যাধি প্রত্যক্ষ আত্মদর্শনের জ্ঞান-নেত্র। সে দর্শনলাভে দেহাদি অনাত্মা পদার্থে অজ্ঞানরূত অনাদি ভ্রম বিগত হয়। যেরূপ অশুশীলন দ্বারা সে সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়, তাহারই নাম ব্রহ্ম-বিচার। সে বিচারে কিছুমাত্র অপ্রত্যক্ষ, অনজ্ঞদর্শন, এবং সংশয় তিষ্ঠিতে পারে না। যেমন আত্মত নেত্রে বয়স্কাকশ সবিত্তমগুল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ উক্ত সাস্কৃত জ্ঞাননেত্রে আত্মসাক্ষাৎকাররূপ ব্রহ্ম দর্শন হয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন দিবসে যেমন বিধিবিহিত কর্ম্মামু-ষ্ঠান কালে “জবাকুগ্রুম-শঙ্কানং” বলিয়া

না জানিয়া যদি হোমরা বেদগান কর, তবে হোমাদেয় মন্তক বিপত্তিত হইবে (যদিরা পড়িবে)। এই কথাতে উক্ত ব্রাহ্মণেরা গান শুগিত করিলেন। পশ্চাৎ চাক্রায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেট উদ্দিষ্টদেবতা কে? তাহাতে চাক্রায়ণ একে একে উত্তর করিলেন, “প্রাণ”, “আদিত্য” এবং “অন্ন”। অর্থাৎ তত্তৎ পদার্থে উপস্থিত ব্রহ্ম। (ছাঃ ১।১০) কলে শঙ্করাচার্য্য কহেন— (৫।১।১০) যে সকল পুরোহিতের বজ্রীক দেবতার তত্ত্বজ্ঞান বা মন্ত্রার্থ বোধ নাই, কেবল মাত্র ক্রিয়ার পদ্ধতি জানা আছে, তাঁহারাও চিরকাল ক্রিয়া ক্রিয়া আশি-তেছেন এবং তাহা বেদও অমুসোদন করেন। অতএব শঙ্করের সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল পুরোহিত কর্ম্মামুষ্ঠান-পদ্ধতি জানেন, তাঁহাদের ক্রিয়া করাইবার অধিকার আছে। তবে কলের ভারতম্য উক্ত হইয়াছে। “ভস্মে হোম” ও “সত্তকখলা” কর্ম্মাভি-নিদ্বার্ব্যাক্ষমাজ।

বিদিনির্ভিত সূর্যোদয়ে প্রণাম করা যায়, একান্ত সূর্যোর অপেক্ষা করা যায় না ; ব্রহ্মদর্শন সেরূপ “বিদিজ্ঞান” বা “মন্ত্র-ভঙ্গ” নহে ; কিন্তু বর্তমান সূর্য্য দর্শনব্যৎ সম্পূর্ণ “বস্তৃত্ব” ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মনিরূপক হইতে পারে না, এবং কোনরূপ ধ্যান, সমাধি ও উপাসনার তাঁহার পরিবর্তে কোন অলৌকিক জ্যোতি, আকাশ, তিরণান্বর্গমূর্তি, মারশক্তি পভূতি, ব্রহ্মরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ আত্মরূপে গ্রহণই সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন।

২৫। সমগ্র উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে এই প্রত্যক্ষ দর্শন প্রতিপাদিত হইয়াছে। বাহ্যতে সাধকেরা অক্ষবিধানের আশ্রয় গ্রহণ না করেন এবং যোগ, যাগ ধ্যান, সমাধি আদি ক্রিয়ালক্ষণ ব্রহ্মভূতানেও, শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানসম্বন্ধ ব্রহ্মজ্ঞানে আদর্শ স্থির রাখিতে পারেন, তাহার বিচার ও সিদ্ধান্ত ঐ সমস্ত মহা শাস্ত্রের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। তাহাই ব্রহ্মবিশ্বার উচ্ছল নিদর্শন। জ্ঞানপথাকটু ধীরেই সেই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধি বিচারের অন্তঃ অন্তর্শীলন করতঃ দেহাদি পদার্থে আত্মব্রহ্ম পরিচয় এবং পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ অস্বপ্নে গ্রহণ করেন।+ এইরূপ

+ বাহ্যদের দেহাদি পদার্থে আত্মব্রহ্ম পরিচয় হইয়া পরমাত্মা সাক্ষাৎ অস্বপ্নে গৃহীত হইলে, তাঁহাদের ঔপাধিক অবস্থার উপাত্ত শিব, কালী, কৃষ্ণ জ্যোতি লীলা ও লীলাধীশ তখন রূপ-নামবিহীন নিরঞ্জন আত্মরূপে প্রকাশ পায়েন। বেহেতু “অস্বপ্ন-দেবতাঃ সর্বাঃ” (মহা ১২। ১১৯) সমস্ত দেবতা আত্মাই।

সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান-সাধনে অসমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ সমস্ত ক্রিয়াদর্শী ব্রহ্মভূতানের ব্যবস্থা। কিন্তু আত্মজ্ঞানই তাহার উদ্দেশ্য।

২৬। ব্রহ্মনিচয় ও ধ্যানাদি সম্বন্ধে পঞ্চদশী শাস্ত্রে অনেক সিদ্ধান্ত আছে। তাহার কতিপয় বাক্য এখানে উদ্ধৃত করিয়া প্রদত্ত সাক্ষ করিব।

(১) ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রস্ব পতাক্ষেটো-ব-নিচঃ। মহানটৈকান্ত্যাপোতৎ চূর্কোপ-সনিচারিণঃ। (যাঃ দী ২০) শাস্ত্রেতে মহাবাক্য ধারা ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মারূপে পণিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু বিচারক্ষম ব্যক্তি দিগের পক্ষে তাহা চূর্কোপা। কেন চূর্কোপা? তাহার উত্তর দিতেছেন।

(২) দেহাদ্যাশ্চ নিস্ত্রান্তোজাগ্রত্যং ন-হঠাৎ পুমান্। ব্রহ্মাত্মেন বিজাতুং ক্ষমতে-মন্দমৌত্ততঃ। (ঐ ২১) সামান্ত লোকের বুদ্ধিতে দেহাদি বড় বস্তুর আত্মব্রহ্ম জাগ্রত থাকায় মন্দবুদ্ধি প্রবৃত্ত পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ আত্মরূপে গ্রহণে তাহাদের সহসা ক্ষমতা হয় না। কেন না বিচার ব্যতিরেকে সে ক্ষমতা জন্মে না।

(৩) বিচারজ্ঞানতে নোপোহনিচ্ছা-যং ন-নিবর্তয়েৎ। যোৎপত্তি সাত্মাৎ সংসারে-দহত্যখিল সত্যাতাৎ (ঐ ১৫) বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় (বস্তৃত্ব বিচার-বোধো জায়তে।) তাহা একবার দৃঢ়তর হইলে অনিচ্ছাতেও আর নিবৃত্ত হইবার নহে। তাহা উৎপত্তি যাক্রে, সংসারে অখিল-সিদ্ধিতে যে সত্যজ্ঞান, তাহা বহন-করে।

(৪) অত্যন্ত বুদ্ধিমান্যাদি সাগণা-
 ষাণাসম্মতং। যো বিচারঃ ন লভতে ব্রহ্মো-
 পাসীত যোনিশং। (ঐ ৫৪।) কিন্তু বুদ্ধি-
 মান্য্য খবুভাই হউক বা চিত্তশুদ্ধির অভাব
 বশতই হউক, যে ব্যক্তি সেই বিচারে অসমর্থ
 হয়, তাহার পরোক্ষরূপে নিষ্কণ্ড ব্রহ্মের
 উপাসনা করা অতি কর্তব্য।

(৫) উপাসকসকল সততঃ ধ্যানমগ্ন বসে
 বসে। ধ্যানেনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মণ বিষ্ণু-
 ত্য়াদিনং ॥ (ঐ ১৩।) উপাসক ব্যক্তি
 সর্বদাই ধ্যানেন্তে তৎপর হইবেন। যে হেতু
 বিষ্ণুলোক প্রাপ্তির ত্রায় ধ্যান দ্বারাই
 তাঁহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।

(৬) ধ্যানোপাদানকঃ যন্তক্ষানাভাবে
 বিলীয়তে। বাস্তবী ব্রহ্মতা নৈব জ্ঞানাভাবে
 বিলীয়তে ॥ (১১৭) ধ্যান সাহার কারণ,
 ধ্যানাভাবে স্তরং তাহার (ধ্যানরূত বা
 উপাস্ত ব্রহ্মত্বের) লয় হইতে পারে।
 অতএব উপাসকের সর্বদাই ধ্যান করা
 আবশ্যক। কিন্তু নিত্যসিদ্ধ বস্তুরূপ যে
 ব্রহ্মসদৃশ, তাহা জ্ঞানালোচনার অভাব
 হইলেও বিলীন হইবার নহে।

(৭) ইতিপূর্বে (এই প্রবন্ধের ১১ক্রমে)
 ধ্যানদীপের ১২১ ও ১২২ স্লোক উদ্ধৃত করা
 গিয়াছে। তাহাতে আছে, অশাস্ত্র-আচার
 অপেক্ষা বিধিবিহিত কর্ম্মস্থলান শ্রেষ্ঠ,
 তদপেক্ষা সঙ্কণোপাসনা শ্রেষ্ঠ এবং তদপেক্ষা
 নিষ্কণোপাসনা শ্রেষ্ঠ। নিষ্কণোপাসনাই
 ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়। নিম্নে
 "ক্রমশঃ" শব্দের তাৎপর্য্য পাওয়া যাইবে।

(৮) নিষ্কণোপাসনং পক্ষঃ সমাধিঃ-
 তঃ শটৈবতঃ। যঃ সমাধিনিরোধাধ্যঃ

মোহনারাসেন লভ্যতে ॥ (১২৬) ॥
 নিষ্কণোপাসনাই পরিণত হইয়া সন্মার্গরূপে
 পরিণত হয়, অতএব তাহাতে অনারাসে
 নিরোধাধ্যা নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়।

(৯) নিরোধলাভে পুংসোহস্তরসকঃ-বস্ত
 শিষ্যতে। পুনঃ পুনর্কাসিতেশ্মিন্ বাক্যাং
 জ্ঞয়েত তদ্বনীঃ ॥ (১২৭) নির্বিকল্প সমাধি
 সুসাধিত হইলে, অন্তঃকরণে কেবল অসঙ্গ
 চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে, পশ্চাৎ পুনঃ
 পুনঃ আলোচনা দ্বারা মহাবাক্য প্রতী-
 পাদিত তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হয়।

(১০) এই তত্ত্বজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব একই
 কথা। নিষ্কণ উপাসনা দ্বারা নির্বিকল্প
 সমাধি এবং নির্বিকল্প সমাধি হইতে তত্ত্ব-
 জ্ঞান (আত্মতত্ত্ব) লাভ হয়। অতএব উক্ত
 হইয়াছে "নিষ্কণোপাসনাই ক্রমশঃ তত্ত্ব-
 জ্ঞান (বা আত্মতত্ত্ববোধ) রূপে পরিণত হয়।
 কিন্তু শুদ্ধ নিষ্কণ উপাসনা বা তদ্বিত্ত
 নির্বিকল্প সমাধি দ্বারা চরম ফল (আত্মতত্ত্ব)
 লাভ হয় না, যদি আত্মতত্ত্ব-বিচারের প্রতী
 লক্ষ্য না থাকে। অথবা উপাসনা, যোগ,
 ধ্যান, সমাধি প্রভৃতি উপায়গুলি (means)
 না ধরিয়াও, বিশুদ্ধস্ব পুরুষ একাএক
 (directly) আত্মতত্ত্বের বিচার (ব্রহ্মবিচার
 আলোচনা) করিতে পারেন; তাহাতেও
 তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইবে। যথা—

(১১) উপাসকানামপোষং বিচার
 ত্যগতো যদি। বাচং তন্মার্গবিচারভাসম্ভবে
 যোগ ঈরিত ॥ (১৩১) ॥ আত্মতত্ত্ব-বিচার
 পরিভ্যাগ করিয়া বাহ্যের কেবল ধ্যান,
 ধারণা, প্রাণায়াম, সমাধি প্রভৃতি "সঙ্কণ
 নিষ্কণ উপাসনাতেই রত থাকের, তাহাঙ্গের

পক্ষে "পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য কসং শেটৌতি ত্রায়
আপতেৎ" (১৩০) হস্তম্ব গ্রাস পরিত্যাগ
করিয়া হস্ত লেহন করার দৃষ্টান্ত লগ্নয় করা।
তথাপি উপাসনার ব্যবস্থা কেন? ইহার
উত্তর এই যে, তাহা অস্ত্রংকরণ শুদ্ধির
নিমিত্তে করিরাছেন। অর্থাৎ আয়ত্ব-
নিচারণের অগস্ত্যাবনা স্থলে উপাসনাদি
উপায় (means) স্মৃতিত চর্চরাজে। কিন্তু
আয়ত্বত্বই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ।

(১১) তৎসানর্থাৎজ্ঞানতেদীর্ঘলাবিজ্ঞা-
নিবৃত্তিকা (১৪০) ॥ যদিও নিষ্ঠূর্ণগোপা-
সনাঃ মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, তথাপি
তদ্বারা তাহার শক্তি হইতে অবিন্যা-নিব-
ৃত্তিকা ব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হয়।

(১৩) উপাসনাত্ত সামর্থ্যাৎ বিদ্যাং-
পত্তির্ভবেত্ততঃ। নানাঃ পস্থা ইতি হেচ্ছান্নং
নৈস বিকৃত্যতে ॥ (১৪২) উপাসনার
সামর্থ্য বশতঃ মুক্তির কারণ উৎপন্ন হয়,
অতএব জ্ঞান ব্যক্তিরকে মুক্তির আর
উপাধাত্তর নাই। "নানাঃ পস্থা বিদ্যাতে
হরনার ইতি শ্রুতিঃ" এই শ্রুতির সচ
উপাসনার আর কোন বিরোধ রহিল না।
কেন না জ্ঞানই উপাসনার উদ্দেশ্য ও ফল
এবং জ্ঞানেই মুক্তি।

(১৪) নিচারাঙ্গম আত্মাস মুপাসীতেতি
সত্ততঃ ॥ (১৫১) আয়ত্ব বিচারেতে
অঙ্গম ব্যক্তি সত্তত আত্মার উপাসনা
(ব্রহ্মোপাসনা) করিবেক, আয়ত্বান করি-
বেক এবং আত্মাতে সমাধিবৃ হইবেক। কিন্তু
বিচারভূক্তম হইলে-সর্বদা ব্রহ্মবিদ্যাক অঙ্গশীলন
দ্বারা আয়ত্বান উপার্জন করিবেক। তাহা
সর্বশ্রেষ্ঠ নিষ্ঠূর্ণ ও অপরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনা।

২৭। সমস্তের তাৎপর্য এই যে, আত্ম-
জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাহা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা
জ্ঞান। তাহাই ব্রহ্মবিদ্যাঃ প্রাপ্তপাদ্য
সহাসোক। ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গশীলন ও
আলোচনাঃ বাহ্য, আয়ত্বত্বের বিচারঃ
তাহা। তাহাতে বাহ্যত্বের কচি নাই,
বুদ্ধি নাই, পূর্বশ্রুতি নাই; অচ্যত জিহ্মা-
ধর্মী মনোবৃত্তির ব্যাপার দ্বারা বাহ্যারী
পরোক্ষে ও সোপাধিক উপারে গৌণ ও
অলৌকিক ফলসঙ্গণে ব্রহ্মলগ্নত করিতে
ইচ্ছুক, শাস্ত্রে তাঁহাদেরই নিমিত্তে আয়-
ত্বত্বের সোপান স্বরূপ নানাবিধ অবলম্বন-
নিশিষ্ট ব্রহ্মোপাসনার বিধান দিয়াছেন।
যোগ, ধ্যান, সমাধি প্রাপ্তি চিত্তবৃত্তির
নিরোধক ক্রিয়া অঙ্গ বিস্তর তাহারই অঙ্গ।
এই ব্রহ্মোপাসনা বধন নিষ্ঠূর্ণ উপাসনার বা
নির্ধিকম সমাধিতে পরিণত হয়, তখন ক্রমে
ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিশ্রুত অস্ত্রাবে
তাহা ঐহিকই দিক হয়; সচেৎ ক্রমে
অম্মান্তরে। কিন্তু বাহ্য আয়ত্বত্ব, তাহা
ক্রমরহিত, পারম্পর্ঘ্যরহিত, সর্বোপাধি-
বিনির্মুক্ত, প্রতিবন্ধশূন্য সাক্ষাৎ আয়ত্বজ্ঞান
বায়।

(ক্রমশঃ)

ত্রীচত্রশেখর বসু।

কর্ম ও ফলিত জ্যোতিষ।

(পূর্নামুভূতি।)

কলিত জ্যোতিষ বিজ্ঞান কি না, তাহা
সমস্তের আলোচনার ইচ্ছা রহিল।
"বরাহ মহিহর" বলেন যে, এই শাস্ত্রে

“উপাস” ও “উপের” লক্ষণ সঙ্গক থাকার ইহা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয়। “উপাসাশ্রমঃ শাস্ত্রম্ উপের বহিঃস্থানং।” অর্থাৎ এই শাস্ত্র উপার ও তাহার বিস্তার উপের স্বরূপ। এই শাস্ত্রে হোরা, ত্রেকাণ, নবংশ, দ্বাদশ ভাগ, ত্রিংশৎ ভাগ, গ্রহ-রাশির বলাবল, অরিস্ট, আবু, দশা, অস্ত-দিশা, বোগাদি কথাবৎ বর্ণিত আছে, তাহাতে জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে কর্ম-বিপাক লভ্য ফলাফল জানিতে পারিয়া ইহলোক ও পরলোকে যে গতি ও সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহা জানিতে পারা যায়, তজ্জন্ম এই শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা।

পূর্বে যে সকল নক্ষত্রের উল্লেখ করি-
রাছি, তন্মধ্যে ২৭টি নক্ষত্রের সহিত
আমাদের সঙ্গক। যথা;—অশ্বিনী, ভরগী,
কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু,
পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী উত্তর ফল্গুনী
হস্ত, চত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অহুয়াধা,
জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা,
ধনুষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদ; উত্তর
ভাদ্রপদ ৫ রেবতী।

এই ২৭টি নক্ষত্র যে সংখ্যায় ২৭টি,
তাহা নহে। তাহার প্রত্যেকে এক, দুই
বা ততোধিক নক্ষত্র সংখ্যায় গঠিত।
সুতরাং নক্ষত্রের আকার বা নক্ষত্রগণের
সমাবেশে তাহাদের বৈরূপ আকার পরি-
লক্ষিত হইয়াছে। তদনুসারে তাহাদের
নামকরণ হইয়াছে।

অশ্বিনী তিনটি নক্ষত্রের সংযোগে উৎ-
পন্ন; তাহার আকার অশ্বের মুখের স্তায়।
ভরগী তিনটি নক্ষত্রে, ইহার আকার

ত্রিকোণ। কৃত্তিকা ৭টি নক্ষত্রে সাধারণতঃ
“সাত ভাই চম্পা” নামে বিখ্যাত। ১৩ রোহিণী
৫টি ও মৃগশিরা ৩টি নক্ষত্রে। আর্দ্রা
একটি নক্ষত্রে, ইহা অতি উজ্জ্বল ও প্রবালবৎ।
পুনর্বসু পাঁচটিতে এবং ধনুকাচার। পুষ্যা
একটি চক্রাকার। অশ্লেষা কুকুর-পুচ্ছবৎ
এবং পাঁচটি নক্ষত্রে বিশিষ্ট। মঘা ৫টি
এবং হলের আকার। পূর্ব ও উত্তর
ফল্গুনীতে দুইটি করিয়া নক্ষত্র এবং পূর্বো-
ক্তের আকার খট্টা এবং উত্তরোক্তের
আকার শস্ত-গুচ্ছবৎ। হস্তর আকার
হস্তের স্তায় এবং ৫টি নক্ষত্রে বিশিষ্ট।
চিত্রা একটি নক্ষত্রে—দেখিতে সুতার সত।
স্বাতীও একটি নক্ষত্রে—প্রবালাকার।
বিশাখা ৫টি, তোরণাকার। অহুয়াধা
৭টি, সর্পাকৃতি। জ্যেষ্ঠার তিনটি, কুণ্ডলা-
কার। মূলা ৯টি, শঙ্খাকার। পূর্বাষাঢ়ার
৪টি চতুষ্কোণ; উত্তরাষাঢ়ার ৪টি শস্তাকার,
শ্রবণার তিনটি শরের স্তায়। ধনুষ্ঠার
৫টি মৃদঙ্গাকার। শতভিষার একশতটি
মণ্ডলাকার। পূর্ব ও উত্তর ভাদ্রপদে
২৮টি—ঘণ্টাকার। রেবতীতে ৩২টি নক্ষত্র
ও আকার সংতার স্তায়, জ্যোতিষ শাস্ত্রে
বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রহাদির স্তায় ইহাদেরও ভবের সহিত
সঙ্গক রহিয়াছে। যথা;—

পৃথিবীতলের অধিপতি—ধনুষ্ঠা, রোহিণী,
জ্যেষ্ঠা, অহুয়াধা, শ্রবণা ও উত্তরাষাঢ়া ৬টি।

জলতলের অধিপতি—পূর্বাষাঢ়া,
অশ্লেষা, মূলা, আর্দ্রা, রেবতী, উঃ ভাদ্রপদ
ও শতভিষা এই ৭

অগ্নিতলের অধিপতি—ভরগী, কৃত্তিকা

পুত্রা, মধ্য, পুঃ ফল্গুনী, পুঃ ভাদ্রপদ ও
স্বাতী এই ৭।

বায়ুতত্ত্বের অধিপতি=বিশাখা, হস্তা,
উঃ ফল্গুনী, চিত্রা, পুনর্করু, অশ্বিনী ও
মৃগশিরা এই ৭।

নোট ২৭

উপরিউক্ত নক্ষত্রাদির বিভিন্ন জাতি-
বিশাগ আর্গ্যাভ্যোতিবে উল্লেখিত হই-
রাছে; তদনুসারে জাতকের জাতি নির্ধা-
রিত হয়। যথা,

- ১। অখজাতি=অশ্বিনী ও শতভিষা।
- ২। হস্তী=রেশমী ও ভরননী।
- ৩। সর্প=রৌহিণী ও মৃগশিরা।
- ৪। অজা=কৃত্তিকা।
- ৫। ব্যাজ্র=আর্দ্রা, হস্তা ও স্বাতী।
- ৬। মেঘ=পুনর্করু।
- ৭। ইন্দুর=পুত্রা, অশ্লেষা ও মধ্য।
- ৮। মহিষ=পূর্বাফল্গুনী ও চিত্রা।
- ৯। হরিণ=বিশাখা ও অহুরাধা।
- ১০। কুকুর=জ্যেষ্ঠা।
- ১১। বানর=মুলা ও শ্রবণা।
- ১২। নকুল=পূর্বাষাঢ়া।
- ১৩। সিংহ=ধনিষ্ঠা, পুঃ ভাদ্রপদ ও উঃ
ভাদ্রপদ।

এই ২৭টি নক্ষত্র “দেবগণ” “নরগণ”
ও “রাক্ষসগণ” উপাধিতে ত্রিভাগে বিভক্ত
হইরাছে। যথা—

দেবগণ—অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্করু, পুত্রা,
হস্তা, স্বাতী, অহুরাধা, শ্রবণা ও রেশমী
—২

নরগণ—ভরননী, রৌহিণী, আর্দ্রা, পুঃফল্গুনী,

উঃফল্গুনী পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ ও উঃ
ভাদ্রপদ—২

রাক্ষসগণ—কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মধ্য, চিত্রা,
বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, মুলা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা
—২

২৭

উপরিউক্ত বিভাগানুযায়ী জন্মলক্ষণ
অনুসারে জাতকের “গণ” নিরূপিত হইয়া
থাকে। তাহাদের স্বভাব ক্রুর ও খল,
তাহাদের জন্ম কখন “দেবগণ” নক্ষত্রে হইতে
পারে না। তাহাদের জন্ম “রাক্ষসগণ”
নক্ষত্রেই সম্ভবপর এবং শরীরের তাপ,
খালাদির প্রধরতা তদনুরূপ হইবে। বাহারা
ধার্মিক, কপালু ও সত্বগুণবিশিষ্ট, তাহা-
দের “দেবগণ” নক্ষত্রেই জন্ম হইবে। শরীরের
স্নিগ্ধতা, আকৃতির সৌন্দর্য ও হৃদয়ের
উচ্চতা দেবোপম হইবে। স্বভাব মৃদু ও
কোমল জন্ম খাগ প্রাণীসাদিও স্নিগ্ধ ও
হৃদ হইবে। সুতরাং রাক্ষস ও দেবগণে
বিবাহ হইলে কখন “উত্তম মিলন” হইতে
পারে না। অহরহঃ দেবাসুরের জ্ঞান
বিবাদ ও নিধন সম্ভব। জ্যোতিষ শাস্ত্রে
বলে—জ্যৈষ্ঠপূর্বের “গণ” এক হইলে “উত্তম
মিলন”—“দেবগণ” ও “নরগণ” “মধ্যম
মিলন”, দেবগণ ও রাক্ষসগণ মিলন
“অধম মিলন”।

বিবাহকালে দম্পতীর কোষ্ঠী বিচারে
জন্ম তুর্ণের বিচার হইয়া থাকে। বর্ষ রাশি
অনুসারে হইয়া থাকে। জ্যোতিষে বলে
“বর্ষজ্যেষ্ঠা চ বা কস্তা বর্ষধীনশ্চ যঃ
পুমান্। তসৌর্ধিবাৎ মূহঃ ত্যং যগাসে

নরক সংশ্লিষ্টঃ বর্ণশ্রেষ্ঠা কস্তার সহিত
হীনবর্ণ পুরুষের বিবাহ কদাচ কর্তব্য নহে।
ভাহার কল ছয় মাসে মুক্ত, তৎপক্ষে সংশয়
নাই।

কোন নক্ষত্রে কোন কর্ম প্রশস্ত,
তাঁহা এদর্শনার্থ জ্যোতিষশাস্ত্রে উপরি-
উক্ত নক্ষত্রাদিকে প্রথমতঃ তিন ভাগে
বিভাগ করিয়াছে। যথা "উর্ধ্বমুখ" "অধঃ-
মুখ" ও "তির্য্যাকমুখ" নক্ষত্র। যক্ষ, শুভ
ইত্যাদি রোপণ, নক্ষত্রাদি দর্শন ইত্যাদি
যে সকল কর্ম উর্ধ্বমুখে অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহা
"উর্ধ্বমুখ" নক্ষত্রে প্রশস্ত। খননাদি কর্ম
বাঁহা অধোমুখে করিতে হয় তাঁহা "অধোমুখ"
নক্ষত্রে বিধেয়। আর "তির্য্যাকমুখ" নক্ষত্রে
বস্ত্রধরন, বাঁধবন্ধন ইত্যাদি কর্ম অনুষ্ঠেয়।

ইহা ব্যতীত উত্তানকর্ম, বাতকর্ম,
অগ্নিকর্ম, শজাদি প্রয়োগ যজ্ঞ ইত্যাদি
যারবার কর্ম কোন নক্ষত্রে প্রশস্ত,
এতৎ সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত
আছে। ক্রম বিক্রম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে
যে "ক্রমাক্ষে" বিক্রম নেষ্টো বিক্রমাক্ষে
ক্রমোপিত। গৌবনাসুগাখিনী বাতঃ
অশুভক্রমক্রমশতঃ ॥ "ক্রম" নক্ষত্রে বিক্রম
করা বিধেয় এবং "বিক্রম" নক্ষত্রে ক্রম
করা অবিধেয়। গৌবন (রেবতী) অসুপ
(পূর্নমাচা) অশ্বিনী, বাত (বাতী) শ্রব
(শ্রবণা) ও চিত্তানক্ষত্রকে "ক্রম" নক্ষত্র
কহে। তদ্ব্যতীত অবশিষ্টকে "বিক্রম"
নক্ষত্র কহে।

পূর্নোক্ত ভাগত্রয় ব্যতীত চর, ধ্রু,
মহু, ক্ষিপ্র ইত্যাদি বান্য ভাগে নক্ষত্রগণ
বিভক্ত হইয়াছে।

চর নক্ষত্রে বিচরণাদি, অশ্ব-গজাদি
আরোহণ ইত্যাদি কর্ম; ধ্রু বা স্থির
নক্ষত্রে দেবস্থাপন ইত্যাদি স্থির কর্ম ও
বশনাদি বীজকর্ম প্রশস্ত। ক্রুর বা উগ্র
নক্ষত্রে বাতকর্ম, অগ্নিকর্ম, বিন ও শজাদি
প্রয়োগ ইত্যাদি ক্রুর কর্ম; মুহ নক্ষত্রে
গীত বাজ ও মিত্রবণাদি কর্ম বিধেয়।
ক্ষিপ্র বা লঘু নক্ষত্রে পণা, রতি, শিল্প
কলাদি কর্ম; আর ভীষ্ম বা দারুণ নক্ষত্রে
বাত, জেদ, অতিচারাদি উগ্রকর্ম অনুষ্ঠেয়।

অনন্তকায়াদি গঠন, মুদ্রাপাতন, বজ্র
প্রোক্ষাদি ইত্যাদি কর্ম, এমন কি অনতি-
কারের নিবেদন গল্পসময়ে তাঁহার নির্মাণ
কর্ম কোন নক্ষত্রে আনন্ত করা বিধেয়,

১। উত্তর ত্রয় অর্থাৎ উত্তরফল্গুনী,
উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরাষাঢ়া ও রোহিণী,—
"ধ্রু" বা স্থির নক্ষত্র।

২। বাতি, অদিতি (পুনর্ধ্রু) শ্রবণা,
ধনিষ্ঠা ও শতভিষা "চল" বা "চর নক্ষত্র"।

৩। পূর্নত্রয় অর্থাৎ পূর্নফল্গুনী, পূর্ন-
ভাদ্রপদ ও পূর্নমাচা তরশী ও মঘা,—
"ক্রুর" বা "উগ্র" নক্ষত্র।

৪। বিশাখা, কৃত্তিকা ও মৃগশিরা
"মিশ্র" বা "সাধারণ" নক্ষত্র।

৫। হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যা "ক্ষিপ্র"
বা "ক্রুর" নক্ষত্র।

৬। মৃগশিরা, রেবতী, চিত্তা ও অশু-
রাধা "মুহ" বা "সৈন্য" নক্ষত্র।

৭। মূলা, জ্যেষ্ঠা, আর্জা ও অশ্বিনী
"ভীষ্ম" বা "দারুণ" নক্ষত্র।

(মুহুর্ভ চিত্তাশিপি, নক্ষত্র প্রকরণ)
অতিক্রম নক্ষত্রের সহিত আর্ঘ্যক্রমোক্তিতে
মানবজীবনের সহিত কোন সম্বন্ধ স্থাপিত
হয় নাই। (লেখক।)

তাহা পৃথাকপৃথাক রূপে উল্লেখিত হই-
রাছে।

আর্যাবল্যোত্তরে অতিক্রম সহ ২৮
আটাইশ নক্ষত্রের ২৮ টী অধিষ্ঠাতা দেবতা
উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাদের নামোল্লেখ
নক্ষত্রাদিরও বোধ হইয়া থাকে। অধিনীর
অধিষ্ঠাতা দেবতা অধিনীকুমার, ভরগীর
বন, কৃত্তিকার অগ্নি, রোহিণীর ব্রহ্মা,
মৃগশিরার চন্দ্র, জ্যেষ্ঠীর শিব, পুনর্ভঙ্গ
অদিতি, পুচ্ছার বৃহস্পতি, অশ্লেষার অনন্ত,
মঘার পিতৃলোক, পূর্বফল্গুণীর দোনি,
উত্তরফল্গুণীর অর্ঘ্যাসা, হস্তার সূর্য্য, চিত্রার
শুক্লা, স্বাতীর বায়ু, শিষ্যার শক্র, অম্বু-
রাধার মিত্র, জ্যেষ্ঠার ইন্দ্র, মৃগার নৈঋতি,
পূর্বাষাঢ়ার তোর, উত্তরাষাঢ়ার বিশ্ব,
অভিজিতের বিধি, শ্রবণার বিষ্ণু, ধনিষ্ঠার
বহু, শতভিষার বরুণ, পূর্ণাভাদ্রপদের
অশ্রুতপাত, উত্তরাভাদ্রপদের অহিব্রহ্ম,
ও রেবতীর পুনা অধিষ্ঠাতা দেবতা।

(মূর্ত্ত চিন্তাসাধন)

(ক্রমশঃ)

শ্রীবহ্নাপ দে।

বিশ্ব-প্রেম ।

(পূর্বাভ্যুত্থিত)।

একশ্রেণী আধামিগের মধ্যে একপ্রাণতা ও
স্বাভাবিক শিক্ষা করিতে হইলে আগে স্বীয়
ব্যক্তিগত করিতে শিক্ষা করিতে হইবে।
অনেকে হস্ত এই স্বার্থত্যাগের কথা শুনিয়া

বিরক্ত হইবেন, তাঁহারা; বলিবেন স্বার্থ
ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব; বাণিজ্য, কৃষি,
বিজ্ঞান জনিত সমস্ত উন্নতির এবং একতার
কারণ বা মূলত স্বার্থ। ইউরোপ আমেরিকার
মধ্যে যে সমাজের একতা আছে, উহা কি
স্বার্থশূন্য? তবে সীচ স্বার্থ না; বর্ণেরা উচ্চ
স্বার্থ বলিতে পারেন। একবার উক্তর এই,
পুরাকালের আঘা মর্ষি, রাজর্ষি ও ধর্ম্মান
কালের হিসাশরবাণী আর্ঘ্য, মহাত্মগণের
মহাপ্রাণতা ও বিশ্বপ্রেমিকতার সহিত
পাশ্চাত্য দেশের একতার অনেক প্রভেদ
আছে। আর্ঘ্যদিগের মহাপ্রাণতা ও বিশ্ব-
প্রেমিকতার দ্বারা আত্মার সীমা উন্নতি
হয়। ক্ষুদ্র জ্ঞান, বৃহৎ জ্ঞানে ও ক্ষুদ্র আশিষ্ট
বৃহৎ আশিষ্ট বা বিরাটত্ব পরিণত হয়
এবং আধ্যাত্মিক বা অহর্জগৎ আলোকিত
হয়। আর পাশ্চাত্য প্রদেশের একতা
দ্বারা জাতির বা সমাজের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ,
রাজ্য, সম্ভ্রম ও ক্ষমতা লাভ হয়, তদ্বারা
বাহু জগৎ আলোকিত হয়। আর্ঘ্যগণের
একপ্রাণতা দ্বারা বহু আশিষ্ট এক আশিষ্ট
পরিণত হয়। উহার সহিত স্বার্থের কোন
সংশয় নাট। উহা বিশ্বার্থ প্রেম। জীব
জন্ত উদ্ভিদ প্রভৃতি সকলের উপর সমান
স্নেহ। ঐ দেখ ঋগবেদে কি আছে। আর্ঘ্য
ঋষিগণ সমিধ ও পুণ্যচরন কালে বৃক্ষের
নিকট যোড় হস্তে আর্ঘ্যনা করিতেছেন,—
“দেব এবং গিত্ত্বার্থার্থে তোমাদিগের
নিকট হইতে কিঞ্চিৎ পুশ্য ও সুশিধ জিকার
প্রয়োজন, তোমরা লক্ষ্যে চিত্তে উহা
আমাকে দান কর। আজ কাল সমস্ত
বিশ্বের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন:

যে উহা পাকানী, কিন্তু উহাতে যে বিশ্ব-
জনীন গেম ও মহাপাণ্ডা আছে, তাহা
তাঁহারা কি বুঝিবেন ? এ দিকে আর্ধ্যদিগের
কাব্য নাটকের মধ্যে মহাপাণ্ডা দেখিতে
পাইবে। কহুস্থলা শকুন্তলাকে পতিগৃহে
পাঠাইবার সময় পুষ্পবৃক্ষকে লক্ষ্য করিয়া
বালিতেছেন, যথা—

কাঞ্চণঃ, তো ভোঃ সন্নিহিতাশ্রপোবনো-
তরবঃ ।

পাতুং ন পথমং ব্যবস্রতি জলং বুয়া সপী-
তেষুশা ।

না দ্বন্দ্বৈ প্রিয়সঙনাপি তবতাং মেহেন
যা পল্লবম্ ॥

আদ্যোবঃ কুহুম প্রসূতি সময়ে যশ্রা ভব-
ত্বাংসবঃ ।

সেরং বাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্পিঁরমু-
ক্তারতাং ॥

“যে শকুন্তলা ভোগাদিগকে জলপান
না করাইয়া নিজে জলপান করিতেন না,
বিনি অভ্যস্ত জলকারিপ্রিয়া হইলেও প্রেহ
বশতঃ তোমাদের একটি পল্লবও গ্রহণ
করিতেন না, যখন তোমাদের প্রথম পুষ্প-
উদগম হইত, তখন বাঁহার আনন্দ উৎসবের
লীলা থাকিত না, সেই শকুন্তলা পতিগৃহে
বাইতেছেন, তোমরা সকলে অহুসোদন
কর ।”

কি বিরাট প্রেম ! এই বিরাট প্রেমের
অর্থ কেবল সেই আর্ধ্যবিগণই বুঝিয়া-
ছিলেন। হায় ! সেই আর্ধ্যবিগণই বা
কোঁথার, আর তাঁহাদের অবোধ্য বংশধর-
গণ এই সুরকের বিষয়-কীট আনয়নই বা
কোঁথার ? কি পাণে যে আর্ধ্য আর্ধ্যুনি

মহাপাণ্ডাশূত্র,—পুত্রিগন্ধমর অগান ভূমিতে
পরিণত হইরাছে, জানিনা। এক্ষণে আর্ধ্য-
ভূমি আবার কি ধর্মজীবন লাভ করিবে ?
জানিনা বিধাতার মনে কি আছে। পক্ষান্তরে,
পাশ্চাত্য জগতের একতা অন্তরূপ, তদ্বারা
প্রাণের সহিত প্রাণের মিল নাই। দুইটি
আর্মি কখনই এক হন না। পরম্পরের
জীবন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহাদের একতা,
স্বার্থের অহুরোধে। অবশ্য তাঁহাদের এক
এক জাতীর মধ্যে বৈষয়িক একতা অতি
চমৎকার আছে। তাঁহারা জাতীর বৈষয়িক
স্বার্থের নিমিত্ত আত্মবলি পর্য্যন্ত দিতে
পারেন, আনশ্রকনত তাঁহাদের স্বীয় স্বার্থ
জাতীর স্বার্থের অগ্রভূঁত করিয়া জাতীর
উন্নতি সাধন করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের
মূল উদ্দেশ্য স্বীয় স্বাধীনতা। তাঁহাদের
জাতীর স্বাধীনতা রক্ষা হইলে, তাঁহাদের
নিজের স্বাধীনতাও রক্ষা হয়। তাঁহাদের
জাতীর ধনসম্পত্তি, রাজ্য-সমৃদ্ধি, ক্ষমতা
বর্দ্ধিত হইলে, তাঁহাদের নিজেরও ধন,
সম্পদ, সমৃদ্ধি, ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়। তাঁহাদের
রাজ্য কেবল তাঁহাদের কার্যনির্বাহক
মাত্র। সকল জাতির মধ্যে রাজ্যও নাই,
তাঁহারা জাতীর সভা সংস্থাপন করিয়া
ঐ সভা দ্বারাই রাজ্য শাসন হয়। ঐ
সভার সভাপতিই রাজ্য কার্য নিরীহ
করেন। প্রকৃত পক্ষে মূলে এক বংশোদ্ভব
বা এক জাতীর লোক অন্ত জাতির প্রতি-
যোগী স্বরূপ তাঁহাদের জাতির উন্নতা,
ধন, মূল ও গৌরব বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহারা
একতা সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহারা
জাতীর স্বার্থের দিকটু তাঁহাদের স্বীয়

স্বার্থ স্থান পায় না। তাঁহাদের একতার স্রোত, তাঁহাদের জাতীয় সীমার মধ্যে অবস্থিত। ঐ সীমার হইদিকে ছুটটি প্রচুরী আছে, এক দিকের প্রচুরী ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া জাতীয় একতা রক্ষা করে, অন্যদিকের প্রচুরী উহা জাতীয় সীমার বাহির হইতে দেয় না। প্রকৃতপক্ষে উহাকে বিশ্বজনীন জাত্যভাব বা মহাপ্রাণতা বলা যায় না। উহা স্বার্থমিশ্রিত একতা। উহা অস্থায়ী। বেহেতু তৌতিকঃ; পদার্থ মাজেই যখন অস্থায়ী, তখন ধনসম্পদের জন্ত বে একতা, তাহা অস্থায়ী ব্যতীত কি হইতে পারে? কিন্তু উহা অস্থায়ী হইলেও তৌতিক জগৎ সম্বন্ধে কতকটা স্থায়ী বটে। বেহেতু ধনসম্পত্তি বা স্বার্থের নিমিত্ত জড়-বিজ্ঞানের এবং বিষয় সংমিশ্রিত—অর্থাৎ বৈবয়িক জ্ঞান, বুদ্ধি, বুদ্ধি, ব্যবস্থা, নির্দী-চন, নীতি বিচার প্রভৃতির যে উন্নতি সাধিত হয়, তাহা সমাজের পক্ষে দীর্ঘকাল স্থায়ী বটে। রোম ও গ্রীস ধ্বংস হইলেও তাহাদের বিষয়নীতি ও বিষয়বিজ্ঞান প্রভৃতি একেবারে ধ্বংস হয় নাই। সেই সকল নীতি ও বিজ্ঞানের মাল মসলা হইতে ইরোরোপীয় তির তির জাতীয় সমাজ-ভিত্তি সংস্থাপিত ও জাতীয় অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। বাহা হউক, একদে আমা-মিশরের জ্ঞান উদ্দেশ্যত্ব হৃত প্রাণ, অকর্ণণ্য, স্বভাবতঃ হিংসক জাতির অপেক্ষা, পাশ্চাত্য একতা বে প্রেষ্ঠ, তাহার আর হিন্দু রাজ পক্ষেই নাই। ঐ একতার গুণে তাঁহারা তৌতিক জগতের উপর অনেক আবিপত্য দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু

আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহারা নিতান্ত দীন। তাঁহারা বক্রপ জাতীয় ও, রাজনৈতিক জীবন লাভ করিয়াছেন, ধর্মজীবন তক্রপ লাভ করিতে পারেন নাই। এখনও এই মৃত-প্রায় অধঃপতিত দীন হীন জাতির নিকট অধ্যাত্ম ধর্মজীবনের কার্যকলাপ অনেক-কাংশে শিক্ষা করিতে পারেন। তাহাদের মধ্যে জাতীয় একতা আছে বলিয়া, অস্ত-কির্ষন, চৌর্গা, দম্ভাভা, নরহত্যা ও অত্যাচার পাণ তাহাদের মধ্যে বা সমাজে বে নাই, ইহা কেও মনে করিয়েন না; তাঁহারা সচরচর জাতীয় জীবনের হিরুদ্ধে কোম কাণ্য করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সম্ভ্রমার মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি-গণ নৈতিক জীবনও কিছুমাত্র লাভ করিতে পারেন নাই। ঐ নিকট সম্ভ্রমার মধ্যে পাপ-শ্রোত এতই প্রবল বে, তাহা শুনিলে লোম-হর্ষণ হয়। তাহার কারণ ধর্মজীবনের অভাব। ঐ সকল লোমহর্ষণ চির যিনি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যিনি বেগেটের প্রবৃত্ত কলিকাভার করেকটা লেকচার পাঠ করেন। তাহাতে সমস্ত দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদের বে সকল সদৃশ্য আছে, তাহার অধি-কাংশই আমরা প্রাপ্ত হই নাই; কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের চাতুরী ও নিকট দোষ-গুলি শিক্ষা করিয়াছি এবং আড়ম্বরপ্রিয় ও বাহ্যিক সুখসম্পদ প্রার্থী হইয়া পড়ি-য়াছি। আবার কৌশলে পরজন্ম হরণ ও পরকে বঞ্চনা করিতে পারিলে আমরা বাহ্যস্থরী বলিয়া মনে করি। তাহাদের মধ্যে ঐ সকল দোষ থাকিলেও তাঁহারা স্বাধীন স্বতন্ত্র জাতীয় জীবন লাভ

করিল, প্রত্যেক ব্যক্তিকে কার্যদক্ষ, কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। এমন কি, পিতা-মাতা পুত্রেরও মুখাপেক্ষী হইরা রহেন না। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের ও কার্যদক্ষতার অভাব তেহু আমরা আত্মনির্ভরশক্তিহীন হইরাছি। তাহাতে পরমুখাপেক্ষিতা অথচ অক্ষয়করণবিষয়কার আমরা চরমর বাহির হইরা পড়িয়াছি। তবে সুখের বিষয় এই যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের ধর্মবীজ একেবারে উভারত হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। পাশ্চাত্য একতা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আলোচনা দ্বারা আমাদের বুদ্ধি মার্জিত হওয়ার, যুগান্তিত শুভপন জানিতে উচ্চ হইয়াছে। ক্ষেত্রান্তরেও শুভপন আছে। ক্ষেত্র গ্রাস্ত হইলে বীজ (বনন একেবারে নষ্ট হয় নাই, তখন) নিশ্চয়ই অক্ষয়িত হইবে। এখন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, পাশ্চাত্য প্রদেশে মহাত্মা বীজ আর্দ্রদিগের আদর্শে বিশ্ব-প্রেমিকতার বীজ আর্দ্রদিগের নিকট হইতে লইয়া একেবারে বপন করিয়াছিলেন, সে বীজের ফল কলে মাই কেন? এখন পাশ্চাত্য দেশে ভূমি কর্বণের বয় প্রস্তুত হইয়াছে, তবে সে বীজের উপযোগী ফল হয় না কেন? তাহার কারণ, ঐ বীজ উহার দেশের ক্ষেত্রের উপযোগী নহে। সিলেটের কমলার বীজ এদেশের ক্ষেত্রের উপযোগী নহে। সিলেটের কমলার বীজ এদেশের ক্ষেত্রে বপন করিলে, সিলেটের কমলার জ্ঞান এখনই হয় না। অন্তরূপ হইয়া যায়। এই অন্ত বীজের মহাপ্রাপ্ত বীজের বৈবদিক কেহই মাল মগলার

শুণে উহা স্বার্থমিত্রিত জাতীয় একতার পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশের ক্ষেত্র-অন্তরূপ, আমাদের বদেশীয় ক্ষেত্রে অন্ত জাতীয় বিদেশীয় মালমগলা সংমিশ্রিত হইয়াছে, তদ্বারা ক্ষেত্রের স্বাভাবিক শুণ স্রষ্ট হইয়া ক্ষেত্র এক পক্ষে আওবিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ সমাজের অধিকাংশ (এমন কি, শতকরা নবতিতম) লোকের মধ্যে স্বার্থান্বেষা, বিবাদ, ফলহ, মামলা, মোকদ্দমা প্রভৃতি আনন্দিত্যকে আক্রমণ করায়, সমাজ ধোর-তর বিকারপ্রস্তু যোগীর ন্যায় হইয়াছে। মহাজন-খাতকের সর্নাশ করিতে, খাতক-মহাজনকে ডুবাতে, জমিদার প্রভার অগিষ্ট-করিতে ও প্রমা জমিদারকে ফাঁকী দিতে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে বধনা করিতে কৃত সংকল্প হইতেছে; তাহাতে মোকদ্দমার প্রোক্ত প্রবণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে; তাহা নিবারণের নিমিত্ত কুইনাইনের জ্ঞান নুতন নুতন আইন, আদালত ও সভা-সমিতির বস্তই পিতার হইতেছে, ততই ঐ অশান্তি দেশব্যাপী ম্যালেরিয়ার জ্ঞান চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে। অন্তপক্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বারা বুদ্ধি, মার্জিত হওয়ার ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাদি দৃষ্টে আমাদের অনুশ্য গ্রন্থাদির প্রতি দৃষ্টি-গণ্ডার এবং মহাত্মাগণের সমরোচিত শিক্ষা দৈবদর্শীর জ্ঞানসেই পুরাতন বিশ্বজনীন প্রেমের কথা সমাজের অতি অল্পাংশ (অর্থাৎ কম-মহাজনের মধ্যে একজন) লোকের অন্তরে প্রবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃহৎসংখ্যার একবার উকিত হইয়া, তৎকালে

হইতেছে। তাহারাই ফলস্বরূপ এই বর্তমান
 ক্রতভাগ্য প্রদেয়ে পূর্নস্বত্বি জাগরিত করি-
 বার জন্য সেই অমূণ্য মহা পাণ্ডতা ভ্রাতৃত্বাব
 ও বিশ্বজনীন পেমের কথা তুলিয়া আজ
 সুরং কান্দিতে ও ভ্রাতাগণকে কান্দিতে
 দাঁড়াইয়াছি। ইহাতে যদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে
 • কাহানও বিন্দুগাত্র অশ্রুপতন হয়, তবে
 শ্রম সার্থক জ্ঞান হইবে। ভ্রাতৃগণ! জগতে
 এমন কোন ঔষধ নাই, বাহা একবার মাত্র
 সেবন করাইয়া কেহ পুরোক্ত ম্যালেরিয়া-
 গণীভিত দেশের সান্নিপাতিক নিকার-
 গ্রস্ত রোগীর রোগ আরোগ্য করিতে পারে।
 আপাততঃ ঔষধ যাহাতে গলাধঃকরণ হয়,
 তাহাট আনন্দক; কিন্তু তাহা করিতে
 হইলে অগ্রে এক এক বিন্দু জল গলাধঃকরণ
 করাইয়া রোগীর শুষ্ক কণ্ঠ ও হৃদয় একটু
 সরস করিয়া অস্তিম কালের রোগিন্দুর
 প্রায়োগান্তে রোগীকে একটু চেতন করিয়া
 অন্ন অন্ন উত্তেজক ঔষধ দ্বারা ক্রমে বলাধান
 করিতে হইবে, তদ্বিন্ন একেবারে উত্তেজক
 ঔষধ দিলে রোগী মারা যাইতে পারে।
 এইজন্য বলি ভ্রাতৃগণ! বিশ্বজনীন পেম
 শিক্ষার পূর্বে সর্বাঙ্গে স্বীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা,
 মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী ও আত্মীয়
 স্বজনের উপর পেম শিক্ষা কর; আত্মস্থখ
 তুলিয়া গিয়া জ্ঞান-উপারে অর্থ উপার্জন
 দ্বারা তাহাদের সুখী করিতে চেষ্টা কর;
 তদনন্তর স্বগ্রামবাসী ও নিকটবাসী জন-
 গণের হিতের ও সুখের নিমিত্ত নিদের ও
 আত্মীয় পরিবারের সুখ তুলিয়া গিয়া কার-
 মনোবাক্যে তাহাদের হিত ও উন্নতির
 চেষ্টা কর। ঐক্য এক একটা ক্ষুদ্র

আমিকে বিস্তার ও বৃহৎ আমিত্বে পরিণত
 কর। তোমার আমি হই হইজন, দশজন,
 বিশজন, ক্রমে সহস্র সহস্র জনের অন্তরে
 মিশাইয়া তাহাদের সহিত একপ্রাণ হইতে
 চেষ্টা ও শিক্ষা কর। হে ধনিমহাশয়গণ!
 দরিদ্রগণকে সম্ভানের জ্ঞান পালন করিতে
 শিক্ষা করুন। প্রথমতঃ আপনাই অগ্রে
 স্বার্থ ত্যাগ ও ক্ষমা শিক্ষা করিয়া সমাজকে
 শিক্ষা দিউন। কিন্তু যাহাদিগকে আপনারা
 দয়া অমুগ্রহ ও ক্ষমা করিবেন, তাহারাই
 ক্রমেই আপনাদের বশীভূত হইবে। তাহারা
 যতই পান্ড হউক না কেন, ক্রতভাগ্য
 সাধনের একটা স্বাভাবিক বৃত্তি। দয়া, ক্ষমা,
 অমুগ্রহ করিতে করিতে নিশ্চয়ই তাহারা
 ক্রতভাগ্য গলিয়া আপনাদের দামামুদাম
 হইবে।

ঋষিগণ যখন তপোবনে সিংহ, বায়্র
 দিগকে বশীভূত করিয়া তপোবনের শান্তি
 স্থাপন করিতেন, তখন আপনারা কিঞ্চিৎ
 স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করিয়া, দয়া, পেম,
 ক্ষমা দ্বারা সমুদয়কে অবশ্বই বশীভূত করিতে
 পারিবেন, এবং আপনাদের আদর্শে তাহা-
 দের চরিত্র ও নিশ্চয় গঠিত হইবে। তাহা-
 দের মধ্যে অন্তর্নিরোধ ভ্রাগ ও ক্রমেই
 ক্রতভাব সংস্থাপিত হইবে। শিবাদ, কলহ,
 অশান্তি সমাজ হইতে ক্রমেই তিরোহিত
 হইবে। এই যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা স্ক্রাদালতে
 ব্যয়িত হইতেছে, উহা দ্বারা জগতের অনেক
 সংকার্য সাধিত হইতে পারিবে। যদি আমরা
 এইরূপ সমাজে ভ্রাতৃত্বাব সংস্থাপন ও পেম
 বিস্তার করিতে পারি, তবে আমরা ক্রমেই
 আত্মদিগের পূর্নপিতামহগণের সেই বিশ্ব-

জনীন বিরাট প্রেমের অধিকারী হইতে পারিব। মর্ত্যভূমির পুত্রিগন্ধ দূরীভূত হইবে। অর্থাৎ সত্যযুগ পুনরাগমন করিবে। স্বর্গীয় সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইবে। ভ্রাতা-গণ, এই গুরু কার্যক্ষেত্র—তোমাদের হিন্দু-স্থান। জগৎগুরু মহাশ্রীগণ তোমাদেরই পূর্বপুরুষ, তোমাদের আশ্রয়শক্তি জন্মভূমি হিমাচল, সেই হিমাচলে তাঁহারা বাস করেন। তোমরাই তাঁহাদের প্রকৃত শিষ্যের উপযুক্ত। হে ভ্রাতৃগণ, আর আশ্রয়শক্তি হইও না, ক্রমে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর, নিশ্চয়ই বীজ অঙ্কুরিত হইবে, এবং ধর্ম বৃক্ষের আধ্যাত্মিক ফল তোমরা বা তোমাদের বংশধরগণ ভোগ করিয়া সমগ্র জগতে ঐ আধ্যাত্মিক ফল বিতরণ করিতে পারিবেন। তোমাদের আদর্শে ভিন্ন দেশে ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং ধর্ম ফলের বীজ ক্রমে অঙ্কুরিত ও ধর্ম বৃক্ষে পরিণত হইয়া সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

শ্রীশশিভূষণ বল্লভ্যোপাধ্যায়।

আভিধর্ম বা বৌদ্ধদর্শন।

(পূর্বাভূতি।)

বিজ্ঞান স্কন্ধ।

সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের ভেদ প্রদর্শন স্থলে বিজ্ঞান কতক লক্ষিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের সম্যক লক্ষণা বৌদ্ধশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ অভিধর্মের লক্ষণ কেবল কতকগুলি সম্যক প্রতীক্ষণের উল্লেখ মাত্র।

যেমন, ‘কন্মো-কুগনা, সম্ফুগনা, সম্ফুসিতত্ত’। ইহাতে বিশেষ কিছুই অর্থাৎ হইত না। অট্টকণায় অশ্য ঐ সমস্তের অর্থ বিবৃত হইয়াছে। বুদ্ধবোধে বিশুদ্ধিমাগ্নে অনেক পদার্থের লক্ষণ করিয়াছেন,* কিন্তু বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ লক্ষণা কুরাপি লক্ষ হইত না। বাহা হউক, সংজ্ঞা ও বেদনার পর তাহাদের লক্ষণ প্রতিবেদ পূর্বক জ্ঞান এবং যাবতীয় মনোভাবের (ইচ্ছাদি) জ্ঞানই বিজ্ঞান;* বিজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ গৃহীত হইতে পারে। মন ও চিত্ত বিজ্ঞানের অধিবচন। ধর্মসম্বন্ধিতে চক্ষু, শ্রোত্র, স্রাণ, জিহ্বা ও কায়, এই পঞ্চ বিষয়ক বিজ্ঞানকে এবং মনোধাতু ও মনোবিজ্ঞান ধাতুকে চিত্ত বলা হইয়াছে। এই ধাতুদ্বয় না বুঝিলে অভিধর্মের কিছুই বুঝা হয় না; তজ্জন্য উহাদের বিবরণ করা বাইতেছে—‘সম্পটিক্কন কিচ্চা মনোধাতু’। সত্ত্বীরগাদি কিচ্চা মনো বিঞ্ঞাণ ধাতু’ (বি। ১৪); চক্ষু বিঞ্ঞাণাদিনং অনস্তরা রূপাদি বিজ্ঞনণ লক্ষণা মনোধাতু’। ‘মনোধাতু পঞ্চসুপি রূপাদিসু পবত্তত্তি;’ ‘মনোবিঞ্ঞাণ ধাতু ছত্ততি।’ ‘তথ চক্ষু বিজ্ঞাণাদি পুরে চর রূপাদি বিজ্ঞানন মনোধাতু’; অর্থাৎ

* অভিধর্মের পারিত্যাবিক শব্দ দিয়া পালিতে বিজ্ঞানের এইরূপ লক্ষণ হইতে পারে—‘লক্ষণ পতিবেধতো ছিব্বারস্মণঞাণং বিজ্ঞানন লক্ষণং বিঞ্ঞাণং।’ অর্থাৎ রূপাদি পঞ্চ ও ধর্মারস্মণ এই বড়বিধ আরস্মণের বে লক্ষণ ও প্রতিবেদ পূর্বক জ্ঞান, তাহাই বিজ্ঞান।

পূরে চর প্রত্যক্ষ রূপাদির + সম্পট্চ্ছন-
কারক অর্থাৎ রূপাদিরা যথার একত্র মিলিত
ভাবে গৃহীত হয়, তাহাই মনোধাতু। উহা
রূপাদি পঞ্চ বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, এই উক্তির
দ্বারা উহা সাংখ্যের প্রত্যক্ষ বিষয়ের তুল্যা
হইল †। মনোবিজ্ঞান ধাতুর কার্য সস্তীরণ
ও তদারম্ভণ। “সম্মা ভীরেতী যথা সম্পটি-
স্থিতঃ রূপাদিঃ আরম্ভণঃ বীমংসতীতি সস্তী-
রণঃ” অর্থাৎ মনোধাতুর দ্বারা সম্প্রতীচ্ছিত

+ “পঞ্চবিঞ্ঞঞাণ গহিতং রূপাদি আবম্ভণং
সম্পট্চ্ছতি তদাকার পবস্তির্যতি” (বিভা)
। ১ । ১ । অর্থাৎ চক্ষুরাদি পঞ্চ বিজ্ঞান ভাবে
গৃহীত রূপাদি বিষয়কে সেই সেই রূপে
প্রবর্তিত হইয়া যে সম্প্রতীচ্ছন বা সমনয়ন
করা, তাহাই সম্পট্চ্ছন। পঞ্চ বিষয় ইহা
দ্বারা একত্র মিলিত করিয়া গৃহীত হয়।
(Sensorium commune)

‡ সাংখ্যের প্রত্যক্ষ আলোচন জ্ঞানের পর
হয়। বোধের নীল পীত সংজ্ঞা প্রথমে
হয়, পরে নীল পীত বিজ্ঞান হয়, পরে সেই
নীল পীত ধর্ম একত্র লইয়া কোন পদার্থে
বিজ্ঞান হয়। শেখোল বিজ্ঞান মনোধাতুর
কার্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সব বিষয়ের উদা-
হরণ না থাকাতে এবং বর্তমান বৌদ্ধ
পণ্ডিতগণের পুস্তকের বাহিরে একপদও
বাইবার সামর্থ্য না থাকাতে, এই বিষয় কতক
অনিশ্চিত। সাংখ্যের প্রত্যক্ষ শুদ্ধ জ্ঞান
যদি নহে, কিন্তু উহা প্রমাণ অর্থাৎ জ্ঞান-
মান বিষয়ের সত্তা নিশ্চয়। বোধের
মনোবিজ্ঞান ধাতু কতক প্রমাণ। নীলতা
(নীলের ভাব অর্থাৎ অভেদে ভেদার্থক
শব্দজ্ঞান) সাংখ্যের বিজ্ঞান। “নীল
আকাশ আছে, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
বোধের সংজ্ঞাকে percept রূপাদি
বিজ্ঞানকে sense perception এবং মনো-
ধাতুর কার্যকে রূপাদি বিষয়কে conception
বলা বাইতে পার।

(সম্প্রতীচ্ছিত) রূপাদি বিষয়কে নীমাংসা
করা বা গবেষণার দ্বারা নিশ্চয় করা সস্তীরণ।
যখন সস্তীরণ হইলে তাহার আরম্ভণে
(বিষয়) জবন (জবমানসৃষ্টির পবস্তি)
অর্থাৎ প্রবৃত্তি বা চিন্তের গতি হয়; তখন
সেই জবনের বিষয়কে—অর্থাৎ বাহ্যতে
চিন্তের প্রবৃত্তি হয়, একরূপ “ফুট বিষয়কে
তদারম্ভণ বলে। ইংরাজেরা মনোবিজ্ঞানকে
representative intellection বলিয়া
অনুবাদ করেন।

এই মনোবিজ্ঞান ধাতু, মনোধাতু ও
চক্ষুরাদি পঞ্চ বিজ্ঞান লইয়াই চিত্ত বা
বিজ্ঞান স্বরূপ। অর্থাৎ সংজ্ঞা, বেদনা, রূপ
ও সংস্কার স্বদের বিমিশ্র জ্ঞান এবং
বিজ্ঞানেরও পুনর্জ্ঞান (re-representa-
tion) বিজ্ঞান স্বরূপ বা চিত্ত হইল। মিলিত
প্রশ্ন গ্রন্থে বিজ্ঞানের এইরূপ উপমা আছে,
যেমন নগর মধ্যস্থ গিআটকে (চতুস্তম্বে)
স্থিত নগররক্ষক উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও
পশ্চিম, এই চতুর্দিক হইতে আগত সমস্ত
পুরুষদের দেখিতে পার, সেইরূপ চক্ষু,
শ্রোত্র, ঘ্রাণ, ক্রিহ্বা ও কায়ের দ্বারা যথা-
ক্রমে রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস ও স্পষ্টব্য বিষয়ের,
দর্শন, শ্রবণ, আভ্রাণ, আবাদ ও স্পর্শন হয়
এবং পরে উহাদের বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান
হয়। অন্যত্র “যঞ্চ মনসা ধর্মং বিজ্ঞানাত্তি
তং গিরিঞ্ঞঞানেন বিজ্ঞানাত্তি” অর্থাৎ
মনের দ্বারা যে ধর্ম জানা যায়, তাহাও
বিঞ্ঞঞানের দ্বারা বিজ্ঞান হয়।

এই বিজ্ঞান স্বরূপ ১২ অর্থাৎ ১২১ ভাগে
বিভক্ত হয়। এই বিভাগের দ্বারা কিন্তু
চিন্তের স্বভাবের বিষয় কিছুই অধিক জানা

বার না এবং এক সঙ্গে নানাদিক হইতে বিভাগ করিতে, উহা অনর্থক জটিল হইরাছে।

ভূমি, জাতি, সম্প্রদায় (সম্ভবতঃ), সংস্কার, ধান, আলম্বন ও মার্গ, এই সপ্ত পর্যায়সারে চিত্র বা বিজ্ঞান স্বরূপ বিভাগ করা হয়। বিজ্ঞানের স্বরূপ, লক্ষণ ও বিশ্লেষণ অত্র সকল স্পষ্ট করিয়া বলিয়া, পরে বথায়োণ্য প্রসঙ্গ স্থলে ধান আদির অন্তর্ভুক্তি করিলে অভিমর্শের জটিলতা অনেক হ্রাস হইত। বস্তুতঃ নৌকাদের যে ৮৯ বিভাগ, তাহা সর্পতোন্যাপী চবদ বিভাগ নহে এবং উহা নির্বাণতত্ত্ব বা সনস্কৃত্ত ব্ৰহ্মবিদ্যে তত স্পষ্ট উপায় নহে। তাহা হটক, সংক্ষেপতঃ ঐ বিভাগ-প্রণালী দেখান বাইতেছে:—

(১) ভূমি—কামাবচর, রূপাবচর, অরূপাবচর ও লোকোত্তর, এই চারি। সাদ-রণ দেব-সমুদায়দির যে কাম্য বিষয়, তদাত্মক লোক সকল কামাবচর। “হেটুটিতো অর্থাচিনন্নয়ঃ উপরিত্তে পরিনির্শিত বসবত্তি দেবে” (৬) ইত্যাদি হটতে জানা যায়, অর্থাচিনন্নয়ক হটতে পরিনির্শিত বসবত্তী দেবলোক পর্যায় (যোগসত্তের সাহেজ্জ লোক পর্যায়) সমস্ত লোক কামাবচর। সাংখ্যের ভৌতিক বিষয়ের সহিত কামাবচর টিক মিলে।

রূপাবচর ভূমি নিয়ে ব্রহ্মলোক হটতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধ অকনিষ্ঠ দেবলোক পর্যায়। বাহার কাম্য বিষয় ভাগ করিয়া “রূপ” ধ্যান করেন, তাহাদের গতি ও স্থিতির লোকই রূপাবচর লোক। যোগ

সত্তে মহঃ, জন ও তপলোক। নৌকোর রূপ ধ্যান সাংখ্যের ভূত-তত্ত্ব ও বাহ্য-শ্রিয়ের তত্ত্ব ধ্যানের প্রায় তুল্য। অরূপাবচর ভূমি নিয়ে আকাশাত্মায়ত্ত্বপূর্ণ দেব হটতে উপরে-সম্ভ্রামংজী দেব পর্যায়। ইহা অরূপধারীদেব গতি ও স্থিতির লোক। ইহা যোগের সত্যলোকের অন্তর্গত। তন্মাত্র-তত্ত্ব, সানন্দ ও সশ্রিত সমাধি নৌকোর আকাশাত্মায়নের প্রায় তুল্য।

লোকোত্তর ভূমি নির্বাণের সাফল্য সাধন মার্গ। এই মার্গের সাধকেরা চারি ভাগে বিভক্ত—শ্রোত আশ্রম, গুরুনাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। যোগের সম্ভ্রামংজী ও অসম্ভ্রামংজী যোগের ইহা প্রায় তুল্য।

কামাবচরাদি চারি প্রকার ভূমিতেদে—সব্ব সকলের যে চিত্তভেদ হয়, তাহাই বিজ্ঞানের ভূমিতেদ।

(২) জাতি—কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত, উহার স্বধ, উঃখ, মৌগনস্য, দৌর্ধ্বনস্য ও উপেক্ষা সহগত হয়।

(৩) সম্প্রদায়—যে সমস্ত ভাব কোন একপ্রকার চিত্তে সম্ভাবী রূপে থাকে,

+ অলোভ, অধেষণ ও অমোহ কুশলমূল এবং লোভ, দ্বেষ ও মোহ অকুশলমূল। এই কয়টির নাম হেতু। সহেতু বলিলে ইহার কোনটি মূলে আছে, বুঝিতে হটবে। বিপাক ও ক্রিয়া অব্যাকৃত। বিপাক অর্থে ক্রমের ফল। ক্রিয়া অর্থে “ক্রম গন্তঃ” অর্থাৎ কেবল মনে করা মাত্র, বাহার ফলে বিশেষ কোন স্বধঃপ হয় না। সাংখ্যের স্বরূপবাহী তপস্বী ভাব, এই ক্রিয়ার সদৃশ। এই কয়টি বিষয় বিশেষ স্বরূপ রাখা আবশ্যিক।

ভাৱানাই সম্পূৰ্ণ ভাব। যেমন—দৃষ্টি (সিধ্যাজ্ঞান), প্রতিম বা বেদ-বিচিকিৎসা বা-সংস্কার, উদ্ধৃত বা উদ্ধৃত (বিবেকপান্থ্য) ও জ্ঞান।

(৪) সংস্কার অর্থে এ স্থলে চিত্তের উৎসাহ-ভাব বা মগ্নত্ব ভাব। “সম্মারোতি তিক্খ ভাবসজ্জাত থণুদ নিসেসেন মজ্জ্জতি তথ নথ কিচ্চে সংসীদমানপ্র চিত্তস্ব অম্মনলপ্রবানেন” ইত্যাদি (বিভাষিনি টীকা) অর্থাৎ অবসন্ন বা অপ্রসংগিত-চিত্তকে তিক্খ ভাবে মজ্জিত করাট সংস্কার। পর হঠক্বে অম্মনল পাণ্ডু হইয়া উৎসাহপূৰ্ণক কোন কাৰ্য্য করাট সংস্কারপূৰ্ণক কথা।

(৫) ধ্যান—নির্ভুক্ত, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা, এই পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ। দ্বৈত পঞ্চ অঙ্গযুক্ত ধ্যান পঞ্চম দ্বিতীয় নির্ভুক্ত-বর্জিত চারি অঙ্গ। তৃতীয় ধ্যান নির্ভুক্ত, বিচার, প্রীতি (মানস সুখ) বর্জিত। চতুর্থ ধ্যান সুখ ও একাগ্রতায়ুক্ত। পঞ্চম ধ্যান উপেক্ষা ও একাগ্রতায়ুক্ত।

(৬) আলম্বন—আকৃগাম্যমানের বিষয়। তাহারা চতুর্বিধ, যথা—আকাশানন্তায়তন বিজ্ঞানানন্তায়তন আকৃগম্যমানন্তায়তন, নৈবসংজ্ঞানা সংজ্ঞাননন্তায়তন। নির্লীণ প্রাসঙ্গে ইহাদের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইবে।

(৭) মার্গ বা লোকোত্তর মার্গ পূর্নোক্ত স্নোতমাগ্ন আদি।

এই মগ্ন পদার্থ অম্মন্যারে চিত্তের ভেদ করা হয়। তাহার কয়েকটি উদাহরণ দিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। কামাবচর কুণ্ডল চিত্ত (অগোভাদি চেতুক)

(১) মৌমনস্ত সহগত+জ্ঞান সম্পূৰ্ণ + অসংস্কারিক।

(২) মৌমনস্ত সহগত+জ্ঞান সম্পূৰ্ণ +সংস্কারিক।

(৩-৪) মৌমনস্ত সহগত+জ্ঞান বিপ-যুক্ত অসংস্কারিক এৱং সংস্কারিক।

(৫-৮) উপেক্ষা সহগত একরূপ। মহেতু কামাবচর কুণ্ডল চিত্ত এই চিত্ত প্রকার। বিস্তৃত মার্গে ইহাদের এক একটি উদাহরণ আছে। এতদ্বারা ১ম চিত্তের উদাহরণ এইরূপ—যখন কেহ দান ধর্মের সুকণ জ্ঞানিয়া অথবা অত্ম কোন মৌমনস্তের কারণে প্রীতি প্রসঙ্গে হইয়া দান করিলে মগ্নতা হয়, ইত্যাদি যথার্থ জ্ঞান পূৰ্ণক, পরের দ্বারা অম্মন্যারে হইয়া দানাদি করে, তবে সেই সময়কার তাহার সেই চিত্তের (thought complex) বিজ্ঞানচরণ চিত্তের উদাহরণ।

আর অসুককে দান করা—এইরূপে পরের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া দানাদি করা দ্বিতীয় চিত্তের উদাহরণ।

কোন শিশু যদি পীর কাতিদের দানাদি দর্শনে দানাদি ভাল জ্ঞানিয়া মৌমনস্ত পূৰ্ণক কোন শিশুকে সহসা হস্তান্তিত কিছু দেয় বা পণ্যম করে, তবে সেই চিত্ত তৃতীয়।

যখন “দাও” “বন্দনা কর” ইত্যাদি প্রকারে উৎসাহিত হইয়া শিশু দানাদি করে, তখন সেই চিত্ত চতুর্থ।

উপরোক্ত চারি ভাব মৌমনস্তসহগত, কিন্তু যখন মৌমনস্তের কারণ না থাকিতে উপেক্ষা পূৰ্ণক একরূপ দানাদি করে, তখন উপেক্ষা সহগত চারি চিত্ত হয়। ইহারা মহেতু কুণ্ডল কামাবচর চিত্ত।

কুণ্ডল রূপাবচর চিত্ত পঞ্চ প্রকার।

কামাবচর বেমন অকুশল হয়; রূপাবচর অরূপাবচর ও লোকোত্তর, সমাদি-সাদ্য বলিরা অকুশল হয় না। উহার হর কুশল না হয় অব্যাকৃত, এই দ্বিবিধ হয়।

কামলোকের ভাব তাগ করিয়া কেবল নীলাদি রূপধর্ম ধ্যানই রূপাবচর চিত্তের স্বরূপ। পূর্নোক্ত বিতর্কাদি পক্ষ ধ্যানাজ্ঞেদে এই রূপাবচর-ধ্যানাজ্ঞ চিত্তের পক্ষ ভেদ হয়। প্রথমটি পক্ষ ধ্যানাজ্ঞবৃত্ত, অবশিষ্টেরা এক এক অঙ্গচীন। পক্ষমটি উপেক্ষা ও একাগ্রতাসহিত।

অরূপাবচর কুশলচিত্তে পূর্নোক্ত আশা-সঙ্গরতনাদি চারি আকৃপা অংশধনে সমাধিত চিত্ত।

লোকোত্তর কুশল চিত্ত ও পূর্নোক্ত স্নোক্ত আপনাদি চারি লোকোত্তর মার্গ বিষয়ক।

এইরূপে কামাবচরাদি ভূমিভেদে কুশল চিত্ত একুণ প্রকার হইল। অকুশল চিত্ত লোভাদি জিহেতুক এবং উহা কামাবচর মাত্র হয়। লোভমূলক হইলে সৌম-নস্ত ও উপেক্ষা সহগত হয়। প্রতিম বা বেষমূলক হইলে, তাহাতে দৌর্মনস্ত সহগত থাকে ও তাহাকে মোহচিত্ত বলে। অকুশল (সহেতু) কামাবচর, লোভমূলক চিত্ত ষষ্টবিধ।

(১—২) সৌমনস্ত সহগত+দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত *+অসংস্কারিক এবং ঐরূপ সংস্কারিক।

(৩—৪) দৃষ্টিগত বিপ্রযুক্ত ঐ ঐ রূপ।
(৫—৮) উপেক্ষা সহগত ঐ ঐ রূপ চারি।

অকুশল কামাবচর বেষমূলক বা প্রতিম চিত্ত দ্বিবিধ।

(৯—১০) দৌর্মনস্ত সহগত, প্রতিম সম্প্রযুক্ত অসংস্কারিক এবং ঐ রূপ সংস্কারিক।

অকুশল কামাবচর মোহচিত্তও দ্বিবিধ।

(১১) উপেক্ষা সহগত, বিচিকিৎসা সম্প্রযুক্ত।

(১২) উপেক্ষা সমগত উদ্বল সম্প্রযুক্ত।

একুশে এই ছাদশ চিত্ত সংহেতু কামাবচর অকুশল চিত্ত হইল।

এ বিষয়েও বিস্তারিত মার্গস্থিত উদাহরণ অনুমানিত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

১ম অকুশল চিত্তের উদাহরণ বর্ণাঃ—

বখন কেহ কামে দোষ নাই, এইরূপ মিন্যা দৃষ্টি পূর্নক হইত তুই হইয়া কাম্য বিষয় পরিভাগ করে, অথবা দৃষ্ট মঙ্গলাদিকে সার রূপে মনন করে; আর তাহা যদি পরের দ্বারা উৎসাহিত না হইয়া স্বাভাবিক ভীকৃতাবে করে তখন তাহাকে প্রথম অকুশল চিত্ত (সৌমনস্ত সহগত, দৃষ্টিগত সম্প্রযুক্ত, অসংস্কারিক) বলা যায়।

সেইরূপ যদি মন্দ বা অতীকৃতো পুরুষ সমুৎসাহিত হইয়া ঐরূপ কাঁয়া করে, তবে তাহা বিতীয় অকুশল চিত্ত (অসংস্কারিক)।

বখন মিন্যা দৃষ্টির বশ না হইয়া কেবল

এই চিত্তে দৌর্মনস্ত থাকে। অথবা স্থল-বিশেষে উপেক্ষা বা অধ-ছন্দিত্ত অধঃও থাকে।

* দৃষ্টি অর্থে মিন্যাজ্ঞান বা বিপরীত জ্ঞান। সুখের বিষয়ে লোভ হয় বলিরা

যদি তুই হইয়া মৈথুনপর্ষদে বা পর-সম্পূর্ণ লোভ করে বা পর-ভাও চুরি করে; আর তখন যত্ন বা তীক্ষ্ণ পরের দ্বারা অসুংসাহিত চিত্ত হইলে, তাহা (দৃষ্টিগত বিধবুদ্ধ) তৃতীয় অকুশল চিত্তের উদাহরণ।

যখন মন্দ বা অতীক্ষ্ণচেতা সমুংসাহিত হইয়া উপরোক্ত রূপ কুকার্য করে, তখন তাহা চতুর্থ (অসংস্কারিক) চিত্তের উদাহরণ।

যখন কামোর অসম্পত্তি হেতু বা অন্য কোন দৌর্মনস্তের কারণ না থাকিলে উপরোক্ত চারি প্রকার ভাব দৌর্মনস্তশূন্য হয়, তখন তাহারা (উপরোক্ত ৪ চিত্ত) উপেক্ষা সহগত চারি চিত্ত হয়।

ইহারা অষ্টবিধ লোভমূল চিত্তের উদাহরণ।

বিবিধ ঘেষমূল অকুশল চিত্ত যথা—প্রাণাতিপাতাদিতে যখন তীক্ষ্ণ প্রবৃত্তি হয়, তখন পঞ্চম চিত্ত (অসংস্কারিক) হয়।

আর যখন মন্দ চিত্ত সমুংসাহিত হইয়া প্রাণাতিপাতাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাই ষষ্ঠ (দৌর্মনস্ত সহগত প্রাতিখ সস্ত্রবুদ্ধ সংস্কারিক) চিত্ত।

বিবিধ মোহমূল চিত্তের প্রথমটা সংশয়কালে হয় ও দ্বিতীয়টা বিবেক কালে হয়।

ষাট প্রকার অকুশল চিত্ত এইরূপ। [কুশল ও অকুশলের আবার বিপাক ও ক্রিয়ারূপ অব্যাকৃত ভাব আছে। অব্যাকৃত চিত্ত জাতিভেদে বিবিধ, বিপাক ও ক্রিয়া। কামাচরাদি চারি ক্রিয়ার চিত্তে-রই বিপাক হয়। ক্রিয়া চিত্ত বস্তুতঃ জি-কৌমিক, কিন্তু বাহারা লোকান্তর ক্রমিতে

উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও কামাচ-চরাদি বিবরণ ক্রিয়া চিত্ত হয়।*

বিপাকের মধ্যে কামাচর কুশলের বিপাক বিবিধ—অহেতুক ও সত্বেতুক। তন্মধ্যে অহেতুক কামাচর বিপাক অষ্ট প্রকার যথা—উপেক্ষা সহগত চতুর্বিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, স্রাবণবিজ্ঞান, কিস্বাবিজ্ঞান, সূক্ষ্মসঙ্গত (ইহা স্কট সূক্ষ্ম নহে) কার-বিজ্ঞান, সৌম্যনস্ত সহগত সন্দীর্ণ এবং উপেক্ষা সহগত সন্দীর্ণ ও সম্পটিক্তন।

সেইরূপ সত্বেতুক কুশল বিপাক চিত্ত আছে। তাহারা অষ্ট কুশল চিত্তের অসু-রূপ। তবে ইহারা বিপাক বলিয়া ইহা নির্ণয় কর্তব্য ফলকণে অসুভূয়মান চিত্ত-ভাব বলিয়া বুদ্ধিতে হইবে।

রূপাচর বিপাক বা পঞ্চবিধ রূপাচর বিপাকের অসু-রূপ। তাহারা পঞ্চ রূপাচ-র ধানের ফলভাবে উৎপন্ন চিত্তভাবের বিজ্ঞান সরূপ।

অরূপাচর বিপাকও ঐরূপ চতুর্বিধ।

লোকান্তর বিপাকও ঐরূপ চতুর্বিধ।

* অভিন্নপর্ষদে সঙ্গের লোকান্তর ক্রিয়া উক্ত হয় নাই। তত্ত্বীকার বলেন অসু-ত্তরের ক্রিয়া অসম্ভব, কারণ মার্গ মূল এক চিত্ত কণিক; মার্গচিত্ত পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইলে ক্রিয়াভাগ হইত। উহা ক্রেশমসুচ্ছেদক বলিয়া অশনিপাতে বৃক্ষ যেমন একেবারে ধ্বংস হয়, সেইরূপ। তাহার ফলে নির্দাণ হয়, তৎকর্ত আর্থা মার্গহদের অত্মির ক্রিয়াচিত্ত উপলব্ধ হয় না। তাহাদের কামাচরাদি বিবরণ ক্রিয়া চিত্ত বে হইতে পারে, তাহা অপ্র-উক্ত হইবে

অতএব কুশল বিপাক (চাতুর্ভৌমিক) চিত্ত একুনে একোনক্রিংশ সংখ্যক হইল। অতঃপর ক্রিয়া চিত্ত জিবিধ। উপেক্ষা সহগত পঞ্চদ্বারা বর্জন *, উপেক্ষাসহগত মনোদ্বারা বর্জন এবং সৌম্যসহগত হসিতুৎপাদ।

সহিতু কুশল ক্রিয়া চিত্ত কামাবচর কুশল চিত্তের অনুরূপ হইবে। *

* আবর্জন অথো আভোগ। "চক্রবাদি পঞ্চদ্বারে খটিত মারম্মণঃ আভেজুতুতুৎ আভোগং করোতি" (বিভা)। অর্থাৎ মনোদ্বাত্ত্বারা চক্রবাদি পঞ্চদ্বারে অভিত্ত বিষয়কে আভোগ করা বা তদবিস্মৃতি ভাবে থাকি পঞ্চদ্বারা বর্জন মনোদ্বারের আভোগ পরম্পর তথাভাবে মনোদ্বারা আবর্জনা অর্থাৎ দৃষ্ট-শ্রুত মত যে মন আব্রমণ গোচর হয়, তাহাতে আবর্জন। মনোদ্বারা বর্জন সস্তীরিত বিষয়কে পঞ্চদ্বারে বোধ্যাপিত বা ব্যবস্থাপিত বা অভিনিবিষ্ট করে। ইহাকে বোধ্যাপন বলে।

স্বীকার্য অর্ন্তের পূর্ণ সাধনাদির কোন নিবর্শন দেওয়া যে প্রকৃষ্ট মন, তাহা সৌম্য সহগত হসিতুৎপাদ চিত্তের উদাহরণ। ইহাই লোকোক্ত ব্রহ্মস্বদের কামাবচরাদি বিষয়ক ক্রিয়া চিত্ত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, ক্রিয়া চিত্ত কেবল মনে করা মাত্র। ইহা ইষ্টানিষ্ট ফলদায়ক কর্মবরূপ নহে।

উন্নতি অনতিকর কোন হেতু না থাকিলে যে স্বাভাবিক বা স্বরসবাহী চিত্ত ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়ান্ধানবেশ হয়, তাহাই "ক্রিয়া" চিত্ত।

* কেবল কুশলচিত্ত শৈক (অর্হস্ব বাতীত জিমাগর্হ) ও সাধারণ সমুদ্যের উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই কুশল ক্রিয়াচিত্ত কেবল অর্হস্বদের উৎপন্ন হয়, এই বিশেষ প্রকৃতি (বি)।

রূপাবচর ক্রিয়াচিত্ত তদ্ভূমিক পঞ্চচিত্তের অনুরূপ পঞ্চসংখ্যক।

অরূপাবচর ক্রিয়াচিত্তও সেইরূপ চিত্ত-বিধ।

অতএব চাতুর্ভৌমিক ক্রিয়া বিজ্ঞান একুনে বিশ সংখ্যক হইল।

অতএব অব্যাকৃত জাতীয় বিপাক ও ক্রিয়া (প্রাচীন পালি ভাষায় ইহাকে কীরিয়া বলা হয়) চিত্ত মোটে ঊনপঞ্চাশ সংখ্যক হইল। ইহার সহিত কুশল ২০ অকুশল ২২ যোগ করিলে, সমগ্ৰ চিত্তের বা বিজ্ঞানসংখ্যক ৮২ হেদ হইল।

মূল আভোগে ইহার এক একটী চিত্তের পঞ্চসংখ্যক কি কি পদার্থ উদ্ভূত থাকে, তাহা তাহাদেবও যথাযোগ্য উপবিভাগ সহ) প্রদর্শিত হইয়াছে। মদূশ প্রত্যেক চিত্ত সংক্ষেপে ঐরূপ বিবরণ থাকিতে অভিমুখে পুনরাবৃত্তি অতি অধিক। সাংখ্যে যেরূপ সাধারণ কয়েকটী মৌলিক পদার্থ দিয়া চিত্ত বুকান হয় এবং সমাদি আদি বুকাইবার সময় অতিরিক্ত হেদ দর্শিত হয়, বৌদ্ধ দর্শনের যেরূপ পঞ্চানী না থাকিতে তাহা অনর্থক জটিল হইয়াছে।

এ স্থলে মধ্যমসূত্রি হইতে এক উদাহরণ দিয়া বৌদ্ধ-পঞ্চানী প্রদর্শিত হইতেছে।

কামাবচর কুশল যে পঞ্চম চিত্ত, তাহাতে পঞ্চসংখ্যক কি কি উৎপন্ন হয়, তাহা সম্যক

সেইরূপ রূপাবচর এবং অরূপাবচর ক্রিয়া বিজ্ঞানও কেবল অর্হস্বদের হইয়া থাকে। কেবল রূপাবচর ও অরূপাবচর কুশলের সহিত এই এই ক্রিয়াচিত্তের এব-বিধ হেদ আছে।

দর্শন হইয়াছে। তাহার এইরূপ বিবরণ আছে।

“উদ্ভিন্ন সবরে কামাবচরং কুশলং চিত্তং উৎপন্ন হোতি সৌমনস্ সনগতং ক্রান সম্প্রযুক্তং রূপারম্ভং বা সন্ধারম্ভং বা গন্ধারম্ভং বা রসারম্ভং বা কোষ্ঠীকরারম্ভং বা বঃ বঃ বা পন আরম্ভ ইত্যাদি”।

(খন্ডসূত্রনি চিত্তপ্রাদিকণ্ডঃ)।

অর্থাৎ সেই সময় রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস স্পষ্ট বা অন্য কোন আরম্ভ অবলম্বন করিয়া কামাবচর, কুশল, সৌমনস্য সহগত জ্ঞানসম্প্রযুক্ত, চিত্ত উৎপন্ন হয়। তখন এই সমস্ত হয়:—স্পর্শ, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, চিত্ত, বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, মুখ, চিত্তের একাগ্রতা, প্রকল্পিত, বীর্ষোক্তির, স্মৃতিস্তির, সমাধীস্তির, প্রোক্তস্তির, মনোস্তির, সৌমনস্যোস্তির, জীবিতোস্তির, সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্‌সংকল্প, সম্যক্‌ব্যায়াম, সম্যক্‌স্মৃতি, সম্যক্‌সমাধি, প্রাক্‌বল, বীর্ষ্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল, প্রজ্ঞাবল, হ্রীবল ও তপ্তবল। হ্রী নিজ হইতে কুর্কর্মে নিবৃত্তি আর—তপ্ত পরনিন্দাদির ভয়ে কুর্কর্মে নিবৃত্তি), অপোত, অবেদ, অমোহ, অন্তিমিত্তা (অলোমূপ্য), অস্বাপাধ (অজোহ) সম্যক্‌দৃষ্টি, হ্রী ও তপ্ত, কাম ও চিত্তের প্রোক্ত (সাধিক ভাব), সযুতা, মুহুতা, কর্ণপাতা, প্রাণ্ডণঃ (অগ্নিনি); স্মৃতি, স্মৃত্তজ্ঞান, সমখ (শান্তি), বিপশানা, প্রোহ (ধীরণা) এবং স্মৃতিস্তির হয়, স্মরণ বা অন্য কোন প্রোহায়নস্বক ধর্ম উৎপন্ন হয়।

পরে এই সবকু পদার্থেরও আবার বিবরণ করা হইয়াছে। কিন্তু বিবরণ

কেবল উপগর্ভ ও প্রত্যয়-ভেদ ভিন্ন সমান-ধাতুক শব্দের দ্বারা (সেমন তর্ক, বিতর্ক, সতর্ক, ইত্যাদি) করা হওয়াতে উহার মতঃ অর্থ বোধ হওয়া হুঃবাধ্য। বিশেষতঃ উহার প্রারম্ভ abstract terms, তাহাদের concrete example প্রারম্ভ পাওয়া যায় না। উক্তন্য অনেক পদার্থের স্মৃতি ধারণা হইবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, উহা অতিধর্মের এক গুণ; কারণ বাসন্য পদার্থের ধারণা কিছু বিশেষ থাকি স্কাল। পাশ্চাত্য ধর্মের দর্শনচর্চার উহা গুণ হইতে পারে, কিন্তু হাঁহারা নিরর্থক সাধন করিবেন, তাহাদের নিকট উহা গুণ নহে।

এতাবতা দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, অতিধর্ম কেবল অসুভূতমান ধর্ম (phenomena) সকল লইয়া। তাহার বিশেষ মূল তত্ত্ব নিকাশনার্থ নহে, কিন্তু স্মিষ্ট পদার্থের জাত্যাদিভেদ অনুসারে তাহার বিশেষ। ধর্ম সকল মূলতঃ কি, তদ্বিবরে যৌক্ত নীরব। সেই মূলকে যৌক্তেরা ‘মূন্য’ বলেন। মূন্য অর্থে সে বিষয় ধারণার অযোগ্য। মূল অতি-ধর্মের মূন্য এইরূপ অর্থেই ব্যবহৃত বলিয়া বোধ হয়, এবং কেবল এইরূপ অর্থেই উহা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু পরবর্তী যৌক্তেরা মূন্যকে মৌলিক ধর্ম রূপে স্থাপিত করিতে বাইরা আর্থা দার্শনিকদের নিকট পরাজিত হন। বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধ আত্মিকত্ব বা metaphysics বিচার্য বিষয় মোটেই বলেন নাই। বৌদ্ধদর্শনকে Psychology of Nirvanic

Ethics বলা হইতে পারে। বুদ্ধ দশটি প্রশ্নকে অব্যাহত বলিতেন, তাহা যথা (১+২) লোক সকল শাস্ত কি অশাস্ত, (৩+৪) লোক সকল অন্তবান্ কি অনন্ত; (৫+৬) জীব ও শরীর এক কি তিন; (৭+৮) তথাগত (কেহ কেহ বলেন তথাগত অর্থে এখানে জীব—“তথাগতো সত্ত্বং নাম”) মৃত্যুর পর থাকে কিনা। (৯) তথাগত মৃত্যুর পর থাকে ও থাকেনা। (১০) তথাগত থাকেনা ও না থাকেনা।

বুদ্ধ এই সকল প্রশ্নের কোন একান্ত পক্ষের উত্তর দিতেন না +। এই সমস্ত প্রশ্নই আর্ষীক্ষিকীর মূল। বুদ্ধ বলিতেন— উহার বিচারে কালক্ষেপ না করিয়া নির্দোষ

+ কিন্তু পরবর্তী বৌদ্ধেরা উহার কোন কোন বিষয়ে একান্তবাদী হইয়াছিলেন। বুদ্ধ ঘোষ বলেন—অবিজ্ঞা অনাদি, তাহা হইলে লোক সকল পরম্পরা ক্রমে অনাদি বা শাস্ত। সাংখ্যেরও তাহাই মত। বৌদ্ধের সর্বস্ত নিবর্ত্ত সাংখ্যের প্রলয় ও সর্গ। তবে বর্ত্তমান ভাবে লোক সকল অবশ্য শাস্ত নহে। লোক সকলকে বুদ্ধ ঘোষ অনন্ত বলেন। বুদ্ধের জ্ঞান, লোক ষাটু গভৃতি বৌদ্ধ মতে অনন্ত।

বস্তুতঃ এই প্রশ্নগুলি কতকটা হেরালির মত। জীব ও শরীর এক কি না, ইহা জ্ঞানিয়া অনেকে মনে করিবেন, জীব যখন মৃত্যুর পর স্বর্গ-নরকে গমন করে ও কন্দ-ফল ভোগ করে, তখন শরীর হইতে পৃথক্ বলহিত বৌদ্ধ মতেই অসম্ভব হইবে। কিন্তু ইহা সত্য নহে। মৃত্যুর পরই জীবের অন্তঃশরীর (স্থল) ধারণ হয়, অতএব তখনও প্রায় হইবে জীব ও শরীর কি এক? কথনতঃ “কাহার নির্দোষপ্রাপ্তি হয়” এই পর্কিত সেই প্রশ্ন চলিবে।

সাধন করাই শ্রেয়ঃ। যদি কোন নির্দোষ-সিদ্ধ পুরুষ বর্ত্তমান থাকেন, তবে ইহা সত্য ও অধিকতর ফলোপায়ক। কারণ পৃথিবীর অতি অল্প লোকেই ভবগবেষক হয়; অধিকাংশ মনুষ্যই পর-প্রত্যয়-নেত্র-বুদ্ধি।

তজ্জন্ম অন্ধবিধাঙ্গমূলক সম্প্রদায় সকলের প্রশংসা অধিক হয়। কিন্তু যখন বুদ্ধের চরিত্র নানা কাল্পনিক আখ্যানিকার বিপর্যাস্ত হইয়াছিল, যখন বৌদ্ধদের কেবল সর্কাসকুলময়—কিন্তু অদৃঢ় দার্শনিক তিত্তি-শূন্য নির্দোষ মার্গ ছিল, পরন্তু যখন অগং-কৌর্গচেতা ধর্ম্মিষ্ঠ পুরুষের সংখ্যা বৌদ্ধ সমাজে অল্প হইয়া গিয়াছিল, যখন dogmaয় অদৃঢ় শৃঙ্খলে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ শৃঙ্খলিত হইয়াছিলেন, তখনই উহা উন্নত আর্ষদর্শনের দ্বারা ও নবধর্ম্ম-বলে বলীয়ান্ আর্ষ সম্প্রদায়ের দ্বারা ভারত হইতে অপসারিত হয়। অতিধর্ম্ম যে বুদ্ধ স্বয়ং প্রণয়ন করেন নাই, তাহা বুদ্ধ ঘোষ একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—“ইদং তাব অতিধর্ম্মো পদভাজনীম্ নয়েন খন্ধেহু বিখাব কথা সুখং। ভগবতা পন বং ক্লিকিরপং অতীভানাগত পচ্চুঙ্গরং অজ্ঞাতং বা বহিদ্ধা বা তহ্মারিকং বা অখুংগং বা হীনং বা পণীভং বা বং পুরে বা সত্তিকে বা তদেক জ্ঞঃ অতি-সংসুহিত্বা অতিসম্মিপিষা অরং বুদ্ধতি রূপক্ খন্ধো।” ইত্যাদি। (বি। ১৪) অর্থাৎ

তথাগত সর্বদীর প্রশ্ন তিনবাদীদের ছিল। উহার সূত্র জীব না হইয়া বুদ্ধ হইতে পারে। উহার উত্তরেও আর্ষীক্ষিকী বিভার অবতারণা হয়।

অভিধর্মে এইরূপ পদতালমীর নয় পূর্বক
• অধের বিস্তার কথা বলা হইল। ভগবান
কিন্তু যে কিছু 'রূপ' অতীত, অনাগত না
প্রত্যাপন, আধ্যাত্মিক বা বাহির, ঔদারিক
(স্থল) বা স্থান, হীন বা পূর্ণ, ঘূরে বা
সম্বন্ধে, তাহা সমস্ত একভাবে সংক্ষেপ ও
অধ্যাহার পূর্বক বলিয়াছেন "ইহাকে রূপ-
স্বরূপ বলা যায়, ইহাকে বেদনা-স্বরূপ বলা
যায়" ইত্যাদি। বস্তুতঃ বর্তমান নৌরূপদর্শন
বুদ্ধের পরে উদ্ভাবিত এবং প্রায় সত্ৰ
বর্ষব্যাপী কাল বৌদ্ধ পণ্ডিতদের চিন্তার
ফল।

(ক্রমশঃ)

ঐহরিরহানক আরণ্য।

তত্ত্ব-চিন্তা ।

(জীব ভাব ।)

(পূর্নানুভূতি ।)

৪২। শিক্ষা। জলে সাঁতার দেওয়া
যায়—এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া বধা
অপাণীতে সাঁতার দেওয়া অভ্যাস করিতে
হয়। অভ্যাসে জ্ঞান জন্মে—জলে সাঁতার
দেওয়া যায়। অতএব এই জ্ঞান হইবার
পূর্বে বাক্যে বিশ্বাস, তাহার পর বধা
অপাণীতে অভ্যাস প্রয়োজন।

সমুদ্র তরঙ্গে জানিতে পারেন—এই
বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে—

(১) বাক্যে বিশ্বাস।

(২) শাস্ত্র-উক্ত অপাণীতে অভ্যাস
প্রয়োজন।

অভ্যাস অস্তে বৃদ্ধিতে পারা যায় "সমুদ্র
তরঙ্গে জানিতে পারেন।"

বাহ্যের পূর্বে জ্ঞান, পরে শিক্ষা বা পরীক্ষা-
পরীক্ষা ও বিশ্বাস করিতে চাহেন, তাহার
অজ্ঞান। অদৃষ্টকে যদি প্রথমেই দেখিতে
পাই, তবে দেখিবার প্রাণী বা প্রাণের
প্রয়োজন কোথা ?

৪৩। বিশ্বাস রাখিয়া শিক্ষার সঙ্গে
পরীক্ষা করা বরং ভাল। কেননা বিশ্বাস
অটল থাকিলে, পরীক্ষার পূর্ণমনোরথ না
হটলেই কেহ উহা ছাড়িয়া দেয় না। আর
একটু অগ্রসর হইলে হরত তাহার কামনা
পূর্ণ হইবে। বিশ্বাস সবে বিনা অল্পটালে
কেহ কখন কৃতকার্য হয় না।

৪৪। এক এক জনকে অহুষ্ঠান না করিয়া
ফল লাভ করিতে দেখা যায়। ইহার তাৎ-
পর্য্য, ঐ ফললাভ পূর্বকৃত অহুষ্ঠান হেতু।
যথা কোন বালক কবে কোথায় একটা বীজ
ফেলিয়া গিয়াছিল, এখন উহাতে বৃক্ষ হই-
রাছে। বীজ ফেলা বালকের মনে নাই।
সেই বৃক্ষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—কে
সে বৃক্ষ রোপণ করিল ? সে বৃদ্ধিতে
পাকক আর নাই পাকক, আমরা বৃদ্ধিতেছি,
ঐ বৃক্ষ তাহার পূর্বকৃত অহুষ্ঠানের ফল।
অতএব অহুষ্ঠান প্রয়োজন। এখন হটক,
উহার ফল ফলিবেই কলিবে।

অহুষ্ঠানের পূর্বে উদ্দেশ্য ও সফল
থাকিবে। অহুষ্ঠানে ফল কলিবে, এই
বিশ্বাস থাকিবে।

৪৫। বাহার বিশ্বাস সহজে অস্তে

তাহাতে তৎক্ষণাৎ, তদনীলা ক শিক্ষা পূর্ণ হইতে হইরাছে, ধরিতে হয়। তাহার বিধান বিপরীত অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত, ইহা ধরিতা হইতে হয়। ইহার পক্ষে দীক্ষা-প্রয়োজন।

৪৩। কোণ। জীব চৈতন্তবৃত্ত, জীব বুদ্ধিধারী, জীবাত্মনানী অর্থাৎ "বৃহৎ অর্থাৎ" বা "পূর্ণ অর্থাৎ" বা "ব্রহ্ম" বৃত্ত হওয়ার নাম "যোগ"। যোগ দুই প্রকার। শরীরকে জৈব শারীরিক ক্রিয়া সমুদয়কে বশীভূত করিয়া যে যোগে প্রযুক্ত হইতে হয়, তাহার নাম ঠঠযোগ (ঠঠ অর্থে শরীর) বা কারযোগ। শরীরের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া মন লইয়া যে যোগ আরম্ভ করিতে হয়, তাহার নাম "রাজযোগ"।

৪৭। কথিত আছে, উপস্থিত কালে পূর্বের মত শরীর নহে, শরীর নীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। গহন পূর্ণ করিতে আয়ুতে কুলান হয় না করিয়া ঠঠযোগ অপ্রয়োজন মনে করিয়া রাজযোগের আদর। ঠঠযোগে প্রাণবায়ুকে স্থির করা যেমন আবশ্যকীয়, রাজযোগে মনকে স্থির করা তেমনি প্রয়োজনীয়। প্রাণের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ শরীর অস্থির হইলে প্রাণ অস্থির এবং প্রাণ ব্যাকুল হইলে শরীরের তাবান্তর ঘটে, প্রাণের সহিত মনের প্রাণ সেই প্রকার সম্বন্ধ। "প্রাণ" কথা প্রয়োগের তাৎপর্য এই যে, শরীর অস্থির, প্রাণ স্থির করিলে প্রাণ ব্যাকুল, শরীরের তাবান্তর ঘাই, এরূপক বোধ্য বার। কিন্তু মন ব্যাকুল, প্রাণ স্থির অর্থাৎ প্রাণ ব্যাকুল, মন-স্থির আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যোগা-

তাসে উত্তর সম্বন্ধ একই প্রকার হইয়া আইসে অর্থাৎ শরীর অস্থির অথবা প্রাণ স্থির, প্রাণ ব্যাকুল অথচ মন স্থির বা মন চঞ্চল—প্রাণ স্থির হইয়া আইসে। যোগের অবস্থা বিশেষে শরীর বোধ থাকে না, প্রাণ বহমান হইয়া, মন নিজের বিশেষ, যেন সূত ইঞ্জিরগণ লইয়া অধু বিস্তারিত বোধ হয়; আবার কোন গোথই থাকে না। যোগ অভ্যাসে এই এই লক্ষণ হইয়া থাকে, অভ্যাস করিতে করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

৪৮। কেহ কেহ কহেন "প্রাণায়াম" শিক্ষা ও অভ্যাস করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা অভ্যাসের প্রয়োজন নাই; যে মনকে স্থির করিতে সক্ষম, তাহার প্রাণায়াম আগনা আপনি হইয়া আইসে। আবার কেহ কেহ বলেন, প্রাণায়াম গভীর মন স্থির হয় না; তবে বাহার মন স্থির হয়, তাহার প্রাণায়াম পূর্ণকালে অভ্যস্ত ছিল। এ বিচার প্রয়োজন কি না, ইহা না ভাবিয়া, সাধক কার্যে নিযুক্ত হইলে, অনুষ্ঠানে বুঝিতে পারেন। রাজযোগীদের অনুষ্ঠান-কালে চিত্তের অবস্থা চতুর্বিধ ঘটনা থাকে। লক্ষ, বিক্ষণ, কশার ও রসাবাদন।

- (১) লক্ষ—অনুগমানে কৃতকার্য নহে হইয়া নিত্যা বার। ইহা অলমতাব্যঞ্জক।
- (২) বিক্ষণ—এক ধরিতে অস্ত আসিয়া পড়ে। ইহা চিত্তচাকলাব্যঞ্জক।
- (৩) কশার—ধরিতে ধরিতে তত্ত্ব হইয়া আইসে, আর অস্তম হইয়া না। ইহা সান্দ্রতা-তাব্যঞ্জক।
- (৪) রসাবাদন—সিক্ত, বহন, বিস্ত

নির্দিকল্পকে ধারণ করিতে না পারিয়া
মবিকল্পে নামিয়া পড়ে। এই অবস্থায়
পূর্নউল্লিখিত 'ভোগ্যজ্ঞেয়কে ধরিতে না
পারায় চিত্ত তুলিতে থাকে। এ অবস্থা
ভাগ্যবানের, সন্দেহ নাট—তথাপি টকা
শেষ মর্মে। কেননা শেষ অবস্থা "যুক্ত"
• অবস্থা।

৫০। কোন অবস্থায় কি করা প্রয়োজন,
তৎসম্বন্ধে গুরুরা বলেন—সর অবস্থায়
"বিচার"।

বিক্ষেপ ঐ "শান্ত হওয়া।"

কশায় ঐ "নিবৃত্ত হওয়া।"

রসাস্বাদনে "পূতর অভ্যাস।"

৫১। ধারণা।—উল্লিখিত আছে, জ্ঞানের
পূর্নাবস্থার নাম ধারণা। জানা পাত্র
হইলে উহাকে ধারণা বলে। পাত্র
বিকল্পরহিত থাকিলে, উহাকে জ্ঞান বলে।

অপহরণ করা ভাল কাজ নহে। ইহা
জানিতে না পারা—ইহার নাম "না জানা"
"অজ্ঞান"। ভাল কাজ নয়, ইহা শুনিলে
ইহাতে "অনুশ" হইল। শুনিয়া মনে
ভাবিলে, ইহাতে "মনন ও ধ্যান" হইল।
তাহারা কখনো চিত্তে বসাইবে, ইহাতে
"ধারণা" পূর্ণ হইল। কিন্তু ঐ ধারণা
রহিল না, উহা তুলিয়া গেল। ধারণা
হইয়া রহিল না—সরিয়া গেল অর্থাৎ "জানা"
হইয়া আবার "অজানা" মত হইল।
ইহাকে "জ্ঞান" বলে না। এই চারিবার
এইরূপ করিতে করিতে বসন আর সরিয়া
গেল না, তখন প্রকৃত "জানা" হইল—অর্থাৎ
জ্ঞান হইল। গুরুরা জানিয়া বাহা জুল
হয়, তাহাকে ধারণা ধারণা জ্ঞান হয় নাই।

জানিয়া বাহা জুল হয় না, তাহাতে ধারণা
অনিকল্প জ্ঞান গুরুত্ব।

অনভ্যাসে ধারণা অপসৃত হয়। "জানা"
ও "না জানার" মধ্যস্থিত বলিয়া "জানার"
দিকে অভ্যাস শিথিল হইলেই ধারণা "না-
জানার ডুবয়া যায়।" "না জানার" বিপরীত
—জ্ঞান ধারণার পরিত্যক্ত বলিয়া শেষ
বলিয়া—"না জানার" ডুবে না। অর্থাৎ
জ্ঞান আর "না জানা" হয় না।

শিশু জননীকে "মা" বলে, ইহাই সাধা-
রণ। কোন শিশু "মা"ও বলে এবং
পিতামহীর সম্বোধন শুনিয়া "বউ মা" বলে।
ক্রমে তাহার জ্ঞান হইতে লাগিল, তখন
সে আর জননীকে "বউ মা" বলিল না।
পূর্বে যে ধারণা ছিল, তাহার পরিবর্তন
হইল বলিয়া তাহার জ্ঞানেরও পরিবর্তন
হইল। যদি তাহার পূর্নধারণা বিকল্পতা-
শূন্য হইত তাহাহইলে তাহার "মা" ও
"বউ মা" বলা বন্ধ হইত না।

৫২। ধারণা ত্রিগুণ-শক্তির অধীন।
এক গুণশক্তি-প্রসূত ধারণা অত্রগুণ শক্তি-
প্রসূত ধারণার সমান হয় না।

মাংসাশী ও কলমূলভুক্। একের ধারণা—
মাংস না খাইলে শরীর ভাল থাকে না,
অপরের ধারণা মাংসে শরীর মট হয়।
রক্তস্রব-সম্বন্ধ ধারণার মাংস প্রয়োজন, সত্ত্ব-
সম্বন্ধ ধারণার মাংস অপকারী। বতকাল
রক্তস্রবওণী সমুদ্রের চিত্ত সম্বন্ধে পরিণত না
হইবে, ততকাল ধারণাও পরিবর্তন পাইবে
না।

"বুঝাইলেও বুঝেনা" কথাটা সত্য,
সরমণ্য বিঃসর্বে এক মনের ধারণা অপসৃত

প্রবেশ না পরণা করিতে অক্ষয়। ইতাই
বুদ্ধি বিস্তারতার হেতু। এই হেতুই "বুদ্ধি-
ভেদ" নিষিদ্ধ হইয়াছে।

৩০। ধারণার পূর্বে ও পর অবস্থার বা
ক্রিয়ার উল্লেখ আছে—

১মশ্রেণী—প্রাণ	২য় শ্রেণী—প্রাণ
মনন	মনন
ধ্যান	ধ্যান
ধারণা	নির্দিধাসন ধারণা (আত্মরূপ-সমাধি ও মনন)

দ্বিতীয় শ্রেণীতে নির্দিধাসনের উল্লেখ
আছে। উহা কাহারও কাহারও পরোক্ষ
হয় না, অর্থাৎ মনন হইতে ধারণা সে মুহূর্ত্ত
কাল—তৎ অন্তর্গত।

প্রাণে—মন আকাজকী এবং অনন্তবিশয়ী।
মননে—মন কৃতী এবং সংযত। (বিবরণ-
স্বর-বিশ্বত্ব বিশেষ)।

ধ্যানের আরম্ভে—কৃতী মন অমুঠাভা,
শেবার্কে নিজের সাক্ষীরূপ।

চিত্ত তখন কাগ্ৰত।

ধারণার—নিজের মন স্থির ও চিত্তগত
চিত্ত প্রকৃতি—বুদ্ধির জ্যোতি প্রাপ্ত।

জ্ঞানে—মনন প্রকৃতি চিত্ত—বুদ্ধিপাত।
সমাধিতে বা মনে—স্বরূপবৃত্ত বা স্বরূপতত্ত্ব
প্রাপ্ত।

জ্ঞানলাভে—বুদ্ধির প্রসাদ, চিত্তের উপবে-
গিতা, মনের আগ্রহ ও অমুঠান পরোক্ষন।

প্রবণ হইতে ধারণা পর্যন্ত কি প্রকার
অমুঠান, তৎসম্বন্ধে গুরুমা বলেন—

(১) প্রাণ। অধু প্রাণ করাকে "প্রাণ"
বলে না। যেমন শোনা, তেমনি যদি মননে

গিরা পরিণত হয়, তবেই "প্রবণ" হইল।

(২) মনন। অধু মনে করাকে "মনন"
কহে না। যেমন মনন হইল, তেমনি যদি
ধ্যানে গিরা পরিণত হয়, তবেই মনন
হইল।

(৩) ধ্যান। অধু কল্পনা করাকে "ধ্যান"
বলে না। যেমন ধ্যান হইল, তেমনি যদি
নির্দিধাসনে (অর্থাৎ সেই ভাবে অচল
অনস্থিতিতে) পরিণত হয়, তাহা হইলেই
ধ্যান হইল।

(৪) নির্দিধাসন অর্থ নিত্য এক
ভাবে থাকা। বাঁচার নির্দিধাসন হইয়াছে,
তিনি কিছুতেই বিরক্ত হন না। ত্রৈলোক্য
স্বামী নির্দিধাসন-শিদ্ধ বলিয়া উক্ত হই-
য়াছেন।

(৫) ধারণা। ধারণা ও নির্দিধাসন
একই বলিয়া বোধ হয়। ধারণা হইবা সাক্ষ-
জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলেই উহা হইতে
অবিচলিত থাকাই নির্দিধাসন।

বিবর জ্ঞান লাভে প্রথম শ্রেণীর করণী,
আত্মজ্ঞানে—অর্থাৎ স্বরূপ—দর্শনে—দ্বিতীয়
শ্রেণীর করণী পর পর অবস্থা।

প্রকৃতি (স্থানান্তরে উল্লিখিত) অজ-
সারে ধারণার তারতম্য ঘটিল থাকে।
কাহারও অল্প কালে, কাহারও দীর্ঘ কালে
ধারণার উদয় হয়।

শাস্ত্র প্রকৃতি ব্যক্তির হরত পূর্বসংস্থান
না থাকা হেতু ধারণার বিলম্ব ঘটিল,
আবার উগ্রপ্রকৃতি ব্যক্তির পূর্বসংস্থান
বশতঃ হরত মুহূর্ত্ত মধ্যেই ধারণার উদয়
হইল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কথা
নহে।

৫৫। শ্রবণ-ইচ্ছা কার্যাকরী হওয়া অবধি বাহিত বস্ত্র লাভ পর্যন্ত একাগ্র-চিত্তে নিযুক্ত থাকাকে "স্তমপাত্ৰা" কহে। যদিও চিত্ত সম্বন্ধে একাগ্রতার অধিক প্রয়োগ আছে, তথাপি উহা মনেও ঘটনা থাকে। শ্রবণ হইতে ধ্যানের পূর্বাঙ্ক পর্য্যন্ত মনের একাগ্রতা ঘটনা থাকে। উহার অল্প-পস্থিতিতে মন ধ্যানে সক্ষম হয় না।

মনের একাগ্রতাকে বিবরাস্তর বৃত্তি—বিবরাস্তর চিন্তা—বিবরাস্তর-পিপাসা নষ্ট করিয়া থাকে।

চিত্তের একাগ্রতাকে অন্তস্ত বৃত্তি নষ্ট করিতে পারে।

৫৬। শাস্ত্রবাক্য বা গুরুবাক্য শ্রবণ করিতে এই প্রাণালী অবলম্বন করিলে, জ্ঞান অশ্রয়। অধু শ্রবণে কাহারও শ্রবণ হয় না, কাহারও শ্রবণ হয়, মনন হয় না, কাহারও মনন হয়, ধ্যান হয় না; আবার অতি অল্প জনের ধ্যান হয়, তাঁহারাই ধারণা লাভে নিদিধ্যাসনে অনাসক্ত ভাবে অবস্থিতি করেন।

পূর্বসংস্কার (অর্থাৎ পূর্ব জন্মের অন্ত্যাস) হেতু কাহারও শ্রবণ মাত্রই ধারণার ও জ্ঞানের উদয় হয়। অর্থাৎ চিত্ত তৎ তৎ অবহার পরিণত হয়। এ স্থলে মনন ও ধ্যান যে হয় না, তাহা সচ, উহা তড়িৎ-বৎ হইয়া ধারণার পরিণত হয়।

৫৭। সুপ পদার্থ ধারণা হেতু যেমন একটা প্রথম উপায় বর্ণন, সুপ বিবর ধারণা হেতু তেননি প্রথম উপায় চিন্তা। চিত্ত করিতে করিতে অন্তস্ত হু উন্নীলিত হয়, তাহা ধারা বর্ণন লাভ হয় অতএব

চিত্ত করা প্রয়োজন। এই চিত্তার পূর্বে শ্রবণ ও মনন হইয়া যায়; চিত্তার ধ্যান হয়, ধ্যানান্তে নিদিধ্যাসন সম্ভব।

যাহা দেখিরাচ, তাহার কথা কহিতেছি না। যাহা শুন নাট, তাহা তোমার মনে আসিবে না; যাহা মনে আসিবে না, তাহা আবার কি প্রকারে ধ্যান করিবে? শুনিয়া থাক, মনে করিয়া থাক (মনে রাখিয়া থাক), তবেই উহার চিন্তা করিতে পারিবে। এই হেতু ধ্যান ও চিন্তা তুল্য বলিলাম। কিন্তু সাধারণতঃ চিন্তার অহুরাগ বা তক্তি থাকে না, ধ্যানে বিশ্বাস, অহুরাগ ও তক্তি নিশ্চয়ান থাকে।

একটা উদাহরণ দিতে ইচ্ছা হইতেছে। যদেশী আন্দোলন। এত দিন শুন মাই, উহার চিন্তাও কর নাই। প্রথম যখন শুনিগে, তখন শুনিগে মাত্র, মনে করিলে না, মনে রাখিলে না, স্মরণে তাহার প্রকৃত চিন্তা করিলে না। তাহার পর যখন মন দিরা শুনিগে—অর্থাৎ মনে রাখিলে, তখনও তিক চিন্তা করিলে না। আবার যখন মন দিরা শুনিয়া, মনে রাখিয়া, চিন্তা করিয়া দেখিলে, তখন বুঝতে পারিলে, উহাকে ধরিয়া পাকা ভাষা; ইতি ধারণা।

৫৮। সুক্তিপ্রার্থী মনের পক্ষে তিনটা প্রয়োজন। শাস্ত্র বিশেষে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ও অবরোধির উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু তাহার কি বা কি প্রকার, তাহা বলা হয় নাই। জ্ঞান অর্থে জ্ঞান, বৈরাগ্য—বিবরে অনাসক্তি এবং অগ্রাহ্যতা ও অবরোধি কাৰ্য্যান্তে বিশ্বরণ (ইহার পূর্বে কিছু থাকে না, পরে অহুশোচনা থাকে না)

স্বাক্ষরি জনকের জ্ঞান, বৈরাগ্য, অবরোধি, জিনই সমান ছিল।

জ্ঞান লাভের উপায়—শিক্ষা, দীক্ষা ও দর্শন।

বৈরাগ্য লাভের উপায়—“প্রাত্যাহার” দ্বারা পরিত্যাগ—অর্থাৎ “আমার প্রয়োজন নাই,” “হয় হউক, না হয় না হউক” ইতি ভাব।

অবরোধির * উপায়—ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পরেছার কার্য্য করা। সুতরাং ভাৱতে সক্ষম থাকে না, আর উহাতে ভালই হউক, সন্দই হউক, ভোগান্তে চিন্তিত হইতে হয় না।

৫২। বৈরাগ্য—বিষয়ভাগ নহে, বিষয়ে পার্থক্য। বিষয়ে আসক্তি ভাগ হইলে বিষয়মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং যিনি বিষয়মুক্ত, তিনি অনাসক্ত। অনাসক্ত অবস্থার ভোগ থাকে, কিন্তু সে ভোগ অনুভূত হয় না। সে ভোগ হেতু বাসনা, সঙ্কর বা অরাস থাকে না; আবার সে ভোগান্তে তৎ-চিন্তা—অনুশোচনা হয় না এবং তদেক্তে তাবাস্তর হইতে হয় না।

চৈতন্ত বা বোধ সত্বে—বাসনা ও শক্তি সত্বে—ভোগার্থ ইঞ্জির সত্বে বিষয়বৈরাগ্যই প্রকৃত বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের উদয়ে মহাজনের আত্মচিন্তা—আত্মদর্শন সুলভ

* “অবরোধি”-তত্ত্ব পরিকার বিবৃত হইল না। “অবরোধি” কোন শাস্ত্রের উক্তি, তাহার উল্লেখ আবৃত্তক। প্রয়োজন, যলে মন-প্রাণাদিরও উক্ত ব্যতীত শাস্ত্রীয় দার্শনিক পরম্পরের উক্ত প্রয়োজনবাহক পিতৃ হয় না। (হি: স:)

হইরা থাকে; কেননা উহার বিষয়চিন্তা থাকে না, অণচ চিন্তা থাকে; বিষয়বাসনা থাকে না, অণচ বাসনা থাকে; বিষয়-শক্তি থাকে না, অণচ শক্তি থাকে; সুতরাং চিন্তা, বাসনা, শক্তি উহার স্বরূপ দর্শনে সাপেক্ষ হয়। আবার বাহার দ্বারা আত্মচিন্তা বলবতী থাকে, উহার বিষয়-বৈরাগ্যও ঘটরা থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবাসুদেয় বসু।

অদৃষ্টি ।

—o—

(১)

কে তুমি, নেপথ্য-বাসি ! চক্ষু-অগোচর !
স্বর্গ-মর্ত্যে করিছ বিহার !
অপ্রিয়-দর্শন কিংবা মধুর স্মরণ !
দেখি নাই, কেমন আকার !

(২)

কখন কাহার প্রতি হও বে সদর,
জানিনা, কি তোমার নিয়ম :—
ভালবাস, খেচ্ছাচার—কলঙ্ক-নিগর ;
অথবা সে আচার, সংবম !

(৩)

বাহ'ক, যেমনি তুমি হও মহাশয়,
চিত্ত বাস আমার উপর ;—
সমস্ত জীবনব্যাপী সাধ্য সাধনার
গলিল না পাখাপ-অস্তর !

(৪)

হে মায়াবি ! আর তোমা নাহি দিব'মন' !
চিনিয়াছি, আসন্ন সন্ধ্যার !
শেষ উপহার সাহি করিব অর্ঘণ,
উপেক্ষিয়া সগৎ-পাতার !

শ্রীবাসুদেয় বসু

শ্রী হরি:

(১৮৪৭ সালের ২০ আইননভে হেজিট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।



১৪শ বর্ষ, ১৪শ পত্র,
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আশ্বিন।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দ।

মন জড় কি অজড় ?



অজ্ঞানশক্তি স্বজন-কামনার জ্ঞানরূপী
 অহেতুত্বের পরণামনা হন; কিন্তু তাঁহার গুণ-
 কোষে অর্থাৎ সাংখ্যান্যকার বিকার প্রথমতঃ
 ভ্রমোত্তপ্তেরই প্রাচুর্য্য হন, এই জন্ত এই
 ভ্রমোত্তপ্ত মহাকাল ও নিরন্ত ক্রিয়াশীল
 ভ্রমোত্তপ্ত শক্তি মহাকালী নামে উক্ত
 হইয়া থাকেন। সাংখ্যকার ইহাকে পুরুষ-
 প্রকৃতি ও বেদান্ত ব্রহ্ম ও সারা নামে
 বিশেষিত করেন। ইহার তামাসিক পরি-
 গাম "নীড়" হইতে বর্ণাক্রমে "বিরৎ পনন
 ভেজোষু ত্বং ত্বতানি অজিরো।" হুস্মা-
 কাশ, হুস্ম বায়ু, হুস্মজ্যোতিঃ, হুস্ম জল ও
 হুস্ম ক্রিতি উৎপন্ন। ইহার তামাসিক
 গুণ হইতে সমুদ্ভূত হইলেও ইহাদের জননী
 স্বরূপীভ্রমোত্তপ্তময়ী; সুতরাং ইহারাও সেই
 ভ্রমোত্তপ্তময়ী।

ইহাদের সাংখ্যিক সংশ্লিষ্ট হইতে পঞ্চজ্ঞানে-
 জ্ঞান, মন ও বুদ্ধি এবং রজ-অংশ হইতে পঞ্চ
 কর্ণেজ্ঞান ও প্রাণাদি উৎপন্ন হইয়াছে।
 যথা,—
 আকাশের সহায় হইতে—শ্রবণেজ্ঞান।
 বায়ুর ঐ স্পর্শনেজ্ঞান।
 তেজের ঐ দর্শনেজ্ঞান।
 জলের ঐ রসনেজ্ঞান।
 ক্রিতির ঐ স্রাণেজ্ঞান।

মোট ৫
 এই সকল সহায়ের সমষ্টি অস্ত্রকরণ;
 তাহা আবার চুট ভাগে বিভক্ত; বিষমবায়ু
 মন ও নিশ্চরায়িকা বুদ্ধ।

"ইদমিখমেব রূপমতি" বো বিচারঃ স
 বিষম্ব ইত্যুত্তমোৎ।"
 "ইহা এইরূপ" ইত্যাকারে যে বিচার,
 তাহাকেই বিষম্ব কহে।

আকাশের রজ-অংশ হইতে—	বাক্ ।
বায়ুর	ঐ গাণি ।
তেজের	ঐ পাদ ।
জলের	ঐ উপহ্ ।
কিতির	ঐ পায়ু ।

মোট ৫

এই সকল রজ-অংশের সমষ্টি হইতে পঞ্চ-প্রাণ ।

১৭

এই পঞ্চদশ সমষ্টি আমাদের স্বল্প বা মিত্র দেহ ।

আকাশের ভাসিক অংশ হইতে—
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য ।

বায়ুর	ঐ ঐ ধারণ, প্রসারণ, উল্লঙ্ঘন, চাঞ্চল্য ও সংকোচন ।
তেজের	" " ক্রোধ, তৃষ্ণা, আলস্য, নিদ্রা ও ক্লান্তি ।
জলের	" " রেতঃ, পিত্ত, মেদ, রস ও রক্ত ।
কিতির	" " অস্থি, মাংস, নাড়ী, ত্বক্ ও রোম ।

* ইঞ্জিয়ারদির ভায় এই পঞ্চ প্রাণ—আমাদের দেহের বিভিন্ন স্থানে ক্রিয়া করিতেছে । প্রাণ—হৃদয়ে, আপন গুহে, সমান নাভিতে, উদানে কণ্ঠে, এবং ব্যান স্পর্শনীরে প্রবাহিত হইতেছে । ইঞ্জিরা অস্ত্রস্বত । ইহাদের অমূরুপ আরও পাঁচটা বায়ু আছে, তাহারা বহিঃস্থত বলিমা কীর্ষিত । যথা—নাগ, কূর্ম, ক্রকর, দেবদত্ত ও পুনঞ্জর । উদগরে নাগ, নীলনোম্মীলনে কূর্ম, কুংকারে (হাঁচিতে) ক্রকর, জ্বন্তনে দেবদত্ত ও সর্ক-পত্রীয়ে পুনঞ্জর বায়ু ক্রিয়া করিয়া থাকে

এক্বে দেখা যাউক, এই পঞ্চীকরণ-প্রণালীতে এক ভূত অপার ভূতচতুষ্টয় হইতে কি কি গুণ লাভ হইয়াছিল ।

(১) আকাশের স্বকীয় বিশেষ গুণ লোভ ।

আকাশ—পবন হইতে পাইয়াছিল	প্রসারণ
" অগ্নি হইতে	নিদ্রা ।
" জল হইতে	রস ।
" পৃথিবী হইতে	আলস্য ।

মোট ৫

(২) বায়ুর স্বকীয় বিশেষ গুণ ধারণ ।

" আকাশ হইতে পাইয়াছিল	কাম ।
" অগ্নি হইতে	তৃষ্ণা ।
" জল হইতে	মেদ ।
" পৃথিবী হইতে	ত্বক্ ।

৫

(৩) অগ্নির স্বকীয় বিশেষ গুণ ক্রোধ ।

অগ্নি—আকাশ হইতে পাইয়াছিল	ক্রোধ ।
" পবন হইতে	উল্লঙ্ঘন ।
" জল হইতে	পিত্ত ।
" পৃথিবী হইতে	নাড়ী ।

৫

(৪) জলের বিশেষ গুণ রেতঃ ।

জল আকাশ হইতে পাইয়াছিল—	মোহ ।
" পবন হইতে	চঞ্চলতা ।
" অগ্নি হইতে	ক্লান্তি ।
" পৃথিবী হইতে	মাংস ।

৫

(৫) ক্রিতির বিশেষ গুণ	অস্থি ।	(৬) তেজের বিশেষ গুণ	ক্ষুধা ।
ক্রিতি আকাশ হইতে পাইরাছিল	মাৎসর্য	পবন অবশিষ্ট পাঁচগুণ মধ্যে	
" পবন হইতে	" সংকোচন ।	পাইরাছিল	ভৃগু ।
" অগ্নি হইতে	" আলস্ত ।	পৃথিবী "	" আলস্ত ।
" জল হইতে	" রক্ত ।	আকাশ "	" নিত্রা ।
		জল "	" ক্লাস্তি ।

৫

মোট ২৫

কিন্তু শেষোক্ত প্রত্যেকটি হইতেই পক্ষীকরণে, একটা ভূত অপর চারিটির অংশ গ্রহণ করায়, প্রত্যেকেরই পাঁচ পাঁচটা গুণ উৎপন্ন হইরাছিল। যথা,—

(১) আকাশের উৎপত্তিক পঞ্চগুণ মধ্যে	
ভাঙ্গার বিশেষ গুণ	গোত ।
পবন আকাশের পাঁচ গুণ মধ্যে	
পাইরাছিল	কাস ।
তেজ "	" ক্রোধ ।
জল "	" মোহ ।
ক্রিতি "	" মাৎসর্য ।

৫

(২) বায়ুর বিশেষ গুণ	ধারণ ।
আকাশ বায়ুর পাঁচগুণ মধ্যে	
পাইরাছিল	প্রসারণ ।
তেজ "	" উন্নম্ফন ।
জল "	" চঞ্চলতা ।
পৃথিবী "	" সংকোচন ।

৫

(৩) জলের বিশেষ গুণ	রোতঃ ।
তেজ পাইরাছিল	গিত্ত ।
পবন "	শ্বেদ ।
আকাশ "	সস ।
পৃথিবী "	রক্ত ।

৫

(৪) ক্রিতির বিশেষ গুণ	অস্থি ।
জল পাইরাছিল	মাৎস ।
তেজ "	নাড়ী ।
পবন "	স্বক ।
আকাশ "	রোম ।

৫

মোট ২৫

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভূতাদির সঙ্ঘা-
শের সমষ্টি—অন্তঃকরণ; তাহা দুই ভাগে
বিতক্ত—মন ও বুদ্ধি। অনেকে অন্তঃ-
করণকে চারিভাগে বিতক্ত করেন; যথা—
মন, কৃচ্ছ, চিত্ত ও অচক্ষার। কিন্তু চিত্ত
মনের ও অহকার বুদ্ধির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া
অন্তঃকরণকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিতক্ত
করা হয়। (এই মন, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ ও

দশেঞ্জির অথবা এই সপ্তদশ সমষ্টি হুন্দ বা লিঙ্গ দেহ সেই পঞ্চত্ব হইতেই উৎপন্ন ; সূত্রমঃ তাহার জড় তিন্ন কদাচ অজড় বঃ চৈতন্য হইতে পারে না । এমন কি, এই হুন্দদেহের কারণ বা বীজস্বরূপ যে অজ্ঞান বা কর্মবীজ, তাহাও অজড় নহে । এক পুরুষ বা আত্মা তিন্ন সমুদায়ই জড়, পরিণামী ও নশ্বর । কারণ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, সেই অজ্ঞানরূপিনী পঙ্কতিও বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং জীবের পরমগতি মুক্তি লাভ ঘটয়া থাকে । শ্রীভগবান গীতাতে “ন কারতে জিন্নতে বা কদাচিন্নাং ভূষা ভকিতা বা ন ভূয়ঃ” ইত্যাকার বাক্য এক আত্মা সহকেই করিয়াছেন । ইনি কখনও জন্মেন না বা মরেন না । কারণ অত্র পদার্থই সরণশীল । বাহার জন্ম আছে, তাহার অশ্রু মুহূঃ আছে । বাহার জন্ম নাই, তাহার মুহূঃ নাই ; অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে, বাহার মুহূঃ নাই, তাহার জন্মও নাই । এইজন্য শাস্ত্র বলেন “মুতি-বীজঃ ভবেজ্জন্ম জন্মবীজঃ ভবেন্মুতিঃ ॥” মুহূঃ-বীজ জন্মের এবং জন্ম-বীজ মুহূঃ কারণ স্বরূপ ।

সাংখ্য মতে “অপূর্ব দেহেঞ্জিরাপি সংখ্যত বিশেষেন সংযোগচ্চ বিরোগচ্চ ।” দেহ-ইঞ্জিরাপির সংযোগের নাম জন্ম, আর বিরোগ বিশেষের নাম মুহূঃ । আমাদের এই হুন্দ ও হুন্দ দেহের সংযোগই জন্ম, আর বিরোগই মুহূঃ । সংকল্প-বিকল্পাঙ্ক বনই তাহার কারণ । ইনি চক্ষুরাদি হুন্দেঞ্জির অপেক্ষাৎ হুন্দভঙ্গ বটে, কিন্তু তাহা হইলেও জড় ; কেবল সাক্ষার ভাবতত্ত্ব বাহ্য ।

আর্য্য ভাবগণ এই মনের আকান হান কোথায় এবং ইহার আকার আছে কিনা, ইত্যাকার আলোচনাও কণ্টে করিয়াছেন । পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও যথাসাধ্য আলোচনা করিতে কুষ্ঠিত হন নাই ।

বিখ্যাত দার্শনিক ডেসকার্টে (Descartes) বলেন “Mind is self knowing principle” অর্থাৎ নিজ বে নিজকে জানিতে পারে, তাহারই নাম মন । •

উইলিয়ম হ্যামিলটন বলেন “Mind can be defined form its manifestation” অর্থাৎ মনেরই বিকাশ ও কার্য-কলাপ দেখিয়া মনের সংজ্ঞা করিতে হয় । তিনি বলেন যে “Mind itself is the universal and principal concurrent cause in every act of knowledge” মনই জ্ঞানপরিচায়ক কর্মাদির একমাত্র সার্বভৌমিক ও প্রধান সহকারী কারণ ।

কেহ কেহ বলেন, ইঞ্জির দ্বারা বাহ্য পদার্থ সত্ত্বকে নীত হইলেই মনের কার্য হয় । মন যেন এই দেহজালের মধ্যে

• আর্য্যশাস্ত্র মতে মন স্বরূপাশ্রয় বা জ্ঞাতা নহেন । কিন্তু মন কখন নিরতিশয় নির্মল হইয়া কেবল সত্ত্ব গুণকেই আশ্রয় করেন—যখন রজঃ ও তমোগুণের বশীভূত হইয়া বিষয়াকারে পরিণত হন না ; তখন তিনি আপনি আপনাকে জানিয়া মোক্ষপথে গমন করিয়া থাকেন । তখন তাঁগণ্ডে কেবল শুদ্ধ সত্ত্বময় চিন্ময় আত্মারই চৈত্ব্য পতিত হইতে পারে ; তখন তাঁহার আর সংকল্প—বিকল্প থাকে না ; নিশ্চয় গদ্যপুণের দ্বায় মোক্ষলাভ পর্য্যন্ত বিভগীন থাকেন ।

(শেষব)

একটা মাকড়সার দ্বারা অবস্থান করিতেছে ।
 বস্তুতঃ মন বেন এতটা উর্ধ্বগত ; নিজেই
 ভক্তগণাবিস্তারপূর্বক নিজেই তাহা আবার
 সংহরণ করিয়া থাকে । মন এক পক্ষে মনের
 বিপরীত পদার্থ রচনা করে, অল্প পক্ষে
 মনই তাহা উপভোগ করিয়া থাকে ।
 ইন্দ্রিয়গুলি উপগম্য মাত্র । এই প্রত্যক্ষী-
 ভূত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্
 প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানেন্দ্রিয় নহে । জ্ঞানাত্মক
 ইন্দ্রিয়গুলি হৃদয়েই সংস্থিত ; উাহারা তত্ত্ব
 জ্ঞানাত্মক ইন্দ্রিয়গুলির গোলক বা প্রকাশ-
 স্থান মাত্র । আমরা ইহজগতে বাহ্য কিছু
 প্রত্যক্ষ করি, তাহার সৃষ্টিগুলি আণবিক
 আকর্ষণে ইন্দ্রিয়াদি কর্তৃক আকৃষ্ট হয় এবং
 হৃদয় হৃদয় শিরা সংযোগে মস্তিকে উপনীত
 হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া হইলেই, আমাদের
 প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা মস্তিষ্ক-সম্বৃত জ্ঞানরূপে
 পরিণত হয় । মনের এই কার্যকে উইলিয়ম
 হারিসল্টন "brain consciousness"
 কহেন । তিনি আরও বলেন যে, "con-
 sciousness is, in fact to the mind
 or what extension is to the matter
 or body"—অর্থাৎ জড়ের সহিত নিসৃত
 মনের যে সংঘর্ষ, মনের সহিত মস্তিষ্কজ্ঞানের
 সেই সংঘর্ষ ।

* "To Descartes, who made extension the sole essential property of matter, and matter a necessary condition of extension, the bare existence of bodies apparently at a distance was a proof of the existence of a continuous medium between them. (Vide Psychometry etc.)

এতৎ সময়ে মহাত্মা ডেকার্টে বলেন
 যে, আমাদের মস্তিষ্কে একটা অতি হৃদয় শিরা
 আছে, তাহার নাম (pineal gland)

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে মস্তকের
 পশ্চাত্তাগের (cerebral hemisphere) পরি-
 মাপাত্ত্বমানে জ্ঞান-নিবন্ধের ভারতমা হইয়া
 থাকে । উাহারা বলেন, সভ্যজগৎ ইউরোপ-
 খণ্ডে সাধারণতঃ পুরুষের মস্তিষ্ক (মস্তক-
 ব্যুত) ৪২ আউন্স এবং স্ত্রীলোকের ৪০
 আউন্স হইয়া থাকে । আর অসভ্য কাফ্র
 জাতিসমস্তিক ক্রোমি ৪৪ আউন্সের অধিক
 দৃষ্ট হয় না । সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ কুভার
 (cuvier) সাহেবের মস্তিষ্ক শিক্ষিত সম্ভ্র-
 দায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া
 বিদীর্ণ হইয়াছিল । উাহার মস্তিষ্ক ৬৪½
 আউন্স হইয়াছিল । কিন্তু পরে জনৈক
 ইষ্টকনিষ্ঠাতার মস্তিষ্ক উাহার অপেক্ষাও
 গুরুতর দৃষ্ট হয় । তাহা ৬৭ আউন্স । ইনি
 ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালে ১৮৪২
 সালে ৩৮ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন ।
 ইনি লেখাপড়া জানিতেন না বটে, কিন্তু
 রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে বড় ভাল-
 বাসিতেন । উাহার স্মরণশক্তি অতীব
 প্রখর ছিল ।

উাহারা বলেন যে, জন্মকালে পুরুষের
 মস্তিষ্ক নূনাধিক ১৫ আউন্স এবং স্ত্রীলোকের
 ১২ আউন্স হইয়া থাকে (Bastian—page
 363) । সপ্তম বৎসরে পুরুষ জাতি পূর্ণ
 বয়স-প্রাপ্তবা মস্তিষ্কের ৬ অংশ এবং স্ত্রী
 জাতি ৫ অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 (Bastian. page 354)

উাহারা বলেন—বানর শ্রেণীর মস্তিষ্ক
 ২ হইতে ২০ আউন্স পর্যন্ত হইয়া থাকে ।
 উদ্যোগে মস্তক-ব্যুত্তর উাহারের পরিমাণ
 অল্পমানে অরঙ্গ (orang) প্রথম, গরিলা
 (gorilla) দ্বিতীয় এবং শিম্পাঞ্জী (chim-
 panzee) তৃতীয় ।

"পিনিয়াল গ্লামাণ্ড" নামক মস্তক
সংযুক্ত রহিয়াছে কেবল মস্তক
ইহা অতঃপরই বোঝান হইবে
কেন্দ্র অতিক্রম করিয়া পিত্ত

মানবের মস্তক
মস্তক পারলক্ষ্যে
সমস্তকমস্তক
পারেনা এবং
পারেনা। (Vide - Mind and Nervous system p 85 - 86)

বার্টন (Burton)
কোন কোন
করিয়াছেন
উক্ত হইল না।

(২) "পিনিয়াল গ্লামাণ্ড"
বাক্য কেহ কেহ
করেন
পিত্তের
উক্ত হইল।

"In describing the pinal gland or back eye, it is shown as containing mineral concretions and sand. Modern Physiology has ascertained that there is an orifice or "door" in it, besides that, 'window-self-shining-within' (Is this door for the purpose of discharging the sand - grains or seed). We are told : complete the physical plasm, the germinal cell of man, with all its material potentialeties with the spiritual plasm, so to say, or the fluid that contains the five lower principles of the six principled Dhyen and you have the secret if you are spritual enough to understand it. Descartes describes the pinal gland as a little gland tied to the brain that can easily be set in motion, by the animal spirits which cross the centre of the skull in every sense. German scientists say that these sand grains are not found in man until the age of seven years, the iderrical age at which the soul is said to enter fully into the body of the child."

(Vide the Path Vol. V, Page 392)

শরীরতত্ত্ব
শরীর মধ্যে
তাঁহা সমস্ত
যে, এই
পরিপূর্ণ।
মানবের
এই

আমাদের
যে
সম্ভবতঃ
এই

"শিরঃকণ্ঠে
পকাশ্য
সর্বপ্রদেশে
পকাশঃ
(পাতঞ্জল
শ্লোক ।)

এই স্থানে
এই স্থানে
মুগ্ধতার
এই
এই
এই
এই

জীবনসংক্রমণ

হিন্দু-আত্মরক্ষা।

('ধর্ম' ও 'বদনী' সাধন ।)

ধর্মীরা হিন্দু আত্মা ধর্মই যে সার।
ধর্মরক্ষাতেই হয় আত্মরক্ষা তার।

ভগবৎরূপার হিন্দু চিরধর্মীরা। এত
জীবনতির অধঃপাতে, এত বৃগ-বৃগাঙ্করবাণী
বিপদ-বিভ্রাট-বিপ্লব-বিভ্রবনার বাধাতে এত
অধুনা দুর্ভিক্ষ দাবিজো-মহাসারী রাজরোষ
প্রকৃতির প্রচণ্ড আঘাতে হিন্দুর ধর্মীরা
অভাগি জগতে অতুল। বরঞ্চ ঐহিক সর্ব-
সম্পদ হাবাটরা, এখন ধর্মই হিন্দু বদনী
রতন, অন্ধের নয়ন, সর্বস্ব মন ধর্মই হিন্দু
এখন অস্তিত্ব আশার একমাত্র লক্ষ্য-পালক,
এ বিপদ-সাগরে একমাত্র বক্ষ-ভেলক।

এখনও হিন্দু চরিত্র আছে। এখনও
হিন্দুর জীবন-দয়ালু শক্তি আছে। এখনও
হিন্দুর সাধুগণ, গুণবৎ পন্থ, সৎ-আত্মিক,
শৌচ-সদাচার, ব্রত-উপবাস, দেব-বিদ-
ভক্তিক্রম, গো-অতিবিশেষ, বেল-মোল-
দুর্গোৎসব, প্রাচীন তর্পণ-তীর্থযাত্রা কিছু কিছু
আছে। এখনও হিন্দু-জগতে সুনী, গুণি,
স্বামী, তপস্বী, যামু, সরাস্বতী, অম্বু-
উদাসী, শাক্ত-ভক্ত-পুরুষ আছেন।
এখনও হিন্দুর-ধর্ম আছেন কানী-পুণী-
অধোয়্যা-ব্রহ্মাবন-কামাখ্যা-চন্দ্রনাথ আছেন।
এখনও হিন্দুর বেদ-বেদান্ত আছেন। স্বাভি-
ভূত-পুরাণ-তীর্থ-সীতা-সাগরত আছেন।
এখনও হিন্দুগণীদাসী বোঁদা আছে, রাম-পদারী
স্বামী, কাম্বু, বৈষ্ণব-কাম্বু, পুত্রসীতার

আছে। নগরে নগরে—গ্রামে গ্রামে মধুর
মোলে—করতাল-খোলে—'হরি হরি' মোলে
হরিসংকীর্তন আছে! তবে আর কি না
আছে? রক্ত-লুপাটরাছে, মাংস-সুকাটরাছে,
তবু চাড়ের কফাল আছে। কথাম বলে—
"হাড় থাকলে মাংস পাওয়া যায়"—ভাই
আশা আছে। কলে ধর্মবিষয়ে হিন্দুর
আজ বিশ-শতাব্দীতে ধ্বংস-শাশটে, কফাল-
বিশিষ্ট, "হ'ররে ভারিমে কাশ্রণ-প্রোণ"—
পূর্বের তুগনার 'নান না' বাণ কিছু আছে,
তাৎ গভ্রাত্ত ঐহিক অত্মরত জাতির
তুগনার অত্মাণ জগতে অতুল অস্তিত্ব—
অসামরণ।

আমাদের সব গিন্নাছে, কিন্তু তবু ধর্ম
একেবারে বান নাহি। এখন আত্মা আশা-
দের এই 'নিদানের কাণ্ডারী' ধর্মকে প্রাণ-
পণে ধর্মেরা রাখিতে পারিলে, কাগে-সক-
লেই আত্মরক্ষার আশার আশা আছে।
একটা পুরাতন গল্প আছে, হরত-অনেকেই
জানেন, তবু প্রামাণিক বলরা এ স্থলে
সংক্ষেপে বলিতেছি। —

এক সত্যবাদী ধার্মিক রাজা এক
নুতন রাজার বগাইরা বোধনা করিলেনকে,
"এই-নুতন রাজার বিজেতাদের অধিকার
প্রাণীদি রাজসরকারে ক্রীত-হউন" এই
বোধনা ও তদনুযায়ী কাগের কলে রাজার
শীত্র-ক্রীতরা যেন। এখন একদিন এক
ধর্মগোক রাজার ধার্মিকতা ও সত্যবাদিতা
পরীক্ষার্থে উঁটির মাটি ছেঁড়া হুল, নথ
ইত্যাদি দ্বারা এক 'অলক্ষী' কৃষ্টি গড়াইরা
রাজার বিক্রমার্থে আনিয়া, বিক্র 'অলক্ষী'
কো, ক্রীতরা-ধর্ম-নিবেদন-বিভ্রত

ধর্ম-পাতিজ্ঞ রাজাকেই উহা। কিনিরা আনিতে
হইল। এখন রাজপুরে অগস্তীর আগমনে
রাজলক্ষ্মী চক্ষুণা হইয়া পুরী ছাড়িয়া চলি-
লেন। “বিষ্ণুক্ষণশান্তি” লক্ষ্মীঠাকুরাণীর
বিচলনে বিষ্ণু ঠাকুরটিও চলিলেন। “হরি-
ষর একায়া,” সূতরাং শিব ঠাকুরও বাহি-
রিলেন। আবার “এক তিন—তিনে এক”
বলিয়া, ব্রহ্মারও আর পাকা হইল না।
কাছেই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সহস্রর, এই সর্বপথান
ক্রিদেরের প্রস্থানে ক্রমে সর্ব-দেব-দেবীই
রাজপুরী ছাড়িয়া চলিলেন। সর্বশেষে
সমুদ্রগ ধনলম্বুর্ধি ধনলম্বেশ ধর্মদেব পদ্মা-
নোভিত হইলেন। সত্যধর্মীসুরোপে রাজা
অগস্তী কিনিরা, সর্বদেবের প্রস্থানেও নাশা
না দিতে নাশা হইরাছিলেন, কিন্তু ধর্ম-
দেবের প্রস্থানকালে রাজা করবোড়ে পথ
আঙুলিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—“ধর্ম
দেব! আপনি দাঁড়িতে পারেন না; আপ-
নার অঙ্গুরোধেই আমি অগস্তী কিনিরা
আনিয়া সবাইকে চারাইলাম। আমি
আপনারই জন্ত সবাইকে ভাগ করিলাম;
আপনি কি বলিয়া আমাকে ত্যাগ করি-
বেন? আপনিই আমার চির আশ্রয়স্থল।
আপনিই আমার সার ধন—শেখ সম্বল।
জীবনে—মরণে আপনাকে ছাড়াছাড়ি
নাট।” তখন ধর্ম ঠাকুরও শঙ্ক হাতে
ঠেকিয়া বলিলেন—“তাইত। তা আমাকে
বহি তুমি কোন মতে না ছাড়, তবে আমিও
তোমাকে ছাড়িতে পারি না। আমারই
পাশ্চাৎ যলেন—“ধর্ম এব ততো হস্তি ধর্মী
সকতি রক্ষিতঃ”। ধর্মকে বে মারে, ধর্ম
ভবে মারেন, ধর্মকে বে রাখে, ধর্ম ভাবে

রাখেন। তুমি যেখানে সর্বভাগী হইয়াও
আমাকে রাখিতেছ, সেখানে আমিও অবশ্য
তোমাকে রাখিব; সূতরাং আমি থাকিলাম।
ধর্ম থাকিলেন। এখন—
“ধর্মাদর্ঘ: প্রভবতি ধর্মীং প্রভবতে সূধম।
ধর্মীন্দেবকৃপা-সিদ্ধি র্তু স্তিমুক্তিচ্চ শাশ্বতীঃ”
অর্থাৎ—

ধর্মেতেই লক্ষ্মী-লাভ, সর্বসুখ-সম্পাদন।
ধর্মে দেবকৃপা-সিদ্ধি ভোগ-সৌক-নিভাধন।

অতএব রাজার ধর্মরক্ষা হওরাতে, ক্রমে
রাজলক্ষ্মীও ফিরিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-
শিব, সর্বদেব-দেবী, সর্বসম্পৎ—সর্বসুখধর্মগ্যা
আবাব রাজপুরে বিরাজিত। এই সত্যচারী
ধর্মরক্ষারী রাজার অমুক্যারী বে হইবে,
সে সব হারাইলেও আবার সব পাইবে।
ধর্মরক্ষাতেই তাহার সর্বরক্ষা হইবে; কারণ
ধর্মেই জগৎ—ধর্মেই সর্ব। সমুদ্রের সর্ববই
ধর্ম। ধর্মই সমুদ্র।

এই ধর্মের পূর্ণতার হিন্দু একদিন
জগতে আদর্শ সমুদ্র ছিল। আজ তাহারই
ক্ষয়ে বা অপচয়ে সেই আদর্শের অদর্শন
ঘটিরাছে। কিন্তু যে চুকু নির্দর্শন আছে,
তদনুসারিণী সাধনার ধর্মকে ধরিয়া থাকিলে,
কালে সেই ক্ষয়চরের পুনরণে সেই আদর্শ-
ের পুনর্দর্শন কখনই ছরাশার ভ্র:বশ্র নহে।
আমাদের আশা হর, যেখানে এত অব-
নতিতে—এত ধর্মকতিতে—অতাপি হিন্দু
সর্বজাতির ধর্মশিক্ষকামনে আসীন হইবার
অযোগ্য নহে, সেখানে সেই ধর্মের শাসন-
পোষণ অব্যাহত থাকিলে, এই রক্তমান
আবর্তনর বিবিধ বিপ্লবের সমন্বয়-সমুদ্র
চুকুণ চুকানে অর্ধবোধ-অসীর ধর্ম-শাসি বিক

রাখিলে, হিন্দু অবশ্য অকূলে কুল পাইবে, কৃষ্কিনে, হুদিন পাইবে, পূর্বগোরবে পুনঃ-প্রতিষ্ঠা পাইবে; এবং “ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ” বাক্যের অব্যর্থ সার্থকতার হিন্দু-ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস বর্ণাক্ষরে সমুজ্জল হইবে।

‘হিন্দুর আত্মরক্ষা’ কথাটি এই হিন্দুহানের আকাশে ধ্বনিত হইলে, ভারত অর্ধ-হিন্দুর ধর্মরক্ষাই বুঝায়। “আত্মানং সততং রক্ষেৎ”— এটি ব্যক্তিগত ব্যাধিভাবের আত্মরক্ষা-উপদেশক নীতিবাক্য; স্তত্রাং আপন পরীর রক্ষা বা প্রাণ-বীচানোই ইহার প্রধান লক্ষ্য। “চাচা আপনা বাঁচা” এই বাঙ্গালা নীতি-প্রবাদ—ভাবিয়া দেখিলে উহারই ভাবসুবাদ। আবার যদি জাতিগত সমষ্টিভাবে উহার অর্থালোচনা করা যায়, তবে “আত্মরক্ষা” শব্দটির বিস্তৃত বিশ্লেষণে ধর্মরক্ষাই ব্যাখ্যাভূত হইয়া পড়ে; কিন্তু উহা এই মোক্ষ-ভূমির হিন্দু পক্ষে। অস্ত্রাস্ত্র ভোগভূমির ইহসর্ব্বব জাতির পক্ষে ঐহিক বা ভৌতিক সত্তা ও স্বার্থরক্ষাই “আত্মরক্ষা” (self defence) পদের অর্থ।

বর্তমান বদেশী আন্দোলনে আমাদের পরীরক্ষা—প্রাণরক্ষা, কৃষি-শিল্প বাণিজ্য-রক্ষা, বদেশী ভাব, স্বভাব, শিক্ষা ও সভ্যতা-রক্ষা, ব্রহ্মচর্য-শিক্ষার বীর্ঘ্যরক্ষা, স্ববলঘন-শিক্ষার পৌর্ধ্য-রক্ষা, বিপদে-সম্পদে ধৈর্য-গাভীর্ষ্য রক্ষা এবং সাধারণতঃ সাংসারিক সর্ব্ববিষয়ে বধাগত্ব পরমুখাপেক্ষিতার অভাব ও স্বাধীন ভাবের প্রেতাব রক্ষা হারা “সর্ব্বই পরমশংসঃ হুংঃ সর্ব্বনাশ্বশংসঃ সুধম্” এই সারসত্য সাংক্রান্তি সু-প্রমাণিত করাই

কি কেবল আত্মরক্ষা? হিন্দুর পক্ষে এই বদেশী আন্দোলনে “আত্মরক্ষা” পদের উৎকর্ষ-অর্থে উহার উপরেও হিন্দুর আচার ও আধ্যাত্মিকতাসূচক ধর্মরক্ষা।

বদেশী আন্দোলনে কতকগুলি লোকের হিন্দু-বিরোধী মত প্রচারণে ধর্মাত্মা হিন্দুর আত্মরক্ষণ ধর্মের আচার ও আধ্যাত্মিকতা রূপ দুটি মর্ম্ম স্থলে আঘাত পড়িতেছে, এবং এই আঘাতের ক্রমবেগ-বর্দ্ধনে হিন্দুর আত্মরক্ষার ব্যাঘাত-সম্ভাবনা বাড়িতেছে। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ চিন্তাশীল হিন্দুর এই বেলা ভায়া বুঝিয়া সতর্ক থাকি আবশ্যক। বদেশী আন্দোলন আমাদের গোড়া ধর্ম্মি নাড়া দিয়াছে। ইহা নিরবচ্ছিন্ন বিদেশীরতার সমাচ্ছন্ন আমাদের বর্তমান সত্তার আমূল পরিবর্তনে উদ্ভূত। বঙ্গ-বন্ধ-সমুহ এই আন্দোলন-তরঙ্গ আজ যে বিশাল ভারতের প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বদেশী ভাবে বিপ্রাণিত করিতেছে, আন্তিক বদেশাভ্যুদগী হিন্দু ইহার মূলে ঐশ হস্ত দেখিতেছেন। স্তত্রাং ভীত বা নিরাশাষিত হওয়ার কোন হেতু নাই। হিন্দুর ধর্ম্মজীবনের আচাররূপ শোণিত-প্রবাহ সুহ ও আধ্যাত্মিকতা রূপ সন্তুষ্ক প্রকৃতিহ থাকিলে আর চিন্তার কোন কারণ নাই। ঐ দুটি ঠিক থাকিলেই, বদেশী আন্দোলন আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়, প্রার্থনীয়, সর্ব্বানর্থবাধক ও সর্ব্বার্থ-সাধক। কিন্তু ও দুটির বিনাশ বা হ্রাস ঘটাইয়া, অপর সর্ব্ববিধ উন্নতি বী সর্ব্বসিদ্ধি-সমৃদ্ধি হিন্দুর বিলুপ্ত বাহনীর নহে।

বদেশী আন্দোলনের মোহাই দিয়া, আজ কাল কতকগুলি পাশ্চাত্যদর্শন-কর্ষিত-জীব

জ্ঞান-নাট্যকাদর্শ নব্য তাত্ত্বিক, কতিপয় একাচার-একাকার-‘নিরাকার’ ভ্রাতা, দুই চারি জন বিশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বৌদ্ধ বাবু, আরও কতকগুলি উৎসর্গী, অপসর্গী বিশ্বর্গী, সর্কর্গী (ইব্রাহিমসর্গী *)লোকের মত, যথা—

- ১। ‘National dinner’ চালাও।
- ২। বিবধার বর মিলাও।
- ৩। জাতিভেদ-বন্ধন ছুটাও।
- ৪। বর্ণাশ্রমচার উঠাও।
- ৫। খুষ্টান-মুসলমানের খানা খাও।
- ৬। ব্রাহ্মণ-চার্যের ভেদ ভাগাও।
- ৭। একাকারে-একাচারে ‘স্বদেশী’ জাগাও।
- ৮। ‘হরিবোল’-বদলেও “বন্দে মাতরম্” লাগাও।

(ইত্যাদি)

এ সব মতের উদ্দেশে হিন্দুর দূর হইতে নমস্কার। স্বধর্মহীন ‘স্বদেশী’তে হিন্দুর সম্বন্ধ-খুৎকার। হিন্দুর পক্ষে স্বধর্মহীন ‘স্বদেশী’ই অসম্ভব। বরং বাহাতে স্বধর্মের পোষণ ও শোধন, তাহাই স্বদেশী সাধন। আর বাহাতে স্বধর্মের বিকার বা সংহার, তাহা স্বদেশীর ব্যতিচার। অন্ততঃ মোটা-মুটি স্বধর্ম থাকিয়া, বরং কিছু ‘স্ব-বিদেশী’ও গ্রাহ্য, কিন্তু স্বধর্ম হারাইয়া সেই বিভ্রান্ত ‘স্ব-স্বদেশী’ ত্যাগ্য।

* ইংরাজের ই, ব্রাহ্মের ব্র, হিন্দুর হি, মহামুসলমানের (মুসলমানের) ম—ই-ব্রা-হি-ম। অভ-এব যিনি দরকার মত সর্কর্গীবলবী, তাঁহাকেই বঙ্গ-ভাষায় ‘ইব্রাহিম’ বলা যায়।

(লেখক)

স্বধর্মশূন্য ‘স্বদেশী’ “কাঁটালের আম-সব” বিশেষ। হিন্দু স্বধর্ম, স্বশাস্ত্র, স্ব-আচার ছাড়িয়া ‘স্বরাজ’ চায়না। ভূত স্বরাজের সমাধি-ক্ষেত্রে বরং বর্তমান বি-রাজ স্বীকার, কিন্তু সে অদ্ভুত ভাবী স্বরাজের নামে নমস্কার! প্রকৃতপক্ষে ‘স্বদেশী’ হিন্দুর জীবন, ‘স্বরাজ’ হিন্দুর আকাজিকত ঘন, বিদেশী-বর্জনে হিন্দুর স্মৃদুত গণ। কিন্তু সর্কোপরি হিন্দুর স্বধর্মের সংস্থাপন! কারণ উহাতেই তাহার সর্কারাধ্য—মুগমুগান্তর-সাধ্য—সর্কর্গীবলন—স্বধর্ম-রতন শ্রীভগবানের শ্রীআসন!

যদি সাখাই খারাপ হইল, তবে শরীরের পুষ্টিতে ফল কি? “লোকটা পাগল হইয়া কিন্তু বেশ মোটা গোটা হইয়াছে!” এটা কেমন খোস খবর! অবিকৃত মস্তিষ্কে প্রকৃতিস্থ থাকিয়া দেহ-পুষ্টি যেমন প্রার্থনীয়, স্বধর্মচার ঠিক রাখিয়া, স্বদেশীভাব ও স্বরাজ লাভ হিন্দুর তৎৎ বাঞ্ছনীয়। যদি স্বধর্মচারই হিন্দুর হিন্দুত্ব বা আত্মস্বরূপত্ব হয়, তবে তাহারই অব্যাঘাতে হিন্দু আত্ম-রক্ষা করিয়া ‘স্বদেশী’ সাধনে সমর্থ, নচেৎ আত্মঘাতী হইয়া, নরকের ‘বায়না’ লইয়া, ইহ-পরকাল ডুবাইয়া, জাতি-ধর্ম ঘুচাইয়া যে স্বদেশী স্বীকার, তাহার উদ্দেশে (আবার বলি) হিন্দুর কোটি যোজন দূর হইতে কোটি নমস্কার।

বিদেশীবর্জন, বেশ কথা। হিন্দুর ধর্ম-নাশক বা আত্মনাশক—স্বতরাং সর্কর্গীনাশক অন্তর্ক-নিবিদ্ধ বিদেশী বস্তুর যথাসম্ভব ও বণাশক্তি বর্জন হিন্দুর অবশ্য সর্কর্গীবলন-সাধ্য, কেননা হিন্দু তাহাতে ধর্মতঃ ও শাস্ত্রতঃ বাধ্য। আর যদি সেই ধর্মকে

হেলিয়া, শাজকে ঠেলিয়া, সামাজিক জাতি-
বর্ণাচার চরণে দলিয়া, পাশ্চাত্য ধরণের
(হাঁল ফ্যাননের) 'patriotism' মতের
স্বদেশী অর্জন-সাপেক্ষ বিদেশী বর্জন করিতে
হয়, তবে ফলিতার্থে যে ধর্মনৈতিক বিদে-
শীয়তা অপেক্ষা রাজনৈতিক বিদেশীয়তা
বরং শ্রেয়স্কর। হিন্দুর বিচারে সেরূপ
স্বধর্মপরিপন্থী বিবেচনাকী বৈদেশিক 'বরকট'
(বর্জন) অপেক্ষা কর্জনের বঙ্গভঙ্গ ও বহ-
নীয়, মর্দী-মিণ্টোর শাসন-রঙ্গ ও সহনীয়,
কৃষ্ণাঙ্গ-ঘৃণী খেতঙ্গ-সঙ্গ ও গ্রহণীয়।

মোকদ্দম স্বধর্মই হিন্দুর যুগ-যুগান্তর-
সেবিত—জন্ম-জন্মান্তর-সামিত, অস্ত্রান্তদেশ-
হুলভ, প্রকৃত ভারত-বৈভব—ভারত-গৌরব।
প্রকৃত স্বদেশী বস্ত। এই আগল স্বদেশীই
কলিত পক্ষ কর্তৃমি ভারতে হিন্দুর
কর্মযোগের ফল, অন্তর-বাহিরের বল, ইহ-
পরকালের শাস্তিহরণ, অনন্ত জীবন-সম্বল।
কিন্তু এই "বরকট"-মাধ্য বিদেশী বর্জনের
সঙ্গে সঙ্গে সেট, আসল স্বদেশী টরও বর্জন
এবং কেবল কতিপয় অহরী, ঐহিক,
ভৌতিক ও সাময়িক 'স্বদেশী' অর্জন হিন্দুর
একান্ত অধীকার্য ও অসহ। বাহ্য হিন্দুর
আত্মসংস্কার বাধক, বরং আত্মহত্যার সাপেক্ষ,
আত্মান হিন্দু তাহাতে আহাবান হওয়া
অসম্ভব ও অস্বাভাবিক।

আসল 'স্ব' হারাইরা, কি লইরা আমরা
স্ব-তন্ত্র বা স্ব-স্বাধীন (স্বাধীন) হইব?
কতিপয় অনিত্য অড়ায়ক বস্ত,—কৃষি-
শিল্প-বাণিজ্য—বিত্তাদি, কাপড়-লবণ-চিনি
ইত্যাদি;—বড় জোর—স্বদেশী সমাজ-পরিষৎ
(সামাজিক শাসন-বর-সভা), স্বদেশী

বিচারালয় (সালিসী বৈঠক), স্বদেশী
বিদ্যালয় (National school) মিলনালয়
(Federation hall), স্বদেশী জাহাজ,
স্বদেশী রেল; অধিকতর স্বদেশের বাঁশঝাড়ের
স্বদেশী লাঠী, আর স্বদেশের মাঠের উর্করা
মাটি! বর্তমান সময়োপযোগী অবস্থান-
সারে এই সমস্ত স্বদেশী অর্জনই বিশেষ
বাহুণীয় হইলেও, হিন্দুর সর্বস্ব আধ্যাত্মিক
সাধনার কর্মসম্মুখার্থ যে শাস্ত্রোক্ত স্বধর্মচার,
তাহার অবিরোধে ও অব্যাঘাতেই উক্ত
বাহুণীয় স্ব স্বীকার্য ও সাধন শিরোধার্য;
অন্তথা—অপত্যা অগ্রাহ।

হিন্দু সব সহিতে পারে, কিন্তু আত্ম-
সম্বের অবনতি, ধর্মের ক্ষতি—সুতরাং হিন্দু
বা জাতীয় বিশেষত্বের বিকৃতি বা অযোগ্যতা
হিন্দুর অসহ। সাধক হিন্দু ঐহিক 'স্বধ-
সম্পদকে মুক্ত-পুরীষৎ—এমন কি, অনিত্য
জীবনকেও নখাগ্রবৎ ত্যাগ করিতে পারে,
কিন্তু তাহার স্বধর্ম-স্বষ্ট, স্বশাস্ত্রনিষ্ঠ সদাচার-
পুষ্টি, নিত্যসম্পদ আত্মস্ব হিন্দুকে সে কিছুই
বিনিময়ে বিসর্জন করিতে পারে না। হিন্দুর
সর্গমনাধিক প্রাণাধিক সেই স্বধর্ম-স্ব বা
হিন্দু স্বার্থ—অর্থাৎ আত্মস্বার্থ হিন্দু
ঐহিক উচ্চতার তুচ্ছকারী, কিন্তু পারমা-
র্ধিকতার দীন তিথারী; বাহুতোগে
বিরাগী, অন্তর্যোগেই অহুরাগী। ঐ অর্থে
হিন্দু অট্টালিকার অনভিলাষী, কুটার-
কন্দর-ভক্ততলবাসী। স্মীর-সরে অনিচ্ছক,
কন্দ-মূল-ফলভুক্। ধৃতি-চাঁদরেও আদর-
হীন, কোপীনেই সুগোবীন! হিন্দু তক্ত-
চূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছেন,—
"এক টুকরা কোঁ পান ওঁ দু'ভাজি বিদ্‌মু গোব,

রাসরসুভব উন্নয়নে—ইঙ্গুর বা কোন্ ?

এক টুকরা কোণীনের জাকড়া, আর সামান্য ছোটো ভালা-ভুলো, তাতে লুণেরও দরকার নাই; দেহধর্মার্থে ঐটুকুই বখেটে। যদি রসুভব শ্রীরাসচক্র হৃদয়ে থাকেন, তবে ইঙ্গুরীর সুখ-সন্তোষ তার কাছে কোন্ ছার ? তগবদ্বতজন, স্বধর্মচার-সেবন হিন্দুর সর্বাঙ্গ সুখা সাধন। আর মন-খাজ, বসন-ভূষণ, শিল্প-বাণিজ্য, বল-বীর্ষ্য, বদেশ-স্বভাতি-স্বজন, স্বরাজ-স্বায়ত্তশাসন, এ সব অত্যাশঙ্কক হইলেও, পূর্বোক্ত সুখের জ্বলনার গৌণ। প্রয়োজনস্থলে সুখের রক্ষার্থ গৌণও বর্জনীয়, কিন্তু গৌণের অপেক্ষার সুখ্যে উপেক্ষা-অপরোধ অসম্বন্ধনীয়। বর্তমান বদেশী আন্দোলনে হিন্দু-পক্ষে এই সুখ্য-গৌণের বিরোধিতার স্থলগুলি সাবধানে অভিজ্ঞ করিয়া বদেশ-সেবাত্রত চালাইতে হইবে। ফলে বদেশ-সেবনে বা 'বদেশী' সাধনে হিন্দুর প্রাণান্ত-পণ; কিন্তু হিন্দুর আত্মরক্ষার অনন্তঅবলম্বন স্বধর্মচারই তাহার প্রাণাধিক ধন।

"সংগোরবে স্বধর্ম-আচার শিরে রর।

সপ্তমে বদেশ-সেবা হৃদয়ে উদর ॥

স্বধর্ম মতকে ধরি—বদেশ হৃদয়ে।

জাগ হিন্দু! ওঠ হিন্দু! অরুণ-উদয়ে ॥"

এই কবি-গীতি রূপ বর্তমানের কর্তব্য-নীতি-সুত্রটি বেন আমরা কুত্রাপি কাহারও কোন কবীর বঁকে বা কোন মেথার কুহকে কমাচ না জ্বলি।

ভাবিয়া দেখিলে, ভারতীয় হিন্দুর তত্ত্ববিচারে হিন্দুর স্বধর্মচার-সাধন-শুদ্ধ চিন্তেই চরমোৎকর্ষ-উপাসনার পরমোৎকর্ষ

কল শ্রীহরির শ্রীচরণ-রূপাশ্রয়স্থল! উহাই হিন্দুর প্রকৃত বদেশ! কোন পরমার্থ-প্রদায়সেবী তক্ত বদকবি গাহিয়াছেন—

"মন! চল নিজ নিকেতনে ॥

সংসার-বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে ?"

তত্ত্বদৃষ্টি-পূত নেজে এ মর্ত্য্য-সংসারক্ষেত্র বিদেশ বৈ কি। অগচ এই বিদেশেই সেই বদেশবাত্ম্যর পথের সম্বল কর্মব্যোগের ধর্ম-বল সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। উহা আর কুত্রাপি মিলিবে না। এই জন্তই এই মর্ত্য্য-সংসার কর্মভূমি। স্বর্গ-নরক দুইই জীবেক ভোগভূমি। ইষ্টচরণাশ্রয়ই কেবল মোক্ষভূমি। মুক্তের আর পুনরাবুত্তি নাই। এই জন্তই গীতার শ্রীভগবান গাহিয়াছেন—
"বদগচ্ছা ন নিবর্ত্তন্তে তচ্ছাম পরমং মম।"
অর্থাৎ—

বখা গেলে নাহি প্রত্যাগতি ।

সে মম পরম ধাম অতি ॥

কর্মকলের বীজস্বরূপ বাসনার ধ্বংস হইলে তবে জীব মোক্ষপ্রাপ্ত বা মুক্ত হয়; সুতরাং পুনঃ বাসনা-বীজোদ্ভূত অদৃষ্ট-বৃক্ষ-বাত কর্ম-কল তক্ষণার্থে মোক্ষধাম ছাড়িয়া আর কর্মভূমি মর্ত্য্যধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। তগবচ্চরণ-রূপাশ্রয়-স্থান—সেই পরম-প্রেম-রসাবিষ্ট ইষ্টধামই তত্ত্বদৃষ্টরূপে মর্ত্য্য-মানবের বখার্থ বদেশ। বৈকুণ্ঠ, গোলোক, স্বর্ধ্যলোক, গাণপত্যলোক, দেবী-লোক, শিব-লোক বা কৈলাস, শঙ্ক ইষ্টোপাসনা-ভেদে যে কোন পৌরাণিক মোক্ষধামের নাম করুন না কেন, কদকথা "বদগচ্ছা ন নিবর্ত্তন্তে" বাক্যের বিষয়ীকৃত ইষ্টপ্রেম্যাশ্রয়

রূপ চিরবিপ্রামহুলাই পরমার্থসাধকের বথার্থ
 বদেধ। অতএব অবশ্য-গন্তব্য সেই বদেধের
 একান্ত আবশ্যকীয় ধর্ম-পাথের সংগ্রহের
 অপেক্ষাতেই কল্পভূমিকেও 'বিদেধ' বলিয়া
 উপেক্ষা করার যোগ্য নাই। সুতরাং বদেধী
 আন্দোলনে এই ভ্রমজ্ঞানীর "সংসার-
 বিদেধে" যদি ইহলৌকিক সর্ববিধ উন্নতিরই
 সত্য মাত্র করিতে হয়, তবে তাহাও সামান্য
 কথা নয়। ফলতঃ হিন্দুধর্মের অব্যাঘাতে
 বদেধী আন্দোলনের শুভফল হিন্দুর ঐহিক-
 পারায়িত্ব, উত্তরবিধ সিদ্ধি-সমুদ্রেরই অব্যর্থ
 সম্বল হইতে পারে। স্বধর্মাচারের অব্যা-
 হতিতে হিন্দুর আত্মরক্ষার অবিরোধী স্বা-
 লম্বন-নিষ্ঠ বদেধী সাধন হিন্দুর বাহ্যোন্নতির
 সঙ্গে ২ আত্মোন্নতিরও একত্রে অবলম্বন।
 বদেধী বর্জনের সঙ্গে ২ বিবিধ অশুদ্ধ
 নিবন্ধ বিদেধী বস্ত্র বর্জনে হিন্দুর ধর্মাচার
 রক্ষার সর্বাঙ্গত ফল আধ্যাত্মিকতারও বে
 উন্নতি অবশ্যস্বামী, তাহাতে চিন্তাশীল
 হিন্দুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব
 সতর্ক—অথচ সূদৃঢ় বদেধী সাধনে আত্ম-
 রক্ষার্থী হিন্দুর স্বার্থবুদ্ধি, সহায়ভূতি—ফলে
 একান্ত রতি-গতি-মতি নিতান্ত প্রয়োজনীয়।
 স্বধর্মাচারের অপ্রতিবুলে—সুতরাং আত্ম-
 রক্ষারই অমুকুলে বে সাম্বিকতাশিষ্টে অবিবেদ-
 বিশিষ্টে নিকার বদেধী সাধন, তাহা আমা-
 দের জগদ্বিষ্ট বৃক্ষবাক্য—জগন্মাত্র গীতা-
 শাস্ত্রেরই উপদেশানুসরণ মাত্র। এতাবত
 এবিধ আত্মরক্ষক বদেধী আন্দোলনে
 আত্মোৎসর্গ করিতে হিন্দু বথান্যথা ধর্মতঃ
 বাধ্য ৮

উপসংহারে, আমরা অজ প্রবন্ধ-প্রতিপাত

বিষয়ে একটি মাত্র আদর্শ উদাহরণ প্রদর্শন
 পূর্বক আমাদের নিবেদন শেষ করিব।
 প্রাচ্য পৃথিবীর মুখোচ্ছন্ন—ইউরোপ-আমে-
 রিকাও ঐর্ধ্যাহল ক্ষুদ্র জাপানরাজ্য—এই
 বহু ও বিবিধ জাতি-ধর্ম সমাকীর্ণ প্রকাণ্ড
 ভারত ভূখণ্ডের ভুলনাথ কত ক্ষুদ্র! উহা
 মহাদেশময় ভারতের একটি প্রত্যঙ্গবিশেষ
 প্রদেশতুল্য। কিন্তু এই প্রাণ্ড মহাসিদ্ধুর
 দ্বীপ-বিন্দু জাপানেও অল্প ২ লোক
 লইয়া অনেকগুলি জাতি-ধর্ম সম্মিলিত।
 প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম, নিটে, ধর্ম,
 কঙুগিয়ান্ ধর্ম, আদিম বৌদ্ধধর্ম,
 আধুনিক বৌদ্ধধর্ম, খৃষ্টান ধর্ম, মুসলমান
 ধর্ম, ইত্যাদি। এই সমস্ত জাতিধর্ম-ভেদে
 সামাজিক আচার-ব্যবহার ও ক্রিয়া-কর্মেরও
 অল্প-বিস্তর ভেদ আছে। কিন্তু তথাপি
 দেশের কাজে সব একপ্রাণ! এক জাপান-
 মাতৃভূমির সম্ভান! তাই বদেধীরতার সেই
 মায়ের সেবার সকলেই সমকর্তব্যকারী ও
 সমদারিত্বধারী ভ্রাতা।—সামাজিক অনেকখ
 সম্বন্ধেও, রাজনৈতিক ও প্রজাতনৈতিক একত্রে
 গাঁথা। সুতরাং জাপানের জাতীয় জীবন
 রাজতন্ত্র ও প্রজা-শক্তির সুসম্মিলনে ঐক্যে
 সম্বন্ধে সমলক্ষ্যে একসূত্রে বাঁধা। তাই
 জাপান আজ আদর্শ দেশ, সার্থক অরণো-
 দয়-দেশ (Land of rising Sun)—
 এশিয়ার গৌরব-ভূমি—আশার ধনি, পূর্ব-
 পৃথিবীর মুকুট-ধনি! জাপানের এই জগন্ত
 জীবন্ত দৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়াও কেহ কেহ
 বলেন, "এক দেশেই বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-
 গণের সামাজিক সম্মিলন অর্থাৎ—আহারে
 আচারে, আদান-প্রদানে একীকরণ ভিন্ন

একতা সংস্থাপন ও স্বদেশীয় জাতীয় জীবন সংগঠন অসম্ভব; অতএব ভারতে সব 'এক চালাও' একাচার—একাকার চালাও: * হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, শিখ, পার্শী, প্রভৃতি পরস্পরের আদান-প্রদান ও কোজা-রতা বিধান দ্বারা সকলেরই সম্মতিচারিত্ব—জাতীয় বিশেষ একত্রে মিলাইয়া গুলাইয়া, এক প্রকাণ্ড খঁচুড়ী পুস্তত করিয়া, ভারত-মাতার ভোগ লগাও! তারপর সেই ভোগের প্রসাদ পাও এবং তারই বণে—তারই ফলে 'স্বদেশী' সাধনে সুসিদ্ধ হও।" হিন্দুর আত্মরক্ষার প্রতিকূল—নরং আত্ম-হত্যারই অসুস্থ এই মোহাক্রান্ত মতে হিন্দুর একান্ত অমত। আত্মনিবেশ হারাইয়া, বাহু লাভের অশেষও কার্যতঃ কিছুই নয়। স্বার্থের সমতুল্যে, ধর্মীচারের বিধিগতও ঐক্য লব্ধ অসম্ভব নয়। আবার সমধর্মী জাতিদেরও স্বার্থের সংঘর্ষে ঘোর সংগ্রামও সংঘটিত হয়। অতীতসাক্ষী

ইতিহাসে উদাহরণের অভাব নাই। কৌরব-পাণ্ডব, মোগল-পাঠান, রাজপুত-মহারাজা, চীন-জাপ, বুঝ-বুটিশ, ইহারা এক হিন্দু, মুসলমান, নৌক, খৃষ্টান রূপে সম-জাতিধর্মী হইয়াও, শুধু স্বার্থ-সংঘর্ষেই পরস্পর ঘোর সংগ্রাম করিয়াছে। 'হেগ' নগরের শান্তি সমিতি ত কালি বসিয়াছে, কিন্তু পরশু পর্যন্ত পাশ্চাত্য খৃষ্টান রাজারা স্বার্থ সংঘর্ষে সজাতি সমধর্মী সঙ্গ রণরঙ্গ মতিরাছেন। ভারতে বহুবিধ জাতি ধর্মীর একত্র বাস থাকিলেও, অধুনা এক রাজতন্ত্রে, এক শাসন-ধরে, প্রায় একরূপ বিধি-ব্যবহার ও প্রায় একরূপ নৈতিক অবস্থায়, স্বার্থ-সাম্যত্বে একতা সংস্থাপন ও ভারতীয় প্রকৃতনৈতিক জাতীয় জীবন সংগঠন অসম্ভব বা অসাধ্য নহে। অথচ কিছু সুসম্ভব ও সুসাধ্যও নহে। তবে কিনা, স্বদেশীভারাগী আত্মিক হিন্দু আশা করেন যে, ভগবৎ-কৃপায় এই স্বদেশী আন্দোলনে ভগবৎ-দিক্কাই 'স্বদেশী' বেশে এদেশে অবতীর্ণ; অতএব অসম্ভব ও সুসম্ভব হইবে, অসাধ্য ও সুসাধ্য হইবে। সর্গ-শক্তিমান বিশ্বাত্মা ভগবানের সান্নিধ্য সহায়তায়, তাঁহার চিরচরণাশ্রিত হিন্দুজাতি আত্মরক্ষা করিয়াই 'স্বদেশী' স্বার্থরক্ষার সমর্থ হইবে।—অতর্কিত নির্বিশেষে—ইহ-পরজ উত্তর স্বদেশে 'স্বদেশী' সাধনার সিদ্ধ হইবে।

* অন্নদিন পূর্বে আমাদের "স্বদেশী" প্রভের বিকট ও বাণজ্ঞ বিরোধী "ইংলিস্-ম্যান" পত্র এই ভাবে একটি মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে যে,—স্বদেশী আন্দোলনে ভারতীয় জাতিভেদ ও আচার কুসংস্কার শিথিল হইলে, তদ্বারাই এই 'স্বদেশী' ছজুগু কমিবে; কেননা বিলাতী কাপড়, লবণ, চিনি প্রভৃতি ধর্মীচার-বিরুদ্ধ অশুদ্ধ বস্তু বোধে তৎসমস্ত ত্যাগের তীব্র উচ্ছ্বাস ও আবশ্যিকতা-বোধ থাকিবে না, ইত্যাদি।—কথাটা 'একাকার'-বাদীদের তাবিবার বিষয়। কলে হিন্দুর কোন ত্রয় নাই। ভগবৎকৃপায় হিন্দুর ধর্মীচার বহুবিধাধি-পরীক্ষাপূত।

শ্রীশরদীন্দ্র সিংহ।

(বিঃ সঃ)

বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তি।

(পূর্বাভূতি ।)

(ক) লোকনাথ বুদ্ধ বলিয়াছেন “ইসে
খোতে তিক্খবে ধম্মা, গম্ভীরা, হুদধা, ছবহু-
বোধু সত্তা, পনীতা অতক্কাবচরা, নিপুণা,
পণ্ডিতবেদনীরা, বে তথাগতো সয়ং অতি-
ঞঞার সচ্ছিকস্বা পবেদেতি”।

ব্রহ্মজালসুত্তং ।

হে তিক্খগণ! এই যে ধর্ম সকল (লোক-
ত্তর) ইহারা গম্ভীর, হৃদিশ, হ্ররহুবোধ,
শান্ত, পনীত বা পূর্ণরূপে সমুদ্র, তর্কমাত্রের
অগোচর, নিপুণ বা সুন্দর ও পণ্ডিতবেদনীর।
তথাগত ইহা সয়ং অতিঞার দ্বারা সাক্ষাৎ
করিয়া প্রবেশন বা উপদেশ করিতেছেন।
অতএব বুদ্ধই লোকুত্তর ধর্মের আবির্ভূত।

(খ) বৌদ্ধদের সীলবৃত্ত পরামাগ নামক
সংযোজন বা বন্ধনের বিবরণ আছে “ইতো
বহিদ্ধা সমন ব্রাহ্মণানং ইত্যাদি”।

ধম্মসঙ্গনি; নিক্খেষকাত্ত।

অর্থাৎ এই শাস্ত্রের (বৌদ্ধ শাস্ত্রের)
বাহিরে যে সীল-ব্রতের দ্বারা শুদ্ধি ইত্যাদি,
তাঁহাই উক্ত বন্ধন। অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রের
বহির্ভূত অস্ত্রশাস্ত্রের দ্বারা বন্ধন মোচল
হয় না, অর্থাৎ তাঁহাতে নির্করণের প্রকৃত
মার্গ নাই।

(গ) বৌদ্ধশাস্ত্রে সাংখ্য বোগী-ধ্বি-
গণের উল্লেখ নাই। যদি তাঁহারা পারদর্শী
হইতেন, তবে অবশ্য উল্লেখ থাকিত। এত-
দূতরে বক্তব্য এই যে—আর্ষশাস্ত্রের বৌদ্ধ

যে ব্রহ্মলোকের গমন পর্য্যন্ত, লোকাভীত
নির্করণ যুক্তি যে আর্ষশাস্ত্রে নাই, ইহা
অসঙ্গতা মাত্র। পূর্বেই ইহা প্রদর্শিত
হইয়াছে।

বৌদ্ধদের প্রথম যুক্তিতে যে “তথাগত
সয়ং সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ করিতেছেন”
এই বাক্য আছে, তদন্থস্থ ‘সয়ং’ শব্দের
অর্থে কেবল তথাগতই উহার আবির্ভূত,
এরূপ নহে। উহার অর্থ—তথাগত নিজে
সাক্ষাৎ করিয়া বলিতেছেন; তিনি বা না
অনুভব করিয়া বলেন নাই।

বৌদ্ধদের “দিট্টুপাদান” (মিন্যাদৃষ্টি
গ্রহণ করিয়া পাকা) নামক দোষের বিব-
রণে আছে :—“ন থ বোকে সমন ব্রাহ্মণা
যে সমগ্গতা পটিগরা। যে ইমঞ্চ লোকং
পরঞ্চ লোকং সয়ং অতিঞঞার সচ্ছিতস্বা
পবেদোস্তীতি।” (ধম্মসঙ্গনি। উপাদান
গোচ্ছকং) এতলে ‘সয়ং’ শব্দের অর্থ ঠিক
উপরের স্থায়। বিশেষতঃ কেমন প্রমণ ও
ব্রাহ্মণ যে সর্কোচ্চপদ লাভ করিয়া তদ্বিবরে
উপদেশ করেন নাই, ইহা ছষ্ট মত। এই
ছষ্ট মত (দিট্টুপাদান) অবশ্য বুদ্ধদেবের
ছিল না, অর্থাৎ তিনি অবশ্যই পারদর্শী
সমন ব্রাহ্মণের সন্তিত্ব স্বীকার করিতেন
ও তাঁহাদিগেতে শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন।

বৌদ্ধদের তৃতীয় যুক্তিতে বক্তব্য এই
যে—নির্করণ ধর্ম যে পূর্বকাল হইতে প্রচ-
লিত ছিল, এই বিষয়ে সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র
অনুপ্রাণিত। বৌদ্ধশাস্ত্রের সর্বত্রই কতক-
গুলি সাধারণ বাক্য পাওয়া যায়। সেই
সমস্ত stock passages বা সাধারণ বাক্য
সর্বত্রই উদ্ধৃত দেখা বাওয়াতে, তাঁহা অতি

প্রাচীন এং বুদ্ধদেবের সুখনিঃসৃত বলিয়া অস্বপ্নিত হইতে পারে। তাঁহাদের তৃতীয় ধ্যানের লক্ষণে আছে, “বস্ত্রং অরিয়া আটিক্-খন্ডি উপেক্ষকো সত্তিমা সুখবিহারীতি” অর্থাৎ ধ্যান বিষয়ে আর্থ্যেরা বলেন “উপেক্ষক, স্তুতিমান্ সুখবিহারী।” এই আর্থ্যেরাওকে, বুদ্ধদেব কোন্ আর্থ্যদের কথা উক্ত করিয়াছেন? অবশ্যই তৎ-পূর্বেকার যোগাচার্য্যদের বাক্য। তাঁহাদেরই বুদ্ধদেব আর্থ্য বা পারদর্শী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ ধ্যানচর্চা যে পূর্ন হইতেই ছিল, বুদ্ধের শিক্ষক আড়ার কালান, (ঐহাকে অখবোষ বুদ্ধচরিতে সাংখ্য-সভাবলম্বী বলিয়াছেন,) তিনি যে ঐ সব ধ্যানে পারদর্শী ছিলেন, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহার স্পষ্টই উল্লেখ আছে। সঙ্খমিনিকার, অখ-পালিনি প্রভৃতি স্রষ্টব্য। ইহাতে কোন কোন বৌদ্ধেরা বলিবেন যে, উহা পূর্নতন বুদ্ধদের উক্তি অস্বপ্নারে বলা হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী বচনে বলিলে That is looking too far back, কারণ পূর্নবর্তী কাশ্মপ বুদ্ধের ২০,০০০ বৎসর পরমায়ু ছিল। তাঁহার ধর্ম ৭০,০০০ বৎসর বর্তমান ছিল; পরে লোপ হইবার বহু বহু সহস্র বৎসর পরে গৌতম বুদ্ধ হন।

প্রকৃত পক্ষে বুদ্ধের কথানান্তী বলিয়া এনিদ্ধ অধিকাংশ বৌদ্ধশাস্ত্রেই তাঁহার অনেক পদে রচিত। মনে কর, ব্রহ্মজাল

• কতদো চ পুণ্ণগো অরিয়ো? অট্ট-
ঠারিঃ পুণ্ণগো অরিয়? অবসেসা পুণ্ণগো
অনসিয়া। অর্থাৎ বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধাদি
অষ্ট প্রকার পুরুষ আর্থ্য।
(পুণ্ণগল পঞ্জতি একক)

স্বজ; ইহার শেষে আনন্দ বক্তা থাকতে, উহা আনন্দের পরবর্তী কোন যোগের দ্বারা রচিত। বিশেষতঃ বখন বুদ্ধ ঐ স্বজ বলেন, তখন দশ হাজার লোকখাছু কল্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইত্যাদি অলীক কথা থাকতে, বখন তাদৃশ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা বাইতে পারে, বখন তাহার জীবিত সাক্ষী ছিল না, তাদৃশ উত্তর কালে উহা রচিত বলা বাইতে পারে। সেইরূপ যে সমস্ত স্বজ বুদ্ধ, পূর্নবুদ্ধ বা স্বীয় পূর্নজন্মকাহিনী বলিয়াছেন, সেই সব স্বজও কারনিক। বস্ততঃ তাহার উত্তর কালে বুদ্ধের সাহায্য ও সর্লশ্রেষ্ঠতাও একটি একটি ধর্ম-নীতি ব্যাখ্যান জন্ম রচিত হয়।

একথা নিশ্চর ছিল যে, বুদ্ধ তাঁহার পূর্ন হইতে প্রচলিত যোগচর্চা অবলম্বন পূর্নক সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ধর্ম-মূলতঃ পূর্নপ্রচলিত ধর্মের অধমর্গ। কিন্তু পাছে তাঁহার সাহায্যের হানি হয়, পাছে প্রচলিত শাস্তাসকল হইতে তাঁহার পুণ্ণগু ও সর্ল-শ্রেষ্ঠত্বের হানি হয়, ইত্যাদি কারণে তাঁহার অধমর্গতা বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। বস্ততঃ পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম-প্রবর্তিতার ভক্তগণ নিজেদের আদর্শ পুরুষকে ঐরূপ করিয়া গিয়াছেন।†

† বৌদ্ধশাস্ত্রে অশেষ প্রকারে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার বেক্রম সুখা ও গৌণ সুকৌশল দেখা যায়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, বৌদ্ধেরা উহাকে অতি উচ্চ ময়ের fine art করিয়া তুলিয়া ছিলেন। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এই নিকর কেই তাঁহাদের পরমায়ুর করিতে পারে নাই।

পৌরশাস্ত্রকারগণ প্রাচীন কোনও প্রাকৃত ব্যক্তির নাম করেন নাই, কেবল স্বীয় নীর ধারণার অনুরূপ কতকগুলি প্রাচীন শাস্ত্র কল্পনা করিয়া গিয়াছেন এবং স্বর্ণলোকের গৌড়া নৌদের দ্বারা অধি-
 ষাণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন । † এ বিষয়ে হুই একটি উদাহরণ দিগেই; পাঠক বুদ্ধিতে পারিবেন । দীর্ঘ নিকায়ের মহাপদান
 সূত্রে, বুদ্ধ কতকগুলি পূর্ণ বুদ্ধের বিবরণ বলিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে । পৌরদের
 এই প্রচলিত ভদ্রকল্পের পূর্বে ২১৩ম বিপ-
 স্মী (সংস্কৃত বিপশিচৎ), ৩১ তম কল্পে
 সিথী, এই কল্পে ককুগন্ধো (ককুগন্ধ)
 কোণসমনো (কণকমুনি) ও কল্পণ বুদ্ধ
 উইয়াছিলেন । গৌতম বুদ্ধের মত ঠিক
 তাঁহাদের সমস্তই ছিল, মায় সিদ্ধ হইবার
 এক একটি 'বোধিজ্ঞান' পর্য্যন্ত । তাঁহার
 ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতীয় (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়
 জাতীত কেহ বুদ্ধ হয় না) এবং কাশ্মপাদি
 গোত্রীয় ছিলেন । তবে কেহ রাজগৃহে,
 কেহ বারণসীতে, কেহ পাকালদেশে জন্ম-
 গ্রহণ করেন ; আর তাঁহাদের আয়ু ৮০,০০০
 বৎসর হইতে ২০,০০০ পর্য্যন্ত । এসন কি,
 গৌতমের ঋতু তাঁহাদের শরীরের ভ্রাম-
 বশেষ রাখিবার এক বা 'অধিক চৈতোরও
 উল্লেখ আছে । (ইহা "আর্য্যভদ্রকল্পিক"
 নামক মহারান সূত্রে আছে ; ঐ সূত্রে
 আরও ১০০০ ভবিষ্য বুদ্ধের উল্লেখ আছে ।)

আর এক উদাহরণ মহাসুন্দরন সূত্রে ;
 তাহাতে বুদ্ধদেব পূর্ব্বজন্মে কুশীনারার ঐ
 নামীয় চক্রবর্তী রাজা থাকার বিষয়
 বলিয়াছেন । কুশীনারার নাম তখন কুশা-
 বতী ছিল । তাহা অতি সমৃদ্ধ নগর ছিল ।
 তাহাতে স্বর্ণ, রৌপ্য, ক্ষটিক, বৈদ্যার্ণ্য,
 লৌহিলাক (Bloodstone ?) ও সর্ক-
 রত্নসম মাত প্রকার ছিল । প্রাকারে চারি
 চারি ঐ ঐ রত্নসম বার ও দ্বারের ঐ ঐ রত্নসম
 মাত মাত, দশ মাত্মদ উর্দ্ধমুখ ছিল ।
 আর কুশানতীতে সপ্ত তালপত্রি ছিল ;
 ঐ দক্ষতাল ঐ ঐ রত্নসম । কোনটার
 গেনার স্বক, রূপার পাতা, মণির ফল,
 কোনটার বা রূপার স্বক, গেনার পাতা,
 মণির ফল ইত্যাদি । আর মহাসুন্দরন
 রাজার পক্ষীরাজ হাতী ও ঘোড়া ছিল
 এবং তাঁহার ৮৪০০০ করিয়া জী, প্রাগাদ,
 পাংখাট ; রথ, মন্ত্রী আদি ছিল । তিনি
 ৮৪০০০ বৎসর বাণ্য, ৮৪০০০ বৎসর যৌবন
 ইত্যাদি পরিমিত আয়ুষ্ক ছিলেন, ইত্যাদি
 ইত্যাদি । *

বুদ্ধদেব অবশ্য জিকালজ ছিলেন, কিন্তু
 যিনি সত্য এবং বাক্য, কাম ও মনের ক্ষুভার
 বিষয় এত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি

* এই স্বর্ণ-রৌপ্য-মণি আদি লইয়া
 বাণোচিত কল্পনার পর এই সূত্রে যে সুন্দর
 নির্কাণধর্ম্মনীতি আছে, অবশ্য তাৎপর্য কোল
 কথা নাই । তাহা যথা—

অনিচ্ছা বত সংখার উপ্পাদবম ধর্ম্মিনো ।
 উপ্পাভিত্তা নিবজ্জন্তি চেতসঃ বৃশসমো
 সুখাতি ॥ অর্থাৎ আনন্ড্যাত সংস্কার উৎ-
 পাদ ব্যয় ধর্ম্মিনঃ । উৎপত্ত চনিককান্ত
 চেভাং ব্যাপশসঃ সুখঃ ॥

† "মোদন্তি বত ভো দেবা তানতিংসা
 সউৎসকা । তথাগতঃ নমস্গতা ধম্মসু চ
 সুসমততি ॥ মহাগোবিন্দ সূত্রঃ ।

যে এরূপ বালোচিত কল্পনার দ্বারা স্বীয় মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন, ইহা কখনই বিখ্যাত্য নহে। কারণঃ তাঁহার ভক্তগণ কয়েক শতাব্দীর পরে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন কর্ত্তা ঐ সব গল্প রচনা করিয়াছেন এবং প্রাচীন কোন প্রকৃত ব্যক্তি তাঁহার অধমগণতা স্বীকার করেন নাই, কতকগুলি কাল্পনিক উপাখ্যান সৃজন করিয়া গিয়াছেন মাত্র।

বৌদ্ধগণ আরও বলেন, ভগবান্ যদি স্বীয় শিক্ষকদের নিকট নির্দোষার্থ সম্যক্ শিখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বোধিসূত্রে ছয় বৎসর 'ভূজিরা' বা কঠোর আচরণ করিতে হইত না। বোধিসূত্রে গৌতম যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহার যে বিবরণ অধুনা পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধের অনেক পরে লিপিবদ্ধ হয় এবং তাহা বহু পরিমাণে অলৌকিক কল্পনামিশ্রিত। মহাবাহু মার, মারামধু, মারামুচর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ, গৌতম মনে কি কি চিন্তা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ, ব্রহ্মাদি দেবগণের আগমন ও অসুরোধ ইত্যাদি বিবরণ যে অলৌকিক কল্পনা, তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাজেই বুঝিবেন। ভাদৃশ কাল্পনিক আখ্যানিকার রচনিতারা বুদ্ধের অধমগণতার অপলাপ করিয়া মৌলিকতা সম্যক্ প্রতিপাদিত করিবার জন্য এরূপ কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বস্ততঃ মৌক্তমার্গের জ্ঞান হইলেই নির্দোষ সিদ্ধ হয় না, কঠোর সাধনের দ্বারা উহা সিদ্ধ হয়। গৌতম ছয় বৎসর প্রাণত্যাগ দ্বারা সমাধি-সিদ্ধ ও বুদ্ধ হইয়াছিলেন। বুদ্ধদর্শনকে আছে "ন ভজ

দক্ষিণা অস্তি নাবিবাংসন্তপস্বিনঃ" অতএব গৌতম যদি মৌক্তবিরোধী কোন কঠোর তপঃ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি পূর্ক্ প্রচলিত মৌক্ত-বিজ্ঞান কতক অনভিজ্ঞ ছিলেন, ইহা বলিতে হইবে। আর যদি তিনি পূর্ক্ প্রচলিত উপনিষদ মৌক্ত মার্গে সুশিক্ষিত ছিলেন, স্বীকার করা যায়, (বৌদ্ধেরা বলেন, তিনি সমস্ত বিজ্ঞান পারদর্শী ছিলেন) তাহা হইলে তিনি উপনিষদ্বক্ত প্রথার "অকাম, নিকাম, আশুকাং" হইয়া 'পরম, অপর, অমৃত' পদে সমাহিত হইতে পারিয়াছিলেন। পরে দেখাইব যে, উপনিষদ্বক্ত পরম পদকে তিনি অতিক্রম করেন নাই এবং কেহ করিতেও পারে না। তবে তিনি যে প্রকৃত ভাবার মৌলিক ভাবে মৌক্তত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় এবং সেই স্মৃতিবলম্বন করিয়া তদীয় ভক্তগণ পরে তাঁহাকে মৌক্তমার্গের অদ্বিতীয় আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ সাংখ্য ও যোগকে অপ্রাচীন মনে করিয়া বৌদ্ধদের প্রাচীনতা স্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ দেখা যায় :—

(১) বৌদ্ধশাস্ত্রে ৬২ প্রকার 'মিত' নিরসিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সাংখ্য মতের উল্লেখ বা নিয়ম নাই।

(২) সাংখ্যের পুস্তক সকল অপ্রাচীন বৌদ্ধ মত হইতে গৃহীত।

অতএব হস্তিধর্শন ভ্রামের মত ঠিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিক্রাণ ধর্মের আলোচনা করা। তাঁহাদের ভাবার

নির্দোষধর্মশাস্ত্রের কোন শব্দ নাই বলিলেই হয় এবং তাঁহার উহার বহিস্তর বাতীত অন্তরের কিছুই বুঝেন না। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের দার্শনিক মত বিচার পূর্বক কোনও তত্ত্ব স্থির করা যে সর্বতোভাবে ভ্রমপূর্ণ হইবে, তাবিসরে সংশয় নাট। বাহা হটক, তাঁহাদের যুক্তি কতদূর সঙ্গত, তাহা দেখা বাউক।

বৌদ্ধশাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার মত নিরসিত হইরাছে, তাহা সমস্তট মৌক্ষধর্মের প্রত্নিক। তাহার যেমন বৌদ্ধদের হের, সেইরূপ আর্য মৌক্ষশাস্ত্রেরও হের। সুতরাং এরূপ হইতে পারে যে, যোগমত বুদ্ধদেবের নিকট অনন্য ছিল বলিয়া, তাহাট তাঁহার অনন্য ছিল; সুতরাং তিনি উহার সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই এবং তজ্জন্ম পরনর্তী বৌদ্ধ শাস্ত্রকারগণও সে বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন নাই। ব্রহ্মজাল সূত্রে আছে যে, “পূর্বপ্রচলিত কোন কোন অর্থোক্তেরা অন্তঃ, পথান, অহুযোগ, অপ্রমাদ সমাক্ সননিরোধের দ্বারা সমাধিসিদ্ধ হন, তাহাতে তাঁহাদের চিত্ত পরিশুদ্ধ, পর্যাবদাত, অনঙ্গন ও উপক্লেণশূন্য হয়”। এই পূর্বপ্রচলিত সাধন বৌদ্ধেরাও অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উহার দ্বারা কুদ্ভ সিদ্ধিলাভ করিয়াই কৃতার্থমন্ত্র হন, তাঁহাদেরই বৌদ্ধেরা নিশ্চয় করেন। অতএব পূর্বপ্রচলিত যোগ-সাধন যে বৌদ্ধেরা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়।

কৃত্যতঃ ব্রহ্মজাল সূত্র, বাহাতে ঐ ৬২ মত হের রূপে উক্ত হইরাছে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ “নইতো বহিছা” এই বাক্যের দ্বারা

আর তাহা ছাড়া অস্ত্র ক্রমত নাই, এরূপ বলা হইরাছে। যেমন শাখতবাদী বাহার আছে, তাহার সেই গ্রন্থোক্ত চারি প্রকারের। তদ্বাতীত আর কোনরূপ শাখতবাদী নাট, ইত্যাদি।

কিন্তু আবার পাশ্চাত্যগণের মতে বাহা বুদ্ধোপেক্ষা বহুপ্রাচীন উপনিষৎ*, সেই বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্যে যে ব্রহ্মপাণ্ডির

* পাশ্চাত্যদের মতে-প্রাচীন যে দশ বার খানি উপনিষদ্ আছে, তাহার কতকগুলি বুদ্ধের পূর্বতন বা pre-Buddhistic যেমন বৃহদারণ্যকাদি এবং কতকগুলি বুদ্ধের পরনর্তী বা মুণ্ডক, খেতাশ্বতর আদি। দুই একটি ক্ষীণ স্থানবলম্বন করিয়া ম্যাক্স মুগারাদির যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহাই এ বিষয়ে যুক্তি। আর সেই সন ধারণাকে গ্রন মত্য মনে করিয়া এ দেশের পন্নবগাঠী অনেক লোক গ্রহণ করিতেও পরাধুখ নহেন। মুণ্ডকোপনিষৎ কেন বুদ্ধের পরে? না উহা মুণ্ডকদের উপনিষৎ, আর বৌদ্ধ সমাধীরা মুণ্ডিত হটতেন, অতএব উহা বৌদ্ধদের পরে। কিন্তু উহাতে যে বজ্জের অনরতা উক্ত হটরাছে, তাহা অবশ্যই বৌদ্ধ ধর্ম হইতে গৃহীত।

এই সন হাশ্বাস্পদ যুক্তির উত্তরে বক্তব্য এই যে, মুণ্ডক-আশ্রয় বুদ্ধের বহু পূর্ব—অনির্গের কাল হইতে প্রচলিত ছিল। বুদ্ধও তৎপ্রথা অহুসারে মুণ্ডকশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন। আর মুণ্ডকোপনিষদের মত বৃহদারণ্যক হটতে কিছুই পূর্ণক নহে। আর সে সমস্ত শব্দ-দর্শাদি নির্দোষ ধর্মের আচরণ বুদ্ধদের সহিত মিলে, তাহাও বুদ্ধের পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল, ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রে তুরাত্মরঃ উক্ত হটরাছে এবং pre-Buddhistic উপনিষদেরও আছে।

প্রত্যুত সর্বোপেক্ষা অপ্রাচীন বলিষ্ঠ

উপদেশ আছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার মোটেই উল্লেখ নাই। নপুংসকলিঙ্গ ব্রহ্মশব্দ, তদ্ব-
নসি, ওঙ্কারমূলক সাধন, আত্মা বৌদ্ধদের

খাত খেতাখতর উপনিষদেও বুদ্ধের পূর্নি-
বর্তী, ইহা পাশ্চাত্যগণের বুদ্ধি-প্রণালী
অবলম্বন করিয়া প্রমাণীকৃত হইতে পারে।
খেতাখতরে “কালঃ স্ত্রীভাবো নিমতির্গদিচ্ছা
ভূতানি গোনিঃ কবয়ো বদন্তি” ইত্যাদি
যে পূর্নিবর্তী প্রদান প্রদান মত উক্ত হই-
য়াছে, ইহার কোনওটি বৌদ্ধ মত নহে।
বুদ্ধের সমসাময়িক আজীবনকাদি সম্প্রদায়ের
সহিত ইহার কোন কোন মতের মাদৃশ
আছে বটে, কিন্তু তাগা সে সেই সময়
উদ্ভাবিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই।
তাহা পূর্বে সংস্কৃত বঙ্গের চর্চিতেও পচলিত
পাকিতে পারিত। আর শ্রুতির মধ্যে
খেতাখতর উপনিষদেই প্রাণায়ামের বিশেষ
উপদেশ আছে। বুদ্ধও প্রথমে প্রাণায়াম
করিয়াছিলেন। মানবদি ধর্মশাস্ত্রেও
প্রাণায়াম গৃহীত দেখা যায়। সত্তর (ক)
জ্ঞান প্রাচীন গ্রন্থ (যাহাতে বৌদ্ধ মতের
বিশু মাত্রাও অভাষ নাট), ঐতিহ্যে মতের
একমাত্র প্রমাণ, তাহা যে বেদনিত না
হইলে প্রাণায়াম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা
কখনই সম্ভবপর নহে। সুতরাং উহা
খেতাখতর হইতেই গৃহীত হইয়াছে বলিতে
হইবে। বুদ্ধ ও তৎসময়ের আর্য সভাবলস্বী
প্রাণায়ামীগণের অবশ্য ঐ শ্রুতিই প্রমাণ
ছিল।

পাশ্চাত্যদের মতে সর্বাণেক পাচীন
যে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ, তাহাতে যে মোক্ষ
ও ভবাচরণ উক্ত হইয়াছে, বৌদ্ধের তাহার
অধিক কিছুই বলে নাই। পূর্বেই উক্ত
হইয়াছে যে, সমাধি ও সম্যক বিরাগ মুক্তির
কেবল মাত্র উপায়। বৌদ্ধেরও তাহাই
করেন, ধর্মিরাও তাহাই করেন। মোক্ষপর
বৃহদারণ্যকে এইরূপ আছে, যথা—“পাত্ত,

মতেও স্থানিক বা স্থা, মনোময় এবং
সংস্কারময়, এই ত্রিবিধ আত্মা আছে, কিন্তু
উহার অতিরিক্ত উপনিষদ আত্মার উল্লেখ

দাস্ত, উপরত, তিত্তিকু ও সমাহিত হইয়া
আত্মাতে আত্মাকে অবলোকন করিবে।
“যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কাগা বস্ত্র জদি
শ্রিতাঃ,” “অকামঃ নিকামঃ আশুকামঃ,”
“পট্টেশনগা, বিটেশনগা, মোটেশনগা, ইত্যাদি
ভাগ”। কুমতঃ সিনি শাস্ত, দাস্ত, উপরত,
তিত্তিকু হইয়া কেবল অপ্রাক্তরে সমাহিত
হন, আর বাচার জয় সম্যক কামনাশূন্য,
তাদৃশ পুরুষাণকণা বৌদ্ধেরা কিছুই উত্তম
আচরণ করেন না। জন্মের সমস্ত কামনা
জ্ঞান অপেক্ষা আব উচ্চ আচরণ কি হইতে
পারে? বৌদ্ধদের শাস্ত্রে যে ৬২ প্রকার
কুমত আছে, ইহা তাহার অন্তর্গত নহে।
যেই ৬০ প্রকার কুমত কেন হয়, তাহার
কারণ বৌদ্ধেরা এইরূপ বলেন—“সর্কে তে
ছহি কস্মায় তনেচি ফুদ্বু ফুদ্বু পটিষং
বেদন্ত। তেদং বেদনা পচ্চমা হুহ। তুহু
পচ্চমা জাতি জাতি পচ্চমা জরা মরণং
মোক পরিদেব হুকুণ ধোমনসু হু পারাণা
সত্তবন্তি”।

ব্রহ্মলয় স্ত্রী

অর্থাৎ যেই ৬২ প্রকার কুমতাবলম্বীদের
সকলেরই জন্ম মরণাতনের (রূপাদি আচ-
তনের) ম সম্পর্কে পটিষ বা ইচ্ছিমজ মোক্ষ
উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে সুখ দুঃখ বেদনা-
মূলক ভূমি হয়। তুফা হইতে উপাদান
বা গাহভাব হয়। উপাদান হইতে ভব না
জন্মেই বীজ হয়। ভব হইতে জন্ম হয়।
জন্ম হইতে জরা, মরণ শোক, পরিবেদন,
হুঃখ, দৌর্ভাগ্য, উপায়না বা নৈরাশ্য হয়।

কিন্তু উপনিষদে প্রাণায়াম সর্বাধিনা-
শূন্য হইয়া বাস্তব ও মনের অর্গোচর্যের
পদার্থে সমাহিত হইলে, বাস্তবসম্পর্ক
হয় না, এবং তুকাও হইতে পারে না।

নাট), দহর পুণ্ডরীক বিষ্ণুর (বৌদ্ধেরা
ইহার কিছু গ্রহণ করিয়াছেন) প্রভৃতির
ব্রহ্মজালাদি বৌদ্ধ মূর্ত্তে নামগন্ধও নাট।
অতএব বৌদ্ধ মূর্ত্তে সাংখ্যমতের উল্লেখ
না থাকিলে, উহার অপ্রাচীনতা প্রমাণ
হয় না; কিন্তু উহা বুদ্ধ যে তের পক্ষে নিক্ষেপ
করেন নাট, উহাই অসুস্থিত হয়।

আর অত্র কোন দোষও হয় না। তবে
ঋষিগণ বলেন, তখন ব্রহ্মণী আত্মায় স্থিতি
হয়, আর বৌদ্ধগণ বলেন, তখন নির্কারণে বা
অসঙ্গত ধাতুতে স্থিতি হয়। এই দুই পদের
ভেদাভেদ “বৌদ্ধ দর্শন ও আত্মা” প্রবন্ধে
উক্ত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকে অর্চিগাদি সার্গে ব্রহ্মলোক
গমনপূর্ব্বক এক প্রকার সংসার-সোক বা
অপনরাবৃত্তি পীড়িত আছে। আর “ন তত্র
প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোত”
এই পক্ষের বিদেহটেকন্যা রূপ সর্লোচ
পদ পীড়িত আছে।

বৌদ্ধদেব অনাগামিভ এনং (অর্হতের)
পরিনির্কারণ উহারই অধুবর্ত্তন।

(ক) মম্বর প্রাচীনতার ছট একটি
যুক্তি এ স্থলে নিবন্ধ হইতেছে। মম্বতে
সহস্রগ প্রাণার কিছু মাত্রও প্রমাণ নাট,
কিন্তু মহাভারতের মূল ঘটনা অত্মদ্বারে
মাত্রী পাণ্ডুর সহিত অমুমতা হন। গ্রীক্—
দুগ মেগেস্ থনস্ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে
সময়ে এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পচলিত দেখিয়া বান।
চতুর্দশশতী সচস্র শ্লোকায়ক যে মূল ভারত
বেদব্যাস রচনা করেন, তাহা অতি প্রাচীন।
আখণায়ন, পাণিনি প্রভৃতির পূর্বে যে
মহাভারতের মূল সাংখ্যিক প্রচলিত ছিল,
তাহা তাহাদের গ্রহ হইতে জানা যায়।

যখন সহস্রগের মাত্র এক প্রাচীন বিশ্ব
মম্বতে নিবন্ধ নাই, কিন্তু মহাভারতের মূল

পাশ্চাত্যদের দ্বিতীয় যুক্তিতে ব্যক্ত
এই যে—প্রচলিত সাংখ্য গ্রন্থের মধ্যে
ঐখর কৃষ্ণের কারিক, সাংখ্য মূর্ত্ত ও

ঘটনায় নিবন্ধ বহিঃক্ষে, তখন মম্ব যে তদ-
পেক্ষা বহু প্রাচীন, তৎপক্ষে সংশয় নাট।

বেদের মন্ত্র ব্রাহ্মণভাগ হইতে জানা যায়
যে, মম্বস্যায় শত বর্ষ পরমাম্ব, এই দিগ্বাগই
তৎকালে প্রচলিত ছিল পূর্ব্ব মম্বস্যায়
দশ বিশ সচস্র বর্ষ পরমাম্বুর বিবরণ কুত্রাপি
দেখা যায় না।

কিন্তু পুরাণে ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঐকপ
অত্যাধিক মম্বস্যায় আয়ুর উল্লেখ দেখা
যায়। মম্বতে ৮০০ বৎসর কৃতযুগের পর-
মাম্বর সমাধি নিশ্চিত আছে। সুতরাং মম্ব
লৌকিক যুগ ও বুদ্ধযুগের সম্যবর্ত্তী সময়েই,
ঐকপ সম্মান করা যাইতে পারে।

মম্বতে ঐক্শুণ, পুরুষ, প্রকৃতি আদি
সাংখ্যীয় পরিার্থের প্রমাণ আছে। আর
মম্বতে যে সমগ্রাণ চর্গা আছে, বৌদ্ধ ভিক্ষু-
দের মীল তাহাকে কোন অংশেই অতিক্রম
করে না।

গৌতম সকালে অপর মন শাস্ত্রাপেক্ষা
সমক্ শৌনসম্পন্ন হইতে পারিতেন, কিন্তু
ঐ “মীল পারিপূরিয়ার” তিনি আদিকঠা
নন। অনেক মনে করেন, অহিংসা দর্শ
বৌদ্ধদেবট আদিকার; উহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তি।
বস্তুতঃ বৌদ্ধ শাস্ত্রে অহিংসা শব্দের ব্যবহার
মোটই নাট। “পানতি পাত পটিনিতর”
“অন্যাপাদ” এই শব্দসম অহিংসা শব্দে
ব্যবহৃত দেখা যায়। হিংসারের গলিত
পত্র ফল ভক্ষণ প্রভৃতি কঠোর নিয়ম
গৌতমের বহু পূর্ব্ব নিয়ম হইতে প্রচলিত
ছিল। কি পূর্ব্ব কি পরে বৌদ্ধাপেক্ষা
আর্হমতাবলম্বীগণ অধিকতর অহিংসাপরায়ণ
ছিলেন। কৃত, কারিত ও অম্বসোভিত,
এই ত্রিবিধ হিংসার বিবরণ বৌদ্ধেরা জানেন
না। দেবদত্তের সহিত সাংসতক্ষণবিষয়িত

সত্য যোগস্বরূপ, এই তিন পুস্তক প্রধান ।
খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাংখ্যকারিকার চীন
ভাবার একখানি অনুবাদ হয়, অতএব ঐ
গ্রন্থ তাঁহার পূর্বে কোন সময়ে রচিত ।
কেহ কেহ বলেন, খৃষ্টানের কিছু পূর্বে
উহা রচিত । উহাতে উক্ত আছে যে,
কশিপু * এইতে আযুরি আদিশিষ্য পরম্পরা
ক্রমে ঐশ্বরকক্ষ উহা শিক্ষা করিয়া গ্রন্থিত
করিয়াছেন ; আর উহা আখ্যায়িকা ও
পরবাদনাঙ্কিত । তাহাতে গোপ তয়, বর্তমান
সাংখ্য-স্বদের জ্ঞান এক গ্রন্থ ঐশ্বরকক্ষের
পূর্বে বিদ্যমান ছিল । শঙ্করাচার্য্য উহা
হইতে কোনও স্বত্র উদ্ধৃত করেন নাই
বলিয়া যে উহা শঙ্করাগেফা নপাচীন, তাহা
স্বার্থ নহে । বস্তুতঃ শঙ্কর দুই এক স্থলে
স্বত্র সাংখ্য-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । বহু
বহু উদ্ধৃত করিলে বরং ঐ মত সম্ভবপর
হইত । তবে ঐ স্বত্রগ্রন্থে পরবর্তী অনেক
আচার্য্য যে স্বকালে প্রচলিত পরবাদের
খণ্ডনার্থ বীর স্বত্র সকল লক্ষিপু করিয়াছেন,
তাহা নিশ্চয় । কিন্তু উহাতে প্রাচীন
সাংখ্যমতের যে অধিকাংশ রক্ষিত হইয়াছে,

লটর। বুদ্ধের সমভেদ হয় । গৌতম
ভিক্ষুদের সাংস-ভক্ষণ নিষেধ করেন নাই ।
গৌতম উপাসকেরাও সমস্ত পশুস্বপ
ভিক্ষুদের আহার করাইত । সুতরাং
অহুঃসাদিত-হিংসাবিরতি বৌদ্ধদের নাই ।

* বৌদ্ধদের আখ্যায়িকায় বুদ্ধের পূর্ব-
পুরুষ ইক্ষ্বাকু (পালি-ওক্কাকু) রাজার
সময় এক কশিপু বর্তমান ছিলেন, তাঁহার
সম্মানার্থে 'কশিপবস্ত' নাম হয় । আবার
সত্যস্বরে কশিপু বর্ণের মুক্তিকা ছিল বলিয়া
কশিপবস্ত নাম হয় ।

তাহাতেও সন্দেহ নাই । অনেক স্বত্র কারি-
কার সহিত অবিকল মিলে ।

প্রচলিত সাংখ্য গ্রন্থের মধ্যে যোগতাস্ত্রই
প্রধান । বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন "সাংখ্যাদি
দর্শনাশ্লেষঅট্টোব্যাংশেবু কল্পংশঃ" বেদব্যাগ-
রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ এই পুস্তক অতি
প্রাচীন ; এমন কি, প্রচলিত বৌদ্ধ শাস্ত্রা-
গেফাও প্রাচীন । ইহার প্রাচীন অপ্রচলিত
শব্দপূর্ণ সরল ভাষা, প্রাচীন ও অধুনা লুপ্ত
পুস্তক হইতে বচন উদ্ধার প্রভৃতি ইহার
প্রাচীনতার সম্যক্ প্রমাণ । "শ্রামণ্য কল-
স্বত্র" একখানি অতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ,
তাহাতে এই যোগতাস্ত্রের বচন প্রায় অবি-
কল উদ্ধৃত দেখা যায়, যথা প্রাকাম্য ও
প্রাপ্তি সিদ্ধি সম্বন্ধে যোগতাস্ত্র :—
"ভূমাবু-
অঙ্কতি নিমজ্জতি যথোদকে । অঙ্গুল্য-
গ্রেণ স্পৃশতি চন্দ্রমঙ্গলং ।" ৩। ৪৫।

শ্রামণ্যফল স্বত্র যথা—
"পথনিয়াপি উমুজ্জ
নিমুজ্জঃ করোতি মেযাথাপি উদকে।"
ইমেপি চন্দ্রিঙ্গ স্বরিয়ে এবং * * * * *
পাণিনা পরামমতি পরিমজ্জতি।"

(ক্রমশঃ)
শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য ।
(কাশিলাভ্রমঃ ।)

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ ।

(১)

সাধে কিম্বো ভালবাসি ব্রজেশ্বর ?
ব্রজেশ্বর বিনে, এ ব্রজ-বিশিমে
সকলি বিরগ—বিরহ-অর্জর ।

সব রেখে গেছে, তবু যেম তার
পিছে পিছে গেছে সর্ব্বই সবার !
মন নাই মনে, গেছে তারি মনে,
সে যে সূচকূর চিরচিত্তহর !

(২)

নেপূ-রবে আর নেহু নাহি ধার,
গোষ্ঠে আর নাহি ছোটে উত্তরার,
দরশন আশে,
জাঁধি-নীরে তালে,
কিরি কিরি চার দুই সম্ভার ।

(৩)

শুক ভসালের উচ্চ শাখা-পরে
শুক-শারী দৌড়ে ডাকে সকাত্তরে ।
নৃত্য নাহি করে,
পেখর না ধরে ;
শিশী নহে সূখী হেরি জলধরে ।
নবজলধর-বরণ-বিরহে,
পঙ্ক-পাখী-মর, কেহ সূখী নহে ।

(৪)

ফুলে ফুলে আর মধুপনিকরে,
মধুর শুধনে মধু না আহরে ;
বিরহ-ব্যাকুল
তর-লতাকুল,
শিশিরে সবার-শোক-অশ্রু ধরে—
কঁক-শ্রেয়ভরে !

(৫)

কালিন্দীর জল, মলয়-মিলনে
সাক্ষ্য রবি-করে, উবার কিরণে,
ভাঁহ-শ্রেয়োজ্বলে,
উবেল উল্লাসে
খেলেনা, কেবল কীদে-মুহুরেটিল—
করণ করোলে !

(৬)

তাই বলি সখি! সাধন-অভাবে,
এই ব্রহ্মপুরে কে আছে বভানে ?
ক্রমে পরিণাম
আগে যে কি হবে,
এ ভাবনা যার জাগিছে সদাই,
তার ভাগ্যবলে
যদি কভু মিলে
সে নীপরতন
গোপিনী-মণ্ডলে ;
রুখা তা না হলে
বাঁচিয়া সকলে,
এই ভ্রমণে, হারিয়ে কানাই !

(৭)

সে ব্রহ্ম-জীবন আঙ্গিগে আশার,
হবে ব্রহ্মে পুনর্জীবন-সংকার,
মতুবা হটল
ছিল যা হবার
ভাগ্যে গোপিকার !
ব্রহ্ম বিনাশিতে, বাহু যদি ছিল,
আশার আশা যে কেন দিয়ে গেল ?
হইত সবার
ভাগ্যে বাহা ছিল—
বিরহে তাহার ।

(৮)

বাই থাকে তার মনের বাগনা,
বণো ব্রহ্মকান্তে একান্ত বাতন,
ব্রহ্মে সবাচার ।
সব শব্দাকার
কেশব বিহনে !
বলো একবার দেখা দিতে তার
বিরহ-বিকারে অস্তিত্বে সবার ।

যদি না দয়াল
বারেক বাচার
অগ্নি-দর্শনে !

(৯)

তানাহলে তাঁর দয়াময় নামে
কলঙ্ক রটিবে, এই ব্রজধানে ;
ব্রজ গোপিনীর
যা পাকে তরঙ্গে,
কে রোধিলে তার ?
অরুণ সন্নিবে কৃষ্ণ ভাবনার,
গোপিনীর শেখ আশা পূরে তার !

স্বর্ণ সুখ ছাৰ,
তার ভাবনার
তুলা ভাবনার !

(১০)

এক গেলে আর, অল্প ভাবনার
হয় অধিকার, হৃদয়-আগার,
তাই ভাবি কৃষ্ণ
আসিলে নিকটে,
কৃষ্ণ সমাধির
ব্যাঘাত বা ঘট
পাছে আমাদের !
সেথা সেথা গধি ! সুখে থাক শ্রাম,
ভাবনা তাহার, যেন অবিরাম
হৃদয়ে জাগিয়ে
রাখিবারে পারি,
সুখে যেন সদা
রটে হরি হরি !
তারি রূপধ্যান,
তারি গুণ গান,
নামামৃত পান
সবল সবেয় !
পাকে ভাগ্যে—পাব দেখা মাধবের ।

শ্রী অটলবিহারী দাস ।

ছুর্গোৎসব-চিত্তা

“যজ্ঞোইত্যং কৃতকৃত্যোইহং সকলং জীবিতং মম ।
আগত্যাস যতো ছুর্গে মহেশ্বরী মদাশ্রয়ম্ ॥”

মা ছুর্গার আগমন হয়েছে এবার
গজ-আরোহণে ;

“গজে চ জলদা দেবী”—কিন্তু বিন্দুধার
গলেনা গগনে !

কল্পা-মাগে বজ্রা-গ্রামে ধাত্ত উড়িয়ার
বুড় নষ্ট হ'ল ।

বৃষ্টি বিনা সৃষ্টিনাশ-ভয় বাঙ্গালার,—
পুড়ে ধান ম'ল ॥

শুধু বন্ধে নয়, প্রতি অঙ্গে ভারতের
ছুর্ভিক-অনল—

কোথা ধূমায়িত, কোথা জলিত ভাবের
প্রকাশ প্রবল !

ধাত্তদা কমলা নিজে অন্নদার বাসে
সহাত্ত বদনে ;

ধাত্ত নষ্ট, অন্নকষ্ট তবু এ ভূ-ধামে
বাড়ে দিনে দিনে !

ছুর্গোৎসবে দক্ষজার দক্ষিণে পূজিত
বাণী-সরস্বতী ;

রাজাদেশে দেশে কিন্তু হ'ল প্রচারিত
বাণী-রোধ-বিধি !

শক্তি পূজি শক্তিহীন, লক্ষী পূজি হার !
হৈছ লক্ষীছাড়া !

পেরেছিস কিছু শুধু বাণীর পুহার,
সাকল্যের সাড়া ;

ধন-বল-জ্ঞান-শুণ সীম গিয়েছিল;
সম্ভাবনামে—
কণ্ঠে ও লেখনী দণ্ডে বাহা কিছু ছিল—
বাণী-রূপালেশ।
নামরক্ষা—মানরক্ষা ছিল কিছু তার;
ভাহাতেও বাদী—
রাজরোষে—ভাগ্যদোষে হ'ল অজি হার।
বাকুরোপ-বিধি।

বিদ্রহর গণপতি, অগ্রে পূজা তাঁরি,
তাই বুঝি তাঁর
বাচনটি সর্বনেশে 'প্লেস' মহামারী
করেন নিস্তার।
লিঙ্গবাহী—নিয়ন্ত্রাতা নিজে গচানস,
কিন্তু পদে পদে—
অসিদ্ধি, অশক্তি, বাধা, বিদ্র অগণন—
উন্নতির পথে।

ছর্গেৎসবে এক পূজা, অচিরে স্থানান,
দেপি বাঙ্গালার,
সাংস্কিক ও রাজসিক কার্তিকপূজার
ধুম লেগে যায়।
বল-বংশ বৃদ্ধি হয় কার্তিকের বরে,
কিন্তু কি রহস্য!
নিরন্তর বংশরক্ষি, সম্পদের ঘরে
পূজা পায় 'পৌষ'।
বলের বিষয়ে আর বলিব কি ছাই?
সুনা বঙ্গ-বীর—
ভয় গণ্ড—সম্মনেজ—'তাল পূজা-সিপাই'।
• যোবনে স্ববির।

স্বপ্নবলাঘিদেব দেব-সেনাপতি,
পূজিয়া তাঁহারে,
আত্মরক্ষার্থেও হার। নাহিক শক্তি
অস্ত্র-ব্যবহারে।
অস্ত্র-আইনের ফলে হুমত আধুনিক
না-কুড়ালি-বাঁটি।
'রপ-রুদ্র' রক্ষালয়ে, বঙ্গাজ পৈত্রিক
লাজিতিক নাটি।

মারের বাহন সিংহ, তাঁরো পূজা করি—
মোরা ফেরপাল।
সাক্ষাৎ-শক্তি-বাহন বুটিশ-কেশরী—
ভারত-ভূপাল।
আত্মশক্তি—স্বাবলম্ব—পৌকবে বাদেয়
স্বভাব-সাধনা,
যতএব শক্তিপূজা-সিদ্ধ তাহাদের,
বাহুপূজা বিনা।
কার্যসিদ্ধি চাই ফলে বাহু সাধনার,
পাই যে নিরাশা;
শক্তি নাই মুখরীতে চিৎকারী-পূজার,
তাই এ ছুঁড়িণা।
সে বাহুপূজাও নাহি শুদ্ধোপকরণে
হ'ত সম্পাদিত;
অশুদ্ধ নিষিদ্ধ চিনি-বঙ্গাদি-সংগে
কনাচারসিদ্ধি।
অশুদ্ধি ও কনাচারে পূজা-অভিনয়
ব্যর্থ—বিফলত;
ব্যক্তিচারে শুভ-সার্থা 'অভিচার' হয়,
শাস্ত্রে সুবিদিত।
বিত্তে দণ্ডে বিপণীত। প্রাণ প্রচুর—
দেখ বঙ্গ হার।
বর্ষে বর্ষে শক্তি পূজা, শক্তি থাকে দূর,
প্রাণ যায় যায়।
অনাচার দোষে পূজা পূজ্য নাহি তোষে;
বরঞ্চ কেবল—
ব্যর্থ সে দেব-সেবার্থী—পড়ি দেব-রোষে,
শাস্ত্রে অমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দুর্ভাগ্য-দোষে ঘটেছে ভারতে
আমাদেরো তাই।
শুদ্ধ স্বদেশীর শুভ উপকরণে
দেব-সেবা চাই।
বা-হ'ল তা হ'ল, সেন না হয় সারি,
এনে দিব 'ইতি'।
বলিবনা মুক্তার, ভলিবনা-আর
বিদেশী—বিলাতী।

ভারতে শরতে শুধু জিদিন-উৎসব
নাহি হবে আর;

মাতৃভূমি-প্রতিমার নিত্য-দুর্গোৎসব
হবে মা হুর্গীর!
দেশতত্ত্ব-শক্তিপূজা নিত্য হবে দেশে—
'স্বদেশী'-সভোগে;
জিহ্বিন-উৎসব হবে শরতে বিশেষে—
বাহুপূজা-যোগে।
তৎপ্রতিবে সিদ্ধিলাভে—শক্তি-সাধনার
শুক দুর্গোৎসবে,—
দীন হীন স্ত্রীণ বত সন্তান মাতার,—
বীর ধীর হবে।
জগন্মাতা-রূপান্তরা জন্মভূমি-মাতা,
এ তব্ব-সিদ্ধান্ত—
সিদ্ধ সত্য রূপে নিত্য চিত্তে রবে গাঁথা—
তবে অপ্রাণান্ত।

স্বাবলম্বে স্ব-সাহায্যে গাধে বে স্বকার্য,—
কর্মবোগ-ভরে,
জগন্মাতা তারে সদা সদয় সাহায্য
করেন স্বকরে।
"স্বর্গাদপি গরীমসী" মাতৃভূমি-মার
সেবে বে সন্তান,
সেই সেবা মাতৃরূপা তাঁরি প্রতিমার
জগন্মাতা পান ॥
'স্বদেশী'-সাধক বেবা স্বজাতি-স্বধর্মে—
মাতৃভক্তিমান,
সন্তানবৎসলা হুর্গী সমস্ত হুর্ঘমে
দেন তারে জ্ঞান।

'কুপ্ত্র বদিও হর, কুমাতা কখনো নর',
সত্য—পুত্র এ চির প্রবাদ;
কুপ্ত্রের ক্রমণী করি, ক্ষমিযেন ক্ষমকরী
শুক শত পত অপরাধ।
বধীশক্তি করি পূজা মহাশক্তি দশভূজা,
দশমীতে মানস-সাগরে,—
বিশুদ্ধ মূর্তি মার, বিজয় সে বিজয়ার—
এ 'স্বদেশী'-সাধন-সমরে—
লভিব বিদেশী-মোহ-রাবণে সংহারি;
আনিব ভারত-লক্ষ্মী-সীতার উদ্ধারি!
মহাশক্তি-মহোৎসব হুর্গোৎসব তবে—

শুক সবে সত্য তব্ব-নিত্য সিদ্ধ হবে।
ধন ধন পূর্ণপূণ্য পূজক কৃতার্থ;
গাণ চূর্ণ করি তূর্ণ পূর্ণ পরমার্থ!
ঐহিকেতে শক্তি-সিদ্ধি, পারজিকে ভক্তি-
মুক্তিদাঙ্গি! জগদ্ধাঙ্গি! জয় মহাশক্তি!
অভয়া-অভয়পদ-নির্ভরে নির্ভয়—;
দুর্গোৎসবানন্দ-রব জয়হুর্গী জয়!
ভাব হুর্গী, অপি হুর্গী, লভি হুর্গে জয়;
হুর্গোৎসব-চিত্তা ফল শিব-ভাবময়!
জয় হুর্গী! জয় শিব! হর হর বম্!
দুর্গোৎসবানন্দে গাই বন্দে মাতরম্!

বেদ ও বেদান্তের জন্ম।

(২য় প্রস্তাব।)

বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমার্শে চারিটি বর্ষের
উল্লেখ করা গিয়াছে। পূজ্যপাদ ঋষিবর্গ তৎ-
কালের পরিক্রান্তা পৃথিবীকে চারি বর্ষে,
সপ্তদীপে এবং সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিয়া-
ছিলেন। সপ্তদীপ ও সপ্ত খণ্ডের নাম এবং
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু সপ্ত বর্ষের
(মতান্তরেণ) আখ্যাগুলি বর্তমান থাকিলেও,
তাহাদের ভৌগোলিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
অসম্ভব। সপ্তবর্ষের নাম এই—কিসু-
পুরুষ বর্ষ, ভারতবর্ষ, হিরণ্যবর্ষ, নাভিবর্ষ,
কুক, হিম এবং গিরিবর্ষ। এই বর্ষগণ্ডকের
মধ্যে প্রথম বর্ষচতুষ্টয়ের পরিচয় আমরা
পরিজাত আছি। বাহারা ভারতের সুদূর
দক্ষিণ সীমান্তিত্রিবাঙ্কুত ও কোচিন
রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাহারা
"ভারতপতী" নামে এক অমতিসুখী

নদী ধ্বংস করিয়া থাকেন। জিবাঙ্কুড় ও কোচিনের ভাষার নাম মালয়নী, এই ভাষার 'পডী' শব্দের অর্থ নদী। পুরাণ-প্রসিদ্ধ পরশুরাম এই নদী হইতে আরম্ভ করিয়া, নেপাল ও সিকিম পর্য্যন্ত এবং তদনন্তর সমগ্র হিমালয়, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ও মানস সরোবর পর্য্যন্ত 'ভারতবর্ষ' নাম দিয়া ছিলেন। জিবাঙ্কুড় ও কোচিন এবং সমুদ্র মালাবার উপকূল, পুরাণ-মতে, ভারতাস্তর্গত নহে, উহা গিরিবর্ষের অন্তর্গত। * এই সকল স্থানের ভাষা, আচার, ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম, শাস্ত্রানুযায়ী দীক্ষা ও শিক্ষা ভারতবর্ষের কোন হিন্দু-জাতির সহিত মিলে না; উহার বর্তমান যুগে নানা জুবিধা প্রাপ্ত হইয়া, আর্ধ্য হিন্দুর অনুকরণ করিয়া হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর্ধ্যবর্ষের হিন্দু-সমাজ হইতে এখনও সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে। জিবাঙ্কুড় ও কোচিন-প্রবাহিত ভারতপডী ভারতবর্ষের শেষ সীমা। আসিয়া মহাদেশের মধ্য-বর্তী গিরিমালা ও প্রান্তরসমূহ পুরাকালে হিমবর্ষ বলিয়া আখ্যাত হইত। পণ্ডিত মোক্ষমূলর প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক নিচয়ের অভিমতানুসরণকারীদিগের ধারণা এই যে, হিমবর্ষই মানব জাতির জন্ম ও আদিলীলাস্থল; কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সন্দেহ মিটে নাই। বর্তমান কালে অনেকে অল্পবিধ অভিমত প্রদান করেন। বাহাটক, বর্তমান প্রদেশে প্রথমোক্ত চারিটি বর্ষের

সহিত সম্বন্ধ থাকার, আমি এই নির্দিষ্ট বর্ষ-চতুষ্টয় লইয়াই আলোচনা করিয়া। ভারত-বর্ষের কথা ইতিপূর্বে করা হইয়াছে। অপর তিনটি বর্ষ কোথায়, এক্ষণে তাহার আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এখানে একটা প্রয়োজনীয় কথা কহিয়া রাখা আবশ্যিক; বর্তমান কালে আগরা বাহাকে ভারতবর্ষ বলি, পুরাকালে ভারতের চতুর্দিকস্থ বহুদেশ প্রদেশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল এবং এই সনাতন হিন্দুজাতি প্রাচীন-কালে কেবল ভারত-দেশ মধ্যেই গীমাবদ্ধ ছিলেন না; পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তাঁহাদের গতিবিধি ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকাও তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল না।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, মানস সরোবর ও কৈলাস পর্বত পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, তাহার পরে তির্কত দেশ। তির্কত অতি প্রাচীন ও পবিত্র দেশ, ইহা ঋষিদিগের অতীত প্রায় ও মনোহর স্থান। অতি প্রাচীন শাস্ত্রেও তির্কতের উল্লেখ আছে। সমুদ্র তির্কত এবং তাহার পরবর্তী সার্দ্ধ দুই শত কোশ পর্য্যন্ত কিম্বদন্তি বর্ষ। এই বর্ষ কতিপয় খণ্ডে বিভক্ত, তন্মধ্যে তির্কত একটি খণ্ড মাত্র। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত আচার্য্য শ্রীমৎ পণ্ডিত রামকুমার বিহারী মহাশয় প্রাচীনানুসারে ব্রাহ্মমত পরিবর্তন করিয়া, পণ্ডিত বিহারী মহাশয় মহোদয়ের ভায় পুনরায় সনাতন হিন্দুধর্ম বীক্ষিত করেন। পরে তিনি সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া 'রানানন্দ ভারতী' নামে আখ্যাত হইলেন এবং নানাহান পরিব্রাজন করিয়া তির্কত দেশে উপনীত হইলেন।

* আরব্য সাগর মধ্যে অনেক দ্বীপ এবং ইহার তটস্থ বহুদেশ এই বর্ষের অন্তর্গত।—লেখক।

“সাহিত্য” নামক বালালা সামিক পত্রের তাঁহার তির্কতভঙ্গনের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; এই বিবরণ সম্পূর্ণভাবে নিখি-
বার অবকাশ বিস্তারিত সহায়ের ছিগ না,
কিন্তু তথাপি বাহা তিনি নিখিয়া গিয়াছেন,
তাহা অতীব নূতন ও প্রয়োজনীয়। এই
বিবরণে তিনি কিম্পুরুষ বর্ষের কিঞ্চিৎ
আভাস দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তির্কত সম্বন্ধে
তিনি মুখে মুখে যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণিতেন,
তাহা আরও মনোহর ও কৌতুকোদ্দীপক।
কিম্পুরুষ বর্ষ সম্বন্ধে তিনি একদা বাহা
কহিয়া ছিলেন, তাহা অবিকল এখানে গিপি-
বদ্ধ করিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন—
“অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বন এবং পর্শর
অতিক্রম করিয়া আমি মানস-সরোবর-তটে
পৌছিলাম পরমানন্দ অমৃতভব করিলাম।
আমার দেহ ও মন পবিত্র হইল। আমি
এমন সুন্দর সরোবর আর কোথাও আছে
বলিয়া বিশ্বাস করি না; ইহা মেন স্বর্গের
অমৃতভরা সরোবর। মানস সরোবরের
তটে আমার মনস্বামনা সুসিদ্ধ হইল;
ভগবান যেন আমার বহুকালের বহু মনো-
বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিলেন! আমি দুই
দিবস মাত্র এই স্বর্গপ্রতিম নিফলক সরো-
বর-তটে বিরাম লাভ করিয়া, তির্কতান্তিমুখে
বাইতে ছিলাম, কিন্তু সহরেই অত্যন্ত
চূর্ণল ও ক্রম হইয়া পড়িলাম; তখনও
এই সুপবিত্র সরোবরের সুন্দর সীমা অতি-
ক্রম করিতে পারি নাই; সুতরাং এক
অত্যন্ত—অগ্ৰ অজ্ঞাতনামা তরুণের তলে
পুনরায় প্রাণি দুর্গীকরণ ভ্রম হইয়া
উপবেশন করিলাম। বর সময় অতি-

বাহিত হইলে, যখন ক্ষুৎশিপাসার নিত্য
কাতর হইয়া পড়িলাম, তখন দেখিলাম,
মহর্ষিগমতুল্য দুইটি সুদীর্ঘকার সুন্দর
পুরুষ মানস সরোবরের একপার্শ্বে অব-
গাহনপূর্বক স্নান করিয়া ভূমে দণ্ডায়মান
হইলেন। তাঁহাদের মস্তকের কেশ ও ক্র
এবং অক্ষয় ও ক্ষুদ্র শুভ্রবর্ণ; সমুদয় দেহ
হতাশনদম্ব বিমলরক্তের ছায় শুভ্রাদিক
শুভ্র; যেন অপূর্ণ ত্রিদিবসজাত নিফলক
গৌন্দর্য্যো জ্যোতির্শ্রম! এমন দীর্ঘকার
প্রবুদ্ধ—অগ্ৰচ পলমান ও যৌবনের গৌন্দর্য্য-
ভয়: মানস-সুখি আনাদের পাপ মনের কল্প-
নাশ্তেও আশ্রয় না। আমি ব্যক্তি দৌড়িয়া
গিয়া মহাসুভবরয়ের পবিত্র পদতলে
মাঠাঙ্গ মনিগাত করিলাম। তাঁহারা সমধুর
বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তুমি কে?’
আমি তাঁহাদের কণ্ঠস্বরকে মধুর হৃৎতে
মধুরতরং প্রদণ করিলাম। সংক্ষেপে
আত্মগরিচর দিবার পরে, তাঁহারা পুনরপি
কহিলেন “কি চাও?” আমি বলিলাম
“ঐচরণ শিঃ অং কিছুই চাইনা।” ইহা-
দের মধ্যে একটি ঋষি সময়ে নিকটবর্তী
একস্থানে গমন করিয়া, কয়েক মুহূর্তের
মধ্যেই ঐ স্থানে পুনরাগমন করিলেন এবং
আমাকে বাহা পাইতে দিলেন, তাহা পায়ের
মুণালের ছায় কোমল, কচিকর ও মধুর।
তাহা ভক্ষণ করিয়া আমার ক্ষুধা ও
শিপাসার শান্তি হইল, উদর ভরিয়া গেল,
আর কিছু পাইতে চছা হইল না; কিন্তু
আমার-সমাপ্তির পূর্বেই দেখিলাম, তাঁহারা
অত্যদিক দিয়া গমন করিতেছেন। আমি
তাঁহাদের পশ্চাদমুসরণ করাই, তাঁহারা

লিঙ্গাসা করিলেন “তুমি কোথা বাও ?”
আমি কহিলাম “আপনাদের এই দাগ
আপনাদেরই অঙ্গবস্ত্রী।” তাঁহারা বলিলেন—
“আমরা তোমার অজ্ঞাত কিস্পুকস বধ-
বাণী। কিয়দূর অগ্রগর হইলেই হিম-
রাশিতে তোমার দেহ জমিয়া নাটবে, তুমি
ভবলীলা সম্বরণ করিবে। সে দেশে যাই-
বার তুমি এখনও উপযুক্ত হও নাই।”
অগত্যা আমি ঋষিদেরকে প্রণাম করিয়া
ফিরিয়া আসিলাম। তাঁহাদের মুখে শুনিয়া-
ছিলাম, প্রয়োজন বশতঃ তাঁহারা কৈলাস
পর্বতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে কিস্পুকস
বর্ষে প্রতিগমন করিতেছেন। ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়দিগকে, রামায়ণ ভারতী
সংহাসয়ের কথা শুনাইলাম। কিস্পুকস বর্ষ
সম্বন্ধে আমি নিজে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞাতক
ভাবে অবগত আছি, তাহা বাবাস্তবে বর্ণন
করিব। পরবস্ত্রী বিবরণে এই অজ্ঞাত বর্ষ
সম্বন্ধে আরও কিছু পরিষ্কার বিবরণ প্রাপ্ত
হইবার আশা করিতে পারেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শক্তি-পূজা।

—:~:—

শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত যোরা, অতন্নচরণে
নত্ৰাশির,
ভরি না রক্ত-বসিতে, বরাতে, দৃষ্ট আমরা
ভক্তবীর,—

উধু মায়ের চরণে নত্ৰাশির!

জননী মোদের অগন্ধাজী,
সৃষ্টি-পতি-প্রণয়-কর্জী,
দীপ্ত-বর-অভয় দারী,
অধিষ্ঠাত্রী ত্রিলোকীর!
আবাহন মার মুক-বনানে;
কৃষ্ণি, তপ্ত-রক্ত-করণে;
পশুবধ আর অঙ্গুর দমনে
মায়ের বজ্রা বাত্রাদীর!
সূর্য্য-খচিত অতুল আশ্র,
নিরাশা-প্নাশ্বে বিনাশি হাত্ত,
রাভুগ চরণ দেব-উপাত্ত
সিংহ-পৃষ্ঠে অটল-পির!

[শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]

কিরীট দীপ্তি ক্রক গগনে
ক্রান্ত-বিজ্ঞাৎ সুরিছে মঘনে,—
সেনবা বহ্নি-জগদি মঘনে
জগা চরেছে জয়শীর!
করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি,
ভরিয়া আশীষে নিখিল সৃষ্টি,
সার্থক করি মানব দৃষ্টি,
রচি রোমাঞ্চ ধরিতীর!

গৌরবসয় পূবা দৃষ্টি!—

উচ্চাস-ভরে শুক্ক বিশ্ব!—

ভরা বিশ্বাগে, শক্তি-শিষ্য,

ধরায় লুটাও মনশীর!

[শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]

মায়ের আরতি, অমতি-নাশির;

পদে অঞ্জলি, বাহ্য পূরণ;

তুখনিশি-হরা সেলার বীর

উবা লাগে শিরে হেমাঙ্গির!

মায়ের করুণা বড় নির্দম,

আছতি-তৃপ্ত-হত্যাশন-সম;

হাতে নির্মল, দহন প্রাপন,—

অন্তে বিশ্ব-বিপরী বীর!

কর পদাঘাত বিপদ-সাপার,

ভয় পরাতল বিজয়-গাথার,—

হর হর হর!—বির কোণার?—

শমন ভূতা জননীর!

[শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]

দর্পে উড়িছে রক্তনিশান;

ক্রুর বিজলি ঝগসে রূপাণ;

নিজ্রা বিদারি, সমর-বিষাণ

ঘোষে "ধিষো অহি,"মপি সমীর!

অভয়োরাসে জননী দত্ত,

হৃদে কলোপি ছুটুক মত্ত

বহ্নি-দদৃশ শোণিতাবর্ত,

রক্ত-অঁধিতে ভক্তি-নীর,—

স্বার্থ ও রিপু নির্দয়ে দলি,

দাও-সুগণ্য ও শ্রীপদে বলি,—

রুধির দারার চরণানুল

রঞ্জি, লুটুক ছিন্ন শির।—

মাগো! জবার বদলে ছিন্ন শির!

[শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত ইত্যাদি]

শ্রী :—

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

উপনিষদের উপদেশ।—শ্রীযুক্ত

কোকিলেশ্বর, তট্টাচার্য্য এম্ এ-প্রণীত।

পুস্তকখানি বর্ণাকৃতি হইলেও পত্র-সংখ্যার

বৃহৎ। কাগজ উৎকৃষ্ট, মুদ্রণ পরিপাটি। বর্ণা-

ভক্তি বা মুদ্রা-প্রদান ও অস্তায় পুস্তকখানি-

হাতে লইপেট, ইহা যে বেশ সুবন্দে, সাব-

ধানে ও সৌষ্ঠব-আয়োজনে মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বুঝা যায়। পাঠ

করিলে, প্রতি পত্র পত্র ছজে ছজে

লেখকের পাণ্ডিত্য, গবেষণা, বিচার-মুক্তি

ও শাস্ত্রীয়তা-শক্তি দেখিয়া আশ্বাসিত ও

আনন্দিত হইতে হয়। কোকিলেশ্বর বাবু

অনেক দিন হটতেই বঙ্গসাহিত্য-সমাজে

প্রভুত্ব ও শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ-লেখকতার উচ্চ-

সনে প্রতিষ্ঠিত। "নবভারত" প্রভৃতি

পত্র অনেক দিন হইতেই তাঁহার প্রবন্ধ-

মালায় অলঙ্কৃত। তবে এ যাবৎ আমা-

ধের "হিন্দু-পত্রিকা" তাঁহার গৌরবময়ী

লেখনীর লিপি-সাহায্য লাভ করে নাই।

আশা আছে, ভবিষ্যতে কল্পিতে পারে। হিন্দু-

শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ-লেখকগণের মূলিপি-সাহায্য

"হিন্দু-পত্রিকার" স্বতঃ সাদর-প্রার্থনীয়।

হিন্দু-শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ প্রকাশ "হিন্দু-পত্রিকার"

জীবন-কালের নামাঙ্করূপে মুখ্য লক্ষ্য।

সে বাহা হউক, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকি-

লেশ্বর তট্টাচার্য্য মহাশয়ের এই পুস্তক

তাঁহার পূর্নপ্রণীত সাহিত্যিক প্রতিকার

অনুরূপই হইয়াছে। ইহা আমাদের

জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটি মহার্হ

রত্ন হইয়াছে। আশা করি, তট্টাচার্য্য মহাশয়

ক্রমশঃ প্রধান ও আনন্দিক সমস্ত উপনিষদ

গ্রন্থগুলির আনন্দ-ব্যাখ্যা এইরূপ পুস্ত-

কাকারে বহুশঃ প্রকাশ করিবেন। ভার-

তের বেদান্ততত্ত্ব জগতের মানবজাতির

একটি প্রধান আধ্যাত্মিক সম্পত্তি। জাগ-

তিক প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রচলিত ভাষায়

ইহার চর্চা, ব্যাখ্যা ও অঙ্গীকরণাদি যথা-

বিচার করিয়া আবশ্যিক। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-
গণ স্ব স্ব শিক্ষা-সংস্কারমূৰ্ত্তি উহার দার্শনিক
অংশই আবাদন করিতে পারিবেন, কিন্তু
ইহার প্রকৃত পরিমার্জিত অনবরতকৃতরস
ভারতীয় বাথায়-শক্তি-সম্বীর্ণ সাধুস্বামী
সমাজেরই অনন্তগন্তোগ্য। শ্রীমৎশঙ্করা-
চার্য্য প্রভৃতির ভাস্ক-টীকাদির দ্বারা বর্ত-
মানে বেদান্ততত্ত্বের সমগ্র ও অধিকারোপ-
যোগী সৌলভ্য সম্পাদন সম্ভাবিত নহে।
বিশেষতঃ সাধারণ-সেবাণী সামাজিক-
ব্যক্তিবর্গের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক
প্রচলিত ভাষায় এতদ্বিবরক এতদধি প্রসি-
দ্ধির প্রচার প্রার্থনীয়। কোকিলেশ্বর
বাবু বঙ্গদেশে এই বঙ্গভাষা-ভাষিনী বাথায়
সে অভাব ও আবশ্যিকতা পূরণের সূত্রপাত
করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জাতীয় সাহিত্য-
সম্বন্ধিকামী শিক্ষিত বাঙ্গালী সাজেরই
কৃতজ্ঞতাভাজন।

তবে কিনা, গ্রন্থকারের সকল মত-
ব্যাখ্যার সহিতই অস্বদীয় মতের ঠিক
অভিন্নতা নাই। স্থানান্তর আবেশকীর
উদ্ধৃতিসহ উদাহরণ প্রদর্শন করিতে পারি-
লাম না। ফলে কোন ২ স্থলে গ্রন্থকারের
আত্মসংস্কার ও বিশ্বাসগত মত যেন শঙ্করা-
চার্য্যর মতরূপেই তদীয় উক্তি-উদ্ধৃতির
সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অর্থাৎ যেন
ঊহার আত্ম মত শঙ্কর-সিদ্ধান্তরূপ মহাব্যস্তের
ভিতরে ফেলিয়া, ঐবদান্তিকতার উপযোগী-
ভাবে পরিশোধিত করিয়া লওয়া হইয়াছে।
কিন্তু তাহাও কম ক্ষমতার কথা নহে।
বাহ্যউক, আমরা কোকিলেশ্বর বাবুর
বর্তমান ও ভাবী কৃতীর্থে আনন্দিত ও
আশ্বাসিত রহিলাম।

গন্ধবর্ণিত হস্ত।—শ্রীগোপাল চন্দ্র
মুখোপাধ্যায়-প্রণীত; শ্রীবটরূপ পাল কর্তৃক
প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরণিত। সার্ব
শতাব্দিক পৃষ্ঠাভাগী বৃন্দাকৃতির গ্রন্থ।
ছাপা-কাগজ উৎকর্ষ। ভূগচুক ও কম।
গোপাল বাবু একজন প্রতিভাশালী প্রাণী
লেখক। ঊহার “যৌবনে যোগিনী” প্রভৃতি
নাট্যকাব্য আমরা যৌবনে পড়িয়াই প্রমোদিত
হইয়াছি। আলোচ্য শৃঙ্খলানি ঊহার পূর্বে
খ্যাতির অতীত হইয়াছে। আমরা ঊহাকে
নাট্যকাব্য-কবি বলিয়াই আদর করিতাম;
তিনি যে এমন শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত ও প্রসি-
দ্ধবিৎ, তাহা এই গ্রন্থ পাঠে বিদিত হইয়া,
দ্বিগুণিত, আনন্দিত ও আশ্বাসিত হইলাম।
আমরা গোপাল বাবুর কাছে কাব্য অপেক্ষা
এইরূপ জিনিসেরই আরো অনেক
আশা করি। এখন প্রাচীন বদেশী সাহি-
ত্যিক সারসঙ্গ সমূহ উদ্বারের সমগ্র পড়ি-
য়াছে। কাব্য এখন দিন কয়েক সত্য ভব্য
হইয়া চুপু করিয়া থাকুন। নব্যদের কাছে
বিজ্ঞান-দর্শন—ক্রমে প্রস্তুত হই—শাস্ত্রতত্ত্ব
আমুন। এখন কেবল ধর্ম চাই—ভগবান
চাই—বদেশতত্ত্ব ও বাসন্য-শক্তি চাই।
ভক্তিযোগে চালিত—ভগবানবিরততার পালিত
নিষ্কাম কর্মযোগ চাই। এইরূপ জাতি-
তত্ত্বনির্ধারণ শাস্ত্রার্থসমালোচক গ্রন্থ বর্ত-
মানে বদেশীয় লুপ্তরসোচ্চারণে প্রধান সহায়,
সন্দেহ নাই। ভক্তভ্রমণীপাল বাবু (গন্ধ-
বর্ণিত-সমাজ কর্তৃক, বিশিষ্ট কৃতজ্ঞতার
অভিনন্দিত হইলেও,) সাধারণ শিক্ষিত
বাঙ্গালী সাজেরই নিকট জাতীয়
কর্তব্য পাগনে সমগ্ররূপ—‘বদেশী’ সাধনে

একটি সাংগঠিতিক সভার স্বরূপ এই পুস্তক প্রণয়ন ও সংকলনে ধন্যবাদার্থে চইরাছেন। বঙ্গীয় নৈশ্ব শাখাস্তর্গত অনেক সম্প্রদায় চইতেই প্রকাশিত স্ব স্ব জাতিতত্ত্বনির্ণায়ক, শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিমোহে নৈশ্বত্বপতি-পাদক অনেক পুস্তক আমরা পাইতেছি। অবশিষ্ট অসংখ্য শাখা-নৈশ্ববর্ষীয় শূদ্রাচার-প্রাপ্ত বঙ্গীয় সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষিত ও সম্পন্নগণের চেষ্টায়, গোপাল বাবুর স্থায় যোগ্যপাত্রে দ্বারা এইরূপ স্বজাতি-তত্ত্ব গ্রন্থ সংকলন ও প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করা প্রার্থনীয়। ফলে জাতীয় উন্নতি সাধনে এইরূপ গ্রন্থাদিই প্রধান সাংগঠিতিক সভাস।

এই “গন্ধবণিকত্ব” পুস্তকে বৈদিক প্রমাণ চইতে গোবণিক, ঐতিহাসিক, কান্যসাংগঠিতিক প্রমাণ-পর্গাস্ত উদ্ধৃত ও আলোচিত চইয়া, বঙ্গীয় “গন্ধবণিক” জাতির বিশুদ্ধ নৈশ্বত্ব বিশদ ব্যাখ্যাত চইরাছে। তদ্ব্যতীত কতিপয় শাস্ত্রাচারদর্শী প্রণেতৃনামা গণিতের গন্ধবণিক-নৈশ্বত্ব-নির্ধারণক সম্বন্ধে (‘পাতী’) শুধি এই পুস্তকে মুদ্রিত চইরাছে। ফলে এতৎ পাঠে বঙ্গীয় গন্ধবণিক জাতির মূলতঃ বিশুদ্ধ নৈশ্বত্ব বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ চইরাছি। বঙ্গীয় অনেক ব্যবসায়ী জাতিই খাঁটি নৈশ্ববর্ষ-সম্ভূত, মুক্তি নগ্নে ‘বল্লালী’ জাতি-বিপ্লব-ফলে যজ্ঞোপবীতভ্রষ্ট ও শূদ্রাচার-বিশিষ্ট। শাস্ত্রীয় জাতিতত্ত্ব-গ্রন্থাদির পঢ়ারে ক্রমে তাহা প্রকাশিত ও প্রমাণিত হইয়া, তত্তৎ সম্প্রদায়ের জাতীয় উন্নতি সাধনে সহায়তা করিতেছে ও করিবে। এইরূপ আমরা জাতিতত্ত্ব-গ্রন্থাদির বিশেষ আদর ও

আনন্দকতাহুত্ব করি। আলোচ্য গ্রন্থ-খানির সর্বশেষে একটি সুবিশিষ্ট বর্ণসঙ্কর-জাতি-পরিচয়-তালিকা সন্নিবেশিত হইয়া, ইহার গুরুত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত হইরাছে।

“চিন্তা-নির্বাহিনী” — শ্রীযুক্ত কুমার বিক্রম মজুমদার-প্রণীত। বৃহৎ পুস্তক। মূল্য ৫০ পাত্ৰ। হিন্দু পত্রিকার গ্রাহকগণের জন্য ৥০ পাত্ৰ। কাগজ ও ছাপা উত্তম। মুদ্রণ-প্রমাদাদি সামান্য। পুস্তকখানি একাধারে দর্শন ও গন্যকব্যের সুন্দর সংমিশ্রণ। গ্রন্থকার স্বদেশত্ব ও আনাদের ঘরের ছেলে চইয়াও, সংস্কার অহুরোধে বলিতে পারিবে, তাহার শিক্ষা, চিন্তাশীলতা, ইংরাজী সাহিত্যে অভিজ্ঞতা ও বঙ্গসাহিত্য-ভাবুকতা অস্বল্পঃ তাহার বয়স অল্পসারে আশাশ্রিত ও আশাহুকণ। ক্রিয়াপদের যথাসম্ভব বিশ্লেষণ-ব্যবহারের সহিত উদ্দীপনাময়ী ভাষার একটা নূতন ভঙ্গি সাহিত্য-রসিক পাঠক এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। কতিপয় অন্যান্য সাহিত্যসনে অগ্রগণ্য প্রধান ব্যক্তি “চিন্তা-নির্বাহিনী”র বিবিধ প্রশংসা করিয়া নবীন লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন। ফলে এবারে এই প্রথম উদ্ভবে যে কিছু ক্রটি, প্রমাদ, অপরূপতা বা অসম্পূর্ণতা দি ঘটয়াছে, তাবিস্যতে ক্রমাগতশীলনে তাহা পরিশোধিত পরিপক ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে, আশা করি।

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনসভে রেজিস্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড,
৭ম সংখ্যা ।

কার্ত্তিক ।

১৩১৪ সাল,
১৮-২৯ শকাব্দা ।

বিজয়া-সম্ভাষণ ।

প্রথম্য দুর্গাঃ শিবদাঃ শিবপ্রিয়াঃ
সুভার সর্গৈ বিজরোৎসবাবিষ্টৈঃ ।
বিধেয়মার্থৈঃ পরিরতা সাদরং
পরম্পরং প্রেমসম্ভাবাদনন্ ।

শ্রীদুর্গা-শ্রীপদবন্দ্য সর্গাগ্রে বন্দন ।
সর্গ-প্রতি বিজয়ার শুভাভিবাदन ॥
প্রতিপাত-নমস্কার-শুভাশীষরাশি—
যথাযোগ্য গ্রহণ করুন দেশবাসী ।
আলিঙ্গন—বিজয়ার শুভ সম্ভাষণ
উদ্দেশে উৎসর্গি, দুর্গা-পদে নিবেদন,
বিজয়া-মা দুর্গা করি রূপা-কৃপা দান,
করুন সবার শুভ বিজয়-বিধান ।
দর্শনে, প্রণামে ও প্রসাদ পেয়ে মারি,
যত্নেপি বিজয়ানন্দ শুভ বিজয়ার,
অভয়া-অভয়পদে সতিরা আশ্রয়,—
আত্মশক্তি-মাতৃভক্তি-নির্ভরে নিশ্চয়-

এ 'সদেবী'-সাধন-সমরে দেশবাসী—
'দ্বিযো জহি'-প্রার্থনা-পূরণে দ্বিষ নাশি,
নব বলে অগ্রগর হ'টন নির্ভর,—
প্রতি পদে নিরাপদে লড়ুন বিজয় ।
পাঠক-গ্রাহক-অনুগ্রাহক-বান্ধব,
সহায়তাবক—পৃষ্ঠপোষক রে সব,
সাহুগ্রহে—সাগ্রহে তাঁহারা পূর্ক ভাবে
করুন রূপানুকূল্য, এ প্রার্থনা এবে ।
তাঁদেরি সাহায্যে সদা তাঁদেরি পালিতা,
তাঁদেরি আশ্রয় বন্দ-আদরে লাগিতা,
তাঁদেরি-পোষণে তোবে তাঁদেরি ভোষিকা-
অধ্যাত্ম-পরিচারিকা এ "হিন্দু-পত্রিকা" ।

অর্থে ও সামর্থ্যে স্বার্থে সহায়তা-কার্য ;
সদয় সহানুভূতি—স্থিতি-সংহাযা,—
করুন কারণে থেকে পুনঃ সর্জন,
বিলম্বার এ বিনীত শুভ সম্ভাষণ।
স্বদেশী সাহিত্য-সেবা স্বদেশ-বিকাশে
প্রধান-সাধন-শক্তি, ব্যক্ত ইতিহাসে।
পালন সে ব্রত সবে লভি নবোদ্যম ;
বলুন বিজ্ঞানক্ষেত্রে বন্দে মাতরম্ !

ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অনুশীলন ।

২৮। যোগবল, উপাসনার সামর্থ্য,
ধ্যান-সমাধির বৃত্তি-নিরোধ ও অলৌকিক
প্রত্যাব এবং তপস্তার শক্তি, আত্মতত্ত্ব বা
ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনকারী বা আত্মতত্ত্বের
বিচারকম পুরুষের অবশ্যসম্ভাবী গুণ বা
অঙ্গকার নহে। কেন না, আত্মজ্ঞান তন্নির-
পেক। যদি তাদৃশ কোন আধারে তাহার
কোনটা দৃষ্ট হয়, তবে মনে করিতে হইবে
যে, তাহা সেই সমস্ত বা তাহার অন্যতর
সাধনের স্বতন্ত্র ফল ; নতুবা আত্মতত্ত্বের
ফল নহে। সামান্য লোকে আত্মতত্ত্বের
আলোচনাকারী পুরুষকে নিঃশব্দ ও অলৌ-
কিক সাধনে অক্ষম দেখিয়া উপহাস করিতে
পারে, কিন্তু তিনি তাহার সাধনে মতি দেন
নাই। যে হেতু তাঁহার মতি, জ্ঞান ভিন্ন
কোন অবান্তর কলনিষ্ঠ নহে। পুনশ্চ, এ
সবক্কে পঞ্চদশীর বিচার উদ্ধৃত করা
বাইতেছে।

(১) উপমুদ্রনাতি চিত্তং চেক্ষাতাসৌ
নতুতব্বিং। নবুদ্ধিং সর্দরন্ দৃষ্টোঘটতব্বত
বেদিতা ॥ [ধ্যাঃ দী ১১] যিনি ধ্যান বর্
চিত্তাধারা চিত্তবৃত্তি বিলীন করেন, তিনি
তত্ত্বজ্ঞানী নহেন + তাঁহাকে ধ্যাভা বলা
যায়। ঘট পট আদি বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের
নিমিত্তে অন্তঃকরণ-বৃত্তি বিলীন (বা নিরোধ)
করিতে হয় না।

(২) সত্বংপ্রত্যয় মাত্রেণ ঘটঃশব্দ
ভাগতে তদা। স্বপ্রকাশোরমাশ্রা কিংঘটপচ্চ
নভাসতে ॥ (ঐ ১২) ॥ কেবল একবার
অন্তঃকরণ-বৃত্তির সংযোগ মাত্রেই ঘটাদি
বস্তুর জ্ঞান হয়, তদ্রূপ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ
আত্মা, চিত্তের বিষয় ব্যক্তিরেকে কেননা
প্রকাশিত হইবেন ?

(৩) ধ্যানবৈচ্ছিকসেতস্ত বেদনাত্মিক
সিদ্ধিতঃ। জ্ঞানাদেবতু কৈবল্যমিতি
শাস্ত্রেষু ডিঙিমঃ ॥ (ঐ ১৭) ॥ তত্ত্বজ্ঞানী
ব্যক্তির ধ্যান ঐচ্ছিক মাত্র। নতুবা জ্ঞান
ধারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হয়। জানেই
কৈবল্য, ইহা শাস্ত্রের বোধণা।

(৪) তত্ত্ববিদ্ যদি ন ধ্যারেৎ প্রবর্তেত
তদা বহিঃ। প্রবর্তেতাং সুখেনাং কোবা-
ধোস্ত প্রবর্তনে ॥ (১৮) ॥ তত্ত্বজ্ঞানী যদি
ধ্যান না করেন এবং বাহু কার্যে আবৃত্ত
হন, তাহাতে বাধা নাই।

(৫) শাপাহুগ্রহসামর্থ্যং ব্রহ্মসৌ তত্ত্ব-
বিদ্ যদি। নতং শাপাদি সামর্থ্যং ফলং
স্রাতপসো বতঃ ॥ (ঐ ১০৮) ॥ অভিসম্পাত
ও অল্পগ্রহ করিতে ব্রহ্মসৌ সামর্থ্য অর্থাৎ,
তাঁহাকেও তত্ত্বজ্ঞানী বলা যায় না। কেননা
সে সব সামর্থ্য তপস্তার (ভগ্নতা বিপর্যয়ের)

কল মাত্র। তত্ত্বজ্ঞানের কল নহে। (তপস্বী অনেক প্রকার—তাহার কতকগুলি চিত্ত-স্বত্বজননুক, কতক ফলাফল, কিন্তু বাহ্য জ্ঞানেতে উদ্ভিষ্ট, জ্ঞানই তাহার কল।)

(৬) বহুবাক্যকুল চিন্তানাং বিচারাত্ত্বনী নহি। যোগো মুখ্যাত্ত্বস্তেবাং ধীদর্পস্তেন নশ্রুতি ॥ (ঐ ১৩২) ॥ বহু বাপারে বাহ্য-দের চিত্ত বিক্ষিপ্ত, বিচার দ্বারা (অথবা স্মৃতি-বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবিশ্বার অমূল্যলন দ্বারা) তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব তাঁহাদের মনস্থিরের নিমিত্তে যোগ (উপাসনা) মুখ্যরূপে উক্ত হইয়াছে। তাহাদ্বারা অন্তঃকরণের দোষ সকল নষ্ট হয়।

২৯। এই ছয়টি বচন কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা। ব্যতীত বিনা সংশয়ে বুঝা সহজ নহে। অতএব নিম্নে তাহা প্রদান করিতেছি।

(১) ঘটজ্ঞানের সহিত আত্মজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু দৃষ্টান্ত সর্বাঙ্গীন হয় না। উভয়ই কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, এই তিন তিনটি পদ উহা। জীবাত্মাই ইঞ্জির-মনোবৃত্ত দেহের স্বামী। অতএব তিনিই ঘট-দর্শনের ও ঘটের জ্ঞান গ্রহণের কর্তৃপদ। চক্ষু ও মনের সংযোগে তাঁহারই ঘট-রূপ-বস্তুর জ্ঞান হয়। অতএব ঘট-রূপে দৃষ্টান্ত, তাহাই কর্মপদ এবং চক্ষু ও মনের সংযোগে-ঘটদর্শন রূপ কার্যটির নাম ক্রিয়াপদ। এখানে জীব রূপ কর্তা, ঘটরূপ রূপ কর্মপদ এবং দর্শনরূপ ক্রিয়াপদ, এই তিনটি পদার্থ পৃথক পৃথক।

(২) কিন্তু আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে আত্মাই আত্মসাক্ষীর কর্তা, আত্মাই পরম-

দর্শনীর বস্তুরূপ কর্মপদ, এবং আত্মপ্রত্যয়ই ক্রিয়াপদ। অতএব একেজ্ঞে কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান পৃথক পৃথক নহে। আত্মা স্বপ্রকাশনাত্ম, অত্ম কিছু তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না; তিনি আত্ম অস্তিত্ব-প্রত্যয়-মাত্র দ্বারা আপনাকে জানেন এবং “তত্ত্ব স্বপ্রকাশনেন ঘটাদপি স্পষ্টত্বাৎ চিত্তরোধনং নৈবাপেক্ষাত ইতাহ সক্রমপ্রত্যয়মাত্রেণেতি”। আত্মা স্বপ্রকাশ, সেগত্ব ঘট অপেক্ষা তাঁহার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। সুতরাং তাঁহার প্রকাশিত হইবার নিমিত্তে চিত্তবৃত্তির নিরোধ বা বিলয় অথবা মন ও চক্ষুর সংযোগ অপেক্ষিত নহে। তাহা একমাত্র আত্মপ্রত্যয়-সারি।*

* দেহ-ইন্দ্রিয়-বন-বুদ্ধিবিশিষ্ট রূপে আত্মার স্বকীয় গত্যার যে জ্ঞান, তাহার নাম দেহাত্মজ্ঞান অথবা কজাত্মক জ্ঞান। তাহা আত্মজ্ঞান নহে। কিন্তু দেহাদি-প্রকৃতি-স্বকীয় ব্যবচ্ছেদক আত্মার নিরূপাধিক অবস্থার আপনার স্বপ্রকাশ চৈতন্য-স্বরূপের যে স্বঃসিদ্ধ জ্ঞান জাগ্রত হয়, তাহারই নাম আত্মজ্ঞান। আত্মা আপনাই আপনার সেই চৈতন্যস্বরূপের দ্রষ্টা। অতএব পরম আত্মাই আত্মজ্ঞানের বিষয় (object)। তাঁহাকে বিভিন্ন বাদিগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাংপর্গো গ্রহণ করেন। সাংখ্য-দর্শন বলেন, ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। তাঁহার উক্ত শাস্ত্রে ‘পুরুষ’ নামে উক্ত হন। অতএব বহু পুরুষ কৈবল্যরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহার প্রত্যেকে স্ব স্ব আত্মজ্ঞানের বিষয়। বেদান্তমতে ত্রয়ই সর্বাঙ্গী—সকলের আত্মা; অতএব তিনিই সমস্ত মুক্ত পুরুষের আত্মজ্ঞানের বিষয়। একমাত্র সাগরপর্বে যেমন নদী-সকল

(৩) অতএব ঘটজ্ঞানে ও আত্মজ্ঞানে এই প্রবেশ। উক্ত বচনে উভয়ের বস্ত-অংশের তুলনা মাত্র দিয়াছেন। অর্থাৎ ঘট, একটি বস্তু (substance)। তাহার

নামরূপ পরিচয় করিয়া অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ আত্মজ্ঞান বিধান পুরুষ সকল, সেই অপর ব্রহ্মেতে, অনিচ্ছাকৃত নাম-রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, প্রবেশ করেন। এই প্রবেশ, অমৃত এবং অরয় পরমানন্দের বাঞ্ছক; কিন্তু সেই মুক্ত পুরুষগণের বিনাশ বোধক নহে। অতএব সৌকর্যরূপ ব্রহ্মেতে মুক্ত পুরুষ-গণের এই পরম শাস্ত্ররূপ অস্তিত্ব বশতঃ ব্রহ্মই আত্মজ্ঞানের বিষয়। তিনি আত্ম-স্বরূপে গৃহীত হইলে, প্রতীপুরুষের আত্ম-স্থিতি সিদ্ধ হয়। এই আত্মজ্ঞান, জাগ্রত, স্বপ্ন, অসুপ্তি রূপ অবস্থাজয়ের অতিক্রান্ত। এই তিন অবস্থাই আত্মগাণ্ডকারের প্রতীকরূপ। কিন্তু আত্মার যে অবস্থায় সাংসারিক জাগ্রতজ্ঞান অতিক্রান্ত হয় এবং তৎসহ তাহার বাধ্যরূপ স্বপ্ন ও অসুপ্তি রহিত হয়, তাহাই নির্গল আত্মা। সেই আত্মা অবাধিত ও অপরিম্পৃষ্টেতয়। প্রত্যেক মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মাত্মাতে অস্তিত্ব বিধায় ব্রহ্মাত্মাই আত্মজ্ঞানের বিষয়। এই অস্তিত্ব, কেবল নদীগণের সাগর অস্তিত্বের স্থায়ী স্বরূপ নহে; কিন্তু পিতা-মাতাতে সন্তানগণের অস্তিত্বের স্থায়ী পরমাত্মার স্বরূপ। এই যে নির্গল ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান, ইহা সৌন্দর্যকার। ইহাই তুরীয় পদ—চতুর্থ। স্বপ্ন, স্বপ্ন ও কারণের অতিক্রান্ত; অতএব চতুর্থ। বাহ্যিক সৌন্দর্য চান, তাহাদের পক্ষে এই তুরীয় ব্রহ্মাত্মাই আত্মা। তিনিই নিষ্কর। (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)। তিনি একস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, শিবস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অপদ্বিতীয়, শাক্ত এবং একাত্মপুত্র্য-সার সৌন্দর্যপদ। তিনি নিত্ব অর্থাৎ সর্বগত ও সর্বব্যাপী, অনন্ত, নিরঞ্জন, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং নিত্য। এই সমস্ত লক্ষণ

অস্তিত্ব-জ্ঞান লাভার্থে চক্ষু মুদ্রিত ও চিত্তবৃত্ত নিরোপ করিয়া ধ্যান-সাধন করিতে হয় না। কিন্তু চক্ষু ও অস্তঃকরণবৃত্তির অবতাসন মাজে মে জ্ঞান জন্ম। সেইরূপ আত্মাও

অন্ত কোন পদার্থে নাই। সমস্ত পদার্থই আত্মকৃত স্ব স্ব পরমাণু প্রকৃতির বিকার। অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ড, সর্বলোক, স্বপ্নকালোবয়, দেবদেহ, সায়ারচিত দেহ, জ্যোতিষের রূপ সমস্ত, প্রকৃতি বা সারা-সম্পাশ্ব আনন্দ-সম্ভোগ, কলকোটি স্থায়ী পরমায়ু এবং কামগতি—এ সমস্তই প্রকৃতির বিকার। ইহার কিছুতেই এই সমস্ত লক্ষণ বিস্তারিত নাই। কিছুতেই স্বরূপ একত্র নহে। সমস্তই প্রাকৃতিক-অবয়ব-সংঘাত-সংশ্লিষ্ট, সুতরাং কালোত্তে বিশেষ্য; অতএব অমৃত, অদ্বিতীয়, অপদ্বিতীয়, অরূপ, নিরঞ্জন, নিত্ব, অবিকারী এবং নিত্যসংগম্য নহে। সুতরাং অমৃত, আনন্দ, মঙ্গল, জ্ঞানস্বরূপ ও সত্যস্বরূপ নহে। অতএব যিনি তুরীয় ব্রহ্মাত্মা, তাহাতেই প্রবেশ করিয়া মুক্ত পুরুষেরা ঐ, সত্য, অস্ত্রযোগ্যাবচ্ছেদক, অরূপ, অবার, অনন্ত, নিরঞ্জন, অমৃত, আনন্দ, মঙ্গল ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। এতাবত এই তুরীয় পদই একত্র ও অমৃত-স্ব প্রভৃতির নিলয়। সেই পদই মহামোক পদ। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানী বাতীত অংশের তাহাতে অধিকার নাই। কেননা কেবল ব্রহ্মাত্মজ্ঞানীই রূপ, নাম, প্রাকৃতিক গুণ, স্বরূপ, পরিচয় করতঃ তাহাতে প্রবেশ করেন। দে মকল পুণ্ড্রা, রূপ, নাম শরীরাদি চান, তাহাদের পুণ্ড্র-লোকে গতি হয়। অমৃতস্বরূপ—আত্ম-জ্ঞানের বিষয় স্বরূপ—সায়ারাজ্যের অতিক্রান্ত স্বরূপ তুরীয়পদ লাভ হয় না। গফাস্তরে, বাহ্যিক তাহা লাভ করেন, তাহারা একত্র সম্ভোগ করেন। সেই একত্র, প্রকৃ-তির বিকার রূপ চতুর্বিংশতি স্ব স্ব সংঘাত দ্বারা, অথবা পরমায়ু পুঞ্জ দ্বারা, অথবা দেশকাল দ্বারা, অথবা অন্যাদি অদৃষ্ট, কষ্ট

একটি বস্তু (substance of object) অথচ স্বয়ংপ্রকাশ (self-illuminating) এবং আপনিই আপনার জ্যেষ্ঠ। তাঁহার প্রকাশ রূপ বস্তু পঞ্চটা, ধ্যান বা চিত্তনিরোধ এবং চক্ষুরাদি ইঞ্জিরের অবরোধন বা সাহায্য অপেক্ষা করেন না।

ক অনিচ্ছা দ্বারা গঠিত নহে। স্তম্ভরঃ অনিচ্ছা, অনিন্দন, অপরিবর্তনশীল, ভেদ-বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুতিশূন্য। এই ভেদে সেট একই লাভে, বৈকারিক, পরমাণুগুনসাম্যী, কর্মজনিত, অনিচ্ছা ও সাধারণ রচিত দেহাদি পদার্থের ভঙ্গ, অজ্ঞান ও বাজা-ধন্যদির বিরোধি এবং চর্বি, শোক, মোহনয় জনসাগরের ভয়ানক তরঙ্গ নিঃশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। "তন্ন কো মোহঃ কঃ শোকঃ প্রকৃত্তমভূতশ্রুতঃ" (ঈশ ৭) যে সময় পুরুষের আত্মদর্শন হয়, তখন তাঁহার মোহটই বা কোথা? শোকটই বা কোথা? অতএব বিশুদ্ধ গগনোপম এক আত্মতত্ত্ব রূপ একদর্শন হইলে, শোক-মোহাদির অস্থ হয়।

+ "প্রকাশভব্বৎসিদ্ধৌ কর্মকর্তৃবিরোধঃ" কপিল স্বর ৬। ৪২। "There is no contradiction here between patient (কর্মগদ object) and agent (কর্তৃগদ subject), because the soul (আত্মা), through the property of light which is (innately) lodged in it, can itself furnish the relation to itself,— just as the Vaiseshikas declare, that through the intelligence ledged in it, it is itself an object to itself."

(Dr. J. R. Ballantyne's translation 1865).

(২) "অন্বং প্রত্যয় বিবয়বাৎ অপত্যো-ক্বাহাচ্" (বেদান্ত স্বত্রের শাকরভাষ্য ১।১।১) "The soul is the object of the first personal pronoun and self evident."

(৪) কিন্তু কেত জিজ্ঞাসিতে পারেন যে প্রত্যক ব্যক্তিই ভো মীর মীর শরীরে আপন আপন আত্মার অবিহ্ব অঙ্ক করেন; যে অস্থতন কি আত্মজ্ঞান নহে? যদি তাহা হয়, তবে আত্মজ্ঞান হৌ সাধারণ কথা এবং প্রত্যক শরীরাত্মমানী ব্যক্তিরই তৈবলা রূপ মুক্তি মদা সিদ্ধ। এমত অবস্থায় আত্মজ্ঞান হইয়া এত বিচার কেন?

(৫) একবার উত্তর এটই যে, উচ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠা অর্থাৎ বেদান্তবিজ্ঞান-পতিপাঞ্জ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান নহে। ব্রহ্মু একটী বস্তু। তাঁহার অবগদনে জ্যেষ্ঠ মনের মিপাঙ্গর্গ অধ্যাত্ত হইয়া ব্রহ্মুতে সর্পদ্বয় হয়। আত্মা সেটরূপ, স্বপকাশ সত্যবস্তু। তাঁহার অনলম্বনে ও আশ্রয়ে, জীবের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সামক, অনাদি কর্ম ও অবিচ্ছা কল্প দেহ, ইঞ্জিয়, মনোবুদ্ধাদি অনায়া পদার্থ সকল আত্ম ভাটিকপে প্রকাশিত ও আণোক্তিত হয়। বিচারহীন অবিশুদ্ধ জ্যেষ্ঠ সেই স্তম্ভকে আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন; কিন্তু ভ্রম-সর্পের জায় সেস্তাণ তাঁহার অনিচ্ছা-পোঁনিত অনায়াসপর্ষী মনের জগৎ এবং পরিণামে স্বাস্ত্র এবং মিপা।

অপরক। "অতো ন পুরুষাণ্যাপার পারতত্ত্বা ব্রহ্মবস্তা; কিত হ প্ৰত্যকাদি প্রমাণ নিবর বস্তুজ্ঞানবৎ বস্তুতত্ত্বের" জী ১।১।৪। "Therefore the science of Brahma is not dependent on personal acts. What then? Like the knowledge of a substance: the object of perception and other proofs) it is dependant on the substance (আত্মা) itself."

(Translation by Revd. K. M. Banerji) Bibliotheca Indica.

(৬) সেগুলি অনিত্য অসংজ্ঞাভঙ্গমণী শত-সহস্র বেদনা-সমূহ এবং জন্ম মৃত্যুর প্রবাহরূপী। বিচারহীন বালক বেদন চিন্তা ও ডোমকে আলোক মনে করে, তাহার অন্তরস্থ স্বপ্ন স্ফোতির তত্ত্ব লয়না, সেইরূপ বিচারহীন পুরুষ আত্মার খোঁজ লয়না, কেবল দেহাদিকে আত্মা ভাবিয়া অনাদি অধ্যায় বশে জন্ম-জরা-মরণশ্রেণিতে ভাসমান হয়। অতএব বিচারহীন অবিশুদ্ধ পুরুষদিগের যে আত্মজ্ঞান, তাহা মাধারণ-ব্যবহার বাটে, কিন্তু তাহা বেদান্ত, বেদ না সাংখ্য-প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান বা মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞান নহে।

(৭) অপরে প্রবৃত্ত করিতে পারেন যে, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি পদার্থকে কিঞ্চিৎ অনাত্মা বশা যায়, এবং কেমই না তাহার আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব-সাধক হইয়াও জন্ম মৃত্যু ও বেদনার হেতু হয়? একবার উত্তর এই যে, আত্মা স্বরূপতঃ অঙ্গ ও নির্মাণ পদার্থ। শাস্ত্রমতে, তাঁহাতে প্রকৃতি বা অনিদ্যা, ঐ সকল অনাত্মা সম্বন্ধ করণা করে, বক্রণ অবাকুস্ম স্ফটিক-পাত্রেতে বীর রক্তবর্ণ আভা প্রক্ষেপ করে। এই কল্পিত সম্বন্ধ অনাদি। তৎকৃত স্বপ্ন-দেহ ও মূল দেহাদির বীজ ও কর্মফল অনাদি এবং তৎসম্বন্ধবশাৎ আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, শুভাশুভ কলভোগ, সমস্তই অনাদিকাল হইতে অব্যবহান হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তৎসমস্তই আত্মাতে আরোপিত হইয়াছে নাজ। তাহার আত্মার স্বরূপগত নহে। স্বরূপগত হইলে, তাহাদিগকে ছাড়ান অসম্ভব হইত।

(৮) কিন্তু আত্মা তাহাদিগকে কেন ভাগ করেন না? ইহার উত্তর এই যে, তিনি উহাদিগের আরোপিত সম্বন্ধে চিরকাল মোহিত হইয়া আছেন। তাহাতে আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। উহারা যে তিনি নন, এ বিবেকজ্ঞান জন্মে নাই। এই কারণে তিনিও উহাদিগকে ছাড়েন না, উহারাও তাঁহাকে ছাড়েন না। এই অবিবেকতা ও অজ্ঞান অনাদি, সেদস্ত্র জগৎও অনাদি অনন্ত-প্রবাহে আসা বাওরা করিতেছে। কিন্তু বহু জন্মের অন্তে শুভ কর্ম দ্বারা, শম-দমাদির সাধন দ্বারা, সাধুগণ দ্বারা যখন আত্মাতে প্রকৃতি বা অনিদ্যা-ব্যবচ্ছেদক বিবেকজ্ঞান জন্মে অথবা আত্ম-দর্শন হয়, তৎকথাৎ ঐ সকল কল্পিত সম্বন্ধ সরিয়া যায় এবং আত্মা যোগানন্দ অমুক্ত করেন।

(৯) ঐ সকল সুখ দুঃখাদি, পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর ঘটনাকারী সম্বন্ধ কল্পিত না হইলে, উহারা আত্মার চিরদ্রব স্বরূপ হইত। কোন উপায়ে উহাদিগকে পরিত্যাগ সম্ভব হইত না। হইলেও আত্মার অবচ্ছেদ হইত। তাহাতে আত্মার অখণ্ড একরস স্বরূপ আত্মজ্ঞান সমুদিত হইত না। এই জ্ঞানযোগের উপদেশ কেবল হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম হইতেই পাওয়া যায়।

(১০) এই জন্ত উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, সাংখ্যদর্শন, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে আত্মজ্ঞান সাধনের এত উপদেশ ও বিচার। সেই সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যার অমূল্যলন, আত্মানাত্ম-বিবেক দ্বারা আত্মতত্ত্বের বিচার, এবং আত্মজ্ঞান লাভার্থ সাধকের অর্জিত

অনুভাবী যোগ, ধ্যান, তপস্যা, ব্রহ্মদেবার্চনাদি সমুদ্রটান করা অবশ্য কর্তব্য। কলে সামক আত্মসুসজ্জন রূপ মুখ্য উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট না হন, ইহাই সমস্ত যোগশাস্ত্রের অভিপায়।

(১১) ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র যে, আত্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান প্রভৃতি একই কথা। প্রত্যেক আত্মাই চৈতন্যময়। তিনি যেমন অবিদ্যাদোষে দেহ মন আদি প্রাকৃতিক কার্য দ্বারা বদ্ধ, সেইরূপ শীর চৈতন্য-শক্তি দ্বারা শাস্ত্রদৃষ্টিতে এবং শুকর উপদেশে তৎসমস্তকে দমন পূর্বক বশীভূত করিতে পারেন, এবং ক্রমে জানিতে পারেন—তিনি স্বতন্ত্র। এই আত্মসাত্বিকজ্ঞান সমুদিত হইলেই প্রত্যেক আত্মাই সাংখ্য মতে, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৈবল্য-রূপী ব্রহ্ম; এবং বেদান্তমতে, প্রত্যেক আত্মাই একমাত্র ব্রহ্মাত্মাতেই আত্মত্ব করেন। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে উত্তর দর্শনের এই আত্মসাক্ষ্যকার রূপ দৃষ্টিভেদ মনোহর।

(১২.) প্রত্যেক আত্মাই স্বরূপতঃ মুক্ত ও সর্বব্যাপী। প্রত্যেকের অনাদি অবিদ্যাকৃত ও অনাদি কর্তৃত্ব হুগ স্বয়ং শরীরই সেই স্বরূপের আবরণ। তাহারই নাম উপাধি। তন্মধ্যে স্বয়ং শরীর নিমিত্তক আত্মা সমূহের যোনিভ্রমণ ও স্বর্গাদি লোকান্তরে গমনস্বয়ং। বলা, আকাশ স্বরূপতঃ মুক্ত ও সর্বব্যাপী পদার্থ। সুতরাং তাহার গমনাগমন নাই। কিন্তু ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশের গমনাগমন হইতে পারে। বাহকের সঙ্গে আরোহণ পূর্বক ঘণ্টের সহিত ভ্রমণ্যৎ আকাশ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গাইতে

পারে। সেইরূপ স্বয়ং শরীরাত্মমানী অমুক্ত ও পরিচ্ছিন্ন আত্মা সমূহ স্ব স্ব কর্তৃনিবন্ধন, লোকান্তরে, স্বয়ং শরীরের সহিত অভিযুক্ত হইয়া এবং তদ্ব্যতীত-বর্ণাৎ অচ হুগকণেবর বা দেবদেহ ধারণ করেন।

(১৩) যে সকল আত্মার ব্রহ্মাত্মজ্ঞান জন্মে, তাহাদের হুগ স্বয়ং শরীরাদিরূপ উপাধি, মূল অবিদ্যা ও অনাদি কর্তৃবীজের সহিত ভ্রম হইয়া যায়। তখন তাহাদের মুক্ত ও সর্বব্যাপী স্বরূপের সহিত স্ব স্ব আত্মনির্ভিত ব্রহ্মাত্মভাব বিকাশিত হয়। স্বরূপ ঘটভেদে, ঘটাকাশ, পারিচ্ছিন্ন অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া সর্বব্যাপী স্ব লাভ করে, তৎসৎ। তখন তাহার আর গমনাগমন কল্পনা করা যায় না। সেইরূপ মুক্তাত্মাগণের উপাধির উপরম হওয়ার্তে এবং পুণ্য-পাপ, পঞ্চাধর্ম, বাগমা ও মায়ার অন্ত হওয়ার্তে, তাহাদের মুক্তার পর শোকান্তরগত রহিত হইয়া যায়। কেননা তখন তাহার জ্ঞানতঃ মুক্ত, সর্বব্যাপী ও ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে তন্ময়। তাহাদের আবার গতিবিধি কেন? স্বর্গাদি ভোগই বা কেন?

(১৪) এইজন্য বেদে কহেন “নতস্ত প্রাণা উৎক্রমন্তি অন্ত ব্রহ্ম সমগ্নত।” ব্রহ্মজ্ঞানীর শরীর ত্যাগের পর তাহার প্রাণাদি উৎক্রমণ করে না। তিনি এই-ধানেই ব্রহ্মসম্ভোগ করেন।

(১৫) “প্রাণাদি” শব্দের অর্থ পঞ্চ প্রাণ, বশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই সমুদয় অবরব-বিশিষ্ট স্বয়ং শরীর। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষ-গণকে তাহাদের স্ব স্ব হেতুসেই স্বর্গাদি লোকে লইয়া যায় না। কেননা তাহার স্ব স্ব আত্মার মধ্যেই ব্রহ্মাত্মকে এবং

ব্রহ্মাচার মধ্যেই য য আত্মাকে লাভ করিয়াছেন। এতে ব্রহ্মাচার লাভ ব্রহ্মানন্দ ভোগের বাস্তবক। সেতোক উক্ত শ্রুতিতে "অঙ্গুতে" (ব্রহ্মানন্দ সংশ্লিষ্ট করেন) এই উক্তি আছে।

(১৬) প্রস্ন এতে যে, ব্রহ্মাচারক মুক্ত পুণ্যসমূহের য য আত্মা চো মোক্ষ কালে ব্রহ্মতে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ শরীরসমূহ কোথায় যায়? ইহার উত্তর এতে যে, ব্রহ্মাচার্য্য সকল আপনারা ব্রহ্মতে প্রবেশ পূর্বেক অমৃত হইলেন, প্রাকৃতিক জাগ্রত, স্বপ্ন, সুস্বপ্ন রূপ ধর্ম হইতে উপরম লাভ করিয়া অপরিলুপ্ত জাগ্রতাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, এবং নিত্য কালের নিমিত্তে ব্রহ্মতে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু তাঁহাদের স্মরণ শরীর ব্রহ্মতে দ্বিগ-নির্দীপকরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। "তস্মাৎ তব-বিদ্যা, বাগাদীনাং নিঃশেষেণ পরমাত্মনি লয়ঃ।" অতএব তত্ত্বনির্দগণের বাগাদি স্মরণ শরীর নিঃশেষে পরমাত্মতে লয় পায়। তৎসমূহের আর উত্থান হয় না; কেননা তাহারা তাঁহাদের সাধারণ সম্পৎ, তাঁহারা মুক্ত হইয়াছেন।

(১৭) মুক্তগণ এবং ব্রহ্মে কোন প্রকার উপাধিগত, রূপ, নাম ও গুণগত, বিভূষ এবং নিত্যতা সর্বদে প্রভেদ নাহি। কেবল এই মাত্র প্রভেদ যে, মুক্তাঙ্গাগণ অবিচ্ছাচারোপকরণে কারামুক্ত; কিন্তু ব্রহ্ম সদা মুক্ত। যদিও সৃষ্টির অধিকারে তাঁহাতে সারা কর্তৃক জগৎ আরোপিত হয়, কিন্তু তাহাতে তিনি বদ্ধ হন না এবং আত্মস্বরূপ ভুলিয়া ধান না। কলে অমুক্ত আত্মারা অবিচ্ছাঙ্কিত

দেহাঙ্গারোপে বশতঃ আত্মনিবৃত্তবৎ বন্ধন-গ্রস্ত হইয়া অনাদি কাল হইতে সংসার-কারাগারে বদ্ধ থাকেন। পশ্চাৎ মুক্তি লাভ করেন। তখন মুখাচার্য্য সকল ব্রহ্মানন্দে একীভূত হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে এই প্রভেদ। ব্রহ্ম সদা মুক্ত, আর মুক্ত সকল। অনাদি ভ্রম হইতে মুক্ত মুক্ত। যিনি সদা মুক্ত, তিনিই গতি। যাঁহারা মুক্ত মুক্ত, তাঁহারা গস্তা।

‡ কেহ কেহ বলেন "একমেবাদ্বিতীয়ঃ" শ্রুতি অঙ্গুত্রে মুক্তাচার্য্য ও ব্রহ্মের মধ্যে এই প্রভেদ দাঁড়াইতে পারে না। তাঁহাদের মধ্যে এই জগৎ সৃষ্টিই হয় নাই। ইহা মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য। তিনি যোগ, তাহাই থাকেন। 'মোক্ষ' নাম মাত্র, কেননা তিনি ক্রিয় অজ্ঞ আত্মা নাই, যাহার মোক্ষ হইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার উত্তর এতে যে, তাঁহাদের কৃত এই তাৎপর্যা উক্ত শ্রুতির সমর্থ নহে। উত্তর যাহা প্রকৃত অর্থ, তাহা আমি স্বধনীত কোন কোন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে বলিয়াছি। আসল কথা এই যে, অসংখ্য আত্মা, জড়জগৎ এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বরীত্ব মহাবিশ্বাস্বরূপিনী মায়ামুক্তির সহ নিত্যকাণাবদি নিত্যকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মতে অধর ও অন্তর্ভাবাপন্ন। ইহাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" শ্রুতির অর্থ। যদি এই অর্থ গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আত্মাসমূহের বতন্ত্র বতন্ত্র অস্তিত্ব অভাবে জগৎ হইতে ধর্ম, ভক্তি, প্রেম ও জ্ঞান সাধন উঠিয়া যায়; উপাস্ত-উপাসক সর্বদা রহিত হয়, অথবা হ্রপাতা বেদান্ত পড়িয়া তৎসমস্তকে জিকাল মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। সুগ কথা এই যে, পরমাত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যেমন নাতিকতা, জীবাচার্য্য অস্তিত্ব না মানাও সেইরূপ নাতিকতা। জীবের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্তেই এই সৃষ্টি। জীবেরই মোক্ষ হয়। সেই মোক্ষ

কর্ভূব, কুর্ন, কৰ্মফল, পাপ ও স্মৃতির
 ংশী ও সংযোজিতা নহেন; সে সমস্ত
 ংভাবতঃ—অর্থাৎ অনাদি কৰ্ম সত্ত্ব অবিভা-
 লক্ষণা প্রকৃতি হইতে আসিয়া জীবগণকে
 আশ্রয় করে। সেই প্রাকৃতিক সংযোগ,
 তৎসাক্ষরাদিবিধাঃ সৌমা ভাবাঃ প্রজায়ন্তে
 তদৈচ্যাপিয়ান্ত ॥” যেমন সুদাম্প অগ্নি হইতে
 অগ্নিবৎ রূপের সহিত সহস্র সহস্র বিকূলঙ্গ
 নির্গত হয়, তদ্রূপ হে সৌমা! “অক্ষবাৎ
 বিবিধাঃ নানাদেহোপাধিভেদমমুবিধীর-
 মানদ্বাং ভাবাঃ কীবাঃ প্রজায়ন্তে তত্রচ
 এব তন্মিত্তেবাকরে অপিয়ন্তি বিলীয়ন্তে।”
 (শাক্তর ভাষ্য অক্ষর পরবন্ধ হইতে বিবিধ
 জীবগণ নানা দেহোপাধি অর্থাৎ আকৃতি-
 প্রকৃতির সহিত জগতে সৃষ্টিকালে অবতীর্ণ
 হন এবং সৃষ্টির বিরাম কালে অর্থাৎ প্রাক-
 তিক পলর কালে সেই অক্ষর পরমাত্মাতেই
 বিলীন হইয়া থাকেন এবং পুনঃ পুনঃ
 সৃষ্টি কালে পুনঃ বার বার জগতে ঐরূপে
 জন্মগ্রহণ করেন। মনুস্মৃতির (১২ অঃ
 ১৫ ঘটন) এই স্রষ্টির সম্পূর্ণ তাৎপর্য
 পাওয়া যায় যথা “অসংখ্যাসুৰ্ত্তরন্তস্য নিম্প-
 তস্তি শরীরতঃ। উচ্চাংচানি ভূতানি সভতং
 চেষ্টয়ন্তি যঃ”। এই ঘটনাব কল্পে তট্ট কৃত
 টীকা, যথা—“অন্ত পরমাত্মনঃ শরীরান-
 সংখ্যাসুৰ্ত্তরো জীবাঃ ক্ষেত্রজ্ঞ শঙ্কেনানন্তর
 মুক্কা লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্না বেদান্তোক্তপদ-
 রেণায়োরিব স্কুলিকা নিঃসরন্তি বাসুৰ্ত্তরো
 (জীবাঃ) উৎকৃষ্টাংগরূপে ভূতানি দেহরূপতরা
 পরিণতানি সর্বিদা কৰ্মত্র পেবয়ন্তি।”
 এই পরমাত্মার দেহ হইতে অসংখ্য জীব,
 লিঙ্গশরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর রূপ উপাধির
 সহিত বিনিসৃত হন। তাঁহার প্রত্যেক
 ংখ্য হইয়া, সূক্ষ্ম দেহবাহী বিধার ‘ক্ষেত্রজ্ঞ’
 নামে উক্ত হন। তাঁহার বেদান্তোক্ত
 প্রকারে নিঃসৃত হইয়া উৎকৃষ্ট অংকট
 ংশে নিঃসৃত হইতে করেন এবং বৎসর বৎসর
 ংখ্য কৰ্মে প্রেরণ করেন।

রজ্জুতে সর্পভ্রমের স্তায় এবং ফটিকে জবা-
 ফুলের আভা প্রতিবিম্বিত হওয়ার স্তায়
 আরোপিত মাত্র। জীবাভ্যাগণের আত্ম-
 স্বরূপের জ্ঞান অতীন্দ্রিয়। স্মৃত্যং এই
 ইন্দ্রিয়চরিতার্থকর বিশ্বরাজ্য সে স্তানের
 উদ্দীপনে অশক্ত। তাহা দেহাদির বীজরূপী
 অনাদি-অজ্ঞান (অবিদ্যা) দ্বারা আবৃত
 থাকার, তাঁহার মুহূমান চরেন (গীতা ৫ ।)

৩১। ভগবানের সৃষ্টি এই আশ্চর্য্য
 রচিত ব্রহ্মাণ্ডের ইহাই প্রণালী। এই
 প্রণালী অনুসারে অনাদিকাল হইতে সৃষ্টি-
 চক্র অব্যক্ত-প্রলয়-প্রান্ত হইতে সুব্যক্ত-
 সৃষ্টি-প্রান্ত পর্যন্ত কল্পে কল্পে আবর্তিত
 হইতেছে এবং অনন্ত কাল হইতে থাকিবেক
 জীবাভ্যাগণের কর্তৃক ভোক্তৃদের কোন
 দায় দোষ পরমাত্মাতে অর্বে না। তাঁহাদের
 সম্মুখে অনাদিকাল হইতে দুইটা পথ পড়িয়া
 আছে। একটা অবিভ্যামারূপিনী প্রকৃতি-
 বিরচিত কৰ্মময় পন্থা; সেই পন্থার নাম
 পের। সেই পন্থাহী হইলে, তাঁহাদের
 শ্রিয় এবং অপিয়, উভয়েরই সংযোগ হয়।
 সদাগরা ধরণীর রাজসম্পৎ, দেহ, দার,
 পুত্র, হস্তী, হিরণ্য, অশ্ব, রথ, চমাতর্ন্যা অবধি
 দারিদ্র্য ও রোগশোকাদি পর্যন্ত সেই পনের
 প্রাপ্তব্য ভোগপুরী। অতঃপর বিতীর্ণ পন্থার
 নাম শ্রেরঃ। ইহার দ্বারা পরমাত্মপুরী
 লাভ হয়।—(কঠ ২। ১-২ ।) সে পুরীতে
 কোনরূপ দেহের অপথা ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির
 সন্থক মাত্র নাই।

৩২। জীবাভ্যাগণ পরমাত্মজ্ঞান-বাহী
 হইয়া ভোগপুরীতে বদ্ধ আছেন। তাঁহা-
 বিগের নির্ধন ও নিফলক অর্থেতে

প্রতিবিম্বিত দেহাদি পদার্থকে “আসি” ও “আনার” ভাবনা করিয়া তাঁহার অনিত্য ও অসত্য স্বপ্ন-রূপে নিম্ন আছেন। পরসংযোগে স্বপ্ন এবং বিচ্ছিন্নে যাতনা ভোগ করিতেছেন। আশ্চর্য্য-রচনা ধন-ধান্যময়, পুত্র-কলত্রপরিবেষ্টিত জগৎ পাটয়া জগৎপতিকে ভুলিয়া আছেন। ঈশ্বরের নিয়মে এই ভোগপুরী বিরচিত। উহার ভোগ সাদৃশ্য হইলে অথবা জ্ঞানযোগে উহার দোষ দূর হইলে, নির্মলচিত্ত বৈরাগ্য-বান্ ও আচার্য্যবান্ পুরুষের জ্ঞান-নেত্রের সম্মুখে পরমাত্মপুরী লক্ষিত হয়। ইতাই জগৎবানের নিয়ম। নতুবা সম্মুখগর্তী বাহিত অঙ্গশেষ, দোষ, স্ত্রী, পুত্র, আরোগ্য, ধন, সম্পত্তি ছাড়িয়া কে বৈরাগ্যের নিরাক্তন সদাশিবকে প্রার্থনা করিবে? কিন্তু তাহা ভোগ করিতে করিতে যখন এই জন্ম বা জন্মান্তরে দেখিবে যে, তাহা সদাপরিনর্ভন-শীল এবং অশেষ বেদনা-সঙ্কুল, তখন ধীর পুরুষ শান্তিপদ পরমাত্মপুরীতে প্রবেশের নিমিত্তে প্রেরণরূপ পস্থা প্রাপ্ত হইবেন।

৩০। এই সংসারট সেট ভোগস্থান। পরমাত্মধামের তুলনার টো অনিষ্টার কারণ—যেহা তমসাক্ষর এবং শতসহস্র প্রকার যন্ত্রণার গদেশ। এই অন্ধকারে কখনও স্বর্গাদি স্বপ্নভোগ, কখনও বা জন্ম সূচ্য-জরা-ব্যাধি ভোগার্থ জীবগণ এক প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে সংসরণ করিতেছেন। সে গুণসাগরময় ও যন্ত্রণার পার নাহি। দেব-লোকাদি স্বর্গও এই অবিজ্ঞা-কারণারের প্রবেশ বিশেষ। কেননা “অস্থ্যা নাম তে

লোকা অন্ধেন তমসাবৃত্তাঃ।” “পরমার্থ ভাবমপেক্ষা দেবাদয়োহপি অহুরা অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেন তমসাবৃত্তাঃ।” (ঈশোপনিষৎ ২) পরমাত্মভাবের তুলনার দেবাদিলোক ও অহুরলোক, অর্থাৎ অজ্ঞান-নাট্যকারে আবৃত। এমত অবস্থায় মর্ত্য-লোকের তো কথাই নাই।

৩০। শঙ্করাচার্য্য কহেন “শরীর পরি-গ্রহাদৃশং জায়তে” শরীর পরিগ্রহ করাতে জীবের এট সকল চঃখ হয়। “সর্ক্সান্না শরীর পরিগ্রহ নাশে সতি চঃখস্ত নিবৃত্তি-র্ভবতি।” সর্ক্সতোভাবে শরীর পরিগ্রহ নাশ হইলেই চঃখনিবৃত্তি হয় এবং অজ্ঞান ও তাহার অন্ধ-প্রত্যক্ষ স্বরূপ কর্ম, রাগাদি, “অভিমান, অবিবেক, নিবৃত্ত হইলে, শরীর-পারণের নিবৃত্তি হয়। কিন্তু কখন অজ্ঞানের (অপিত্তার) নিবৃত্তি হয়? উত্তর—“ব্রহ্মা-নৈকত্বজ্ঞানে জ্ঞাতে সতি সর্ক্সান্নাহবিজ্ঞা নিবৃত্তিঃ।” ব্রহ্মতে জীবের আত্মজ্ঞান হইলে, নিঃশেষে অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হয়। (আত্মানাত্মবিবেক। রা, মো, রা-গ্রন্থাবলি, ১৭২৫ শক। ৪০৫ পৃষ্ঠা)

৩০। এই জন্ম উপনিষদাদি মহামহা শাস্ত্রে ব্রহ্মবিজ্ঞার ভূমঃ উপদেশ। ব্রহ্ম-বিজ্ঞাই ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের নামান্তর অথবা প্রসূতি। সেই জ্ঞানই সর্ক্সতোভাবে কর্ম, অভিমান, অবিবেকতা এবং অনাদি অবি-জ্ঞার সহিত যুগশরীর, মনোবুদ্ধি, দশেন্দ্রিয় ও পঞ্চবিধ প্রাণাদিবায়ুর সম্বাত্তরূপ স্বল্প-শরীর, আর প্রকৃতিরূপ বীজাদি ঐক-ক্রিবিধ দেহ এবং জীবের সেই সকল অধ্যা-মোপিত দেহেতে আবিষ্কৃত স্বল্প স্বল্প

নিঃশেষ ধ্বংসকারী। ধর্মের অঙ্গাদরে
নিশাির ধ্বংসরাশি নিশেবে ধ্বংস হয়, তদ্বৎ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

সকায় সাধনা বা ধর্ম- জিজ্ঞাসার প্রয়োজনীয়তা

আর্য্যধর্মশাস্ত্রাদি গুরুত-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার
সহিত পর্যালোচিত হুঁলে, ইহাই উপলব্ধ
হয় যে, সাধনার প্রণালী বিবিধ। যথাকালে
ও যথানির্দিষ্ট পাত্র অর্থাৎ অধিকারী ব্যক্তি
ঐ সকল শাস্ত্রাভ্যায়ী গৃহীত অবলম্বন করি-
লেই শুভ ফল উৎপন্ন হয়; নতুবা উহাতে
নানা অনর্থোৎপত্তি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্-
ভাগবত গ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে,—

“অর্জুন! অর্জুন! ত্বংস্বয়ং যঃ স কাম্যং ।
যাবদ্বৈ বেদ স্বর্গাদি সর্গভূতৈঃ স্বনিত্তম ॥”

অর্থাৎ—মহামুগ্ধাণে যে পর্য্যন্ত সর্গভূতে
অবস্থানকারী আমাকে (পরমাত্মাকে)
অবগত না হইতে পারিবে, অর্থাৎ ধ্যানাদি
প্রত্যয়ে আপন হৃদয়ে পরমাত্মার অস্তিত্ব
সুস্পষ্ট অনুভব করিতে না পারিবে, সে
পর্য্যন্ত কর্মকাণ্ড অস্থান পূর্বক প্রতিমা-
দিতে অর্চনা করবে।

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে
পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিবে, তাৎ অস্ত-
করণের নিশ্চলতা ও নিশ্চলতা সাধন অল্প
সমুদয় সাধারণ উপাসনা করিবে।

অপরন্ত “বেদান্তসার” গ্রন্থে সিদ্ধান্তিত
হইয়াছে—

“অধিকারীত্ব বিধিনবধীত বেদবেদা-
জ্ঞেনাপাততোহুৎসগস্তাৎশিথ দেদার্থোহুৎস
অস্মিন জন্মাস্তরে বা কাম্যনির্দেহজন
পুংগরং নিতা নৈনিত্তিক প্রারশ্চিত্তাণা-
সনানুষ্ঠানেন নির্গতনিশিলাঙ্গসত্তরা নিতাস্ত
নির্গনসাস্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা ॥”

যিনি যথানিদি বেদ-বেদান্ত শাস্ত্র অসা-
রন করিয়া আপাততঃ অর্থাৎ সুক্ৰমে
সকল বেদের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন,
ইহ জ্ঞান বা জন্মাস্তরে কামা ও নিদিক,
এই দুই প্রকার কার্য্য পরিচাল্য করিয়া,
নিত্য, নৈনিত্তিক, প্রারশ্চিত্ত ও উপাসনা,
এই চতুষ্টয় কার্য্যের অস্থঠান দ্বারা সকল
প্রকার পাপ ধ্বংস হইয়া যাওয়াতে, অস্ত-
করণকে একান্ত নিশ্চল করিতে পারি-
য়াছেন, এবং নিত্যানিত্যাস্ত্রবিবেক, ইহা-
সুত্রফলভোগবিরাগ, শরদমাধি সাধন-
সম্পত্তি ও সুসুকৃৎ এই চতুষ্টয় সাধনঅব-
লম্বন করিয়াছেন, তাদৃশ প্রমাতা অর্থাৎ
সমুদ্যুই ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মো-
পাসনার অধিকারী।

স্বর্গাদি ইষ্ট কামনার যে কার্য্য করা
যায়, তাহাকে কামা বলে। নরকাদি
অনিষ্টসাধক কার্য্যকে নিদিক বলা যায়।
যে কার্য্য না করিলে পাপ হয়, তাহাকে
(বধা—প্রত্যতিক সঙ্কটাবসন্না ও শিষ্ঠা-
সাতার প্রতিপালনাদি) নিতাকর্ম বলে।
কোন নিশিত অবলম্বন করিয়া যে কার্য্য
হয় (বধা—অপুত্রক ব্যক্তির পুত্রকামিনী
বজ্রাদি) তাহা নৈনিত্তিক। পাপকর্ম-
সাধক কার্য্যকে (যেমন চাক্রায়ণাদি) প্রার-
শ্চিত্ত বন্দে। সকল ব্রহ্ম অর্থাৎ পার্কার



ঈশ্বরের আরাধনাকে উপাসনা করে। কাম-
ক্ৰোধাদি নিকট পবুক্তি সকলের হীনতাকে
অন্তঃকরণের নিরর্থকতা বলা যায়। ইহ-
কালের নিত্যত্ব অক্ষয়ী এবং পরকালের
কিছু অধিকক্ষণতায়ী (অনিত্য) সুখের
ভোগ নিদরে বিরক্তিকে ইতাসুহ-ফলভোগ-
বিরাগ বলে।

শম, অস্তরিক্রয়ের নিগহ, দম (ক্রম
বাহুস্থিরেব নিগহ), উপরতি, (কাম-
কর্ম নিষ্পূর্ণক পরিত্যাগ), তিত্তিকা
(মৌতাকাঁদি সঙ্ঘ করিতে পারা), সমাধান
(ঐশ্বর্যনিবন্ধক শ্রীণ জননাদিতে আকর্ষিত
মনের একত্রিতা) ও শ্রদ্ধা (সুক্লপদেশ
ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন), এই বদ্ভবিদ
কার্যকে শম-দমাদি-সামন-সম্পত্তি বলা
যায়। মুক্তির উচ্চাকে মুমুকুত্ব বলে।

অষ্টম মতেও প্রধান পবর্ষক মহাত্মা
শঙ্করাচার্য্য ও ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে,
অসংসারী-ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না,
অর্থাৎ অনিত্যের সংসর্গ-দোষে নিত্যেরও
প্রভাব থাকে না। যেমন অশ্ব লঙ্ঘন
করিয়া বনসু গ্রহণ কর না, অশ্রুণ অপরি-
সমাপকর্মা করাত বন্ধ'জ্ঞাসার অধি-
কারী হইতে পারে না। পূর্বে কর্মকাণ্ডে
তৎপর হইয়া শমদমাদি সামন ধার ক্রমে
ইন্দ্রিয়দির শক্তি হইতে মুক্তি লাভ হইলে
স্বভাবতঃই কর্ম রহিত হইয়া যায়। কঠো-
পনিষদে উক্ত হইয়াছে ;—

"বদ্য পকাবতিষ্ঠতে জ্ঞানানি মনসা সত।
যুতিশ্চলনমিচিষ্টেষ্টি তামাহঃ পরমাং গতিস্ম ॥
জ্যৈ-যুগপিত মতন্তে তিরামিহিরধারণাৎ।
কমসত্ত্বত্বা ভবতি যো লোহি প্রভাবাপ্যরোর"

আধুনিক 'ব্রহ্মজ্ঞানী'দিগের পূজ্যাদায়া
মুত নামঃসাধন রায় মহাশয় জানীঃদগকে
লক্ষ্য করিয়া সফুত বেদান্তানুযায় নামক
ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছিলেন যে, "যথার্থ
ব্রহ্মজ্ঞান উপলক্ষ হইলে, কর্মকাণ্ডের তাদৃশ
প্রয়োজন থাকে না বটে, তথাপি জানী-
দিগের কর্মকাণ্ড সাধন করা অবশ্য কতব্য ;
উহা কেন মতে তাজ্য নহে। কেন না
তৎসাধনে ঐ ব্রহ্মজ্ঞানের মনদে ক্ষুতি হয়।
সকাম সাধনের নাম অশ্রীজ্ঞাসা; নিকাম
সাধনার নাম ব্রহ্মজ্ঞাসা। অতএব ব্রহ্ম-
জ্ঞানার পূর্বে অশ্রীজ্ঞাসার বিবেচনা
আবশ্যকতা আছে" ইত্যাদি। বেদান্তদর্শ-
নের প্রথম সূত্রের এই কথাই প্রকাশও
হইয়াছে ;—

"অথাভো ব্রহ্মজ্ঞাসা" (বেদান্ত)

কর্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্মজ্ঞাসা কার্যব।

অতএব অসংসারী ব্রহ্মজ্ঞান, সংসার-
দোষ-সংসৃষ্ট ব্যক্তির প্রাপ্য নহে। তথাপি
যে ব্যক্তি শাস্ত্রাভিধানে তাভাতে প্রযুক্ত
হয়, সে লোনাদিগের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান, উত্তম
ও প্রচীটার্য্য বিগরা বিবেচিত হয়।

যাও কা সংসার আর্থে,—

"তায়াগত-বনস্ব জ্ঞান নাটোহ' ভাষ্যপ্রিয়ঃ।
শ্রীকবৎ সত্য নীচ পুত্রাতাহ প সমুচাতোহ"

যে ব্যক্তি স্বায় পূরণক ধনোপার্জন
করিবে এবং তব'নট জগৎ তত্বাদু সময়ে
একানট ও অ'ভিপনেবা-পবলপ' ও সে,
নিতা-নৈমাত্তিক মাত্ত-পত্ব প্রাভাব কারণে
ও সত্য বাক্য কাহবে, এইরূপ পুত্রও
প'রমুত্ব হয়।

এতদূশ শাস্ত্র-ব্যবহা সৎকও যে পুঁহে

কর্মভ্যাগ করিয়া 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিয়া বখোঁজা-
চারে মগ্ন হইয়া, তাহাকে শাস্ত্র ও যুক্তিপথ-
ভ্যাগী বখোঁজাচারী বলিয়া গণ্য করিতে
হইবে। মিশিলার অধিপতি জনকাদিও
ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন; তাঁহাদিগের দ্বারা কর্ম-
কাণ্ড-প্রবাহকের অবরোধ হয় নাই; বরং
ঐশ্বর্য প্রভূত দক্ষিণা দ্বারা বহাবধ ব্রহ্মাদি
সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্ত্র-
নিন্দা, দেব-ব্রাহ্মণ-নিন্দা, অগ্নিসন্ধাতার ও
সদাচার-পরিভ্যাগ, অথবা ব্রতনিয়মোপবাস
এবং তীর্থভ্রামাদির ব্যাঘাত করেন নাই।

মহামতি বিশিষ্ট দেব শ্রীরামচন্দ্রকে
কহিয়াছেন,—

“বহির্বাণীর-সংরস্তো—

জুদি সংকল্প-বর্জিতঃ ।

কর্ত্তাণতিরকর্ত্তাশ্চ-

য়েবং বিহর রাষণ ॥”

(যোগবাসিষ্ঠ)

হে রাম! তুমি বাহিরে সকল কর্ম কর,
মন সংকল্পরহিত হও, বাহিরে আপনাকে
কর্ত্তা বলিয়া জানাও, কিন্তু মনে আপনাকে
অকর্ত্তা বলিয়া জানিও।

পরন্তু, শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ ব্রহ্মজ্ঞানীলোকের
সংসারী ব্যক্তিগণের পক্ষে কেবল যে নিত্য-
নৈমিত্তিকাদি কর্মভ্যাগের নিবেদন করিয়া-
ছেন, এমন নহে, প্রবলতর প্রত্যাহার
প্রদর্শনপূর্বক ঐ নিবেদনের দৃঢ়তা সম্পাদন
করিয়া গিয়াছেন, যথা—

“আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা

বক্তব্যার্থীভ্যঃ সর্ বক্তৃতনৈঃ ।

ছন্দাভেনং মৃত্যুকালে ভাঙ্গন্তি

নীচং মনুন্দা ইব, সাত্তপন্যঃ ॥”

অর্থাৎ মনুষ্য যদি ব্যাকরণাদি ছন্দ অদ-
সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করেন, তথাপি
আচারহীন ব্যক্তিকে বেদ সকল পরিজ্ঞ-
করিতে পারেন না। বেগন পক্ষীশাংকের
পক্ষোক্ষম হইলে, সে আপন নীড় পরিভ্যাগ
করিয়া পলায়ন করে, তদ্রূপ ছন্দ অর্থাৎ
বেদ সকল, আচারহীন ব্যক্তিকে মৃত্যুকালে
ভ্যাগ করিয়া গমন করেন।

এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিয়া
দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, মনুষ্য যে
পর্যায় আপন অন্তঃকরণকে নিশ্চল ও
নির্মল করিতে সমর্থ না হইবে, তাৎ
সংসারে থাকিয়া বিবিধ সাকার দেব-দেবীর
আরাধনা ও নহতর কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান
করিয়া জিতেন্দ্রিয়তা অভ্যাস করিতে থাকিবে।
ক্রমশঃ মনের পবিত্রতা ও নির্মলতা লাভ
ও জ্ঞানালোকের প্রথরতা উপস্থিত হইলে,
অব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তের নিমিত্ত নিত্য-
নৈমিত্তিকাদি সকল কর্মেরই অনুষ্ঠান
করিবে, কিন্তু তাহাতে ফলকামনা ও
আসক্তি পরিভ্যাগ করিবে।

“নিরতঃ কুরুকর্ম স্বঃ কর্মজ্যায়োহুঃকর্মণঃ ।

শরীরমাজাপি চ তে ন প্রসিদ্ধেদকর্মণঃ ॥”

(গীতা)

পরলোকেই ভগবান্ পরিষ্কার করিয়া
বলিতেছেন;—

“ব্রহ্মার্থংকর্মণোহুঃকর্ত্তালোকোহুঃকর্মংকনঃ ।

তদর্থং কর্ম কৌন্তেরংমুক্তময়ঃ সমাচর ॥”

(গীতা)

পরিশেষে! একত জিতেন্দ্রিয়তা; উপাভ
ইবারে ও পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস এবং
সর্বদায়ে নিঃসন্দেহ নির্মল জ্ঞান উপস্থিত

হইলে, সংসার পরিত্যাগ পূর্বক সমাদি
অবলম্বন করিয়া জীবন-মুক্তিলাভ করিবে।
তখনই ক্রন্দাকাশে চিদাতাসে আশ্রিত হইয়া
উঠিলে,—

“সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।

অনন্দরূপমমৃতং বহিষ্ঠাতি ।

। সত্যং শিবমবৈতম্ ॥” (শ্রুতিঃ)

শ্রীপ্রেমানন্দ ভিক্ষু ।

তত্ত্ব-চিন্তা ।

(:পূর্বাহ্নবৃত্তি।)

জ্ঞান হইতেও বৈরাগ্যের উদয় হয়, অন-
য়োধি হইতেও বৈরাগ্য-উদয় হয়। অর্থাৎ
অনর্থক জানিয়া বিব্রাসক্তি তাগ হয়,
আর বিস্মৃতি হইতেও ক্রমশঃ আসক্তি-
তাগ হয়। জ্ঞান হইতে জাত বৈরাগ্য চির-
স্থায়ী, বিস্মৃতি হইতে জাত বৈরাগ্য চিরস্থায়ী
নহে, কেননা কোন সময়ে আবার আসক্তি-
উদয়ের সম্ভাবনা থাকে।

আসক্তি-মোহের জিরা। মোহ তিন
প্রকার —

(১) বিষয়জ অর্থাৎ বিষয় সত্ত্বে তদাসক্তি।

(২) মনোজ অর্থাৎ বিষয় নাট, কিন্তু তাহা
মনে আছে; মনে উদয় হইলে তদাসক্তি
জন্মিতে পারে।

(৩) সংস্কারজ অর্থাৎ বিষয় নাই, মনে
নাই, কিন্তু সংস্কার বশতঃ মনে পড়িয়া গেলে
আসক্তি করে।

সুতরাং বিস্মৃতি হেতু বৈরাগ্য চিরস্থায়ী
নহে।

সাধারণতঃ কোন কারণ বশতঃ বিষয়-
তাগ হইলে, তাহাকে বৈরাগ্য বলে না।
(শোকে ছুঃখে বা অপারকতা বশতঃ বিষয়-
তাগ হইলে, তাহাকে বৈরাগ্য বলে না)
কেননা হৃদয় তাহার তৎসর্গ তাগ হয়
নাই। আবার স্বার্থতাগ হইলেও, মন
অন্তরস্থিত আসক্তিত্যাগ হয় না। অজ্ঞান
অবস্থায় অর্থাৎ মুক্তি অবস্থায় আসক্তি-
তাগ দেখায়; কিন্তু অবস্থান্তরে উহার
স্মৃতি ও চিন্তা উদয় হইবার সম্ভাবনা।
অতএব মোহ হেতু বা ম্যেংগত কারণ বশতঃ
যে বৈরাগ্য, উহা আত্মাচ্যায় উপকারী
নহে।

৩০। রিপু। রিপু অর্থ শত্রু। প্রক-
র্ত্ত্ব (অহংকে) “আমিকে” যে প্রকৃতিস্থ
কারিতে পারে—সে পরাক্রান্ত শত্রু। কাম,
ক্রোধ, মোহাদি বর্জিত বৃত্তি—সমরূপী
অহংয়ের। ইহার সময় সময় অহংকে
অপ্রকৃতিস্থ করে বলিয়া “রিপু” নামে খ্যাত।
বৃত্তি কখনই রিপু নহে—কেননা অহং ঐ
সকল বৃত্তি লইয়াই “বৃত্তিবস্ত”। ঐ সকল
বৃত্তি হইতে যে কামনার উদয় হয়, তাহাও
রিপু নহে। কামনা চরিতার্থ করিবার
অন্ত যে বেগের উদয় হয়, উহাই রিপু।
সেই বেগ কাহার বা কোথা হইতে আইসে?
চিত্তের বলিবে? চিত্ত কি অহং-ব্যতীত?
সুতরাং উহা অহং-প্রসূত। অহং-প্রসূত
হইয়া অহংয়ের শত্রু, এ বিচার গ্রাহ্য কি
প্রকারে? বিশেষতঃ বাহাতে ভোগইচ্ছা
নাই, উহাতে উহাদের প্রকাশ নাই—
উহার রিপুও নহে।

উহারি যে অহংয়ের বৃত্তি, সেই অহং

আত্মবিস্মৃত বশতঃ উচ্চাধিকারকে শত্রু বলি-
রাছেন। আত্মবিস্মরণ গিয়া যখন অশ্রমের
পূর্ণ ভাব হয়, তখন উহার। আর শত্রু
পাকেনা—শত্রুতা করে না—বৃত্তিরূপে সেই
অশ্রমে লীন থাকে।

তোমাতে ক্রোধ আছে—কোথায় আছে
বা কি ভাবে আছে, দেখাওতে পার না।
এখন তুমি পূর্ণ ভাবে অশ্রম—জীবাত্মি-
মানী, সুচরিত্র লক্ষ্যবিশিষ্ট। তুমি এক-
টিই বলিয়া তোমাতে ঘাঃ বাধা আছে,
তৎসমুদয়ই অশ্রমীত্ব। তুমিই ক্রোধের
উত্তেরনা করিলে—ক্রোধ প্রকাশ পাইল,
তোমাকে আরও অপ্রকৃতিত্ব করণ। দোষ
কার? শত্রু কে কাহার? ক্রোধের সমর
দৈন্য অবলম্বন বিধেয়; কেননা জৈ দৈন্যের
অনুভব তুমি পুনঃ প্রকৃতিত্ব হইতে পার।
ক্রোধের সমর হাসিয়া ফেলিলে, বৃষ্টিতে
পারিলে—উহা রিপু নহে—তোমারই অশ্র-
মগত মাত্র।

৬১। একপে সাধারণ ভাবে কাম-
ক্রোধাদিকে রিপু ভাবিয়া দেখা যাউক।
রিপুকে শাসন করিতে না বশীভূত রাখিতে
মহু স্থান তচ্ছা প্রাকৃতিক। অতএব কাম-
ক্রোধাদিকে শাসন করিতে না বশীভূত
রাখিতেই মহু স্থান কর্তব্যবোধ।

সিপুশাসন দুঃসাপা—কেনে করিতে
পারে না—পারিলে না; কেননা নাটকে
শাসন করিলে, সে যে তুমি "তুমিই", আমি
"আমিই"। অথবা তুমি "তোমার" আমি
"আমার"।

রিপু বশীভূত রাখা আর আপনি প্রকৃ-
তিত্ব পাঁকা, একই কথা। আপনি প্রকৃতিত্ব

হও—রিপুও বশীভূত হইয়াছে, বৃষ্টিতে
পারিলে—জীবাত্মমানী রিপু বশীভূত করিতে
আত্মাত্মমান ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠের অশ্র-
মগত হয়। যে পরিমাণে অশ্রমগত হয়, সেই
পরিমাণে রিপু বশীভূত করিতে সক্ষম হয়।
প্রথমটী আত্মশাসন, দ্বিতীয়টী আত্মউৎসর্গ।
জ্ঞানমার্গ ও তাক্তিমার্গ অপর্যবনই এক মাত্র
উপায়।

জীবাত্মমানী রিপুতে আসক্তি বৃদ্ধ
করিয়া অশ্রমতন পাণ্ড হয়।

৬২। কুকার্যে বাধা "আসক্তি", সং-
কার্যে তাহাই "অশ্রমগত"। শত্রুর বিপ-
রীত বলিয়া এক হইতে অশ্রম কত বিভিন্ন।
আসক্তিতে যেমন আত্মবিস্মৃতি—অশ্রমগত
তরুণ আত্মবিস্মৃতি হয়। তারতম্য এই
দে, প্রথমটীতে নিস্মৃতি প্রকৃত—দ্বিতীয়টীতে
নিস্মৃতি প্রকৃত নহে—আত্মউৎসর্গ করা।
অর্থাৎ প্রথমটীতে চৈতন্তলোপ—দ্বিতীয়টীতে
চৈতন্তলোপ হয় না।

৬৩। ইচ্ছা—পূর্ণি বলা হইয়াছে—

(১) বাসনা হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি।
ইচ্ছা বাস্তব বাসনা-স্বরূপ কাম্য থাকে।
ইতি কাম্য বাসনা কার্যকারী নহে। বাহার
কাণা নাট, তাহার ইচ্ছা নাই, বাসনাও
কাম্য। বাহার কার্য নাট, সে অসংকার
ও আত্মাত্মমানশূন্য। অতএব বাস্তবে
অসংকার ও আত্মাত্মমান আছে, তাহার
কাণা আছে কাণা পরিবার ইচ্ছা হয়;
এই ইচ্ছা কাম্য বাসনা হইতে উদ্ভূত হয়।

ইচ্ছা হইতে ব্রহ্মবাস, অশ্রম ব্যক্তিরই
ইচ্ছার উদয় হয়; মুক্ত ব্যক্তির কাণা নাই
বলিয়া ইচ্ছা হয় না। অতএব ব্রহ্মবাস ইচ্ছা

কম সে ব্যক্তি বৃত্ত নহে—লিপ্ত বা বিকারী।
বিকারীতে বাহ্য ব্যবহৃত, তাহারও বিকার
সম্ভব।

সুতরাং উচ্ছা বিকারীর—মুক্ত ব্যক্তির
নহে।

(১) উচ্ছা তিন প্রকার—ইচ্ছা, অনিচ্ছা
ও পরেচ্ছা।

(১) উচ্ছা—যথা বিকারীর কুপণ্যে ইচ্ছা।
আরের উপর অন্ন বা অধিক জল বা অন্ত
কুপণ্যে ইচ্ছা।

(২) অনিচ্ছা—যাচা অসম্মত বা অসম্মত
উচ্ছা। চন্দ্রে—নক্ষত্রে বেড়াইবার উচ্ছা,
লীনচঃখী তটের রাজভোগে ইচ্ছা।

(৩) পরেচ্ছা—আপনার ইচ্ছা নাই—
পরের উচ্ছার কাজ করিতে উচ্ছা।

প্রথমটীতে—লিপ্ততা, আসক্তি, মায়, ভ্রম
ইত্যাদি।

বিত্তীয়টীতে—কতক আসক্তি, অধিক ভ্রম,
কতক মায় উচ্ছ।

তৃতীয়টীতে—লিপ্ততা ও আসক্তির লেশ
নাই, মায় নাই, ভ্রম কতক নিচর্যা।
না করিলে, ক্ষতি-লাভ বোধ প্রিনাই, তবু
কেন করি—এই ভ্রম।

(৪) উন্নতির পথে—অর্থাৎ মুক্ত হইবার
পূর্বে উচ্ছা ও অনিচ্ছার লোপ হয়।
পরেচ্ছা তখনও থাকে। পরেচ্ছার দায়িত্ব
ভাগ অন্ন; দায়িত্ব পড়িয়া কার্য করিলে
যে রূপ দায়িত্ব, সেই রূপ। কার্য ব্যতীত
অস্তিত্ব নাই, সুতরাং অস্তিত্ব সঙ্গে পরেচ্ছার
কার্য করা মুক্ত হইবার পূর্ব ভাব।

(৫) ইহা হইতেই বুঝা যায়—বাহ্যর বৃত্ত
উচ্ছা, সে বৃত্ত লিপ্ত। বাহ্যর উচ্ছা বৃত্ত অন্ন,

সে বৃত্ত পরিমাণে অনাসক্ত—মুক্ত প্রবেশ।
অন্ন ইচ্ছার যেমন অনাসক্তি মুক্ত। তেমনি
বিরতি অর্থাৎ “আর চাই না” বুঝায়।

(৬) আনি ইচ্ছা করিবনা, মনে করিগেই
সে ইচ্ছার শেষ হয়, তাহা নহে। সম্ভব
যত অনাসক্ত, যত অন্ন লিপ্ত, যত অন্ন
মোহ ও মায়গ্রস্ত হইতে থাকে, তত তাহার
ইচ্ছার সঙ্ক্টি ও ইচ্ছার বেগ কমিতে থাকে।
অতএব ইচ্ছার হাস আত্মপ্রতির উপর
নির্ভর করে।

হৃঃখীর সুখ-ইচ্ছা স্বভাবসিদ্ধ। হৃঃখী
পড়িয়া সুখ চাহিব না বলিলেই যে ইচ্ছার
উদয় হইবে না, তাহা নহে। বাহার হৃঃখ-
বোধ আছে, তাহার আশ্রয় উন্নতি তত
হয় নাই বলিয়া, উচ্ছা স্বভাবতঃ হইবেই
হইবে। অতএব মোহ করিয়া ইচ্ছার শেষ
করা যায় না।

হতাশেও ইচ্ছার শেষ নহে। আশা
নাই, তাই হতাশ। আশা থাকিলেই ভোগ
ও কার্য আছে, স্বীকার করিতে হয়,
সুতরাং উচ্ছাও হইবে। সেই আশা না
থাকা বশতঃ ইচ্ছার শেষ হয় না। যখনই
সেই আশার উদয় হইবে, তখনই ইচ্ছারও
উদয় হইবে।

শোকাতুর ইচ্ছা করিয়া থাকিবে দায়িত্ব
করে না; তাই বলিয়া তাহার ইচ্ছার
শেষ হইয়াছে, বলা যায় না। শোক বৃত্ত
টুকু করিয়া সরিয়া বাইবে, সেই পরিমাণে
ইচ্ছার উদয় হইবে।

মৃত্যুতেও ইচ্ছার শেষ নহে। ইহা
দেখাইবার যো নাই।

(৭) ইচ্ছার শেষ সুখ তৃপ্তিতে সম্ভাবিকা

যথা শেট ভরিয়া ভাল খাইয়া তৃপ্ত হইলে, সেই খাদ্যে আর ইচ্ছা বৃদ্ধি না। এই তৃপ্তির কথা অন্তর্ভুক্ত আছে।

(৭) অতএব বতকণ তৃপ্তি না হয়, ততকণ পর্য্যন্ত ইচ্ছা পরিত্যাগ নাহে—পরিত্যাগ করিবার যো নাই ও উহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করা অন্তর্ভুক্ত। কারণ, সে চেষ্টা কখনই সফল হয় না।

(৮) আবার ভোগইচ্ছা সবে, বিশ্ব সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা না করা অবিধেয়। শক্তিতে শ্রী কুলার, শক্তির সঞ্চয় করিতে হয়। গাড়ী চড়িতে বড় ইচ্ছা—যাহাতে গাড়ী চড়া হয়, তাহাই করা উচিত। কারণ বতকাল ঐ ভোগ পূর্ণ না হইবে, ততকাল ভোমার নিস্তার নাই। অর্থাৎ উহা সম্বন্ধে নির্দিষ্ট বা অনাসক্ত হইতে পারিবে না। অতএব যাহাতে গাড়ী চড়া হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। ইহা জন্মে অপূর্ণ যে কোন বাসনার পূরণার্থেও পুনর্জন্ম সম্ভাবিত। বিশ্বের অনিত্যতাবোধসিদ্ধির দ্বারাই বাসনা-জর বিহিত। নচেৎ বলাৎ-কৃত বাসনা-দমন জনন-মরণ-শৃঙ্খল-ছেদ ও মুক্তি লাভের সাধন নহে।

এই ভোগইচ্ছা—ইচ্ছা বা অনিচ্ছার অন্তর্গত; সুতরাং বিকারীরই সম্ভব। বিকার হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে, এই ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না।

(৯) সংকেপতঃ, যাহাতে বিকার দূর হয়, সাধুর্তা তাঁহাই করেন, জানীরা তাহাই করেন, শাস্ত্রও তাহাই বলিয়া থাকেন।

যদি ইচ্ছা কি, বুঝিতে পার, তবে উহাকে বাঞ্ছিতে দিও না, শাস্ত্রভাবে—‘হর হটক,

না হর না হটক’—এইরূপ অনাসক্ত ভাবে অগ্রসর হও। আত্ম-উন্নতি করিব, ইচ্ছা করিয়া থাকিলে, অপর বাহ্য উন্নতির ইচ্ছা প্রায় হ্রাস পাইয়া থাকে অথবা ক্ষীণ বল হইয়া পড়ে।

(১০) পরেচ্ছার যেমন ইচ্ছার প্রায় শেষ বৃদ্ধি, পরের অগ্রগত হইলে, সেইরূপ ইচ্ছার বেগ ও সম্মা হ্রাস পায়। তত অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরে ভক্তি করে, বিশ্বাস করে, বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে—সে জানিতে পারে না, অগত তাহার ইচ্ছার বেগ ও সম্মা কমিয়া আইসে। অতএব ঈশ্বরে নির্ভর করার ইচ্ছার লাঘব হয় বলিয়া উহা কর্তব্য।

২৬। সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইতে পারে, কেননা ইচ্ছার পূর্ণতা শক্তির উপর নির্ভর করে। একে বৃদ্ধ হইয়া যিনি বতকণ অবস্থিতি করিতে পারেন, তাঁহার সেই পরিমাণে শক্তি লাভ হয়। যিনি নিত্যবৃত্ত, তিনি নিত্যসমর্থ। নির্বাণনা হেতু তাঁহার শক্তি-পর্যোগ নাই, সুতরাং কদাচ বাসনা হইলে, উহা পূর্ণ হয়। সত্যযোগী শিব কদাচ বাসনার ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন; কোন কোন ঋষির কার্যেও ঐশী শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইচ্ছা পূর্ণ না হইলে, ভোমার শক্তির অভাব, ইহা নিশ্চয়বে চনা করিতে হইবে। ঋষিরা ইচ্ছা-পরিমাণে শক্তিসঞ্চারী—বরং ইচ্ছাত্যাগী ঐশীও শক্তিসঞ্চারী। তুমিও শক্তি-তপস্তার শক্তি সঞ্চয় কর, ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে—ইহাই শুকরা বলেন।

আসক্তি।—ভোগার্থেই আসক্তি দেখা যায়।

বাহ্য ভোগ কর নাই, তৎভোগ মনে
আইসে না। বাহ্য ভোগ করিবার ইচ্ছা
মনে হয়, ইচ্ছার পূর্বে তাহা কি—পূর্ণ মাত্রার
তাহার উপলব্ধি না থাকুক, কতক উপলব্ধি
পাকে। তিনি খাটরা-বল উহা মিষ্ট।
শুড়ও মিষ্ট, কিন্তু শুড় খাও নাই; শুড়কে
মিষ্ট বলিলে উহার মিষ্টতা তোমার কতক
উপলব্ধি হয়; ঐ উপলব্ধি ভুক্ত চিনির মিষ্টতা-
উপলব্ধি হইতে লওয়া। শুড় ও চিনি এক
প্রকার মিষ্ট নহে—অপচ উভয়ই মিষ্ট।
শুড় খাটতে ইচ্ছা হইলে, চিনির মিষ্টতা
তোমার মনে আইসে।

বস্তু প্রকার ভোগ-ইচ্ছা হয়, ইচ্ছার পূর্বে
তাহার ভাব উপলব্ধি পাকে; অর্থাৎ জান
বলিয়া চাহ। এইরূপ চাওয়া-বৃত্তি মনুষ্যের
কেন, প্রত্যেক জীবের আছে। এই বৃত্তি-
হেতু চাওয়ার নাম ইচ্ছা। তদ্ব্যতীত না
চাহিয়া থাকিতে না পারার নাম "আসক্তি"।
ভোগ জানা থাকা দোষ নহে, জানিয়া
চাওয়া কতক দোষ; কিন্তু না চাহিয়া না
থাকিতে পারা গুরুতর দোষ।

সাহারা মনকে কর্তা বলিয়া জানে, তাহা-
দের পক্ষে বৃত্তি, ইচ্ছা এবং আসক্তি, একই
বলিলে দোষ হয় না, কেননা তাহারা কোন-
টাকেই মন মনে করে না। এই সকল
লোকের উক্তি "মন পেল, তাই করিলাম,
ইহাতে দোষ কি?" বাহারা মনকে এক
মাত্র কর্তা বলিয়া স্বীকার করে না, তাহা-
রাই বৃত্তি, ইচ্ছা ও আসক্তিতে গুণ-ভেদ
করে। প্রথম শ্রেণীস্থদের আসক্তির
বিপক্ষে, দাঁড়াইবার উপায় নাই। বিচার-
পদ্ধতিসম্মত মনুষ্যের জন্ম বৃত্তি হইতে

কামনা, কামনা হইতে আসক্তি বস্তু
দোষার্থ, বিচার প্রয়োজন।

৬৭। বৃত্তি সকলেরই আছে।

(ইচ্ছা) সকলের হয় না।

আসক্তি ভদ্রম দৃশ্যমান।

হিংসা-বৃত্তি সকলের আছে।

হিংসা-ইচ্ছা সকলের উদয় হয় না।

হিংসা না করিলে থাকিতে পারে না,

এইরূপ জন-সংখ্যা অল্প।

বৃত্তি ছিল (আছে), (ইচ্ছা) কামনার
উদয় হটল।

(ইচ্ছা) কামনা পূর্ণ করিলাম, ইচ্ছির
প্রস্তুত হইল।

ভোগান্তে—ইচ্ছির শিথিল হইল, কামনা
বৃত্তিগত হইল, বৃত্তি বন্ধপে লয়
পাইল।

ইহাতে আসক্তি এখনও দৃষ্ট নহে।

কামনা পূর্ণ করণার্থে ইচ্ছির প্রস্তুত
থাকা সত্ত্বেও নিষ্ফলতা হেতু অননুভূত
একটা "বেগ" উপস্থিত হইল—ইহাতেই
আসক্তির সূত্রপাত বা ইহাই আসক্তির
আদি। ফলশূন্য-অন্তে কামনা-বেষ্টিত
থাকা এবং বৃত্তি লয় না হইয়া কামনা-পরি-
পোষক থাকা পর্য্যন্ত আসক্তির সীমা।
অতএব আসক্তি, বৃত্তি হেতু কামনা হইতে
ভোগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত। অভ্যাগ-জনিত বলিয়া
বহুকাল স্থায়ী ও প্রবল। এক প্রকারের
বৃত্তিভাভ হইয়াও আসক্তি উহা অপেক্ষা
অধিক প্রবল; উহা অপেক্ষা অধিক কুশল
কেন না আসক্তি-হেতু বস্তু প্রকার কামনা
মনে আইসে।

৬৮। "চিত্তবেগ" বলিয়া প্রসিদ্ধ কথা।

আছে। চিত্ত-বেগহেতু মহৎ কর্ম-বেরণ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব, কুর্কর্মও সম্পন্ন হওয়া সেইরূপ সম্ভব। ইচ্ছা-নিরুদ্ধে চিত্ত-বেগ-সঞ্চিত আসক্তি ব্যতীত আর কি? ধর্ম-পরামর্শের চিত্তবেগবশতঃ কৃত গৃহিত কর্ম সম্বন্ধে ইহাই সীমাংসা।

ভোগ-উদ্দেশ্য যখন আসক্তির মূল, তখন কাহার কোন ভোগ উদ্দেশ্য, তাহার পক্ষে তাহাই বিচার্য।

“প্রত্যাহার” দ্বারা ভোগ-ইচ্ছাকে দুর্বল করিতে পারিলে, বৃত্তি-সঙ্ঘেও আসক্তির উদয় হয় না। স্ত্রীরাঃ আসক্তি-শূন্য হইলেই নির্বাসনাবুক্ত হইতে হয়।

৬৯। বন্ধমূল আসক্তি পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য। উহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করা-ভাগ্যের কথা। দৈনরূপা ব্যতীত অপনা-কঠোর তপস্তা ব্যতীত পরিত্রাণের আশা নাই। ঘৃণিত জলে তপ পড়িলে, ঘৃষ্মা-ঘৃষ্মা উহার যেমন মর হয়, বন্ধমূল আসক্তি-জীবকে সেইমত বার বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন করিয়া ঘুরাইয়া মারে। এষ্ট আসক্তি হইতে যে সংস্কার জন্মে, উহা আরও ভয়াবহ; কেননা আসক্তি-হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেও, সংস্কার হইতে আসক্তির কখন উদয় হইবে, কে বলিতে পারে?

৭০। সংস্কার।—সংস্কার বা মোহের উল্লেখ হইরাছে, কিন্তু সংস্কার কি, তাহা বলা হয় নাই। একই কার্য করিতে করিতে সেই কার্য করা এত অভ্যাস হইয়া যায়, যেন উহা আপনা-আপনি হইতে থাকে। এই অভ্যাসেরই কল সংস্কার। নিষদীদিগের বিধ-বাগনা সংস্কার। মনরূপী অহং-নিষদী,

যেন সে অহং-কখনও বুদ্ধিরূপী ছিলেন না বা হইতে পারেন না। এত নিষদী-বিগম্য-মহৎত্ব অসুপীলনে তাঁহার বন্ধ বা ইচ্ছা দেখা যায় না। তৎকল্পনা বা কারণ্য-করিতেও তিনি সক্ষম হন না।

অকস্মাৎ নিষদী-মহৎত্বকে অমুরত হইলে, বলিতে হইবে যে, মনরূপী অহং-রের বুদ্ধিরূপী অহং-হইবার ইচ্ছা হইয়াছে বা বুদ্ধিরূপী অহং-হইতে মনস্ত মনে পড়িয়াছে। এই পরিবর্তনের পর সে অহং-কখনও নিষদী ছিলেন, এমন বোধ হয় না। আমরা ঈদৃশ ব্যক্তিকে প্রশংসা করি, বাহবা দিই; অহং-রের কে অনন্ত শক্তি, তাহা ভুলিয়াই সে ব্যক্তিকে প্রশংসা করি।

কখন কাহার কি সংস্কার থাকিতেছে বা বাটতেছে, তাহা বলিতে পারা কঠিন। তদ্বন্ধ ব্যতীত অপর তাহা দেখিতে না-বুদ্ধিতে অসমর্থ। তৎসংস্কার ইহা দেখিতে পান, বুঝতে পারেন বলিয়া সেই সংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

জীবের অস্তিত্ব সংস্কারে ভাসিতেছে। সংস্কারে অহং-জীবরূপে জন্ম-মৃত্যুর বাধা। অহং-রের সংস্কার নষ্ট; জীবরূপী অহং-রের সংস্ক-বশতঃই জন্ম-মৃত্যু—ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার-পালনের অবস্থা মার। মৃত্যু-জীব-প্রভৃতি, সর্পবোনি-উদ্ভূত বহু সংস্কার-লটেরা জাতি। কোন্ মহাশয় কোন্ বোনি-মৃত্তক সংস্কার-বগান, তাহা বলাও কঠিন। মৃত্যু-ভবিৎ-আপনার সংস্কার দেখিতে পান, লক্ষ্য রাখেন, এড়াইতেও কৃতকার্য হইবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদাচার্য বর্ষ।

রাস-রসায়ন ।

[শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-
রসাবলম্বিত পদ-কীর্তন ।]

— ০ —

(১)

রাস-রসেশ্বর শ্রীমসুন্দর নাগর রায়—

(গোপীর) প্রার্থনা পূরালেহ্ন শ্রীরাসলীলায় ।

তেরে—

শারদ পৌর্ণমাসী, গগনে পূর্ণশশী —

কিবা শোভা পায় !

(গেমে) গলে চাঁদ চলে পড়ে নীল্ যমুনার !

(ভাবে) হেসে চাঁদ ভেসে চলে নীল্ যমুনার !

(আহা !)

সে ভাসির চর্ষভরে,

ফুটল ফুল পরে পরে !

অলিকুল গুন্ গুন্ করে !

কোকিলের কুলপরে—

প্রণ-মন মাতায় ! —

(অস্মি)

সেই সময় রসময় বাঁশী বাজায় !

(২)

শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাঁশনী বাজিল

কুলকানন মাঝে,—

(অস্মি)

স্বাবর-অঙ্গ— সবার অঙ্গ

গেম-ভরণে নাচে !

ভূচর-বেচর— সর্ব চরচর

শিহরে মুরলী-তানে !

অখে নাচে শিখী, যেম্নে গাহে পাখী,

যমুনা নচে উজানে !

(শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর গানে)

(আহা !)

যোগী ছাড়ে যোগ, ভোগী ভোগে ভোগ,

গুণী ভাজে গুণবাস !

জননী-স্তন ছাড়ে শিশুগণ,

সতী ছাড়ে পতি-পাশ !

(মোহন বাঁশীর তানে)

(তখন)

কাম্বীরাজ তানে পুরিয়ে সকান,

বাঁশী বাণ পুনঃ-হানিধ ;

(অস্মি)

ব্রজসম্ম-মন-ভরণ বিদগ্ন,

বী ধয়ে কাননে আনিল !

(ও সেট 'নচূর কাণা)

গোপী-মোহনের মোহন মুগলী

বাঞ্জিল কুল-মাঝে ;

(অস্মি)

গোপিকা-কুণ আকুল ব্যাকুল —

ভেটি ত পোকুগরাজে ।

(মনে) শ্রীম-দরশনে মাজে ।

(মনে) হ'ল যেন দিশেহারা !—

(অস্মি)

কি করতে কি করে, কি করতে কি পরে,

মাজিছে বাড়রী-পারা !

(৩)

(কেহ) কর্ণেতে ককন পরে !

কণ্ঠে পরে 'তাড় !

কটিতে মেড়িয়া পরে

গজসতি-হীর !

(কেহ) চরণে কাজল দিল !

ময়নে আলতা !

হৃদয়ে দোলায়ে দিল
 'চরণ-পদ্ম'-পাতা!
 (গোপী) গৃহকাৰ্থা গৃহে র'ল,
 সবে চ'ল মুগ্ধ ;
 অনলে উপলি প'ল
 বৈশালীর হৃদ্ব!
 (গোপী) স্বামী-সেবন, শিশু-পালন
 সকল ভুলে গেল ;
 (গোপীর) আধা অন্ন র'ধা হ'ল,
 অমনি পড়ে র'ল !
 (৪)
 ধেরে চ'ল বনে,—
 (৩ সেই) বন-বিহারীর দরশনে ;—
 (গোপীর) হৃদ-বিহারীর দরশনে ॥
 (সবে) এল জাম-পদ-মূলে ;—
 (অগ্নি)
 "এস এ'ন' করি, চান্দ-সুখে হরি
 তুষ্কিলেন গোপীকুলে ॥
 (অতি) সমাদরে তাগবার,—
 বসারে নিকটে, কহেন কপটে
 ষষ্ঠ-লক্ষ্যট রায়,—
 "(কেন) এলেহে গোকুল- কুলবালাকুল !
 ব্যাকুল হয়ে এ যেনে ?
 (বল) এ বোর নিশান, গৃহ ভাঙ্গে হাদি !
 কাননে কি কারণে ?
 (৫)
 . (আহা !)
 তোমরা সতী গুণবতী পতি-পদের রতিমতী,
 মেহবতী সন্ততিগণে ;—
 (বল) তবে কেন এলে হেন
 ভাঙ্গ নির জনে ?
 ভাঙ্গে পতি গৃহাসে, পরপুরুষের পাশে
 কেবা অসে নিশাকালে বনে ?

(অগ্নি) তাই গো বলি, বাও গো চলি
 সবে মিলি স্তবনে ।
 সতীধর্ম—গৃহকর্ম সাধ গিয়ে সদনে।
 পতি-পুত্র পিতা-মাতা সেব গিয়ে ভবনে ॥
 (৬)
 (নীরদরূপীর এই নিদারুণ ব্যক্তি—
 তুষ্কিতা চাতকী-শিরে হানিল অশনি !)
 তখন কর গোপিনী—
 "এক একি শুনি !
 (অভাগীগণের ভাগ্য পরিহাসি,
 শুনী-করে আজি করে বিবরণি !)
 হ'ল এ যে কেমন ধারা !
 (মেধরা) কার ডাকে কার কাছে এলাম হু
 কিসে হ'লাম দিশেহারা হু"
 (৭)
 (বলে) "এই কি তোমার বিধি ?
 ওহে হৃদি-নিধি !
 (তোমার) বিধি শুনে বিদরে হৃদি !
 ওহে গুণনিধি !
 মোহন বাঁশীর তানে, টেনে এনে বলে,
 (ওহে বংশীধারী হরি ছে !
 (ওসে বাঁশীত নর, সর্বনাশী !)
 (গোপীর মন মুগী বাঁধার কাঁশী !)
 (তোমার কি যাহু হবে জানে বাঁশী !)
 (সুরে মনো প্রাণ উদাসী)—
 (বলে—"বাঁশীধারীর হইগে দাসী)—
 (পদে—জীবন-যৌবন স'র্গে আসি ।)
 (৩ সেই) বাঁশীর তানে, টেনে এনে বলে,
 (এখন) করে কিরে যেতে দিচ্ছা গিধি !
 মোদের পিতা-মাতা, পতি-পুত্র-ভ্রাতা,—
 (বেশি বল'ন কি আর বঁধু হে !)
 আজি এই চরণে সব স'র্গে দি ।

গোপের মন সরেনা, নয়ন কেমনা,
(গোপীর প্রাণ-মন-হাসী হরি হে!)

আর চরণ চলেনা তবন-প্রতি।

(৮)

(অই—)

ননখন-রূপ নয়নে লোপেছে,
নয়ন ফিরানো ভার।

শীতল চরণ-শরণ তাজিরে,
চরণ চলেনা আর ॥

(যেরে কিরে যেতে)

কিবা!

মধুর চাহনী! মধুর হাঁসনী!

মধুর সুসলী-ধ্বনি!

মধুর আদরে, মধুর অপরে

মধুর মধুর বাণী!

(আহা! প্রাণ-বঁধুর)

কিবা!

মধুর নয়ান! মধুর বরান!

মধুর বক্তিসঠান!

(আহা!)

মধু হতে কত সুমধুর মাণ!

মধুমাথা 'শ্রাম' নাম!

(প্রাণবঁধু হে! তোমার মধুমাথা 'শ্রাম' নাম!

তেন—

মধুচক ছাড়ি, মন-মধুকরী—

—যেতে কি চার হে বঁধু?

(জাগা!)

সংসার-গরলে আর কি সে ভোগে—

বে পিরে এ প্রেম-মধু?

মোর—

ভয়-প্রাণ-মল, জীবন-বৌবন,

• মরুত্ব ধন হারি!

ও রূপ ভঞ্জে, ও গোসে মন্ডিতে,
গঁপেছি ও রাজাপায়!

(এখন) রাখ হে শ্রীপদে, বিচ্ছেদ-নিপদে
কেল, যদি উচ্চা হয়।

(উচ্চামর হে হরি!)

(আর)-মজিব না মোহে, তাজিব না গেছে,
তাজিব না হে ভোগার!

(ভাগ্যে যা হয় হবে)

অই—

জিতদ-ভঙ্গিতে, অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে,

বাঁশীর সঙ্গীতে আর,—

(কি 'মোহিনী' জানিহে বঁধু!)

(নিজে) এনে ধরে বেঁধে, বল কিরে! যেতে
প্রাণ বধে' অবলার!

• বলি এই কিহে সুবিচার?

(৯)

(অরি) ফিরল প্রেমময়ের ভাব!—

(আহা!) হেরে গোপীর প্রেম-প্রত্যাব।

(অরি) মজল মনমোহনের মন!

(বেধে) গোপীর আয়সমর্পণ।

ভাবে লাগল ভাবময়ের ভাব!

তখন—

গোপিকা-সঙ্গে, করব-রঙ্গে,

দরশ-পরশ-সরসালাপ!

রসিকা-সঙ্গে, রস-তরঙ্গে!

রাসরসরাজ দিলেন বাঁপ!

তাঁহে প্রেম-তরঙ্গ উঠল!

অরি—

প্রেমের নীরে, প্রেম-সমীরে,

প্রেমের তুফান ছুটল!

(প্রেমময়ের প্রেম-অনয়ের

প্রেমের তুফান ছুটল!

শ্রাম-নাগরের প্রেম-সাগরে

প্রেমের তুফান ছুটল !

(১০)

সগরাকের বেধু বাজে !

নন্দ নাগরী গোপী নাচে !

(কিনা) নাজ ছুপুর পায়ে !

(মনে) 'লাগনাগ' বলে, প্রেম-রসে গলে,

চলে' পড়ে শ্রামকায়ে !

(রসে) ভূমিতে রসিকরাগে রে !—

হেসে চলে' পড়ে শ্রামকায়ে !

(অমি) নাগর-নাগরী করে কর ধরি,

নাচে রাস-রঙ্গেতে !

(মনে) ভাসে প্রেম-তরঙ্গেতে ।

শ্রাম-সম্মিলনে, গোপী ভানে মনে—

“আজি সাধনের ধন পেলাম মনে !

(গোপীর) সরসম্বন্ধন, জীবনের জীবন,

হৃদয়-রতন পেলাম মনে !”

হয়ে —

শ্রাম আদরিণী, শ্রাম সোচাগিনী,

গোপিনী গরবিনী !—

(অমি) সে ভাব গর্ভ করিতে ধর্ম

(হরি) গর্ভ অন্তর্গামী—

হলেন অন্তর্হিত !—গর্ভ অন্তর্গামী !

(অমি—)

“হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ !

কোথা গেলে কৃষ্ণ ?

দেখা দেও কৃষ্ণ !

প্রাণে যে মরি !

(নাথ !)

তোমার বিরহ

হরহ—দঃসহ,

প্রাণ মন-দেহ

দহিছে হরি !”

বলিতে বলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে

কৃষ্ণ অশ্বষিতে ধাম গোপিনী ।

কৃষ্ণ-প্রেমাতুরা, বিরহ-বিধুরা,

গোপ-বধূরা উন্মাদিনী !

(১১)

বলে—

“ওে কদম্ব ! হে চম্পক !

অশোক ! কিংকণক ! বক !

(যদি) দেখে থাক,

বল কোথা হরি —

(তোমরা প্রিয়তমের প্রিয়তম)—

আমরা অবলা বালা,

সহেনা বিরহ জালা,

(ও সেই) চিকণ-কালা

না হেরিয়ে মরি !

(যোরা হরি-হারা করে মরিছে !)

(আর কিসে বৈরন পরিছে ! ”)

(তখন) কৃষ্ণ উদ্দেশিয়ে গোপী বলে,—

“নাথ !

জীবন-সৌভবন নিলে, কুণ-শীল না রাখিলে,

দেহে সাজ প্রাণ ছিল বাকি,

(সকলই ত দিয়েছি)

(সবই পদে সংপেছি)

নাথ !

তাও তব আদর্শনে, আজি বুঝি বার এ বনে ;

সরণ-কালে চরণ পাবনাকি ?

(ওহে সরণ-হরণ হরিছে !)

(তোমার চরণ সরণ করিছে !)

(১২)

নাহর চরণ দিলোনাশে,

দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ;

নয়ন তারি হেরি হরি ! ও রূপ-নিধি ।

হার !

ছটি সাজ দিয়ে নেজ,

বাক সেখেছে নিষ্ঠুর বিধি ;

হারি! হারি! পুনঃ তার
 (পেড়ি) পলক হয়েছে বাদী!
 পিলাসা—মিটিগনা—নরনের;
 ঐ মধুর সহাগ—ভাগ শুনিরে,
 জ্ঞান মেটেনি শ্রবণের।—
 দেখা দেও, কণা কণ্ড,
 আর মেরনা বিরহ-নাগে,
 আর কিরনাহে বনে বনে।—

ব্রজের—

কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে
 (বাধা) পেরোনাহে শ্রীচরণে।

আহা!

ভেবে খে মন কেমন করে,
 পাছে না কঠিন ককমে,
 আত্ম বাণিত করে ও পদ কমল।—

(মোদের)।—

কঠিন হৃদে তুলে গিহে
 ভর হয় চিত্তে, এরি কোসল!
 বলি ভাই, (আর) কাজ নাই
 খেলে লুকোচুরি—মনচোরা!
 মোরা বিরহ-গরলে জরা হে!
 কেহি মিলনামৃত-ধারা।
 হেন বিধে—প্রাণ কিসে—বাঁচে হে?—

(ওহে প্রাণের হরি!)।

(গোপীর—

জাতি-কুল-মান-তুহু-মন-প্রাণ-
 হারী হে হরি।)

(গোপীর—

সরস্ব ধন! জীবনের জীবন!
 হৃদয় রতন! হৃদি-বিহারি!)।

• আহা!

হরি-নীলা-ওপ-নীতে,

হরি-রূপ পরি চিত্তে,

হরিনাগামুতে,—

এথমগ প্রাণ আছে।—

আর ত রয়েনা হে!

প্রাণের প্রাণ হরি তোমা বিদে,

প্রাণ আর রয়ে নাহে!

জালা সংহনা হে!

হরি হে! নাথ হে! বঁধু হে! শির হে!

আর ছুখ্ দিয়োন।—

নিজ দাসীদেহে আর ছুখ্ দিয়োন।

ও চাঁদ—

ছুখ না হেরে, বুক নিদরে,

আর ছুখ্ দিয়োনাকো।—

ওহে—

গোপিক ধন! বাশীদন!

দেখা দিবে প্রাণ রাখা।

(১৩)

কাঁদে গোপীকুল, বিরহে বাকুল,
 না হেরে গোকুলচাঁদে।

নরনেরি জলে যমুনা উছলে,
 পাষণ গলে গোপীর খেদে ॥

কেহ ভাবভরে অস্তিনয় করে
 কৃষ্ণগীলা কৃষ্ণপ্রোমাবেশে।

অবলারি বল— কেবল মমল—
 রোদন-সাধন অবশেষে ॥

আর—

গোপীর ছুখ্ সৈতে নারি,

গোপী-মনোহারী হরি—

হেসে হেসে এসে দ্বিগেন দেখা।

গোপিকা সবাকারে

প্রাণ দিলেন সবাকারে,

দেখা দিবে কক প্রাণসখা ॥

হেসে কন কৃষ্ণ তখন,
 "তোমরা মোর প্রেম-মহাজন,
 চিরবাঁধা রলেম প্রেমধ্বজে ।
 অথবা হৈতে নারি,
 অথবা হৈতে পারি,
 তোমাদের সুশীলতা-গুণে ॥"
 (প্রাণসখী গো !)
 (১৪)
 (তখন) গোপী-সঙ্গে, রাস-রঙ্গে,
 রসরাজ সাজে ।
 (অগ্নি) স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি করে সুররাজে !
 (শ্রামের) বামে রাধা বিনোদিনী ঐ নাচে ।
 (শ্রামের) বামে রাধী রাসেশ্বরী ঐ নাচে ।
 কিবা শোভা মনোলোভা বৃন্দাবন-মাঝে !
 (যেন) কুসুমিতা স্বর্ণলতা তমালেরি গাছে !
 (যেন) নবধনে সৌদামিনী বিলাসে বিরাজে !
 (যেন)
 শ্রামল বিলে অমল জলে সোনার কমল সাজে !
 (কিবা) স্বর্ণমণি-বর্ণ-বিভা নীলমণির কাছে !
 (কি শোভা হ'ল রে !)
 (আবার)
 চৌদিকে টাঁদের মেলা সখিগণ সাজে !
 (কিবা)
 এক এক গোবিন্দ নাচে ছ ছ গোপীর মাঝে !
 (আবার)
 বস্ত গোপী তত কৃষ্ণ বিহারে বিরাজে !
 (বেগমারি মা'র কি মারারে !)—
 (তাহে)
 সবে ভাবে "আমার কৃষ্ণ আমার কাছে আছে ।"
 (হরির)—
 রাস দেখিতে অলঙ্কিতে সুরগণ সাজে ।
 (আহা !) ইন্দ্রসহ ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মসহ ব্রহ্মাণী,

দেবী-সনে দেবগণে বিমানে বিরাজে !
 (আবার) আপুনি হয় গৌরীসনে বুধাসনে নাচে
 (হরি-হরি-বোল্ বলেরে !)
 (আজ্) যমুনারি সঙ্গ-গতি এলেন গঙ্গা-সরসতী ;
 কৃষ্ণা-গোদাবরী আদি বৃন্দাবন-মাঝে !
 (এলেন) সর্বতীর্থসর সাগর প্রেম-সাগরের
 কাছে ।
 (এলেন—)
 পুরী-প্রয়াগ-অযোধ্যা, কুরুক্ষেত্র-কামাখ্যা,
 গিত্তীর্থ পুণ্যক্ষেত্র বৃন্দারণ্য-মাঝে !
 পুরুর-নৈমিষারণ্য বৃন্দারণ্য-মাঝে !
 (আবার) শিবের কাশী এলেন ব্রজে শিবের
 পাছে পাছে !
 (আজি)
 সর্বদেব-সর্বতীর্থ, সর্বধর্ম সর্বসত্য,
 সর্বপ্রেম-সর্বরস-পর্ব ব্রজ-মাঝে !
 (আজ্) সর্ব সুখে সর্বলোকে 'হরি'বলে' নাচে
 সুখ্য-সোমে—বায়ু-ব্যোমে 'বোল হরিবোল'
 বাজে !
 (অই) হরিনামে রাধা-কৃষ্ণ যুগলরূপে
 রাজে !
 (আহা) 'হ'-এ রাধা, 'রি'-এ কৃষ্ণ 'হরি'তে
 রিমাঝে !
 (হেরে—)
 প্রেম-গগনে পূর্ণ ইন্দু, মাতুল রাস-রসসিদ্ধ,
 যে লভে তার পুণ্যবিন্দু, ধন্য ধরা-মাঝে !
 (ও তার) কৃপা-বিন্দু শশবিন্দু
 করষোড়ে ষাচে ॥
 ('হরি হরি' বলে' রে !)
 (১৫)
 (কৃষ্ণ-) লীলারি সারৎসার—
 রাসলীলা চমৎকার !

মন মজাওরে তায়।—
(সবে) 'হরিবোল বোল হরিবোল'
গাও সদায় ॥

—o—

শ্লোকঃ—

* এই পদাবলীটি সংকীৰ্ত্তনরূপে গান করিতে চাইলে, উহার স্তম্ভভেদ জ্ঞাপক ক্রমিক অক্ষরাত অক্ষরারে বাস্তব তালগুলি এইরূপ জানিতে হইবে, যথা—১—রূপক, ২—একতালা, ৩—চুঁরি, ৪—একতালা, ৫—কাঁপতাল, ৬—গড়খেমটা, ৭—একতালা, ৮—ঝুলান, ৯—একতালা, ১০—আড়খেমটা, ১১—দশকোষী, ১২—একতালা, ১৩—গড়খেমটা, ১৪—খেমটা, ১৫—রূপক।

[লেখক]

বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি ।

(পূর্বস্মৃতি ।)

বলিতে পারি, 'শ্রামণ্যফল' ব্রহ্ম হইতে বিভূতিতত্ত্ব যোগভাষ্যে উদ্ধৃত হইতে পারে ; কিন্তু তাহা সস্তবপর নহে । শাস্ত্রকারগণ যে বেদবাহ্য বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ কথা সর্বথা অসম্ভব । কিন্তু যোগভাষ্যে উহা উদ্ধৃত বচন বলিমা বোধ হয় না । কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে উহা যে অবৌদ্ধদের পূর্বে প্রচলিত শ্রামণ্যফল, তাহার স্পষ্ট নির্দর্শন আছে ।* উহারও

* বৌদ্ধেরা অনেক প্রাচীন ও পুঙ্খশব্দ সকলকে নিজেদের অভিন্নত অর্থ দিয়া স্বীয় শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, এরূপও দেখা যায়, যথা :—

উপরিস্থিত যে 'লোকুত্তর' মার্গফল, তাহাকেই বৌদ্ধেরা কেবল নিজেদের আবিষ্কার মনে করেন ।

চতুর্দশ ভূবন ও সেই সেই ভূবনের সাধারণ অধিবাসী, তাহাদের বিবরণ যোগভাষ্যে যেরূপ আছে, বৌদ্ধ শাস্ত্রেও তদনুরূপ দেখা যায় । ঐরূপ ভূবনের বিবরণ কেবল মাত্র যোগভাষ্যেই দেখা যায় । উহা যোগীশাস্ত্রদ্বারা প্রচলিত বিদ্যা । বুদ্ধ-বচন হইতেও দেখা যায় যে, বুদ্ধের সময়ে ও পূর্বে অনেকে সমাধিসিদ্ধ হইয়া ঐ সকল লোকে যান বা তদ্বিবরণ অবগত হন । আর ত্রয়ন্ত্রিংশদেব ইন্দ্র, ব্রহ্মাপুরোহিত, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিও বৌদ্ধদের আবিষ্কৃত নহে । সুধর্মী, দেব-সভা, যম, বৈশ্রবণ প্রভৃতিও পূর্বে প্রচলিত ছিল ।

অতএব যেহেতু আর্ষশাস্ত্রের মধ্যে যোগভাষ্যেই ঐরূপ চতুর্দশ ভূবনের প্রাচীনতম বিবরণ আছে, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও যখন

যো গীণবত সম্পন্নো পহিতত্তো সমাচিন্তো ।
চিত্তং যন্ত বশীভূতং একগুণং স্তমমাহিতং ॥
পূর্বে নিবাগং যো বেদী সগুণাপঞ্চ পস্গতি ।
অথ জাতিক্খমং পত্তো অভিঞঞা বোয়ি-

তো মুনি ॥

এতাহি তিহি বিজ্জাহি তেবিজ্জো হোতি
ব্রাহ্মণঃ ॥

(অসুত্তর নিকায় । তিক নিপাতে ব্রাহ্মণ-
বগ্গো)

অর্থাৎ তিন বেদের বিস্তার জরীবিদ্যা-সম্পন্ন হয় না, কিন্তু যিনি মীলব্রতসম্পন্ন প্রহিতাত্ম্য (বীর্যবান) ও যিনি প্রজ্ঞাভাবিত, তিনি ঐ তিন প্রকার বিস্তার দ্বারা জরীবিৎ ব্রাহ্মণ হন । তাহাকেই আমি (বুদ্ধদেব) জরীবিৎ বলি । অস্তেরা কেবল লণিতলাপক ।

উহা গৃহীত দেখা যায়, আর এখন বৌদ্ধের নিজস্ব নহে, তখন উহা যোগভাষ্য হইতেই গৃহীত বলিয়া অনুমান করা সম্ভব।

অবশ্য বৌদ্ধেরা উহার কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়াছেন এবং উহার কতকগুলিকে রূপাংকন, কতকগুলিকে অরূপাংকন ইত্যাদি নিজেদের উদ্ভাবিত সংস্কার লক্ষিত করিয়াছেন।*

* যাম্য বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোককেই সর্কোচ্চ স্থাধিরাছেন; আর উদীচা বৌদ্ধেরা ব্রহ্মলোক হইতে ব্রহ্মাকে নীচে নামাইয়া, বোধিসত্ত্বলোক ও আদিবুদ্ধলোককে সর্কোচ্চে স্থাপিতরাছেন; কিন্তু পরিনির্বৃত্ত কোন বুদ্ধকে লোক মধ্যে রাখা যাম্য বৌদ্ধশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধ বলিয়াছেন যে, যত দিন তাঁহার শরীর আছে, তত দিনই সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পর-নির্করণের পর আর দেব, মনুষ্য, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। এই মত যোগ-দর্শনের অমুরূপ।

পাশ্চাত্যগণ যে বলেন "Buddhism was a protest against the prevailing animism" ইহাও অসঙ্গত। চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেব, দেবরাজ ইঞ্জ প্রভৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধের পূর্বে বৈরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল, তাহা "animism" হইক আর যাহাই হইক, বুদ্ধও সেইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

বায়ুদেবতা ইঞ্জ, দেবরাজ রূপে বহু পূর্বে হইতেই প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (প্রথম পত্রিকা। ১১) ইঞ্জের "বাবতঃ" প্রভৃতি মহিষার উল্লেখ তাহার প্রমাণ। বৌদ্ধগণও ঐরূপ ইঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "animism" পদার্থের দ্বারা পাশ্চাত্যগণ যে ভারতীয় ধর্মের ব্যাখ্যান করেন, তাহা ব্রাহ্ম ধারণার উপর স্থাপিত।

যোগভাষ্যকার স্থানে স্থানে ক্ষণিক-বিশ্লেষণবাদের খণ্ডন (বদ্বিঃ সূত্রের তিত্তর ঐ বাদের কুড়াপি প্রসঙ্গ নাই †) করিয়াছেন, ইহাতে অনেকে বলিবেন, তবে তিনি ক্ষণিক-বিশ্লেষণবাদী নাগার্জুনের

† যোগসূত্রের প্রথম পাদের ৩২। ৪৮ চতুর্থ পাদের ২০। ২১ প্রভৃতি সূত্রের ভাষ্য স্থলে ভাষ্যকার ক্ষণিক-বিশ্লেষণবাদের প্রসঙ্গ করিয়াছেন। কিন্তু সর্কোচ্চস্থানেই প্রসঙ্গক্রমে উহার উত্থাপন করিয়াছেন। কোন সূত্রেই ঐ বিষয়ে স্থান নাই। তবে সেই সেই সূত্রে সূত্রে তত্ত্বমুসারে ক্ষণিকবিশ্লেষণবাদ যে অস্ত্রায়া, তাহা ভাষ্যকার দেখাচেন মাত্র।

যোগসূত্রে বৌদ্ধমত ও অজ্ঞাত কোন দর্শনের মতের প্রসঙ্গ না থাকতে, উহা সর্কোচ্চস্থানে প্রাচীন বলিয়া অনুমান হইতে পারে। কিঞ্চ সাংখ্যযোগ যে সর্কোচ্চস্থানে প্রাচীন, তাহা ভারতের চিরস্থান বিশ্বাস। বুদ্ধদায়ক উপনিষদে আনুরি, পতঞ্জলি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কতকগুলি নাম পরিচয়। সেই প্রাচীন কোন পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রণেতা। এটরূপ প্রবাদ আছে যে, ভগবান্ অনন্ত পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া, যোগসূত্র, চরক ও মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন। অতএব যোগসূত্রকার ও মহাভাষ্যকার এক ব্যক্তি না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ যোগসূত্র ও মহাভাষ্যের মতের তুলনায় দেখা যায়। যিনি যোগসূত্র রচনা করিতে অতুলনীয় চিন্তার গুণস্বীর্ণ দেখাষ্টয়াছেন, যিনি পরমার্থতত্ত্বকে বিশুদ্ধ-জ্ঞানস্বত্ব-নির্মূল্য বুদ্ধির দ্বারা অনন্ত ও প্রোক্ষণ করিয়াছেন, তিনি যে ব্যাকরণ মগধাভাষ্য আবার অনর্থক অল্পরূপ মত প্রচার করিবেন, তাহা মোটেই সম্ভবপর নহে। অতএব যোগসূত্রকার, চরক ও মহাভাষ্যকার যে পৃথক পৃথক ব্যক্তি, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(ষট্‌পূর্ব প্রথম শতাব্দী) পরের শোক । একথাও সর্কাপা অসম্ভব । ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদ বহু পূর্বের । বিজ্ঞান পদার্থ বোধের উৎপত্তি হইতে লইয়াছেন । বিজ্ঞান-পরিণামী পদার্থ, পতিক্রমে তাহার ভিন্ন ভিন্ন বা (একাগ্রভায়) এক জাতীয় পরিণাম হয় । অতএব বিজ্ঞান সেই পরিণামের প্রবাহ স্বরূপ । আর্গেরা বলেন, বিজ্ঞানের মূলে এক অস্থিত সংপদার্থ আছে ; বিজ্ঞান-বিদগণ বাহার পরিণাম বা বাহার উপর বিজ্ঞান-প্রবাহ বিবর্তিত । কিন্তু দৌক দর্শনে সেই মৌলিক সংপদার্থ বা hypos-tasis স্বীকৃত নাই । তাহাদের মতে পূর্বা-পর বিজ্ঞানের কোন বস্তুই সম্ভব নাই ।

প্রাচীনতম দৌক পিটক শাস্ত্র এতরূপ ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদের ('ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ' নামটি বোধ হয় পরে প্রদত্ত হয় । যোগ-ভাষ্যে তাহাকে 'নৈশেষিক' বলা হইয়াছে) ভূয়োভূয়ঃ প্রসঙ্গ আছে । দীর্ঘ নিকায়ের 'শ্রেষ্ঠপাদ সূত্র' উষ্টব্য ।

বুদ্ধ এই মতের আধিকর্ষ্য অথবা ইহা পূর্বে হইতে ছিল কিনা, (বোধেরা বলেন, দৌক শাস্ত্র পূর্বে হইতে ছিল) তাহার স্মৃতি নাই । পরন্তু পিটক রচনার পূর্বে এবং বুদ্ধের পরে, যে সময় ভারতে বৌদ্ধ-মতের খুব চর্চা হইতেছিল, সেই সময় যে যোগভাষ্য রচিত হইয়াছে, (অর্থাৎ ষট্‌পূর্ব পূর্বে পঞ্চম শতাব্দী) তাহা উক্ত বুদ্ধি হইতে অসম্ভব হইতে পারে ।

এই যোগভাষ্য, পঞ্চশিখাচাণ্যকৃত সাংখ্যের সর্কাপেকা যে প্রাচীন গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতে উদ্ধৃত বচন পাওয়া যায় । তদ্ব্যতীত বার্ব-

গণা আচার্য্যের বচন ও অনেক লুপ্তগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচনও পাওয়া যায় । সেই এক পঞ্চশিখ বচন হইতে জানা যায় যে, আদি বিন্দু কপিলা নির্মাণচিত্তাদিষ্টান পুস্তক আত্মার ক্ষমকে সাংখ্যভঙ্গ উপদেশ করেন । আত্মার উহা স্বনি-সমাজে প্রচার করেন । বুদ্ধের পর ভারতে যেমন মন-চর্চীর অভ্যুদয় হয়, সেই সময়ও কপিলাসের সাংখ্যোপাস সমাজে * জ্ঞানযোগের চর্চীর অভ্যুদয় হয়, ইহা মহাত্মারের প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায় । অত্মের পামার শিষ্য পরিভ্রাজক পঞ্চশিখ নিপলাদি দেশে পরিভ্রমণ করিতেন, তিনিই প্রধান সাংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন ও সমাক্ষ প্রচার করেন । তাহাতেই কোন কোন উপনিষৎ, মনু, ও মহাত্মারতাদি দাবতীয় আর্ষগ্রন্থ সাংখ্য-মতে অল্প পরিচিত দেখা যায় ।

মহাত্মার অতি প্রাচীন সংবাদসমূহের শ্রেষ্ঠ স্বরূপ । যদিও উভাতে অনেক অপ্রাচীন উক্তিভাগ আছে, কিন্তু আবার যে সময় আর্গামসাজে বিবাহ-পণা ছিল না, জ্ঞায়ন "অনাবৃত্তা" ছিল, তাহারও স্ব স্ব আছে আদি পর্বে (১২ অঃ) । সেই মহাত্মারের এক প্রাচীন সংবাদ হইতে জানা যায় যে, পঞ্চশিখ নিদেহপতি জনদেব জনক মরণতির শাস্তা ছিলেন ।

কোশলের পূর্ববর্তী রাজ্যের নাম বিদেহ ।

* ইহা স্ব-সংগের কথা । বুদ্ধের সময়ে কেহ স্বমি ছিলেন না, তাহা উষ্টব্য । তখনও অতি পুরা কালে স্ব-সংগ ছিল, এইরূপ শোকের ধারণা ছিল, তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে জানা যায় । বুদ্ধের ভক্তেরা তাহাকে সম্মানসূচক 'মহেশি' বা 'মহেশ্বরি' নাম দিয়াছেন ।

বেদের "বিদেহ" নাম হইতেই সম্ভবতঃ এই নামের উৎপত্তি। এই বিদেহ রাজ্য অতি প্রাচীন। যত্নভারতের মূল ঘটনা, যাহা ঐ গ্রন্থের অতি প্রাচীন অংশ, তাহাতে জানা যায়, যুদ্ধিগিদির সময়ে ঐ রাজ্য লুপ্তপায় হইয়াছিল। বুদ্ধের সময় ঐ রাজ্য ছিল না।† বুদ্ধের সময় এই কয়টা প্রদেশ জনপদ ছিল, যথা—“কাশিকোমলেন্দ্র বজ্জি-মল্লেন্দ্র চেতিবৎসেন্দ্র কুরুপঞ্চালেন্দ্র মচ্ছ-সুরসেনেন্দ্র”।

(দীর্ঘনিকায়ের জনবসত সূত্র)

অর্থাৎ কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু পঞ্চাল, মৎস্য, সুরসেন (এই সকল দেশে এবং অঙ্গ-মগধেই বুদ্ধের প্ৰসার ছিল)। আর মহাসুন্দর্শন সূত্র হইতে জানা যায় যে সময় চম্প, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাংখ্য, কোশাখী ও বারাণসী প্রধান নগর ছিল। উত্তর মধ্য বজ্জি ও মল্ল দেশেই প্রাচীন বিদেহ রাজ্যের স্থান। (মহাভারতে মল্ল দেশের নাম আছে, বজ্জির নাম নাই)।

এ দিকে শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষৎ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও বিদেহ-পতি জনকের অধ্বান পাওয়া যায়। অতিএব অল্পতম জনক রাজার শাস্তা পঞ্চ-শিখানারী যে বুদ্ধের বহু পূর্বের লোক, তাহাদের সংশয় নাই। কত পূর্বের তাহা স্থির করিবার উপায় নাই; তবে দেখা

† বৌদ্ধ শাস্ত্রে কোশল “বেদেহিপুত্র অজাতসত্ৰু” এই বাক্যে বৈদেহী নাম পাওয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধযোন বলেন, তিনি ঐ নামের একজন কোশল রাজকুমারী।

যায়, ভারতবর্ষে নানাদিক প্রতি সহস্র বর্ষে এক একবার ধর্মচর্চার অভ্যুদয় হইয়াছে। বুদ্ধের সহস্র বর্ষ পরে শঙ্কর ও শঙ্করের সহস্র বর্ষ পরে বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয় হয়। অধুনা ভারতে বৈষ্ণব ধর্মেরই প্রাবল্য। বুদ্ধ ও বলিরাছেন, তাঁহার ধর্ম সহস্র বর্ষ পরে হীনপ্রভ হইয়া গাইবে। কপিলাসি-প্রণোদিত হইয়া ঋষিসমাজে যে ধর্মচর্চা প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ঐ সহস্র বার্ষিক কালচক্রের একাদিক চক্র পূর্বে ঘটিয়াছিল, বোধ হয়।

ইহা আরও উদ্ভব্য যে, সাংখ্যের প্রচলিত গ্রন্থ সকল অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন হইলেও প্রাচীন সাংখ্যমত তাহাতে বিপর্যস্ত হয় নাই। সৌভাগ্যের বিষয়, সাংখ্যের তত্ত্ব সকল বুদ্ধিমূলক। অন্নগোম ও বিলোম বুদ্ধির দ্বারা উৎসাহিত হয়; তজ্জন্ম “নিগুণ পুরুষ” ও “ত্রিগুণ” উক্ত হইলেই সাংখ্যের সমস্তই স্থচিত হয়। যেমন জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞা ও তাহার প্রমাণের একাংশ পাইলে, অবশিষ্টাংশ অস্থচিত থাকে না, ইহাও সেই-রূপ। বস্তুতঃ পঞ্চশিখানার প্রবচনের যথা অবশিষ্ট আছে, তাহা অধুনাও সাংখ্য-বোগকে সম্যক স্থচিত করিতেছে।

অতএব প্রাচীন সাংখ্যধর্মের উপায় যে নৌক ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত, তাহা সম্ভব সংশয় নাই। তবে নির্মাণের সাধন সমূহ, সূত্রাৎ তল্লাভ্য পরমপদ সমান হইলেও, ঐ নির্মাণ সাধন নৌকেরা তিন্ন দিক্ হইতে বুঝাইয়া গিয়াছেন। সেই বুঝাইবার প্রণালী বা অতিধর্মের সহিত সাংখ্য-প্রণালীর মোটেই সাদৃশ্য নাই। সাংখ্যে অল্পতমসান

পদার্থের মৌলিক বিশ্লেষণ ও সমন্বয় আছে,
আর অভিন্নার্থে কেবল অবিচ্ছিন্ন (complex)
পদার্থের বিচার। আত্মিকতাকে meta-
physics বোঝা দেয় নাই। যাত্রা হটক, অতি-
ধর্মের বিষয় পরে বর্ণনার উচ্চা রহিল।

শ্রীশরীরহরানন্দ আরণ্য ।

রহস্য ।

কে আমি, ছিহু বা কোন্ দেশে,
কে বলিবে তাতার সন্ধান ?
কি কাজে—কি সাধিবারে এসে,
এ সংসারে লভিয়াছি স্থান ?

কাহার আদেশ বহি শিরে,
ঘুরিতেছি অনন্তের পথে ?
বিলম্ব বা বাইব অচিরে,
সাধি এই কর্তব্যের ত্রতে !

কিছু নাই অস্তর-বাহিরে,
অক্ষীভূত যুগল নয়ন ;
নিয়তির নির্ধর্ম-তিমিরে
করিয়াছে চির আচ্ছাদন !

হৃদি-কল্প ক্ষণ-ভাগ্য-বশে
হেরি কোন্ আলোকের রেখা ;
দ্বিগুণিত অন্ধকারে শেবে
লুকায় দে ক্ষুদ্র ক্ষীণ শিখা !

এ মহা আঁধার ভেদ করি,
উঠে না ত সত্যের নিহির !
প্রাণপণে ভাবিবারে নারি—
রহস্যের কঠোর প্রাচীর !

চামিছে গাইছে নিশিদিন,
নিষ্ঠুর, জবরহীন যত ;
ভোগ-নন্দ—বিচ্ছেদবিহীন,
ভূঞ্জিতেছে কত মনোমত !

বাগনা না জাগিতে অস্তরে,
অমনি তা হ'তেছে পূরণ !
সুখ তার সৌভাগ্য শিরে-
বিছাইছে কুপ্তম শয়ন !

কিন্তু যারা দীনভাব-ভরে,
সাধুগণ করিয়া আশ্রয়,
চলিতেছে জীবন-পান্তরে,
মুষ্টিমান্ন দাক্ষিণ্য, বিনয় ;—

ছড়াইছে প্রাণের গৌরভ,
পূর্ণ করি ব্রহ্মাণ্ড আশ্রয় ;
জগতের বিভব-গৌরব
করে তারে তাঁর উপহাস !

পৃথী প্রায় সতি বজ্রাঘাত,
অবহেলি শত অপমান,
করিতেছে দেহ-প্রাণঘাত,
দধীচির হৃদয় সগাল !

হায় ! তারা, একি অপিচার !
তুমানলে দহিয়া দহিয়া,
নীরবেতে হইয়া অঙ্গার,
যাইতেছে অনন্তে গিশিমাণ !

ধরিতেছে অশনি-প্রহার,
শিউকির শাস্তি-নিকেতন !
আবরিছে কুহেলি আঁধার,
সত্য-স্বাত নির্মল কিরণ !

১৫

কোণা এর নিশাঙ্করণী ?
এ বেদনা পাশরিব কিমে ?
কি বন্ধুব সংসার শরণি !—
কি জাণা এ নিরাশার বিশে !

১৬

কে আছ এ জগতের মূল ?
কুপাকরি চাহ একবার ;—
মহত্তর অর্গলটা খুলে
এ হস্তরে করহ নিস্থার ।

পথিক

● কোণা হ'তে চলেছি কোণার ?
কত দিন হটেবে চলিতে !
কে বুঝা'য়ে দিবগো আনার ;—
কেহ কি তা' পারগো বলিতে ?

২

চপে কিছু দেখিতে না পাই,
চারি দিক্ বোর অন্ধকার !
তম্ জামি চলেছি সদাট,
কাপ-স্রোতে ভেসে অনিবার ।

৩

কত দেশ, কত মঙ্গ-বন,
কত মাঠ, কত নদ-নদী,
লোকগণ, নিবিড় কানন,
বাহিয়া চলেছি নিরবধি ।

৪

হাসি-কান্না-বিস্মিত কত
মৌভাগ্যের উখান-পতন ;—
মহাদেহে অভিকৃত মত—
হেরিতেছে স্থখের মগন !

হেরিহু, উদাস—আত্মহারী,
কত জন প্রাণ করি পাত,
চিন্তাজরে হইরাছে সারা,
প্রতিদানে লাভি পদাবাত !

৬

কহ এক শ্মশান-মাকারের
পিশাচের তাণ্ডব নর্তন !
নিবিড় গভীর অন্ধকারে
গৃহনীর পক্ষ-সঞ্চালন !

৭

তাপিতের 'জাহি' আর্ন্তনান,
ভয়ার্জের ব্যাকুণ চীৎকার !
ভগোময় বিরাট্ নিশাদ—
করিয়াছে পূর্ণ চারি পার !

৮

কত স্থপ-মৌলধোর মেলা,—
বিচ্যাতের ক্ষণিক বিকাশ ;
কর লুকু বাগনার খেলা—
করে ধোরে তীর উপহাস !

৯

কে আছ এ জগতের মূলে—
অধিরাজ, অনন্তের পথে !
মহত্তর আবরণ খুলে,
উদ্ঘাপন করাও এ ত্রতে !

১০

ক্রান্ত প্রাণ, অবসন্ন দেহ,
বন্ধুর, কণ্টকসর পথ ;
কোণার নিরাম-কুঞ্জ-গেহ,—
দেখায়ে পুরাও মনোরথ !

১১

দাও জ্যোতিঃ, করুণা বিকাশি,
দাও প্রেম, দাও দিব্যজ্ঞান ;—
জীবনের বত প্রসূরাপি;
চির তরে হ'ক সমাধান ।

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকৃষ্ণন

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ১০ আইনমতে রেজিষ্ট্রিকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।



১৪৭ বর্ষ, ১৪শ পঞ্চ,
৮ম সংখ্যা ।

অগ্রহায়ণ ।

১৩১৪ সাল,
১৮-২৯ শকাব্দা ।

‘স্বদেশী’ সাধন ।

“জননী জন্মভূমিঞ্চ সর্গাদপি পরীক্ষণী”—
ইহা আমাদেরই পূর্বপুরুষ-পূজিত প্রাচীন
প্রবচন ; কিন্তু আমরা তাহার উত্তরাধিকারের
কি পরিচয় দিতেছি ? তাঁহারা যে “স্বদেশী”
জন্মভূমির পূজা করিতেন, স্বদেশের গৌরব
যুক্তিতেন, তাঁহাদের উক্ত বাক্যই তাহা
প্রমাণিত। তাঁহাদের স্বদেশ-সেবা সংকীর্ণের
ধ্বংসাবশেষ-লেশ এই বাক্যটি মাত্র অধুনা
আমাদের স্মৃতি-সাহিত্যে বর্তমান ; কেননা
আমরা এখন কেবল বাক্য-সর্জন, কিন্তু
কার্য-নিঃস্ব। তবে কিনা, নানা কারণে
বাক্যের স্বাচ্ছন্দ্য ও সময় আর আমাদের
নাই। কার্যের অবসর ও আবশ্যিকতা
অনিবার্য বেগে আগত। “কপায় আর
চিড়ে ভিজিবে না।” কাজ চাই। আপাততঃ
কাজে রাজবাধা নাই। কেবল অর্ধেক
ও অস্বত্ববশীলতাই বাধা। কাজে লাগিলে,

সে বাধা ক্রমে কাটিবে। কেবল মাতৃভূমির
ছাংখ কাঁদিবার এ সময় নহে ; ক্রন্দনত নারীকে
মাঝ ; পরন্তু পৌরুষ-সাধনে লাগণপণে মায়ের
চঃখ মুচাইবার—অশ্রুজল মুচাইবার অদম্য
উত্তম, অটল উৎসাহে ও অবিচল অধ্যবসারে
হৃদয় বাঁধিবার সময়।

বাজালীর বিষম হৃদ্বিন উপস্থিত। বাঙ্গালী
জাতি আজ জীবন-মরণ-সমস্তার সঙ্কট সঙ্কি-
ন্তলে মশরুতাবে সমাগত। বর্তমান অবস্থায়-
গারে—এখন একমাত্র উপায়—এক মাত্র
প্রতীকার—লাগণপণে স্বদেশীজীবন-স্বদেশ-
আপাততঃ—‘স্বরাজ’—জাতীয় শিক্ষা প্রভৃতি
গৌণভাবে চলুক, কিন্তু ইহাই ‘সুখ’ সাধনা
হউক। এই সুখের অর্থ আর ইহাই একমাত্র
সহোষক। ঐযথটি আপাতদৃষ্টিতে সামান্য
বোধ হইলেও, ইহার সঙ্কীর্ণতা। ‘স্বচিকা-
তরণ’ কৃত্তম বটী ; কিন্তু সুবিজ্ঞ কবিরা

সৌর সাম্প্রতিক বিকারের প্রবলাবহাতেই ইহার ব্যবস্থা করেন। আমাদের জাতির আধি-ব্যধির প্রতিকার-ব্যবস্থাপক বিজ্ঞ বিচক্ষণ চিকিৎসকগণই একবাক্যে আমাদের এই জাতীয় জীবন-সঙ্কট-বিপ্লব-বিকারে এই 'বদেশী সাধন' সৃষ্টিকার্ত্তনগণই ব্যবস্থা করিয়াছেন। জ্বর-আধারে, মাতৃভক্তি-অনু-পানে এই মলৌষণ মাড়িরা, "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে অতিমগ্নিত করিয়া, পান করিতে হইবে। এই মলৌষণেই মধুহৃদনের রূপার বিপদ কাটিবে; -রোগ্য বাইবে, দুর্ভোগ দূর হইবে, জাতীয় জীবন রক্ষা পাইবে। এ ডোবা নাড়ী আবার উঠিবে; এ হিমাদ্বে আবার তাপ স্রুটিবে; এই শীতল শিথিল রক্তস্রোত আবার বিহ্বৎ-বেগে স্রুটিবে।

দাৰ্ভা-খেলার যেমন একটা ঘোর বিপদ-জনক 'কিত্তী'র চৌটে মাতের অবহার পড়িয়া গেলে, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, সকল বলের ও সকল চালের বলাবল ও কলাকল পর্যালোচনা করিয়া, হয়ত এমন একটি চাল বাহির করিতে হয়, বাহাতে 'মাং' রক্ষা পায় এবং বাকী জরেরও আশা হয়। আমাদের দৈব ও পুরুষকারের অহুষ্ঠিত এই জাতীয় জীবনের দাৰ্ভা-খেলার দৈব "গয়েবী" খেলোয়াড়ের ভার আড়ালে থাকিরা যে কিস্তি দিয়াছেন, আমাদের পুরুষকার 'বেচারা' তাহাতে মাং বাঁচাইতে, কয়েক বৎসর বাবস্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া "বদেশী জ্বর ব্যবহার" রূপ এই চরৎকার চালটি বাহির করিয়াছেন। আমরা এখন 'রাকী' পাই না পাই, অন্ততঃ 'মাং' বাঁচানো চাই,

এবং অন্ততঃ এ 'প্রবুন্' সমাধানে এই 'চাল তির আর অন্ত উপায়ই নাই।

"গীতা-কর্মকার করে হাহাকার,
সুতো—জাঁতা টেনে অন্ন মেলা ভার;
দেশী বস্ত্র-অন্ন বিকারনাকো আর;
হ'ল দেশের কি ছুদ্দিন!"

ইত্যাদি প্রবীণ-বঙ্গকবি-সঙ্গীত বন্দে বহুদিন পূর্ক্ হইতেই গীত হইতেছে, কিন্তু বঙ্গীয় জন-সাধারণের তাহাতে সুম তাহে নাই। এখন 'বদেশী' আন্দোলন-তরঙ্গের আঘাতে জাগিরা বুঝিয়াছে যে, বাস্তবিক দেশের শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হইতে বসিগে, তৎকালের ভার দেশীয় ছুদ্দিন আর কি হইতে পারে? এ জগতে যত দেশ ও জাতি উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে, বদেশীর শিল্প-বাণিজ্যোন্নতিরই তাহার সর্ব প্রধান কারণ। ইতিহাসে উদাহরণ অসংখ্য বাহুল্য মাত্র। এই চক্ষের উপরেই বৃটিশের উন্নতি, মার্কিনের উন্নতি, আধুনিক জাপানের এই অগৎ-বিস্তার-করী উন্নতি, এই সমস্তই শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যোন্নতিরই অবশ্রুত্বাবী ফল। ভারতের শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যোন্নতিতেও একদিন সমগ্র জগতের বিশ্বেশ্যবিষ্ট চক্ষু আকষ্ট হইত। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যপোত একদিন খুলীল জলধির ফেনিল তরঙ্গ-রঙ্গ তরঙ্গ করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঙ্গে ভারত-প্রসাদ বিতরণ করিত। সেই ভারত আজ পর-প্রসাদ-প্রত্যাপী। যে ভারত অত্যাধি নিজ স্বদেশোৎপন্ন অন্ন বহু বিদেশের অন্নাত্যাব দূর করিতেছে, সে ভারত আজ নিজে—

"অন্নাত্যাবে শীর্ণ, চিন্তাঅন্নের জীর্ণ,
অলশনে শুষ্কীর্ণ।"

অতএব ভারত-সম্রাজ্যের এখন নিরাশ-
নিশ্চেষ্টতা—অথচ নিম্নজ্ঞ বাহুবিলাগ-
বিহীনতা আর শোভা পায় না। স্বদেশ
বার পরপ্রসাদতিথারী, ভার আর বিদেশী
বিলাসের ব্যবসিরি মাঝেনা। “সুটেবুড়ুনীর
বেটা সন্দনবিলাস।” ইহাত আমাদেরই
প্রায়া প্রথচনে মর্শ্বভেদী উপহাস। সা বাদের
পরবার-তিথারী, তাহারি কোন সুখে—কোন
জুখে পর-পসাদে হাসে ? পিক্ আমাদের
বিদেশী বিলাসে। পিক্ আমাদের বিদে-
শাত্মকরণ উল্লাসে ! এখনও যদি আমরা
স্বাবগমন না ধরি, আপন পারে ভার দিতে
পিকা না করি, এখনও যদি বিদেশীর
আপাত-চাক্চিক্য চমকে ভুলি, বিদেশীর
শিল্পকার্গা—ব্যবসার-বাণিজ্য অবহেলি ; এক
কথার—‘হাতের লক্ষী পারে ঠেলি’—তবে
আমাদের ভার আত্মহত্যাকারী, স্বদেশ-
দ্রোহচাচারী হতভাগা জাতির উচ্ছেদ বে
অসম্ভবত্বী ও অবশ্যস্তাবী, তাহাতে আর
সন্দেহ কি ?

সেই আগর উচ্ছেদ হইতে আশ্রয়কার
আপাতেই আমাদের দেশের এই বর্তমান
আন্দোলন উখলিয়া উঠিয়াছে ; আশান্তের
চৌটে নোহের ফুল ছুটিয়াছে ; দেশা কাটি-
য়াছে, আত্মদৃষ্টি ছুটিয়াছে। বিদেশী-বর্জন
ও বিদেশী অর্জনে এই দেশব্যাপী উৎসাহ-
উত্তেজনা তাহারি নিদর্শন। আজ ‘হাটে
হাটে মাঠে বাটে’ দেশের সর্বত্র সর্বদা
জাহারই আন্দোলন—আন্দোলন। তাই
আজ ‘স্বাধীন বর’ তুল্য রাজবিধির বঙ্গ-
বিক্ষেপ ও তাবাক্তরে স্বর্গীর নিরাশানিক্ষেপ
জানেনে আগ্রহে এখন। হিন্দু-মুসলমান,

বালক-বর্ষারান, স্ত্রী-পুরুষ, সাক্ষর-নিরক্ষর,
ছাত্র-মুদ্র, সর্বভেদ-নির্কিশেবে—ভারতবাসী
সবারই সেবা এই বিদেশী সাধন। দেশের
বিশক্তি-বিনাশ-ব্যবহার দেশবাসী কাহার
আপত্তি ? রাজারও ইহাতে আপত্তি বা
অসহায়ত্বতির শিকা-সভাভাঙ্গুমোচিত সঙ্গত
হেতু নাই। চিররাজতন্ত্র হিন্দুর বিদেশী
জব্যাহুরাগে ‘উদারনৈতিক’ বিদেশী গবর্ণ-
মেন্টের বিরূপ দৃষ্টির স্বাভাবিক আশঙ্কা
নাই। বিশেষতঃ ইন্দোনীং এডমেন্সীর কৃষি-
শিক্ষারতির প্রতি ইংরাজরাজের কতকটা
অস্বকুল দৃষ্টিরও নিদর্শন একান্ত অদৃষ্ট নর ;
তবে আর শুদ্ধ বিদেশী-সাধনে (লাট্ সিন্ডেটের
মতে “Honest” বিদেশীতে) ভার-তাবনার
বিষয় কি ? বিদেশী-বিধেব-বিরহিত শুদ্ধ
‘বিদেশী’ অস্বরাগের ভিত্তিতে স্থাপিত এই
‘বিদেশী সাধন’ তদেতুই রাজ-বিধি-বাণিত না
হইলে, ইহার সাক্ষ্য-সম্ভাবনারইবা একান্ত
অসম্ভাবনা কি ? শুদ্ধ বিদেশী জব্য-
হুরাগের আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে কিছুমাত্র
রাজনৈতিক নহে। কলে বৈধ রাজবিধি-
বাধ্যতার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাতক কোনও
আন্দোলন ভারতের পক্ষে স্বভাবতই
অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। রাজবিধি-বাধ্যতাই
আধুনিক রাজতন্ত্র (Loalty)। উপদেশ
বা আইনের দ্বারা আমাদের সেই রাজতন্ত্রের
শিকা ও রক্ষার ব্যবস্থা বাহ্যামাত্র। শুদ্ধ
রাজতন্ত্র আমাদের হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রাঙ্গুণত ও
স্বতঃসিদ্ধ। আমাদেরই সর্বসারতম শাস্ত্রগ্রন্থ
গীতার আমাদেরই উপাত্ত তপসান স্ত্রীকঙ্কর
শ্রীমুখের উক্তিভেই ব্যক্ত হইয়াছে যে—
“স্বাধীন নরসাম্রাজ্য”। অর্থাৎ সর্বধর্মের সংরক্ষ

আমাকে হনরাধিগ—কি না রাজা বলিয়া জানিবে। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রাহুগারে রাজশক্তিতে ঐশী শক্তির পকাশ। রাজা ঈশ্বরের লৌকিক প্রতিনিধি স্বরূপ। আমার সেই শাস্ত্রই বলেন—“রাজা প্রকৃতির রজন্যং।” অতএব প্রকৃত প্রজ্ঞাবৎসল রাজার প্রেতি রাজভক্তি গনিত্যে বিখ্যাত ঈশ্বরের কোপ এঃ সুতরাং সর্গশুভ-সম্ভাবনারই লোপ হয়, ইহাই তিন্দু বসর্গ-শাস্ত্র-সঙ্গত বিশ্বাস। তবে কিনা, বর্তমান ক্ষেত্রে ভারতে রাজকর্মচারী-বিশেষের কোন অবিচার বা অত্যাচারাদির বিদিশঙ্গত প্রতিবাদ কখনও রাজভক্তিব বাধক হইতে পারে না। পদন্ত রাজকর্মচারী-বিশেষের দোষে বা বুঝিবার ভুলে সুভাঙ্গা-পালনের কোন বাধাত ও তঃগতে রাজসম্ভানস্থানীর প্রেকাপুঞ্জের শাস্ত্রিতে আঘাত লাগিলে, মৌনানুসমাদনে তাহাব সমর্পনই বরং রাজভক্তির বাধাতক বলিরা মনে হয়। ফলকথা, খঁটি সদেশাহু-রাজমূলক স্বদেশী জ্ঞান-বাবচাব হিসরক আন্দোলনে কোনরূপ আপত্তিকনক রাজ-নৈতিকতারই সংস্রব নাট। প্রকৃত আমাদের বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর রূপার আমাদের নির্ভরশীলতার ও বিদিশাশাতার ঈশ্বরভক্তি ও রাজভক্তির অক্ষুণ্ণতাতেই আমাদের স্বদেশা-ক্ষুণ্ণিতিক সক্ষম হইবে। ঈশ্বরভক্তি, রাজ-ভক্তি ও স্বদেশাহুভক্তি পরস্পর অক্ষুণ্ণাত বা থাকিলে, আমরা কনচ স্বদেশসেবার সমর্গ হইব না। তরত এক অচিন্তিত-পূর্ণ অসংগোপনিত ঘটরা আমাদের সব নষ্ট হইতে পারে। অতএব আমাদের এই

স্বদেশী জ্ঞান বাবচাবের আন্দোলন ঈশ্বর-ভক্তির আশ্রয়ে পালিত হউক, রাজভক্তির জ্ঞানাবাতে চালিত হউক এঃ দেশভক্তির শক্তিতে চলিত হউক, ভগবচ্চরণে ইহাই প্রার্থনা।

অবশেষে নিয়বদন, আমাদের পবম-সংগোপন—দেশের সর্গশাস্ত্র-সংস্পদ হুবকবুদ সেই এই দেশ-ভক্তির নবাহুগাৎপে কঃসমনোবাকো আশ্চোৎসর্গ করিরাচেন, ইহাতেই আমাদের অন্তবে কৃতকাপীতার আশি জঃগিরাছে। আমাদের বুড়াব দেশের ত এগন প্রার পঃগানেক সমম আঃগিরাছে। ঈঃগাঃ দেশের ভবিষ্যৎনতা, ঈঃগাঃের দীঃগিতিক, আচাব-বাবচাব আদর্শ উদু-হরণে দেশের ভবিষ্যৎসঃগ চালিত, পালিত, বিকাশিত বা (ঈশ্বর না ককন) বিনাশিতও হইতে পারে, যেট নবীনবুদকে শুক স্বদেশ-মুবাগে অক্ষুণ্ণাণিত দেখিরা যেন আমরা ঐ প্রাচীন কৃৎ অন্তিমে আনকে নরন মুঃগিত করিতে পারি, ইহাট ভগবচ্চরণ প্রার্থনাঃ তঃ! শত কর্তব্য পদদলিত করিরা, স্বদেশ-গৌণ ভুলিরা, স্বজাতি-গেমমঃগাঃ না বুঝিরা, বিবাত বিলাসে মঃগিরা আমরা ঐ জীবনে যে স্বদেশ জ্রোতিঃ—মাতৃ-স্রাতিঃক কলঙ্ককে পুঃগিরাতি, তঃগিমে ঐ নিবক-নিঃগিষ্টে নবীন পাঠঃগাঃ কঃগে বিঃ হঃ পারি—বঃসগণ!—পেঃসঃস্পদ বাধক-বুঃকঃগাঃ আমাদের অন্তিমের অক্ষুণ্ণতাৎ ও তেঃমাদেঃ কঃগার সাঃগনার কঃগে যে কলঙ্ক অচিরাৎ কঃগালত হউক তেঃসরাই দেশের সর্গকঃগে ভেঃসরা জঃগিলেই দেশ জঃগিলে। তেঃসরা উঃগিলেই দেশ উঃগিলে। তেঃসরাঃ শাস্ত্রিলেই

সনাত্ন স্মৃতিবো। কিন্তু বঙ্গগণা—মনে
 রাখিও—“ভাঙ্গাশামসারনঃ তপঃ” অনেকেই
 নিস্তার্থী ভোগস্বা, ভারত দেশের ভোগস্বাদের
 ভাবভী দেশের তপস্বী অপারনাতিব যেন
 বাধা দেনা হয়। মনে রাখিও—“সিদ্ধির্দৈর্ঘ্য
 ব্রহ্মচর্যাম্।” আর মনে রাখিও—“সর্গমত্যম্ব
 গর্ভিতম্।” উন্নত হইও না, উচ্ছ্রাণ হইও না,
 অচুচ্ছ্রিত হইও না, অপরাধনিক হইও না।
 মনে রাখিও—“নিপদি শৈর্গাম্।” শীত-
 গভীর-অপচ অচল অচল ভাবে—অদমা
 উন্নত-অক্রান্ত অধাবসারের সাতপূজার
 পুণ্ড্র বলি লইয়া অগমন হও। আরাধাতার
 ভগবৎবক্তিত্তি, বিধিবাধাতার রাজভক্তিত্তি ও
 অরঃভক্ততার অদমাভুক্তিত্তি, এই ত্রিশক্তি-
 সত্যের শক্তিমান হইয়া, “সর্গাদি পৈ গরীমণী”
 জননী অদমভূমিব গতি ভক্তিমান হও।
 সেই অগজ্জননীর্ নিত্যপ্রতিমাকপিতী
 অদমভূমিব পুণ্ড্র নিত্য অরুভক্তিমান
 হও।

অদেবী বর্জ্জন, বিদেবী বর্জ্জন ও বিলাগ,
 নিবর্জ্জন, এই তিন মহাযোগের মহানাদিনার
 শুভ অংশু কামিরাছে। এ সাধনার
 িক্রিতে শনে জীবন আশ্রুক, শুকপাণ
 আনন্দে ভাসুক; সন্দেশে বারি ছুটুক
 অশানে ফুল ফুটুক, গরলে অমৃত টুটুক!
 সন্তের সাধনে আঁধারে আলো, সন্দে ভাগ,
 “শাপে বধ” ধটুক! ঐ দেব, বিদাতের
 স্রোতে—বিনাসনা স্রোতে বা আমাদের
 বিনাশের স্রোতে ঐ সর্গব স্তামিনা চলিরাছে!
 গোটা কাঁড়িটাই ধ্বংস-সাগরের দিকে ফ্রু-
 যোগে ভুঁ দিয়া চলিরাছে। ঐ অদুরে সেই সর্গ-
 সৎকার সাগরের অনন্তগম্যসিগী সর্গস্রাসিনী

বৃষ্টি দেবা দিখাছে! উন্নত উত্তর তর -
 বর্জ্জন শুনা শিখাছে! আর কি নিশ্চয়
 ও নিশ্চেষ্টে থাকার সময় আছ? অগ
 জাতীয় স্মৃতার আত্মপূর্ণ অদমার অদেবী
 বঙ্গ বাবস্বাকরণ অদমা অদেবদ বাবস্বার
 কর। ইহাট আমাদেব স্মৃতস্বীপন, ইহা-
 তেই আমাদেব স্বাবলগন—“সর্গমাত্ম-
 বণং স্বপ”; স্মৃতবঃ ইহাট আমাদেব সর্গার্থ-
 পদ অদেবীসাপন। এম নবীন-পনীণ, জী-
 পুণ্ড্র, পনীর্নির্ধন হিন্দু স্মাংমাণ, একমাদেব
 সন্তান-সনাত্ন স্মিৎ, এক যোগে এই
 মহাযোগের সাধন লই। এম, সাত্ত্বের—
 সাত্ত্বিকভাবে সাত্ত্বপুজার সন্ত হই।

কি ছািব সিদ্ধার বিলাসী বিলাসনাভাব!
 কেবল বাহুস্বদ্র ও লুপ্ততার পলোভন-
 সর্গব বিদেবী বঙ্গা-বঙ্গমস্তার! অদেবী
 শাধা-মাটা মোটা সেটা বঙ্গাদিট আমাদেব
 ভাল। “বানে চিহ্ন, পবনে মোটা, বন
 বঁ মনে ছোটো ছোটো”—আমাদেবই দেশের
 এই পনচন কি অদমাইট মানিব না?
 আমাদেব স্বী-কোলা-ভীত ভাইদের ভাইের
 ভীতের—দেবী স্মৃতার মোটা ধুঁইই আমা-
 দেব প্রাণবীর্ষ ও শোভনীর্; কেননা সে
 আমাদেব মারের পাদ। অদার কাচ-
 এনামেল দূরে থাক; আমাদেব পিতল-
 কাঁশা বঙ্গার থাক। বেলোরায়ী চুড়ী বিকস
 লটুক, আমাদেব শাঁখা-কড় অক্ষয় হটুক।
 বিলাসী ‘বুটু-সুপ ক’ ভারত’ হাঁড়ুক,
 আমাদেব চটানাগরার আদর বাড়ুক।
 আর পুনলাভী চিনি ও লুপ্ত সর্গতো-
 ভাবে পরিচর্গা; কারণ, সনাই কামিরাছে,
 উহা স্মৃত স্মৃকর-স্মৃকর হাড় স্তামিব সংসেবে

হিন্দু মূলধানের অধিকার - অস্পৃশ্য—অস্পৃ-
তাম্বা। বরং কাণো করকচ্: কণো চিনি বা
কোনা শুভ্রও আমাদের গানের গ্রাহ্য;
কেননা দ্বারের পদাট সন্তানের শিরোধার্যা।
এই স্থানে আশ্রয় একটি অ'ধুনিক 'বদেশী'
'ছড়া' পত্রের অংশনিশেষ উদ্ধৃত করিয়া,
ভদ্রারাই এককালে আমাদের মন্তব্য নিবেদন
করিতেছে—

“ভার্যের হাড় চিনি লুণ,
খেরোনা আর কোন স্তনে;
চর্কি মাড়ের ঐ কাপড়ে
সাজিরো না আর দেহ।

কাচের চূড়া দেওহে ফেলে,
এমনো আর এনামেলে,
সিগ্রেটে—বিছুটে—বুট

সজিও না আর কেহ ॥

'লিবারপুলে' লিভার ফোলে,
ম্যাগেরির'র মারে।

বুনা জনার বুড়া বানার,
বোরান দেহ আরে ॥

ও লবণ লবনাকো, 'ও'ছোপ' ছোঁবনা;
সিটুচিনির ফিটু শানা সন্দেহ খাবনা।
বে চিনি না 'চিনি, তারে 'চিনি' বলে কেটা?
বে সন্দেহে 'বেশ' নাই, সন্দেহ কি সেটা?
পামকটি—পাপকটি, বিছুটে—বিব-কুট।
ছিগারেট—ছি: গর্হিত। হুট বিলাতী বুট!

'স্যাটিমারে' স্যাটী মারে;

'ও'মেনে' ম'মেন' করে,

'টি'পাতে 'ট' মানে,

'ইই'পিড' বে, বোবেদ' সে।

'বু'মিট—বিদেশী-বুট

নী-দুরী-কাটা।

স্বদেশী বর্জন করি,
বিদেশী বর্জন করি,
কর্জন গর্জনে বর্ক-

ভদ্রেতে গরুরাজী ॥

এই ছড়ার ভবে ছত্র—বর্ণে বর্ণে মায়া-
দের সন্দেহ-সম্মতি ও সম্যক সমাহৃত্তি।
বাস্তবিক ভগবান যদি কৃপা করেন, তবে এ
জীবনে পাপ ছিগারেট আর ছোঁবনা, লবণ
আর লবনা; চিনি আর চিনিব না; কাচ-
এনামেল আর কিনিব না। তাঁতীর মূর্তি
গঠিব, মূর্তির জুতা পরিব। মা মা হাতে
কম্বিয়া দেন, তাই শিরোধার্যা করিব। এই
আমাদের প্রত্যাশা, এই আমাদের পণ।
এখন—“মজের সাধন কিছা শরীর-পতন।”

উপসংহারে নিবেদন, প্রতিজ্ঞা করা
অপেক্ষা প্রতিজ্ঞাপালনেরই অধিক শুভ্র
ও আশ্রয়, এ কথা যেন আমরা না ভুলি।
আর কঠোর প্রতিজ্ঞা পালন করিতেই
ব্রহ্মচর্যের বিশেষ প্রয়োজন। আমাদের
ভারত-গৌরব জীমদেব চিরব্রহ্মচারী ছিলেন,
তাই বরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও কৃষ্ণকেশ-
বৃদ্ধ অন্নধারণের প্রতিজ্ঞা উদ্ব করিয়াই
নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।
অত্য়াপি লোকে বচ পণের নিদর্শনে বলিয়াই
থাকে—“ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা”। অতএব প্রতিজ্ঞা
প্রতিপালনে সংঘ ও ব্রহ্মচর্যই আমাদের
প্রধান সাধন, এ সত্য যেন আমরা বিস্মৃত
না হই। আর এক কথা, বদেশী গ্রহণ ও
বিদেশী বর্জন “বখাসাধার করিব”, এরূপ
প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাই নহে। এই “বখাসাধার”
শব্দের কাঁক দিয়া সকল বৃত্তাই বাহির
হইয়া বাইতে পারে। একই—অস্পৃশ্য

বাটলেট, ঐ শব্দের আড়ালে সকল প্রতি-
জ্ঞার দ্বার এতান বাটতে পারে। আবার
“নিশ্চয় করিন” একপ প্রতিজ্ঞাও বর্তমান
অবস্থায় সবার সমস্ত বনে। অত-
এই লোকের ব্যক্তিগত সামসারিক—পারিবা-
রিক প্রভৃতি অবস্থাসারে কতকগুলি বিদেশী
ক্রমা নিশ্চয় পরিচাণের এবং অপরাধগুলি
রপাণাধা পরিচাণের প্রতিজ্ঞা করাট একপ
যুক্তিযুক্ত। যেমন কানীধামের ৮নিবেশ্বরকে
বা শ্রীক্ষেত্রের ৮পুরুনোত্তমকে এক একটি
কল উৎসর্গ করিয়া তাহা জন্মের মত ভাগ
করার ধর্ম রীতি অস্বদেশে পচলিত আছে,
তদ্রূপ আপাততঃ কতকগুলি ক্রমা—অর্থাৎ
সাধারণতঃ আমাদের নান্দনিত্য-ক্রমা
আমাদের মাতৃপূজার বলি উৎসর্গ করিয়া,
তাহা জন্মের মত ভাগ করা চাই। ক্রমে
এক এক প্রতিজ্ঞা পালনের ফলে ও বলে
অস্তিত্ব প্রতিজ্ঞা পালনেরও শক্তি পাইব,
এবং কালে ভগবৎরূপার সর্বপ্রতিজ্ঞা
পালনেই সমর্থ এবং সর্বার্থপ্রদ ‘বদেনী’
সাধনে সিদ্ধ হইব।

শ্রীঃ—

কর্ম ও ফলিত জ্যোতিষ ।

রাশিচক্র ।

চন্দ্র পৃথিবীর সমধিক নিকটবর্তী ;
তাহার পর বুধ, শুক্র, সূর্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি
ও শনি। স্বাভাবিক অধিকতর দূরবর্তী ;
তাহার পর রাশিচক্র । হিন্দু জ্যোতিষ-মতে

পৃথিবী হইতে চন্দ্র ৫,৫৬৬ বোজন, বুধ
১,৬৬-০১, শুক্র ৪,১৪-০৮, সূর্য ৬৮৯,০৭৭
মঙ্গল ১২,২৬,৬-৯, বৃহস্পতি ৮,৭৬,৫০৮,
এবং শনি ২০০১০২-০৭১ বোজন দূরবর্তী ।
তাহার পর রাশিচক্র । রাশিচক্র পৃথিবী
হইতে ৪,১০,৬২-৫৬৮ বোজন ; অর্থাৎ এই
পৃথিবী হইতে সর্বাধিক দূরত্ব শনিচন্দ্র
বত দূরে, রাশিচক্র তাহার দ্বিতীয় অধিকতর
অধিক দূরে অবস্থিত ।

ইংরেজী জ্যোতিষ মতে চন্দ্র পৃথিবীর
সর্বাধিক নিকটতম, তাহার পর শুক্র,
তাহার পর মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি ও শনি
অধিক দূরবর্তী । চন্দ্র মখন পৃথিবীর অভ্যন্ত
সমীপবর্তী হয়, তখন পৃথিবী হইতে তাহার
ব্যবধান ২২৫৭ ৯ মাইল এবং পৃথিবী হইতে
বুধন অতি দূরবর্তী গীসার গমন করে,
তখন তাহার ব্যবধান ২,৫১,২৪৭ মাইল ।
কিন্তু উপরিউক্ত ব্যবধানও সম্পূর্ণ ঠিক
নহে। গ্রহগণের দূরত্ব নিরূপণ সহজ সাধ্য
নহে। তাহার নিশ্চয় নহে। শূভবার্ণ
সকলেই স্বকীর বেণাহুয়ারী অঙ্কনঃ স্ব স্ব
কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবী যেমন
সূর্যের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ
গ্রহগণও শেটেলরূপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।
এইরূপ অবস্থার তাহাদের দূরত্ব সকল
সময়ে সমান থাকে না। অপিচ, তাহাদের
স্বকীর দেহাবর্তনেও ব্যবধানের ইতর বিশেষ
হইয়া থাকে। বাহ্যিক, পৃথিবী হইতে
তাহারা বহু অধিক দূরে বাইতে পারে এবং
অতি সমীপবর্তী হইতে পারে, তাহার ব্যব-
ধান ইংরেজী জ্যোতিষ-শাস্ত্রে যেমন ইংরে-
জি আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।—

অতি সমীপবর্তী ৬টলে—

- ১। শুক্র—(Venus) ২৫,১২২০.০ মাইল
- ২। মঙ্গল—(Mars) ১৭,০৮২,০০০ ”
- ৩। বুধ—(Mercury) ৫৬,০৮,০০০ ”
- ৪। বৃহস্পতি—(Jupiter) ৮৩,২৬৩,০০০ ”
- ৫। শনি—(Saturn) ৭৮০,৭০৮,০০০ মাঃ
- ৬। ওরনাস্—(Uranus) ১,১৬,৪২১০০০ ”
- ৭। নেপচুন্—(Neptune) ২,৫৫০,৮৫১০০ ”

অতি দূরবর্তী ৬টলে—

- ১৭৫,৫৬২০০০ মাইল
- ২০০,৭৪০০০০ ”
- ১২৭,৮২০০০০ ”
- ৪৬৭,১২০০০০ ”
- ২২৩ ৫৬৫০০০ ”
- ১,৮৮৫,২৮ ০০০ ”
- ২,৮৩৭,৭০১০০০ ”

চন্দ্র যখন সূর্য্যের অধিকতম নিকটবর্তী, তখন তাহাদের ব্যবধান ২,৭০,০০০ মাইল এবং যখন অধিকতম দূরবর্তী, তখন ব্যবধান ২০৮০০ মাইল। অন্তর্ভুক্ত গ্রহগণ সম্বন্ধে এইরূপ—

- ১। বুধ সূর্য্য হইতে ৩৫ ২৭০০০ মাইল
- ২। শুক্র ” ৫৬,০০০০০ ”
- ৩। পৃথিবী ” ২ ৪০০০০০ ”
- ৪। মঙ্গল ” ১০২৫১২০০০ ”
- ৫। বৃহস্পতি ” ৪৭৫৬২০০০০ ”
- ৬। শনি ” ৮৭২১৩৫০০০ ”
- ৭। ওরনাস্ ” ১৭৫২৮৫১০০০ ”
- ৮। নেপচুন্ ” ২৭৪৬২৭,০০৭ ”

সকল গ্রহের সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কাল এক-রূপ-নহে। যে গ্রহ যত নিকটবর্তী, তাহার ভ্রমণ-ক্রিয়া তত অল্পকালে সমাপ্ত হয়।

গ্রহাদির আকার বা আয়তনানুসারে প্রদক্ষিণ-কালের বিশেষ তারতম্য হয় না। নিম্ন-প্রদর্শিত তাহাদের আয়তনের আপেক্ষিক পরিমাণ ও পরিবেষ্টন-কাল দেখিলেই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

পৃথিবীর আয়তন (Volume or size) ও গুরুত্ব (weight) একশত ধরিলে সেই অল্পপাত অল্পসারে —

আয়তন—	গুরুত্ব—
১। পৃথিবী ১০০	১০০
২। বুধ ৫	৭
৩। মঙ্গল ১৪	১২
৪। শুক্র ৮০	৭২
৫। ওরনাস্ ৭৩০০	২৩০০
৬। নেপচুন্ ২৪০০	১৭০০
৭। বৃহস্পতি ১৩৭০০	৬০০০
৮। শনি ৭৪৬০০	২০০০

সূর্য্যপরিবেষ্টন কাল—

দিন	ঘণ্টা	মিনিট
৫৬৫	৬	২
৮৭	২০	৪৫
৬৮৬	২৩	৩১
২২৪	১৬	৪৮
৩০৬৮৬	১৭	২১
৬০২১৮	০	০
৪৩০২	১৪	২
১০৭৫২	৫	১৬

পূর্ব্বোক্ত রাশিচক্রকে ইংরেজীতে Zodi-
acal constellation কহে। ইহা ষাদশটা
চিহ্ন কর্তৃক বিভক্ত। হিন্দু-ভ্যোতিষে
ইহাদিগকে রাশি কহে। চিহ্নের বৈশিষ্ট্য
আকার পরিলক্ষিত হইরাছে, তদনুসারে
তাহাদের নামকরণ হইরাছে।

পূর্বতন চিহ্নগুলি এখন পর্যন্ত হিন্দু-জ্যোতিষে অবিকৃত রহিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতিষে তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। অন্যত্র এইরূপ পরিবর্তন অস্বাভাবিক নহে। কোন বিষয় ক্রমাগত ভাঙ্গা-স্তুত হইলে অথবা আসলের পুনঃ পুনঃ নকল করিলে, কালক্রমে তাহার ভাব বা আকার নষ্ট হইয়া, তাহা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে *। আসলের আর আসলও থাকে না। প্রাচীন মেঘ চিহ্নের শৃঙ্গটাই পাশ্চাত্য জ্যোতিষে মেঘাচিহ্ন ধারণ করিয়াছে। ছইটী মৎস্য অস্ত্রোক্ত পুঙ্খাতিমুখ—অর্থাৎ একটীর শির ও অপরটীর পুঙ্খভাগ উপর্যুপরি স্থাপিত করিলে বেরূপ আকার হয়, তাহাই মীনরাশি। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতিষোক্ত মীন (Fish) বা অস্ত্রোক্ত রাশির বেরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে সেবাদি নামকরণের কোনই কারণ উপলব্ধি হয় না। ইংরেজী জ্যোতিষ-গ্রন্থে উপরিউক্ত চিহ্নগুলি বেরূপ লিখিত আছে, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল—

* ইংরেজীতে পদ্যর ছন্দে—এই রাশিগুলি এইরূপ আছে,—

B. T. O.

'The Ram, the Bull, the Heavenly turns.

And next the crab, the Lion shines.

The Virgin and the Scales,

The Scorpion, Archer, and He-goat.

The man bears the watering pot.
And Fish with Glittering toils."

(Lockyer's Astronomy.)

R Aries (Ram) মেঘ।

V Taurus (Bull) বৃষ।

U Gemini (Heavenly twine) নিপুণ।

T Cancer (Crab) ককট।

P Leo (Lion) সিংহ।

M Virgo (Virgin) বস্ত্রা।

A Libra (Scale) তুলা।

M Scorpis (Scorpion) বৃশ্চিক।

T Sagittarius (Archer) ধনু।

W Capricornus (He-goat) মকর।

—Aquarius (Man) কুম্ভ।

X Pisces (Fish) মীন। *

পৃথিবী-মণ্ডলে পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত ধেরেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম বিষুব রেখা বা নিরক্ষ বৃত্ত। ইংরেজীতে ইহাকে Equator কহে। নভোমণ্ডলে এইরূপ যে রেখা কল্পিত হয়, তাহাকেও বিষুব রেখা বা নিরক্ষবৃত্ত কহে। ইংরেজীতে ইহাকে Celestial Equator কহে। এই রেখা অতিক্রম করিয়া ২৩½ অংশ উত্তরে ও ২৩½ অংশ দক্ষিণে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। সূর্য্যের এই কক্ষকে "অন্নান্ত বৃত্ত" কহে। সূর্য্য এই রেখার মধ্যেই গমনাগমন করে। উত্তর বা দক্ষিণ ২৩½ অংশের অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে না। সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহণ (Eclipse) এই পথেই সংঘটিত হয় বলিয়া ইহাকে ইংরেজীতে "Ecliptic" কহে।

বৃত্তোপরি রেখাও বৃত্তাকার ধারণ করে।

* এই চিহ্নগুলির ঠিক অরূপ 'টাইপ্' ছাপাখানার না থাকিতে, এগুলির বর্ণনাসম্বন্ধে সাদৃশ্য অঙ্গুণ্যে ইংরাজী "বড় হাতের অক্ষর" টাইপে দেওয়া হইল। অক্ষর ছাপাখানার আকৃতির 'বুক্' প্রস্তুত না থাকিলে, তাহাও দিতে পারা গেল না। (পৃষ্ঠার)

তজ্জন্ত “অন্ননাস্ত,” “নিরক্ষ,” “ক্ষক”
 রেখাদি “বৃত্ত” কথিত হইয়া থাকে। বৃত্ত
 সাত্রেই ৩৬০ অংশে বিভক্ত; অন্ননাস্ত বৃত্তে
 তদনুরূপ ৩৬০ অংশ থাকিলেও, ষাদশটা চিহ্ন
 কর্তৃক উহা ষাদশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এই
 বিভাগ বা চিহ্নগুলিকে রাশি কহে। সুতরাং
 এক একটা রাশি ৩০ অংশ। এই রাশি-
 গুলিও নক্ষত্রপঞ্জ। হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্র
 অশ্বিনী, ভরণী ইত্যাদি যে ২৭টা নক্ষত্রের
 সহিত মানবজীবনের সম্বন্ধ প্রদর্শন করি-
 য়াছে, তাহার সওয়া দুইটীতে এক একটা
 রাশি এবং তাহাতে ৩০ অংশ পূর্ণ হইয়াছে।

১। মেঘ রাশি—অশ্বিনী ১৩ $\frac{১}{৩}$ অংশ

ভরণী ১৩ $\frac{১}{৩}$ ”

কৃত্তিকা ১৩ $\frac{১}{৩}$ ”

—৩০ অংশ।

২। বুধ—কৃত্তিকা ১০

রোহিণী ১৩ $\frac{১}{৩}$

মৃগশিরা ৬ $\frac{২}{৩}$

—৩০ অংশ

৩। মিতুন—মৃগশিরা ৬ $\frac{২}{৩}$

আর্দ্রা ১৩ $\frac{১}{৩}$

পুনর্কম্ব ১০

—৩০ অংশ

৪। কর্কট—পুনর্কম্ব ৩ $\frac{১}{৩}$

পুষ্যা ১৩ $\frac{১}{৩}$

অশ্লেষা ১৩ $\frac{১}{৩}$

—৩০ অংশ

৫। সিংহ—মঘা ১৩ $\frac{১}{৩}$

পূঃ ফাল্গুনী ১৩ $\frac{১}{৩}$

উঃ ঞ্ ৩ $\frac{১}{৩}$

—৩০ অংশ

৬। কন্যা—উঃ ফাল্গুনী ১০

হস্তা ১৩ $\frac{১}{৩}$

চিত্রা ৬ $\frac{২}{৩}$

—৩০ অংশ

৭। তুলা—চিত্রা ৬ $\frac{২}{৩}$

শ্রাবতী ১৩ $\frac{১}{৩}$

বিশাখা ১০

—৩০ অংশ

৮। বৃশ্চিক—বিশাখা ৩ $\frac{১}{৩}$

অনুরাধা ১৩ $\frac{১}{৩}$

জ্যেষ্ঠা ১৩ $\frac{১}{৩}$

—৩০ অংশ

৯। মঘ—মূলা ১৩ $\frac{১}{৩}$

পূর্বাষাঢ়া ১৩ $\frac{১}{৩}$

উত্তরাষাঢ়া ৩ $\frac{১}{৩}$

১০। মকর—উত্তরাষাঢ়া ১০

শ্রবণা ১৩ $\frac{১}{৩}$

ধনিষ্ঠা ৬ $\frac{২}{৩}$

—৩০ অংশ

১১। কুম্ভ—ধনিষ্ঠা ৬ ২

শতভিষা ১৩ ১

পূঃ ভাদ্রপদ ১০

—৩০ অংশ

১২। মীন—পূঃ ভাদ্রপদ ৩ ১

উঃ ঐ ১৩ ১

য়েবতী ১৩ ১

অংশ

মোট— ৩৬০

হিন্দু-জ্যোতিষ শাস্ত্র এষ্ট রাশিগণের
মানব-দেহের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে।

যথা ;—

১। মেঘ	মস্তকে।
২। বৃষ	মুখে।
৩। মিথুন	কণ্ঠে।
৪। কর্কট	হৃদয়ে।
৫। সিংহ	পাকস্থলীতে।
৬। কন্ডা	নিতম্বে।
৭। ভূলা	বস্ত্রিদেহে।
৮। বৃশ্চিক	পায়ুদেশে।
৯। ধনু	উরুতে।
১০। মকর	জাহ্নুতে।
১১। কুম্ভ	জন্ড্বায়।
১২। মীন	পাদদেশে।

গ্রহাদির সহিত পৃথিব্যাদি তত্ত্বের যেরূপ
সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, রাশিগণেরও সহিত
জ্যোতিষ শাস্ত্রে সেইরূপ আকাশ ব্যতীত অপর
চারিটা তত্ত্বের সম্বন্ধ উল্লেখিত হইয়াছে।*

* “মেঘশচ সিংহ ধনুযৌ বিজ্ঞেয়া বহিরাশয়ঃ ।
বৃষ কন্ডাথ মকর স্তম্ভেতে ভূমি রাশয়ঃ ॥
মিথুনশচ ভূলা কুম্ভোরশয় পবনায়ক ।
কর্কটবৃশ্চিক মীনাসচ বিজ্ঞেয়া জলরাশয়ঃ ॥”
(অথ হায়নরত্ন, ৩ পৃষ্ঠাঃ)

পৃথিবীতত্ত্ব জলতত্ত্ব।

১। বৃষ। ১। কর্কট।

২। কন্ডা। ২। বৃশ্চিক।

৩। মকর। ৩। মীন।

অগ্নিতত্ত্ব। বায়ুতত্ত্ব।

১। মেঘ। ১। মিথুন।

২। সিংহ। ২। ভূলা।

৩। ধনু। ৩। কুম্ভ।

যোগশাস্ত্রে তত্ত্বাদির যেরূপ বর্ণ উল্লেখিত
হইয়াছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে রাশিগণেরও
তদনুরূপ বিভিন্ন বর্ণ নিরূপিত হইয়াছে।
‘স্বরোদয়’ মতে পৃথীতত্ত্বের পীতবর্ণ, জল-
তত্ত্বের শ্বেতবর্ণ, অগ্নির অরুণ বা লোহিত
বর্ণ, বায়ুর শ্চামবর্ণ এবং আকাশের নানারূপ
বিচিত্র বর্ণ।

জ্যোতিষশাস্ত্রমতে মেঘের অরুণ বর্ণ,
বৃষের শুক্ল, মিথুনের হরিদবর্ণ, কর্কটের শ্বেত-
রক্ত-মিশ্রিত বর্ণ, সিংহের পাণ্ডুবর্ণ, কন্ডার
বিচিত্র বর্ণ, ভূলার কৃষ্ণবর্ণ, বৃশ্চিকের পিঙ্গল
বর্ণ, ধনুর অগ্নি-বর্ণ, মকরের ধবল বর্ণ,
কুম্ভের কপিল বর্ণ এবং মীনের কৃষ্ণবর্ণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমহনাথ দে।

অভিধর্ম বা বৌদ্ধ দর্শন।

(পূর্বাহ্নবৃত্তি)

সংস্কার স্কন্ধ।

সুধারাম অভিধর্মসংস্কার লক্ষণক, তাহার
সমস্ত একত্র সংস্কার স্কন্ধ। ‘এখ
সংস্কারণং নাম রাশিকরণলক্ষণম্’ (বিঃ ১৩)

অর্থাৎ অভিসংস্করণ অর্থে রাশিকরণ। সংস্কার, বেদনা ও বিজ্ঞান, এই স্বকৃত্রয়ের বিস্তার বা বর্ধনের দিকে সংস্কারের গতি। মিলিকে অভিসংস্করণের এই দৃষ্টান্ত আছে—“যেমন কোন পুরুষ সর্পি, নবনীত, তৈল, মধু ও কাণিত একত্র অভিসংস্কৃত করিয়া আপনি পান করে ও পরকে পান করাইয়া স্ত্রী হয় ও করে।” এখানে অভিসংস্করণের অর্থ প্রস্তুত করা অথবা সংগ্রহপূর্বক বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা। বুদ্ধ বোধ ও মিলিত মিলাইয়া লক্ষণ করিলে সংস্কার একরূপ হয়, যথা—স্বেচ্ছাপূর্বক বা স্তব্ধবেদনাদি স্বকৃত্রয়িক ভাব সকলের সঙ্গমই সংস্কার। তাহার সমূহ সংস্কার স্বক।*

সঞ্চিতভাব এবং সঞ্চায়ন হেতু, উভয়ই বোধ হয় সংস্কার।

সংস্কার কুশল, অকুশল ও অনাকৃত ভেদে ত্রিবিধ ও সর্বসমস্ত পঞ্চাশ সংখ্যক। তন্মধ্যে পঞ্চ সংস্কার সর্বসাধারণ। ছয় প্রকৌণিক বা কুশলাকুশলে যথায়োধ্য ভাবে

* সাংখ্যমতে চিত্তের ধারণাশক্তির সমস্ত অমুভূতভবে বিবৃত থাকাই সংস্কার। তাহাই কর্মসংস্কার। তাহার নান্দভাব কর্মকল। সংস্কার চিত্তের অপরিদূর্ষ মর্ম। বৌদ্ধের সংস্কার ফলতঃ তাহা, হট্টলেণ্ড ভিন্ন সূচিত। কারণ বৌদ্ধের লীনাবস্থা নাই। পরিদূর্ষ কর্ম অবলম্বন করিয়াই তাহাদের বিচার। বৌদ্ধের যাত্রা নিকরু (ধীন) হয়, তাহা উদিত হয় না। নিকরু ভাব ও উদিত ভাবের সম্বন্ধ নাই। কর্ম কিরূপে থাকে, কিরূপে কপীভূত হয়, সে সব বিষয় বৌদ্ধের বুদ্ধান না। কেবল মাত্র যোগ-ভাষ্যই তাহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিবৃত আছে।

মিলিত থাকে। পঁচিশ কুশল এবং চৌদ্দ অকুশল। মোট পঞ্চাশ সংখ্যক হইল।

সংস্কার সকলের প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাত হইতেছে।—

(১) স্পর্শ (ফস্গো)। ফুগনা, সম্ফুগনা, সম্ফুসিত্ত্ব, এই শব্দত্রয়ের দ্বারা—অভিবর্ষে স্পর্শের লক্ষণ করা হইয়াছে। স্পর্শ মানস ও ঐন্দ্রিয়িক, উভয়বিধই হয়। তন্মধ্যে চক্ষুরাদিতে সজ্বট্টন হয়, মনে সেক্রম হয় না। কিন্তু সংস্কারের পদস্থান বা আশ্রয় বেদনাদি স্বকৃত্রয় বলিয়া স্পর্শসংস্কার বস্তুতঃ মানস বা অরূপ মর্ম। অতএব চক্ষুরাদি প্রণালীর দ্বারা বাহ্য বস্তুয়ের ও মানসবস্তুয়ের (মর্মের) সংস্পর্শন ভাব স্পর্শ। যদিও বাহ্য ভাবের সহিত মিলন হইয়া স্পর্শ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ স্পর্শ মনোগত। যেমন তপ্তাস্ত্রের দ্বারা জীবনের হেতু হট্টলেণ্ড লক্ষ্যগত তাগই তাহার জীবিত্যের মুখ্য কারণ, সেইরূপ। ইহাতে একরূপ বোধ হয় কি, যে মানসিক, বিশেষ ভাব আরম্ভকে গ্রহণ করিলে বেদনাদি উৎপন্ন হয়, তাহাই স্পর্শ। সাংখ্যের গ্রহণভাব বা receptivity এই স্পর্শের ভূগ্য।

(২) চেতনা। চেতনা অর্থে চিন্তা। বুদ্ধ বোধ এতৎসম্বন্ধে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। যেমন সূত্রায়ের জ্যেষ্ঠ শিষ্য নিজের কার্য করে ও পরের কার্যও দেখে। যেমন কৃষক ৫৫ জন রুবাণ খাটাই, সেটরূপ ইহা চিত্তের স্পর্শবাদি (পূর্বোক্ত) ৫৫ অঙ্গকে চালিত করে। মিলিকে পূর্বোক্ত স্তব নবনীতাদির অভিসংস্করণের ভায় চেতনার কার্য উক্ত হইয়াছে। তাহাতে আছে—

“কুশলঃ কশ্ম চেতনায় চেতনিত্বা” অর্থাৎ কুশল কশ্ম চেতনার দ্বারা চেতিত করিয়া— উত্থাশ্রি। ইহা হইতে জানা যায় যে, চিত্তের সমস্ত ভাব লটয়া তাতাদের সামঞ্জস্য পূর্ণক য়ে চিন্তন, তাহাই চেতনা।

(৩) একাগ্রতা—নানা আলম্বন ছাড়িয়া এক আলম্বন দ্বারা একাগ্রতা।

(৪) জীবিতেশ্রিয়—রূপক্ষের জীবিতেশ্রিয়ের প্রায়। তাহা কপের জীবন, আব ইহা অরূপাবস্থার জীবন, এই প্রভেদ।

(৫) মনসিকার—মনে করা অর্থাৎ পূর্ণ মন হইতে বিসদৃশ মন করা বা আনা। মনসিকার ত্রিবিধ, আরম্ভণ্, প্রতিপাদক, বীথি—(চক্ষুরাদি দ্বারা ও চক্ষুরাদি বিজ্ঞানের সম্বন্ধীয় শ্রেণী) প্রতিপাদক ও জবন প্রতিপাদক।

এই পঞ্চ সংস্কার সর্বাচিত্ত (৮২ বিজ্ঞান) সাধারণ।

(৯০৭) বিতর্ক ও বিচার—বিতর্কন বা চিত্তের অভিনিবোপন (অভিমুখে স্থাপন) বিতর্ক আর বিচরণ বা আরম্ভণে অহুমজ্জন বিচার। এ বিষয়ে অনেক উপমা দিয়া বুদ্ধ যোগ বুঝাইয়াছেন। যেমন বৃত্ত অঙ্কত করিতে হইলে, মধ্যে এক কণ্টক রোপিত করিতে হয়, সেইরূপ বিতর্ক আর চতুর্দিকে ভ্রমণকারী কণ্টক অহুমজ্জনকারী বিচার। যেমন গন্ধাক্রষ্ট ভ্রমর পদ্মে পতিত হয়, সেইরূপ বিতর্ক; আর পদ্মের উপরে ঘুরিয়া বেড়ান বিচার। আকাশে উৎপাতত কাম পক্ষীর পক্ষমঞ্চালয় বিতর্ক; আকাশে উড়ীন

পক্ষীর পক্ষের অনতিপ্ৰদীপ্যমানর জ্বল নিচার। অশ্রম (জুক নিপাত অট্ট কথায়) উত্তর পক্ষের দ্বারা বাতগ্রহ পূর্ণক মতা-শকুনের স্থির পক্ষের দ্বারা গমন বিতর্ক, আর বাতগ্রহনর্থ পক্ষের প্ৰদীপ্যমান নিচার। এক হস্তে মলিন কাশ্মপাতিপর্য বিতর্ক, অশ্র হস্তে তাহা পরিমার্জ্জন করা নিচার। ইত্যাদি অনেক উপমার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিষয়টা তাহাতে অধিক পরিষ্কার হয় নাই। বিতর্ক ঘণ্টাঘাতের মত, আর বিচার সূক্ষ্ম দৃষ্টিবলেব মত। বিতর্ক আর মনের পর্যাভনন- (চারিদিকে বাত) কাণী আর বিচার অহুমজ্জনকারী। বিভাণি নিকার আর এক দৃষ্টান্ত দেন। যেমন কোন গ্রামবাণী কোন রাজপল্লভ মিত্তের দ্বারা রাজগেহে অহুমপনেশ করে, সেইরূপ বিতর্কের দ্বারা আরম্ভণ-আরোহণ হয়। আর একেবারে পরিচয় বিনা রাজগৃহে পবেশ অবিতর্ক আরম্ভণপ্রাপ্তি। এই সব হইতে ইহা স্থির হয় যে, বুদ্ধমতে মোটা-মুটি ভাবে আরম্ভণ দ্বারা বিতর্ক, আর ধর্ম্মী তদ্বিষয়ক (সূক্ষ্ম) চিন্তা বিচার।*

* ভগবান্ পতঞ্জলি সমাধাঙ্গ বিতর্ক ও বিচারের আত সুন্দর ও স্পষ্ট লক্ষণ দিয়া-ছেন। শব্দ, অর্থ, জ্ঞান ও বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণ চিন্তা বিতর্ক, আর শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ—স্মৃতি শুদ্ধ হইলে, কেবল বিষয় নির্ভাসক চিন্তা অবিতর্ক। বিতর্ক সূক্ষ্ম বিষয়ক; সেইরূপ যাহা সূক্ষ্মবিষয়ক, তাহাই বিচার। সূক্ষ্মত: বিতর্ক মশম্বা সূক্ষ্ম বিষয়কী চিন্তা। অবিতর্ক নি:শব্দ চিন্তা। যেমন ‘নীল’ এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক স্ট্রে সেই শব্দের সহিত অভিন্ন নীলরূপে চিত্ত সমাধাঙ্গ

+ ইহাকে স্মৃতি ও বলা হয়। কুশল-চিত্তের একাগ্রতা সমাধি।

(৮) অশ্রু-মাংস—দৃঢ় গমক্ক বা গাশ্বক্কর
সম্ভাবনের নাম অশ্রু-মাংস।

(৯) বীর্গা—উৎসাহ ভাব।

(১০) পীতি—চিত্ত ও কায়ের তর্পণ
ভাব। তৃষ্ণাক্তের জল পানের মত কবনা
আরম্ভণ পাইলে পীতি হয়।

(১১) চন্দ—নিগমার্থিকতা। কর্তৃক
মাতা; যেন মনের হস্ত প্রহারণের জায়।

এই ছয় সংস্কার অল্পসমান, অর্থাৎ ৮৯
চিত্তের মধ্যে দোষযোগী কতকগুলির
সহিত সম্পৃক্ত হয়।

(১২) মোহ—চিত্তের অজ্ঞান বা অন্ধ-
কার ভাব। ইহা আবদ্ধণকে আচ্ছাদিত
করে।

(১৩) অহীকতা—লজ্জাভয়শূন্যতা।

(১৪) অনেন্তিপ্র—নিন্দাভয়শূন্যতা।

(১৫) উদ্ধত (উক্ৰতা)—বিক্ষেপ ভাব।

(১৬) নৌকতা (কুকূট)—কুক্ষণের
অনুভাব।

(১৭) লোভ—ঐচ্ছাক্ত রোগের জায়
অপরিভাগ ভাব।

(১৮) দৃষ্টি—মিথ্যাভ্জান। সাধারণতঃ
ত্রয়কাল যুক্তোক্ত ৬২ কুমতকে মিথ্যাদৃষ্টি
বলা যায়, কিন্তু আধুনিক বৌদ্ধের ভিত্তরও
অনেক মিথ্যাদৃষ্টি আছে।

(১৯) মান—গর্প। উন্মাদের মত কেতু-
কাগাতা বা মকণের মধ্যে কেতুরূপ হই-
বার উচ্ছা।

(২০) বেম—চাঞ্চিক্য; ইহা সর্পের বিষ
ঢাপার মত বা নিজের আশ্রয়দাহনকারী
দাবাঘির মত।

(২১) জৈর্ষা—পরম্পত্তিতে অনভিরাতি
বা অপ্রীতি।

(২২) মাৎসর্গা—গন্ধ বা লভ্য আশ্র-
ম্পত্তির নিন্দা। পরম্পত্তির সহিত নিজ
ম্পত্তির সমানতা বিষয়ে অক্ষমা।

(২৩) মিন, মিন্দঃ—ধিন বা স্ত্যান =
অলুৎসাহ অর্থাৎ বীর্গোর অভাব। মিন্দ
আগস্ত বা অকর্মণাতা—আলস্ত শরীর-
জড়তা, বৌদ্ধের মিন্দ কায়ের (বেদনা সংজ্ঞা
সংস্কার স্বন্ধের) অকর্মণাতা।

(২৪) বিচিকিৎসা—সংশয়। অনিশ্চয়
হেতু চিত্ত কম্পন।

দ্বাদশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্যন্ত চতুর্দশ
সংস্কার অমুশন। অতঃপর কুণল।

(২৬) শ্রদ্ধা—শ্রদ্ধাধানতা।

(২৭) স্মৃতি—একধারা স্মরণ সংস্কার
ইর্ষ্যা। স্তম্ভের মত আরম্ভণে দৃঢ়রূপে চিত্ত
রাণা।

(২৮) ভ্রী—লজ্জা-ভয়ে কায়-প্রচরিতাদি
হইতে বিমতি।

(২৯) ভক্তপ্র (অবতপ্র)—পরনিন্দাদি
ভয়ে হৃৎচরিত-নিবৃত্তি।

সবিতর্ক সমাধি। আর নীল নাম বিশুদ্ধ
হইয়া কেবল নীলরূপাংগাচিধ্যান নিবিতর্ক।
নীলরূপে সমাধানানন্তর শব্দময় বিচারের
দ্বারা রূপ-ভঙ্গ্যে উপনীত হওয়া সবিতার।
আর রূপ-ভঙ্গ্যের নিঃশব্দ ধ্যান নির্বিচার।
শেষটি সাধন চিত্তস্থেরোর চরম উৎকর্ষ।
বৌদ্ধদের 'দৃষ্টান্তসমূহ' পর্যালোচনা করিলে,
ইহাই তাহার প্রকাশ করিবার চেষ্টা
করিয়াছেন, বোধ হয়। বস্তুতঃ এইরূপ
লক্ষণই সাধনে কার্যকারী; নচেৎ "তৎকা
সত্ত্বো বস্তুচিত্তত্ত্বং" ইত্যাদি লক্ষণ বিশেষ
psychological grasp স্মৃতি করে না।

(৩০) অলোভ।

(৩১) অদেহ—মৈত্রী।

(৩২) তত্ত্ব মধ্যস্থতা—চিত্ত চেতনিক কোন ধর্মে নুনোদিকতা ভাব গ্রহণ না করা। সারথি যেমন মসপ্রাপ্তিত অশ্রমণকে অধুপেক্ষণ করে, চিত্ত চেতনাকে সেইরূপ অধুপেক্ষণ। ইহাই উপেক্ষা।

(৩৩২৪) কায় ও চিত্তের প্রসঙ্গি—কায় ও চিত্তের অকল্প (সাহিত্যিক) ভাব। কায় অর্থে জ্ঞানেশ্বর।

(৩৫১৬) কায় ও চিত্তের লগ্নতা—কায় ও চিত্তের অন্তর্গত বা অন্তর্ভুক্ত।

(৩৭১৮) কায় ও চিত্তের মূর্ততা—মূর্ততা অরোধকতা। যেমন মোঘায়েম চামড়া।

(৩৯১০) কায় ও চিত্তের কর্মণাতা—মিত্র ও খিনের বিরোধী ভাব। পোমাদনীয় বস্তুতে প্রসাদ ভাব—হিত ক্রিয়াতে বিনয়োগ-সামর্থ্য।

(৪১১২) কায় ও চিত্তের প্রাপ্ত্যা (প্রাপ্ত্যঞ্জনতা)—কায় ও চিত্তের অগ্নানি (আরোগ্য) ভাব। সুস্থতা।

(৪৩১৪) কায় ও চিত্তের স্নজুকতা—আর্জ্জব। অর্থাৎ কায়ের স্নজুকতা, অবক্রমতা, অকুটিলতা এবং চিত্তের সরলতা।

ষড়্বিংশ হইতে চতুঃস্বারিংশ পর্যন্ত স্তম্ভ সংস্কারকে শোভন সাধারণ বলে।

(৪৫) কায়-দৃষ্টি-বিরতি বা সম্যক কর্মাস্ত—পাপক্রিয়া হইতে চিত্তের বিমুখ ভাব। ইহা ত্রিবিধ—প্রাণাতপাত-বিরতি (অহিংসা); অদন্তস্বাগ্রহণবিরতি (অস্তেয়) এবং কামে মিত্যাচার বা উচ্ছিন্নতা-বিরতি।

(৪৬) বাগ্‌দশচরিতবর্ত বা সম্যক-বাক—মিত্যা, পশু ও পরম বাক্য এবং সম্ভ্রমাপ (সম্ভ্রমণা) (বচনগীতা) ভাগ।

(৪৭) মন্বাকীর্ণবর্ত—মমন্ত বার্ষিক্য হইতে বিরতি।

এই তিনের নাম নিরতিজয়।

(৪৮) করণা—ভূঃস্তের প্রতি দয়া ভাবনা।

(৪) মুদিতা—পরমসম্পত্তির অমুমোদন বা তাহাতে সমুদিত ভাব।

ইহাদের নাম অপমাণা (অপমানঞ্জন)।

(৫০) প্রজ্ঞেশ্বর—প্রজ্ঞা সমাধিকৃত পুরুষ্ট জ্ঞান; তাহার ইঞ্জিয় (সম্বিত শক্তি) প্রজ্ঞেশ্বর।

এই পঞ্চবিংশতি (২৬-৫০) সংস্কারের নাম কুশল সংস্কার। ১৪টা অকুশল; ২৫টা কুশল। স্পর্শাদ সর্বিদধারণ সংস্কারের মধ্যে যাহারা অব্যাকৃত চিত্তের সহিত সম্ভ্রম-যুক্ত, তাহারাই সর্বাঙ্কৃত সংস্কার। স্পর্শাদির অন্তর্গত পাকতে অব্যাকৃত পূণক সংস্কার গণিত হয় নাই।

এই ৫০ সংস্কার যথায়োগ্য ভাবে ৮৯ বিজ্ঞানের সক্তি সম্ভ্রমযুক্ত হয়। আর সেই বিজ্ঞান বা চিত্তগন্তান জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর আবর্তন ক্রমে চর্চিত পাকে। যথা—
পটি সক্তি ভবঙ্গ বীথযোগে চুতি চেত তথা ভারতরে।

পুন সক্তি ভবঙ্গ মিচরণ পরিবর্তিত চিত্ত-সম্ভ্রমতি ॥

অর্থাৎ প্রতিগন্ধি (জন্ম), ভবঙ্গ (আমৃ-ফল), ও চুতি, মৃত্যু) পুনঃ পতিগন্ধি পুনঃ ভবঙ্গ ইত্যাদিরূপ চিত্তসম্ভ্রম পরিবর্তন করে।

নির্বাণ ।

মান বা তৃষ্ণা হইতে নিষ্ক্রান্তি বা রাগা-
গ্নির নির্বাণের নাম নির্বাণ । নির্বাণ এক-
বর্ষ । উহা অত্যাশ্চর্য্য নহে । “গচ্ছকৃৎসুমান
সিদ্ধতা সন্দৃশ্যেন চ অভাব মত্তং নির্বাণ
মিতি বিপ্লটী পন্নানং বাদং নিষেদতি”
(নিত্যা । ৩) । অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও অসুমান-
সিদ্ধতা দেখিয়া, কেবল অভাব মাত্র নির্বাণ,
একম অশুকবাদ নিষেদ করিতেছেন, ইত্যা-
দিত্ত নির্বাণ যে অভাব মাত্র নহে, তাহা
প্রতিপন্ন হয় । অভিধর্ম্মে নির্বাণকে
অমঙ্গল বা অসংস্কৃত্য দাতৃ বলা হইয়াছে ।
অসংস্কৃত্য দাতৃর অনেক লক্ষণ আছে । নিম্নে
প্রধান কতকগুলি উক্ত হইতেছে—উহা
অব্যাকৃত, কিন্তু বিশাক নহে । সংক্লেষ্ট-
সংক্লেষ্টিক নহে । অবিতর্ক, অপ্চিটার ।
আচরণ্যামী বা অপচরণ্যামী নহে । অপমাণ
(অপ্রমের) । পণীত (পূর্ণ মধুর) । অনি-
য়ত । অজতিত্ব (ইন্দ্রমতিবাতক নহে) ।
অনিদর্শন (চক্ষুরাদির অপোচর) । হেতু
নহে । হেতু বিশমুক্ত ও অহেতুক (হেতু
সকল বাহার সহজানী নহে) । অরূপী
লোকৌত্তর । আগব সংযোজনাদি বিশ-
মুক্ত । অনারম্মণ (আলম্বনশূন্য) । চিত্ত
নহে । অচৈতনিক । চিত্ত বিশমুক্ত ।
চিত্ত সমুখান ও চিত্ত সচল নহে । উপাদান
অল্পাদান (উপাদান ধর্ম্মশূন্য) । ইত্যাদি ।

নির্বাণের লক্ষ্য চারি অর্থা সম্ভার জ্ঞান
আবশ্যক । তাহা যথা—হুঃখ জ্ঞান, হুঃখ
সমুদ্র জ্ঞান, হুঃখনিরোধ জ্ঞান, হুঃখনিরোধ-
গামিনী প্রতিপদের (মার্গের) জ্ঞান ।
“অরিয়া ইমানি পটি বিজতি” অর্থাৎ

বুদ্ধাদি আর্ষোরা ইহা মূলতঃ জামেন বলিমা
ইহাদের নাম আর্ধ্যসত্য ।

হুঃখের যেকোন জ্ঞান হইলে, হুঃখকে
অনবশেষ প্রধান করিবার প্রযত্ন হয়, তাহাই
হুঃখজ্ঞান । নচেৎ শুদ্ধ কথায় জানিয়া
হুঃখের বিষয়ের অরুধাবন করিলে, তাহাকে
“হুকৃৎসুমানং” বলা যায় না । বৌদ্ধপণ্ডিতগণ
নিম্নোক্তপ্রকারে হুঃখ নির্দেশ করেন । জাত
(জন্ম), জরা, মরণ, শোক, পরিদেবন
(বিগাণ), হুঃখ (কামিক পীড়া), দৌঃমর্গস্ত
(মানস হুঃখ) । উপায়স (অত্যন্ত হুঃখজনিত
শেষ) • অপ্রিয়-সম্প্রয়োগ, প্রিয়-বপ্রয়োগ,
‘ইচ্ছিতা লাভ’ । ইহার মধ্যে জাতিই সর্ব-
হুঃখের প্রসূতি “জাতিপ সূতিকং হুকৃৎসু” ।
হুঃখের বাহা উৎপত্তির কারণ, তাহার যথার্থ
জ্ঞান—যে জ্ঞানের দ্বারা হুঃখ সমূলে উচ্ছিন্ন
হয়, তাহাই হুঃখ সমুদ্ররূপ আর্ধ্যসত্য ।

তৃষ্ণা † হুঃখের উৎপত্তি-কারণ । “বাদং

* বুদ্ধ ঘোষ বলেন—শোক ভাজনের
মধ্যে পাক হওয়ার স্থায়, পরিদেব তাহা
হইতে উষ্ণিরা পড়ার মত, আর উপায়স
ভাজনের মধ্যে পরিক্রম পর্য্যন্ত পাক হওয়া ।
জাতি আদি হুঃখ, জরা মধ্যে হুঃখ, মরণ পর্য্য-
বগানে হুঃখ । হুঃখেরনির্বাচন যথা—হুঃ =
কুৎসিত ; খং = তৃচ্ছ । অর্থাৎ অনেক উপ-
দ্রবাদের অধিষ্ঠান ও বালজনের পরিকল্পিত ।

† তহা দ্রুতিয়ো পুরিসোঃ দীঘমজ্জানং
সংসারং । ইট্ট্ঠভাবঞ ঞ্ঠেভাবং সংসারং
নাতিবর্ত্ততি ॥

(সূত্র নিপাত । ৭৪০ শ্লোক)

সমুখ্য তৃষ্ণারূপ বিতীয়া (ভাষা) সহ
দীর্ঘ সংসার-পথে গমন পূর্বক ইষ্টতা-
স্তথা ভাব রূপ সংসারকে অতিক্রম করিতে
পারে না ।

তাহা পোনস্তাবিকা নন্দীরাগ সহগতা তত্র
তত্রাভিনন্দিনী* পৌনর্ভবিকা নন্দীরাগ
(কোন বিষয়ে পুনঃ পুনঃ রাগ স্বথ উদ্ভিত
হইতে থাকে) সহগত সেই সেই বিষয়ে
অভিনন্দিনী তৃত্বাই হ্রঃ সমুদয় নির্দেশ।
তৃত্বা ত্রিবিধ, কামতৃত্বা, ভবতৃত্বা ও বিভব-
তৃত্বা। বিষয়ভেদে তৃত্বা ছয় প্রকার—রূপ-
তৃত্বা, শব্দতৃত্বা, গন্ধতৃত্বা, রসতৃত্বা, স্পষ্টেবা-
তৃত্বা ও ধর্ম (মানস বিষয়) তৃত্বা। এই
ছয় তৃত্বার বিষয়ে কামাবাদবশে যখন
তৃত্বার প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে কামতৃত্বা বলে।

যখন সেই ছয় বিষয়কে শাস্ত মনে
করিয়া তৃত্বার প্রবৃত্তি হয়, তাহা ভবতৃত্বা
(যেমন পাঞ্চভৌতিক, তন্ত্রিয়-সুপনিদান,
নিত্য, স্বর্গলোকে বিধাসীদর তৃত্বা)।

আর যখন সেই ছয় তৃত্বা বিষয়েতে
উচ্ছেদ-দৃষ্টি তাহার। সম্যক্ বিনষ্ট হইবে,
এইরূপ বিখ্যাস) সহগত হইয়া তৃত্বার প্রবৃত্তি
হয়, তাহাকে শিবতৃত্বা বলে। বিধ্বং-
সাবস্থা প্রাপ্তির তৃত্বা।

অভিপর্ষে তৃত্বা বা লোভের অনেক
পর্ধায় আছে। তাহা মোক্ষসার্গগামী সর্ক-
সম্প্রদায়ের লোকেরই জঠেবা বলিয়া এ স্থলে
উদ্ধৃত হইল লোভ—রাগ, সারাগ-অনুদয়,
অনুরোধ, নন্দী (আসোদ পাওয়া), নন্দী-
রাগ, চিত্তের সারাগ, ঠেড়া, মুচ্ছ (ইষ্টবিষয়ে
চিত্তমোহ) অধ্যাশন (গ্রাণ), গেধ
(গুণভূতা) পানিগেধ (সর্কগ্রাণ), সজ,
পঙ্ক (অবসাদ কর), এজা (আকর্ষণ),
মায়। জনিকা (হ্রঃজননী), সঞ্জননী,
সিকণী (সেলাই বা বন্ধনকারিণী) জালিন
(জালাবন্ধকারিণী), সরিং (আশনদী),

বিষা:জ্জকা, সূত্র, বিসতা (বিষয়ে বিসর্গিনী)
আয়ুহনী (বিষয়ার্থ কষ্টপ্রমকারিকা), দ্বিতীয়া
(ভাষ্যার মত সহচারিণী), প্রণিধি
(আকাজ্জা), ভবনেত্রী (জন্ম-মরণকারিণী),
বন, বনপ (সুপান), সংস্রব (ঘনিষ্ঠতা),
স্নেহ, অপেক্ষা (স্নেহজনিত অপেক্ষা),
প্রতিরসু (সদাগ্নিহিত জাতি-কুটুধ), আশা,
আসিংসনা (আর্থিকতা), আসিংসনস্ত
(প্রমত্তভাবে চাওয়া), রূপাশা, শব্দাশা,
গন্ধাশা, রসনাশা, স্পষ্টেবাশা, লাভাশা, ধনাশা,
পুত্রাশা, জীবিতাশা, স্নান্না (লাভ হইলে
বকিতে থাকে), লোভুপা, পুচ্ছঞ্জিকতা
(কুকুরের পুচ্ছনাড়ার মত ভাব); সাধু-
কাম্যতা (স্বার্থের জন্ত প্রিয় হইবার ইচ্ছা),
প্রার্থনা, স্পৃহনা, হ্রঃখমূল, হ্রঃখনিদান
ইত্যাদি।

(ধর্মসঙ্গনি)

তৃত্বার অনবশেষ নিরোধ অথবা অশেষ
বিরাগ না প্রতিনিঃসর্গই (ভাগ) হ্রঃখের
নিরোধ বা নির্দ্বাণ। ইহা শাস্তিসঙ্গণ।
অচ্যুতি ইহার রস বা প্রবাহ। অনিসিত্ত
ইহার প্রতাপস্থান বা অভিমুখতা।†

† বৌদ্ধ পণ্ডিতের। সমস্ত পদার্থকে লক্ষণ,
রস (কৃত্যাসম্পত্তি) প্রতাপস্থান (উপস্থান-
কার এবং ফল) ও পদস্থান দিয়া বুঝান।
তদ্ব্যভীত বিভাগ, নির্দ্বাচন, অর্থ, অর্থোচ্চার
(বহুবিধ অর্থের মধ্যে স্বার্থ নিকাশন),
অনুনাধিকতা, ক্রম, অন্তর্গত পদার্থের ভেদ,
উপমাশ্রুতার সকলের এক বিশিষ্ট ইত্যাদি
প্রকারেও অনেক পদার্থ বুঝান। এইরূপে
বুঝান নাম বিনিচ্চর।

বুদ্ধ যোগ বলেন (বি। ১৬) যে, ভবাগত-
দের উক্তি সিংহের মত; তাহার। স্বর্ধ-
নিরোধের বে উপদেশ করেন, তাহাতে

নির্মাণ অসংকুল ধাতুর লক্ষণে সবিশেষ লক্ষিত হইয়াছে। ইহাকে “অচ্যুত ঋব পদ” বলা হয়। ধর্মপদে উহাকে “পরম সূত্র” বলা হইয়াছে। ঋব পদকে নির্মাণের পদস্থান বলা বাইতে পারে। সম্যক্ দৃষ্টি আদি আর্ধ্য অষ্টাদিক মার্গই হুংখোপ-শমগামিনী প্রতিপদ। তন্মধ্যে চারি আর্ধ্য সত্যের সম্যক্ জ্ঞানই সম্যক্ দৃষ্টি।

সম্যক্ দৃষ্টিসম্পন্নের নির্মাণ বিষয়ে চিন্তের অভিনিরোপণ (সংকল্প পূর্বক সম্যক্ স্থাপন) সম্যক্ সংকল্প।

পূর্বোক্ত বাগ্‌দৃশ্চরিত-বিরতি সম্যক্ বাক্। কারদৃশ্চরিত-বিরতি সম্যক্ কর্ম্মাস্ত (কর্ম্ম)। মিথ্যাঙ্গীব-বিরতি বা নির্মাণ সাধনের অহুকুল ভাবে জীবন বাপন করা

হুংখের হেতু পর্যাস্ত প্রতিপাদন করেন, কেবল ফল মাত্রকে করেন না। আর অল্প তীর্থিকের। কুকুরোক্তির মত উপদেশ করেন। তাহার হুংখনিরোধ ও তাহার উপদেশ করিতে বাইরা কেবল হুংখরূপ ফলের কথাই বলেন, হুংখ হেতুর কথা বলেন না।

কিন্তু হুংখের এই হেতুনির্দেশ ও সমূল-নাশ শুদ্ধ বৌদ্ধদের এক চেষ্টা নহে। সাংখ্যেও আছে, হুংখের আদি হেতু অবিজ্ঞা, তাহার নাশে হুংখের সমূল নাশ হয়। বুদ্ধ যোষ সাংখ্যের বিষয় কিছু জানিতেন। অজ্ঞান প্রকৃতি-পুরুষ বাদে উল্লেখ তাহার প্রমাণ। অতএব সম্প্রদায়ভিত্তিকের ইহা এক নির্দর্শন। অনেক বৌদ্ধও মনে করেন, আর কুত্রাপি আর্ধ্যমত্যা ও নির্মাণমার্গ নাই।

প্রতীত্য সমুৎপাদ অহুসারে তৃকার কারণ বেদনা, বেদনার কারণ স্পর্শ, স্পর্শের কারণ বড়ানতন, তাহার কারণ নামরূপ, তাহার কারণ বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার, সংস্কারের কারণ অবিজ্ঞা।

সমাগাঙ্গীব। † সমাখাগাদিসম্পন্নের বে কোণীজ সমুচ্ছেদের অল্প বীর্ষা, তাহাই সম্যক্ ব্যারাম। অভিধর্মে ইহার এইরূপ লক্ষণ (প্রকৃষ্টি বা পঞ্ক্রান্তি) আছে। চৈতনিক বীর্ষ্যারজ, নিক্রম, পরাক্রম, উদ্ভম, ব্যারাম, উৎসাহ, উৎসোহ (দৃঢ়োৎসাহ) নাম (স্থামন্); ধৃতি (সহিষ্ণুতা), অশিখিল পরাক্রমতা, অনিক্ষিপ্ত হৃদ্যতা (অভয়সংকল্প অনিক্ষিপ্ত ধুরতা (ভার সহিষ্ণুতা), ধুর সম্প্রগ্রাহ, বীর্ষা, বীর্ষোজ্জ্বল, বীর্ষ্য-বল।

বীর্ষ্যবান স্বৃতি সাধনের যোগ্য। অভিধর্মের স্বৃতির এইরূপ লক্ষণ আছে। স্বৃতি=অহুস্বৃতি, প্রতিস্বৃতি (মনে আনা) স্বৃতিস্মরণতা (স্বৃতির স্মরণ), ধারণতা, অগিনাপনতা বা অঙ্গবনতা (মনের ভেসে না থেড়ান—অভ্যক্তরে প্রতিষ্ট থাক), অসম্পোষণতা (তুলিয়া না যাওয়া) স্বৃতি-জ্জ্বল, স্বৃতি-বল।

† শ্রদ্ধা, শীল, বীর্ষা, স্বৃতি, সমাধি ও ধর্ম বিনিস্চয়রূপ যে উপার ধর্মপদে বর্ণিত আছে এবং যাহা যোগ মতের অহুরূপ, তাহাও এই মার্গের অন্তর্ভুক্ত। শ্রদ্ধার সহভাবী সম্যক্ দৃষ্টি ও সম্যক্ সংকল্প। সম্যক্ বাক্, কর্ম্মাস্ত ও আঙ্গীব শীলের সহিত তুল্য। বৌদ্ধদের যে-শীলস্কন্ধ আছে, তাহা বিকৃত বলিয়া উদ্ধৃত হইল না। বস্তুতঃ অহিংসা, সভা, অচ্ছেদ, ব্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ করিলে এবং নির্কণবিরোধী কর্ম্ম ও বাক্য ভাগ করিলে, সমস্ত শীলই আচারিত হয়। বুদ্ধদেব ‘শীলপরিপুরিয়া’ সম্পন্ন ছিলেন, অর্থাৎ পরিপূর্ণ শীলের কোন অঙ্গেরই উহাতে অভাব ছিল না।

স্মৃতিসাধন সমাধির মূখ্য উপায় বলিয়া স্মৃতিপটকে ইহার সম্যক উপদেশ আছে। মহাস্মৃতি-প্রস্থান স্মৃতি ও স্মৃতিপ্রস্থান স্মৃতি দ্রষ্টব্য। উহা সংক্ষেপে উক্ত হইতেছে।—

বোধি পক্ষীয় স্মৃতিপ্রস্থান চতুর্বিধ—
কারামুপশ্চনা, বেদনামুপশ্চনা, চিত্তামুপশ্চনা
ও ধর্মামুপশ্চনা ।

অশুভ, দুঃখ অনিত্যবাদ ভাবনাপূর্বক কারাদিতে অমুপ্রতিভাবে সর্বদা স্মরণ রাখাই স্মৃতিপ্রস্থান ।

শরীর চাতুর্ভৌতিক, অশুচি, কেশ-
অস্থি আদির সম্ভার, ইত্যাদি প্রকারে স্মরণ-
প্রবাহ কারামুপশ্চনা স্মৃতি ।†

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিহরানন্দ আরণ্য ।

† অশুভ ভাবনার দ্বারা কার্যস্মৃতির আমু-
কূল্য (সঙ্গার) হয়। বিনীলক (নীলবর্ণ-
শব), উরুমাতক (ফোলা শব), বিপূর্বক
(গলিতশব), বিচ্ছিন্নক (মধ্যে বিধা-
জীর্ণ), বিখাদিতক) বন্ধায়িতক শৃংগা-
লাদি ভক্ষিত), বিক্ষিপ্তক (টুকরা
২), হতবিক্ষিপ্ত (ছিঁড়িয়া ইতস্ততঃ
ক্ষিপ্ত), লোহিতক (রক্তাক্ত), পুলবক
(ক্রিমিবৃত্ত), অস্থিক (অস্তিপঞ্জর),
এই দশবিধ শব্দকে দেখিয়া তাহা ধ্যান
পূর্বক চিন্তে তদ্বিষয়ক দ্বাঃ উত্তোলন
করিতে হয় ও পরে নিজ শরীরেও
সেই ভাব আনিতে হয়। সেই ভাব
স্মৃতির অন্ততম বিষয়। ইহার নাম অশুভ
ভাবনা। এইরূপ শব্দধ্যান হইতে বোধ
হয় পরে তাত্ত্বিক বুদ্ধদের দ্বারা শব্দসাধনা
প্রথা প্রচলিত হয়।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

এই বিশ্ব যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত,
ইহার সমস্ত ব্যাপারে যে একটা মুশৃঙ্খলা
বর্তমান, একথা এ পর্য্যন্ত কেহ, এমন কি
নাস্তিকেরাও অস্বীকার করিতে পারেন নাই।
নাস্তিকেরা বলেন যে, ঐ নিয়ম প্রাকৃতিক
নিয়ম, উহার মূলে ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলিয়া
কেহ নাই। অজ্ঞাতবাদীরা বলেন যে,
প্রকৃতির নিয়মতা আছেন, কিন্তু তাঁহার
স্বরূপ মানব-বুদ্ধির অগম্য।

জ্ঞানের উৎকর্ষ অপকর্ষের সহিত জগ-
তের সর্বত্রই ঈশ্বরের স্বরূপ সবন্ধে ভিন্ন
ভিন্ন মত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কার্য হইতে
কারণ-অনুমান যুক্তিসঙ্গত। এই বিষের
ব্যাপার পর্যালোচনা করিলে, আমরা কতক-
গুলি সত্য উপনীত হই—যে সত্যগুলি
দেশকাল দ্বারা বাধিত নহে। আমরা
জানিতে পারিয়াছি যে, বাহাকে আমরা
জড় বলি এবং বাহাকে আমরা শক্তি বলি,
ইহারা কেহই ধ্বংসশীল নহে। ইহাদের
রূপান্তর ভিন্ন আমরা কখনও ইহাদের ধ্বংস
দেখি না। বাহা আছে, তাহার কোন
দিন ধ্বংস নাই, এবং বাহা নাই, তাহা
কখনও নাই। বাহা অস্ত নাই, তাহার
আবির্ভাব আমরা কখনও প্রত্যক্ষ করি না,
এবং বাহা অস্ত আছে, তাহার তিরোভাবও
কখন দেখি না। “নাসত্যো বিদ্বতে ভাবঃ,
নাভাবঃ বিদ্বতে সত্যঃ” গীতোক এই সত্যটি
বিজ্ঞানামুদ্বোধিত। সূত্রায় জড় এবং শক্তি,
দ্রুইই অনাদি এবং অনন্ত। তাহার কখনও

সৃষ্ট হয় নাই, কখনও তাহাদের ধ্বংস নাই। আছে কেবল রূপান্তর মাত্র। জড় এবং শক্তি সম্বন্ধে বাহা বলিলাম, তাহা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত। এই যে অট্টালিকার মধ্যে তুমি উপনিষ্ট আছ, তুমি মনে করিতেছ, সে তুমি উহার স্রষ্টা। কিন্তু উহার কোন জন্মটি তুমি সৃষ্টি করিয়াছ? উহার কোন উপকরণটি তুমি সৃষ্টি কর নাই, কেবল রূপান্তর মাত্র করিয়াছ। অগ্নি সংযোগে মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াছ, বৃক্ষাদি খণ্ড খণ্ড করিয়া— ঘাস-বাতারনাদি প্রস্তুত করিয়াছ। ইত্যাদি ইত্যাদি। তোমার শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তা এই সমুদায় উপকরণে বৃদ্ধ হইয়াছে। এই অট্টালিকার সমুদায় উপকরণই বর্তমান ছিল, এবং কখনও ইহার কোন অংশেরই ধ্বংস হইবে না। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলেও, উহার কণামাজেরও অভাব হইবে না, হইবে কেবল উহা রূপান্তরিত মাত্র।

এই বিশ্বের অস্তিত্ব চিরকাল একই ভাবে আছে। আমরা যাহাকে অভাব বা ধ্বংস বলি, সে কেবল রূপান্তর মাত্র। ইহার একটি পরমাণুও সৃষ্ট হয় নাই, বা একটি পরমাণুও ধ্বংস হইবে না। অসৎ হইতে ভাবের অস্তিত্ব নাই, সত্যের কখনও অভাব নাই। এই বিশ্ব আছে, ইহা সৎ, ইহার ধ্বংস কখনও নাই। বিশ্বের সর্বত্র আমরা একটি অনন্ত অবিরাম গতির বিস্তারিতা দেখি; কুক্ষিাপি গতির অভাব দেখি না। অবিরাম গতির সহিত আমরা—অনন্ত রূপান্তরই দেখি। একটি বীজ পূর্নাবস্থার রূপান্তর

মাত্র; উহার জন্ম, উহার ধ্বংসও রূপান্তর মাত্র। রূপান্তর মূঢ়া নহে। জন্ম আগাদের জীবনের আরম্ভ নহে, কিম্বা মূঢ়া উহার অবসান নহে। বিশ্ব অনাদি, অনন্ত; উহার সৃষ্টিও নাই, লয়ও নাই। রবি সন্ধ্যাদি হইতে রস গ্রহণ করিতেছেন; উহা বাষ্পে, বাষ্প মেঘে, মেঘ জলে, জল সন্ধ্যাদিতে রূপান্তরিত হইতেছে। কেবল রূপান্তরের লীলা! কে কাহাকে সৃষ্টি করে, কে কাহাকে ধ্বংস করে? এই বিশ্বের বালুকণাও যদি আত্মস্থানহীন হয়, তবে কি কেবল মানবাত্মাই অমৃত হইতে বঞ্চিত? কখনও হইতে পারে না। যে নিয়ম দ্বারা তাবৎ বিশ্ব পরিচালিত, মানবাত্মা তাহার বহির্ভূত হইতে পারে না।

মনে কর—মানবাত্মার আদি আছে। মনে কর, একটি শিশুর জন্ম হইল, না একটি নূতন মানবাত্মা সৃষ্ট হইল। আমরা দেখি যে, পত্যোক মানবাত্মাই এক একটি বিশেষ ভাবাপন্ন। আমরা শৈশবাবস্থাতেই শিশুদিগের মধ্যে বল, সাহস, জ্ঞান, সৌন্দর্য, পরোপকার বৃত্তি প্রভৃতির অঙ্গুর দেখিতে পাই। এই সমুদায় আত্মা যদি সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে, তাহার জন্মের অঙ্গুগৃহীত। কিন্তু জন্মের ইহাদিগের গতি কেন অঙ্গুগ্রহ করিবেন, তাহার কি কোন কারণ আছে? অকারণ তাঁহার অঙ্গুগ্রহ কেন হইবে? অপর দিকে দেখিতে পাই, কতকগুলি আত্মা মূর্থতা, নৃণংসতা, স্বার্থপরতা, কদাকার, ইত্যাদি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহারা যদি সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা কি জন্মের নিগৃহীত?

অপরাধ ইহাদের প্রতি নিগ্রহের কারণ কি? ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হইলে, তিনি পক্ষপাতিত্ব নোনে হুই হন। যদি ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হন, তাহা হইলে মানবের দায়িত্ব কোথায়? পাপকারীরা বলিতে পারে, আমাদের অপরাধ কি? ভগবান্ আমাদেরিগকে যে ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা তাহাই হইয়াছি। ঈশ্বর মানবাত্মার স্রষ্টা হইলে, তিনি নিখানাদী, পরদায়িত্বমর্ষণকারী, চোর, দস্যু প্রভৃতির স্রষ্টা, স্তরাতঃ মূগতঃ তাহাদের কুকার্য্যে প্রয়োগকর্ত্ত বা নিয়ন্তা হইয়া পড়েন। মানবাত্মা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মের ফল যদি ভোগ না করে, কেবল ঈশ্বরেচ্ছায় যদি পাপকারী বা পুণ্যকারী হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে যোগেচ্ছাচারী বলিতে হয়।

বহুবিধ জাতির ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর কাঠকেও অমুগ্রহ করিতেছেন, কাঠকেও নিগ্রহ করিতেছেন, কাঠকে বিক্রমী করিতেছেন, কাঠকেও পরাজিত করিতেছেন, ইত্যাদি ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন। 'আদম' কি অপরাধ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত নাকি প্রত্যেক মানবাত্মাদারী, এবং তজ্জন্ত বিস্তৃষ্ট আত্মবলিদান দিলেন এবং তাঁহাকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহাদের মোক্ষ হইবে। এইরূপ সমুদায় শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিলে, ঈশ্বর একের অপরাধে অপরাধে দায়ী করেন, এবং একের পুণ্যে অপরাধের পাপমাণ করেন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। সৃষ্টির প্রারম্ভ বিশ্বাস করিলে, ঈশ্বর সৃষ্টির আগে কি করিতেছিলেন? কেহ বলেন যে, ঈশ্বর কেবল মঙ্গলময়, সার

অমঙ্গলের বিধাতা সমুদান। সমুদান এবং ঈশ্বরে আনন্সমান কাল বিবাদ চলিয়া থাকিতেছে তাহা হইলে বস্তুতঃ হুইটি ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায়। তাহা হইলে, ভাল-মন্দের জন্ম কোন মানবাত্মারই দায়িত্ব থাকে না। যাহা ভাল, তাহা ঈশ্বরের; যাহা মন্দ, তাহা সমুদানের। প্রত্যেক মানবাত্মাকে মঙ্গলের ঈশ্বর ও অমঙ্গলের ঈশ্বরের দ্বারা গঠিত, স্বীকার করতে হয়।

ফলকথা এই, ঈশ্বরের প্রকাশনে এক অসীমাত্মা ভূমার হস্ত-ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্," মানবাত্মা তাঁহার অপরিবর্তনীয় এবং মনাতন নিয়মসমুদারে - স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে।

"পাপকারী যথাচারী তথা ভবতি—সামুকারী সামুর্ভবতি—পাপকারী পাপো ভবতি—পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন।" (বৃহদারণ্যক স্মৃতি—৩। ৪। ৫)

প্রত্যেক মানবাত্মাই প্রত্যেক পরমাণুর জায় নিত্য, উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। প্রত্যেক মানবাত্মাই স্বীয় স্বীয় চরিত্রের নিয়ন্তা। তুমি বোগী, অপরাধ তোমার। সুহ পাকিবর যে নিয়ম, তাহা তুমি পালন কর নাই, তজ্জন্ত তুমি দায়ী। তুমি মুর্থ, তুমি জ্ঞানার্জনের চেষ্টা কর নাই, তাই তুমি মুর্থ। তুমি পূর্ণরূপে বেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফল-সমষ্টিতে কতকগুলি গুণবিশিষ্ট হইয়া নব জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং ইচ্ছায় প্রত্যহ তোমার পূর্ণ কার্য্যসমুদারে ফল পাইয়া থাক, এবং দেহাবসানেও পাইবে। আত্মহত্যা করিলেই যে মর্মে করিলে

তোমার নিস্তার আছে, তাগা নহে। যত্ন তোমার যত্ন সংঘটন করিতে পারে না। তুমি অনাদি ও অনন্ত ।

মানবজীবন একটি সময়-ক্ষেত্র; তাই যুগ্মী ঐক্য অর্জনেকে সময়ক্ষেত্রেই—মানব-জীবনের জন্ম-কর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া-ছিলেন। এই সময়ক্ষেত্রে—সামু এবং নিতী-কেব জন্ম, এবং অসামু ও ভীতের পরাজয়। তুমি নীচমনা হও, মনে জানিও, তুমি নিজেই—তোমার জন্ম এই নীচাবাস প্রস্তুত করিয়াছ; তুমি যদি উচ্চমনা হও, মনে করিও, তুমি নিজেই তোমার জন্ম এই মহদাবাস প্রস্তুত করিয়াছ।

জগতে অমঙ্গল কেন? জগতে অমঙ্গল না থাকিলে, মঙ্গল কোথা থাকিত? ব্যাধি না থাকিলে, ঔষধের উপলক্ষ কোথায়? অজ্ঞান না থাকিলে, জ্ঞান কোথায়? যে সাহস, বল, বীর্ষা, পরোপকার, স্বার্থত্যাগ জগতে সময়ের প্রশংসিত হইয়া থাকে, উহাদের বন্দ না থাকিলে, উহাদের অস্তিত্ব কোথায় থাকিত? দুঃখ না থাকিলে, দয়ার স্থান কোথায়? অত্যাচার না থাকিলে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে জ্ঞানের দণ্ডায়মান হইবার সুযোগ কোথায়? দরিদ্রতা না থাকিলে, ধনোপার্জনের প্রবৃত্তি কোথায়? আবার দেখ, অন্ধকারের নিজের অস্তিত্ব নাই, উহা আলোকের অস্তিত্ব মাত্র। অস্তিত্ব কিছু সং নহে। আলোক না থাকিলে অন্ধকার, কিন্তু অন্ধকার না থাকিলে, কাহারও আলোকের জন্ম প্রবৃত্তি হইত না। আলোক হইল, অন্ধকার আর নাই। অতএব আলোকের প্রতি প্রবৃত্তি চাই; কেননা, আলোকের

অভাবে অন্ধকার আমাদেরকে আচ্ছন্ন করিবে। পুণ্যের প্রতি প্রবৃত্তি চাই। কেননা পুণ্যের অভাবে পাপ আমাদেরকে আচ্ছন্ন করিবে। অন্ধকার বলিয়া সতন্ত্র একটা জিনিষ নাই; আমরা প্রদীপ জালিয়া আলোক আনার চায় অন্ধকার আনিতে পারি না। আলোক না থাকিলেই অন্ধকার হইল। মানবাত্মাকে গতির দিকে আকৃষ্ট রাখিতেই—অগতি। ভাবের দিকে আকৃষ্ট রাখিতেই—অভাব।

দরিদ্রতা বলিয়া কোন ভাব-পদার্থ নাই, উহা ঐশ্বর্যের অভাব। ঐ অভাব না থাকিলে, ঐশ্বর্যের উপলক্ষ হইত না।

আমরা কি পরের দোষে কষ্ট পাই না? তোমাকে বিশ্বাস করি, তুমি প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে সর্ব্ববাস্ত করিলে; শিশু অগ্নিতে হাত দিল, হাত পুড়িয়া গেল। অমৃত জ্ঞানে বাহা খাইলাম, তাহা বিব হইয়া আমাকে জর্জরিত করিল। কুষ্ঠরোগীর সেবার আমি কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত হইলাম। এ কি বিধান? আশুনে পুড়িবেই পুড়িবে। জৈশ্বর অগ্নির দাহিকা শক্তি ধ্বংস করিয়া কার্য-কারণের বিচ্ছেদ ঘটাইলে, জগতে জ্ঞান, সতর্কতাবির দিকে কাহার লক্ষ্য হইত? অস্ত শিশু আশুনে পড়িলে পোড়ে না, জানিলে, করজন মাতা শিশুর অগ্নি-সংস্পর্শ সম্বন্ধে সতর্ক হইতেন? কিন্তু একজন শিশুর অনিষ্ট হইতেই সমস্ত পল্লী সাবধান হইয়া গেল। নিরম বাহা, তাহা চিরকালই থাকিবে, তাহার বিপর্যয় হইতে পারে না। তোমার আমার কর্তব্য, সেই নিরমগুলি অবগত হওনা এবং

তদনুসারে কার্য করা। কুষ্ঠরোগীর সেবার যে সাধুর কুষ্ঠ রোগ হইল, তাহার অল্প আমি দুঃখিত, কিন্তু ঐ সাধু স্বয়ং তাহাতে কিছু মাত্র দুঃখিত নহেন। তিনি জানেন যে, তাঁহার শরীর কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত, কিন্তু তাঁহার হৃদয় পবিত্র ও নির্মল। আর যদি তিনি তাহাতে দুঃখিত হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, কতকগুলি রোগ-বীজ এক শরীর হইতে অল্প শরীরে সংক্রান্ত হইতে পারে, এবং তদনুসারে তাঁহার সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার রোগ তাঁহার অজ্ঞান বা অসাবধানতার ফল মাত্র। অজ্ঞানের ফল কেহ ভোগ করিবে না, বিধাতার এই নিয়ম হইলে, জ্ঞানার্জনের প্রবৃত্তি কোথায় থাকিত? সুতরাং যাহাকে আমরা অমঙ্গল বলি, সে এক হিসাবে আমাদের মঙ্গলের অঙ্গ। মঙ্গলের মঙ্গলও বুদ্ধি হেতুই অমঙ্গল। বিপদ মঙ্গলজনক, কেন না, উহাতে আমাদের সাহসের বৃদ্ধি হয়; সতর্কতার শিক্ষা হয়। দরিদ্রতা মঙ্গলজনক, কেন না উহা আমাদের আলস্য পরিত্যাগ করায়। অমঙ্গল আমাদের ঔষধ। ঔষধ খেতে হইলে নিতান্ত কষ্ট-ভিত্তক এবং দুর্গন্ধময়, কিন্তু উহাতে স্বাস্থ্য আনয়ন করে। অমঙ্গলও তরুণ আমাদের গিকে মঙ্গল আনয়ন করিয়া দেয়। বিধের সনাতন নিয়মানুসারে যে কার্যের ফল যাহা, তাহা হইবেই। অজ্ঞানের ফল ভোগ করিয়া আমরা জ্ঞান অর্জন করি। আশুনে পুড়িয়াই আমরা আশুনে হইতে অব্যাহতি পাই।

এই বিধে খামখেরালি ভাবে কিছুই হয় না। অনুক ভাগ্যবান, অনুক হতভাগ্য,

আমরা এইরূপ অনেক কথা শুনি। কিন্তু মানবের ভাগ্য মানবের আয়ত্তাধীন। প্রত্যেকেই কার্যানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে, এবং কাহারও কোনও অবহার হতভাগ্য বা বিষন্ন হইবার ক্রিয়া কারণ নাই। অনিবার্য ও অপরিহার্য কর্মফল-ভোগে দুঃখিত হওয়াই বরং দুঃখের বিষয়।

প্রত্যেক মানবই অনন্তকাল ধরিত্রী অনন্ত জীবনে অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। তিনি কখনও ধনী, কখনও দরিদ্র, কখনও রাজা, কখনও প্রজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। কখনও জলমগ্ন, কখনও অগ্নি দগ্ধ, কখনও বাধি গন্ত, কখনও কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইতেছেন। তিনি শৈশবে, যৌবনে, প্রৌঢ়ে এবং বার্দ্ধক্যে মরিয়াছেন; হিংসা-বিখাসবাতকাহি দ্বারাও তিনি লালিত হইয়াছেন; বজ্রপাত, জল-প্রাণ, ভূমিকম্পের হস্ত হইতেও জ্ঞাণ পান নাই। তিনি কোনও জীবনে অসত্য সমাজে, কোন জীবনে স্নগতা সমাজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শীতপ্রধান বা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশ প্রভৃতি অনেক দেশই তিনি দেখিয়াছেন। অরণ্য এবং জনাকীর্ণ নগর, উভয়ই তাঁহার আবাসস্থান হইয়াছে। তিনি ক্রীতদাস এবং দাসাধিপতি, দুইই হইয়াছেন। তিনি গৃহী ও বটে, সন্ন্যাসী ও ধটে। পাপী-পুণ্যবান, সুখী-দুঃখী, জেতা-জিত, হত-হস্তা, জ্ঞানী-অজ্ঞানী ইত্যাদি সকলই হইয়াছেন। জন্মজন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান অধিকার করিয়াছেন।

যাহাকে আমরা দুঃখ বলি, তাহাতে দুঃখিত হইবার কারণ নাই। উহা অরুচ

জীবনের সচ্ছ সচ্ছ অবস্থার মাপা অবস্থাস্থর
মান। তুংপ অনেক সময় সুখ ভটতে কি
ভাল নয় ? পরোপকারে যে হুঃখ হয়, সে কি
পরোপকারমুক্ত সুখ ভটতে ভাল নয় ? তুংপ
মামুস নগীরান্ তম, তাহার জদর পশত
তম, কিন্তু স্বখে মামুসকে ভূর্দল করিয়া
ফেল, জদর : কুচিত করে তুংপে মামুসকে
শ্রমশীল করে, কর্ণঠ করে, পরের হুঃখ
মোচনের পাবুতি কমাঃ ; স্বপ মামুসকে
অলস এবং নার্বণত করে। নাজাব ঘরের
ছেলে তওয়ার চেয়ে, দরিদ্রর শিশু সচ্ছ
সুঃখ কি ভাগ্যান্ নচে ?

এই বিশ্বের এই নিয়ম সে, তোমাকে
সচ্ছ সচ্ছ নামা নিয়, আপদ বিপদের সমা
দিয়া জীবন বাতা নির্মিত করিত হইবে।
এমন কোন বীর আছে যে, তিনি রণ ক্ষেত্রে
বিপদের কাগনা না করেন ? নিপদ না
থাকিলে, নীরজের পত্রিচারর সম্ভাবনা
কোপায় ? মানবজীবনও কল্পণ। জুংপ-
ক্লেশ, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, শীত গ্রীষ্ম, কুপা-
তুম্বা, আদি ব্যাদি, রোগ-শোক, মিথ্যা-
প্রবন্ধনাদি দ্বারা তিনি পরীকিত হইয়া -
অগ্নি-দগ্ধ স্তবর্ণর জ্বর নিস্তক হইয়া থাকেন।
মামুস, মামুস ভটতে গেলে, সচ্ছ সচ্ছ
বিপদ অতিক্রম করিতে হয়। আজ যে
তোমার প্রভু তোমাকে বিনা অপরাধে-
বেজাবাত করিয়াছে, উহার কারণ কি তাহা
জান ? উহার কারণ সে, তুমি কখনও
কাহারও প্রতি এতরূপ নৃশংস ব্যবহার
করিতে না। 'ইহা তোমার শিক্ষারই
ফল।

মানবজীবনের হুঃখ দুনীভূত করিবার

দুইটি উপায় দৃষ্ট হয়। উহার একটি উপায়
হচ্ছে হুঃখকে অনঙ্গীকার করা, আর একটি
হচ্ছে হুঃখকে জয় করা। ইহা বুদ্ধিতে
গেলে, আত্মদের সর্ক প্রথমে টহা বুঝা চাই
যে, মামুসও যেরূপ আত্মস্থবিনীন, বিশ্বের
তাবৎ পদার্থও এরূপ। পশু পক্ষী, কীট-
পতঙ্গ, বৃক্ষ-গতা, প্রত্যেক সজীব পদার্থের
আত্মা আছে। একটি কীটের আত্মা আমার
আত্মা ভটতে যংটুফ নিঃস্ন, আমার আত্মাও
মচাপুরুগদিগের আত্মা ভটতে তত নিঃস্ন।
যত নিঃস্ন দিকে চাই, ততই আমরা দেখিতে
পাই তুংপ কম। একটি পশুর ভালমন্দ
বিচার নাট; শিক্ষা, ধর্ম, রাজ্যাশায়ন, মান,
অপমান ইত্যাদি লইয়া তাহাদের কোন
আন্দোলন নাট। তাহার পাপ পুণোর
কোন জ্ঞান নাট, ভবিষ্যতের জন্ত তাহার
কোন চিন্তা নাট। আহার-বিহার এই
দুইটি জিনিষ লইয়া তাহাদের সমস্ত জীবন।
পশাদির নিঃস্নব জীবন হুঃখ আরও কম।
বৃক্ষ গতাতির জীবন অনন্ত শান্তিগয় বলা
যাইতে পারে। তাহাদের কিছু করিতে
হয় না, কোন ভাবনাও নাট, বৃক্ষাদির
আয় হুসিও বাহু শাস্তি লাভ করিতে পার,
বাহু হুঃখ অনঙ্গীকার করিতে পার, কিন্তু
তাহা হইলে তোমার নিঃস্ন বাইতে হইবে।
এতদূর নিঃস্নে বাইতে অনেক জীবন লাগে,
কিন্তু যাওয়া যায়। আমরা প্রত্যহ মামুস-
দেহে পশাদির আত্মা প্রত্যক্ষ করি।
জন্ম-কন্মাস্তরে এরূপ ভাবে অবরোধ করিতে
করিতে আত্মদের আত্মা পশাদির দেহ
অবলম্বন করে। নিঃস্নগামী আত্মার পুনর্কার
উর্দগামী হইবার অনেক সুযোগ প্রাপ্ত

হয়, প্রত্যেক পদাঙ্কনে-সে বুঝিতে পারে যে, নিম্নে যাইতেছে। সে বুঝিতে পারে যে, তাহার অর্ধের দিকে প্রবৃত্তি কম হইয়া অর্ধের দিকে প্রবৃত্তি অধিক হইতেছে। ইহা বুঝিয়াও যদি সে নিম্ন দিকেই যাবমান হয়, তাহা হইলে তাহাকে আর কে উদ্ধার করে? তুমি সুখ চাও, ঐ যে হৃষ্ট পৃষ্ট বস্তুটি দেখিতেছ, ও দেখ দেখি কেমন সুখী! ঐ যে সুন্দরী ললনার ক্রোড়ে সারসেম দেখিতেছ, দেখ দেখি ও কেমন সুখী! ঐরূপ দেখ অবলম্বন করিয়া কি তুমি সুখী হইতে চাও? তুমি যদি কেবল ঐরূপ সুখই চাও, তাহা হইলে তোমার পশু-জীবন কামনা করিয়া পশুচিত কার্যা করিতে হয়। খণ্ড সর্পের জ্ঞান ফুর হইলে, তুমি সর্পজীবন লাভ করিতে পার। একেবারে নিষ্ক্রিয় হইতে ইচ্ছা করিলে, ফল-ফুল-মুশোভিত তরু-লতায় রূপান্তরিত হইতে পার। সুতরাং দ্রুত অঙ্গীকার ইচ্ছা না থাকিলে, তোমার নিম্ন দিকে যাইতে হইবে। যে বস্তু বড়, তাহার তত অধিক দ্রুত। মানবাত্মা সর্বাপেক্ষা বড়, তাহার দ্রুতও সর্বাপেক্ষা অধিক।

বড় হইতে হইলে, দ্রুতকে জয় করিতে হইবে। তুমি যদি মৃত্যুকে ভয় না কর, তাহা হইলে তুমি উহাকে জয় করিয়াছ। মৃত্যু কি? মৃত্যু পরিবর্তন ব্যতীত কিছুই নহে, এবং ঐ পরিবর্তন অপরিহার্য। ভয় করিলেও উহার হস্ত হইতে জ্ঞান নাই, এই জ্ঞান অগ্নিতেই আর মৃত্যুর ভয় থাকে না। মৃত্যুতে অমঙ্গল কোথায়? মৃত্যুর ভয়ই মৃত্যুতে এক মাত্র অমঙ্গল।

আমরা গিরগনের মৃত্যুতে শোকে বিহ্বল হই, কিন্তু আমরা যদি জানি যে, মৃত্যু মৃত্যু নহে, তাহা হইলে আর আমরা দুঃখে অভিভূত হইনা। বাহাতে দুঃখ না আসে, তাহা করা যাইতে পারে; আসিলে, উহার প্রতিবিধান করা যাইতে পারে। যে স্থলে প্রতিবিধান করা না যায়, সে স্থলে উহা অনিবার্য, এই জানে বীরের জ্ঞান উহা সহ করা যাইতে পারে, এবং ইহাও নিশ্চয় যে, উহার অবমানও অনিবার্য। মানবজীবনের বীরত্বে অধিকারী হইবার অল্প সেকন্দের সাহ বা নেপোলিয়ান হইবার প্রয়োজন নাই; প্রত্যেক মানবই তাহার কুটীরে বসিয়া বীরত্বের অধিকারী হইতে পারে।

মাহুয যে বাহা চায়, সে তাহাই পায়। যে বেক্রপ হইতে চায়, সে সেইরূপ হইতে পারে। “বাদৃশী কামনা যন্ত সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।” তুমি একেবারে জড়ের জ্ঞান শাস্তি চাও, উহা পাইতে পার; কিন্তু তোমার নিম্নের দিকে যাইতে হইবে। আবার তুমি উর্দ্ধগামী হইতে চাহিলে, নিশ্চয়ই উঠিতে পারিবে। নিম্ন দিকে যেক্রপ গীমা নাই, অর্থাৎ যেক্রপ অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিম্ন দিকে যাইতে পার, তজ্রপ উর্দ্ধ-দিকেরও গীমা নাই; অনন্তকাল পর্য্যন্ত উর্দ্ধদিকে উঠিতে পার। নিম্ন দিকে যাওয়া সহজ, হাত-পা ছাড়িয়া দিলেই নিম্নে যাওয়া যায়। উর্দ্ধদিকে যাওয়া সহজ নহে। “দুর্গম-পথং কবরো বদন্তি।” যে গমুদার তত্তদর্শী মহর্ষিগণ উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছেন, তাহারাই বলেন যে, ঐ পথ বড়ই দুর্গম। পথ দুর্গম

বটে, কিন্তু বস উঠ, ততই জানক। “কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে” ? অত-এব “উদ্ভিষ্টত জাগ্রত প্রাপ্য বরণ নিবোধত কুরন্ত ধারা নিশিতা তুরভারা দুর্গমপথন্তং কবয়ো বদন্তি।” অসীম বিশ্বের মাঝে—মনে হয়, মানব একটি ক্ষুদ্র জীব; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মানবের শক্তি অসীম। তুমি খতই দরিদ্র হওনা কেন, ইচ্ছা করিলে তুমি পূর্ণ সমুদ্রের অধিকার করিতে পার। এমন কোন ঐর্ষ্যা নাই, বাহা তোমার আরম্ভাধীন হইতে পারে না। এই বিশ্ব তোমার জন্ত, তুমি ইহার স্বাধিকারী, ইহাই তোমার সিংহাসন; তুমি ইহার রাজা। এই বিশ্বে এমন কোন রহস্য আছে, বাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য ? এমন কোন বাধা আছে, বাহা মানব পরাজয় করিতে অক্ষম ? হে মানব ! তুমি এই বিশ্বে অজয়ের।

ঐ যে বড় বড় নদী, সরোবর, সমুদ্র, পর্বত, প্রান্তর, বন দেখিতেছ, উহাদের কি কোন শক্তি আছে ? উহারা মানবের পদ-তলে সৃষ্টিত রহিয়াছে। মানব উহাদের জেতা। মানব বুদ্ধি-বলে, আকাশের তারার—কেবল গণনা নয়, তাহাদের আকার-প্রকার গতি আদি পর্যন্ত বলিয়া দিতে পারে। ঐ যে অনাবৃত্ত কুবক-বালক রাস্তার ধূলায় খেলা করিয়াছে, ও জড় হিমালয় অপেক্ষাও বড়।

আগুনকে নগণ্য জ্ঞান করিয়া, মানবের ত্রিরমাণ হইবার যুক্তি কোথায় ? কাপী বা রোম, বেবিলন্ বা কার্থেজ ত সেদিনকার, মানবের শক্তি-সমুদ্র; কিন্তু মানবত-অনন্ত-কালের। বেদ বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল, তাহারা ত মানবের শক্তিরই পরিচয়

দেয়। মানবাত্মার উন্নতি-অবনতি মান-বাত্মারই কর্তৃহাধীন। তাঁহার ভাগ্য তাঁহার নিজেরই হস্তে। তিনি নিজেই তাঁহার প্রভু। তিনি স্বরাট। উন্নতমনার রাজ্য দিগন্ত-বিস্তৃত। বস্তু দূর চিন্তা ও শ্রেয় পৌছিতে পারে, আত্রকন্তব পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য। নীচমনার রাজ্য অতি ক্ষুদ্র, সার্কি তিন হস্ত দেহের বাহিরে আর তাঁহার কোন রাজত্ব নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলে, তিনি তাঁহার অধিকার বিস্তৃত করিতে পারেন। যদি তিনি রাজ্যচ্যুত করেন, সে তাঁহারই দোষে। জগতে আত্মা তিন্ন আত্মার শত্রু নাই। “আটম্বব হাত্মনো বহুরাটম্বব রিপূরাত্মনঃ”। তুমি একে ওকে শত্রু মনে কর কেন ? তুমি নিজেই তোমার শত্রু। তোমার আর কোনও শত্রু নাই। চৌর তোমার দ্রব্য চুরি করিল, তুমি মনে করিলে, তুমি হারিলে, চৌর জিতিল; বস্তুতঃ তাহা নহে। চৌর তুম্বারা তাহার নিজের বাহা চুরি করিল, তাহা টাকার পাওরা বার না। অর্থ আজ আছে, কাল নাই; কিন্তু চৌরের আত্মার যে সদগুণ অগহত হইল, তাহা প্রাপ্ত হওরা নিভান্ত সহজ নহে। প্রভুর নির্ভর বেত্রাঘাতে তোমার শরীর অর্জরিত, কিন্তু তোমার শরীরের বেদনা কণহারী; প্রভুর যে আত্মা ক্ষত বিক্ষত হইল, উহাকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে অনেক দিন লাগিবে। তোমার একমাত্র শত্রু অজ্ঞান—অবিদ্যা। জানই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হওরা চাই। যে জ্ঞানে সৃষ্টির সূত্রাৎ থাকে না, ভয়ের ভয় থাকে না, সেই জ্ঞান তোমার অধিকার করা চাই। যদি বলে কর যে, বৃষ্টি, বৃষ্টি

ক্রান্তি ভোমাকে জ্ঞান দিবেন, সে ভোমার জন্ম। তুমি নিজেই ভোমার জ্ঞানকর্তা; আর কেহ ভোমাকে জ্ঞান দিতে পারে না। “মন এব মহুস্তাণং কারণং বহুসোকরোঃ” ইহা নিশ্চয় জানিও যে, ভোমার রাজ্য ভোমার অভ্যন্তরে, ভোমার বাহিরে নহে। অভ্যন্তরের রাজ্য রক্ষার জন্য গোঁরা পল্টুন্ চাই না; শক্রতা—বিধ্বাসঘাতকতার কোন ভয় নাই। ভোমার চিরকাল বৃদ্ধ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু ভোমার শত্রু সব ভিতরে; বাহিরে ভোমার কোন শত্রু নাই। তুমিই ভোমার শ্রমী, পালক ও সংহারক। তুমিই স্বর্ণ সৃষ্টিকর, তুমিই নরক সৃষ্টিকর। স্বর্ণ-নরক কবি-লক্ষণা নর, উহারাই ভোমার ভিতরে, উহারাই ভোমার সৃষ্ট। তুমি ইচ্ছা করিলে, চিরকাল সজে সজে স্বর্ণ রাখিতে পার। আবার ইচ্ছা করিলে, প্রাত্যহিক নরকভোগে সজ্জাবিত। প্রতিদিন অন্ততঃ একবার নিজেকে পরীক্ষা করিয়া দেখ বে। ভোমার ভিতর নরক কতটুকু স্থান বা স্বর্ণ কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বর্ণের সীমা বৃদ্ধি কর; নরক ক্রমে ছোট হইয়া যাইবে। ভোমার পাশের ফলই ভোমার নরক, ভোমার পুণ্যের ফলই ভোমার স্বর্ণ। নাস্তিক বলে, পিতা-মাতার শরীর লইয়া সন্তানের জন্ম; ঠাণ্ডাদের প্রকৃতিই তাহার প্রকৃতি; কিন্তু বাহাকে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে তুমিষ্ট হওয়া বলি, উহাই যদি আত্মার প্রথম জন্ম হইত, তবে সে কথা খাটিত। ভোমার পাপ-পুণ্যের জন্য ভোমার পিতা-মাতা হারী হইলেন, তাঁহাদের পিতা-মাতা হুতরাং

তাঁহাদের পাপ-পুণ্যের জন্য দারী। এইরূপে কোন আত্মারই নিজের দারিদ্ৰ থাকিল না। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, আত্মা অজ এবং প্রত্যেক আত্মা যে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া, আত্মা অন্য সমস্তগোত্রান্ত আত্মা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। যে চোর, আজীবন চৌর্য্যে বাহার আসক্তি, দেহাবসান হইলে, তাহার আত্মার চৌর্য্যাসক্তি হেতু ঐ চোর-সানীপোচ্ছাই বলবতী হওয়ার, আত্মা চোর-গৃহেই জন্ম গ্রহণ করিবে। কিন্তু তৎপরে প্রতিপদে তাহার চৌর্য্য পরিত্যাগের উপায় উপস্থিত হয়; অথচ তাহা সবেও যদি সে চৌর্য্য ব্যাপারে নিরন্ত থাকে, তাহা হইলে সে নির্য দিকেই যাইবে এবং ক্রমে হরত দস্যুগৃহে জন্ম গ্রহণ করিবে। সাধুর ঘরে সাধারণতঃ সাধুই জন্ম গ্রহণ করে, অসাধুর ঘরেই অসাধু। কিন্তু অসাধুও ইচ্ছাবলে পুনর্বার সাধু হইতে পারিতে পারে; একটি সাধুও কৰ্ম-দোষে অসাধু হইতে পারে।

এই আত্মা শরীরাত্মিক পদার্থ। শরীর ইচার বাসস্থান মাত্র। আত্মা তাহার নিজ গোপনযোগী শরীর গ্রহণ করে। কিন্তু এ বিষয়টা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা এই বিশ্বে সর্বত্রই পরিবর্তন দেখি। কিন্তু সর্বত্রই পরিবর্তনই একটি অনন্ত নিরম-শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত। এখন দিন আছে, একটু পরেই রাত্রি হইল; এখন জাগ্রত আছি, একটু পরেই নিদ্রিত হইব; এখন শীত, কিছু দিন পরেই গ্রীষ্ম আসিবে। এখন বেচে আছি, দুই দিন পরেই মরিব।

আর দেখ, প্রেমের পরেই বিশ্রাম; হৃৎকের পরই সুখ; যুদ্ধের পরই শান্তি। আবার দেখ, ঐ যে গুরো পোকা বা গুটি পোকা মাটিতে বেড়াইতেছে, উহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, উহা দেখিলেই তোমার মনে হয়ত একটা সুগার ভাব আসে; কিন্তু ঐ পোকা কোন বুক আশ্রয় করিল, উহার শরীরের পরিভ্রাজ্য নির্ঘাস দ্বারা নিজেকে রক্ষ করিল, কিছু দিন পরে একটি সুন্দর প্রজাপতি হইয়া বাহির হইল। তখন তুমি হয়ত উহাকে ধরিবার জন্য লালসায়িত! শিশুরা প্রজাপতির সৌন্দর্য্য দেখিয়াই উহাকে ধরিতে ধাপিত হয়। প্রজাপতি পূর্নজন্মে গুটিপোকা ছিল, গুটি পোকাই পরজন্মে প্রজাপতি হইল। যে কখনও গুটি পোকা দেখে নাই, যে তাহাকে ক্রমশঃ শরীরের নির্ঘাস দ্বারা গুটি প্রস্তুত করিতে দেখে নাই, এবং তৎপরে ঐ গুটি হইতে প্রজাপতি হইয়া বাহির হইতেও দেখে নাই, তাহাকে প্রজাপতি এবং গুটিপোকা যে এক, তাহা বিশ্বাস করান কঠিন। কিন্তু এই ব্যাপারটি দেখিতে দেখিতে অনেকে এই রূপান্তরের বিষয় অবগত আছেন। প্রজাপতির ভিতরেও যে আত্মা, ঐ পোকটির ভিতরেও সেই আত্মা। একই আত্মার দুইরূপ দেহ অবলম্বন করা—প্রত্যক্ষ করা গেল।

শরীর আত্মার আশ্রয়স্থান; কিন্তু শরীরের মধ্যে দিয়াই আত্মার গুণ ফুটিয়া বাহির হয়। তোমার শরীরটি বেশ, তুমি দেখিতে বেশ সুন্দর; কিন্তু তুমি যদি 'বদমাশ' হও, তোমার ঐ সুন্দর চেহারার মধ্যস্থিতও তোমার 'বদমাশের' ফুটিয়া

বাহির হইবে। তুমি কদাকার, কিন্তু তুমি যদি পুণ্যবান হও; তোমার আত্মার জ্যোতিঃ তোমার কদাকার দেহকেও জ্যোতিঃময় করিবে। আমরা সুন্দর দেহের মধ্যে এই সংসারে মিথ্যা কপটতা প্রভৃতি সুক্লান্ত রাখিয়া—অজ্ঞ লোকের নিকট মাধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাই। কিন্তু মৃত্যু অন্তে—আমাদের দেহাবসানের পরে, আমাদের আত্মা ঢাকার কোন আবরণ থাকে না। আবরণটা পড়িয়া গেলে, তখন প্রত্যেক আত্মাই তাঁহার সীম নীম রূপে দৃষ্ট হন। শরীররূপ আবরণ চলিয়া গেলে, দেখা যায় যে, কোন মানবাত্মা হয়ত ব্যাক্ররূপ ধারণ করিয়াছে! এই আত্মা পূর্নজন্মে ব্যক্তের জন্মই কার্য্য করিতে করিতে সে ব্যাক্রাত্মা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু মানবদেহে থাকার জন্মই সে মনুষ্য-সমাজে বাস করিতে পারিত। মানবদেহাবসান হইলে, সে দেখিল যে, সে ব্যাক্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যাক্রাত্মা মানুষের ঘরে জন্ম লইয়া কি সুখ পাবে? সে তাহার সমজাতীয় আত্মার সান্নিধ্য চায় এবং সুতরাং ব্যাক্রী পরিত্যক্ত করিবার জন্মই তাহাকে সুন্দরবনে ব্যাক্র পিতা-মাতার জন্ম গ্রহণ করিতে হইল। কেহ যেন মনে না করেন যে, এ কেবল কল্পনা। প্রত্যেকেই যেন নিজে নিজে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখেন—তাঁহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রতি মূহুর্তে আমাদের আত্মা হয় উর্জগামী—না হয় নিম্নগামী হইতেছে। এখনই যদি তোমার শরীররূপ আবরণ ফেলিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তোমার ভিতরের জিনিষ লব বাহির হইয়া পড়িবে। শরীরটাকে আত্মার

মুখস্বলা যাইতে পারে। মুখস্ পরিয়া মাছেব
 যিবিয়া নাচে, সে সময় কেহ কাহাকেও
 চিনিতে পারে না; মুখস্ খুলে ফেলিলে বড়ই
 লজ্জা হয়। 'অমুক ব্যক্তি আমার সম্পূর্ণ
 অপরিচিত, তাহার কাছে এই কথাটা
 বলিয়া ফেলিয়াছি।' আমরা এখন মন
 মুখোস পরে আছি, কেহ কাহাকেও চিনিতে
 পারিতেছি না। কোন কোন সময়ে হয়ত
 মুখসের ভিতর দিয়া মানুষটাকে 'চেন চেন'
 করিতেছি, কিন্তু ঠিক বুঝিতে পারিতেছি
 না। মুখোস পরে অনেক কুংসিত বি'দ
 সুন্দরী সজেছেন। অনেক যথার্থ সুন্দরী
 হয়ত কদাকার মুখোস পরে কুংসিত দেখাই-
 তেছেন; আসরাও তজ্জপ—দেহকণ মুখস
 বা খোলস্ দ্বারা আমাদের স্বরূপ ঢাকিয়
 রাখিয়াছি। যতক্ষণ মুখোস থাকে, ততক্ষণ
 প্রভারণা করা যায়, মুখোস পড়ে গেলে,
 স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে; তখন আর কেহ
 কাহাকেও প্রভারণা করিতে পারে না।

মৃত্যুই আশ্রয় মুখোস খসাইয়া দেয়।
 যেই মুখোস পড়ে গেল, তখনই কে ভাগ,
 কে মন্দ, ধরা পড়ে গেল। এখানে হয়ত
 বাহার বিকলাঙ্গ দেখিয়া তাহা হইতে দূরে
 বাটতেছি, সেখানে তাহার বিকলাঙ্গ-মুখোস
 পড়িয়া গিয়াছে, দেখি যে—উহার স্থলে
 লাবণ্যসর—জ্যোতির্শ্ময় মূর্তি! এখানে হয়ত
 বাহাকে অসামু বলিয়া চিরকাল নিন্দা করিয়া
 আসিয়াছি, হয়ত দেখিব—তিনিই যথার্থ
 সাধু। আবার হয়ত যে ভঙকে সামু বলিয়া
 সম্বাদ করিয়া আসিয়াছি, নানাবিধ পাণে
 তাহার আত্মা কলঙ্কিত; ঢাকিবার মো নাই;
 খোলস্ পড়িয়া গিয়াছে! এখানে যে অপরাধী

বলিয়া হয়ত কাচাগারে গেল, সেখানে
 গিয়া দেখিব সে নির্দোষী—এবং যথার্থ
 দোষী তাহার নিজ অপরোধের কলঙ্ক দ্বারা
 ঘোষণা করিতেছে, 'উ'ন নির্দোষী, আমিই
 দোষী।' এখানে আমরা মনের পাপ ঢেকে
 রাখি। মনে মনে কত জীর সতীভ হরণ
 করি, কত লোকের ধন অপহরণ করি,
 কত লোক হত্যা করি, এমন কেহ জানিতে
 পারে না; কিন্তু পাতোক কার্যের জ্ঞান
 আমাদের পাতোক চিন্তার দ্বারাও আত্মা
 উন্নত না অন্নত হয়। কেহ মনে মনে না
 করেন যে, অন্তরে বা বাহিরে কোন প্রকার
 অজ্ঞান কবিতা কেচ সারিধা যাইতে পারি-
 বেন। দেহাবসানেই আমাদের যথাযথ
 পরীক্ষা হইয়া আবার তদুন্নয়নী নূতন দেহ
 ধারণ করিতে হইবে।

(ক্রমঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

“কর্মকার-বৈশ্যতত্ত্ব”।—সঙ্গীত
 ‘কর্মকার’ জাতির বৈশ্যতত্ত্বপ্রতিপাদক পুস্তক।
 “বঙ্গভূমি” পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক
 শ্রীচরমিত লাল রায়-প্রণীত। শ্রীমন্তোক্ত
 নাথ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০
 আনা। শ্রীমান হরমিত লাল আসাদের
 মেহাস্পদ ব্যবক, বঙ্গসাহিত্যের অমুরাগী
 সেবকও মূললেখক। ইনি ব্যবক দক্ষতা
 সহকারে শাস্ত্র বুদ্ধি-সমাবৃত্ত বিংশতি
 প্রকার প্রমাণ প্রয়োগে বঙ্গীত-কর্মকার

জাতির বৈশ্বিক প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার্য। গ্রন্থকারের বিচার, গবেষণা ও লিপিপত্রাজলতার বিশিষ্ট পরিচয় এই পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিবিধ বহুশিল্পকার—বুদ্ধাজ্ঞকার কর্ম-কার জাতি দে সমাজের অভাবশুকীয় ও আদরনীর অঙ্গ, তাহা অশুভ স্বীকার্য। এই জাতির জাতীয় উন্নতি সাধনে উত্তম সাহিত্যিক সহায় স্বরূপ এই পুস্তক খানিক এই জন্তই আমরা আদৃত দেখিতে ইচ্ছা করি।

বঙ্গালচরিতম্ ।—বঙ্গ “বঙ্গালী আমলের” বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি শ্রীযুক্ত গোপাল ভট্ট বিরচিত সঙ্কৃত ছন্দামুগত শ্লোকবদ্ধ পঞ্চগ্রন্থ। প্রাচীন সকল গ্রন্থই প্রায় মুখহ রাখার সুবিধার জন্য পত্রপ্রাপ্ত করা হইত। এখনকার মত তখন ছাপাখানার ছড়াছড়ি ও পুস্তক প্রকাশের বাড়ি-বাড়ি ছিল না। একখানি গ্রন্থ অতিকষ্টে জুগেথক দ্বারা প্রতিলিপীকৃত (নকল) করা হইত। তবে সঙ্গর করা হইত। কোন গ্রন্থের কোন একটা কথা আলোচনার আবশ্যিকতা হইলেই অননি সহজে তাহা পাওয়া যাইত না; কারণ মূল গ্রন্থ বড় বিরল ও দুর্লভ ছিল। এই জন্তই তখন মুখহ করিয়া রাখার বিশেষ আবশ্যিকতা ছিল। কাজেই গ্রন্থকারগণ ও ব ব গ্রন্থাদি স্বতাবতঃ পণ্ডে গাঁথিয়াই প্রকাশ করিতেন। তুর্তীয় কঠোর পণ্ডিত-জ্যোতিষ প্রকৃতি শাস্ত্র ও পণ্ড-শ্লোকাবলীতে গাঁথা। “বঙ্গালচরিত” গ্রন্থে

বঙ্গীর ব্রাহ্মণ, কারহ, বৈশ্ব, এই প্রধান জাতিজর এবং অস্তান্ত ভট্টবৈশ্ব, মুন্ড ও সঙ্করনর্ণ সমুদয়ের উৎপত্তি, বৃত্তি ও কুল-নির্নয় এবং বংশের বিভাগ ও বিতৃতি প্রকৃতির বিবরণ ইহাতে বিশদরূপে বর্ণিত হইরাছে; এই জন্ত ইহাও মুখহ রাখার বিশেষ প্রয়োজন। তৎকালীন কুলচার্য্যগণ মুখে মুখেই সকল কুলতত্ত্ব বিবরণ করিতেন; কেননা প্রাচীন ও তাৎকালিক কুলগ্রন্থ নিচয় সমস্তই সহজে মুখহ রাখার উপায় স্বরূপ পঞ্জরচিত শ্লোকাবলীতে প্রথিত ছিল।

শ্রীমৎ গোপাল ভট্ট বিরচিত এই “বঙ্গাল-চরিত” গ্রন্থ কিন্তু বাস্তবিক বঙ্গালের কার্য ও জীবন-বিবরণী বিশেষ কিছু নাই। উহা কেবল “বঙ্গালী আমলের” বঙ্গীর জাতি-কুল-সমূহের বিস্তৃত বিবরণে পূর্ণ; কিন্তু এই পুস্তকের “পরিশিষ্ট” রূপে শ্রীযুক্ত কনি আনন্দভট্ট রাজা বঙ্গাল সেনের জীবন-চরিত লিখিয়াছেন। বঙ্গালের সমসাময়িক গোপাল ভট্ট রাজতরে বঙ্গাল রাজার সমস্ত গর্হিত গুহকার্য্যগুলির বিবরণ করিতে পারিয়াছিলেন না বলিয়া, বিশেষ কিছু ইচ্ছা করিয়াই লেখেন নাই; কিন্তু তাঁহার মূল উদ্দেশ্য তাৎকালিক জাতি-বিবরণ প্রকাশ, তাহা তিনি প্রয়োজনস্বরূপ প্রাক্রম ও বিশদভাবেই রচনা করিয়াছেন। তাহার অনেক পরে বঙ্গালী ভর বিরহিত আনন্দ ভট্ট বঙ্গাল-জীবনী লিখিয়া, মূল “বঙ্গাল-চরিত” গ্রন্থের শেষে সংস্কৃত করিয়া দিয়া-ছিলেন। কলে মূল গ্রন্থের এক প্রধান অভাব-পূরক হওয়াতে উহা বহুকাল হইতেই মূলগ্রন্থীকৃত হইয়া চলিয়া আসিতেছে।

গ্রন্থখানি বাস্তবিক অতি প্রয়োজনীয়, অগচ অতি হুল্লত ছিল। সুপণ্ডিত শ্রীবৃদ্ধ শশি-ভূষণ ভট্টাচার্য্য ইহার বঙ্গভূবাদ করিয়াছেন। প্রাৰ্থিতনামা পণ্ডিত শ্রীবৃদ্ধ হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় উহা সংশোধন পূৰ্ব্বক প্রকাশিত করিয়াছেন। অজ্ঞবাদের ভূমিকার এই পুস্তক প্রকাশের বিস্তৃত বিবরণ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের প্রথমেই দেশের দীপ্তনামা পণ্ডিত মণ্ডলীর অত্র পুস্তক সম্বন্ধীয় অস্তিমতাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে উাহারা সকলেই প্রায় একবাক্যে “বঙ্গাল-চরিতের” উপযোগিতা, আবশ্যকতা ও উপাদেয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং অজ্ঞ-বাদক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ করিয়াছেন।

আজ কাল আমরা “মুণ্ডাঠানের” চৌদ্দ পুরুষের খবর রাখি, ‘আমেজান’ নদীর সর্বাঙ্গিক গভীরতা কত ফুট, তাহা জানি; আফ্রিকার ‘হলন্দু’ জাতির আদি বংশোৎ-পত্তি-বিবরণ বলিতে পারি; অগচ নিজের জাতি-বংশের কিছুই জানিনা—কিছু খোঁজ রাখি না। ঠাকুর দাদার বাপের নামটাও হরত বলিতে পারি না, এমনি কপাল পুড়িয়াছে! এরূপ অবস্থার এই “বঙ্গাল-চরিত” আমাদের বঙ্গীর হিন্দু জাতি-কুল-নির্গম ও আদি মূল বংশ-পরিচয় পরিজ্ঞানে—জাতীয় উন্নতি বিধান-বিশেষ উপকারে আসিবে। পূৰ্ব্বোক্তর ভেদে ঋগ্বেদে বিতক্ত এই গ্রন্থের পূৰ্ব্বার্কে ব্রাহ্মণ, কার্য ও বৈষ্ণব-বিবরণ, অগ-নার্কে বঙ্গীর অপরাপর জাতি বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বঙ্গের সুবর্ণবিগিক ও বোণী (‘বুণী’) জাতির প্রকৃত মূল বংশ-বিভক্তি, সামাজিক প্রেৰ্ত্ব-সংঘ ও বঙ্গাল

রাজের কোপ-বলাংকৃত পাতিত্য-বিধান-বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কলে-বাল্যী জাতির আদি জাতিভঙ্গ বিষয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় ইহাতে বিস্তর আছে। এমন একখানি জাতীয় পরমোপকারী প্রয়োজনীয় পুস্তকের সমাজে সমাদর ও বহুল প্রচার বিশেষ বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিত ব্ৰদেশ-সেবক ও স্বাধাতি-হিতৈষী বাল্যী মাজেরই এই পুস্তক ১।১ খানি সংগ্রহ করা এবং (এমন কি) পারিরা উঠিলে—কঠম্ব করাও উচিত বোধ করি। অন্ততঃ একবার পুস্তকখানি আশ্চোপাস্ত পড়িরা দেখিতে অনুরোধ করি। বৈখানির দামও বেশি নহে, ৯০ মাত্র। কলিকাতার গুরুদাস বাবুর মেডিক্যাল লাইব্রারি প্রেভৃতি স্থানে পাওয়া যায়।

“সেবিকা”—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ক্রমি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় এবং বিবিধ সাময়িক সংবাদ-সংবাহিনী মাসিক পত্রিকা। শ্রীবৃদ্ধ মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি-সম্পাদিত। ডায়মণ্ড হারবার হইতে “হীরক” যন্ত্রে মুদ্রিত হইরা সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১১ এক টাকা মাত্র। আকৃতি-আরতল বৃহৎ, কিন্তু পত্র-সংখ্যা চারিটি মাত্র। তবে “ডিমাই” আকারের প্রায় বিগুণ বটে। বার্ষিক মাত্র ডাকমাণ্ডল ১১ টাকা মাত্র মূল্যে ইহার অধিক পত্র-সংখ্যা দিলেও খরচে পোষায় না। তবে স্বাধিকারীর নিজের মুদ্রাবয় হইলে একরূপ চলিতে পারে। এই “সেবিকা”

পত্রিকাখানি প্রাধান্যতঃ বঙ্গীয় 'মাহিষ' সমাজের মুখপত্র স্বরূপ। উক্ত সমাজস্থ শিকিত ধনাঢ্যগণ নিয়মিত সাহায্যাদি করিলে, পত্রিকাখানি সু প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা। পত্রিকা চলতেছে ও আজ নব নবসর হইতে। তবে "হিন্দুপত্রিকায়" সমালোচনার্থ ইহা আমরা সংপ্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। এমন সুশক্ত মূল্যে একখানি সুন্দর পত্রিকা পাওয়া বঙ্গ-সাহিত্যসেবীর অপাহুণীয় নহে। পত্রিকাখানিতে প্রধানতঃ মাহিষ-পসঙ্গ গাণিত্যেও, অপর বিবিধ হিতকর ও শিক্ষণীয় বিষয়ও থাকে। ভারত-গৌরব বেন্দ্রান্ত্রাজ্যের সমর্থ-পত্নীমুখ্যাদি "জ্ঞানদায়ী গীতা" নামে যে একটি সন্দর্ভ ইহাতে নিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে, উহা অতি উপাদেয়। রচনাটি বেশ সরল, মধুর, শ্রাঞ্জল 'পয়ার' ছন্দে গ্রাণিত। আবার এক্ষণে গুণ গভীর গৃহন বিষয় যেরূপ কৌতূহলের আভাসে অঙ্গ ভাষায় রচিত হইয়াছে, তাহাও ইহার প্রশংসনীয় বিশেষত্ব। ইহার কৃষি-শিল্পাদি বিষয়ক প্রবন্ধগুলিও বেশ উপকারী ও শিক্ষাদায়ক। ইহাতে চিকিৎসা-স্বাক্ষর প্রয়োজনীয় কথাও দেখিলাম। এই নিত্য-রোগাঙ্কর বঙ্গদেশের সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদিতে চিকিৎসা-স্বাক্ষর প্রয়োজনীয় কথা ও পরীক্ষিত মুষ্টিযোগাদি বহু প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। 'সেবিকা'তে সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও থাকে। মোটামুটি অনেকগুলি ভাল ভাল বিষয় ইহাতে প্রকাশিত হয়; তবে কিনা, পত্রিকার পত্র-সংখ্যার অন্ততঃ বিষয়গুলি প্রায় "হোমিওপ্যাথিক ডোজ" সারিতে হয়। বিষয়ের সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা বিষয়ের বিশদীকরণ অধিকতর

বাহুণীয়। অনেকগুলি প্রশংসা কেবল ছিটাইয়া দেওয়া অপেক্ষা অল্প প্রশংসা মোটামুটি মিটাইয়া লেখা ভাল। এই জন্ত আশা করি, বিস্তৃত মাহিষসমাজের সম্পন্ন সাহিত্যা-নুরাগিগণের সাহায্যে "সেবিকা" আর একটু সুশক্তপনবরা হইয়া প্রকাশিত হইতে পারিবে, পত্রিকার সংকলোক্তি-অনুসারী সকল প্রশংসাই অপেক্ষাকৃত বিশদরূপে আলোচিত হইতে পারিবে।

উপসংহারে আর একটি কথা বলা আবশ্যিক বোধ করি। "সেবিকা"র কালমান জ্ঞাপক মাস-বৎসর ইংরাজী কেন? এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল প্রভাবের দিনে স্বদেশী ছাড়িয়া বিদেশী মন-তারিখ্য ব্যবহার (বিশেষতঃ 'স্বদেশী' সাহিত্য-ব্যাপারে) সম্ভব কি? অথবা 'স্বদেশী' ভাবের সম্প্রসারণ-আবশ্যকতার যে কোন উপায়ে তৎসাহায্য-সম্ভাবনা উপেক্ষণীয় নহে। আজ-কাল বঙ্গের সাহিত্য-প্রসঙ্গে, 'স্বদেশী-সেবক সাময়িক পত্রাদির অঙ্গে 'আগষ্ট' ও '১৯০৭' খৃষ্টাব্দ দেখিতেই যেন কেমন কুংসিত দেখায়। আশা করি, কাজের বিশেষ অনুবিধা না হইলে, ভবিষ্যতে এ খঁতু সৎশোধিত হইবে।

['হিন্দু-পত্রিকা'-কার্যালয়ে আরও অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকাদি সমালোচনার্থ আমরা মজুদ রহিয়াছি। আমরা পত্রিকার স্থানীবকাশ-অনুসারে ক্রমশঃ তৎসমুদয়ের বর্ণনাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিব। প্রকাশকগণ আমাদের অনিচ্ছাকৃত বিলম্ব ক্রটি ক্ষমা করিবেন।]

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিস্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ পঞ্চ,
৯ম সংখ্যা ।

পৌষ ।

১৯১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ? (পূর্নানুবৃত্তি ।)

আম্মা দেহানসানে কি ভাবে থাকে ? এই প্রশ্নের সীমাংসার পূর্বে একটু চিন্তা করা পাড়ে একটা আস দেখিতেছ, দেখেছ কি ? একটা নতিবানরণ—হৃৎ বা ছাল। সর্ব-প্রথমে ঐ ছালই আসের দেহ। উগ ক্রমে বড় হইল। • উহার ভিতর শাস হইল, আঠি হইল, আস পাকিল। তুমি আস পেড়ে, ছাল ফেলে দিলে, শাসটুকু খেলে। আঠিটি মাটিতে পুতিলে। তার পর ঐ আঠি ভেদ করিয়া একটি অক্ষুর বাহির হইল। এখন তুমি যে আমটি খেয়েছিলে, সে আমটি এই ছই পরিবর্তনেও কি জীবিত আছে—না মরিয়া গেছে ? আস খাইয়া ফেলিলেই আস মরিয়া না, ও উহার আঠিতে জীবিত রহিল। তার পর আম গাছ হইল। এ

মনয় আঠিটি গচিরা গিয়াছে। যে আস খেলে, সে মরে না, সে ঐ বৃক্কেট জীবিত আছে। একটা নারিকেলের ভিতরে আসরা প্রথমে গোসা, তারপর মানা, তারপর লণ, তারপর নেওয়া, তারপর শক্ত নারিকেল, তারপর ফোপল। উতাদ বহু পরিবর্তন দেখি; তারপর আবার তাহা হঠতেই অক্ষুরোৎসব হইয়া নূন নারিকেল গাছ হইয়া—বহিরোপকরণ লইয়া সে প্রবাণ্ড বৃক্ক হয়। আম্মা কি শরীর ছাড়া কখনও থাকে ? আসের বা নারিকেলের আম্মা কি কখনও আস বা নারিকেলের দেহাংশ ছাড়া বর্তমান রহিয়াছে ? মাংসেরইবা তাহা কেন হইবে ? মাংসের যে শরীর আম্মা সাধারণতঃ দেখি, উহা স্থলদেহ;

ঐ স্থলদেহের ভিতর স্কন্দদেহ আছে। আত্মার নূতন জন্ম ঐ স্কন্দদেহ লইয়া। ঐ স্কন্দদেহই নূতন উপকরণ সংগ্রহ করিয়া নূতন স্থলদেহ গঠন করে। বতক্ষণ স্থলদেহের সত্বিত আত্মা সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ আত্মাকে শরীরের ভরণ-পোষণ করিতে হয়, এবং শরীরের উপাধি দ্বারা তাহার স্বাধীনতার সন্ধেচ হয়। কিন্তু স্থলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন স্কন্দদেহযুক্ত আত্মার আর স্থলদেহোচিত ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। মুক্তা-ত্মারা—মুক্তার পর জীবনের অবস্থা কি, তাহা জানেন। তাঁহারা জানেন যে, আত্মা নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নূতন দেহ ধারণ করে, এবং উহা নিমিষের মধ্যেই হইয়া থাকে। বাঁহাদের আত্মা উন্নত হইয়াছে, বাঁহারা বাসনা ক্ষয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না। তবে যদি জগতের কোন মঙ্গল সাধন করিতে হয় তখন তাঁহারাও জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু বতক্ষণ বাসনার ক্ষয় না হয়, ততক্ষণ জন্ম-গ্রহণ করিতেই হইবে। আত্মাজগতে বাঁহারা সুখ-পান না, তাঁহাদের পুনর্বার এই স্থানে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইঞ্জের-সুখ চরি-তর্ষ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্থল দেহ ধারণ করিতে হয়। এইরূপ পুনঃ পুনঃ আসা-বাওয়া করিতে করিতে আত্মার জ্ঞান পরিপক হইলে, ইহসংসারে আর আসিতে হয় না।

একের সহিত এক যোগ দিলে দুই হয়, এটি চির সত্য। তুতে সত্য, বর্তমানের সত্য, ভবিষ্যতেও—অর্থাৎ সর্বকালেই এটি সত্য। এখানে, ওখানে, সর্বখানে—এটি

সত্য। দেশ বা কালের দ্বারা এ সত্যের বাধা প্রায় না। এটরূপ দেখে, এটি সত্যটি খণ্ডন করার অধিকার কাহারও আছে কি না। বাঁহাকে সর্বশক্তিমান জৈশ্বর বলা যায়, তিনিই কি এটি সত্যের বাধা জন্মাটতে পারেন না জন্মাটয়া থাকেন? জৈশ্বর কি সত্যকে মিথ্যা করিতে পারেন বা করেন? যে শক্তির উপর এটি বিশ্ব নিষ্ঠিত, সর্ব-শক্তিমান জৈশ্বর কি সেই শক্তি ধ্বংস করিতে পারেন বা করেন? পরে কি বলে, কোন্ শাস্ত্রে কি বলে, তাহা ভুলিয়া যাও, নিজেই বিশেষক পরিচালনা কর; তাহা হইলেই এই সকল প্রশ্নের উত্তর সতঃই হৃদয়ে উদ্ভিত হইবে। তুমি আছ, এই বিশ্ব আছে, ইহার ধ্বংস করিবার শক্তি কার আছে? ধ্বংস নাট, আছে কেবল রূপান্তর।

আমরা যখন কোন ভাল কার্য্য করি বা মন্দ কার্য্য করি, তখন কি আমরা বলি যে, জৈশ্বর উহা করিয়াছেন? তুমি ঠিক দিতে ভুলিলে, ও ভুলটা কি জৈশ্বরের না তোমার? তুমি সাক্ষিতে চুরী করিলে, ঐ কার্য্য জৈশ্বরের না তোমার? আবার তুমি পরের জন্য জীবন দিলে, ঐ কার্য্য জৈশ্বরের না তোমার? তুমি যদি শারীরিক মঙ্গল চাও, তাহা হইলে তোমার ব্যায়াম করিতে হয়, পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে হয়, আহার বিহার সংযত করিতে হয়। যদি জ্ঞানী হইতে চাও, জ্ঞান উপার্জনের যে সমুদয় উপায় আছে, তাহা তোমার অব-লম্বন করিতে হয়। এই জীবনে বাহা-তোমার প্রয়োজন—ধন, খাদ্য, গো, অশ্ব, রথ, বসন, ছুৎ ইত্যাদি সকল প্রয়োজনের

জন্তুট তোমার নিজের পুরুষস্বরের প্রয়োজন। ধাতু উৎপন্ন করিতে ধাতু বীজ নগ্ন করিতে হইবে। উহা বপন না করিলে, তুমি পণ্ডিতই হও, বীরই হও, যোগীই হও আর ভক্তই হও, কিছুতেই ধাতু হইবেনা। পক্ষাবস্থার সর্বকালে কার্য-কারণের নিত্য সম্বন্ধ। কার্য-কারণের এই সত্য সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলেই তুমি ভবজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে। তবে এক ঈশ্বর একটি নিয়ম মাত্র? নিয়ম থাকিলেই নিয়ন্তা আসিয়া পড়ে; তাহা হইলে তিনি নিয়ন্তা। এই বিশ্ব তাঁহার শরীর, এই বিশ্ব জড় ও জড়শক্তি, এবং মানবাত্মা, পশুাত্মা পভূতি সমুদায় আত্মাই তাঁহার শরীর স্বরূপ। তিনি সকলের মধ্যে থাকিয়া সকলকে অল্পপ্রাণিত করেন। তাঁহার নিয়মে বিশ্ব একটি সূত্রে আপত্তি রহিয়াছে। এই বিশ্বের বিরাট দেহ তাঁহার। তিনি "সংস্রনীর্গা পুরুষঃ সহস্রাকঃ সহস্রাণাং।" (ঋগ্বেদ) অর্থাৎ তিনি অনন্ত শির বা অবয়ব-যুক্ত, অনন্ত চক্ষু বা জ্ঞানেশ্রিয়যুক্ত, অনন্ত পাদ বা কর্ণেশ্রিয়যুক্ত বিরাট পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্তী হইরাছেন।

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যঃ পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ৩ ॥

যেহন্দু তিষ্ঠন্ত্যোহস্তরো যমাপো ন বিদুর্জাত্যঃ শরীরং সোহপোহস্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ৪ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ৫ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ৬ ॥

যমন্তরিকঃ ন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ৭ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ৮ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ৯ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১০ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১১ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১২ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১৩ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১৪ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১৫ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১৬ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১৭ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১৮ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ১৯ ॥ যোগী যোগী তিষ্ঠন্ত্যেহস্তরো যমর্গন বেদ যজ্ঞাঃ শরীরং যোগীমন্তরো যমরতোষ ত আত্মাহস্তর্গামামৃতঃ ॥ ২০ ॥

প্রাণমন্ত্ৰো বসরতোষ ত আত্মাহুতর্গাম্য-
 মুতঃ ॥ ১৬ ॥ যো বাচি তিষ্ঠন্ বাচোহুত্ৰো
 যং বাঙন বেদ যশ্চ বাক্শরীরং যো বাচ-
 মন্ত্ৰো বসরতোষ ত আত্মাহুতর্গাম্যমুতঃ ॥ ১৭ ॥
 যশ্চকুবি তিষ্ঠ শচকু:বাহুত্ৰো যং চকুর্ন বেদ
 যশ্চ চকু: শরীরং যশ্চকুসন্ত্ৰো বসরতোষ
 ত আত্মাহুতর্গাম্যমুতঃ ॥ ১৮ ॥ যঃ শ্রোত্রে
 তিষ্ঠং শ্রোত্রাঙ্গন্ত্ৰো যঃ শ্রোত্রাং ন বেদ যশ্চ
 শ্রোত্রং শরীরং যঃ শ্রোত্রাঙ্গন্ত্ৰো বসরতোষ
 ত আত্মাহুতর্গাম্যমুতঃ ॥ ১৯ ॥ যো মনসি
 তিষ্ঠন্ মনসোহুত্ৰো যঃ মনো ন বেদ যশ্চ
 মন: শরীরং যো মনোহুত্ৰো বসরতোষ ত
 আত্মাহুতর্গাম্যমুতঃ ॥ ২০ ॥ যদ্বচি তিষ্ঠং সত্ব-
 চোহুত্ৰো যং স্বঙন বেদ যশ্চ স্বক্শরীরং
 যশ্চসন্ত্ৰো বসরতোষ ত আত্মাহুতর্গাম্য-
 মুতঃ ॥ ২১ ॥ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞান-
 মন্ত্ৰো যঃ বিজ্ঞানং ন বেদ যশ্চ বিজ্ঞানং
 শরীরং যো বিজ্ঞানমন্ত্ৰো বসরতোষ ত
 আত্মাহুতর্গাম্যমুতঃ ॥ যো রেতসি তিষ্ঠন্
 রেতসোহুত্ৰো যঃ রেতো ন বেদ যশ্চ রেতঃ
 শরীরং যো রেতোহুত্ৰো বসরতোষ ত আত্ম-
 হুতর্গাম্যমুতঃ ৩১ ॥ ঠাহুত্ৰো যঃ শ্রেতোঃ মতো
 মন্ত্ৰো বিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নাভ্যোহুত্ৰোহুত্ৰি
 ত্ৰি নাভ্যোহুত্ৰোহুত্ৰি সন্তানোভ্যোহুত্ৰোহুত্ৰি
 বিজ্ঞাতেন ত আত্মাহুতর্গাম্যমুতঃ ৩২ ॥
 ততো হোদালক আকণিকপন্নয়ঃ ২৩ ॥
 ইতি বৃহদারণ্যকোপনিষদি ত্ত্ৰীমাধ্যায়গা
 পঠনং ক্রমশ্চ ॥ ৭ ॥

উদালক আকণি যাজ্ঞবল্ক্যে অতর্গামীর
 বিবরণ দিঙ্গাগা করিলে; যাজ্ঞবল্ক্য বলিছেন—
 তিনি পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, তিনি
 পৃথিবীর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, পৃথিবী বাহ্যর

বিষয় জ্ঞাত নহে, পৃথিবী বাহ্যর শরীর,
 যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে
 নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার
 আত্মা, তিনিই অতর্গামী; অর্থাৎ যিনি সাক-
 শের অন্তরে থাকিয়া সাক্ষকে নিয়মিত
 করেন, তিনিই অতর্গামী, তিনিই অমৃত।

(অন্তরং—অভ্যন্তরং, বসরতি—নিয়মতি,
 সব্যাপারে। তে—তব, সর্গভূতানাং উপ-
 লক্ষণার্থম্।)

যিনি জলে বাস করিতেছেন, যিনি
 জলের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জল বাহ্যর
 বিষয় জ্ঞাত নহে, জল বাহ্যর শরীর, যিনি
 জলেতে অভ্যন্তরে থাকিয়া জলকে নিয়মিত
 করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই
 অতর্গামী, তিনি অমৃত ৪।

যিনি অগ্নিতে বাস করিতেছেন, যিনি
 অগ্নির অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অগ্নি বাহ্যর
 বিষয় জ্ঞাত নহে, অগ্নি বাহ্যর শরীর,
 যিনি অগ্নির অভ্যন্তরে থাকিয়া অগ্নিকে
 নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা,
 তিনিই অতর্গামী, তিনিই অমৃত ৫।

যিনি অন্তরীক্ষে বাস করিতেছেন, যিনি
 অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অন্তরীক্ষ
 বাহ্যর বিষয় জ্ঞাত নহে, অন্তরীক্ষ বাহ্যর
 শরীর, যিনি অন্তরীক্ষের অভ্যন্তরে থাকিয়া
 অন্তরীক্ষকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই
 তোমার আত্মা, তিনিই অতর্গামী, তিনিই
 অমৃত ৬।

যিনি বায়ুতে বাস করিতেছেন, যিনি
 বায়ুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বায়ু বাহ্যর
 বিষয় জ্ঞাত নহে, বায়ু বাহ্যর শরীর, যিনি
 বায়ুর অভ্যন্তরে থাকিয়া বায়ুকে নিয়মিত

করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ৭।

যিনি স্বর্গেতে বাস করিতেছেন, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, পূর্ণ বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, পূর্ণ বাঁহাৰ শরীর, যিনি স্বর্গের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বর্গকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ৮।

যিনি আদিত্য বাস করিতেছেন যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আদিত্য বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, আদিত্য বাঁহাৰ শরীর, যিনি আদিত্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া আদিত্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ৯।

যিনি দিক্‌গম্ভে বাস করিতেছেন, যিনি দিক্‌গম্ভের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন দিক্‌গম্ভ বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, দিক্‌গম্ভ বাঁহাৰ শরীর, যিনি দিক্‌গম্ভের অভ্যন্তরে থাকিয়া দিক্‌গম্ভকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১০।

যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রগম্ভে বাস করিতেছেন, যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রগম্ভের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চন্দ্রে ও নক্ষত্রগম্ভ বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, চন্দ্রে ও নক্ষত্রগম্ভ বাঁহাৰ শরীর, যিনি চন্দ্রে ও নক্ষত্রগম্ভের অভ্যন্তরে থাকিয়া চন্দ্রে ও নক্ষত্রগম্ভকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১১।

যিনি আকাশে বাস করিতেছেন, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, আকাশ

বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, আকাশ বাঁহাৰ শরীর, যিনি আকাশের অভ্যন্তরে থাকিয়া আকাশকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১২।

যিনি অক্ষকারে বাস করিতেছেন, যিনি অক্ষকারের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, অক্ষকার বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, অক্ষকার বাঁহাৰ শরীর, যিনি অক্ষকারের অভ্যন্তরে থাকিয়া অক্ষকারকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১৩।

যিনি তেজে বাস করিতেছেন, যিনি তেজের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, তেজ বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, তেজ বাঁহাৰ শরীর, যিনি তেজের অভ্যন্তরে থাকিয়া তেজকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১৪।

এতদ্বারা ব্রহ্মের আধিপত্যিক সত্বক—অর্থাৎ দেবতাদিগের সচিৎ তাঁহাৰ যে স্বক, তাহা বলা হইল; এইক্ষণ এক হৃৎতে স্তম্ভগাম্ভ ভূতগম্ভের সচিৎ তাঁহাৰ যে স্বক—অর্থাৎ ভৌতিক সত্বকের কথা বলিল।

যিনি ভূতগম্ভে বাস করিতেছেন, যিনি ভূতগম্ভের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, ভূতগম্ভ বাঁহাৰ বিষয় জ্ঞাত নহে, ভূতগম্ভ বাঁহাৰ শরীর, যিনি ভূতগম্ভের অভ্যন্তরে থাকিয়া ভূতগম্ভকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অস্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১৫।

এতদ্বারা ব্রহ্মের আধিপত্যিক সত্বকের কথা বলা হইল; এইক্ষণ তাহাৰ আধ্যাত্মিক সত্বকের কথা বলিল।

যিনি প্রাণে বা জীবাত্মার বাস করিতেছেন, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, প্রাণ বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, প্রাণ বাঁহার শরীর, যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে থাকিয়া প্রাণকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১৬।

যিনি বাক্যে বাস করিতেছেন, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, বাক্য বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, বাক্য বাঁহার শরীর, যিনি বাক্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া বাক্যকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী। তিনিই অমৃত। ১৭।

যিনি চক্ষুতে বাস করিতেছেন, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, চক্ষু বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, চক্ষু বাঁহার শরীর, যিনি চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া চক্ষুকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১৮।

যিনি কর্ণেতে বাস করিতেছেন, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, কর্ণ বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, কর্ণ বাঁহার শরীর, যিনি কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া কর্ণকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ১৯।

যিনি মনেতে বাস করিতেছেন, যিনি মনের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, মন বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, মন বাঁহার শরীর, যিনি মনের অভ্যন্তরে থাকিয়া মনকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ২০।

যিনি স্বপ্নে বাস করিতেছেন, যিনি

স্বপ্নের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, স্বপ্ন বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, স্বপ্ন বাঁহার শরীর, যিনি স্বপ্নের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বপ্নকে নিয়মিত করিতেছেন তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ২১।

যিনি জ্ঞানে বাস করিতেছেন, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, জ্ঞান বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, জ্ঞান বাঁহার শরীর, যিনি জ্ঞানের অভ্যন্তরে থাকিয়া জ্ঞানকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ২২।

যিনি রেতে বাস করিতেছেন, যিনি রেতের অভ্যন্তরে রহিয়াছেন, রক্ত বাঁহার বিষয় জ্ঞাত নহে, রক্ত বাঁহার শরীর, যিনি রেতের অভ্যন্তরে থাকিয়া রক্তকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। ২৩।

তিনি অল্পের দৃষ্টির অগ্রাহ্য হটরা দর্শন করেন, শ্রুতির অগ্রাহ্য হটরা শ্রবণ করেন মনের অগ্রাহ্য হটরা ও মনন করেন, জ্ঞানের অগ্রাহ্য হটরাও জানেন। তিনি ব্যতীত অল্প কেচ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্বা বা জ্ঞাতা নাট। তিনিই তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্গামী, তিনিই অমৃত। তিনি ব্যতীত অল্প সকলই মরণশীল। যা জ্ঞাতার এই উত্তর শুনিয়া উদ্যালক আরুণি অল্প প্রশ্ন করিলেন না।

আব্রহ্মস্বয় পর্যাঙ্ক সকলই ব্রহ্মময়, সকল বস্তুই ব্রহ্ম দ্বারা নিয়মিত। জীবাত্মা ও তাঁহার শরীর মাত্র, এত। তিনি তাঁহারই নিয়ন্তা। তিনি কেবল শাস্ত্রী, দ্রষ্টা ব্রহ্মণ, তাঁহার অপরিবর্তনীয় নিয়মে বিশ্বাণিক।

চালিত হইতেছে। তিনি আশ্বার্য্য আশ্বা।
তিনি পরমাত্মা।

“দ্বা সুপর্ণা সমুজ্জা সমাধা—

সমানং বৃক্ষং পরিমথজ্ঞাতে

ভয়োরণ্যঃ শিঙ্গলং বাহুস্তা

নন্দ্রমস্তোহাভিচাক্ষীতি। (শ্রুতিঃ)

জীবাত্মা পরমাত্মার নিকটপ সম্বন্ধ ? না
ছটটি পানী যেমন একটি বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া
থাকে, সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই
দেহ আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার
সখ্যভাবে সংযুক্ত হইয়া আছেন জীবাত্মা
স্বাচ্ছন্দ্য ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ স্বীয় কর্ম-
ফল ভোগ করেন, কিন্তু পরমাত্মা কেবল
সাক্ষী স্বরূপে তাহা দেখেন।

তবে তিনি যে কেবল মানবদেহে জীবা-
ত্মার সহিত সংযুক্ত আছেন, তাহা নহে;
তিনি সর্বত্র বর্তমান রহিয়াছেন, এবং
সর্বপদার্থই তাঁহার বিরাট শরীর।

“তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তবাসুস্তত্র চন্দ্রমাঃ

তদেব শুক্রঃ তদ্বৃক্ষ তদাপস্তং প্রজাপতিঃ।

স্বঃ স্ত্রী স্বঃ পুমানসি স্বঃ

কুমার উত বা কুমারী।

স্বঃ জীর্ণো দণ্ডেন বক্ষরসি

স্বঃ জাতো ভবাসি বিশ্বতো মুখঃ।

নীলঃ পতঙ্গো হরিতে! লোহিতান্দ

স্তড়িঙ্গর্ভ ঋতবঃ সমুদ্রাঃ

অনাদিষ্বঃ বিভূষেন বর্ভসে

যতো জাতানি ভূগনানি বিশ্বা।”

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি
কুমারী। তুমিই বৃক্ষরূপে নৃত্য ধারণ করিয়া
ভ্রমণ করে। তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া সর্বত্র
রাহিয়াছ।

তুমিই নীলবর্ণ ভ্রমণ, তুমিই হরিৎ ও
লোহিতবর্ণ পক্ষী, তুমিই তড়িঙ্গর্ভ মেঘ,
তুমিই ঋতু, তুমিই সমুদ্র, তুমি অনাদি,
তুমিই বিভূরূপে বর্তমান রহিয়াছ, বাহ্যতে
বিষ্মভূতন রহিয়াছ।

অতএব জৈশ্ব কি ? না তিনি বিভূ—সকল।
তাঁহার স্বরূপ কি ? বিভূত্ব—প্রভুত্ব বা নির-
জুত্ব এই বিশ্ব চিৎ ও অচিৎ; চৈতন্য
এবং অজ্ঞ ও জড়শক্তি—তাঁহার বিরাট দেহ;
উহা আছে। উহা তাঁহার বাহ্য বিকাশ।
উহা রূপান্তরিত হইয়া বটে, কিন্তু কখনও
ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; অতএব তিনি সং বা
সত্য। যে নিয়ম দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত,
উহা সঙ্গলয়, অতএব তিনি শিব। বিশ্ব
সৌন্দর্য্যায়, অতএব বিশ্বেশ্বর সুলয়। সুলয়
বলিলে আমরা কি বুঝি ? যেখানে যে রূপ
সমাবেশ গাজে, তাহা পাকিলেই আমরা সুলয়
বলি। সুলমাবেশের অভাবই কদর্য্যতা।
প্রকৃতিতে কদর্য্য কিছু দৃষ্ট হয় না। ইহাতে
‘খাপছাড়া’ কিছুই নাই। অতএব জৈশ্ব
সত্য, শিব ও সুলয়।

বিশ্ব তাঁহার নিয়ম দ্বারা নিয়মিত।
তাঁহার নিয়মের পরিপূর্ণন হইলে, তাঁহার
স্বরূপ পরিবর্তিত হয়। যদি এক আর একে
ছই হয়, ইহা পরিবর্তিত হইতে পারিত,
কিবা তিন কে তিন দিয়া গুণ করিয়া বে
নয় হয় ইহা পরিবর্তিত হইতে পারিত,
তাহাহইলে জৈশ্বের জৈশ্বত্ব প্রাকৃতিতে পারিত
না। এ কি বিশ্বাস করা যায় যে, জৈশ্ব
সংযুক্ত অসৎ এবং অসৎকে সং করিতে
পারেন, কিবা ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল,
বিখ্যাকে মজ, অসরলতাকে সরলতা,

বিধাগম্যত্বকে বিশ্বস্ততা করিতে পারেন? এই ভারতবর্ষ নামে প্রকাণ্ড যে ভূখণ্ড রচিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। এই ভারতবর্ষ যে এক দিন ছিল, এ সত্য কি লুপ্ত করিতে পারেন? ভারতবর্ষের ভূত অস্তিত্বের গোপ সস্ত্রবশর হইলে, ভারতবর্ষ যে বর্তমানে নাই, একথা কি সত্য হইবে? জৈধর কি তাহার স্বীয় অস্তিত্বের গোপ করিতে পারেন? পরমাত্মা কি আয়ত্ত্ব করা করিতে পারেন? অথবা তিনি কি এই বিশ্বের অস্তিত্বের গোপ করিতে পারেন? এ সমুদায় বিষয় দীর ভানে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলে, মনে জ্ঞানের উদর হইবে। এ ব্যক্তির বা ও ব্যক্তির এ শাস্ত্রের বা ও শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া স্বকমার্গে এস। জৈধবত্ব বিষয়ক মীমাংসায় যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব, একপ কোন উপদেশ বা অত্যাশ্রয়ন্য ব্যক্তি যদি শুনিয়া থাকে, তাহা ছুঁলিয়া যাবে। সনাতন শাস্ত্র উচ্চ কণ্ঠে বলিয়াছেন, “যুক্তিহীন বিচারেণ ধর্মতানিঃ প্রক্কারতে।” স্বীয় মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করিয়া, এই সমুদায় চটিং বিষয় মীমাংসার চেষ্টা কর। যদি সম্পূর্ণ মীমাংসাও না করিয়া উঠিতে পার, তাহা হইলেও দেখিলে যে, তুমি মীমাংসার পথে উঠিয়াছ। যদি কুযুক্তির আশ্রয় গ্রহণ না কর কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি বা শাস্ত্রের উপর নির্ভর না কর; তাহা হইলে এ সত্য তোমার মনে অবশ্য সত্য: উদ্ভিত হইবে যে তোমার কল্পনার বস্তু বড় শক্তি কল্পিত হইবে না কেন, ভূতকালের কোন ব্যাপার কোনও শক্তি বাহা লুপ্ত হইতে পারেন না। তোমার

পিতা পিতামহাদি ছিলেন। এমন কোন শক্তি আছে, বাহা দ্বারা তাঁহারা যে ছিলেন, এই সত্যের গোপ হইতে পারে? বাহা তোমার জ্ঞানে সত্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা তুমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। হইতে পারে তোমার ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু যে পর্যন্ত ভ্রম বলিয়া তোমার স্থির ধারণা না হয়, সে পর্যন্ত তুমি উচ্চ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে অভাবত:ট বাধ্য। ভূত ব্যাপারগুলি যে ধ্বংস হইতে পারে না, এ সত্যটি সত্য:ই প্রতীয়মান, এবং ইহার ব্যত্যয় হইবারও যে কোনও সম্ভাবনা নাই, তাহাতেও সন্দেহ সাজ নাই। সত্যের ভিত্তি সত্য। বাহা সত্য, তাহা ধ্বংসবিহীন। তোমার অস্তিত্ব একটি সত্য, সর্বশক্তিমান জৈধর তাহার ব্যত্যয় সংঘটন করিতে পারেন না। এই সত্য:সিদ্ধ সত্যের উপর দণ্ডায়মান হইলে, তুমি বুঝিতে পারিলে যে, এক আর এক যে ছই হয়, ইহা চিরকাগই সত্য। ভূত সত্য, বর্তমানে সত্য এবং ভবিষ্যতেও সত্য। বুঝতে পারিলে যে, ঐ প্রকার গণিত শাস্ত্রের অত্যা সত্য, অায়-অত্যা বিষয়ক সত্য, বিশ্বের নিয়মাবলী ইত্যাদি বিষয়ক সত্য চিরকাগই সত্য—ভূতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। যদি অতীতে তাহাদের পরিবর্তন হইতে পারিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও পরিবর্তন হইতে পারে। যদি অতীতে তাহাদের অস্তিত্বের ধ্বংস থাকিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতেও ধ্বংস হইতে পারে। জৈধরের বিশ্বের বিধান সার্বজনীন। ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া নহে। অল্পনে পোড়ে, সকলেই আগুণে পোড়ে। পাণী-ধ্বংসাবল,

ধনী-দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-
 পুরুষ—সকলেই পোড়ে। এই নিয়মগুলি
 অনাদি, অনন্ত। ঘড়ীতে চানি দিলাম,
 আর ঘড়ী চলিল, এ তাহা নয়। বিশ্বের
 ঘড়ী চিরকালই চলিতেছে—কখনও বিরাম
 লাট, হটেবেওনা। বিশ্ব নিয়মের অধীন—
 ভুতে, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। মানবের
 ঈদনন্দিন কার্যে আমরা কি দেখি? তুমি
 ঠিক দিতে ভুল করিলে, এ ভুল কাহার?
 তোমার না ঈশ্বরের? অতিরিক্ত ভোজনে
 তোমার অঙ্গীর্ণ হইল, এই কর্ম ও কর্মফল
 কাহার? অমুক টাকা পাঠিত, তাহাকে
 ফাঁকি দিলে, এ প্রভারণা কাহার? তোমার
 না ঈশ্বরের? এইরূপ সর্গদেবেরই দেখিলে
 যে, জীবের কর্তৃত্ব, কর্ম ও কর্মফলে ঈশ্বরের
 স্রষ্টৃত্ব নাই। তবে মূল নিয়ম, স্ব অস্বা আছে।
 “ন বর্ত্ত্বং ন কর্ম্মাণি লোকত্র সৃজতি প্রভুঃ।
 ন কর্ম্মফলসংযোগঃ স্বভাস্তু প্রবর্ত্ততে ॥”

(গীতা)

অর্থাৎ—

লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম্ম আর কর্ম্মফল—

ঈশ-সৃষ্ট নয়, হয় স্বভাবে কেবল।

ইহার মধ্যে কোন দৈব বা অস্বাভাবিক
 কিছুই নাই, ঠিক তুমি বেশ বুঝিতেছ; কিন্তু
 আর একটু বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের স্বরূপ
 নিয়মস্ব। কার্য-কারণের নিত্য নিয়মস্বাধীন
 এই বিশ্ব। কার্য-কারণের নিয়মস্বাধীনই যদি
 জগৎ হয়, তাহা হইলে জগদীশ্বরের স্তব স্ততির
 স্থান কোথায়? যতই স্তব-স্ততি কর না
 কেন, ধাত্তবীজ হটেতে গোধূস উৎপন্ন হয় না।
 জ্ঞানী-অজ্ঞানী ধনী দরিদ্রাদি সকলেরই
 ধাত্তবীজ হইতেই ধাত্ত উৎপাদন করিতে

হইবে। কিন্তু ধাত্তোৎপাদনের নিয়মে তাহার
 সত্তা রহিয়াছে। যেমন ধাত্তোৎপাদনে,
 তেমন স্রষ্টোৎপাদনে। এক কথা—বিশ্ব
 তাৎ উৎপাদনেই নিয়মস্বাধীনতা রহিয়াছে;
 কেন না, যে উপায়ের দ্বারা বাহ্য উৎপাদন
 করিতে হইবে, তাহা না করিলে, হইবে
 না। এ ধর্ম্ম, ও ধর্ম্ম, এ বিশ্বাস, ও বিশ্বাস,
 এইরূপ পূজা বা ঐরূপ পূজাদির দ্বারা
 আত্মার মোক্ষপাপ্তি হইবে না। যে অনন্ত
 নিয়মে বিশ্বস্থ তাৎ পদার্থ নিয়মিত, মান-
 বাস্ত্যার মোক্ষও সেই নিয়ম দ্বারা নিয়মিত।
 যে কার্য দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদর্থে
 তাহাই করিতে হইবে। বিশ্বের মধ্যে
 একটি সর্গজনীন প্রাণী দৃষ্ট হয়; উহাকে
 জনন-প্রাণী আখ্যা দেওয়া বাইতে পারে।
 উহার অর্থ এই যে, প্রত্যেক কারণ একটি
 বীজস্বরূপ এবং উহার কার্য-ফল ধ্রুব।
 মানবের প্রত্যেক কর্ম্মই একটি কারণ এবং
 উহার ফলও ধ্রুব। ভাল কার্যের ভাল, মন্দ
 কার্যের মন্দ ফল। পূর্নোক্ত বৃহদারণ্যক
 শ্রুতি উচ্চকর্থে এই সনাতন সত্যই ঘোষণা
 করিয়াছেন। পরমাত্মাকোন ধর্ম্ম বা সস্ত্র-
 দায়বিশেষের পক্ষপাতী নহেন। “সমোহুৎস্ব
 সর্গভূত্বন মে ঘোষোহুতি ন প্রিয়ঃ।”(গীতা)
 মন্দির, মসজিদ বা গিরিআ, কিছুই তাঁহার
 প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। ঝড়ে বা ভূকম্প বা
 অনিষ্টে—মন্দির, মসজিদ বা গিরিআ বলিয়া
 কিছুই পক্ষপাতিব হইবে না। অকাল-
 মৃত্যু সকল ধর্ম্মের লোকেরই হইয়া থাকে।
 রোগে পাপীও মরে, পুণ্যবানও মরে। ধনী-
 দরিদ্র বলিয়াও কোন বিচার নাই। শারীরিক
 বাধি শারীরিক নিয়ম অপালনের ফল,

মানসিক বাধি মানসিক নিয়ম অপালনের
ফল। ব্যক্তি-বিশেষ, ধর্ম-বিশেষ বা সম্প্র-
দায়-বিশেষ, কিছুই নিয়মের বহির্ভূত নহে;
সকলের পক্ষেই বিশেষ এক মূল নিয়ম।
আন্তিক-নাস্তিক, পাপী পুণ্যবান, ধনী-দরিদ্র;
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন,
পার্শী, ইহুদীর পক্ষে একই নিয়ম। যেমন
কার্য, তেমনি ফল—“যেমন বুনবে বীজ,
কলিবে তেমন।” ছাদ যদি খারাপ হয়, তাহা
হইলে পুণ্যবান সেই ঘরে থাকিলেও জল
পড়িবে; ছাদ যদি ভাল হয়, তাহা হইলে
পাপী উহার নিম্নে আছে বলিয়া যে জল
পড়িবে, তাহা নহে। পাপী ইষ্টকালরে বাস
করিলে, উহা আশুনে পড়িবে না; কিন্তু
পর্ণকুণ্ডীরবাসী পুণ্যবানের আবাসও আশুনে
পড়িবে। পাপী কৃষক ধান বুনিলে এবং
ধাত্তোৎপাদনের জন্ত বাহা করা উচিত,
তালা করিলে, ধাত্ত পাইবে; কিন্তু পুণ্যবান
কৃষক অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, কিবা
ধাত্তোৎপাদনের জন্ত বাহা করা উচিত,
তাহা না করিলে, কখনও ধাত্তলাভের
আধিকারী হইবে না।

ভিন্নকে ভিন্ন দিয়া গুণ করিলে যেমন নম
হয়, আর কিছুই হইতে পারে না; কার্য-
কারণের সম্বন্ধও ঐরূপ। $৩ \times ১ = ৩$,
 $৩ \times ২ = ৬$, $৩ \times ৩ = ৯$ ইত্যাদি নিয়মতা নত:
সত্য। জগতে সমস্ত সরল ও জটিল ব্যাপার
ঐরূপ নিত্যনিয়মসামান্যতার সত্য। যেমন
কারণ, তেমনি কার্য। কার্য-কারণের সম্বন্ধ
নিত্য; উহা নিখণ্ডাণী, সার্বজনীন। ক্ষুদ্র,
গুণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গ্রহ, উপগ্রহ, বায়ু,
মহা-অগ্নি, বরুণাশু, হাবর, বজ্র—‘নারদ্রত্ব’

পর্যন্ত অনিবার্য ভাবে অনন্ত কাল নৈমর্গিক
নিয়মের অধীন। যে নিয়ম তোমার ভিতরে,
সেই নিয়ম তোমার বাহিরে। তোমার
প্রত্যেক কার্য, প্রত্যেক চিন্তা কারণস্বরূপ
হইয়া তোমাকে উর্দ্ধ দিকে বা অধোদিকে
কইয়া যায়। প্রত্যেক নিমিষে তোমার
কার্যের বিচার হইতেছে। যদি তুমি মনে ঘেব,
হিংসা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অজ্ঞ নীচ পরিত্র
স্থান দিলে, অমনি হাতে হাতে তুমি তাহার
ফল পাইলে। তোমার চরিত্র কলুষিত হইল,
তোমার আত্মা নিম্নগামী হইলে। সাধুকার্য
ও সাধুচিন্তার ফলও ঐরূপ হাতে হাতে
নগদ বৃদ্ধায়। রাজিতে যখন নিজের
শাস্তিময় ক্রোড়ে তুমি আশ্রয় গ্রহণ করিতে
যাও, সেই সময়ে, তুমি দিব্যভাগে যেরূপ
ভিলে তাহা আন নাই। তব পূর্ণাঙ্গের
একটু ভাল না হয় খারাপ হইয়াছে। বেশ
চিন্তা করিয়া দেখিলে, তোমার আত্মা ভিন্ন
তোমার আর কোন সত্তা সম্বন্ধে নাট।
ধন-ঐর্ষ্যা-দি পড়িয়া থাকিলে, এই সোনার
গৃহ পড়িয়া থাকিলে; এই গাড়ের মাঠ,
যাচপর্ব, চিড়িয়াখানা পড়িয়া থাকিলে। এই
শরীর আশুনে পড়িয়া যাইবে। থাকিলে
কেবল আত্মা। অতএব ঐ আত্মার উন্নতি-
অনতিই তোমার একমাত্র লক্ষ্য হওয়া
উচিত। ঐ শুন, পরমাত্মা যেন দীবাঙ্ঘাকে
বলিতেছেন—

“দীবা! অশ্রুত হও; তুমি অমৃতের
পুত্র। অশ্রুত হও তোমার উৎপত্তি, অশ্রুত হই
তোমার পরিণাম।”

ভক্ত বলিবেন যে, এ সমুদায় কথা-মহে
লাগে না। ভক্ত বলেন যে—‘আজি’ চাই

এমন ঈশ্বর, যাঁহাকে সব সময় দেখিতে পারি, সেবা করিতে পারি, আপাদ বিপদে যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।” কাণা-কার-ণের সঙ্কট বদ অপরিসর্তুীয় হয়, তাহা চাইলে ভক্তির স্থান কোপার? আমরা বলি, উচ্চতম মর্যাদা ভক্তির স্থান আছে। (আগামী বারের মনমের বিশদ আলোচনা করা যাইবে।)

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবিদ্যা এবং তাহার অনুশীলন ।

(পূর্নামৃত্তি।)

৩৬। ব্রহ্মোক্ত জীবাশ্বার যে আশ্ববুদ্ধি, তাহাই মোক্ষ। জীবাশ্বা, অমৃতের পুত্র হইয়া, বিজাতীর অভিনিবেশ বশতঃ চিরকাল অবিজ্ঞার কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া, অনাশ্ব দেহাদিকে আশ্বা ভাবিয়া, হর্বশোকে বিভ্রান্ত ছিলেন। তাহাতে, যিনি আপনার প্রকৃত আশ্বা, যিনি পেশাম্পদ পিতা, যিনি পুত্র হইতে পিয়, পিত্র হইতে পিয় এবং অশ্ব সর্ব্ব হইতে পিয়, সেই অশ্বরতস পিয়তম পরমাশ্বাকে ভুলিয়া গিয়া, আপনি সেই কারাগারে, পরের জ্ঞার, অনাপের জ্ঞার, কয়েদীর জ্ঞার, সূরিয়া বেড়াইতে ছিলেন; এবং কত জন্ম-জন্মান্তরে আপনার বত কয়েদীদের সহ পিতৃ মাতৃ ভ্রাতৃ-সহোদরা-স্ত্রী-পুত্রাদি সবক বার বার পাতাইরা ছিলেন

এবং তাহাদের বিচ্ছেদ বার বার কতই ক্রন্দন করিয়াছেন; সেই অমৃতের পুত্র, এক্ষণে সেই পরম পেশাম্পদ নাহুনীর ধন জনক দর্শন, স্পষ্ট জানিতে পারিলেন যে, কেবল মায়াবদ্ধ দ্বারা সেই মায়াময় অবিজ্ঞার কারাগারে বদ্ধ ছিলেন। যে মিত্রী এক্ষণে ক্ষয় হইল।

৩৭। সামান্ত কয়েদখালাসীর যেমন আপনায় মাতা, পিতা, বন্ধু, জী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, গ্রাম প্রভৃতি একেবারে অজ্ঞান্যমান মনে পড়ে, সেইরূপ সংসার-কারামুক্ত পুরুষের আশ্বাতেই, পুরাতন সম্পদ্বৎ পরম পিতা পরমাশ্বার সহিত, পরমপিয় আশ্বধাম জাগরিত হয় এবং তখন তিনি সেই স্বধামে অনন্ত আনন্দময় অভয়প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সামান্ত কয়েদী কয়েদখালাসের পর আপনায় বাটীতে গেলেও তাহার কলঙ্ক থাকে; কিন্তু সংসার-কারামুক্ত পুরুষের তাদৃশ কোন কলঙ্ক থাকে না; কেননা, তাহা মহাবপ-ক্রুপিণী মায়ার খেলা মাত্র। আশ্বজাগরণে তৎসমস্ত মিথ্যারূপে প্রতীয়মান হয় এবং তাঁহার নাম রূপ-গুণ ও মনোবুদ্ধি-ইঞ্জিরাদি সমস্তই তিরোহিত হয়। তাহাতে তাঁহার নির্মল ক্ষটিকবৎ আশ্বরূপে অবিজ্ঞার কলঙ্ক তিষ্ঠিতে পারে না।

৩৮। যাঁহার এই বর্তমান কালে বিজাতীর বুদ্ধিপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া, তারতীর শাস্ত্রবিধি ও শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য জ্ঞান হত-প্রকার সহিত পরিচ্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অক্ষেপেই মনে করেন, ঈশ্বর জীবাশ্বা-সমূহকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার জীবের পূর্বজন্ম ও পরজন্ম মানেন না; কেশের

অস্বাভাবিক স্বীকার করেন না এবং মনোবুদ্ধি-
বিরহিত-কোনরূপ সৌন্দর্যে বিশ্বাস করেন
না। তাঁহাদের মধ্যে বাঁহারা মনুষ্যের
পরলোক মানেন, তাঁহারা সেই অবস্থাকে
দুর্গ বা দেবলোক আখ্যা দেন এবং তাদৃশ
পরলোকস্থ পুরুষের মন-বুদ্ধি-ইঞ্জিয়ারদির
সম্বন্ধ স্বীকার করেন। কিন্তু সর্কোপাদি-
মিসিন্দুক আত্মতত্ত্ব মানেন না, বুদ্ধিতেও
পারেন না।

৪০৩। এই প্রকারের ব্যক্তিবিশেষ বুদ্ধিতে
ভারতীর সৃষ্টিতত্ত্বের আন্তোপাত্ত শূন্যমানক
প্রমাণী; এবং অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডবাণী
অনন্তকোটি জীবের কোটি কোটি জন্ম ও
মরণস্বাক্ষর স্বর্ণাদি ভোগের বাবদ্য। এবং
অন্যথেষ্টে মরণসম্বন্ধের বিধান—এই সমস্ত
তত্ত্ব স্থান পায় না। সুতরাং তাঁহাদের
মিসিন্দুক ব্রহ্মবিশ্বাস আদর নাই। অনেকে
উপনিষৎ ও বেদান্ত পাড়েন বটে, কিন্তু
তাঁহাদের উক্ত প্রকার ভ্রষ্টবুদ্ধি বিধান, তাঁহারা
সর্কোপাদিপ্রকারে ভারতীর শাস্ত্রার্থ গ্রহণে
অসমর্থ।

৪০৪। বিশেষতঃ শাস্ত্রের আর একটি
কথাই এবং আত্মজানীগণের একটি বাস-
হারে তাঁহারা নিম্নিত হয়েন। তাহা এই
যে, আত্মজানী পুরুষ লোকসংগ্রহার্থে
জন্মকাদি ক্রমিক স্বর্ণপ্রসম্বন্ধপালন ও
যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেন। কেননা,
এই সকল স্বর্ণই যেমন সমাজ-রক্ষার হেতু,
সেইরূপ অর্থে ব্রহ্মবিশ্বাস এবং আত্মজান
স্বার্থের সোপান। তত্ত্বিত স্বর্ণাদি অনাস্তর
স্বার্থস্বীকার করণ। অতএব আত্ম-
জানী ব্রহ্মবিশ্বাস পুরুষ এসমস্ত অনুষ্ঠানে

অবহেলা করেন না। গৃহস্থপ্রসম্বন্ধে আত্মজান
পুরুষের এই একটি বিশেষ লক্ষণ।

৪। ফলতঃ আত্মজানে জাগ্রত পুরুষেরই
নিকট আত্মকৃত্তর পর্যাঙ্ক সাধারণ মায়াকল্পিত,
সুতরাং সিপ্যা বগিরা প্রতীকমান হইলেও,
অন্ত মকলের পক্ষে ছত্রতীক্রমণীয়া অবিস্তার,
অপাশ বশতঃ টটা চিরকাল সত্য; কেননা
ইহার হেতুভূত কামকর্ম্মনাসনাসম্বী যে
অনিষ্টা-প্রকৃতি জীবের ভোগসমাপ্তি অথবা
আত্মজান বাণীত, তাহা শতকোটি ব্রহ্ম-
কালেও কমপাপ্ত হয় না। অতএব এই
সংসারের এবং টটার সৃষ্টি, পালন ও সংহা-
রের বর্তী ব্রহ্মা-নিষ্কৃ মহেশাদি ঈশ্বরগণের
প্রবাহরূপ স্থায়িত্ব পক্ষে সন্দেহ নাই এবং
জীবনগণ, আপনাদের কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের
ফল ততকাল অনন্ত ভোগ করিবেন।
যে অস্ত্র সর্কোপাদি গৃহস্থপ্রসম্বন্ধী মানব-
গণকে স্বর্ণপ্রসম্বন্ধ ও যজ্ঞদেবর্চনাদি শুভ-
কর্ম্মানুষ্ঠানে উপদেশ করেন, বাহাতে অবা-
স্তর শুভগতি ও চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়। ব্রহ্ম-
বিশ্বাস এমত উদ্দেশ্য নহে যে, সিপ্যা ও
মায়াস্বর বগিরা উক্তভাবে ঈশ্বর, জগৎ ও
স্বর্ণপ্রসম্বন্ধকে উড়াইয়া দিবে। যে গৌড়ায়-
বান পুরুষ ব্রহ্মবিশ্বাস অস্বীকার করেন,
তাঁহাকে অতি মানবানুভার সহিত আত্ম-
শাসন অবলম্বন করিতে চাইবে। তিনি
মনে রাখিবেন যে, লোকের বুদ্ধিতেই করা
তাঁহার কর্তব্য নহে। তাঁহার কর্তব্য যে,
তিনি আপনি স্বর্ণপ্রসম্বন্ধ পালনপূর্ব্বক
লোকদিগকে অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবেন।
কেননা স্বর্ণপ্রসম্বন্ধের সুদেশী শাস্ত্রানুষ্ঠান
দ্বিজাগা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাদিগকে

ত্রস্তাবিচার অতীতগনে এবং বিধিবিচিত্র আশ্রমধর্মপালনে উৎসাহ ও উপদেশ দান করিবেন ।

৪২। কেবল জ্ঞানাদিকারে দ্বৈতব জগৎ ও ধর্মাদর্শ সারাসর । সে জ্ঞান অন্ন-লোকেরই ভাগ্যে উদ্ভিত হয় । উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শনের ব্রহ্ম-উপদেশ সেই জগৎ লোকের নিমিত্ত । তত্ত্বিন্ন এই সমস্ত শাস্ত্রে নিরাসিকারীদিগের জন্ম সঙ্গ-দেবতা-নাদি ভাবত্ব ধর্মের উপদেশ আছে । সাংখ্য-দর্শনেও আত্ম-উপদেশের আনাত্মর এই সমস্ত ধর্মাত্মভাৱের আদেশ দৃষ্ট হয় । সৃষ্টি ও কর্মের অধিকারে, উপনিষৎ, বেদান্তদর্শন, কর্মমীমাংসা-দর্শন, সাংখ্যদর্শন এবং ভায়-দর্শন—ইহারা সকলেই জগৎ-জীবনের ও জগদীশ্বরের প্রবাহরূপ ধ্রুপনিত্যতা স্বীকার করেন । অতএব দ্বৈতরকে, জগৎকে ও ধর্মাদর্শকে দিগা বলিয়া উড়াইয়া দিবার পূর্বে, ব্রহ্মজ্ঞানার্থী পুরুষ ভাল করিয়া শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন ।

৪৩। আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ ব্যবহারে সম্পূর্ণ সরলচিত্ত হইবেন । সহজ প্রায়ই ধার্মিক, ভক্ত, যোগী ও জ্ঞানীগণের কোন না কোন প্রকার অশৌকিক ভাব-ভঙ্গি দেখিতে ভালবাসেন । কিন্তু যে পুরুষ আত্মজ্ঞ, তিনি অশৌকিক ভাব বা বেশাদির পক্ষপাতী নহেন । তাঁহার কোন বিশেষ উপাধি, বেশ এবং চিহ্ন নাই । তিনি গৈরিক বসন, দীর্ঘকেশ, অটাতার, মুণ্ডিত সতত প্রভৃতি কোন ধর্মধ্বজা ধারণ করেন না । তিনি চক্ষু মুণ্ডিত করিয়া সর্বদা ধ্যান—সমাধিতে ও নিমগ্ন থাকেন না; যথো

যথো দশাভ্রান্ত ও হন না এবং ভাবের কপাও কন না । তিনি সাধারণতঃ গৃহত্যাগ্রমণাঙ্গী অছাত্ত বর্ণাশ্রমচারী, দেব-দেব-শুকতত, নিতানৈমিত্তিকাদিকর্ম্মাশ্রুতানকারী ব্যক্তি-দিগের শ্রেণীর একজন ব্যক্তি মাত্র । তাঁহার ব্যবহার, কপাচার্ত্ত, জিয়া-কর্ম্ম এবং জীবিকা-সংগ্রহ, সমস্তই সরল, শৌক্য ও শাস্ত্রীয় বৃত্তিসম্মত (rational), লোকের অমুদ্বৈগম্য এবং বহ্বারম্ভবর্জিত । যে কালী করলে, তাঁহার নিম্নের ও পরের চিত্তবিক্ষেপ হয় বা মগ্নাজের শাস্ত্রিত্ত্ব হয়, এমত কার্য হইতে তিনি নিবৃত্ত থাকেন । গৃহত্যাগ্রমণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী আত্মজ্ঞ পুরুষের সাধারণতঃ এই লক্ষণ । গৃহধর্ম্মত্যাগী গম্যাঙ্গী আত্মজ্ঞানীর কপা স্বতন্ত্র ।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু ।

ধ্বনি-বিচার ।

—:~:~:~—

সম্প্রতি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার শ্রীযুক্ত নামেজ মুন্সের জিবেদী "ধ্বনি-বিচার" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন । প্রবন্ধটিতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে বলিয়া আমরা উহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিন্দু পত্রিকার সন্নিবেশিত করিলাম ।

বাক্যের সহিত অর্থের নিত্য সম্বন্ধ । কিন্তু এই সম্বন্ধ কিরূপে আসিল, তাহা সুশীলম নিরূপণ করিতে সমর্থ হন নাই । ভাবের কতকগুলি শব্দ যে বাতাবিক ধ্বনির অঙ্ক-করণে উৎপন্ন, তাহাতে বিন্দুগাজ সন্দেহ নাই । বাতাবিক ধ্বনির অঙ্করণে ভাবের

উৎপত্তি হইয়াছে, এই সম্বন্ধে ইংরাজীতে পণ্ডিতেরা "অনোম্যাটোশিক - থিওরি" বলেন।

ধ্বনির অনুলকরণে যে শব্দকল্প সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা ভাষার সম্পর্কিত পশ্চিমবঙ্গের নাম 'কা' 'কা' করে বলিয়া কালের নাম 'কাক', 'কুক' 'কুক' করে বলিয়া কোকিলের নাম কোকিল, 'কেঁটে কেঁটে' করে বলিয়া কুকুরের নাম কুকুর। বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে ক'রিনা, উঠাই প্রমাণ করিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা। এই আলোচনার প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে লেখক ধ্বনির উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়াছেন।

বাণীতে ফু দিলে, তাহা উঠতে ধ্বনি বাতির হয় এবং তাহা শুনিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করি। এই আনন্দে মুগ্ধ হইয়া গোপীপদ কদমতলার নন্দীয়ারী হরির পানে ছুটিতেন। ধ্বনিতে যেমন আনন্দের সম্পর্ক আছে, উহার সাপে নিরানন্দের সম্পর্কও আছে। ধ্বনি যেমন আনন্দদায়ক, কখন কখন উহা ভেদনি ক্লেশদায়ক। কোন ধ্বনি কিরূপে কি ভাব জাগায়, তাহা পণ্ডিতগণ বলিতে পারেন না; তবে কোন কোন ধ্বনি মধুর হইবে এবং কোন কোন ধ্বনি কঠোর হইবে, তাহার একটা ভেদ নির্ণয় করিতে পারেন।

বাণী বাজাইলে, বাণীর ভিতর আনন্দ বায়ুটা কাঁপিয়া উঠে এবং বাতির বায়ু-রাশিতে তরঙ্গ (wave) সৃষ্টি করে। সেই কম্পমান বায়ুতে টেটগুলি কর্ণের ভিতর সাধুবলে আঘাত করে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধ্বনির জন্ম হয়। তরঙ্গের সংখ্যা হ্রাস

ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির কৌশলতা ও তীব্রতা নির্দিষ্ট হয়। এই সংখ্যার ঠিক হিসাবও নির্দিষ্ট হইয়াছে।

তানবুরার তানে বা দিলেও কীরূপ তরঙ্গ উঠে, সংখ্যা কাঁপে, চারিদিকের বায়ু-রাশিতে তরঙ্গের ঢেউ জাগে এবং তরঙ্গের পরিমাণ আমরা ধ্বনি শুনিতে পাঠি। লক্ষ্য হবার সেকেন্ডে সহ স্টেট জমায়ে, খাটো চোর তার চেয়ে বেগী যায়; কালকেই তাব সহ গায় হয়, ধ্বনি ততই নীচে নামে বা কোমল হয়।

আবার ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি মিশিয়া স্বরমধুর্যের উৎসর্গ বাড়ায়। বাণীর ভিতর সমস্ত বাতাসটা স্বর-সংযোগে কাঁপিয়া উঠে; আবার এই বাতাস আপনাকে ছুঁ-তিন চারি সমান গুণে ভাগ করিয়া লটরা, এক এক ভাগে আপন আপন ধ্বনি জমাটরা কাঁপে; কোন ধ্বনিটা তীব্র, অথবা কোমল। কোমলে তীব্র মিশ্রিত হইয়া ধ্বনির সাধুর্য বাড়িয়া দেয়। বাণীর ভিতরে বাতাস বা তরঙ্গ-বল্লব তার যেমন আপনাকে সমান সমান ভাগ করিয়া লটরা, মধুর ধ্বনি উৎপাদন করে, টেনিশের উগর কাঠঠক করিয়া ঠোকর দিলে, কাঠখানা কাঁপিয়া উঠে এবং কাঠফলকটা আপনাকে নানা ভাগে ভাগ করিয়া লয়; কিন্তু উহার ভাগ-গুলি এলো মেলো হইয়া পড়ে এবং এই সকল ভাগ হইতে যে সকল ধ্বনি জন্মে, তাহার এক যোগে একটা বর্ধন শব্দ উৎপাদন করে; এইরূপে আমরা বর্ধন ও মধুর ধ্বনির উৎপত্তি বুঝিতে পারি। এখন

কিন্তু আমাদেৱ স্বাভাৱিক বাক্যেৰ উৎপত্তি হুইবাহে, তাৰা বুঝিব।

আমাদেৱ বাগ্‌সমূহটা অনেকটা বাঁশীৰ মত। কুন্ কুন্ হুইতে প্ৰাৰম্ভেৰ বায়ু মুখকেটেৰে আসিবাৰ সময় কৰ্ণনাশীৰ পেণীনিশ্ৰিত তাৰে আঘাত দিয়া, ঐ তাৰকে কাঁপাইয়া পৰে এং তাৰেৰ কম্প মুখকেটেৰেৰ বায়ুৰ মধ্য চেটে জন্মায়। সেই চেটেগুলি মুখকেটেৰ হুইতে বাহিৰে আসিবা কৰ্ণগত হুইলে, বাহিৰে আসিবা ধ্বনি জন্মায়। বাহিৰ হুইবাৰ সময় কোপাৎ কোন বাধা বা আটক না পাইবা বাহিৰ হুইলে, উহা অৱ বৰ্ণেৰ উৎপত্তি কৰে, আৰ কোনস্থানে বাধা পাইলে, বাঞ্জনবৰ্ণেৰ উৎপত্তি কৰে। মুখবাদন কৰিয়া বা নিবৃত্ত কৰিয়া আনৰা অৱবৰ্ণন না বাঞ্জনবৰ্ণেৰ উচ্চাৰণ কৰি। আৰ বাঞ্জনবৰ্ণ উচ্চাৰণ কৰিবাৰ জন্ম বহিৰ্গমনেৰ বায়ুক বাগ্‌সমূহেৰ কোন এক স্থানে আটক হুইবা কেলি। কৰ্ণহীনী কাঁপাইবা, কৰ্ণ-নাশী হুইতে বাতাস বাহিৰ হুইতেছে, এসময় সময় কণেৰ মত চিহ্নবাৰ গোড়াটা উপৰে ডুলিয়া কৰ্ণেৰ দ্বাৰ বন্দ কৰিলে, ধ্বনি বাহিৰ হুইল 'ক'—উহা বাঞ্জন বৰ্ণ। চিহ্নবা মুগেৰ স্পৰ্শকালে উহাৰ উৎপত্তি, এইজন্ম উহাৰা দিলে মূৰে স্পৰ্শবৰ্ণ। অথবা চিহ্নবাৰ মধ্যভাগ তালুকে স্পৰ্শ কৰিয়া বাতাস আটকাইলাম, আৰ ধ্বনি হুইল 'চ'। উহা জালবা স্পৰ্শবৰ্ণ, অথবা চিহ্নবাৰ অগ্ৰভাগ উন্টাইবা উপৰে ডুলিয়া, তালুৰ পশ্চাতে বেথানটাকে মুৰ্ছা বলে, সেই খামটা স্পৰ্শ কৰিলে ধ্বনি হুইল 'ট'। আবাৰ চিহ্নবাৰ উপৰিভাগ উপৰ পাৰীৰ ধাতে ঠেকাইবা

বাতাসটা বন্দ কৰিয়া মাত্ৰ ধ্বনি জন্মিল 'ত'—উহা দন্তাস্পৰ্শবৰ্ণ। আৰ হুই ঠোটা পৰস্পৰ স্পৰ্শ কৰিয়া, তাৰাৰ মধ্য দিয়া জোৰে বাতাস ছাড়িলে, জন্মিল 'ণ'—উহা ওষ্ঠা স্পৰ্শবৰ্ণ।

পূৰ্বে বগিয়াছি, নৱকৰ্ণ একটা বাঁশীৰ মত। বাঁশীৰ ভিতৰ হুইতে বাতাস অবাঁহত তাৰে প্ৰাৰম্ভ হুইলে সে বহুক্ষণ স্থায়ী ধ্বনি জন্মায়, সে বৰেৰ ধ্বনি। সেই বাতাসেৰ পৰোপ কৰিলে, ক্ৰান্তায়ী বাঞ্জনৰ উৎপত্তি হয়। বাঞ্জন-ধ্বনিৰ একটা লক্ষণ হুইল, উহা ক্ৰান্তায়ী। এত অল্প সময় ব্যাপিয়া উহাৰ ত্ৰিভি যে, পূৰ্বে বা পৰে অৱ ধ্বনি না থাকিলে, উহাৰ উচ্চাৰণ চলে না। আনৰা 'কা' কি কু' ইত্যাদি অৱস্থ বাঞ্জন উচ্চাৰণ কৰিতে পাৰি; আবাৰ অক্, ইক্, উক্ এইৰূপে আদিতে অৱ বসাইবা ও বাঞ্জনৰ উচ্চাৰণ বুঝিতে পাৰি; কিন্তু অৱবৰ্জিত খঁটি বাঞ্জনটুক্ উচ্চাৰণ কৰিতে পাৰি না। বায়ু বৰ্ণনাৰা হুইতে মুখকেটেৰে বাহিৰ হুইবাৰ সময় যদি বাধা পড়ে, সেই বাধাৰ সময়কালে বাহিৰ অৱ বাহন ধ্বনি; বাধাটা গৰিয়া গেলে সাহা আগে, তাৰা অৱ।

খঁটি অৱেৰ উচ্চাৰণে মুখ একেবাৰে খোলা বা নিবৃত্ত থাকে; তবে মুখকেটেৰে টাৰ আকৃতি অল্পপাৰে ঐ অৱেৰ বিকাৰ উৎপত্তি হয়। 'আ' উচ্চাৰণ সময়ে আসৰা একেবাৰে বদন ব্যাদান কৰিয়া থাকি; তখন জিবেটা মুখ-হাৰেৰ নীচে নাগিয়া সদুচিত হুইবা থাকে। 'ই' উচ্চাৰণেৰ সময়কিহ্না উপৰে উঠিয়া তালুৰ নিকটবৰ্তী হয়—চিহ্নবাৰ অগ্ৰভাগ নীচেৰ পাৰীৰ

হাতের পশ্চাতে আসিয়া পড়ে। মুখের কোটির তখন অনেকটা ছোট হইয়া পড়ে। 'উ' উচ্চারণের সময় মুখ-কোটির আরও ছোট হয়; ছোট হোঁচি কাছাকাছি আসে এবং ছোট হোঁচির মাঝে একটা বিবর উৎপন্ন হয়। এই বিবরের দ্বারা দিয়া বায়ু বহির্গত হয়। মুখ-গহ্বরের আকার ও আয়োজন ভেদ অনুসারে অরের এইরূপ ভেদ হইয়া থাকে।

কোন কোন ধ্বনি মিশিয়া কি কি অর উৎপন্ন হইয়া থাকে, আরমান্য পণ্ডিত হেলম হোলজ প্রথমে তাহার তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিলেন। 'অ', 'ই', 'উ' প্রভৃতি বিভিন্ন অরের মধ্যে কোনটার ভিতর কি কি ধ্বনি আছে, তাহা তিনি বিশ্লেষণ দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং বিশ্লেষণে যে যে ধ্বনি বাতির হইয়াছিল, সেই সেই ধ্বনি মিশাইয়া 'অ', 'ই', 'উ' প্রভৃতি অর স্বরযোগে উৎপাদন করিয়াছিলেন। এ সকল পরার্থ-বিজ্ঞান শাস্ত্রের কথা। ব্যাকরণের এত সূক্ষ্মত্বের খোঁজ নেওয়া তর না। এখানে মোটামুটি হিসাব চলে। এই মোটা হিসাবে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষার প্রচলিত বর্ণমালায় তিনটা বিশুদ্ধ অর আছে 'অ', 'ই', 'উ', এই তিন অরের প্রত্যেক আবার সাতা ভেদে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, এই তিনটা করিয়া রূপ আছে, যথা—অ, আ, ঐ, ঐঐ, উ, উ, উ; এই নয় অরের প্রত্যেকের আবার ছইনী করিয়া ভেদ আছে। নাক দিয়া কতক ছাওয়া বাতির করিয়া আসিয়া প্রত্যেক অর উচ্চারণ করিতে পারি;—যথা—অ (অ) কখনো কখনো হইতে জোরের সহিত ছাওয়া

বাহির করিতে পারি—যথা—অঃ। এই ছই ভেদে শব্দ যার ও বিদগ্ন বাঞ্জম কি অর, টহা শব্দে একটা তর্ক আছে। বাস্তবিক উণ অরও নহে, বাঞ্জমও নহে। উহা অরবর্ণের নিকৃতি বুঝাইবার চিহ্ন সাজ। উল্লিখিত নয়টা অরের এই বিভিন্ন বিকার হইতে পারে, যথা—অ, অঃ, আ, আঃ; এইরূপে সমুদয়ে ২৭টা অর উৎপন্ন হয়। এই ২৭টা অর-ধ্বনি তিনটা মূল ধ্বনিরই (অ, ই, উ) রূপভেদ সাজ।

অ, ই, উ ইহাদের পরস্পর সন্ধিতে কয়েকটা সন্ধাকারে উৎপন্ন হয়, যথা—

$$\left. \begin{array}{l} \text{অ} + \text{ই} = \text{ঐ} \\ \text{অ} + \text{উ} = \text{ঔ} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{অ} + \text{ঐ} = \text{ঐ} \\ \text{অ} + \text{ঔ} = \text{ঔ} \end{array}$$

এইদ্বয় সংস্কৃত বর্ণমালায় ঐ ও ঔইটা বর্ণ স্থান পায়। উত্তারা অর মধ্যে গণিত হইলে ৩০ খঁটা অর নহে। ঐ উচ্চারণের সময় প্রায়ই জিহ্বাও স্পর্শ করে, ঐ উচ্চারণ কথিত সময় জিহ্বাও প্রায়ই উপর পাটীর দাঁত স্পর্শ করে। প্রায় করে, একটু ফাঁক থাকিয়া যায়; এইজন্য ইহাদিগকে বাঞ্জনের মধ্যে না ফেলিয়া, অরের মধ্যে ফেলা হইয়াছে।

'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' এই স্পর্শবর্ণ কয়েকটা মুখ-কোটিরের তিনই স্থানের স্পর্শের ফলে উচ্চারিত হয়, দেখা গিয়াছে। প্রত্যেকের আবার রূপভেদ আছে।

স্পর্শের সময় একটু জোর দিলে, ছাওয়াটা একটু জোরে বাহির হয়, তখন 'ক' পরিণত হয় 'খ'য়ে; 'চ' পরিণত হয় 'ছ'য়ে, উতাদি। 'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' এই পাঁচটা অর ধ্বনি; ঐ চ ঐ ঐ ক, এই কয়েকটা সন্ধাপাণ।

আবার হাওয়ার পরিমাণ বেশী হইলে, 'ক' 'চ' 'ট' 'ত' 'প' বর্ণক্রমে 'গ' 'জ' 'ড' 'দ' 'ন' 'ব' 'স' 'হ' 'ল' 'শ' 'ষ' 'স' 'খ' 'গ' 'ঘ' এই চারি রূপ গ্রহণ করে,

আর উচ্চারণ কালে নাক দিয়া কঁতক হাওয়া আসিলে, উহার আনুমানিক রূপ হয় ঙ। কাজেই জিহ্বামূলের স্পর্শবর্ণ ক-বর্ণের অন্তর্গত পাঁচটা বর্ণ ক খ গ ঘ ঙ; ঐরূপ ভাণব্য চ বর্ণের অন্তর্গত চ ছ জ ঝ ঞ ইত্যাদি বর্ণমালার বাহ্যবর্ণগুলি এইরূপ সাজান যাইতে পারে।

স্পর্শবর্ণ।

	ষোড়শোন		ষোড়শোন		আনুমানিক	সদ্যাক্ষর	
	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ		সদ্যাক্ষর	উচ্চ
জিহ্বামূলের	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	—	—
ভাণব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	স	শ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	র	ষ
দন্ত্য	ত	থ	দ	ধ	ন	ল	স
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম	য	—

সংস্কৃত বর্ণমালার বর্ণ 'হ'কে কঠ্যবর্ণ বলা চলে। অ যেহেতু মহাপ্রাণ হইয়া 'হ'য়ে পরিণত হয়।

উচ্চারণ তালু হইতে মূর্ধা এবং দাঁতের গোড় হইতে বাহির হয়, এই জন্ত ইহাদের পরস্পরের বিভিন্নতা।

'স' 'র' 'ল' 'ব' এই চারিটি অন্তর্ভুক্ত বর্ণকে সদ্যাক্ষর রূপে গণ্য করা যাইতে পারে।

পূরে বাগা বলা হইয়াছে, তাহাতে ইহা বুঝা যায় যে, স্বাভাবিক ধ্বনির অক্ষররূপে সমুদ্রের ভাষার অনেকাংশ নির্মিত হইয়াছে।

$$\left. \begin{array}{l} \text{স} = \text{ই} + \text{অ} \\ \text{র} = \text{ধ} + \text{অ} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{ল} = \text{৯} + \text{অ} \\ \text{বু} = \text{উ} + \text{অ} \end{array}$$

বাক্যের ভাষা নির্মাণকার্যে এই অক্ষরগুলি কতদূর চলিয়াছে, তাহাই পরচর্চা। কতিপয় ধ্বনির একযোগে এক একটি শব্দ গঠিত হয়; এক শব্দের উপর এক বা একাধিক অর্ণের আয়োগ করা হয়; সেই শব্দের সেই অর্থ কোথা হইতে আসিল গঠনে যে যে ধ্বনি উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ধ্বনির সহিত সেই সেই অর্থের একানরূপ সম্পর্ক আছে কি না, তাহা দেখান আবশ্যিক। তাহা হইলেই, বুঝতে

উহাদের উচ্চারণে সম্পূর্ণভাবে সুখ বিন্দুত থাকে না, আবার হাওয়া একেবারে আটকান পড়ে না, কাজেই উহা না বর—না বাঞ্ছন।

গঠিত হয়; এক শব্দের উপর এক বা একাধিক অর্ণের আয়োগ করা হয়; সেই শব্দের সেই অর্থ কোথা হইতে আসিল গঠনে যে যে ধ্বনি উপাদান রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সেই ধ্বনির সহিত সেই সেই অর্থের একানরূপ সম্পর্ক আছে কি না, তাহা দেখান আবশ্যিক। তাহা হইলেই, বুঝতে

'শ' 'ষ' 'স' তিনটি বর্ণ আছে। জিহ্বা যেখান বায়ু বাহির হইবার সময় বায়ুর ঘর্ষণে এই এই ধ্বনি জন্মে। ইহাদের নাম উচ্চারণ—এবং বর্ণক্রমে এই তিনটির

দেখান আবশ্যিক। তাহা হইলেই, বুঝতে

পারা বাইবে, কেন ঐ শব্দ ঐ রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিবরণ আলোচিত হইবে।

প্রথমে 'আ' 'ই' 'উ' এই স্বরত্রয়ের ক্ষেত্র কোথায়, তাহা দেখা যাইক। 'আ' উচ্চারণে আনন্দা বদন ব্যাদান করি; মুখকোটরের পরিপন্ন ও আনন্দন যথাশক্তি বাড়াইয়া লই 'ই' উচ্চারণে মুখকোটরের আনন্দন ছোট হইয়া পড়ে; 'উ' উচ্চারণে আনন্দ ছোট হয়। 'আ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বরের মধ্যে আ বড় বঝায়; ই তার চেয়ে ছোট; উ আনন্দ ছোট বঝায়।

বাঙ্গালার 'টা' 'টি' 'তু' এই তিনটি প্রকার আছে। যথা একটা, একটি, একটু। 'একটা' বলিলে বস্তু বড় বঝায়, 'একটি' বলিলে তার চেয়ে ছোট বঝায় এবং 'একটু' বলিলে আনন্দ ছোট বঝায়।

চুক্চকে জিনিষ বলিলে উচ্ছল জিনিষ বঝায়, চিক্চিকে জিনিষের উচ্ছল্য তার চেয়ে কম। চুক্ চুক্ জিনিষের উচ্ছল্য যথেষ্ট তার চেয়ে আনন্দ কম।

চন্চনে নৌজের চেয়ে চিন্চনে নৌজের দীপ্তি কম। 'পটপটে' জিনিষ চালু ও উজ্জ্বল; 'পিটপিটে' জিনিষ আরও চালু ও উজ্জ্বল এবং 'পুটপুটে' জিনিষ এত উজ্জ্বল যে হাতে মাড়াচাড়া করা কঠিন।

এই কয়েকটি দৃষ্টান্তেই 'আ' 'ই' 'উ' এই তিন স্বর একই বাঞ্ছন বর্ণে যুক্ত হইয়া কিরূপে ভিন্নভাবে জ্ঞাপন করে, তাহা দেখান হইল। প্রত্যেককার বাঞ্ছনবর্ণ লইয়াও ঐরূপ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গালী ভাষায় কনি অল্পসংখ্যক অনেকে

শ্রী শব্দের ভাবের পরিবর্তন ঘটে। ইচ্ছা দ্বারা মনে হয়, ভাষা কনির উপর সংস্থাপিত। এক্ষণে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, বাহাতে আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করে। কিছু ভাষার অনর্গত বাগ্গীয় শব্দেরই এইরূপে উৎপত্তি বুঝা যায় না। ইহাই প্রত্যেককারের মন্তব্য।

আমরা উক্ত প্রবন্ধটীর সারসংক্ষেপ এখানে দিলাম। প্রত্যেককারের বুদ্ধিমত্তার আনন্দ প্রাপ্তি করি। তিনি দিন দিন এইরূপ স্বাধীনচিত্ত-পন্থিত প্রবন্ধ দ্বারা বাঙ্গালী ভাষার উন্নতি সাধন করুন, এই আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

অভিধর্ম বা বৌদ্ধদর্শন।

(পূর্বাহ্ব্যুত্তি।)

স্বপ্নস্বপ্নাদি বেদনা কেবল যথার্থ দেখিয়া যাওয়া বা সদা স্মরণীয় রূপে বেদনাপ্রাপ্তনাম্বিত।

চিত্তেরও সেইরূপ স্মরণ, স্মরণাদি তাব স্মরণীয় রূপে চিত্তাপ্রাপ্তনাম্বিত। শব্দ বা সংজ্ঞা ও সংস্কার শব্দকে সেইরূপ দেখা শব্দাপ্রাপ্তনাম্বিত প্রস্থান। ইহারাই সম্যক স্বত। তদ্ব্যতীত উহার সহায় শব্দ অস্বত আছে। "অস্ব অস্ব শরণং অস্বস্বত" অর্থাৎ অস্বক্রমে স্মরণ অস্বস্বত। তাহারি যথা—বুদ্ধাস্বস্বত, শব্দাস্বস্বত, সঙ্ঘাস্বস্বত, শীলাস্বস্বত, ত্যাগাস্বস্বত, দেবতাস্বস্বতি (প্রভাবি সমস্বরণিত দেবতাদের গুণ আনন্দে আনন্দ, এই ভাবে দেবচিত্তা), উপস্ব শব্দাস্বস্বতি (সর্বস্বরণের উপস্ব শব্দ),

সরণাচ্ছন্দ, কারণত্ব ও আলাপানত্ব
(স্বাস-পথসের স্রবণ) এষ্ট দশ ।

লোকোক্তর সমাধিতে সমাক্ গমাধি। কুশল
চিত্তের একাগ্রতাই সমাধি। তাহার লক্ষণ
অবিক্বেপ; বিক্বেপ বিকল মন রস। অবি-
কল্পন গভূপস্থান এবং সুপ পদস্থান।

সূত্র আত্মপর্বে সমাধির এষ্ট লক্ষণ আছে—
স্থিতি, সংস্থিতি (গম্পিগ্নিত ভাব), অব-
স্থিতি (অসংগাহন ভাব), অবিসাহার
(অবিসার ভাব বা অনৌদ্ধত্য), অবিক্বেপ
অবিসাহার মানসতা (মানসকার্যে একরূপ
প্রবাহ), সমথ (শান্তি), সমাধীভ্রমর,
সমাধি-বল ।

সমাধি অনেক প্রকারে বিভক্ত হয়,
যথা—উপচার সমাধি, অঙ্গনা সমাধি, লোকীয়
সমাধি, লোকোক্তর সমাধি ইত্যাদি। উপচার
(অর্থাৎ অঙ্গনার সমীচরী) অপর সমাধি
যেন শিখর চণনেব মত। আর অঙ্গনা পরিপক্ক
সমাধি যেন বলাবান্ পূর্বের চলনের মত।
লোকীয় সমাধি কামানচরাদি ক্রিষ্টিক
লোকোক্তর সমাধি লোকোক্তর কৃতিক। সমাধি
সাধনের অষ্ট "কণ্ঠস্থান গ্রহণ" করিতে হয় ।

সমথ বা শান্তিগামক কর্মস্থান ৪০
সংখ্যক আছে। তন্মধ্যে বাহার যে কুলি
প্রকৃতির অহুকুল, তাহা গ্রাহ্য। পূর্বোক্ত
দশ অষ্টভ ভাবনা, দশ চন্দ্রত্ব, ঐন্দ্রাদি
চারি ব্রহ্মনিহার, আহারে সত্বিকুল সংজ্ঞা
(অঙ্গের অর্জনা দিব্য ভাবনা), বাবস্থান
(পুণিক্যাদির বাহুর শরীরে কেশাদিক্রমে
যে ভাব আছে, তাহার ভাবনা), দশ কসিন
ত্ব অক্ষাশাপস্তম্ররতনাদি চারি আরাণ্য-
আগমন—এই সকলের নাম কর্মস্থান ।

বিতর্কাদি পক্ষ সমাধাদ লোকীয় বা
লোকোক্তর উভয় সমাধিতে সাধারণ।
কসিন বা মাননিবর্তক উপায় দশ প্রকার—
(মতান্তরে অষ্ট প্রকার) পৃথিবী, আগো,
তেজো, বায়ো, মীল, পীত, লোহিত, অবনাত
(যেত) আকাশ ও আগোক, এই দশ
কসিন ।

পৃথিবী কসিন এইরূপে সাধা—প্রথমে
সর্গপ্রকার, বায়ু চিন্তা ও শবীরধারণের
অতিরিক্ত কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক নিকপত্র
স্থানে অরুণবর্ণ গলাস্থিতিকার মত স্থিতিকার
এক তাল (বাসিনমণ্ডল) চক্ষুর সমোচ্চ-
দেশে স্থাপিত করিয়া, তাহাকে নিকট হইতে
দূর চক্ষে দেখিতে থাকিবে। পরে চক্ষু
বুজিলেও উচ্চ (বাসিন মণ্ডল) বধন মনে
মনে দৃষ্ট হইতে থাকিবে, তখন তাহাকে
উপস্থানিমিত্ত বলা যায়। "পৃথিবী, পৃথিবী,
পৃথিবী" এইরূপ নাম সহকারে ঐরূপ ধ্যান
করিতে হয়। পরে উগ্রহ নিমিত্ত বধন
কসিন-দোষশূন্য হয়, তখন তাহাকে সাত-
ভাগ নিমিত্ত বলা যায়। এইরূপে
পাণ্ডি নিমিত্ত (তন্নরতা) গ্রহণ করিয়া
সবিতর্কাদি পক্ষনিধ ধ্যান উৎপন্ন হয় ।

কোন কুণ্ডিকা অনাবিল জলে পূর্ণ
করিয়া আগো-কসিন ভাবনা করিতে হয়।
দীপশিখা, দানায়ি বা কোন অগ্নিতে
তেজো-কসিন হয়। কোন পর্দায় অর্ধ
হস্তাধিক পরিমিত চক্রাকার ছিদ্র করিয়া
তন্মধ্য দিয়া তৎসমান জলি-রূপ দর্শন পূর্বক
তেজো-কসিন্ ভাবনা করিতে হয় ।

বায়ু শরীরে লাগিলে, তাহার অহুত্ব
পূর্বক অথবা ইস্কু আদির কেজ বায়ু বায়ি

স্পষ্টিত দেখিয়া বায়ুর ধারণা পূর্বক বায়ু-নির্মিত গ্রহণ করিতে হয়। কোন নীল পুষ্পের পত্রের ধারা এক করণ পূর্ণ করিয়া নীল কসিন ভাব্য। পীত, শোহিত, অব-দাত কসিনও ঐরূপ।

ভিত্তি-ছিত্তাদি-আগত আলোকে আলোক-কসিন ভাব্য।

সেটরূপ বাতায়নাদিগত পরিচ্ছিন্ন আকাশে (কাঁক স্থানে) আকাশ-কসিন্ ভাব্য। সূতাবিত হইলে, কসিনের প্রতি-ভাগ নির্মিত উৎপন্ন হয়। তদ্বারা উর্ধ্ব, অধঃ, তীর্থাঙ্ক, অধর (সর্কদিগ্যাপী) ও অপ-মাণ ভাবে নির্মিত উৎপন্ন হয়। *

কসিন-কল রূপাবচরের অন্তর্গত। কসিন-ধ্যান হইতে কতকগুলি সিদ্ধি লাভ হয় এবং এতাবন্মাত্রাধ্যায়ীরা রূপলোকে গমন করেন। যোগদর্শনোক্ত ভূতজরাজনিও সিদ্ধির সহিত কসিনজনিও সিদ্ধির প্রায় ঐক্য আছে। বিশুদ্ধমার্গের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে কসিনের বিস্তৃত বিবরণ আছে। উহাই বর্তমানে কসিনাধ্যায়ীদের একমাত্র অবলম্ব্য শাস্ত্র।

এস্থলে পঞ্চ প্রকার ধ্যানের বিবরণ ব্যাখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া যাউতেছে।

* ভগবান্ পতঞ্জলিও বলেন—“পরমণু পরম মহত্তা স্তোত্রস্ত বশীকারঃ” বস্তুতঃ কসিন সাংখ্য শাস্ত্রোক্ত ভূতের স্থলরূপ ও স্বরূপ ধ্যান। ভূতত্ব ধ্যানে সাংখ্যমতে শাস্ত্রাদি পঞ্চাঙ্গ আলম্বন করিতে হয়, কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন, গড়, মস ও স্পষ্টব্য বিবরণরূপ লোকে নাই। নাই উহা সত্য নচে, তবে মনুষ্য উহার পিত অপেক্ষা সচ্চিত বলিয়া তত গ্রাহ্য নহে।

বস্তুতঃ উহার চিত্তৈর্ঘ্যের এক এক প্রকার অবস্থা। যোগে বেদে যথাযোগ্য ভাবে উহার লোকীয় বা লোকোত্তর হয়।

তন্মাত্রে প্রথম ধ্যান যথা—কাম ও অকুশল কর্তৃ হইতে নিবৃত্ত হইয়া সবিতর্ক সবিচার বিবেকজ্ঞ (আভাস্তরিক্ত নিবৃত্ততাজনিত) শ্রীতিসুখযুক্ত প্রথম ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিহার + করেন।

দ্বিতীয় ধ্যান যথা—বিতর্ক ও নিচারের উপশম হইতে অধ্যাত্ম সম্প্রদান চিত্তের একাদি ভাব (একাত্রতা), অব্যব-কৃত্ত শ্রীতি-সুখ (রূপ দ্বিতীয় ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিহার করেন।

তৃতীয় ধ্যান যথা—শ্রীতির (মানসসুখ) নিরাক্রম হইলে উপেক্ষক হইয়া বিচার করেন। (তখন) স্মৃৎ (স্মৃৎমান্ ও সম্প্রকৃত্ত (মানসিক ঘটনার বোধযুক্ত) হইয়া “কার্য” সুখের প্রতিগম্বদন করেন। এ বিষয়ে আচার্য্যারা বলেন “উপেক্ষক স্মৃৎমান্ সুখ বিচারী” ইত্য এতরূপে তৃতীয় ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিচার করেন।

চতুর্থ ধ্যান যথা—সুখ ও চিত্তের পতন হইলে, পূর্ণেকার সৌম্যস্ত ও দৌর্ধ্বনস্ত অন্তর্গত হইলে, অতঃখ, অ-সুখ, উপেক্ষা ও (অথবা উপেক্ষাজনিত) স্মৃতির পরি-শুদ্ধিযুক্ত চতুর্থ ধ্যানে উপসম্পন্ন হইয়া বিচার করেন।

উহার নাম ধ্যানে চতুর্থ নর। পঞ্চক-

+ বিভলে ‘বিহারতি’ শব্দের এইরূপ অর্থ আছে, যথা—বিহারতি চিত্তৈর্ঘ্যে, পবতি, পালেতি, বপতি, বাপেতি, চমুতি, বিহারতি তেন বৃচ্চতি বিহারতি।

ময়ে একবার বিতর্ক, পরে বিচার বিধায়ক করিয়া দ্বিতীয় ধ্যানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় ।

যোগদর্শনের সমাপ্তির (বৌদ্ধেরাও ইহাকে সমাপতি বোধেন) সচিত্র টহারা প্রায় তুল্য। ভিন্ন ভাষায় কথিত হওয়াতে এবং এই ধ্যান-লক্ষণ বৌদ্ধশাস্ত্রের পাচীনতম অংশ বলিয়া, ইহা যোগীদের সম্যক্ জ্ঞেয়া ।

অতঃপর চারি আকৃপাধানে কথিত হইতেছে চতুর্থ ধ্যান মহাকার আকাশ-কগিন ভাবনাপূর্ণক তাহা প্রসূত করতঃ সেই আকাশান্তায়তন সংজ্ঞা সে ধ্যানে সহগত থাকে, তাহাকে আকাশান্তায়তন ধ্যান বলে। তাহাতে মরণঃ রূপসংজ্ঞার সমতিক্রম হয়, পতিত সংজ্ঞার শব্দাদি জ্ঞানের) অস্তগমন হয়, নানাত্ সংজ্ঞার অসংসকার হয় ।

ইহা চতুর্থ ধ্যানের বিষয় বলিয়া অভ্যর্থন্যে উক্ত হইয়াছে; কিন্তু প্রথমে “অনন্ত আকাশ” এই শব্দ পূর্ণ মানসিক বিচারের দ্বারা অনন্ততাব আনয়নের বিধি উক্ত (বুদ্ধঘোষ কর্তৃক) থাকতে, তাহা সবচোরাদিও প্রথমে হইবে। ইহা দ্বারা রূপের নিবেদ বিরাগ ও নিরোপ হয় ।

যোগশাস্ত্রে ইহা তন্মাক্তত্ব। তাহাতে ও বিষয়ের নানাত্ ও শাস্ত্ৰ ঘোর ও মুচুপতা নাশ হয় এবং উহা চারিভূগত (সাবচার, নিষ্টিচার) সমাপ্তির বিষয় ।

বিজ্ঞানান্তায়তন ধ্যানে আকাশান্তায়তন ছাড়িয়া তাহার বিজ্ঞান মাত্র লক্ষ্য করিতে হয়। আকাশান্তায়তন স্পষ্ট

বিজ্ঞানের সনসিকার পূর্ণক ইহা মাধ্যম। বিজ্ঞান আকারে অনন্ত নহে, কিন্তু সনসিকার বশে (সনসি-কাতব্ব বসেন) অনন্ত ।

ঐ সহগত বিজ্ঞান (সহজ বিষয়ক) “নাস্তি ২” * বা “শূণ্য ২” এরূপ আবর্জনা, সনসিকার ও পাত্যোক্ষণের দ্বারা বৈজ্ঞানিক রচিত ভাব হয়, তাহাট আকিঞ্চনায়তন আকৃপের চরমধানে নৈবসংজ্ঞা নামঃজ্ঞায়তন। আকিঞ্চনায়তন আক্রম পূর্ণক সূক্ষ্মতম সংজ্ঞাধখন পূর্ণক ধ্যানই নৈবসংজ্ঞা নামঃজ্ঞায়তন ।

তখন পট্ট সংজ্ঞাক্রতা থাকেন না বলিয়া তাহা নৈবসংজ্ঞা এবং সূক্ষ্ম সংজ্ঞা থাকে বলিয়া তাহা ‘ন অসংজ্ঞা’ ।

এই শেষ তিনটি সংখ্যার অন্তঃকরণ তত্ত্বধান—শেষটি বুদ্ধতত্ত্ব, কারণ বুদ্ধ সংজ্ঞার বা অনাত্মবোধের চরম সীমা। প্রাপ্তকৃত সমস্ত বোধের সমাধি; অতঃপর লোকোত্তর সমাধি কথিত হইতেছে। ইহাদের নাম চারি আর্গানার্গি। তন্মধ্যে ‘শ্রোত-আপত্তি, নামক প্রথম সার্গের বিবরণ এইরূপ—লোকোত্তর প্রথম ভূমির ধ্যান নির্গাণিক বা সংসারবন্ধন হেদ করিয়া গমনশীল, অপচয়গামীর বা কন্মক্ষয়কারীর তাহাতে অজ্ঞানম্ জ্ঞাত্যামৌচ-ইন্দ্রিয় হয়। (ইহার দ্বারা অদৃষ্ট, অজ্ঞাত, অখাপ্ত, অপিত্ত, অসাক্ষাৎকৃত ভাবের সাক্ষ্যকার হয়) ।

* বিজ্ঞানরূপ হইলে, আকিঞ্চন ও নৈবসংজ্ঞানামঃজ্ঞা ধরন হয়, কিন্তু ইহাকেও বিজ্ঞান স্বকর সামিল ধরা হইয়াছে; অতএব এই চিত্র বিজ্ঞান আত্মবাসায়িক বা representative বলিতে হইবে।

তখন কারহস্ত রত, বাগ্‌হস্তরিভ ও মিপা-
 জীবনের সেতুভাষ হই, অর্থাৎ উভাদের উৎ-
 পত্তির পথ সমাকৃৎক হয়। আর তাহাতে
 বস্তুনিচয় নামক মনোবোধ প্রজ্ঞা হয়।
 এই কয়টা পূর্ণ পূর্ণোক্ত সমাদি হইতে
 লোকোক্তের প্রথম মার্গের শেষ। বলা বাহুল্য,
 ইহাও সপিতৃকাদ চারি বা পঞ্চ ধ্যানের
 দ্বারা নিম্পন্ন হয়।

লোকোক্তের সক্রমগামী নামক দ্বিতীয়
 মার্গের ধ্যানও নির্ঘাতনিক অপচরগামী।
 ইহাতে কামরাগ ও ল্যাপাদ তহুতার পাশ্চ
 হয়। তাহাতে 'আজ্ঞ' উপশ্রম (অঞ্-
 জ্ঞেশ্রম) হয়। আজ্ঞা, জ্ঞাত, দৃষ্ট, পাপ,
 বিদিত, মাক্ষাংকৃত সমস্তের মাক্ষাংকারণতী
 চরম প্রজ্ঞা ০।

অনাগামী নামক তৃতীয় তৃত্বির ধ্যান
 নির্ঘাতনিক অপচরগামী। তাহাতে কাম-
 রাগ এবং ল্যাপাদের অনবশেষ প্রহান হয়।
 ইহাতেও আজ্ঞ-উপশ্রম থাকে।

অর্হিব নামক লোকোক্তের চরম তৃত্বিতে

০ প্রকার লক্ষণ অভিপ্রেত এইরূপ
 অসংস্কৃতসংস্কৃতান্যাদিচয় (গবেষণা) পান-
 চক্র, মনোনিচয় (ন মতা গবেষণা), সক্রমণ,
 উপলক্ষণা, পড়াগলক্ষণা বেদ করিমা
 জানা) পাণ্ডিত্য, কৌশল্য, নৈপুণ্য, বেতন্য
 (সমাগোচনা) চিত্তা, উপপদীক, (বিভিন্ন)
 ত্বিরমেধা, মেধা, পারনাম্যক (নামক-
 ত্বার), বিশুদ্ধতা, মস্তাজ্ঞান, (প্রজ্ঞা)
 প্রোভাদ, সজ্ঞে স্তম্ব, সজ্ঞাভাষ, প্রজ্ঞা-
 প্রোভাষ, সজ্ঞারত, অস্মাৎ, (তৎপরিত)
 বস্তুনিচয় সমাকৃৎকৃত।

পরবর্তী পাণ্ডিত্যের দ্বারা প্রজ্ঞা-অর্হিব
 প্রোভাদ-সংস্কৃত হইতেছে, কিন্তু তাহার
 আধিকাংশই বাপাতিবর।

কপরাগ, অকপরাগ, মান, উচ্চা, উচ্চ),
 ও আনন্ডার অনবশেষ প্রহান হয়। ইহাতে
 অঞ্ঞাভাষী প্রম + হয়।

ইহাই নিম্পাণ। সংস্কারনিশূন্য হেতু
 উহা শূন্য ও স.গা'দ পাণাদশূন্য হেতু উহা
 অসানীভত (চরম গাত) এবং অসানীভ
 বা মোম শূন্য।

প্রাশস্তক ১১মর সমস্ত পাঠে পাঠক বৃত্তিতে
 পারিবেদন য, মোক্ষমার্গ বৌদ্ধদের সম্পূর্ণ
 আছে। তাহাতে অশ্রুত আদিদের উদ্দিষ্ট
 মোক্ষপাথ গমন হয়। কিন্তু মার্গ ও গতি
 এক হইলেও, সেই মার্গ-বস্তু বুঝাইবার
 প্রাণী ভিন্ন। মাংখা ও বৌদ্ধের মে নিম্নে
 কি হেদ, তাহা আলোচনা করা যাউক।
 মাংখা সংস্কারাদি বৌদ্ধ পাতীতা সমুৎ-
 পাদাদি। ১০ ঘন বক্ষ পান'সও মৃত্তকা
 পিণ্ড পান'সও হইলেও ১০ ঘন বক্ষ থাকে,
 আবার পিণ্ড ঘট হইলেও এই পান'মাণ
 থাকে। পিণ্ড পনামোগা ভাবে সমাকৃত
 হইয়া ঘট হয়। ভূগতার ভ্রাস এবং দৈর্ঘ্য
 ও প্রকার বৃকট মেট প্রকার। কতক-
 গুণ নিম্নেত্তের দ্বারা মেট পিণ্ডিত্ত প্রায়
 ঘটরূপে বিকাশিত হয়। টতার মনো মুৎ
 উপাদান বা অস্বীকারণ এবং অল্প নিমিত্ত
 কারণ। এইরূপে বলা যায়, মৃত্তকা ঘট-
 রূপে পনিগত হইল না ঘটব উপাদান

† অঞ্ঞা- ০ জ্ঞানীভৌক্তর চরমে
 প্রথম মার্গের জ্ঞান হয়। আজ্ঞার দ্বারা
 প্রথম মার্গের কল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মার্গ ও
 তৎকল এবং চতুর্থ মার্গ, এক ছয় বিষয়ের
 জ্ঞান হয় অঞ্ঞাভাষীভিন্ন আজ্ঞাবি-
 দ্রয়) হইতে অহঙ্কার কণ বা নির্ঘাতনের
 জ্ঞান হয়।

মুদ্রিকা। এইরূপে নিম্নে ও উপাদানে সমস্ত রূপে বিশেষ করিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি রূপ চরম উপাদানে এবং পুরুষ রূপ চরম হেতুতে (নিমিত্তে) উপস্থিত হন। এই সং-কার্যাবাদে কার্য হইতে কারণ বা কারণ হইতে কার্যের অর্থ এক অর্থক অর্থহীন থাকে। তাহাই সংকাগাবাদের মূল ভিত্তি। বস্তুতঃ কার্য কারণই থাকে; কারণ কতকগুলি নিমিত্তের দ্বারা তাহার অভি-যান্তিক হয়।

নৌকমতে সমস্তই হেতু ও প্রত্যয় বা কারণ প্রাণের—অর্থাৎ উপকারক কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। হেতুও একপ্রকার প্রত্যয় বা প্রাণ গণিত হয়। অতএব উপকারক উপত্যয় কোন পদার্থ হয় না। কারণ অসংস্কৃত পদার্থ অতএব উপত্যয়। উদাহরে কিন্তু (অন্ততঃ বিজ্ঞানের) উপাদান কারণ নাই। তাহার উপাদান নিমিত্ত সকল-কেই “ধর্ম” রূপ এক জাতিতে নিষ্কোপ করিয়া বিচার করেন। অর্থাৎ মূঃ যেমন রূপাদি ধর্মসমষ্টি, ঘটও মেঘরূপ; মূঃ নামক ধর্ম সকল রূপ হেতু হইতে এবং অজ হেতু, ও প্রত্যয় হইতে ঘট (মূঃসম-সকলের সৃষ্ণ ও বিগ্ণ) নামক ধর্ম-সমষ্টি উৎপন্ন হয়।

● মতান্তরে প্রত্যয় বা প্রত্যয়োপাদানক কতকটা উপাদান কারণের সমাধিক। “অপ প্রত্যয়োপ নিবন্ধঃ পৃথগ্যপ্ তেজোবা-বুকান বিজ্ঞান পাত্ননাঃ সমগায়ান্তিত কার্যঃ। তজ কারয় পৃথগী পাত্ কঠিনা-মভিনবর্ত্তরতি” তজা পাত্ পৃথগী আ হ বাত্ (বাত্ ও পাত্ সম্পর্ক) বরূপে প্রা-য়োপনিবন্ধ উপাদান কারণের প্রায় সূচনা

তহা বাস্তবিক সাংখ্যের নিকট নহে, কিন্তু অনির্ভর অজ প্রাণের দর্শন মাত্র।

সাংখ্য বিশেষ পূর্ণক বিশেষের মধ্যে সাধারণ উপাদান আবিষ্কার করেন, ক্রমশঃ সাধারণতম অব্যক্ত নামক উপাদানে উপ-নীত হন। অর বোধক প্রাণ হইতে সমস্ত পদার্থের মূলে শূন্য পদার্থে উপনীত হইয়া পৌঙ্করা শূন্যকে অর্জন মাজ বলে মা। “শূন্য রূপেণ কৌশক তিষ্ঠতা” “রূপী রূপাৎ পশ্চতি শূন্য” “অবিচ্ছিন্ন ধ্যান” ইত্যাদি অবস্থানযোগ্য ও ভাবনায়োগ্য শূন্য রূপের অর্জন মাজ নহে।

এইরূপ শূন্য অগতের সহিত জাতি ভূলা। পৌঙ্করা প্রাচীনমান অবিলম্বে পদা-পের মূল শূন্য বলেন। সাংখ্য অবিলম্বেকে বিশেষ কারণ, পরে মূলে অব্যক্তকে স্থাপিত করেন।

নৌক বিজ্ঞানের আভিষ্কৃত কোম নৌগিক পদার্থকে কারণ মধ্যে গণনা করেন না। তাহাদের পক্ষত্বের কোনও সামান্য উপাদান নাই। তাহাদের আকি-কৃত বোধ এবং নৈন সংজ্ঞা না সংজ্ঞার বৃত্ত বীকৃত থাকিলেও, তাহার সংজ্ঞাক বা বিজ্ঞানত্বের কিরূপে অন্তর্গত, তাহা স্পষ্ট নহে। পরন্তু অনন্ত বিজ্ঞানের নিরোপ করিয়া সেই অবস্থার বাইতে হয়, এরূপ উপদেশ আছে।

সাংখ্য বুদ্ধি, অহংকার ও মনঃ নামক বৃত্ত বোধ, ক্রিয়া ও ধারণা নৃত্তিকে প্রাচী-নমান বিজ্ঞানের বা চিত্তের সামান্য উপাদান হিঙ্গু করেন।

তবে পূর্ণকবের-বর্ষ বা-অতীত-বর্ষ

এবং পদ্ধতিগত ধর্মের হেতু তা সম্বন্ধ ব্যতীত
 জ্ঞানীয় সম্বন্ধ আছে কিনা, তাইসময়ে সাংখ্য
 ও নৌকের মতভেদ হতে পারে। উহাই
 দুঃখজনক জ্ঞানবাদের মূল। বৌদ্ধ অর্থাৎ
 ও বর্ধমান ধর্মের হেতুতা ও চেতনাত্মতা
 ব্যতীত অন্য সম্বন্ধ স্বীকার করিতে আন-
 চ্ছুক। কিন্তু সাংখ্যেরা তৎপ্রাকৃত্যে যে
 যুক্ত দেন, বৌদ্ধেরা তাহার এ পর্য্যন্তও
 সহজব দিতে পারেন নাট।

বৌদ্ধ দর্শনের প্রাণালী সংক্ষেপতঃ এই-
 রূপঃ—রূপ নামক কতকগুলি বাহ্য ও
 আধ্যাত্ম ধর্ম আছে, আর সংজ্ঞা-বেদনাদি
 কতকগুলি অরূপ ধর্ম আছে। রূপের
 মধ্যে প্রসাদ রূপ (স্ক্রানেক্রিয়) রূপ ও
 অরূপের ঘটন স্থান। তদ্বারা রূপ ধর্ম-
 সংজ্ঞিত, বিদিত, সংস্কৃত ও বিজ্ঞাত হয়
 এবং অরূপ ধর্ম রূপাহার ও আত্মরূপের
 স্মরণাহারে (স্পর্শাচার, মনঃসংকেতনাহার
 ও বিজ্ঞানাহার) জীবিত থাকে। অরূপ
 ধর্মের এই জীবনের ফল প্রধানতঃ দুঃখ
 এবং মোহ, ঘেদ ও মোহ, এই তিন হেতু
 আহারের প্রবর্তক।

অসৌভাগ্য অধেষণ ও অযোগ্যের দ্বারা সেই
 চষ্ট আহারের নিবৃত্তি হইলে, সেই দুঃখময়
 অরূপধর্মের জীবনের শান্তি হয়। তাহাই
 পুরম সুখ বা নির্দ্বন্দ্ব। তখন যাগা থাকে,
 তাহার নাম অসংস্কৃতধাতু। পঞ্চস্ককেই
 আসন্ন "আসন্ন" নামে ব্যবহার কর; কিন্তু
 রূপম পঞ্চস্ক নিরাক্ত হয় বলিয়া সেই অসংস্ক
 অসন্ন।

বৌদ্ধদর্শনে "নির্দ্বন্দ্ব সুখের তেজীকে" এ
 ধর্মের সহজব নাই। আর অসংস্কৃত ধাতু

সাহিত্য সম্বন্ধে বা জীবের সম্বন্ধে কি আহার
 সহজব নাই। পঞ্চস্ককেই কি নিজের-নিজের-
 ধর্ম চেষ্টা করে? "আসন্ন" নির্দ্বন্দ্ব-সুখের
 অন্য পরাবর চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নির্দ্বন্দ্বের
 সঙ্গে "আসন্ন"র সমস্তই ধ্বংস হইল; কেবল
 অসংস্ক অসংস্কৃত ধাতু রছিল!! আর যদি
 বল, 'সউপাদেশম' নির্দ্বন্দ্বের নির্দ্বন্দ্বের
 (মনোবিজ্ঞান ধাতু) বিজ্ঞানই পরম সুখ;
 তাহা হইলে, নির্দ্বন্দ্বসুখ আত্মবিন মাত্র
 স্থায়ী হয়।

এই সব বিষয়ের সহজব প্রচলিত বৌদ্ধ
 বাখ্যান-প্রাণালী হতে হয় না। বুদ্ধের
 পর নুনানীদক সহস্র বংসর ধারমা প্রচলিত
 বৌদ্ধদর্শম র চত হয়; সুতরাং উহাতে মূল
 বিস্তৃততা সম্যক্ রক্ষা পাওরাছে। কি না,
 তাহাতে সংশয় আছে

যাহা হউক, বৌদ্ধ ও আর্থাগণ ভিন্ন ২ পথ
 দিয়া মখন নিরূপরূপ একতঃশব্দের উপনীত
 হন, তখন তাঁহাদের ভিন্নতা থাকিলেও
 বিরুদ্ধতা নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের
 মধ্যে Hume এর প্রাণালী কতকটা বৌদ্ধের
 মত। Hume বলেন "We have there-
 fore no idea of substance distinct
 from that of collection of particu-
 lar qualities * * *. The idea of
 substance as well as that of mode,
 is nothing but a collection of sim-
 ple ideas, that are united by the
 imagination and have a particular
 name, assigned them, by which we
 are able to recall to ourselves of
 others, that collection. The differ-
 ence betwixt these ideas consists
 in this, that the particular qualities

which form a substance are commonly referred to an *unknown something* in which they are supposed to adhere or at least supposed to be closely and inseparately connected by the relations of contiguity and causation.

(—Works I. P. 32.)

কণাগুলি গ্রাহ্য সভ্য, কিন্তু সাংখ্যের মূল substance বা প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত নহে। শক্তি পদার্থ বরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়, উহাও সেইরূপ জ্ঞাত। অহুমান গ্রহণের দ্বারা শক্তির সভ্য নিশ্চয় হয়, কিন্তু ক্রিয়ার সভ্য মনে উহার ধারণা বা image হয় না। বুদ্ধদেরও শুরুতে অসংস্কৃত ধাতুরূপ nonmenon স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু তাহার নিম্নে কেবল phenomena লইয়া বিচার করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট ।

অতিধর্মপাঠীদের কতকগুলি বর্গ বা শ্রেণীকরণ নহে। রাখিলে বিশেষ অর্থের অবগতি হয় না। সে কারণ এ স্থলে কতকগুলি বর্গ উক্ত হইতেছে।

৪ আসব—আসব অর্থে আশ্রয় বা বিষয়-প্রবৃত্তি। বৃহস্পতির উহাকে আসব বা সভ্য অর্থেই ব্যাখ্যা করেন। তাহার। যথা—
কামাসব, ভবাসব, ৫ দৃষ্টাসব (কুমত) অবিভাসব।

৬ কাম ও ভব সর্বত্রই কামলোকে ও ভবে (অন্যে বা সংসারে বর্তমান থাকার) উচ্চা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

৪ ওষ—ওষ বা বন্যা—বাহ্য হ্রঃখময় সংসারে ভাগাইরা লইয়া যায়। উপরোক্ত চারিটাই ওষ।

৫ যোগ—উপরোক্ত কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিভাই যোগ বা বন্ধন।

৬—অভিজ্ঞা (লোভ)—কারগ্রহি, বাপানকার গ্রহি, শীলব্রত-পরামর্শ কার-গ্রহি ও ইদংসভ্যাতিনিবেশ কারগ্রহি। তৃতীয়টা সামান্য পুণ্য কর্ণেই জীবন বাপন করা।

৭ উপাদান—কাম, দৃষ্টি, শীলব্রত আশু-বাদ। উপাদান অর্থে গ্রহণ, যেমন সর্পের ভেদক-গ্রহণ।

৮ নীশরণ—নীশরণ নির্কারণের বাধা। কামছন্দ, স্ত্যানমিত, ঐক্যতা কোকৃত্য, বিচিকিৎসা ও অবিভা।

৯ অমুশরণ—কামনাগ, ভবনাগ, প্রতিব, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও অবিভা। ১০ সংযোজন—৭ অমুশরণ ও শীলব্রত, জৈর্বা এবং মাৎসর্গ্য।

১০ ক্লেশ—লোভ, ধেব, মোহ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, স্ত্যান (খিনং), ঐক্যতা (উচ্চর), অস্বীকৃত্য ও অনৌত্তপ্য (অনৌ-তপং)।

উপরোক্ত সমস্তই পাণ।

১১ ধ্যানাগ—বিতর্ক, বিচার, জীতি, একাগ্রতা, সৌমনস্ত, দৌর্গমস্ত ও উপেক্ষা। ১২ মার্গাদ—অষ্ট আর্গ্যম্যূর্ণ এবং সিধ্যা-দৃষ্টি, সিধ্যা সংকর, সিধ্যা ব্যায়াম ও সিধ্যা সম্মাধি।

১৩ বল—প্রকা, বীর্বা, বৃতি, সমাধি, প্রজ্ঞা, হী, উত্তপ্য, অস্বীকৃত্য ও অনৌত্তপ্য।

৪ অধিপতি—ইন্দ্র, চিত্ত, বীর্গা ও বীংসো। অস্ত্রাধীন অস্ত্রিত্তি সকলের পতীভূত ধর্মই অধিপতি। ছন্দ বা ইচ্ছা থাকিলে সমস্তই সিদ্ধ হয়; অস্ত্রএব পূর্ক সংস্কারবশে প্রবল ছন্দ, বাহার অধীন অস্ত্র কতকগুলি ধর্মের প্ত্রিত্তি হয়, তাহাই ছন্দাধিপতি। চিত্তাদি অধিপতিও সেইরূপ। বীংসো অর্থে বৃত্তিপূর্কক গণেশবা বা নিচোর।

৫ জাহার—কবলিদ্ধার (অস্ত্র) স্পর্শ, সনঃসংকেতনাহার (অকুশল ও কুশল জন্ম প্রেরণ) এবং নিস্তানাহার (সেই জন্ম বা প্রতীতিস্বিক্রি বিজ্ঞান যে সহজাত নাম রূপকে আহরণ করে, তাহা)।

ইহারাই মিশ্রবর্গের অন্তর্গত।

৬ স্মৃতিপতন—পূর্ক উক্ত হইয়াছে।

৭ সম্যক্ প্রাধান—প্রাধান অর্থে বীর্গা—ঐশ্বর্য পাপধর্মের প্রাধানের অস্ত্র বীর্গা, অসুখপাপ পাপধর্মের অসুখপাদনের অস্ত্র বীর্গা, অসুখপাপ কুশলধর্মের উৎপাদনের অস্ত্র এবং উৎপদের ভূরি ভাবের অস্ত্র বীর্গা।

ইহারাই সম্যক্ ব্যারাম।

৮ সম্বোধক—স্মৃতি (সম্যক্) ধর্মনিচয় (আগ্যসত্যঃপ্রজ্ঞা); বীর্গ (সম্যক্ ব্যারাম), জীতি, পশুজি, সমাদি ও উৎপেকা।

এই সমস্ত বোধিপকীরের অন্তর্গত।

৯ স্বক—রূপ; বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার স্বকবিজ্ঞান।

১০ উপাদানস্বক—রূপাদিরা উপাদান স্বকই স্থাণ।

১১ আরভূম—চক্ষু, শ্রোত্র, শ্রাণ, জিহবা, নাসিক, হস্ত, পদ, শিক, স্বক, ময়স, অর্ধব্য ও স্বক।

১২ খাতু—চক্ষুরাক্ষয়, শ্রোত্রাধি পর্শ্যাত্ত ৬ এবং চক্ষুরাদি ছরের (বিক্রি। খাতু শব্দের কি অর্থে ব্যবহার হয়, তাহা অস্পষ্ট। চক্ষু, শ্রোত্র, চক্ষুস্ত্রির কি ভেদ, তাহা বোধেরা বসিতোক্তাপ্রণেয় না। প্রচলিত ব্যাখ্যাভূগারে চক্ষুই চক্ষুখাতু। "বাহারি আপনার স্বভাব ব্যরণ করে, তাহারাই পতি; অর্থাৎ ভাৱীরা যেরূপ ভার বহন করে, সেইরূপ সেইরা হঃখরূপে বাচাদের নিধারণ করে। তাহারি খাতু।" খাতুর এইরূপ অস্পষ্ট শীঘ্রি পাওল যায়। খাতুর মধ্যে নির্দীপ ধর্ম-খাতুর অন্তর্গত (কারণ নির্দীপ এক ধর্ম)। বুদ্ধবোধের উক্তি হইতে বোধ ইয় "চক্ষু-রাদিগ্ন মূলতঃ নিঃসহ ও নির্দীপ, এই উভ খাতু শব্দ স্মৃতিত করে। কিন্তু তিনি আনার বলেন, যেমন বর্ণরোপাদি খাতু বা যেমন অস্থিমজ্জাদি শরীর-খাতু, চক্ষুরাদি খাতুও সেইরূপ।

সম্বর্ত ও বিনর্ভ—সম্বর্ত ও বিনর্ভ সাংখ্যর প্রতীপর্গ ও বর্গের জুগ্যার্থক স্বর্ভ নিকারের অগুগুত্র ইত্যেএবং বিস্তৃতিমার্গের জেরাদশ পরিচ্ছেদে ইহা যে বিবরণ আছে, তাহার সার সঙ্কলিত হইতেছে। "পরিহারমসি" কল্পের নাম সম্বর্ত ও বর্জমান কল্পের নাম বিনর্ভ। সম্বর্ত "বা" লয় তিনি ইহা কলে হয়, বর্ণা—আপাসম্বর্ত, তেজসবর্ভ, ও বাহুসম্বর্ত।

যখন তেজের ধারা কলের সম্বর্ত হয়, তখন আত্মর বেদনতাবের নিরূপ সম্বর্ত লয় হয়, আর আত্মাধীরেতে তৎকর্তৃক

গত হইলে, দ্বিতীয় সূর্য প্রকাশিত হয়। তৎকালে তখন রাজ্য-দিনের ভেদ আর থাকে না। এইরূপে জন্মঃ গণ্ড সূর্য্য প্রকাশ পায়। সেই কালের মধ্যে সিংহপাতন— হংগপাতনাদি মহাহুদ ও নদী-সমুদ্রাদি সব শুক হইয়া যায়। সকল (শত সহস্র কোটি) চক্রবাল একজালা হইয়া সেই অগ্নিজালা স্রসেকর উপরে উঠিয়া চাতু-সাহারাজিক দেবদেব গ্রহণ করে। পরে স্রসেকহিত কনকবিমান, রত্নবিমান ও মণিবিমান আচ্ছাদিত করিয়া সেই অগ্নি-জালা জরজ্বিংশ দেবদেব গ্রহণ পূর্ব্বক আত্মাবর লোক পর্যাণ্ড যায়। বতকাল স'কার থাকিলে, ততকাল সেই অগ্নি জলিয়া, বৃত্ত বা তৈলের অগ্নির মত সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া নির্কাপিত হয়। তখন নীচের ও উপরের আকাশ এক হইয়া যায় ও মহাকার হয়। ইহাই মঘর্ষ।

তাহার দীর্ঘ কাল পরে পুনশ্চ মহামেঘ উৎপিত হইয়া অত্যন্ত বর্ষণ পূর্ব্বক শত সহস্র কোটি চক্রবালের অর্ধেক পর্য্যন্ত জলে পুরিয়া, অতর্হিত হয়। বায়ু সমুখিত হইয়া, সেই জলকে সর্কমিকে ঘন ও গোলাকার করে (যেন পদ্মিনী-পত্রহ জলের মত)। বিবরি দানের দ্বারাভেই (যথো-মধ্যে কঁাক করিয়া) সেই মহোদক ঘন হয়। বায়ুর দ্বারা সল্লিভীরমান ও পরি-কারমাণ সেই উদক অবতরণ করিলে, জ্বালোকের নীচের চারি বেবলোক প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব পৃথিবীর স্থান পর্য্যন্ত জল অবতরণ করিলে, বলবান বায়ু সকল উৎ-পন্ন হইয়া বহু হয় ও জল নিরচ্ছাদ হয়।

সেই সমুদ্রোদক পরিকীর্ণ হইলে, উপরে রস-পৃথিবীকে সরের মত উৎপাশিত করে। তখন জ্বালোকের প্রথমোৎপন্ন আত্মাবর দেবেরা আয়ুকরে বা পুণ্যকরে, সেই লোক-হইতে চ্যুত হইয়া, ইহলোকে স্বরাগত অন্তরীক্ষচর হইয়া উৎপন্ন হয়। তাহার। সেই রস-পৃথিবী আবাদ করতঃ তুচ্ছাত্ত্বত হইয়া স্বরাগতব হারার। তখন অন্ধকারে তাহার। ভীত হয় ও পরে তাহাদের তম নাশ করিয়া সূর্য্য প্রকাশিত হয়। তম নাশ করিয়া তাহাদের 'সুরভাব' (সুরতা) উৎপাদন করাতেই 'সুরির' নাম হইয়াছে। সেইরূপে রাজির অন্ধকার নিবারণের 'ছন্দ' হইবার পর চক্র উৎপন্ন হওয়াতে চক্র নাম হইয়াছে। চক্র-সূর্য্যের পর স্রসেক, হিমবানু ও চক্রবাল পর্ত্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমন তাত পাক করিতে গেলে তাহা কুটিয়া কোন স্থানে স্তূপ স্তূপ হয়, কোন স্থানেবা নিয় নিয় হয়, সেইরূপ নিয় স্থানে সমুদ্র ও স্তূপ সকল পর্ত্ত হয়।

অনন্তর সেই রস-পৃথিবী ভোজন করিতে করিতে সবদেব কেহ কেহ স্রবর্ণরুত ও কেহ কেহ দুর্ধর্ষ হইয়া যায়। তখন স্রবর্ণের। দুর্ধর্ষদের অবজ্ঞা করে ও তাহাদের সেই অবজ্ঞা-রূপ দুর্ধর্ষের জন্ত রসপৃথিবী অত-র্হিত হয়। পরে ভূমি-পর্লটা উৎপন্ন হয়। পরে পূর্ব্ব কারণে তাহাও অতর্হিত হয়। পরে 'পদালতা' (মিটলতা) উৎপন্ন হয় ও তাহাও যায়।

পরে 'অকটপাক' শালি উৎপন্ন হয়। তাহা কণ ভূবাবিশ্ব ও ভদ্র। ইহার। পরে সবেরা ভোজন প্রত্ভ করে। তাহার।

ভাঙ্গনে সেই শালি স্নিগ্ধা-পাষণ পুতে ষাণন করিলে, স্বপ্ন-অগ্নিশিখা উৎপন্ন হইয়া তাহা পাক করে। তাহা পুষ্কলদ্বন্দ্ব ওদন হয় এবং তাহাতে স্থপ-বাঞ্ছনাদির প্রয়োজন হয় না। সেই স্থপ আহার হইতে সন্ধ্যার সূর-পৃথিবী উৎপন্ন হয় এবং তাহার নিষ্কম-পঞ্চ-হস্ত-নিষ্কমপঞ্চ স্ত্রী ও পুরুষের স্বীয় স্বীয় ভাবেই উৎপন্ন হয়। তখন পুরুষের স্ত্রীদের ও স্ত্রীর পুরুষদের সর্পদা ভাবনা (অভিবেশ উপনিষ্কারতি) করিতে কাম-পরিদাহ ও তৎপরে সৈমথুন-দর্শ উৎপন্ন হয়। সেই অসদ্বর্ষ প্রতিগ্রহ করিতে বিজ্ঞদের দ্বারা ভৎসিত হইতে থাকিলে, তাহারা সেই অসদ্বর্ষ সূকাইবার জন্ত আগার নির্মাণ করে। পরে তাহারা দ্বিচ্ছ সঞ্চর করে ও ক্রমে ত্বন ও কণ তণ্ডুলের সচ্চিত দৃষ্ট হয়। পরে কেহ কেহ অস্ত্রের অদন্ত গ্রহণ করিতে লাগিল। অদন্ত-দ্বারীদিগকে ২।৩ বার বারণ করিয়াও না শুনাতে, পরে পাণিলেজুড়ু (কিল সুগি) প্রহারপূর্বক দণ্ড দিতে লাগিল।

এইরূপে চৌর্গ-মণ্ডা আদি প্রাণতুর্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে, সেই সন্ধ্যার স্থির করিলে, আমরা একজনকে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিব, যিনি দোষীদের অর্থদণ্ড বা ভৎসনা বা নিরাসিত করিবেন। আর আমরা তাহাকে শালির ভাগ দিব।

পরে আভিরূপভর, দর্শনীরভর, বনী, বুদ্ধিসম্পন্ন, নিগ্রহ-প্রগ্রহ করিতে সক্ষম, ক্রমে এক প্রাণীর জন্ত গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার ভাঙ্গন পুরুষের নিকট বাইরা, তাহা সেই প্রধানরূপে দ্বারা স্থির করে।

তিনিই কেবল অধিপতি বলিয়া কল্পিত-ধর্মের দ্বারা পরকে রঞ্জন করিতে 'রাজা' নামে অভিহিত হন। এইরূপ বোধীগণকে আদি করিয়া, কল্পিতমণ্ডল ও ক্রমে ত্রাঙ্ক-গাদি বর্ণ উৎপন্ন হয়।

ইহাই পৌরুষের এক সর্ষভ—বিষর্ভ। ইহাতে অগ্নির দ্বারা ধ্বংস হয় বলিয়া ইহাকে তেজঃসর্ষভ বলে। আপ্য সর্ষভও ঐরূপ; তবে তাহাতে দ্বিতীয় স্থগা উদয়ের পরিবর্তে ক্ষারোদকবর্ষী মহামেঘ উৎখিত হইয়া শত সশ্রু কোটা চক্রাশল পরিপূরিত করিয়া বর্ষণ করে। ক্ষারোদক বৃষ্ট হওয়ার সমস্ত বিনষ্ট হয়। সেই উদক বায়ুর দ্বারা বিধৃত হইয়া থাকে। পৃথিবী হইতে তিন ত্রক্ষলোক পর্যন্ত বিলস করিয়া উদক শুভক্ষয় দেব-লোকের নিয়ে অবতান করে। পরে পূর্বের মত সুমত সন্ধ্যারের গহিত উদকও অস্ত-হিত হয়।

বায়ু সর্ষভে প্রবল বায়ু উৎখিত হয়। তাহাতে প্রথমে স্বপ্ন রজঃ, পরে স্বপ্ন বাসুক্য, পরে সর্কর-পাষাণাদি বায়ুর দ্বারা আকাশে উৎক্লিষ্ট হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। পরে মহা পৃথিবীর নীচে বাত উৎখিত হইয়া, পৃথিবীকে পরিবর্তিত ও উর্দ্ধমূল করার, শত শত যোজন পরিমাণ পৃথব্যাংশ সমস্ত বাতবেগে আকাশে উৎক্লিষ্ট হইয়া—চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিসষ্ট হয়। পৃথিবী হইতে বিহার-ক্ষয় দেবলোক পর্যন্ত বায়ু ছাড়া ঐরূপে গৃণীত হইয়া, পরে সর্ষ সন্ধ্যার সহ বায়ু অস্ত-হিত হয়। কি কারণে এই লোক-বিভাষ হয়, তাহাত্তরে বোধ পায়ে এইরূপ আছে—সকল স্থলই বিনাশের কারণ।

অধিকারের প্রাপ্যতা অধিকারী ও
 বেধের প্রাপ্যতা উদকের দ্বারা-নাশ করা
 করিয়াও মতে বেধে অধিকারীকে প্রাপ্যতা
 উদকের দ্বারা-নাশ করা। একধর অধিকারী
 মাম চইলে অনন্তর সাক্ষর অধিকারী
 নারী হইতে বাকি উদক ও বায়ু গণকর
 ঐ নিয়ম।" জীবনের অকুণল কর্ম চইতে
 ক্রিয়ণ ও কেন মহাত্ম হংস হইলে, তারা
 বৌদ্ধেরা যুগান নাও সাংখ্য-মতে জগৎ
 ব্রহ্মার অভিমানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার অধি
 বা চিত্ত-লয়ে জগৎ লয় পায় ও জাগরণে
 জগৎ ব্যক্ত হয়, ইহাই সর্বাৎপেক্ষা সঙ্গত
 ব্যাখ্যা।

শ্রীহরিকরানন্দ আরণ্য।

তত্ত্ব-চিন্তা।

(জীবভাগ)

(পূর্ণাঙ্গবৃত্তি)

১। মনন "কর্ম" হইতে সংস্কার, তখন
 কর্ম কি, তাহা জানা আবশ্যক। মনকণে
 দেহীর বিষয়ে বিচারই কর্ম। আচাসিক
 কর্ম সুখ, নৈতিক কর্ম সুখ। শব্দ, স্পর্শ,
 রূপ, রস, গন্ধ ভূতভূতি বা স্থল ভৌতিক
 বলিদানস্থল এই মননের অধিকার বিচার
 উহা ইন্দ্রিয়িক বিচার। ই-হংক ভাবনা
 আদিতে যে বিচার উহা মানস বিচার
 বুদ্ধিরূপী মনন। অধিকার সাংস্কার
 হইলে

শব্দ স্পর্শাদি স্থল ভৌতিক, অধঃ-ধা
 স্থল ভৌতিক। অতএব জীবের কর্মস্থল
 ভূত হইতে আরম্ভ। ভূত মননভিত্তিক
 ভিন্ন রূপে প্রকাশক। পূর্ণাঙ্গ-পাণ্ডুর
 (উভ্যেই "পাণ্ডুর" মনন) শব্দিক পক্ষে,
 তাহা বলা যায় না; অর্থাৎ ক্রিয়ণ জগৎ
 তেজ, মকং, বোম গিশ্মা যোগ্য কাহাই
 থাকে। উভ্যে পক্ষের অধিকারে; ইহা
 তেই অধিকারীনা।

২। সাধারণ হিন্দুদিগের ধারণা
 মনুষ্য, দেবতা, ঈশ্বর ও পরমেশ্বর পর পর
 শ্রেষ্ঠতম। অর্থাৎ মনুষ্য হইতে দেবতা
 শ্রেষ্ঠ, দেবতা হইতে ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর
 হইতে পরমেশ্বর শ্রেষ্ঠ। এই ধারণা
 পরমেশ্বর এক, ঈশ্বর একাধিক বা বহু,
 দেবতার সংখ্যা ঈশ্বর-সংখ্যার অধিক, এবং
 ততোধিক মনুষ্য-সংখ্যা। এই ধারণা বা
 কল্পনা সঙ্গত নহে। কারণ ইহাতে অপকার
 নাই, বরং উত্তরোত্তর উৎসাহ আছে।
 মানুষ দেবতা হইতে চাহিবে—উন্নতির দিকে
 যাঁতে চাহিল, তাহাতে ক্ষতি নাই, উপ-
 কার আছে।

এই কল্পনাদ্বি-অভিমার্গের উপস্থিতি,
 কেননা জ্ঞানদর্শী মনুষ্য, দেবতা, ঈশ্বর
 পরমেশ্বরের বিভিন্নতা-আয়োজ করেন।
 জ্ঞানদর্শী-জ্ঞানে, এক অধঃ-ভূত
 পরমেশ্বর, ঈশ্বর, দেবতা বা জীব; করল
 অর্থাৎ মনন-সংস্কার। অধিকারী
 অধঃ-অধিকারী হইল। তাহা হইলে
 অধিকারীকে প্রকৃত উত্তর ভাবনা, জ্ঞানে
 অধিকারীকে প্রকৃত উত্তর ভাবনা, জ্ঞানে
 পর কে ঈশ্বর হইবে। অধঃ-ভূত

পরমেশ্বর হইবে, ইহা কল্পনা করেন
 : দীর্ঘ
 : মনুষ্য-বৈশিষ্ট্যিক বিস্তারিতা, বিচার
 কারিরা-দেখ-উচিত।
 (১) মনুষ্য-হুনা দেবতারী ; ক্ষিত, অপু,
 তেজ আদি স্ব-কর্তৃত্বক দেহতারী। চক্ষুর
 দৃষ্টি: স্পর্শ স্পৃশ্য। দেবতার দেহতারী
 হইয়াও জিভোতক—অর্থাৎ তাঁহাদের
 দেহ ক্ষিত ও অপু নাই, স্পৃশ্য স্পৃশ্য,
 স্পৃশ্য ও আকাশে নির্গত ; সুতরাং অদৃশ্য,
 অপৃশ্য।
 (২) দেবতার আমাদের মত জুল
 দেহতারী নহেন বলিয়া, আমাদের মৈত্রিক
 বিকার (ক্ষিত ও অপু লনিত বিকার)
 প্রাপ্ত হন না। উক্ত দুই ভুক্তিত বা
 উহাদিগের মনস্কীর্ণ কোন-মরণ প্রাপ্ত হন
 না। তাঁহাদের বিকার-অপর জিভোতক
 সূত্র শরীরে বহন করিতে হয়।
 দেবতার হুনা দেহতারী নহেন বলিয়া
 দেবতার-গত-বর্ণনা ও তন্ময়-অন্য-মরণ
 প্রাপ্ত হন না। আবার আমাদের দেহপাতে
 বৈরণ-মুহূর্ত্ত-বর্ণনা হয়, তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত
 হন না। মনুষ্য-অস্তিত্বের আদিতে
 জন্ম, অস্তিত্ব-অনন্তত্বাবী। স্বর্গ-মণী
 হইলে: বা দেবতা হইলে, তাহার তাঁহাকে
 জন্ম-গ্রহণ-কারতে হয় না; স্বর্গ-ভাগেও
 জন্ম-বৃত্ত হইতে হয় না। মনুষ্য
 স্বর্গ-ভাগের উপযুক্ত-দেব-স্বাক্ষর-করিয়া
 স্বর্গে-অস্তিত্ব-করিত; জন্ম-প্রাপ্ত
 হইলে, আবার ভূতলে-জন্ম-গ্রহণ-করেন।
 উপযুক্ত-দেব-স্বাক্ষর-প্রার্থী হইয়া বখন
 মনুষ্য-রূপে-জন্ম-গ্রহণ-করিতে-চাহেন,

তখন স্বর্গ-ভাগের উগ্ৰ-যোগী-তৈজস-দেহ
 মন্তের-ভায়-ভাগ-করিতে-হয়-না; সুতরাং
 তাঁহার-মৃত্যু-অপর-ত। সেই-স্বর্গ-মণী
 দেবতা-সোক্ষ-প্রাপ্ত-রূপে-জন্ম-দেহ-প্রাপ্ত-হেতুই
 জন্ম-গ্রহণ-করেন।
 ৪। মনুষ্য-হুনা, ভৌর-শরীরে-স্বর্গে
 যাইতে-পারে-না।-দিবা-দেহী-দেবতার
 স্বর্গ-ভাগী।
 সাধারণত: স্বর্গ-উর্দ্ধ-দিকে-নির্দেশ-করা
 হয়। উর্দ্ধ-পন্থত: শূন্য-বা-আকাশ-আছে;
 দেবতার-আকাশ-ভাগী-হইয়া-উর্দ্ধ
 আছেন, এ-বিচার-ঠিক-নহে। আকাশ-
 বা-দীর্ঘ-যে-উর্দ্ধে-বিরাজমান, ইহা-না-হইতে
 পারে; কেন-না-আমাদের-চতুর্দিকেই
 আকাশ।
 কেহ-কেহ-বলিতে-পারেন, মৃত্যু-পর
 পরিত্যক্ত-দেহ-মনুষ্য-আকাশ-ভাগী-হয়েন।
 কিন্তু-পাশ্চাত্য-বলেন, মৃত্যু-পর-মনুষ্য-আকাশ-
 প্রাপ্ত-হন-না, পিতৃ-লোক-প্রাপ্ত-হয়েন। এই
 পিতৃ-লোক-হইতে-পুন: জন্ম-গ্রহণ-করেন।
 দেবতার-আকাশ-ভাগী-স্বীকার-কর,
 কিন্তু-তাঁহাদের-কর্তৃক-ঋষি-দিগের-সম্মাননা
 জ্ঞান-যাচন-এমনাক, অনেক-দেবতা-স্বৈর
 কোন-ঋষিকে-ভয়-করিয়া-চলিয়া-হইত।
 ইহাতে-ঋষি-দিগের-শ্রেষ্ঠত্ব-প্রমাণ-হইতে-কে।
 অপর-ঋষিরা-জন্ম-দেহ-ভাগী। যখন-জন্ম-দেহ-
 ভাগী-ভূত-ভাগী-হইয়াও-তাঁহারা-আকাশ-ভাগী-
 দেবতার-আরাধ্য, তখন-স্বর্গে-আকাশ-
 ভাগী-শ্রেষ্ঠত্ব-প্রমাণ-হয়, তাঁহাদেরই-
 মনুষ্য-রূপে-আকাশ-ভাগী-দেবতার-
 আকাশ-ভাগী-রূপে-ই-আকাশ-ভাগী-
 নয়-আকাশ-ভাগী-স্বর্গ-ভাগী-এক-স্বর্গে।

৭৩। প্রকৃত আকাশবাণী হওয়া কঠিন ।
 বর্ণবাণী হওয়া উহা অপেক্ষা সহজ । প্রকৃত
 বাণী সময় সময় আকাশবাণী করেন,
 তখন তাঁহার পক্ষে বর্ণবাণী অকিঞ্চিৎকর ।
 কি প্রকারে আকাশবাণী হওয়া যায়, উহা
 সাপেক্ষের সহ-প্রকর নিকট জ্ঞাতব্য ।

মহাশয় বর্ণে বাইতে পারে না, এই বে
 ধারণা, উহা অপ্রকৃত । মহাশয় ত্রিলোক- (ভূ,
 জ্বল ও স্বর্গ) বিহারী । দেহ-বোধ সবে মহাশয়
 জ্ঞানী, দেহ-বোধ-নিঃসর্বে (চিন্তায়)
 জ্বলোকনাগী, এবং আশ্চর্য্যচিন্তার মূলবোধ-
 নিচুত হইয়া, আনন্দ লাভার্থ বর্ণবাণী করেন ।
 বিবর্তীর ভূ হইতে জ্বলোক পর্ষাস্ত গমনা-
 গমন হয়, আবিবর্তীরা বর্ণ পর্ষাস্ত গমনাগমন
 করেন । বর্ণের পর অপর চারিটী লোক
 আছে,—মহ, জন, তপ ও সত্য । বর্ণ
 হইতে বর্ণীর দেবতার ঐ চারি লোকের
 ভক্ত ভগত্ব করেন । ভূতে অবস্থিতি
 করিয়াও সিদ্ধ স্বর্গের ঐ চারি লোকে
 বিচরণ করিতে পারেন । দেহ-বোধ সবে
 যেমন বিবর্তীর বর্ণগ্রহ লাভ অসম্ভব, বর্ণ-
 বাণী হইরাছেন বলিয়াই দেবতার মুক্তি-
 লাভও সেইরূপ অসম্ভব । দেবতা মুক্ত
 হইবার পূর্বে মহাশয়ক্স গ্রহণ করিয়া,
 সুবুদ্ধিতে পাকভৌতিক পাশ দেহন করেন ।
 ত্রিভৌতিক পাশ ছেদনে পূর্ণতা লাভ ঘট
 না । দেব-ভগবী ভূতের উত্তমাংশ লইয়া
 উত্তম কুলে জন্ম করেন । পরে ভগত্ব দ্বারা
 মুক্ত করেন । বে দেবতা ভগবী মহেন,
 বর্ণ কুলভোগান্তে তাঁহাকে প্রবৃত্তিভূবায়ী
 কুলে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় ; অসুখান দ্বারা
 আবার বর্ণবাণী হইতে পারেন ।

৪৪। যে সপ্ত লোকের উল্লেখ হইল,
 উহাদের মধ্যে ভূ ব্যতীত অপর কোনটীই
 কর্মস্থান নহে । সাধারণতঃ উহাদিগকে স্থান,
 ধাম বা লোক না বলিয়া বুঝান যায় না ।
 প্রকৃত কথা, উহার অহংয়ের এক একটী
 অবস্থারতন । জীব হইতে আশ্চর্য্যরূপ লাভ
 পর্ষাস্ত ঐ ঐ অবস্থার অহং অবস্থিত করেন ।

নিভাবুক্ত সিদ্ধপুরুষেরা বলিতে পারেন,
 কোন্ মহাশয় হইতে কোন্ দেবতা কোন্
 বিষয়ে বা কি ভোগ হেতু শ্রেষ্ঠ ; আবার
 কোন্ মহাশয় কি প্রকারে বর্ণবাণী না
 হইরাও সপ্তলোক বিচরণ করিতে পারেন ।

৭৪। মুক্তিপ্রার্থী সাধক ভগত্ব-বলে
 যে বে লোক প্রাপ্ত করেন, সেই সেই
 লোকের অধীশ্বর তাঁহার সহায়তা করেন ।
 এমন কি, তাঁহাকে অস্ত্র কাজ কিছুই করিতে
 হয় না, তৎলোক-অধীশ্বরই তাঁহার সকল
 কাজ করিয়া দেন । ভগত্ব-বলে বর্ণলোকের
 উপবৃত্ত হইলে, বর্ণের অধীশ্বর এবং মহ,
 জন, তপ লোকের উপবৃত্ত হইলে, মহ,
 জন, তপ লোকের অধীশ্বর সেই সাপেক্ষের
 সাপনে সহায় হন । তক্তের হইয়া রণক্ষেত্রে
 ভগবান বেরূপ উপস্থিত করেন, সেইরূপ
 তক্তের প্রতি কার্য্যেই ভগবান আপনি কর্ম্ম
 হইয়া কর্ম্ম করিয়া দেন । এমন দৃষ্টান্ত
 দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহ্যিক অসুখদ্বারা
 ব্যক্তি কর্তৃক মহাঅসুখান হইয়া গিয়াছে ।
 দ্রৌপদী কর্তৃক সশিবা দুর্বাণার আক্রমণ-
 কার্য্য সম্পন্ন হওয়া উহার একটী বিচরণ
 দৃষ্টান্ত ।

শ্রীযামাচরণ বসু ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ খণ্ড,
১০ম সংখ্যা ।

মাঘ ।

১৩১৪ সাল,
১৮-২৯ শকাব্দা ।

শেষের সে দিন ।

—:~::~—

“মনে কর শেষের সে দিন ভয়কর ।
অন্তে বাঁচা কবে, কিন্তু তুমি হবে নিরুত্তর ।
বার প্রতি ষষ্ঠ মারা, কিবা পুত্র, কিবা জায়া,
তার মুখ দেখে তত হুটেবে কাঁওর ।
জুঁহে ‘হার! হার!’ শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ব,
দৃষ্টিকীর্ণ, নাড়ীহীন, হিম কলেবর ।”

[৬ রামমোহন রায় ।]

ধীন বার, রয়না; কিন্তু শেষের সে দিনের
কথা আর কোন দিনেই মনে হয় না !
বাহাও কিঞ্চিৎ কটং হয়, তাহাও হওয়ার
মত নয় । সে দিনের কথা লাগার মত
মনে লাগিলে, আর কি কিছু ভাল লাগে ?
অবিস্মার কি মন্ত ত কুহক-কুরঙ্গা ! মারারি—
কি মোহিনী শক্তি ! সংসার-মোহের কি
নন্দোহন আধরণ ! বিষ-নিষ-নেপার কি
মারাত্মক মাদিকঁড়া ! অথবা এক কথার
ভগবাসের কি কুবন-কুণানী ভব-ক্রীড়ার

ভাব-কৌশল । যা সব চাইতে সুনিশ্চিত
সর্পনাশ, জবশুস্তানী অমঙ্গল, অপ্রতি-
বিষের আপং, আমরা তাহাতেই একেবারে
নিশ্চিত,—নিশ্চেষ্ট—নির্জিতবৎ ! সংসারে
একটু সামান্য অন্তত অশান্তি, অনিষ্ট বা
অসুবিধা ঘটিবার সম্ভাবনা দেখিলে, আমরা
তাঁহার পরিহারার্থ কত সাবধান হই, প্রতি-
কারার্থ কত ব্যস্ত হই; অণুচ সর্প অন্তর্ভের
সমস্ত স্বরূপ—সর্পাস্তকরূপ সরণকে আমরা
মনের কোণেও সরণ করি না ! কোন
কল্পিত কষ্ট বা অসুস্থিত অসুখের চিন্তার
এং সন্ধিষ্ট মনের আশঙ্কার আমরা কাঁড়
হই; দূরবর্তী বিপদও আমাদিগকে ব্যস্ত
ও ব্যাকুল করে; কিন্তু সুনির্দিষ্ট ও সঙ্কট
সম্ভাব্য সরণকে আমরা দ্বিনীতেও মনঃ
প্রান্তে সরণ করি না ! আমরা সর্বভিতে—
সর্বকূতে সর্পদা মৃত্যুর ভীষণ খেলা—কাঁড়

করাল নীলা—কৃতান্তের সর্লীক্ষক দস্তমালা
 দেবিতেরি, তবু ত্বদ্ববয়ে কেমন নির্ভর—
 নিশ্চিত্ত ! “কিশার্চ্যামতঃ পরম্।” সাধে
 কি ধর্মপুত্র বৃথিত্তির বকরণী ধর্মের “কিশা-
 শ্চ্যাম” প্রানের উত্তরে বলিরাছিলেন,—
 “অহঙ্কহনি তুতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
 শেনাঃ হিরমিচ্ছন্তি কিশার্চ্যামতঃ পরম্॥”

অর্থাৎ—

দিনে দিনে জীবগণে
 যেতেছে যন্ন-ভকনে ;
 অবশিষ্ট রহে যারা,
 অসময় চাহে তারা !
 এ হতে আশ্চর্য্য আর
 কি আছে (ভব-সাবার) ?

“মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ”—নিশ্চয়—নিঃ-
 গন্দেহ স্মরণেই হইবে। ‘স্মরণে হইবে’
 এই ছয়-অক্ষরী ছোট কথাটির মত প্রব
 নিশ্চিত্ত বাঁটি সত্যকথা আর বিতীয় নাই।
 বয়ঃ, ‘জীবন আছে’ এ বাক্যেও কাহারো ২
 গন্দেহ, কিন্তু ‘মৃত্যু আছে’ এ কথাটা
 নিত্যা—নির্দিষ্ট—নিঃগন্দেহ ! গেই স্মরণহরণ
 অগৎ-কারণ হরি অপেক্ষাও যেন স্মরণেই
 জাগ্রাম্যমানতা অধিক ! এ হেন স্মরণকে
 তুলিয় থাকি,—সংসারে সর্ব কাছের মাঝে
 স্মরণকে মনে না রাখা বাস্তবিকই বিষমকর !
 অগতের আশ্চর্য্যতম বিষয় বলিরা ইহার
 অতিনন্দন ধূর্মনন্দনের পক্ষে সুযোগ্য ও
 অসম্পূর্ণকই হইরাছিল।

স্মরণ মনে না হওরাই অগবজ্ঞারার একটি
 নিঃসংশয় নিদর্শন। যখন তখন স্মরণ-স্মরণ
 করে কি আর রক্ষা ছিল ? তাহলে
 আর এক হাসি-খেলা, ভোগ-বিলাস,

আরাম-বিরাম, আমোদ-পমোদ, নৃত্য-
 গীত কি ভব-রসভূমে চলিতে পারিত ?
 সাধারণ উপরে স্মরণহুজে দোহুলামান ধর্মধার
 খড়্গ লইরা কে লাফালাফি করিতে পারে ?
 ইহসর্গস্বয়ংছেদক মরণ-মহাপঞ্জ আনাদের
 সাধারণ উপর সদা-সম্ভাবনার শীর্ণহুজে,
 অশ্রুজ্ঞাবিতার ভাষ ও অসম্ভার ধার
 সংযোগ—ভীষণবনেগে তুলিতেছে ! তাহারই
 তলে “আছারাম সরকারের” ডেকী বাজীর
 পুতুগল্পে কখনও আনাদের লাফালাফি
 ধুম,—কখনওবা নির্ভাবনার ঘুম ! স্মৃতা
 কখন ছেড়ে,—খাঁড়া কখন পড়ে—তার ঠিক
 নাই ; আনাদের কিন্তু ভ্রক্ষেপ নাই !—
 ভবের খেলায় তাগতঙ্গ নাই ! স্মরণ
 এমনই কুহক ! মোহ এমনই সাদক !
 মনে হয়, আগরা যেন ঠিক কসাইখানার
 ছাগল-ভেড়া। দিব্য লেজ নেড়ে বাগ-পাতা
 খাচ্চি, ও’দকে যে ছোরার ধার দেওয়া হচ্ছে,
 তা টের পাচ্ছি না ! যখন টুটিতে পৌন্স
 পড়িবে, তখনই হৌন্স হইবে ! তখন
 কেবল ‘হা হতোহ্ম’ বাণী, করণ কাত্ত-
 রাণি, আর দাকণ বাতনার চুঁকটানি মাত্র
 সার হইবে। তখন অশ্রুপারেও উদ্ধার
 নাই, হাঁহাকারেও প্রতীকার নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে হিন্দু-পত্রিকার একটি
 গান প্রকাশিত হইরাছিল,—

‘আর খাবনা পাতা নেহুড় নেড়ে।
 আবার ছোরার কথা মনে পড়ে।
 এ সংসারখাল কসাইর দোকান,
 কাল-কসাই ঐ আসছে ভেড়ে।
 হাতে হাসছে ছোরা, আসছে ভেড়ে।

বি-এ, এম্-এ, অজ্—সেজেটার

নির্ভাবনাঃ গেকুড় নাড়ে ।—

(যেন)

যো নাই জানার, কসাইখানার

ছাগল-ভেড়াকি সকল ভেড়ে ॥

‘নিভা-নতুন’ বাস পাভা-খড়

খাচ্চি আর ঘুমাচ্চি পড়ে ।—

(কচ্ছি)

শিং-ল্যাজের বাহারে বিচার,

‘জবাই’র চিন্তা সর্গাই ছেড়ে ॥

ছোরা-মারা জানলে বারা,

ভাগলে তার দড়া ছিড়ে ; —

(আনি)

রোখা ভেড়া. পাকা দড়া,—

টান্বে আরো এঁটে পড়ে ॥

(এট)

নিরুপায় ‘শরভের’ উপায়

মরতে রয় ও পার পড়ে ।—

(তবে)

কসাইর বাপের সাধা কি আর—

গোঁসাই যদি দেয়গো ছেড় ॥

(তবে)

কসাইর বাঁশ খসাই হেলার,

গোঁসাই যদি দেয়গো ‘ছেড়ে ॥’

বাস্তবিক দিনি বর্তই বিভাবান, বুদ্ধিমান,
শশ-গোরভে—পদ-গোরবে গরীরান, রূপে
ভূপে, কুলে-শীর্ষে, ধনে মানে মহীরান হউন
না কেন, বাস্তব হইয়া, অধিকার পাইয়াও,

এই সর্বমেনশে শমন-সকটের কোন প্রতীকার
না করিতে পারিলে, অর্থাৎ শেষের সে দিনের
সেই দারুণ দুর্দিন সুদিনে পরিণত না করিতে
পারিলে, সব বুধা—সব বিড়ম্বনা। কসাই-
খানার ছাগল-ভেড়ার গত মরা, বুদ্ধিগাথমাধি-
কারী মানবজগৎপারীর পক্ষে বড়ই আক্ষেপের
বিষয়। এই পাক্তৌতিক হুগ দেহ অমর
কোব,—ভাত-বাজনের পরিণামশিঙ এই
মিছে মায়ার ভাঙ দেহকে অবশ্র চিরদিন
বজায় রাখা যাইবে না। যোগবলে সুদীর্ঘ
আয়ু লাভ হইতে পারে, কিন্তু চিরজীবী
অসম্ভব।

“অখখমাবলিবাস হঁহুমস্তো নিতীবণঃ ।

মার্কেণ্ডেয়ো নারদশ্চ সপ্তেতে চিরজীবিনঃ ॥”

অর্থাৎ—

অখখামা, বলি, বাস, হুম্মান, বিভীবণ,

মার্কেণ্ডেয়, নারদ, এ চিরজীবী সাতজন ॥

শাস্ত্রমতে এই চিরজীবীও চারি বুগা-
বচ্ছিন্ন মাত্র। অমৃতপানে স্বর্গীর দেবগণ
অমর; ‘অমর’ই তাঁদের নামান্তর, কিন্তু
সে অমরত্বও ওলরাত্ত পর্য্যন্ত। মহাপ্রলয়ে
স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও মরণ শাস্ত্রে কল্পিত
হইয়াছে। ‘শেষের সে দিন’ একদিন সক-
লেরই আশিবে। সৃষ্ট মাত্রই বিনষ্ট হইবে।
হুগ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাও যে সেই মূল সৃষ্টিকর্তা
ব্রহ্মের সৃষ্ট। বাহা মায়িক, তাহা কারিক,
তাহাই ধ্বংসশীল। “আব্রহ্মন্তমপর্ধ্যন্তং
মায়য়া কল্পিতং জগৎ ॥” স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা
হইতে সামান্ত সৃষ্ট তৃণ মর্ধ্যন্ত এই সমগ্র
জগৎ ব্রহ্মের মায়ার দ্বারা কল্পিত; সৃতরাং
ইহা মায়িক বলিয়াই কারিক এবং মর্ধ্যন্ত
বলিয়াই ধ্বংসশীল। বাহা জন্মে, তাহাই

সরে । আবার বাহা করে, তাহাই অস্মে ।
 “প্রাকৃত হি জীবো মুক্তা জীবং জন্ম মুক্তস্ত চ ।”
 (শ্রীভা) । এইরূপে এই জগৎ অনিত্য হইবার
 প্রমাণরূপে নিত্য । স্বরূপতঃ নিত্য কেবল
 “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ব্রহ্ম । তিনি সার-
 স্বীকৃত; জগৎ সারস্বতী । এই অনিত্য
 রক্তিক বিধের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বাহাতে,
 তিনিই একমাত্র নিত্যত্ব শাস্ত্রস্বরূপ পর-
 ব্রহ্ম । “বক্তোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে,
 যেন জাতানি কীবন্তি, যৎপ্রযজ্যতি সংবিশন্তি,
 তন্মৃতম্ ।” বাহা হতে এই ভূতসমূহ জাত,
 জাত ভূতগণ বাহাতে জীবিতরূপে স্থিত,
 এনং বাহাতে কালে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্টপ্রায়
 প্রভূত, তিনিই ব্রহ্ম ।

আমরা যেখানে জন্মিয়াছি, সেখানে
 অগস্ত্যই মরিব । সিদ্ধ-জলে বিধ-বিন্দুবৎ
 বাহা হতে আমরা উদ্ধৃত হইয়াছি, তাঁহাতেই
 বিনীন হইব । সিদ্ধস্তক্ক রামপ্রসাদের
 একটি গান আছে,—

“বলু দেখি তাই কি হয় ম’লে ।

এই বাদামুখ্য করে সকলে ।

কেউ বলে ভূত-প্রেত হবি,

কেউ বলে তুই বর্গে বাবি,

কেউ বলে সাধোক্য পাবি,

কেউ বলে সাবুজ্য সেলে ॥

(রাম) প্রশ্ন করিলে—যা ছিল তাই ।

তাই হবিয়ৈ নিদান কালে ;

(সেমন) জলের বিধ জলে উদয়,

লয় হয় সে নিশায়ে জলে ॥”

মুক্তার পর প্রাপীয়া প্রেতবেণি পাইয়া
 পৌতুলোকে—অর্থাৎ বসলোকে নরক-বাতল

পাইবে, আর পুণ্যস্মারি বর্গলোকে
 দেববাণি পাইয়া বর্গস্থ সন্তোষ করিবেন ।
 রামপ্রসাদ বলেন যে, সে মুক্তাই নয় ; প্রাকৃত
 মুক্তা হইলে, অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরের বিগরণ হইলে
 একেবারে নির্লীপ মুক্তিলাভ হইয়া, পরমাঙ্গ-
 সমুদ্র-গচ্ছৃত জীবাঙ্গা-বিধ পরমাঙ্গাতেই
 মিলিত—অর্থাৎ ‘সোহং’ সিদ্ধিলাভ হইবে ।
 অতএব সাধারণ মুক্তা মুক্তাই নয় । যদি
 সাধারণমুক্তাতেই মুক্তি হইত, তবে মহাপাপ
 ও মহান্নকের কারণ আত্মহত্যা অতি সহজ
 সৌকর্যজন হইত । তাহা হইলে সমস্ত
 সাধন-জ্ঞান, যোগ, তপস্বা, উপাসনার
 ফল দুর্হাত দর্শিতে বা ভগণ্ডা পরমার
 আফিংয়ের বড়ীতেই সিদ্ধ হইত ! অতএব
 পূর্কোদ্ধৃত গানটিতে রামপ্রসাদের উক্ত যে
 মুক্তা, তাহা ফলিতার্থে অমৃতত্ব বা মুক্তিত্ব
 মাত্র ।

জগতে প্রাকৃত মুক্তা কিছুই নাই । পরি-
 বর্তন ভিন্ন বিলোপ বা অত্যন্তাভাবরূপ
 প্রাকৃত মুক্তা অঐক্যনিক ও অসঙ্গ । সে
 পরিবর্তন ও জড়স্বরূপের মাত্র । আত্মস্বরূপের
 পরিবর্তনও নাই, জন্ম-মৃত্যুও নাই । উহা
 চিরস্থির—অবিকারী, অযায় ; নিত্য, সত্য,
 সনাতন । জীবাঙ্গার নামরূপাঙ্গক উপাধির
 পরিবর্তনই জীবের ঐহিক মুক্তা পদে
 আখ্যাত । গীতা বলেন, উহা আত্মার
 পরিচ্ছদ-পরিবর্তন—অর্থাৎ ‘কাপড়-ছাড়া’
 মাত্র ।

“বাসাংসি জীর্ণানি বধা বিহার,

নবানি গৃহ্ণতি নরোহপরাপি ।

তথা শরীরানি বিহার জীর্ণা-

জ্ঞানানি-স্মৃশতি নবানি দেহী ॥”

অর্থাৎ—

যথা জীর্ণবস্ত্র-ভাঙ্গ করি নর পরিহার,
পরে নব বসন অপর।
দেহী তথা জীর্ণকার পরিভাগ করি পায়
পুনঃ অস্ত্র নব কলেবর ॥

অনিত্যতা এই পোষাকেই মাত্র,
পোষাকধারীর কিছুই নয়। অপেদ-পিপদ
বিঘ্ন বিকার সমস্ত পরিচ্ছদের উপরেই পড়ে,
পরিধারী আত্মা নিত্য—নিরাপদ—নিরাময়—
নির্লিপ্ত। আত্মা অস্ত্রে ছেঁড়েনা, আগুনে
পোড়েনা, জলে রসে না, বাতাসে শোষে
না। গীতায় স্বয়ং ভগবানই গাইয়াছেন,—
“নৈনং হিন্দস্তি শক্তাদি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
নষ্টেনং ক্লেবরস্ত্যাপো ন শোষয়তি মাকতঃ ॥
অচ্ছন্তোহসদাছোহসক্লেছোহশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্গগতঃ স্বপ্নবচলোহয়ং সনাতনঃ ॥
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়মুচ্যতে ।
ভস্মাদেবং বিদিতৈনং নাগুশোচিত্তুংহর্ষি ॥”

অর্থাৎ—

অস্ত্র না ছিঁড়িতে পারে, অনল পোড়াতে পারে,
জল এঁরে পচাতে অক্ষয়;
বায়ু নর শোষিতে সক্ষম।

অচ্ছন্ত অদাহ ইনি অক্লেস্ত অপোষা হন।
নিত্য সর্গগত, স্থাগু অচল ও সনাতন ॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত ইনি—অবিকারী উক্ত হন।
এঁকে হেন জেদে তাই পোক ভব অকারণ ॥
কলে, মরণের ভয় বা ভক্তনিত সর্গ-
সংগের শোক কেবল সূত্রতার কল মাত্র।
বাস্তবিক নীতৌক্ত দেই। পিরণ-বনদ্যকেই
মরণ ভাবিয়া ভরে মরা তব্জ্ঞানীর পক্ষে
কামল মাত্র। খেলনা কেড়ে নিলে খোকা
ক্রোধে; তরুণ জীবের ভয়ের খেলার

খেলনা এই শরীরটি মরাইয়া নিতৌচিত্তেও
পরমার্থ-জ্ঞান-শিক্তগণ (আমরা) নিতান্ত
নারাজ। এ বিষয়ে আমরা শিশুরও অধম।
নূতন কাপড় পরিয়া শিশু উল্লাসে দাঁচিতেছে;
কেহ কেড়ে নিতে গেলে সে সম্ভবতঃ
কাঁদবে; কিন্তু আমাদের এ ‘বাসা’সি
জীর্ণানি—পপক-মায়ান-মূত্রে রচিত পুরাতন
কারা-কাপড়ানি বদলাইয়া নূতন পরাইবার
আয়োজনেও আমরা নিশ্চর কাঁদব।
এ হাসি-কান্নাসম সঙ্গুরবেলা স্নান হটরা
আসিলে, যুগ্মা মূঢ়রাই কারা-বিয়োগ-ভয়ে
কাঁদে; কিন্তু তব্জ্ঞানযুক্ত মোক্ষমুক্ত সাধু-
ভক্তগণ বরং অভয়-তাবনানন্দে হাসেন।
অনেক সময় শেষের সে দিনের প্রসাদ-
বিষাদ-ভাব-ভেদে সাধু-অসাধু কতকটা
চেনা যায়। সাধু পিরোমর্গি তুলসীদাস
বর্ণিয়াছেন—

“তুলসি! যব জগসে আরো,
জগ হসে, তোমু রোর।
আগা-কর্ণি কর চলো কি
তোমু হসে, জগ রোর ॥”
অর্থাৎ—

তুলসি! যবে এলে ভবে,
হাসলে তুমি, কাঁদলে লোক।
যাবার বেলা এমনি বাবে,
হাসবে তুমি, কাঁদবে লোক ॥
কলে “শেষের সে দিন” সুদীন মারা-
ধীনগণের পক্ষেই যোর হুঁদিন; কিন্তু দীন-
নাথের পোষাধীন সাধুতত্ত্বের কাছে সে
দিন বিয়ং আরো বিশেষ স্তম্ভন। বিরহিণী
পতিরতার পতি-সকাশে সাওয়ার দিন
বেরুণ সুদিন বা শুভদিন, অগণপতির

আকর্ষণে—তত্ত্বের ঐহিক জগতের দৈহিক-
বাদ্য বিন্যাসের দিন—সেই শেষের সে দিন
অত্যধিক সুদিন বা শুভদিন। কিন্তু সংসারে
সাধারণতঃ আমাদের জ্ঞান বহু জীবের
পক্ষে সে দিন কি সর্ব্বশেষ দিন! সর্ব্বের
নাশ, অর্থাৎ কিছুই না রবে যে দিন, এক
দিন সে দিন হবে।

“এক দিন হারি! এমন হবে,

এ মুখে আর বলবে না।

এ হাতে আর পরবেনা,

এ চরণে আর চলবেনা ॥

নাম ধরে ডাকবে তবে,

শ্রবণে তা শুনে না।

(তখন)

পুত্রে-মিত্রে—জগৎ-চিত্রে—

নেত্রে নিরখিবে না।”

খোকার বুলি, খুঁসীর হাসি,

প্রাণপ্রেরণীর প্রেমের কাঁসি,

সকল কেলে যাবে চলে,

লঙ্গে কিছু লবেনা ॥

(তখন)

বিলাস-বিহার, আহা-বাহার—

মজার আর মজিবেনা।

(ও সেই)

কাংসা-করের মুড়োর মূরে

মুড়ো নৈ আর দিবেনা ॥

(আহা!)

মুখে বখল দুটো নয়ল,

উঠেনেত্রে কনুবে শরল,

(তখন)

বীশের বাণিস লবে বৃকে,

শীশের বাণিস পাবে না ॥

(সে দিন)

সুন্দরী জী তেরাগিরে,

'সুন্দরীর খেটে' নিরে,

কাঠ অঙ্গ আলদিরে,

কষ্ট কিছুই হবে না ॥

এইরূপ শমন-বিবেক-সংগীত কণিক
বৈরাগ্যের আবেশে গাইতেও বেশ, শুনিতেও
বেশ, ইহার কাব্য-রস-তত্ত্বের বা সাহিত্য-
সত্ত্বের আশ্রয়ও বেশ; কিন্তু এ সব গৌণ-
কলা; মুখ্যফল যে ঐহিকতার অনাসক্তি ও
ভগবদ্ভক্তি, সাহিত্যিক সরণ-স্ররণ শিক্ষার
তাঁহর স্থায়িত্ব রক্ষা হয় না। যাহা হয়,
তাঁহর বিকাশ বাহ্যিক ও চপলা চমকবৎ
কণিক। এই মায়িক বিবেক মারা-মোহের
কুহক-রহস্যে ইহাই বিশ্বাসের নিদ্রা। সোটা
কথা, এ মর্ত্যে সরণ-বিশ্বরণেই বিশ্বাসের
চরণ; তাই ইহাই যুধিষ্ঠিরের “কিমাশ্চর্ষ্য-
মতঃপরম্।”

সরণ-স্ররণ আমাদের অতি উৎকৃষ্ট মানস-
শুক। শূকর উপদেশ, ধর্মসংস্কারকের
বক্তৃতা, শাস্ত্র-গ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গে সংপ্রসঙ্গ,
তীর্থভ্রমণ ইত্যাদি আর কিছুতেই বিষয়ে
বিরক্তি, ধর্ম আগতি, সৎশুণের উদ্দীপন
ও ভগবানের দিকে প্রাণের আকর্ষণ সেরূপ
হইতে পারে না, একান্ত মনে সরণ-স্ররণে
বেরূপ হইতে পারে। এই সত্যের অকৃষ্ট
প্রমাণ বরূপ একটি গল্প মনে পড়িল।—

এক হিন্দু-রাজা অতিশয় বিবাসিত, ভোগ-
বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু
‘হিন্দু’ বলিরা, তাঁহার বৃত্তাবৃত্তে শুকবক্তি
ও শুকবাক্যে বিশ্বাস ছিল, এবং তাই
শ্রীহাকে কালে অতি-বিবাসিত প্রভৃতি

দেব হইতে মুক্তি দিয়া, বৈরাগ্যবান ও শাসন-শক্তিমান করিয়াছিল। রাজার গুরুদেব বিষয়বিরাগী যোগীপুরুষ ছিলেন। রাজা মনের সাথে ইঞ্জিয়সেবা-সন্তোষ-সমর্থ হইবার জন্য যোগীবরের নিকট কোন মজৌবধি প্রভৃতি দ্বারা স্বীয় শক্তিবর্ধনার্থ প্রার্থী হইলেন। তাহাতে যোগীবর কোন একটি বৃক্ষের শিকড় বহু ক্ষুদ্র ২ খণ্ডে কাটিয়া, তাহার এক ২ খণ্ড প্রত্যহ রাজাকে সেবন করিতে দিলেন। যোগী নিজে ঐ শিকড় প্রতিদিন বহু পরিমাণ সেবন করিতেন; অন্যদি প্রায় খাইতেন না এবং অহোরাত্রের অধিকাংশ সময়েই ভগবদ্ভূপাসনানিষ্ঠ ও ধ্যান-সমাধির ভাবাবিষ্ট থাকিতেন। কখন কখন ভগবদ্ভূপ-রূপ-গুণ-গীলাদি বিষয়ক ভক্তি-সংগীত গাহিতেন, আর আনন্দে ছুই মনন বাহিয়া প্রেমশ্রু পহরী গায়ুণী-মুখ-গলিতা পতিতপাবনী গঙ্গার স্তায় প্রবাহিত হইত। এ হেন ভক্তি ও বিষয়-বিরক্তি রূপ আধ্যাত্মশক্তিমান সাধু গুরু লাভেও রাজার বিষয়াসক্তি প্রবল ছিল, ইহাই আপাত-আশ্চর্য্য! ফলে কিন্তু গুরু-রূপায় সে প্রবলতা নিকীরণের অব্যবহিত পূর্বে দীপশিখার প্রবলতার স্তায়ই হইয়াছিল।

বাহা হউক, রাজা সেই গুরুদত্ত শিকড় সেবনে বিপুল রাজীকরণ-শক্তি লাভ করিয়া অত্যধিক ইঞ্জিয়সেবার মত্ত হইলেন। ছয় মাসে সে শিকড় নিঃশেষিত হইল। আবার ঐ শিকড় পাইবার আশায় ঐ ইঞ্জিয়-বিলাস-বিমুক্ত রাজা আবার স্বীয় গুরুদেব যোগী-বরের আশ্রমে উপনীত হইলেন। যোগীবর তখন সেই শিকড়ই চিবাইতে ছিলেন।

রাজা তদ্রূপে বিষয়ানিষ্ট হইয়া কহিলেন,—
“গুরুদেব! আমি যে শিকড়ের নিম্নমাত্র সেবা করিয়া, তাহার তেজে আহার-বিহারাদি ইঞ্জিয়সেবার অহোরাত্র আসক্ত ও অশক্ত থাকি, আপনি সেই শিকড় প্রত্যহ বহু-পরিমাণে ব্যবহার করিয়াও একপ অমত্যাগী, বিলাস বিরাগী, স্ত্রী-সংস্পর্শশূন্য—নিকির, এবং নিরন্ত ভগবৎসামান-সম্পন্ন থাকেন, ইহা অতীব বিষয়ের বিষয়।” রাজার এই বাক্যে যোগীবর স্তব্ধ হস্ত করিয়া কহিলেন—
“বৎস! এই আর ৬ মাস কাল পূর্ণীপক্ষে দ্বিগুণ মাত্রায় ব্যবহারের উপযোগী সেই শিকড় দিতেছি, ব্যবহারার্থে লইয়া যাও। এই ৬ মাস পরে এতদর্থে আবার মনন আমার নিকট আসিলে, তখনই তোমার এই বিষয়োৎপাদক সমস্তার সমাধান প্রাপ্ত হইবে। আজ কিছু বলিব না; বলিলেও বুঝিবেন না।” রাজা জিজ্ঞাসিলেন,—“দেব! এই ঔষধে শক্তিবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু আয়ু-বৃদ্ধিও কি হয়?” গুরুদেব বলিলেন—
“নিশ্চয়; তোমার ইঞ্জিয়-সেবার আধিক্যে আয়ুক্ষয় হইয়া আসিয়াছিল; এই মনোবশ সেবন না করিলে, তুমি অস্ত্রাপি জীবিত থাকিতে কি না, সন্দেহ। বাহা হউক, এই ঔষধ-বলে তুমি আর ছয় মাস নিশ্চয় বাচিবে; কিন্তু অস্ত্র হইতে বচ চন্দ্রে তোমার আয়ুশেষ-সম্ভাবনা জানিবে; অতএব এই ছয় মাস আহার-বিহার, বিলাস-বিহার, বত গার, ভোগরূপ লাভ করিয়া লও। আজ আর অন্য কথাই কাজ নাই। গৃহে গিয়া আমার আদেশ পালন কর। ছয় মাসের শেষাংশে, অর্থাৎ তোমার জীবনের সম্ভাবিত

শেবাংশে আগার আগিবে।" রাজা এই কথা শুনিয়া, গুরুদেবকে প্রাণামপূর্ণক অগত্যা বিসম্মুখে ও অবসন্নবুকে শিকড় সহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন; শিকড়ও গুরুর আদেশামুযায়ী দ্বিগুণ সাতার সেবা করিতে লাগিলেন বটে। কিন্তু ভোগবিসায়ে তাঁহার আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভোগমুখ আর ভাল লাগিল না। আমোদ-প্রমোদে অকটি হইল, বিষয়-বিলাস বিষয় জ্ঞান হইল। সংসারের সম্মোহন ইন্দ্রজাল অপসারিত হইল; উহার ঠৈরাগ্য-বিশীর্ণ বিসম্বন্ধন মূর্ত্তি দেখা দিল। তখন অশন-বসন-বাগনাদির আশক্তি বিরক্তিতে পরিণত হইল। এ ভোগারতন ভৌতিক শরীরকে যোগবিবেক-নেজে কেবল মাংস রক্ত-মল-মূত্রের অমেধ্য ক্ষেত্র মাত্র জ্ঞান হইতে লাগিল। তখন—

"সমাস্ত্রয়্যাত্মৈকর্ষনপশিতপিণ্ডং স্তনমিমা,
মুখং লালাক্লিষ্টং পিণ্ডিত চসকং স্রাসবসিবা।
অমেধো ক্লেদাত্রে পিণ্ডিত রসতে স্পর্শরসিকো,
মহামোহাঙ্কানাং কিমিহ রমণীয়ং ন ভবতি ॥"

ইত্যাদি "শাস্ত্রনতকের" শ্লোকসমূহের তীব্র তাৎপর্যাগ্রহ যেন মূর্ত্তমান বৈরাগ্য-বিগ্রহরূপে হৃদয়ে উদয় হইল।

তখন ধর্মের কথা মনে আসিল। ভগবানের দিকে দৃষ্টি পড়িল। গুরুবাক্য-পিখাসে অকস্মাৎ আগম মরণের স্রবণ আসিরা রাজার সংসার-নিষ্কারণ করিল। সেই রাজপদ-মদ-গর্ভিত রাজা আপনাকে বিশ্বরাজার এক অতি নিঃস্বপ্নপ্রকার জার অকিঞ্চন, অস্তিসানহীন ও বীনাভিনীন ভাবিতে লাগিলেন।

গুরুর আজ্ঞার রাজা সেই গুরুদত্ত মহা-গুণশালী মহোবধ প্রত্যাহ দ্বিগুণ সাতার ব্যবহার করিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ইঞ্জির-চাপল্য অতি বর্ধিত হওয়া দূরে থাকুক, অণুসাতার রহিল না। ঐহিক ভোগের দৈহিক উত্তেজনা অন্তর্হিত হইয়া, আধ্যাত্মিক যোগের পারমার্থিক প্রেরণা পরিবর্ধিত হইতে লাগিল। 'শেবের সে দিন' অল্পদিন অল্পসরণে অল্পদিনেই রাজার এই অপূর্ণ পরিবর্তন হইল।

যাহা হউক, গুরুদত্ত সেই "বঠ চন্দ্র" সমাগত হইবার—অর্থাৎ ৬ মাস কাল পুরিবার কিছু পূর্বেই গুরু-আজ্ঞা-পালন-পূত, বিবেক-বৈরাগ্যমুখ, বাহিরে রাজ্য-পালনরূপ মহা বিসম্বন্ধকারী—অন্তরে নিগিপ্ত নিরীহ 'জনক'-জীবনধারী সেই "মানস-গুরু মরণ স্রবণ"কারী রাজা মন্ত্রগুরু যোগীবরের আশ্রমে পুনরাগত হইলেন।

রাজার অপূর্ণ সাত্বিক মূর্ত্তি ও ভাব-ভক্তি দেখিয়া যোগীর স্মিত-সৌম্য মুখে কহিলেন—“এস বৎস! কেমন আছ?” রাজা (প্রাণপাতপূর্ণক) কহিলেন—“ভবৎ-প্রসাদে—কৃপাশীর্ষাদে কৃতার্থ আছি। আমার এ অনিত্য জীবনের অবসান-দিন ত আগতপ্রায়; তাই একবার অন্তকালে অস্তিমের সম্পদ এই অন্তর-পদ দর্শন-স্পর্শনের আশায় এ সেবকাথম আসিরাছি।

যোগী। বৎস! ত্বর নাই। মদন্ত মহোবধে পুনরায় তোমার আয়ু আর ১ বর্ষ বর্ধিত হইয়াছে।

রাজা। গুরুদেব! আপনায় ওঁরখের ঐহিক গুণ পূর্ণবার বেশ বুঝিরাছিলাম। আনুর্ভূত

হইতে পারে; কিন্তু ভোগশক্তি ও ভোগাশক্তিবুদ্ধি পায় নাই। এবার বরং আপুনার বাবস্থিত 'মরণ-অরণ' মহৌষধই মহাবৈরাগ্যরূপ-মহৎপরিবর্তন সাধন করি-
 যাচ্ছে; তবে আর ভবৎপ্রসাদে আয়ুক্ষেয়েই বা ভয় কি? "ভবিতব্যং ভবত্যেব।" ইচ্ছা-
 ময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে।

যোগী। বৎস! ঠিক বলিয়াছ। "বৈরাগ্যমেবাত্মম্।" বৈরাগ্যই একমাত্র অত্যন্তের কারণ। এ তেন দেবভূলভি অধ্যাত্মসম্পদ বৈরাগ্য 'মরণ-অরণ' কারণ যত মহৎ লাভ হয়, কোন ভোগ-তপস্যায় তত হয় না। নিরন্তর মরণ-অরণ ফলে ভোগ্যার অগ্রর-বৈরাগ্য-বিশোধ—বিষয়-বাসনা-নির-
 হিত হইয়াছে; তাই এমন অসাদারণ তেজ-
 বীর্ষ্য ও ভোগাশক্তিসম্বন্ধক মহৌষধ বিত্তপ-
 সাত্ম্য-সেবনেও ভোগ্যার কিছুমান ইঞ্জির-
 চাপলা ঘট নাই! অধিকন্তু তাহার শক্তিতে, ভোগ্যার ফলিতার্থে আয়ুর্ভুক্তি হইলেও, তুমি উক্ত বৈরাগ্য-ফলে—অধ্যাত্ম-
 বীরত্ব বশে অম্লান-রূপে মরণার্থ প্রস্তুত হইয়াছ। এখন বৎস! ভোগ্যার পূর্ণবাবের সমস্তার সমাধান বুঝিয়াছ কি?

যোগী।—গভো! আপনার প্রসাদে প্রায় বুঝিয়াছি।

যোগী। স্বীকৃত পূর্ণভাবেই বোঝ। তুমি ভাবিয়াছ, ভোগ্যার ৬ মাগ-পরে মৃত্যু হইলে, তাই তুমি সেই মরণ-অরণ-ভুক্ত বৈরাগ্য-বারিতে, জরয়ের সমস্ত বিষয়বাসনা নিষেধ করিয়াছ; আর আমি প্রতিমুহুর্তেই সেই মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিতেছি। প্রতিক-
 ফলেই তাহার প্রাণিকের-প্রাণীকায়

প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি; মৃত্যুরাং অত্যা-
 ভেকক ভেদক মুহুর্তে; সেবনেও আমার গবেষ সংস্কৃত বা বৈরাগ্য ব্যাহত হয় নাই। বরং স্বরূপায় এই মহৌষধের সাধিকী শক্তিতে আমার আয়ুঃসত্তা ও সাধনশক্তি-
 সত্তা বৃদ্ধি প্রাপ্তই হইয়াছে। ভগবৎরূপায় কোমায়ও এক্ষণ সেই অবস্থা। তবে তুমি-
 গৃহী ও মহাবিদ্যী রাজা, আর আমি এই-
 পর্ণকুটীন্দ্রাসী, কন্যাসুফলাদী, ষোড়শীন্দ্রাসী-
 বনচারী মার।

রাজা। তবে প্রভো! আমার-
 উপায় হইবে? আপনি কালিলেন,—আরামে
 আয়ুঃসত্তাও বর্জিত হইয়াছে; তৎকালে আমি
 ও রাজাশাপন রূপ—নিমগ্ন বিষমার্গের
 তুমুল তুফানে থাকিয়া কিরূপে আশ্রয়লাভ
 করিব?

যোগীবব-একমুহুর্তে একটি শ্লোক বলিলেন—
 "পুত্রাশ্রুপুত্রবিন্যাস্তপসেবগানৈঃ
 দীপ্তো ন মুখ্যত মুক্তদপাদারনিলয়ে।
 সর্গত্বাত্ত্বস্বত্বানিবশংতাপি
 মৌণীহকৃতপরিমলকপটীন টীবর।"
 অর্থাৎ—
 পুত্রাশ্রুপুত্রবিন্যাসেও বিষয়-সেবনে,
 হারিপানপত্র নাহি-পরিহরে স্বীরা
 রহি গান-বাত্ত-তান-বাদ্য-ভাবকনে
 শির-কৃত্ত-সুরক্ষণ লগা-নর্ন্তকীর।

এই ভাবে সংসারে পাকিতে হইলে
 গীত্রায়-ভগবান বলিয়াছেন,—"পদ্মপা
 যিতাজ্জনা" লগৎ অনাছ পদ্মপা
 বিষয়ে গাগ্র হইয়াও অস্তরে অলিঙ্গ রহিবো
 অক্ষয়িনঃ বৈশেষক-কেন দিন" মরণ-ফলে
 তজ্জন্মিক-বৈরাগ্য-বলে তুমি নিমগ্ন হইবে।

নিষ্কাশতার স্নানার্থে জনকের আদর্শ লাভ করিয়াছে। এখন গৃহে যাও, জনকবৎ গৃহে থাকিরাও গুরুদত্ত মন্ত্রসাধন ও মরণ-স্মরণলাভ বৈরাগ্য-প্রভাবে বিবন্ধ-বিনুক্তি ও ভগবন্তক্তি লাভে যত্ন হও ।”

স্নানান্তর প্রথমপূর্বক গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের অবশিষ্টকাল গুরুপাকলে—বিবন্ধ-বৈরাগ্য-বলে তত্ত্ব-সাধনে—ভগবদ্বারাগমনে প্রেমামল-মনে অতি-বাহিত করিলেন এবং ‘শেখের সে দিন’ স্মরণ-কলে স্বীয় শেখের সে দিনে ট্রান্সনাথের চরণতলে শরণলাভের পূর্ণ পরমার্থ-প্রভাবে বদার্থ ত্তার্থ হইলেন।

এই উপাখ্যানে এই শিক্ষা লাভ হয় যে, মরণ-স্মরণে জীবনের অনিত্যতা বোধ হয় এবং আত্ম-সীমাবন্ধির এই ভব-ভোগের সমস্ত ভোগ্য বিষয়ই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর জানিরা, ইহার প্রতি আসক্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ ও বৈরাগ্যবিশীল হইরা যায়; কিন্তু আগলিঙ্গা মনের স্বাভাবিক ধর্ম, স্মরণাৎ সে লোক্যার পুরণার্থ অনিত্য পদার্থের পরিবর্তে নিত্যধর্ম ভগবচ্চরণ লাভের বাসনা ও তদর্থে সাধনা চলিতে থাকে এবং গুরু-কৃপাশ্রমে তাহা লাভ হয়।

সুচিকিৎসক ‘বোলান্’ দিরা পেটের কুপিত মল নিঃসারিত করিয়া, পরে ঔষধ সেবন করাইলে, তাঁরা বেরূপ শরীর মধ্যে সহজে ও শীঘ্র জিহ্বাশীল হইরা, রোগীর স্বাস্থ্য-বিধান করে, এই ভবযোগে রোগী আশ্রয় ও যদি তরুণ মরণ-স্মরণ-অনিত্য বৈরাগ্য-সারক সেবনপূর্বক জন্ম-জন্মান্তর-সঞ্চিত বিবন্ধ-বাসনারূপ কুপিত মলরাশি নিঃসারিত

করিয়া, আশ্রয়ভুক্তি-সম্পাদনে সমর্থ হই, তখন অধ্যাত্মবৈষ্ণব শ্রীগুরুদেব-দত্ত উষ্টমন্ত্র-সহোষগির সত্ত্বকল লাভে অবিলম্বে আত্মোন্মত্ত ও পরামশ-প্রেমার-পথ্য ভোগের যোগ্য হইব, সন্দেহ নাই। আমরা বল কিছু পাপ, অগম্য বা অবধ্য কার্য্য করি, মরণ স্মরণ না থাকাই তাহার প্রদান কারণ। জীবনের অনিত্যতা যে আজগাম্যান দেখে, প্রতিকূল বৈরাগ্যের প্রহরতার আত্মজীবন অগাপ-জীবন তাহারই থাকে। কেননা, অনিত্য জীবনের অনিত্য বিষয়ভোগের অকিঞ্চিৎকরত্ব জানে পাণের আঘাতলোভনীরতের অত্যবে বর্তমানতা তাহারই মনে লাগে।

উপলংহারে নিবেদন, সাংসারিক চর্চটিনা-বিশেষে আকাম্বিক চিত্তাক্রমকশে যে সাম-রিক বিষয়-বৈরাগ্য অস্মে, তাহার শাস্ত্রে “মর্কটবৈরাগ্য” বলা হইয়াছে; উহা স্বামী ও সাগম-সাকল্যাদামী নহে। আবার শব্দ-দর্শনে বা শব্দবাহকের রোমহর্ষবী হরিশ্চন্দ্রনি শ্রবণে যে উদাগতোভিত্তারাক্রান্ত স্বপ্নে কণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, শাস্ত্রোক্ত সেই “শ্রমণ-বৈরাগ্য” ও কণসকারী ও অকিঞ্চিৎকারী। কিন্তু দিনান্তে একবারও একান্ত-মনে স্বীয় শেখের সে দিনের অশ্রুত্মাশিত্য স্মরণ করিলে যে বৈরাগ্যের সত্ত্ব সফার হইতে থাকে, তাহা পাকা গাঁপানের স্তায় স্মৃষ্টিরূপে স্মরেৎ সংগঠিত হইরা, বিষয়-জঞ্জাল বিবাহিত বিশ্ব-বিস্তৃত আত্মমন্দির নির্মাণ করে এবং বিষয়স্ময়ের প্রেমসমন জাগ্রত বিগ্রহ তাহাতে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইরা, পূজককে প্রেমামল-প্রসাদ প্রদানে পরম পরিভূক্ত ও চরম চরিতার্থ করে। অতএব তদবচ্চরণে

প্রার্থনা, আমরা যেন শেষের সে দিনের কথা 'শেষের সে দিন' পর্যন্ত কোন দিনই না ভুলি।

যেন—

শেষের সে দিন,
স্মরি পতিদিন।
মরণ-হরণ করি,
এ ধারণা ধরি,
মরণ মরণ করি,
বপি 'হরি হরি'!

শ্রীঃ—

জীবন-সংগ্রামের নবীন অস্থি।

সংগ্রাম সংসারের নিয়ম। কি জীব-
জগৎ কি জড়জগৎ সর্বত্রই সর্পকণ সংগ্রাম
বিস্তারিত। কাণপ্রবাহ জীবনের বক্ষের
উপর দিরা খরবেশে সতত প্রবাহিত ;
অগম্য-ভাসিমা বায়, কোন্ অপরিস্রুত
প্রদেশে বাহিত হইয়া, নীর অধিকার
হারাইয়া ফেলে, আর মনল শক্ত দৃষ্টিতে
সহস্র উপকরণ সংগ্রহ করিরা স্বাধিকার রক্ষা
করে।

দৃষ্টিতে দর্শন করিলে, সংসার নন্দন-
কানন বোধ হইবে না ; কলকোক্তিগঞ্জিত
নবগম্য-বুকুলমণ্ডিত কুসুমস্তবক-মঞ্জিত
'কুল'ও মনে হইবে না। বস্ততঃ ভয়াবহ
রক্ষকের রূপে প্রতীক্ষমান হইবে। শান্তি,
প্রীতি এখানকার অতিথি—ভাঙনা, বেদনা,

বাতনা, রোদন, পলায়ন ও মরণ এখানকার
অধিবাসী। প্রতিবন্দিতার উচ্ছ্বলন বৃত্তা,
ভীত-আক্রমণ, হৃদয় আত্মরক্ষা, মনলের জর,
হৃদয়ের পরামর্শ কর—এখানকার সংক্ষিপ্ত
ইতিহাস।

ভারতীয় সমাজে এই জীবন-বুদ্ধ ভীষণ
হইতে ভীষণতর ভাবে আত্মরক্ষা করি-
তেছে। প্রকৃতির অরূপার ভারতীয়গণ
আক্রমণের ভার পান নাই। আত্মরক্ষার
হুংগাধা অগ্নি-পরীক্ষার অধিকার পাইয়াছেন।
সমাজের উচ্চতরের কথাই প্রধানতঃ এ
প্রবন্ধে আলোচ্য।

প্রথমতঃ বিজ্ঞানির পুরাকালীন জীবন-
বুদ্ধের অস্তিত্বের বিষয়ে আলোচনা করা
আবশ্যক মনে করি। তদাধো ব্রাহ্মণ বিষয়ে
বৈদিকযুগের অধিসভাগে (জীবিকা লব্ধে)
দৃষ্ট হয়,

“দ্রব্যমর্জ্জয়ন্তু ব্রাহ্মণঃ ঘাজয়ৈ-
নধ্যাপয়েৎ প্রতিগৃহীয়াধা।”

অর্থোপার্জননের অস্ত ব্রাহ্মণ বাজন,
(পৌরোহিত্য) অধ্যাপন, ও সংপ্রতিগ্রহ
করিবেন।

সংহিতায়ুগেও এই সিদ্ধান্ত সম্মানিত
হইত, প্রমাণ—

যশাস্তু কর্মণামস্তু জৌগি কর্ম্মাণি
জীবিকা।

বাজনাধ্যাপনে চৈব বিদ্বাচ্চ
প্রতিগ্রহঃ।”

বাজন, অধ্যাপন, দান এবং বাজন, অধ্যা-
পন, প্রতিগ্রহ এই বই 'কর্ম' ব্রাহ্মণের

কুস্তীয়া, ইহার মধ্যে শেখোক তিনটা জীবিকা-
নির্কীর্ষের উপার। এ নিয়ম সাধারণ।

সংহিতাধুগে জীবিকাভ্রমের উপায়ভেদে
ব্রাহ্মণগণ বহুশ্রেণিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

মানব-ধর্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়,

কুশ্লুশাশ্রুকো বা স্যাৎ শাস্ত্রক
এব বা ।

ক্র্যহৈহিকো বাপি ভবেৎ অশস্ত্র-
নিক এষ বা ।

চতুর্গাঋষিঃ চৈতেষাং বিজ্ঞানাং গৃহ-
মেধিনাং ।

জ্যায়ান্ পরঃ পররাজ্ঞয়ো ধর্মতো
লোকজিতমঃ ।

যটুকশ্মৈকো ভবতোযাঃ ত্রিভিবশ্ব্যঃ
প্রবর্ততে ।

যাত্য্যগৈকঃ চতুর্থস্ত ব্রহ্মসত্রোণ
জীবতি ।”

কুশ্লুশাশ্রুক, কুস্তীশাশ্রুক, ক্র্যহৈহিক
অর্থ অর্থনৈতিক হইয়া জীবন যাপন করিবে।
এই চতুর্গণ মধ্যে পুরোক্ত অপেক্ষা পরোক্ত
অধিক শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে কেহ যটুকশ্ম
অবলম্বন করিবে, কেহ কশ্মজয় গ্রহণ করিবে,
কেহ কুইট্টা কর্ম, কেহ বা ব্রহ্মসত্র দ্বারা
জীবিকা নির্কীর্ষ করিবে।*

* মেধাতিপি বলেন, ‘কুশ্লুশাশ্রুক’
অর্থ বাহার বর্ষজন্মের সংখ্যা (যাজ্ঞ ও
‘বর্ষাদি’) আছে, ‘কুস্তীশাশ্রুক’ অর্থ ৬ মাসের
উপযুক্ত যাজ্ঞ বাহার আছে, গোবিন্দরাজ
বলেন, ‘কুশ্লুশাশ্রুক’ ১২ দিন চলিবার
হা উপযুক্ত যাজ্ঞ আছে, ‘কুস্তীশাশ্রুক’ ৬

গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বহুপরিবার-
বাস্তি ‘শাস্ত্র’ অর্থাৎ শিল্প এবং উচ্চ (১)
অপাচিত, বাচিত, কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীর্ষ (২)
এ যটুককার বৃত্তি অবলম্বন করিতেন।
পুরোপেক্ষা অন্নপরিজন গৃহস্থ যাজ্ঞন,
অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ আশ্রয় করিতেন। অল্প
গৃহস্থ প্রতিগ্রহকে নীচবৃত্তি মনে করিয়া,
যাজ্ঞন ও অধ্যাপন দ্বারা জীবিকা নির্কীর্ষ
করিতেন। যাজ্ঞনে দোষদর্শী ব্যক্তি কেবল
মাত্র অধ্যাপন অবলম্বন করিয়া পরিবার
প্রতিপালন করিতেন।

এই শ্লোকে প্রদর্শিত চতুর্গণ গৃহস্থের
ধর্মের কঠোরে সমাজের বিভিন্ন প্রকার চারি

দিনের মত যাজ্ঞ সঞ্চিত আছে। কুল্লুকওট্ট
বলেন ‘কুশ্লুশাশ্রুক’ গৃহস্থ ৩ বর্ষের যাজ্ঞ
সঞ্চিত আছে। কুশ্লুশ অর্থ টট্টকাদিরাচিত
যাজ্ঞাগার। আর ‘কুস্তীশাশ্রুক’ ধানকা-
হৌপযোগী যাজ্ঞের অর্থ। কেহ বলেন
কুশ্লুশ অর্থ মরাই,—দেশভেদে ‘আউট্টী’
নামে অভিহিত। টটারাই পড় দৃঢ় এবং
বাহিরে স্তম্ভভাবে গঠিত হইলে ‘গোলা’
নাম ধরে, তাহাই কুল্লকের যাজ্ঞাগার।
কুস্তী অর্থ ‘জালা’ বা ‘কোলা’ কিম্বা ‘মাট’
ইত্যাদি প্রাদেশিক নামে পরিচিত বৃহৎ
ধূংপাত। কুশ্লুশ অর্থ ‘গোলা’ আর কুস্তী
অর্থ উট্টীকা বা আউট্টী। ইহা আবার
বলি।

(১) ক্ষেত্রপতিত বনরোগ্রহণ অর্থাৎ
‘শাস্ত্র’ কুড়াইরা শিল্পা শিল্প, এবং ক্ষেত্র-
পতিত পরিত্যক্ত যাজ্ঞকথা সংগ্রহ উচ্চ।
এতদ্বতয়ের নাম ‘শাস্ত্র’।

(২) কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীর্ষ সম্বন্ধে
করিবে না, অপরের দ্বারা করাইবে।
গৌতমের ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, ‘কৃষি-
বাণিজ্যকুসীর্ষাশ্রয়ঃ কুসীর্ষাতি’

অন্য বৃক্ষাদি স্থানাদি হয়। সময়ে সময়ে বিশেষে কার্য-বিশেষ প্রশংসিত বা নিষিদ্ধ হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানস্থ সত্য। কৃষি ও বাণিজ্যাদির প্রতি অনাদরাদর্শন সেই দিনই সম্ভব, যে দিন গ্রীক পরিব্রাজক মেক্সান্ড্রিনিস ভারতে বিজ্ঞা ও দর্শনাবসাদীর আদর সমস্তই ব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন। বৈদিকযুগের নবোন্মেষে কৃষিবাণিজ্য রাজ-পূজা পাইত, এ সময়ে প্রমাণ প্রয়োগের প্রয়োজন দেখিনা। জ্ঞানচর্চার যুগে জ্ঞানীর উচ্চস্থানে যাহারা আকৃত, তাহাদের কৃষি শ্রম করিতে সঙ্কোচ বোধকরা স্বাভাবিক, সুতরাং “লব্ধরংকৃত” কৃষি বাণিজ্য তখন সমাজে স্থান পাইয়াছিল। এই সময় শায়ীর শাস্ত্রের প্রতি অনাদরাদর্শনপূর্ণক কেশব মানসিক শক্তির অস্থায়ী রূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষা দ্বারা ব্রাহ্মণ-সমাজ চর্কণ হইতে আরম্ভ করেন। কার্যবিশেষের প্রতি ঘৃণা ও কায়িক পরিশ্রমে পরামুগ-তাই মূগাহীন মানের দানী উপস্থিত করিয়া সমাজের সর্গনাশসাধন করিয়াছিল।

যখন কৃষি-বাণিজ্য-সেবার সহিত পরোক বা প্রত্যক্ষভাবে সঙ্ক-রক্ষা ও জ্ঞানচর্চাকারি-গণের অপ্রীতিকর হইয়াছিল, তখন বাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহই জীবিকার্জনের উৎকৃষ্ট উপায় রূপে অবধারিত হইল।

প্রতিগ্রহের সম্মান—যোগ্যতার অন্তিমুষ্টি। শক্তিমানে চরণে সর্ব্বক উৎসর্গ করিবার জন্য দেশ বেদিন প্রাণে প্রাণে প্রস্তুত ছিল, মেদিন প্রতিগ্রহের নাশাস্ত্র ছিল পূর্ণা-প্রাপ্তি। কৃষিকার-লাভ। দর্শনপ্রতিষ্ঠা, জ্ঞানদামর্ঘ্য ও উচ্চজ্ঞান অর্থাৎ প্রতি-

গ্রহ” শিক্ষা বা প্রার্থনার নীচমুষ্টি বাতীত অপর কিছুই হয় না। যখন প্রতিগ্রাহীর ধনলাভ “কাকালী বিদায়ের” দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন আভিজাত্যভিমানে ব্রাহ্মণ-তনয়ের অন্তঃস্বামীতে যে ঘৃণাব্যঞ্জক অকার উদ্ভিষ্টাছিল, তাহারই পরিচয় শাস্ত্রে পরিস্কৃত। সে পরিচয় মানব-দর্শন-শাস্ত্রের দশমাধ্যায়ের (৩) উহাতে প্রতিগ্রহকে নীচকর্ম বলা হইয়াছে। সমাজের শ্রেষ্ঠ দুইটা বাজন ও অধ্যাপন, (গৌরোত্তম্য ও অধ্যাপকত্ব বা গুরুত্ব) লইয়া যোগ্য ব্যক্তি সম্বন্ধে থাকিলেন; প্রতিগ্রহ উচ্চজীবিকার শ্রেণী হইতে নির্দাসিত হইল।

সমাজের অপর স্তরে এই সময় আর এক ধনি উদ্ভিষ্ট। সুযোগ্য ব্যক্তি প্রতিগ্রহে ঘৃণা বোধ করিলেন। অপেক্ষাকৃত সুযোগ্য—জ্ঞানচর্চায় অসমর্থ অভিজাতবর্গীয় সম্মান ঘোষণা করিলেন—

‘প্রতিগ্রহাৎ শুধ্যতি জপ্যাহোমৈঃ
যাজ্যন্তু পাপং ন পুনস্তি বেদাঃ;’

প্রতিগ্রহ-জনিত দোষ জপ-হোমাদি-দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু বাজন-কর্মে যে দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা দূর করা বেদের ও অসাধ্য। এই প্রচারের পরিণামে ‘প্রতিগ্রহ’ উচ্চ জীবিকাজানে পুঞ্জিত হইল না, (কারণ উৎকর্ষ-নিশ্চয় শিক্ষিত সমাজেরই করতল-গত) পক্ষান্তরে, সুযোগ্য ব্যক্তিগণ বাজনের

(৩) প্রতিগ্রহাৎ বাজনাৎ কৃতধীর্য্যাপ্রা-
প্রতিগ্রহঃ প্রত্যবরঃ যেষা বিপুল-
দাঁড়িঃ।

প্রতি বীতভ্রম হইলেন। পৌরোগিক যুগে
 বর্ষে বর্ষে পুরাণকার বলাইরাছেন।
 “পৌরোহিত্যমহং জানে গর্হিতং
 দূন্যজীবিতং।
 অর্থাৎ গর্হিতমপি তবাচার্য্য-
 সিন্ধয়ে।”

অর্থাৎ হে রাম! আমি জানি পৌরোহিত্য
 গর্হিত কর্ম, দূন্য জীবিকা, তথাপি উপ-
 নয়ন সময়ে তোমার আচার্য্যর লাভ করি-
 বার প্রত্যাশারই ঐ নিন্দনীয় বৃত্তি অবলম্বন
 করিয়াছি। বর্ষিষ্ঠ ও বিশ্বাসিতের সময়ে
 পৌরোহিত্য-ঘটিত কলঙ্ক-বটন, ও সেই
 পিত্রাটের কলে সমাজবিপ্লব—এমন কি
 রাষ্ট্রবিপ্লব পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা
 পুরাণপাঠকের অবিদিত নহে। পৌরো-
 হিত্য নিরাসিত হয় নাই, কিন্তু উচ্চসম্মান
 হারাওয়া বলা কপঙ্কং আশ্রয় করা করিতে
 বাধ্য হইয়াছে।

শেষ আশ্রয়—ব্রাহ্মণ-শক্তির নির্দোষ
 অবলম্বন ব্রাহ্মণ্য বা অধ্যাপন। এই পদার্থ
 দুই বিভিন্ন আকারে আমাদের দেশে আপন
 ককাল লইয়া দণ্ডায়মান। এক আকার
 অধ্যাপকমণ্ডলী, অপর বৃত্তি গুরুসম্প্রদায়।
 অধ্যাপকবর্গের অধিকার-স্থান সমাজ-সাধা-
 রণ, গুরুবৃন্দের অধিকার-ক্ষেত্র সমাজের
 অংশবিশেষ শিল্পসম্বন্ধিত মাত্র।

এই দুই বৃত্তিতে মৃতপ্রায় ব্রাহ্মণ্য আর
 দুর্ভাগ্যজনক অধিক পুরের ব্রাহ্মণ্য জীবিকা
 জীব নিদর্শন-অপেক্ষে প্রচার করিতেছে।

কজিরের বৃত্তি পত্র-ধারণ, বৈভববৃত্তি
 বা নিম্ন-কর্ম-পত্র-ধারণ।

এ বাবৎ আমরা অনাপৎকালের উপার্জন
 বিষয়ে আলোচনা করিলাম, অধুনা আপৎ-
 কালীন জীবিকার কথা বলা প্রয়োজন
 মনে করি। শাস্ত্র, আর্জি বা বিপন্নের প্রতি
 অল্পগ্রহে প্রকাশে গড়োচ বোধ করেন নাই।
 বর্ত্ততঃ অস্বাস্থ্যমুদায়ের ব্যবস্থা না হইলে,
 সে ব্যবস্থা মৃত স্ত্রনের বা পণ্ডিত হউক না
 কেন, সমাজ তাহাকে নিষ্ঠুর বিধান মনে
 করিতে বাধ্য হয়। যখন আপন ব্রাহ্মণ
 স্বভাবসার দ্বারা জীবিকাকর্মে অসমর্থ হই-
 যেন, তখন তিনি কজিরবৃত্তি—অর্থাৎ
 বোকা কর্ম গ্রহণ করিবেন। (১) প্রদেশ-
 নির্দেশের নিয়মের ব্রাহ্মণ-সম্মান জমিদারের
 “পাইকু” “পেরাদা”রূপে নিরীহ প্রজার
 মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া আপনাদের
 নিদর্শন প্রদর্শন করিতেছে। এখন উহা
 সামান্য ভৃত্যভাবসংগ্ৰহ হইলেও, আরম্ভ-
 সময়ে উহা মৈনিকশক্তির অংশ-বিশেষ-
 রূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, এরূপ নির্দেশ
 অসম্ভব নহে।

কজির ধর্মের দ্বারা জীবন রক্ষা ক্রেশকর
 হইলে, ব্রাহ্মণের আশ্রয় বৈভববৃত্তি—অর্থাৎ
 কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি। (২)
 অবস্থার আণীড়নে ব্রাহ্মণসম্মান কৃষকের
 সকল কার্য্যই ক্রমে হ গ্রহণ করিয়াছেন,
 কিন্তু “সহস্রে হলচালনা” এখনও অপকর্ম

(১) মতঃ—অজীব্য ভ বপোক্তেন ব্রাহ্মণ্য
 যেন কর্মণা। জীবৎ কজির-ধর্মণ-সইত
 প্রত্যনস্তমঃ।

(২) উভাত্যামণ্যজীবন্ত কনং স্তাদিত
 চেন্দ ভবেৎ। কৃষিগোরক্ষ্যমাজার জীবৎ
 বৈভব জীবিকাঃ।

মনে করিতেছে। গোরক্ষ বে তাবে দেশে
 বিজ্ঞান, তাহাতে উহার নাম 'গোহত্যা'
 রাখিবেই সত্যের আদর করা হয়। বাণিজ্য
 একেবারে "চর্ষপাত্ৰকাবিক্রম" পর্গাতে অব-
 তরণ করিয়াছে। গোরক্ষের এক মুক্তি গৌশ-
 কটপৌষন। একজন বন্ধুর মুখে এক দিন
 শুনিরাছিলাম, পশ্চিমের কোনও প্রসিদ্ধ
 মহলে একজন ব্রাহ্মণ-সম্মানকে এক ব্যক্তি
 একখানা-পত্রের শিরোনামা পাঠ করিতে
 বলার, বিগপত্র জোখে অশ্লিষণা হইয়া
 বলিয়াছিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, "লালা"
 নহি"। শেষে জানা গেল, ঐ ব্রাহ্মণ-তনয়
 গৌশকট-পরিচালনা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ
 করেন। তাঁহার বিবেচনার, পত্র পাঠ করা
 'লালা' সম্প্রদায়ের এক চেষ্টা, ব্রাহ্মণের
 উহা অগোরবকর। এ দৃশ্য যেমন শোকে-
 দীপক, তেমনি হাত্তজনক।

শূদ্রবৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। (১) শূদ্র-
 বৃত্তি সেবাকর্ম; প্রকৃত কথা বলিতে গেলে—
 উহা "ধানপামাগিরি"র নামান্তর। শাস্ত্রের
 আদেশ, ব্রাহ্মণ শূদ্রবৃত্তি এবং শূদ্র ব্রাহ্মণ-
 বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশে
 ইহার এখনও বিশেষ ব্যতিক্রম হয় নাই।
 বলা বাহুল্য, 'শূদ্র' বলিতে 'অনার্য জাতি'
 বুঝরা থাকি। ভারতের কোনও ২ প্রদেশে
 ব্রাহ্মণ প্রকৃত শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করিয়াছে।
 লাহোরের একটি বিবরণ কঠিনক বন্ধুর মুখে
 শুনিয়া বুঝিয়াছি, উহা প্রকৃতির প্রতিশোধ,
 নূতন মর্মে। বিবরণ এই—কঠিনক বন্দীর

ব্রাহ্মণের জাতীয় ব্যক্তি উচ্চকর্মে নিবৃত্ত
 হইয়া লাহোরের গিয়াছিলেন; তাঁহার ব্রাহ্মণ
 পাচক সফার পর প্রকুর চরণ-মর্দনে
 (গোড়মলিতে) প্রবৃত্ত হইলে, তিরস্তন
 সংস্কার বশে তিনি নিবেশ করিলেন।
 প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিল, "ইহাকে আমরা
 'দোষকর' মনে করি না।" ঋষির শাসন—
 বৃত্তিকার শোষণ অপেক্ষা প্রবল নহে। এ
 সংবাদে আনন্দিত হইতে পারি না। উদারতার
 —মহাপ্রাণতার অঙ্গপ্রাণিত হইয়া ব্রাহ্মণ
 সংসারের সেবক হইতে পারেন, কিন্তু এ
 তাহা নহে; বন্যকারণে আশ্রয় সঙ্গ্রহ জ্ঞানের
 একরূপ সশীঘ্র-মুক্তি-গ্রহণ বা শোচনীয়
 পরিণতি লাভ কাহারও ঐতিকর হইতে
 পারে না। আশ্চর্য্যবিতা জাতীয় উন্নতির
 অন্তরায়, কিন্তু আশ্রয়সঙ্গ্রহ আশ্রয়তির
 গর্ভস্থান উপকরণ, ইহা কাহারও নিবৃত্ত
 হওয়া কর্তব্য নহে।

আপংকালে কত্রির বৈশ্ব শূদ্রবৃত্তি এবং
 বৈশ্ব শূদ্রবৃত্তি ও গ্রহণ করিতে পারেন।

এই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় জীবিকার আলো-
 চনা করিয়া আমরা বুঝিলাম, আপংকালে
 ব্রাহ্মণ কত্রির-বৈশ্ববৃত্তি গ্রহণে দোষী হন না।
 বর্তমান সময়ে বৃত্তিবিপ্লব রাক্ষস করি-
 তেছে। অপরগণ শাস্ত্রীয়বৃত্তি ছাড়িয়া নানা-
 কর্ম করিতেছেন,—শাস্ত্র নগ্নন, "অবষ্ঠানি
 চিকিৎসিন্যং।" বাহার 'সমীক্ষিত কত্রির'
 নামে পরিচিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের
 কেহও অগ্যাপকতাও করিতেছেন। অপর-
 বর্ণ বিপদেও ব্রাহ্মণবৃত্তি গ্রহণ করিবেন না,
 এইরূপ শাস্ত্রের মত,—কিন্তু 'বান্দন কর্ম'
 ব্যতীত অত সকল ব্রাহ্মণবীথিকাই অপর

(১) বঙ্গ-... কথকন কুর্নীত ব্রাহ্মণঃ
 কর্ণবর্ধনঃ ।

জাতি গ্রহণ করিয়াছেন। ভ্রাঙ্কণের সর্প-
জাতির বহিঃপ্রণয় করিতেছেন। অনাপ-
কর্ম, অশয়ন, অদর্শন, গাটতে প্রবেশ, অপ-
কর্ম, অপায়ে পড়িত। সমাজের যে অত্যন্ত
অপেক্ষা করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য।
অন্যদিকের সমাজের যে খোঁজা-বাঁড়া ও প্রাণ-
ছাড়াইয়ের প্রচেষ্টা ঘটিতেছে না।

দারিদ্র্য, কোপ, শোক ও অকালমৃত্যু
সংক্রান্ত বিষয়ে সমাজের সঙ্গত হল। অবিবর্ত
সংস্কারমণ্ডলে ক্রিয়াকর্ম করিতেছে। সেখানে
ভার্যাকৃত্যই চিরদিনের জন্য আনন্দধর্মের
স্বরূপ হইতে পারে। সমাজের যে
আপেক্ষা করা উচিত, ইহা অর্থাৎ অগোচর নয়।
ভ্রাঙ্কণের পূর্বকর্তা পরিচয় বাক্যের।

সমাজের পূর্বকর্তা বিবরণ অপেক্ষা
অধিকতর পরিষ্কৃত রাখা। সমস্ত হইতেছে,
এ প্রকার। সমাজের পক্ষে স্মৃতি-বিপ্লবের
পরিচয়ক। সমস্ত বর্ণিতোছেন—

“স্মৃতি-বিপ্লবঃ স্মৃতি-সেনা যৌরিক্যঃ
বিপণিঃ কৃষিঃ।
স্মৃতি-ভৈর্যঃ কুমীদঞ্চ দশ জীবন-
হেতবঃ।”

অর্থাৎ, বিপ্লবস্থলে বিদ্যা, শিল্প, ভূক্তি
(বেতন গ্রহণ পূর্বক কার্য সম্পাদন—
'চাকরী') সেনা (স) (শুদ্ধকর্ম), গোলকর্ণ,
নাবসার (বাণিজ্য) কৃষি (স্বয়ংক্রিয়তা)

(স) 'সেনা' অর্থে কুমুদভট্ট বলেন—
'স্মৃতি-বিপ্লবঃ' পরিচয় আদেশ পাঠ্যেই
জীবন-সংস্কারমণ্ডলে ভ্রাঙ্কণের অর্থ গ্রহণ করি-
তেছে। 'স্মৃতি-ভৈর্যঃ' কৃষি-
বৃদ্ধি। 'স্মৃতি-সেনা' বেতনগ্রহণ।

সম্ভাব, ভ্রাঙ্কণের, কুমীদ (অদর্শন—
টাকা ধার দেওয়া), এই দশবিধ জীবিকা-
জর্জনের উপায়।

'বিদ্যা' অর্থে ব্যাখ্যাভূষণ তর্কবিদ্যা,
বিষয়িতা, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি বুঝায়েছেন—
ইহা সকল বর্ণের বিপ্লবকালের জীবিকা।

'বেদ্যতর্কবিদ্যাপনয়নাদিবিদ্যা-
সর্বেষামাপাদি জীবনার্থঃ ন
দ্রুস্মৃতি, ('মস্বর্ষমুক্তাবলী ')

সুতরাং উত্তরপক্ষে ও কলিকাতার ভ্রাঙ্কণ-
করিবার জন্য অপকর্ম করিতেছেন না।

“তস্মাদ্ ভ্রাঙ্কণেন ভেদজং ন
কার্যং।”

এই নিবেদ্যক্তি (বেদবাণী) তাঁহাদের
প্রতি প্রয়োজ্য নহে; কারণ, উহা স্মৃতি-
দ্বারা জীবিকা জর্জন সম্ভব হইলেই অপর বৃদ্ধ-
গ্রহণ নিষেধ করিতেছে।

এই সমস্ত জীবনোপায়ের মধ্যে যাহার
যাহা নিষিদ্ধ, তিনি বিপদে তাহাই গ্রহণ
করিতে পারেন। মস্বর্ষমুক্তাবলীর স্মৃতিপূর্ণ
উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। স্মৃতি
করি 'অপাৎ প্রকরণ্যং জীবন-হেতব ইতি

এতদ্ব্যয়ের পার্থক্য বুঝি না। জীবন-হেতবের
পরের আদেশ-পাঠ্যে 'বেতন' জীবন-সংস্কার-
পন্য পরিষ্কৃত হয় না; তখন বেতন গ্রহণ
পরিষ্কারপালন করা, বেতন গ্রহণ পূর্বক
প্রেরণ (আজ্ঞাপালক) হওয়া, এ দুইটির
ওদে কোপারি 'শিল্প' বলিতে তিনি
বুঝিয়াছেন। 'শিল্প' বিধিনাদি করিয়া
শিল্প অর্থে বসি 'কেনাকাটা' করি-
শিল্পের প্রিত্যক্ত-প্রকরণ্যং 'কার্য' অর্থে 'কর্ম',
ইহাতে সন্দেহ নাই।

নির্দেশাৎ এখানে অর্থাৎ বরা বৃত্তা বস্তানাপদি
কীবাং নিবিহৎ উরা তস্তাতাহুজ্ঞারতে
ইত্যাদি।”

যুক্তি অর্থাৎ সন্তোষে হৃৎখের তার লঘু
হই, কিন্তু উহা আপৎসনয়ের জীবিকা-
নির্কীর্ষের উপায়রূপে গণ্য হইবার যোগ্য
কি না, তাহা জীমানের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অপমত।
যুক্তি অর্থে যুক্তিমত। যুক্তি—ধারণা অর্থাৎ
অতীত ব্যাপারের স্মারকলিপি রক্ষা (পুরাতন
হিসাব রক্ষা।) এরূপ কেহ বলেন, কণাটা
নিভাস্ত সন্দ বোধ হয় না।

‘বিত্তা’ শব্দে আমরা অধ্যাপনা বুঝি।
অক্ষয়জ্ঞে (অনাপবৃদ্ধিতে) বেতনব্যবস্থা
নাই। অধ্যাপকসঙণী ও গুরুকুল, সমাজের
দ্বারা সেবিত—পালিত হন, কিন্তু তাহাদের
অর্থাগম—বেতন বা ভূতিশস্যবাচ্য নহে।
কালনিয়মে নিরন্ত-সংখ্যক মুদ্রা গ্রহণ করিয়া
কর্তব্য সম্পাদন করাই ভূতিজীবন। অনাপৎ-
কালে অধ্যাপনে বেতন গ্রহণ নিবিহক,
কিন্তু আপনে বেতন গ্রহণ পূর্বক অধ্যাপনা
করা শাস্ত্রোক্ত ভূতকাধ্যাপকতা।

অক্ষয়জ্ঞার ভূতকাধ্যাপকতা নিস্কীয়,
উহাতে প্রাপ্তিভঙ্গানিভাই শাস্ত্রের অতি-
মত। বেতনগ্রাহী অধ্যাপক যুগিন্দ,
পক্ষান্তরে সমাজের সর্ববিধ সহায়ভূতি-
রহিত। সমুদয়হিতার ভূতীরাধ্যায়ে ১৫৬
লোকের দৃষ্ট হয়,— ভূতকাধ্যাপককে দৈব-
কার্যে এবং পিতৃকার্যে নিমগ্ন করাও
বোধাবস্থা। এই নিম্নিত ভূতকাধ্যাপকতা
বিপৎকালে কর্তব্য বলাই সমস্ত।

সামাজিক্য ‘শকট’ ‘শিরি’ এবং ‘অনুপ’
(জীবিকাপ্রাপ্যের মধ্যে) এই তিনটি অতিরিক্ত

লিখিয়াছেন। শকটচালনা এবং পর্বতের
কাঠ-সত্তরাদি বিক্রয় জীবিকাকর্মের উপায়
বটে। ‘অনুপ’ অর্থাৎ (জলপ্রায়) নির-
ভূমি,—সেখানে বৃক্ষ ওষধি উৎপন্ন হইতে
পারে, তবিক্রয় জীবিকানির্কীর্ষের অল্পতম
উপকরণ।

বৈশ্বভূক্তি গ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণ নীল,
লাক্ষা, মনণ, শৌহ, হৃৎ, দধি, ধূত, মধু,
শুড়, মস্ত, মাংস, শস্ত, মহুস্ত ও কৃত্তার
(রাধা ভাত) গভুক্তি বিক্রয় করিবেন।

মহু মহারাজের এ নিবেদ আর কেহ
মানেন না, কৃত্তারবিক্রয় বন্ধ হইলে নানা
মাংসের সান্না ভাবের “হোটেল” ভলি বিলুপ্ত
হইবে, তাহাতে দেশের লোকের অর্শেব
আপত্তি। যখন “আব্গারী” বন্দোবস্ত
হয়, তখন সময় সময় কুণীন ব্রাহ্মণের
ডাকুই অগ্রগণ্য হয়, দেখিয়াছি।

এই যুক্তিবিম্বা ভারতে সুবর্ণযুগ আনয়ন
করিবে আশা করি। বিম্ব হইতে শৃঙ্খলা
আসে।

সমাজের কাছে এইসব শাস্ত্রের আর
সম্মান নাই। ব্যবসায় কাহারও নিষেধ
নহে। সকলেই সকল ব্যবসায়ের অধি-
কারী। যখন আপত্তিরেও নীচে বাঁধা
হইতেছে, তখন সুবিধাভূতায় তত্ত্বকারে
ব্যবসায় গ্রহণ করা সকলেরই ইচ্ছা।

শ্রমজীকার করিতে এ দেশের ভ্রাতৃলোকেরা
পরামুখ। মানের পরিমাণ এখনও
নিভাস্ত অল্প মর; কাজেই ‘চাকরী’কে
সত্যতার চরম আদর্শ মনে করিয়া, অজাত-
স্বল্প বালক হইতে পকেলু সৌভ পূর্বাত
তাহারই সেবার বোধশোপচার সংজ্ঞ

করিয়া "সার" হইতেছি। সম্প্রতি ভগবৎ-
কৃপায় আমরা এই অধঃপতনের পথে আর
অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।
অন্যত্রের কশাঘাতে ফিরিতে-বাধ্য হইতেছি।
চাকরী যে আপৎকালে অকর্ষ্য নর, তাহা
পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু ভৃত্য-
ত্বই সম্মানিত হওয়ার, আমরা আত্মনিবাস
হানাইরাছি ও আত্মশক্তির অপ্রতীক্ষনে
অগামর্ধ্য অহুত্ব করিতেছি।

শিম-বাগিয়া-চন্দ্রমা বৈদেপিক অভিজাত-
রাহর করালকবলে আত্মনির্গর্জন করি-
রাহে। 'কৃষি' অনাদৃত—অবজাত—উপে-
ক্ষিত হইয়া সমাজের নিরন্তরে মুখ লুকাইয়া
আছে। নিপুণদৃষ্টিতে দেখা যায়, সমাজের
হই তরে জীবনসংগ্রামের হই অত্র বাসন্ত
হইতেছে। উচ্চস্তরে লেখনী, নিরন্তরে
হল না লাগল। নিরন্তর সবেগে লেখনীর
চকল অকল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে।
লেখনী-দেবী কিকিং চিত্তচাপল্য অহুত্ব
করিতেছেন মাজ, এখনও নিরন্তরে আত্ম-
সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হন নাই।

নিরন্তরে যে ক্ষত্রশক্তি (৩) অবজাত ভাবে
বিদ্যমান, তাহা হইতে ধনি উঠিয়াছে,—
"হে ক্ষত্রগণ! তোমরা আমাদিগকে বহু-
কালের স্বাধীনতা হারা কুণাটীর রক্ষিতে চেষ্টা
করিতেছ, অগত তোমরাই আমাদিগকে
'চাষা' হাওয়ার সুখী কর, আমাদের অণ গ্রহণ
করিতেও তোমরা কুটিত। আমাদের সামা-
জিক অধিকারদেও; নতুবা তোমাদের কৃষি
আর কর্ণ করিব না। তোমরা যেখন বিদেশী-
ক্রয় বর্জন করিয়াছ, আমরা সেইকণ
তোমাদের সম্বন্ধ বর্জন করিতে বাধ্য হইক।"

* লেখকের মতে—বৈষ্ণব ভাস্কর বর্ষের পুত্র-
মতিকেই 'আর' লেখা হইয়া 'কৃষিক' মনে করি-
তেছেন।

জানি না, আজ মহু নাহকর্য্য পাঁকিলে
কি উত্তর দিভেন! আমাদের ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে
এইরূপ পারণা হয়, কর্ণল বাকি, মনাজ বা
আতি, কাহাকেও কোনও অধিকার প্রদান
করিতে পারে নাই। সবল হস্তে দাঁতের
মর্যাদা রক্ষিত হয়। অপরকে অপরকে
অধিকার প্রদানের নামান্তর বা রূপান্তর
বোধ হয় "বাণিকারে বক্ষিত হওয়া"।
ভারতীয় সমাজে সফটসমস্তার সমর সমাগত,
এ সময়ে প্রত্যেক মনীষী ব্যক্ত আত্মবিত-
চিত্তার অগ্রগর হউন।

জীবনযুদ্ধের পুরোক্ত অস্ত্রধরের মধ্যে
লেখনী আর সমাজের অরসমস্তার সুশী-
মাসোয় সক্ষর নহে; সুতরাং আমরা বল-
দেবের প্রিয়ান্ন "হলদেবের" সেবা করিতে
বলি। পুরাতনবে ব্রাহ্মণকাজিরের হলচালনা
"পুরাতন" হইলেও, বর্তমান সমাজের নরনে
"নৃতন"। তাহাই বলি, হিন্দুসমাজের
উচ্চবর্ণের ভ্রাতৃগণ! জীবনসংগ্রামের নবীন
অস্ত্র গ্রহণ করুন। আপনাদের পুর্ক-
পুরুবগণ বৈদিক যুগের প্রারম্ভে আপনা-
দিগকে 'আর্য' বা 'কর্ষক' মানে অভি-
হিত করিতে কুটিত হইতেন না; পরন্ত
গৌরব মনে করিতেন। তাহারো অপরকে
এক অনীশশক্তিমানী সম্প্রদায় ছিলেন।
আপনারা সর্বসংহারক "মনি" কর্ণনাশার
জলে তাইয়া দিয়া, "প্রাণ" রক্ষা করুন।
বিদ্যাল সংসারে বাহাদের বিততিপ্রাধপ
কৃষিও নিজের মাই, তাহাদের আবার
মনি? শ্রমালীও আপন পক্ষেরে স্বাধীনতার
বর্গস্থ পক্ষেগ করে; আর আপনাদের
সেরণ আপা করিবার সক্তি ও সামর্থ্য,—তরু

“মানে”র অভিনয়ে মান-জান হয়। হল-চালনার আপনাদের শাস্ত্রমত অধিকার আছে।

মহর্ষি মহু অনাপৎকালে অবরংকৃত কবি ও বিপদে পরোকভাবে অবরংকৃত কবি অর্থাৎ বৈষ্ণবর্ষ অহুসোদন করিয়াছেন। পরাশর, বলিরাছেন, বটকর্ণনিরত বিপ্র কবি কর্ণ (অনাপৎ সময়ে) করাটবেন। ভাংগণ্য বুঝি বার, আপৎকালে বরং কবি করিতে পারেন। ধর্ম শাস্ত্র-পণেতা বৃহ-স্পতি গভীররবে ঘোষণা করিতেছেন—

“কৃষিবাণিজ্যকুসীদং প্রকুর্ষীতা-
স্বয়ং কৃতং ।
আপদি স্বয়মপ্যেতৎ কুর্ষন্থ
যুজ্যেত নৈনস।”

কৃষি বাণিজ্য ও কুসীদ বরং করিলে না, অপরের দ্বারা করাইবে। কিন্তু আপৎকালে বরং কৃষি, বাণিজ্য ও কুসীদের অহুতানে পাপস্পর্শনকা নাই। ইহার মধ্যে কুসীদ অপেক্ষাকৃত দুগা। কুর্ষপূরণে হুদুভিগাদে প্রচারিত হইয়াছে।

“কৃষিং স্বয়ং প্রকুর্ষীত বাণিজ্যং বা
সমাজ্রয়েৎ ।
কর্ষাং পাপীয়সীং বৃত্তিং কুসীদং
তাং পরিত্যাজেৎ ।”

বরং কৃষি বা বাণিজ্য করিলে, কিন্তু পাপবৃত্তি কুসীদ পরিত্যাগ করিলে। বস্তুতই কুসীদ, চারিত্রের মহর্ষ সষ্ট করে। উহা পদ-বৃত্তির লুক্কট উপায় হইলেও উপায়ভার শকা।

বৈষ্ণাচারের বিজয়রূপে কৃষিবাণিজ্যই অস্বীকৃত হইবে। বাণিজ্য বর্তমান-প্রতি-যোগিতার সময়ক্ষেত্রে সহজে অস্বীকার্য বরমাণ্য লাভ করিতে পারিবে কি না—বলা বার না, তৎক্ষণ্ত বতন্ত্রভাবে চেষ্টা চলিতেছে। এখন কৃষিই প্রেষ্টসাধন। হে ভ্রাতৃগণ! শরীরের বাহ্য ও বাণীভার ভাববৃত্তি যদি প্রার্থনীর হয়, তবে শ্রামল শস্ত্রলতিকার, চরণচূর্ণি শীতল-সমীর সেবন করিয়া অন-বৃত্ত অমনোর অশীষর হও। জাতীয়তার নব প্রত্যয়ে জীবনসংগ্রাসের সনীন অঙ্গ গ্রহণ করিয়া, পদতরে ভ্রমণ কাঁপাইয়া অগ্রসর হও, ভগবানের মঙ্গলাশীর্ষক অলক্ষ্যে তোমাদের সম্বন্ধে বর্ধিত হইবে। ও শান্তি!

জাতীয় বিস্তার
বশোহর।

বরংকৃতমালা ।

অথ সুসুক্ণানুপাদেয়েনু পদার্থেবু কতমা
বহিষ্ঠা রত্নভূতা ইতি। উচ্যতে । (১)

আগমেষু ঋতিঃ। ঋতিবু—“কচ্ছ-
বাঘনসি প্রাজগদ্ বচ্ছজ্ঞান আশ্বনি।
জানমাশ্বনি মহতি তদ্বচ্ছজ্ঞাত আশ্ব-
নীতি” সাধন পক্ষে। (২) আহারতঃ
সবভূতিঃ।

বস্তুভূত।

সুসুক্ণগণের উপাদেয় পদার্থের মধ্যে
কোনগুলি বহিষ্ঠ রত্নরূপ, তাহা বলা
হইতেছে। (১)

আগর সকলের মধ্যে ঋতি প্রেষ্ট।

সকলকেই একাকৃতি, সৃষ্টিতেই সর্ব-
 প্রকৃতির বিয়োজক ইতি সায়ন বুদ্ধি
 পক্ষে। তৎপক্ষে— (৩)

সায়নবিষয়ক স্রুতির মধ্যে এই স্রুতি
 শ্রেষ্ঠ—স্রাজব্যক্তি বাব্কে (অর্থাৎ বাগ্-
 স্কৃত সমস্ত বাব্কেস্রাজকে) মনে উপ-
 সংহত করিবেন, মনকে • জ্ঞানরূপ আত্মাতে
 অর্থাৎ "আনিন্দুজানিত্তেহি" এই স্রুতি-
 প্রবাহে উপসংহত করিবেন। সেই জ্ঞানকে
 মহান্ আত্মার বা অসিতা মারে উপসংহত
 করিবেন এবং অসিতাকে শান্ত, আত্মার—
 অর্থাৎ উপাদি শান্ত বা বিলীন হইলে বে
 স্বরূপ-আত্মা থাকেন, তদতিস্থে উপসংহত
 করিবেন। (২)

• সঙ্গম ভাগ করিলে মন অমং উপ-
 স হত হইয়া জ্ঞান আত্মার যায়। মহা-
 ভারত রণে "তথৈবোপহ সঙ্গমং মনো
 জ্ঞানমি হুধাকরেৎ"। এ বিষয়ে যোগতার-
 স্বরূপে শঙ্করাচার্য্য স্রুতি স্মরণ করা বলিয়া-
 চেন, তাহা যথা "সংস্র সঙ্গম পরম্পরাণাং
 সংহেদনে সন্তত সাবধানঃ। পশুতদাগীন
 দুগা প্রপঞ্চঃ সঙ্গমমূলয় সাবধানঃ"।
 অর্থাৎ সাবধান বা সদা সৃষ্টিমান্ হইয়া
 বীর্ষসংকারে প্রপঞ্চে বিরগ পূর্ণক সঙ্গমকে
 উপলব্ধি কর।

সায়নের বুদ্ধি কিরণে এই স্রুতি শ্রেষ্ঠ—
 আধীভুক্তি • অর্থাৎ ইঞ্জিরের ধারা
 প্রবর্ত্তাকে বিঘ্ন সংহ ভাগ করিলে সর্ব-
 ত্ব কি বা চিত্তগম্য হয়; সর্বত্ব কি হইতে
 একাত্ব কি বা সমাধি হয়। সৃষ্টি লাভ
 হইলে, সমস্ত অবিত্যপ্রহি হইতে ত্রিমুক্তি
 হয়। (৩)

• বৌদ্ধ যোগিগণ ইহাকে স্মরণের

"ইঞ্জিরেতাঃ পরা স্রুথি অর্থেত্যন্ত পরঃসমঃ।
 মনসস্ত পরা বুদ্ধিঃ কুদেয়াত্মা মহান্ পরঃ •
 মহতো পরমবাক্তমবাক্তাং পুরুষঃ পরঃ।
 পুরুষায় পরং কিকিঃ সাকোষ্ঠা সা পরাগতি-
 রিতিঃ" (৪)

মিলেবু জাতিবিদ্যান্ পরমর্ষিঃ কপিলঃ।
 মর্শনেবু সাংখ্যম্। সাংখ্যগ্রেহেবু যোগ-
 মর্শনম্।

মহাহুতায সাংখ্যেবু শাক্যমুনিঃ ।

প্রতিকূল—সংজ্ঞা বলেন। তদ্বতে আহার
 চতুর্বিধ। কবলিকার বা অন্ন, স্পর্শ বহু
 ঐতিহাসিক বিকর, মনঃসংহতনা বা জ্ঞান এবং
 বিজ্ঞান। কবলিকার আহারকে পুত্রের সাংস
 তক্ষণকৎ বোধ করিবে; স্পর্শকে ধর্মহীন
 পক্ষে পুত্র বেদনাবৎ দেখিবে, মনঃসংহতনাকে
 অগ্নিময় স্থান বা তুলুগের সত দেখিবে,
 এবং বিজ্ঞানকে বিদ্বশেল সমান দেখিবে।
 এইরূপ দেখার নাম আহারে প্রতিকূল
 সংজ্ঞা। এইরূপ দেখিতে শিক্ষা করিলে
 যে সাধকগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়,
 তাহা বলা বাহুল্য।

তৎপক্ষে স্রুতি মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ—

অর্থ বা বিষয় সকল ইঞ্জির হইতে পর
 (কারণ বিষয় ইঞ্জির-প্রণালী যারা প্রথম
 হয় বটে, কিন্তু বস্ততঃ তাহার বিষয় মনেই
 প্রকাশিত হয়)। অর্থ হইতে মন পর।
 মন (চিত্তার কারণ) হইতে বুদ্ধি বা অর্থ-
 কার পর। বুদ্ধি (অভিসান রূপ) হইতে
 মহান্ আত্মা পর। মহান্ আত্মা বা মন্তত্ব
 (সমাধি প্রোক্ত "স্মরীতি" বোধ) হইতে
 অব্যক্ত পর (কারণ মহতঃ গীন হইয়া
 অব্যক্ততা প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত বা ঐক্যতি
 (স্বরূপতঃ সমস্ত সমাধি পদার্থের লীনতা)।
 হইতে পুরুষ পর। পুরুষ হইতে স্রুতি
 মাই, তাহা চরমা গতিঃ (৫)

স্বগতবোরাবীক্ষণার বৌদ্ধনীতিশাস্ত্রম্ ।
 বৌদ্ধশাস্ত্রে ধর্মগদনম্ । বীজের ওকারঃ
 সৌক্যমিতি চ । মন্ত্বেষু "ঐ তত্রিকোঃ পরমঃ
 পদ্ব্যমতাঃ" । ধর্ম্মাগাগারু "পর্যাগনহোহপ
 পপি ব্রহ্ম বা স্বঃপরিক্কাণাবর্ক জাগঃ ।
 স গায়বীভাকরমীক্ষমানঃ স্ত্রান্তিত্যত্বেপ্ৰা-
 ন্তভোগভাগীতি" (৫)

আখ্যায়িকাসু মোক্ষদর্শনকীর্ত্তীম্ বৌদ্ধশাস্ত্র-
 চ । সাধনালম্বনেষু আত্মা প্রপবো বহুঃ শরোঃ
 স্বাস্তা ইতি প্রহৃদিতঃ । মোক্ষোপায়েষু
 শ্রদ্ধা-বীর্বা-স্মৃতি সমাধি প্রজ্ঞাঃ । নাহুধ্যানেষু

আলোক দেন । শ্রুত আছে "স্বঃ-
 কপিণং বস্তুমগ্রে জ্ঞানৈ নিভক্তি" ইত্যাদি ।
 স্মৃত বলেন "হিরণ্যগর্ভো যোগত বজ্রা
 নাত্তপুরাতনঃ" । সম্ভবতঃ এই মহত্তেদ
 লইয়া ঋষিযুগের ভারতে সাংখ্য ও যোগ
 নামে দুই সম্প্রদায় হয় । কিন্তু উভয়ের
 আদিই কপিণ । জনক-রাজত্বাদি উপ-
 নিষদের স্ববিগণ সকলেই কপিণের পরে
 এবং কপিণ-প্রবর্তিত সাংখ্যযোগের দ্বারা
 গায়দর্শী ছিলেন, ইহা ভাবিত হইতে জানা
 যায় । ভারতে আছে "জ্ঞানং মনু বজ্রি
 মন্ত্বেষু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যে তপৈব
 নোপে । মতাপি দৃষ্টে বিবিণং পুরাণে
 সাংখ্যাগতং তত্রিবিণং নরেন্দ্রম্" ।

সিদ্ধের মধ্যে আদি বিদ্বান্ পরমর্ষি
 কপিণ ০ শ্রেষ্ঠঃ । দর্শনের মধ্যে সাংখ্য
 শ্রেষ্ঠঃ । সাংখ্যাগ্রহের মধ্যে যোগদর্শন ।
 মহাত্ম্যে সাংখ্যের মধ্যে শাক্যমুনি ০ ।
 আয়ত্ত দৌৰ দেবিবার জজ্ঞ বৌদ্ধনীতি
 শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ । বৌদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে ধর্মগদ
 শ্রেষ্ঠ । বীজের মধ্যে ওকার ০ সৌক্যম্ ।
 মন্ত্বেষু মধ্যে "ঐ তত্রিকোঃ পরমঃ পদ্ব্য
 পশুস্তি সুরঃ দিবী চক্ষুবাততম্ বরি-
 প্রাসো নিপজ্জবো জাগ্গামঃ সমিকৃত" ।
 অর্থাৎ সেট বিষ্ণু বা আকাশে সুর্য্যর আঁর
 স্তায় ব্যাপনশীলদেবের পরমপদ সমী জ্ঞানী
 বৈষ্ণবসংগ সুরমন্ডে স্মৃতমান হইয়া অন-
 লোকন করেন । "শম্যা বা আসনে স্থিত
 বা পুণে চপিতে ২ আয়ত্ত, চিত্তাঙ্গান বিহার
 ক্ষীণ, তাদৃশ সংসার-বীজের ক্ষয় দর্শন
 করিতে ২, নিত্যস্থিত, অমৃত ভোগভাগী
 হইবে" । সাংখ্যশাস্ত্র এই বৈষ্ণবসিকী
 গাণা মোক্ষপথে বীর্বা-পদাধিনি প্লাথার
 মধ্যে শ্রেষ্ঠ । (৫)

(মোক্ষদর্শন ৩০ অধ্যায়) অর্থাৎ হে
 নরেন্দ্র, মহৎ-বক্তির মধ্যে, বেদ সকলে,
 সাংখ্যমতাবলম্বী ও যোগমতাবলম্বীগণের
 মধ্যে যে মন্ত্বে জ্ঞান দেখা যায় এবং পুরাণে
 যে বিবিধ জ্ঞান দেখা যায়, তাহা সমস্তই
 সাংখ্য হইতে আগিয়াছে । অত্বে "নাতি
 সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাতি যোগসমং বস্তুম্" ।
 "গজামাঃ কপিণো মুনিঃ" কলে সর্ষি
 কপিণ পৃথিবীতে মোক্ষদর্শনের আদিম
 উপদেষ্টা । তাঁহার শাক্য অবলম্বন করিয়া
 তরীম শিষ্য প্রিশিষ্টগণের দ্বারা সাংখ্য-
 যোগাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ।

* প্রথমে এই পৃথিবীতে বাঁধা হইতে
 মোক্ষদর্শন বা সাংখ্যযোগ প্রবর্তিত হয়,
 তিনিই কপিণ । তাঁহার পূর্বে আর কেহ
 সম্যক উপদেষ্টা ছিলেন । তিনি স্বীত পূর্ন-
 জন্মেই সংসার বলে ইহলীলনে যোগের
 দ্বারা পরম পদ সাধা করিয়া উপদেশ
 করেন । মতান্তরে সাধা হিরণ্যগর্ভ
 দেবী (ঐবদিক স্মৃণে স্ববিগণ জগতের
 অধীশ্বরকে) সাংখ্যকোষকে "হিরণ্যগর্ভ"
 নামে জানিতেন) তাঁহাকে যোগদর্শনের

০ শাক্যমুনির শুকবর (আড়ার কালি
 ও কল্পক-রূপ পুত্র) সাংখ্য ও যোগী
 ছিলেন । সাংখ্যের মোক্ষগামী পদ
 শাক্যমুনি সম্যক গ্রহণ করিয়াছেন । অত-
 এক তিনি সাংখ্যযোগী, তত্রিবিগণের মত
 ছিল । তিনি বিষ্ণুর অন্তর্যামী ঋষি
 থাকতে, তিনি মহাত্ম্যবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 বস্তু হইবে ।

মুক্ত পুরুষঃ। আধ্যাত্মিক ধোয়ের বোধঃ।
 নিঃপ্রাণানেবু আত্মহু, মুক্তপুরুষ ধ্যানম্। মূল
 বন্ধনত পদাঙ্গত মহাপার, স্তুতিঃ। হুঙ্গবন্ধন-
 রূপারা অস্তিতারা নিরোধোপারেবু তপঃসু
 চ প্রাণারামঃ। (৬)

ঐক্যো গায়নেবু স্তুতিঃ। স্তুত্যা লক্ষণাহু
 ঐহে ভাবঃ-স্বরাসি অস্তিত্যসহক তিষ্ঠানীতি।
 ধার্যাবিবর স্তুতিসায়নেবু শিখিলপ্রবত শরী-
 রত প্রাণক্রিয়া-বোধস্তুতিঃ। কার্যাবিবর
 স্তুতি সাধনেবু বাগরোধত বোধস্তুতিঃ।
 জ্ঞেয় বিবর স্তুতিসায়নেবু নাদবোধস্তুতিঃ
 হৃদ্যোজ্যোতি বোধস্তুতিশ্চ। (৭)

আধ্যাত্মিকার মধ্যে মহাপারতের মোক্ষ-
 ধর্মপর্বীর এং নৌক আধ্যাত্মিক প্রেষ্ঠ;
 কারণ উহাতে কেবল বিগুত মোক্ষধর্মনীতি
 ব্যাখ্যাত হইরাছে। সাধনের আলম্বনের
 মধ্যে আত্মতাব প্রেষ্ঠ। প্রণব ধনু, শর
 আত্মা, বন্ধ তাহার লক্ষ্য ইত্যাদি, ক্রটিতে
 এই আত্মতাব উপদিষ্ট হইরাছে। যোক্তের
 উপারের মধ্যে শ্রদ্ধা, বীর্ষা, স্তুতি, সমাধি
 ও প্রজ্ঞা। বাহ্যে পদার্থের মধ্যে মুক্ত-
 পুরুষ। আধ্যাত্মিক ধোয়ের মধ্যে বোধ।
 নিঃপ্র (বাহু ও আধ্যাত্মিক) ধ্যানের মধ্যে
 আত্মত মুক্ত পুরুষের ধ্যান প্রেষ্ঠ। বন্ধনের
 মধ্যে মূল বে প্রমাণ, তাহার নাশের লক্ষ
 স্তুতি প্রেষ্ঠ। হুঙ্গবন্ধন বে অস্তিতা, তাহার
 নিরোধের উপারের মধ্যে এবং তপ্ততার
 মধ্যে প্রাণারাম প্রেষ্ঠ। (৬)

ঐক্যোক্ত সাধনের মধ্যে স্তুতি সাধন
 প্রেষ্ঠ। স্তুতির লক্ষণার মধ্যে এই লক্ষণা
 প্রেষ্ঠ—“আদি (করণ ব্যাপারের) ত্ৰীটা”
 এই ত্তির স্মরণ করা এবং তাহা বে স্মরণ
 করিতেছি, তাহাও স্মরণ করিতে থাকিব ও
 থাকিতেছি, এতাদৃশ তাইই-স্তুতি। শিখিল-
 প্রবত শরীরের বে প্রাণক্রিয়া, তাহার

আত্মব্যবসায়িকস্তুতি সাধনেবু অস্তীতা-
 নাগত চিত্তা নিরোধজ্ঞান-স্তুতিঃ। সাহি
 সক্রম করন পূর্বকৃত্যাদি স্মরণ নিরোধ-
 স্তিক। স্তুতিসাধন হ্যাসেবু হৃদ্যোজ্যোতিবি
 পৃচ্ছাদৃতাগে বং। (৮)

সুখের স্তুতিসুখম্। বাহুসুখের সন্তো-
 বলঃ বং। সুখসাধনেবু বৈরাগ্যম্। বৈরাগ্য-
 সাধনেবু নিরুদ্ধতাধনিতো। বো। ভাব-
 বিশেষঃ চিত্তেপ্ররত, তৎস্তুতিপ্রবাহ
 তাধনম্। (৯)

বেগের স্তুত—শরীরাবিবরক স্তুতর সাধ-
 নের মধ্যে প্রাধান। জ্ঞেয় বিবরক স্তুতি
 সাধনের মধ্যে অনাহত নাদের বোধস্তুতি *
 এবং জ্ঞদরহু জ্যোতির বোধস্তুতি
 প্রাধান। (৭)

* ইহাকে নাদাত্মসন্ধান বলে। যোগ-
 তারাবলীতে আছে—লোকে যে শব্দর
 লক্ষণের উপার আছে, তদ্বধ্যে নাদাত্ম-
 সন্ধান প্রেষ্ঠ।

অভীত ও অসাগত চিত্তার বে নিরোধ,
 তাহার বে বোধ, তাহাবরক স্তুতি—আত্মব্যব-
 সায়িক স্তুতি সাধনের মধ্যে প্রেষ্ঠ। তাহা-
 সক্রম ও পূর্বকৃত্যাদি স্মরণের নিরোধক
 রূপ। নিরোধ জ্যোতির পৃচ্ছাদৃগদেশক
 স্তুতিসাধনহ্যাসের মধ্যে প্রেষ্ঠ। (৮)

সুখের মধ্যে স্তুতি সুখ প্রেষ্ঠ। বাহু-
 বিবরক সুখের মধ্যে সন্তোভব সুখ। সুখের
 সাধনের মধ্যে বৈরাগ্য। নিরুদ্ধতা
 থাকিলে চিত্ত ও ইঞ্জিরের বে তাবিশেষক
 অহুত হয়, স্তুতির দ্বারা তাহূণ তাবপ্রবাহ
 উপহিত রাখা বৈরাগ্য সাধনের মধ্যে
 প্রাধান। (৯)

বৈরাগ্য সহায়ত্ব সন্তোষে হেরতৎ-
জানুক । সন্তোষসাপেক্ষে ইষ্টপাপ্তৌ বস্ত্ৰে
নিশ্চিত্ত ভাবস্তত্ব স্ত্য ভাবনম্ ॥ (১০)

নামেযু বাগদমঃ । বাক্যেযু তৎসংবিধকং
যৎ । কনিবদমনোপায়েষু স্তোত্রোচ্চরঃসন্
কাব্যবিধরাস্বরগন্ । লোকতদমনোপায়েষু
তুষ্টিঃসন্ অপিভাসকোচঃ । শারীরৈবৈধোযু
চক্ষুঃকৈবর্ধ্যক্ । (১১)

ধারণা চিত্তবন্ধনার আধ্যাত্মিক বেশ:
খাস-প্রবাসৌ চ । আধ্যাত্মিক বেশেযু
আজ্ঞদর্যং আত্মপ্রকৃঃ জ্যোতির্পরঃ বোধ-
ব্যাপ্তো বঃ । খাস-প্রবাসৌ বর্জীর্ষং স্তম্ভং
প্রবৃত্তবিশেষপূর্নকং রেচনং সহজতঃ পুরণক ।
প্রাণারাম প্রবৃত্তয়ু সর্নকরণানাং স্থির শূভ-
বভাবস্ত আরকাপি রেচনপুরণবিধারণামি ॥
(১২)

বৈরাগ্যের সহায়ের মধ্যে সন্তোষ এবং
হেরতৎস্বের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ । ইষ্টপাপ্তি হইলে
যে তুষ্টি নিশ্চিত্তভাবে অহুত হয়, তাহার
স্বস্তি-প্রবাহ ভাবনা করা সন্তোষ-সাধনের
মধ্যে প্রধান । (১০)

নামের মধ্যে বাগদম । বাক্যের মধ্যে
তৎসংবিধক বাক্য । ইঞ্জিরগণকে বিধর-
ভোগে নিরস্ত রাখিরা কাব্যবিধকে স্মরণ
না করা কনিবদমনোপায়েষু-মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
লোক-নয়নোপায়েষু মধ্যে তুষ্টি হইরা অভাব
সঙ্কোচ করা । শারীরৈবৈধোযু মধ্যে
চক্ষুঃকৈবর্ধ্যক্ । (১১)

ধারণার দ্বারা চিত্তবন্ধন করিবার জন্য
আধ্যাত্মিক বেশ এবং খাস-প্রবাস শ্রেষ্ঠ ।
আধ্যাত্মিক বেশের মধ্যে স্তম্ভ হইতে

বীপ্রসাদার বৃত্তজানার্জনম্ । জানেযু-
কার্যকরং বৎ । জানার্জনোপায়েষু শ্রদ্ধা-
সহিতা জিজ্ঞাসা । জানার্জন প্রতিপক্ষ
প্রধানার মানসকৃত্যাক্তরিতা ত্যাপঃ ।
জানেযু বোধার্থ লক্ষণ—সাদকঃ । লক্ষণাহ
বা প্রস্তুট ধারণা ভাবিনী । জ্ঞানপ্রয়ো-
গেযু ত্রুষ্টিবিকারিষ-সাধনম্ । বিচারেযু
সহন্যাবিগিন পূর্নকঃ বিবেকব্যাক্তি-
পর্থাবলিতঃ বিচারঃ ॥ (১০)

ত্রুষ্টিপর্থাভ জ্যোতির্পর বোধ ব্যাপ্তদেশ
শ্রেষ্ঠ । দীর্ঘ, স্তম্ভ, প্রবৃত্তবিশেষ, রেচন
এবং সহজতঃ পুরণ, ইহাই খাস-প্রবাসের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । সমস্ত করণের স্থির, শূভবৎ,
ভাব বাহা স্মরণ করাইরা দেয় (অর্থাৎ
স্বস্তি আনয়ন করে), তাদৃশ রেচন, পুরণ
ও বিধারণ প্রাণারাম-প্রবৃত্তের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ।
(১২)

বীপ্তির প্রসন্নতার জন্য—বৃত্তজানার্জন
জ্ঞানের মধ্যে—কার্যকর জ্ঞান; জানা-
র্জনের উপায়ের মধ্যে—শ্রদ্ধা সহিতা
জিজ্ঞাসা শ্রেষ্ঠ । জানার্জনের প্রতিপক্ষ
নাশের জন্য—মতিমান, শুকতা (নিজেস-
ংকর বৃদ্ধ হেতু অবিনেরতা) ও আত্ম-
স্তরিতা ত্যাপ করা শ্রেষ্ঠ কর । জ্ঞানের
মধ্যে বাহা পদার্থের বোধ লক্ষণা পাণ্ডিত
করে, তাহা শ্রেষ্ঠ । লক্ষণার মধ্যে—বাহা
মনে প্রস্তুট-ধারণা উৎপাদন করে । জ্ঞান
প্রয়োগ বা বিচারের মধ্যে—বাহা ত্রুষ্টির
অবিকারিষ সিদ্ধ করে, তাহা । সহতৎ
সাক্ষাৎকারপূর্নক যে বিচারের বিবেক
ব্যাক্তিতে শেষ হয়, তাহা (সে বিচার সস্ত-
জাত) বিচারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । (১০)

সমাজ ও শাস্ত্র।

সাধারণতঃ সমাজই শাস্ত্রের অধিকার-ভূমি। শাস্ত্রের উদ্ভূত দণ্ড প্রায়শঃ সমাজের বক্ষেই আপন আগুন স্থাপন করিয়া ক্রান্তার্থ হয়। শাস্ত্র যেমন সমাজশাসক, সমাজও তেমনি শাস্ত্রের উপর পালি, দেশ ও সমাজ-স্বরূপ আধিপত্য বিস্তার করে। কেহ কাঠকে ও উপেক্ষা করে না, প্রভূত পর-স্পরের অপেক্ষায় থাকে। সমাজের অসংযত বলগা শাস্ত্রের কঠোর হস্তে স্তম্ভ হয়, আবার সময়ে শাস্ত্রের উচ্ছৃঙ্খল আধিপত্য, সমাজের সবল আকর্ষণে সংযত হয়; কলে শাস্ত্র, সময়ের ও সমাজের আয়ুগতো ব্যাখ্যাত হয়।

প্রকৃতির শাসন জগতের সর্বদেশেই সমাদৃত হয়, সুতরাং সময়ের অক্ষুণ্ণ-সঙ্কেতে সর্বদেশের শাস্ত্রই নবভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। একরূপ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ও নিদর্শন বর্ণেই আছে। যখন সমাজে নব তথ্য আবিষ্কৃত হয়, নবতাবের অঙ্গপ্রাণনা উপহিত হয়, তখন পুরাতন মতের নূতন ব্যাখ্যা না করিলে আর প্রাচীনের প্রসার প্রবল থাকে না; কাজেই বসন্তশেবে নব-পল্লব-পরিচ্ছদে সজ্জিত পুরাতন তরুই পণিকের নয়নরঞ্জন করে। ধর্মজগতে নূতন তথ্য প্রচারিত হইলেই পাশ্চাত্যগণ বাইবেলের এক কোণে ঐ সত্যের অবহিত প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাহাই বাইবেল—“থোল্ ও নলিচা উত্তরের

পরিবর্তন সবেও সেই হাঁকাটা” হইয়া বিরাজ করিতেছে।

ষাটশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজে, (দাক্ষিণাত্যের সমাজে,) সমাজের পক্ষ-পাতে শাস্ত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। বর্তমান সময়ে শাস্ত্রসেবকের নবব্যখ্যা প্রচারের শুভ সময় সমাগত হইয়াছে। আবার বর্তমান প্রবন্ধে দক্ষিণপথের সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক আচার “মাতুলকর্তাপরিণয়ের” অমূল্যে সুপ্রথিতনামা দার্শনিক, ব্যবস্থাপক, ও রাজনীতিক পুরুষ মহাশয় মাধবাচার্য্যের অপূর্ণ শাস্ত্রব্যাখ্যা-কৌশলের আভাস প্রদান করিব।

দাক্ষিণাত্যের বেঙ্গল ব্রাহ্মণ মাতুল-হুহিতাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া পুত্রাধার বিষয় মনে করেন।* অপর দিকে আৰ্য্য-শাস্ত্র জলদগম্বীর দোষে বলিতেছেন— “মাতুলস্ত স্ত্রীমাতুলা মাতৃগোত্রাৎ তপৈবচ। সমান প্রবরাকৈব ত্যক্তা চাত্মারণকরং।” অর্থাৎ মাতুলকর্তাকে ও সমানপ্রবরাকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাতি পাপগ্রস্ত হইবেন, সেই পাপ অপনোদনের জন্ত পত্নীপরিভ্যাগ করিয়া চাত্মারণ ত্রুতের অমুষ্ঠান করা কর্তব্য। অস্ততম শাস্ত্র প্রণেতা বশিষ্ঠ বলিয়াছেন।—

“পরিতীত সগোত্রাস্ত সমানপ্রবরাস্তথা।
তস্তাং কৃথা সসুংসর্গং বিলশ্চাত্মারণং চরং।
মাতুলস্ত স্ত্রীমাতুলা মাতৃগোত্রাৎ তপৈবচ।”

* * * * *লেখকের নিকট একজন সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছিল পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—“আমি মাতুলকর্তা বিবাহ করিয়াছি; একরূপ বিবাহ গৌরবকর মনে করি।”

অর্থাৎ সপেণ্ডা, সমান প্রথরা, মাতুলসুতা ও মাতুলগোত্রকে বিবাহ করিয়া, সেই নারীতে রেভৎসেক করিলে, বিজয় চাপ্রায়ণ করিতে বাধ্য হইবেন।

কুকার্যে তিরস্কার ও সংকর্ষে পুরস্কার-প্রাপ্তি অগতের সনাতন নিয়ম। মাতুল-কর্ত্ত-পরিারণ শাস্ত্র-দৃষ্টিতে কুকার্য, সুতরাং শাস্ত্রাক্রম মর্মে তাহাতে প্রারম্ভিতের বিধান করিতে কুচিত হন নাই।

মাধবাচার্য যখন 'ভারমাসাবিস্তর' গ্রন্থ রচনা করেন, তখনও তিনি দাক্ষিণাত্যের এই আচারকে 'অগ্রমণ' বা 'অঙ্গত বলিতে কুচিত হন নাই, কিন্তু যখন সামাজিক শক্তির প্রবল আকর্ষণে শাস্ত্র-বীর অধিকার হারাতে প্রস্তুত হইল, তখন সমাজরক্ষক মূল্যবোধ বা সমাজপতির ইচ্ছিতে সমরজ্ঞ স্তম্ভীর মাধবাচার্য শাস্ত্রের নবন্যায্য প্রচার করিয়া, সমাজ ও শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। পরশরামসংহিতার মাধবপ্রণীত ভাষ্যে (এই গ্রন্থ 'পরশরামাধব' নামে পরিচিত, উহা ভারমাসা রচনার পরে ও 'কলিমাধব' প্রণয়নের পূর্বে লিখিত হয়।) মাতুল-হৃত্ত-পরিণয় শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়া সর্ব প্রথম ঘোষিত হয়।

মাধবাচার্য বলেন, বিহারে মাতা-ভ্রাতা বা দৈববিধি-বিধানে বিবাহিতা-অর্থাৎ যিনি ভ্রাতাদি-বিধানে বিবাহিতার পুত্র, তিনি এই মাতার-ভ্রাতৃকর্ত্তাকে বিবাহ করিতে পাবেন। আর যে ব্যক্তির জননীর পরিণয়-কার্যে ভ্রাতাদি-বিধানে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, অর্থাৎ যিনি, ভ্রাতাদি-বিধানে বিবাহিতা-রমণীর গর্ভভাত, তিনি মাতুল-হৃত্ত-পরিণয় করিলে প্রারম্ভিত হইবেন।

উক্ত বন্দীধীর উক্তিলস্বহের তাৎপর্য এই যে, ভ্রাতাদি-বিধানে বিবাহকার্যে নিষ্পন্ন হইলে, 'সম্পদপীড়ননের' পরই রমণী পিতৃগোত্র-ভাগ করিয়া পতিগোত্র লাভ করেন। ভ্রাতাদি-বিধানে বিবাহে শাস্ত্রীয় দান-কার্যে যথাবিধি নিষ্পন্ন না হওয়ার, রমণী আমরণ—এমন কি, মরণের সম্বৎসর কাল পরেও (সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত) পিতৃগোত্র-ভাগিনী থাকেন। অঙ্গিগোত্রভাগিনী না হওয়ার, অপিচ পিতৃকুলের গোত্র-সম্বন্ধ-চ্ছেদ না ঘটিলে, ভ্রাতাদি-বিধানে বিবাহিতা নারী পিতৃকুলেরই "সগোত্রা" এবং "সপিণ্ডা" হইবেন। ভ্রাতাদি-বিধানে পরিণীতা নারী-স্বামিকুলে সগোত্রতা ও সপিণ্ডতা লাভ করেন, কিন্তু পিতৃকুলে "সপিণ্ডা" "সগোত্রা" থাকেন না। মাতার সপিণ্ড ও সগোত্র ভ্রাতার হৃদিতাই সন্তানের অবিবাহ। সেই বিবাহেই প্রারম্ভিত ভাগিনী আছে। যে মাতুল মাতার সগোত্র ও সপিণ্ড ভ্রাতা নহেন, তাঁহার কর্ত্তাকে বিবাহ করা ভাগিনেয়ের পক্ষে অপকর্ম নহে, সুতরাং প্রত্যবর্ত্ত হওয়ার-বুদ্ধিসঙ্গত নহে।

মাধবাচার্য এইরূপ ব্যাখ্যার মূলমন্ত্র মনুর ধর্মশাস্ত্রেই পাইয়াছেন। সতসংহিতা ১১ অধ্যায়ে ১৭২ ও ১৭৩ শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

"পৈতৃভ্যশ্চৈভাগিনীঃ স্ত্রীয়াং মাতৃভ্যঃ চ। মাতৃশ্চ ভ্রাতৃঃ স্যন্তু গম্য চাপ্রায়ণ-করং। এতাদৃশস্ত ভার্গ্যার্থে নোপগচ্ছত্ব-বুদ্ধিমান। ভ্রাতৃভ্যোহনুপেরাংস্বাঃ পততি-কুপয়মাঃ।" পৈতৃভ্যশ্চৈভাগিনীঃ মাতৃভ্যঃ-হৃদিতা ও মাতার-অপ ভ্রাতার-কর্ত্তা, এই

রসগীতের অস্তিত্ব নারীতে উপযুক্ত হইলে চাক্ষুর্য করা কর্তব্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহাদিগকে ভাগ্যাক্ষেপে গ্রহণ করিবেন না। জ্ঞাতিকেন্দ্রনকন এই রসগীতের অগম্য; এই সকল রসগীতে উপগমন করিলে বিলম্ব পতনের পথে সবেগে অগ্রসর হইতে থাকেন।

এই শ্লোকবধে করেকটি শব্দের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা প্রয়োজন। পিতৃবন্দ-হৃত্যের বিশেষণ "ভগিনী" শব্দ তাহাদের অস্তিত্ব। পিতৃবন্দা ব্রাহ্মবিধানে পরিণীতা হইলে, তাঁহার সহিত পিতৃকুলের সগোত্রতা-নিবৃত্তি হয়, সুতরাং তাঁহার কস্তা সুখ্যাথে "ভগিনী" নহেন, কিন্তু মাতুরাদি বিধিতে বিবাহিতা সগোত্র। পিতৃবন্দার কস্তা বর্ণাধ ভগিনী, তাহাকে বিবাহ করা বা তত্পগমন দোষার্থ। অপর একটি মাতার ভ্রাতার বিশেষণ "আপুত্র"। মাতার আপুত্র ভ্রাতা অর্থাৎ সগোত্র ও সপিও ভ্রাতার কস্তাকে বিবাহ করা অস্বচিত। ইহাতে বোধ হয়, মাতার যে ভ্রাতা "আপু" নহেন, অর্থাৎ অসগোত্র ও অসপিও, তাঁহার কস্তাকে বিবাহ করা দোষান্বিত নহে। "আপু" শব্দ না থাকিলে, একমুখ ব্যাখ্যার আবলয়ন দুইটি ছিল। দ্বিতীয় শ্লোকে 'জ্ঞাতিকেন্দ্র' পদ—ব্যাখ্যার অপর অঙ্গ। জ্ঞাতিকেন্দ্র অগম্যতা বা অবিবাহ্য নিদেপ করায়, বেধনে (১)

(১) সগোত্রবধ সর্বক ও প্রাকীর পিও-সর্বক লইয়া সপিওতা নিদেপ করা হয়। দক্ষিণাত্যে অববধ-সর্বক সপিওতার সর্ব-প্রবধ। সে সপিওতার জীবনে নিবৃত্তি

সগোত্রতা ও সপিওতার অগম্য বটরাছে, সেখানে উপগম ও বিবাহ দোষজনক নহে, মনে করা যায়। সগোত্রবধাদির কি বিনাশের পরও যদি জ্ঞাতিক থাকে, তবে সে জ্ঞাতিক হয় অমর, নচেৎ কথার কথা। কেবল বেমানবধর্ষণাজের করণ কটাকই একমাত্র সম্বল, তাহা নহে; আর্ধ্যসভ্যতার ও জ্ঞানের অন্ত রত্নভাণ্ডার বেদশাস্ত্রে ও মাতুল-কস্তা-পরিণয়ের স্তম্ভ নিদর্শন লোক-দৃষ্টিগোচর হইবে। এহলে একটা বৈদিক-মন্ত্র উদ্ধৃত ও আলোচিত হওয়া আবশ্যক মনে করি।

"আরাহীত! পণ্ডিতীরিত্তিঃ। বজ্রময়ং নো ভাগসেরং বৃদ্ধক। তৃপ্তাং জহ্ম তুলসেব যোবা, ভাগসে নৈত্বসেরী বণাম্।"

বাখ্যা। হে ইন্দ্র! ঐতিহ্যেতিঃ পণ্ডিতঃ অসাকং ইমং বজ্রং প্রুতি আরাহি আগত্য ভাগসেরং বৃদ্ধক স্বীকৃত। খবিলঃ বামুদিত্ত তৃপ্তাং তৃপ্তিকরীং বণাং জহঃ ত্যক্ত-বস্তঃ। বণা মাতুলস্ত যোবা-হুহিতা ভাগি-নেরস্ত ভাগঃ, কণা বা পৈতৃবশেরী পিতৃবন্দ-

হয় না, সুতরাং পিতৃবন্দা সপিওতা থাকেন। সগোত্রতা না হইয়া সপিওতা হইলে, তাদৃশ কস্তা বিবাহ করা দোষজনক নয়। বিবাহিতা (ব্রাহ্মাদি বিধানে) কস্তার পিতৃ-কুলে সপিওতা থাকে না। পারিভাষিক জিপুলক-সপিওতা আছে, স্বীকার করিলেও, সগোত্রতা না থাকায়, কস্তা বিবাহে বাধা হই না, কারণ সপিওতা ও সগোত্রতা এক-সঙ্গেই বিবাহে বাধা দেয়, পূর্ণক-সঙ্গেই ইহা সম্ভাব্যবিশেষের সত।

কস্তা পিতৃঃ পৌত্রস্ত ভাগঃ, তথাইং তে
বপায়াঃ ভাগঃ অস্ত ।

বনামুখ্যাদ ।—হে! ইন্দ্র ! স্ত্রী প্রসূত মার্গ-
সমূহ দ্বারা এই বস্তু আগমন কর, আসিরা
তোমার বস্তুভাগ গ্রহণ কর । বৃষকৃৎস
তোমার উদ্দেশে তুষ্ণিকরী বপা (প্রাদি-
বেহের অংশবিশেষ) : উৎসর্গ করিরাছেন ।
গেমন মাতুলকস্তা ভাগিনেয়ের ভাগ, অর্থাৎ
গ্রহণযোগ্য (তাৎপর্যাতঃ পরিণয়নারী)
কিবা বৈরুপ পিতৃবস্তুহিতা প্রোক্ষা (বিবাহ),
নেইরূপ এই বপা তোমার ভাগ, অর্থাৎ
গ্রহণের উপযুক্ত । প্রদর্শিত বেদমন্ত্র অর্থ-
বাদ হইলেও অপ্রসিদ্ধ পদার্থের দ্বারা স্তম্ভি
করা যায় না, স্ত্রীরূপে প্রোক্ষাকে বিধি কল্পনা
করিতে হইবে ।

অপর একটি বেদবাক্য উদ্ধৃত করিবার
লোভ সক্ষম কস্তা জ্ঞানার্থা বিধায় উত্তম
পদ্ধিত্যক্ত হইল না । ; মন্ত্র বপা,—“তন্মাতঃ
সমানাং পুরুষাং অস্তাত্যস্ত জারতে তৃতীরে
সদচ্ছাবিটে উত চতুর্থৈ সদচ্ছাবিটে ”
ব্যাখ্যা ।—সমানাং পুরুষাং অস্তাত্যাত্যাত্য
আতঃ তোমাস্ত জারতে, তে পরম্পরঃ
সম্মতঃ তৃতীরে পুরুষে (কুটুম্বাং) সদ-
চ্ছাবিটে বিবহাবিটে উত চতুর্থৈ পুরুষে
সদচ্ছাবিটে বিবহাবিটে ।

বনামুখ্যাদ ।—তোমার ও তোমার দুইজনই
এক ব্যক্তি হইতে লক্ষ গ্রহণ করে । সেই
তোমার ও তোমার পরম্পর সম্মত করে,—
সুপ পুরুষ হইতে তৃতীর বা চতুর্থ পুরুষে
অসমস্তা বিবাহিত হইব ।

বিষ্ণুজী প্রশংসারূপে বৃকিতে হইলে, দুটী
গ্রহণ করা যোগ্য । সপ্তে করা বাউক্,

রাস একজন গৃহস্থ, তাহার একটা পুত্র ও
একটা কস্তা জন্মিয়াছিল । ঐ কস্তা প্রাক্ষ-
বিনানে বিবাহিতা হয়,—তাহার একটা পুত্র
সন্তান জন্মে, রাসের পুত্রের একটা কস্তা
জন্মে । এই পুত্র ও কস্তার বিবাহ হইতে
পারে । রাস কুটুম্ব নাম পুরুষ, তাহার
পুত্র-কস্তা দ্বিতীয় পুরুষ, তাহার কস্তা-পুত্র
তৃতীয় পুরুষ । ইহাদের সপ্ত কস্তাটি
তোমার, পুত্রটি তোমার । এক রাস হইতেই
তৃতীয় এই পুত্র কস্তায়ুগল (স্বামী ও স্ত্রী)
উৎপন্ন হইয়াছে এবং উহার রাস-অপেক্ষ
তৃতীয় পুরুষই বিবাহিত হইয়াছে ।

এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত নহে ।
এরূপ সমসং সংসারের সমসামুদায় মঙ্গল-
বিধানের জন্য শাস্ত্রের কৃষ্ণতে রক্ষিত
আছে । “শাস্ত্র নূতন হয় না” বলিতেও
অসম্মত নহি, কিন্তু “ব্যাখ্যা নূতন হয় না”
বলিতে একবারের অসম্মত । সাধকচরিত

নৌদারনমুনি স্বর্গীয় ধর্মশাস্ত্রে দক্ষিণ
দেশের পঞ্চবিদ বিষ্ণু আচার ও উত্তর-
দেশের পঞ্চবিদ বিষ্ণু আচার—সেই সেই
দেশেই সর্গাচার, এইরূপ নির্দেশ, বলিয়া
ছেন । দক্ষিণাভার আচার দক্ষিণাত্য-
দেশীয় ব্যক্তি উত্তরদেশে অস্থতান করিলেও
মোক্ষজনক হইবে, উহার বলিয়াছেন ।
দক্ষিণাত্যের আচারগুলির নামোন্মেষ
করিতে গিয়া নৌদারনমুনি মাতুলস্বতঃ
বিবাহ, অস্থপনীত ব্যক্তি ও ভাগ্যার সম্বন্ধ
একজন ভোগ্যন, পর্গানিত ভোগ্যন, মাতৃবস্তু-
চর্চিত্ত পরিণয়ন ও পিতৃবস্তুকস্তা-পরিণয়ের
কথা বলিয়াছেন । উত্তরদেশের উক্তরূপ
আচারপদ্ধক—তাহার সত্তে উর্ধ্ববিষ্ণু,
সম্মতান, আয়ুদীরকত, সম্মতান, “উত্তর-
ভোগ্যন” ব্যাখ্যাগ্রন্থ দ্বারা ব্যাখ্যাক
নিশ্চয়ন ।

ঐ নিবাহকে সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্বন্ধ বলিতে বাইরা, দৃঢ়তা সহকারে ঘোষণা করিয়াছেন;—“রাগ-প্রবৃত্তি” গ্রন্থে আচার প্রচলিত হয় নাই, কারণ বাইরা শাস্ত্রীয় বিধিনিবেশ অঙ্গত আছেন এবং বিধি প্রতিপালন ও নিবেশ বিপর্যয় কর্তব্য জ্ঞান করেন, ও অধুষ্ঠানের সর্বাঙ্গ সঙ্গুল হৃদয় হইতেও বাইরাদের কদাপি পদস্থগন হয় নাই, উচিত্য ও এই-রূপ আচারকে সম্মানে পালন করিয়া থাকেন; সুতরাং রাগিজনের মোক্ষমূলক শাস্ত্রবিরুদ্ধ অপব্যবহার বা যথেষ্টাচার উচিত্য জ্ঞানদাতা নহে। শিষ্টাচার ও শাস্ত্রের সম্মতি জ্ঞাপন করে।

মাধবের এই উক্তির বৃক্তিবৃক্ততা নিম্নে আমরা আলোচনা করিব না, কেবল পাঠকস্বর্গের অঙ্গতির অস্ত্র এতটী পূর্ণকথিত করার উল্লেখ করিব মাত্র। আমরা বলিয়াছি, “জ্ঞানমালা-বিস্তার” গ্রন্থ রচনাকালে মাধব এই আচারকে অপ্রমাণ বলিতে কুষ্ঠা বা লজ্জা বোধ করেন নাই। তখন রাগপ্রবৃত্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার সহিত এট দক্ষিণাত্যা-স্ত্রের হিন্দুসমাজ পার্থক্য উহার হৃদয়স্থির মোচের আসে নাই। আনন্দকতা উপাধি স্থষ্টি করে, ইহা অঙ্গতের সার্বভৌম সত্য।

পরিশেষে আমরা ইহা বলিতে একান্তই বাধ্য যে—মাধবাচার্য্য্য ওরূপ ব্যাধি প্রচার করিতে ভারতঃ ও স্বর্ষতঃ বাধ্য, নচেৎ উহার ব্যাধার সমাধর বা প্রতিষ্ঠার প্রচাশা কোথায়? শাস্ত্রকে অস্বীকারের না বলিয়া সে জ্ঞানিত তত্ত্ব লাভ করে নাই, উহাদের নিবট ব্যাধাবর্ত্তা, ওরূপ না

শিথিলে অপ্রাজ্ঞ ও আশী করিতে পারেন না, ইহা চন্দ্র-স্বর্ঘ্যের জ্ঞান সত্য।

অপর পক্ষে, মাধবাচার্য্য্য্য ইচ্ছিতে সম্ভার নগ্নস্থির দিকে পাঠককে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্বেই ব্যাধা গ্রন্থে করিয়াই বিপক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—“নাটুলহৃদিত্ত-নিবাহের জ্ঞান শিষ্টস্বস্থহৃদিত্তিবাহে ও শাস্ত্রগিচ্ছ, তলে শিষ্টেরা সে সম্বন্ধে উদাসীন কেন?” উত্তরে মাধব গভীরস্বরে বলিয়াছেন, “শাস্ত্রগিচ্ছ হইলেও উহা লৌকগিচ্ছ নহে।” বাহা সমাজের বিবেকের বিষয়, তাহা শাস্ত্রসম্বন্ধ হইলেও অকর্তব্য। শাস্ত্রগিচ্ছ ও সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যবহারের নাম করিলে বাইরা তিনি পুরণের বিষয় বিভাগ, সৌখ্যমস্ত্রিবাধে সুরাগ্রহ গ্রন্থ, গোসত্রৈ গোবধাদি—সহ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মাধব কি স্পষ্টতঃই বলেন নাই যে—সমাজ বাহা চাহে না, তাহা শাস্ত্র দিলেও, সে গ্রন্থ করিতে পরাজ্ঞাধু? ইহাতে কি সম্বন্ধে সত্য হয় না যে, সমাজ বাহা চায়, তাহা শাস্ত্র না দিলে, সমাজ শাস্ত্র অতিক্রম করে? আমরা মনে করি, যখন সমাজের তত্ত্ব আকাজ্জা পুরণে শাস্ত্রের পুরাতন ব্যাধা অসমর্থ হয়, তখনই স্ত্রন ব্যাধা প্রচায়ের প্রয়োজন হয়। আজ ব'দ মাধবাচার্য্য্য্য জীবিত থাকিতেন, কোম হয়, তিনি পরামর্শ-হিতা-ভাষ্যের ২।১ স্থানে পূর্বেই সমাজ পরিভাগ করিয়া, নব-দিক্কাতে লিপিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইতেন; কারণ শাস্ত্র সমাজস্বার্থের সমাজের অঙ্গগমন করিতে প্রস্তুত হয়। শস্য।

শ্রী:—

রশোহর

ভাতীর বিভাগদা ১২

বিজ্ঞান অরণ্যে, পথে, নগরে, প্রান্তরে,
 ভ্রমিছে অযনী-মাজে প্রতি ঘরে ঘরে,
 কোথাও না পাইলাম শান্তি-পরশন,
 যদি পাই তব ঠাঁই—তাই অবেশন।
 জমিরা বুকেছি বলু সংসারের ভাব,
 অশান্তি-প্রভাব শুধু, শান্তির অভাব।
 অভাব-নষ্টন-ভব-ভাবিনানিচর,
 কামনার শান্তি-লোপ ঘটায় নিশ্চর।
 জীবকূণ সনাকূণ বিপুল ধরাতে,
 দেখি মাত্র অভাবের অভাব তোমাতে !
 থাকেনা অভাব তার, অস্তিত্ব সমর,
 অন্তর আশ্রয় তব বেজন লভয় ;
 অতএব, হে আশান ! সত্য সনাতন !
 তুমিই অশান্তি-রাজ্যে শান্তি-নিকেতন।
 ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, ত্রিকালের
 সাক্ষী তুমি, পূণ্যভূমি এই জগতের।
 অবিবেকী নীচাশর মুগ্ধ জীবগণ—
 তোমার বিকট-মূর্ত্তি করে দরশন।
 দেখে তারা—ভরস্করা পিশাচীর পাল—
 লোহিত-লোলুপা লোল রগনা বিশাল।
 ভীমবেশ, কুম্বকেশ, অটু অটু হাসি,
 উল্লসিত উদ্ভাসিত অঙ্গে পাশুরাশি,
 ভাঙ্কিনী, যোগিনী, ভূত, প্রেত গোরিত্তে,
 বনন স্বাদিনে যেন শর গরাসিতে !
 পরম হরসে পাশে পেয়ে শব্দেহ,
 অধীরে কুধির-মাংস গরাসিছে কেহ ;
 শিবারণ কোম্বহল করিছে বিস্তর ;
 নাড়ী-ভূঁড়ি কাঁড়াকাড়ি করে পরম্পর।
 অবিরল ক্রন্দন লাগিত্তেছে মুখে,
 সুখ্যা তাবি মত তোক্তনের সুখে।
 কখনো অসিছে অরি—নিভিছে অধীর,
 ভীত ভিত চমকিত, ঘোর অন্ধকার !

কছু কোম্বাহলে কাক-পকুনি গৃধিনী,
 শব্দেহ ল'রে কেহ করে টানটানি।
 কোথাবা গলিত মুগ্ধ, কর বা চরণ,
 বিদম নীতৎস মৃগ—বিকট ভীষণ !
 অমার সংসার-মোহে মুগ্ধ বার বন,
 জীবনের নখরত্ব না জানে যে জন,
 অবিবেকী গেই, গর অস্তরে বিকার,
 নিম্নিত, স্থগিত ভূমি নিকটে তাহার।
 কে আশান ! ভব-জীবকূণ-পরিপাম !
 বিবেচীর কাছে তুমি শান্তি-সুখধাম !
 প্রাণান্ত মূৰ্ত্তি তব করি দরশন,
 নির্ভয় জারে লর তোমার শরণ।
 এ তামকলে মীর তুমি হে আশান !
 উহ-পর-লোকঘরে যোগ-সন্ধিহান।
 সংসার বৈরাগ্য-চিন্তা তব ধরশবে
 জনমে অজান-মগ্ন-অবিবেকী মনে।
 যথা মধু ঋতুরাজ চিববিরাজিত,
 সুখমেয়া শোভন সামগ্ৰী সমধিত ;
 মক্ষন কাননানন্দ—ইন্দ্র-মনোহর,
 মক্ষার কুহুম সার-সুখমা সুন্দর,
 সরলা, চপলা-ভাতি অনন্তযৌবনা
 অঙ্গুরী, কিরণী, চাকনিতম্বা, সুস্তনা,
 কল্পচক্র, সর্বকাম-কল-সম্পাদন,
 দেবেশ্র বাসব-বাহু। রত্নসিংহাগন,
 অমাত্য অমরবন্দু, সস্ত্রী বৃহস্পতি,
 পবিত্রসলিলা মঙ্গলিনী শ্রোতবতী ;
 অনিন্দ্য সুন্দর সুর-আনন্দাভিরাগ—
 বিশ্বকর্মা-বিনির্মিত বৈজয়স্বয়াম।—
 বাসনা-বিজরী জানে অশান্তির মূল ;
 আশান ! সবে সেবার তব সমকুল।
 বিশ্বমেমে মত মিত্য বিশেষ পর,
 কৈশলি তবন উচ্চ হিরাভি-শিবর,—

পরিষ্কার, লইয়া আশ্রয় তব স্থানে,
 সর্বাশ্রিত সর্বা মন্ত আশ্রানন্দস্থানে ।
 ত্রিভুবন সম্বন্ধে শাস্তিনিকেতন তুমি,
 ধর্মক্ষেত্র স্থপতি তব পুণ্যভূমি,
 দেব-কাল-পাত্ৰ-ভেদে তিন্ন তিন্ন নামে
 অতিহিত, হে স্থানাম । তুমি পরাধানে ;
 প্রাকৃত বিক্রমশালী অবিভীত ভূপ,
 হীনবল দীনজন, সুরূপ, কুরুপ,
 ঈশী হুঃশী, শ্রীঃপুরুষ, শিষ্ট-চষ্টগতি,
 তিন্দু-মুগল্য়ান্ পৌরু শৃষ্টান-ইহদী ;
 বিবিধ বিভিন্ন জাতি অতির সস্তার,
 সমভাবে তব পুত্ৰ অক্ৰে তান পায় ;
 অগতে সবার গতি তব লমজান,
 গয়ল, অমৃত, তন্ন, চন্দন সমান ।
 পক্ষপাতশূন্য তুমি—নিভা নিরীকায়,
 কে আছে তোমার সব সর্বা শুদ্ধাধার ?
 সাক্ষাৎবৈরাগ্য তুমি, সারা মুষ্টিমান !
 অস্তিত্বের শাস্তিহান তুমি হে স্থানাম !
 তব শাস্তি-শ্রান্তি-শান্তি তোমাতে স্থানাম !
 প্রেমামকে বন্ধি তোমা, সর্বাশ্রানন্দস্থাম !

ঐবিষ্ণব বিধাঙ্গ ।
 (সাতকীর।)

দান-ধর্ম ।

—:~:~:—

“দানমেকং কলৌবুগে।” কলিযুগে দানই
 একমাত্র সর্বপ্রধানপুণ্যকার্য। অস্ত্রাত
 কঠোর আর্হটানিক ধর্মক্রিয়া কলিতে
 হুঃসাধ্য, সুতরাং কপকিং ভাগবীকারকাত
 দানধর্মই কলিতে সুপুণ্য; অতএব শাস্ত্রা-

হুশাসনে কলির মানব (বিশেষতঃ গৃহী)
 যথাশক্তি ও যথাগম্ভব দানধর্মে বাধ্য। এই
 দানের মধ্যে আবার অন্নদানই সর্বশ্রেষ্ঠ ;
 কারণ কলিতে—“অন্নগতাঃ প্রাণাঃ”।—এই
 অন্নই শাস্ত্র বলেন—“কলৌ সর্বেষু দানেষু
 অন্নদানং মহত্তমম্।” কলিকালে সর্ববিধ
 দানের মধ্যে অন্নদানই শ্রেষ্ঠতম। এই
 অন্নই আমাদের দেশে মুষ্টিভিকার অবার
 প্রচলন। মুষ্টিভিকা দানে প্রায় কাহারই
 কিছুমাত্র অতুষ্টির সম্ভাবনা নাই, সুতরাং
 প্রার্থীঃমনেও দাতার আপত্তির ভাবনা নাই।
 কিন্তু ইদানীং ইহার কিছু বিপর্যায় ঘটি-
 রাচ্ছে। তাহার কারণও আছে। ইদানীং
 মুষ্টিভিকাতের দাতার অতুষ্টি-সম্ভাবনা এবং
 গ্রন্থীতার স্বদরেও আপত্তির ভাবনা ঘটি-
 তেছে। “একমুষ্টি” অবশ্য আপত্তিজনক
 না হইতে পারে, কিন্তু একের বহুত্বই
 অনেকের স্থটি। অনেক মুষ্টিতে পরিমাণে
 ‘সের’—‘মণ’ সবই হইয়া পড়ে। অধুনা
 যে রকম ভিখারীর আমদানী, এবং
 দুর্ভিক্ষ—দুর্শূল্যতার কলে ঐ আমদানীর
 দিন দিন বেরূপ অতিবৃদ্ধি, তাহাতে “মুষ্টি-
 ভিকা”র অশ্রদেয়ত্ব রক্ষাকরা অনেকেরই
 সাধ্যারত্ত হইতেছে না। ইহার দোষ-
 গুণ কি? অসাধ্যতা হলে বাধ্যতা-পরি-
 হার দোষ নহে; কিন্তু ‘সেই অসাধ্যতা
 অবশ্য সদত ও স্বাভাবিক হওয়া চাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।

১৪শ বর্ষ, ১৪শ পঞ্চ,
১১শ সংখ্যা ।

ফাল্গুন ।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা ।

দান-ধর্ম ।

(পূর্বাহ্নুত্তি ।)

—:~:~:~:—

ইহানীং দশটি পোষ্যপোষক মে গৃহী
অতি কষ্টে তাহার দৈনিক প্রায় পাঁচশের
চাউলের খরচ চালাইতেছে, মুষ্টিভিক্ষার
দৈনিক ভিখারীর পাণ বিদায় করিতে তাহার
যদি সমষ্টিতে আরও ছ'একশের চাউলের
খরচ বাড়িয়া যায়, তবে তাহার পক্ষে
তাহা নির্বাহ কাজেই হর্ষহ হয় । এই হর্ষহ-
তাতেই পূর্বোক্ত অসাধ্যতা স্রুত ও স্বাভা-
বিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে । সুতরাং মুষ্টি-
ভিক্ষার দানধর্ম কার্যটিরও সঙ্কোচ অনিবার্য
হইয়া উঠিয়াছে । এই দান-সঙ্কোচ বা
প্রার্থী-প্রত্যাখ্যান প্রভাবারজনক কিনা ?

লোকগণনার দ্বারা হইয়াছে, এ দেশে
১৮ লক্ষ ভিক্ষুক । এই ১৮ লক্ষের মধ্যে
৫৫,২১০ লক্ষ অন্ধ-আতুর, কালা, কাণা,
বোরা, অসহন, দুর্গম, রোগী ও বৃদ্ধ

প্রভৃতি বাস্তবিক স্বপ্নমে স্বপোষণে অসমর্থ,
অর্থাৎ খেতে খেতে অপারক । ফলতঃ
শাস্ত্রানুসারে এই ২।৩ লক্ষ ভিক্ষুকই দানের
যোগ্যপাত্র । অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ কন্মালস বা-
সায়ী ভিক্ষুক (professional begger)
সমাজের গলগ্রহ মাত্র । বহুমুষ্টি-সমবয়ে
খাদ্যশস্ত্র-সমষ্টি-দানে এ কুপোষ্যগণকে পুষিতে
সমাজ ধর্মতঃ দায়ী নহে । এই অতৃপ্ত
অন্নকষ্টের দিনে অবশ্যপোষ্য-পোষণই সাধা-
রণতঃ হঃসাধ্য ; সুতরাং এই কুপোষ্য-পোষণ
বে অসাধ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? এই
১৫ লক্ষ লোক যদি শুধু ভিক্ষার্থ-পর্যটনের
দৈনিক পরিপ্রস্তুকু "খেতে খাওয়ার" স্বা-
লব্ধনুসাধনে খাটাইত, তবু অন্ততঃ অতি নান-
কমে ও গড়ে প্রত্যেকের মাসে ৩টি টাকা ভাষ্য
প্রমার্জিত হইলেও, মাসে প্রায় অর্ধকোটি

টাকা। সুতরাং বৎসরে প্রায় ছয়কোটি টাকা দেশের আয় হইত। বার্ষিক ছয়কোটি বড় কম কথা নয়। ইংরাজসরকারের সমগ্র ভারতগভর্নমেন্টের রাজস্ব-আয়ের প্রায় এক-পঞ্চাংশ-অংশ-পরিমিত। বর্ষে বর্ষে কেবল আলাশা, ঔষ্য, কৰ্ম-বিমুখতা ও ধর্ম-বিমুখতার সেবার দেশের এতগুলি অর্থের অপচয় হইতেছে, বলিতে হইবে। অধিকন্তু উহাদের পোষণার্থে দেশের স্ত্রী-প্রমার্জিত অর্থ ততোধিক পরিমাণে অপব্যয়িত হইতেছে; কারণ ইহাণীঃ সাসিক ৩ টাকার একজননের শুধু পেটের ভাতও হওয়া কঠিন; আরও অন্যান্য অভাবশ্রমকীর নানা খরচ আছে। অতএব আলস্য-দোষে অপচয় ও অলসের পোষণে অপব্যয়, এ ক্ষেত্রে এই উভয়তঃই দেশের যে প্রভূত ধনক্ষতি, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ বর্তমান বিশ্ব-বিলোড়ী 'বন্দেী' আন্দোলনে—দেশের এই জীবন-সঙ্কট দিনে, এইরূপ জাভা, কৰ্ম-বৈমুখ্য ও দেশীর বা জাতীর বিপুল অর্থনাশরূপ অনর্থের প্রশ্রয় প্রদান কাৰ্য্যটি সাবিক পুণ্যের পরিবর্তে তামসিক পাপ-মোহেই পরিণত হইতেছে। আলস্যের প্রশ্রয়-দান সৰ্ব্বঅনর্থের নিদান। সুতরাং তদ্বারা পুৰ্ব্বোক্তরূপ তামস দান প্রকৃত দানধর্মই নহে।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র বলেন,—পরিশ্রমই ধন। ফলে পরিশ্রম তিন্ন জগতে ধনো-পার্জন সাধারণ নিয়ম নহে। 'পড়ে পাওয়ার' টাকেরে স্তোড়ী বা মোহরের বড়ী অর্থ-পার্জনের সাধারণ নিয়মার্জিত ধন নহে; উহা বর্জিত বিশেষত্ব—(exceptional

case); অতএব পরিশ্রমার্জনীর অবশ্র-কর্তব্য ও অবশ্রসম্ভাব্য—দেশের এই বিপুল ধনাগমের প্রতিকূল ও ধননাশের অধু-কূল কাৰ্য্য করিতে আমাদের অধি-কার কি? সুতরাং স্বাবলম্বনধর্মীস্বল্প পবিত্র কৰ্মযোগে বিমুখ ব্যবসায়ী তিক্ককে দেশের বহু ধননাশক—মহানিষ্টসাধক জানি-রাও, বরং আরও স্ত্রাব্য প্রমার্জিত ধন ব্যয় করিয়া তাহার জীবন ও তাহার কদাচরণকে পোষণ করা পাপ কি না, তাহা বোধহয় বিনা অজ্ঞানসেই বিচার্য। অতএব স্বাবলম্বন-শক্তিনাশ পরাবলম্বনকারীদের পোষণে অস্বদেশে যে তথাকথিত (so-called) দানধর্ম অহুষ্ঠিত হয়, তাহা "ধর্ম" শব্দের বাচ্যতা সাতের যোগ্য কিনা; অন্ধ-অভূত-অন্ধম প্রভৃতি সমাজের সঙ্গত ও স্বাভাবিক পরাবলম্বীদের সেবার পবিত্র দানে সহজ স্বাবলম্বনসমর্থপণকে অঙ্গী করা স্ত্রাব্য-সঙ্গত কিনা, ধর্মসম্বন্ধ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। ফলে, বাহার্য অবশ্র-পরপোষ্য—যথার্থ দীন, তাহাদের সেবাই সমাজের এক প্রধান ধর্ম ও অবশ্র কর্তব্য কৰ্ম, তাহাই যুক্তি ও শাস্ত্রার্থ-সঙ্গত যথার্থ দানধর্ম। শ্রমের অপব্যবহার-কারী, প্রশ্রয়: অনৈতিকচারী, (সুবিধা পাইলে) নানা হুজুরাধিকারী অশিক্ষিত, ইঞ্জিয়াসক, দেশীর প্রভূত অর্থ অপব্যয়ের হেতুভূত—দেশের স্পষ্ট অনিষ্টকারী কুপোষ্য-গণের পোষণে যথার্থ দান-ধর্মের ব্যতিচার রূপ কদাচার কদাচ কদাই নহে। মোট কথা, অন্ধদের স্ত্রাব্য প্রাপ্যে সঙ্গমকে অঙ্গীকরা, হুপাজে দেয় অধ্যের তাগ অপাড়ে

অর্পণ করা প্রকৃত ধানধর্মের অপলাপ।
উহা পুণ্য-পরিবর্ষে পাপ। অস্বদেশে এই
পাপ অধুনা বর্ধিত বেগে বর্তমান; সুতরাং
ইহার অবিলম্ব-প্রতীকার প্রার্থনীর।

এতদেশে ক্রিষ্টাব্দে সাধারণতঃ যে
'কাদালীবিদ্যার' হইয়া থাকে, তাহাতে
দেখা যায় যে, বড় জোর শতকরা ৫৭ টি
অন্ধ-আঁচুর প্রকৃতি উপার্জনাকর প্রকৃত
কাদালী উপস্থিত; তথাহীত প্রায় সবই
"জোরানবর্ধ" বৃষ্টি-সেপের ও সক্ষম সখের
কাদালী! কাদালীবিদ্যারে যে সমস্ত ককির-
বৈকব দল উপস্থিত হয় তাহাদের অধি-
কাংশেরই আকৃতি, প্রকৃতি ও আচরণ
দাতার স্বাভাবিক দরাবৃত্তির উত্তেজক
নহে। আমাদের রক্ষণশীল 'ভালমামুঘ'
সমাজের চিরাগত প্রথায় তাহার বড় 'মজ'
পাইয়া গিয়াছে। স্বল্পে দশজননের চাউলে
উদর ভরিয়া, সমাজের সহজলভ্য বহুধনহানি
করিয়া, আপনাদের আলত-পূজা বলার
রাখিতেছে। একটি বাদলা প্রবাদ-পত্র
আছে—

"বশ দুয়ারে বুরি,

ঝুলি-করোরা পুরি,

পরমা-কড়ী, কল-পাকড়,

মাকে মাকে কাপড়-চোপড়;

কীকের ঘরে পাই বখন,

"বড় বিভা" চালাই তখন।

বাই আর জমাই, বেচেও করি টাকা।

"ভিকারার সৈব সৈব চ" যে বলে সে বোকা।"

আমাদের দেশের পেশাদারী তিথ্য-
রীতির পক্ষে এ পত্রটি অনেক স্থলে অকরে
অকরে খাটো। এরূপ পেশাদারী তিথ্যার

'বাউল' আখ্যাতারীদের নিতট 'নহুনা' সবধে
একটা সংকৃত উত্তট শ্লোকও প্রচলিত আছে,
যথা—

"রঙা-যৌবন-ভজন-বীরঃ,

কীর্জন-পতনে মল্লশরীরঃ।

ইকনমাণী বলমিতবাহঃ,

পরধন-হরণে সাক্ষাত্রাহঃ॥"

পবিজ্ঞ "বৈকবী" আখ্যায় অতীব অপ-
ব্যবহারকারিণী রঙা (রোঁড়) গণের যৌবন
ভজন বীর, পংকীর্জনে পুনঃ পুনঃ ক্রিমি "দশা-
পড়া"র অভিনয়ে মনের ভার জুহুতগরীর;
কাঠের মালাধারী ও বাহতে ভাড়-বালা
পরিধানকারী ব্যক্তি গণের ধন গ্রাস করিতে
সাক্ষাৎ রাহতুল্য।

পূর্বোক্ত তিথ্যারীতুল্য প্রত্যক ও পরোক
(positive and negative) দুই প্রকারে
দেশের ক্ষতি করে। এতগুলি লোককে
বারমাস বসাইয়া খাওয়ান বিপুল ব্যয়সাধ্য।
দেশকে এই ব্যর্থ বিপুলার্থ ব্যয় বহুকাল
হইতে বহন করিতে হইতেছে। আবার
ইহাদের অধুপার্জনজনিত প্রকৃত ধনাগম-
হানি অধুনা দেশের এক হুনির্বার্য হুর্দৈব
স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে ইহাদেরও
অবিলম্বনশুভভাজনিত সহস্রধর্মের হানি।
সহস্রধর্মে সহস্রধর্মের অভাবে সুখ-কোথায়?
সুতরাং ইহার কেবল দেশে দুঃখের বোঝা
বাড়াইতেছে। শাস্ত্র বলেন,—

"কীর্ষী-দুর্গীষসমস্তঃ কোষণো নিত্যপকিতঃ।

পরতাপোপদীষী চ ধীভেতে হুঃখভাগিনঃ॥"

"স্বভাভা পরেঃ-কীর্ষাকারী, সর্বদা বিপদ-
বিদ' স্বভাব; অসন্তোষগণ-চিত, কোপন-
স্বভাব ও সর্বদা তরাতুর হুর্দৈব প্রকৃতির

লোক, আর বাহারা গরের ভাণ্ডা খার, অর্থাৎ বাবলখনহীন পরমুখাপেকী নীল, তাহারি হুংখতাগী। শাজ বলেন,—“সর্বং পরবশং হুংখং সর্বমাস্রবশং সুখম্।” একে ত গোটা জাতিটাই “সুচ সুতা-দিরাশলাই কাটিটি” পর্য্যন্তের জন্তও পরমুখাপেকী, তাতে আবার স্বভঃ পরমুখাপেকী জাতি-টার মধ্যে আবার আলস্ত ও অকর্ম্মসেবী পূর্ণ পরতাগ্যজীবী এতগুলি লোকের ভার জাতীর হুর্দ্বহ গণগ্রহ। তিখারী জাতির আবার এতগুলি সখের তিখারী পোষণ কি শোভাগার? যে জাতির এখন বাবলখন তির্র আর গতি নাই, উগার নাই, উদ্ধার নাই, সে জাতির মধ্যে প্রকাশ প্রচলিত প্রধার বাবলখনের এই ঘোর অবসামনা— পরমুখাপেকিতার এই প্রকট প্রশ্রয়, এবং সাধ করিয়া হুংখতাগিতার এই নিপুল-তারবর্কন বাহুরী কিনা, চিত্তাণীল দেশ-হিতৈবিসণ তাহা জাবিরা দেখুন। কপাটা কইরা আন্দোলন আন্দোলনা চলিতে থাকুক। যদি উচিত বোধ হয়, সভা-সমিতি করিয়া, দিখিয়া, বলিয়া, বুঝাইয়া, প্রেরোদনীর শাজ-প্রমাণাদিও প্রবর্শন করিয়া, প্রচারকের প্রকার দ্বারা—কলে সম্ভাবিত সর্ববিধ উপারামলকরে এরূপ তিকা দেওয়া ‘একদম’ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। উক্ত বিরাট তিখারী সমাজও বাধ্য হইয়া সহুয়ভাবে সজী-বিত হইয়া উঠুক; বাবলখ-কর্ম্মযোগ সেবার দেশের কাজে আহুক; দেশের সম্ভানধর্ম্ম-লাভে যত হওয়ার জন্ত প্রস্তুত হউক। দেশের দেশাচার-নিরাক এইরূপ একটা প্রবল সমস্তি প্রবর্ত্তি রাখা সম্ভব “কাজে লাগ্ন”

(utilized) হওয়ার যে অন্ততঃ বর্তমান-সময়ে অতীব আবশ্যক, আসাদের এ সিদ্ধান্তে যদি জুল থাকে, তাহাও প্রদর্শিত,—আলো-চিত্ত ও বিচারিত হউক। ফলকথা, বর্তমান-এটি একটি ভাবিনার বিকল্প। শাজ বৃত্তি-পরীকার বিসয়; পরন্তু অণুমাত্রও উপেক্ষার বিসয় নহে।

বিলাত প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রদেশের অনেক স্থলেই এইরূপ পেণাদারী ভিন্ন আইনের দ্বারা প্রতিধিক। ওরূপ তিখারী রাজদ্বারে লভাই। সে-সব দেশে-অন্ততঃপক্ষে একটু নষ্ট গন, একটু হাসি-তামাসা-কি একটু “হল্পবোলা” গিরি, ভাঁড়ামী বা একটু কোনরূপ জীভা-কৌতুকাদি দেখান প্রভৃতি কোন-না-কোন কিছু সময়-মণিপ্রায় ‘মুনাকা’ স্বরূপ না দিলে, এক পরগাও পাওয়ার প্রত্যাশা বা দেওয়ার প্রথা নাই। সক্ষমের প্রতি প্রতিদানই স্ক্রুতি ও নীতি-সঙ্গত, কিন্তু দান নহে। দান অক্ষমের জন্ত—অলসখের-স্বার্থ অন্ততঃের মোচনের জন্ত। অক, আতুর, রোগী, বৃদ্ধ প্রভৃতি স্বার্থ অসমর্থদের জন্ত প্রতীচা প্রদেশে অনাবাশ্রম প্রভৃতিরও অন্তর্ভুক্ত নাই। আবার সমর্থগণের স্বাধিকার জন্ত কার্য্য (work) সর্বিজ সুনিষ্ঠ। অক্ষমের এ জন্ত অবশ্য ‘আইন’ প্রার্থনীয় নহে। কেননা “more enactment—more slavery” রাজার বিধি বহু বাড়িলে, প্রচার-দাগবশুখলের পৈচৈও তত বাড়িলে। দেশের-লোক বুঝিয়া জুরিয়া চিন্তিত্যপারিলে, রাজার বেশি-আইন করিবারই বা আবশ্যকতা-বোধ হইবে কেন? আশাদের প্রদেশে অনাবাশ্রম-বাড়ুক,

অন্নরক্ষণী ব্যবস্থা হটক, স্থানীয় হুর্ভিক্ষ-
তাণ্ডার স্থাপিত হটক, আর ইতরসাধারণ
সমর্থ শ্রমজীবীগণের জন্য নানা ব্যবস্থাদির
'কারখানা' (workshop) প্রভৃতি বাড়ুক।

অপাত্রে অধিক দানাদি দূরে থাক,
পূর্বোক্ত মুষ্টিভিক্ষাও সমষ্টিতে দেশের পাত্ত
মনহানির হেতু হুত। মর্শ্ববৃদ্ধি-মূচ্তায়—
আলস্য-প্রশ্রব, অকর্ম-অর্চনা ও দেশের
অকারণ ছঃখভার-বিবর্ধন দেশ হইতে
দূরীভূত হটক।

অন্নদেশে ঐরূপ পেসাদারী 'ক্ষির-
বৈষ্ণব' ভিখারীর দল কেবল যে আলস্য-
দোষে বা শ্রম-বৈমুখ্যবশে ঐরূপ ভিক্ষা
করিয়া বেড়ায়, তাহা নহে; তাহাদের
অনেকের বিশ্বাস যে, ভিক্ষাই তাহাদের
মর্শ্বমুক্ত উপজীবিকা; 'খেটে খাওয়া'
তাহাদের মর্শ্বত: নিষিদ্ধ। খেটে খাওয়ার
কথা বলিলে, তাহারা অনেকে বিরক্ত হয়,
কেহনা চটিয়া ওঠে! বলে "খেটে খাওয়া
আমাদের অপমান; ওতে আমাদের আঁতি
যায়। আমাদের বাপ-দাদা কেউ খেটে
খায়-নাই। ভিক্ষা না করা আমাদের পক্ষে
পাপ।" ইত্যাদি। দেখুন দেখি, রোগ
কতদূর পাকিয়া গিয়াছে! আমাদের দেশের
প্রবাদ—

ওঁকাজে কুড়ে,

ভোজন দেড়ে,

বচনে মারে পুড়ে পুড়ে!

বস্ত্রতঃ ইহারাই এই প্রবাদের পরিষ্কার
প্রমাণ-পাত্র। অথবা "ভাল করতে পারিনা,
মন্দ করতে পারি, কি দিবি তা দে"—এই
প্রবাদবাক্যেরই ইহারি বিশিষ্ট বিবরণীভূত।

তাহারা দেশের কোনই ভাল করেনা, বরং
বিপুল মনহানিকরণ ও চঃখভার বর্ধন রূপে
বিশিষ্ট অনিষ্টই করে, অথচ ইহাদিগকে
কি দিবে, তা দেও! ইহাদের পোষণ-
তোষণের সম্পূর্ণ ভার নেও। নচেৎ নাকি
তোষার মনুষ্যত্বের মূগধন ধ্বংসই হানি!
কি নিড়ঘনা! কি গ্রহণ-করণ!

আমাদের কোন হরিতক্ত বন্ধু বলেন যে—
"যে 'জয় রামাকৃষ্ণ' বাক্য শুনাটীয়া ভিক্ষা
চাহিবে, সে মাদরে ভিক্ষাদান-সংকার
লাভের যোগ্য। আর্হী! সামান্ত মুষ্টিভিক্ষার
বিনিময়ে সৈ বে আমাকে ভিক্ষামুক্তি-দান
অমুদান দিল! আহা! এ যে আশা পূরণার
বিনিময়ে 'রামা-কৃষ্ণ' গাভ। কারণ নাম-
নামী অভিন্ন-ভাব।

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভঙ্গ নিষ্ঠা করি।

নামের সহিত র'ন আপনি শ্রীহরি ॥"

ইত্যাদি। আমাদের হরিতক্ত বন্ধুটির ঐরূপ
ভগবৎভক্তিভারগর্ভিত সিদ্ধান্তের আমরা
কোন প্রতিবাদ করিনা; কিন্তু হায়! সেই
'রামা-কৃষ্ণ'ইবা কল্পজন বলে? অনেকেই
"চাট্টি ভিক্ষে পাইগো মা-জননি!"—"অতিশ
বিদায় করগো!"—"দয়া হটক বাবু!"
ইত্যাদি বুগিই প্রায় বলে। গৃহস্থ-পক্ষে
শোক দেখিলে, অনেকে কিছু বলেও
না—খালি ভিক্ষাভাঙ লইয়া দাঁড়ায়।
যারা হরিনাম করে, হরিসংকীর্্তন করে বা
আজকালকার "স্বদেশী" গান করে, সে সব
ভিখারীকে দান অবশ্য আপত্তিজনক
হটুতে পারে না; কারণ উহা ঠিক 'দান'ই
নহে—প্রতিদান মাত্র। কিন্তু নিরর্থক
ঐরূপ দৈনিক বহু সমর্থ 'অতিশ বিদায়'

করিতে দেশ কতদূর সঙ্গতভাবে সমর্থ, সেই
দান-ধর্ম (৭)-রহস্যই অধুনা অবশ্য আলোচ্য।

উপসংহারে, আমরা এ বিষয়ের শাস্ত্রীয়তা
পক্ষে যত্নক্রমে নিবেদন করিয়া, বিদ্যার
গ্রহণ করিব। সংপাতে দানই শাস্ত্রের
বিধান; অপাতে দান বরং পাপ ও পাত্তি-
ভোগ নিধান। শাস্ত্র বলেন, অপাতে দানে
দাতা-গ্রীতা উভয়েই পতিত—সুতরাং
প্রারম্ভিক্তাই হন। ঋষিবাক্য রূপ শাস্ত্রের
প্রতিশ্রুতি—পরমার্থ-পথ প্রদর্শক মহাজন-
গণের পদাবলীতেও প্রকাশিত। ভগবদ্ভাস
ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

“দাতা রাজস, দানী লালস,
দোনো একুই ভাও।
দোনো মুঢ়া ডুব পড়া—
চতুঃ পাথর নাও॥”

যে স্থলে রাজসিক দানকারী দাতা এবং
‘সংলবন্য’ বিষয়াসক্ত গ্রীতা, সে স্থলে
ঐ দুয়েরই সমান দশা; যেমন পাপের
নৌকার চড়াইরা পার করিতে গেলে, দাবী
ও চড়ানার উভয়েই ডোবে, তদ্রূপ তামস
বা রাজস দানে দাতা-গ্রীতা উভয়েই
পতিত হয়। শাস্ত্রে দেশ-কাল-পাত্র-বিচা-
রিত সাধিক দানই অভিনবিত, রাজস-
তামস দান নিন্দিত। সর্গশাস্ত্রগার গীতার
স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন—

“দাতব্যমিতি বন্ধানং দীরতেহুপকারিণে।
দেশে কালেচ পাত্রেচ তদানং সাধিকং স্মৃতম্॥”
“যত প্রীতাপকারার্থং” বলমুদ্রিত বা পুনঃ।
দীরতে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং স্মৃতম্”
“অদেশ-ক লে বন্ধানংপাত্রেচ্যচ দীরতে।
অপংকৃতমবজ্ঞাতং ততামনমুদীতম্॥”

দান-ধর্ম কর্তব্য, এই দাতা বৃক্ষিণা; যে
ব্যক্তি দাতার কোন উপকারে আসিবে না,
সে ব্যক্তি যদি দানের অপাত্তি না হয়, আর
দানের স্থান ও সময়টাই যদি প্রতিকূল না হয়,
তবে যে নিঃস্বার্থ বা নিষ্কাম দান, তাহাই
সাধিক দান, তাহাই স্বার্থ দানধর্ম।
আর কোন উপকার পানয়ার আশার বা
কোন ‘কাজ হাসিল’ করার সংলবে—অপত
মনে কষ্টবোধ করিয়া যে দান করা হয়,
সে রাজস দান। আর দেশ-কাল-পাত্রের
প্রতিকূলতার, অর্থাৎ অসুপযুক্ত স্থানে,
সময়ে ও অপাতে—অবহেলা ও অবজ্ঞার
সহিত যে দান, তাহাকে তামস দান কহে।
ফলে অপাতে সকাম রাজস-তামস দানে পুণ্য-
পরিবর্তে ধরং পাপ-স্পর্শ; কেবল সুপাতে
নিষ্কাম সাধিক দানই দানধর্মের আদর্শ।
পুরাণ বলেন,—

“অশ্রদ্ধয়া হৃপাত্রেভ্য হৃতং দত্তংকৃতঞ্চ বং।
অসদিভ্যচ্যতে সর্কং ন চ তৎ প্রোত্য নো ইহ॥”

অশ্রদ্ধার—(“শুক্র-বেদান্তবাক্যেবু বিখ্যাসঃ
শ্রদ্ধা”) অর্থাৎ অবিখ্যাসের সহিত বজ্র-
পূজাদি করিলে এবং অবহেলার সহিত
অপাতে দান করিলে, সেই বজ্রাদি বা
দানাদি সর্ককার্যই অসৎ। তাহা ইহকাল,
পরকাল, কোন কালেরই কোন কাজে
আগে না, অর্থাৎ ফলদায়ক হয় না স্মৃতি
বলেন,—

“ন বার্যাপি প্রযজ্জেতু বৈভ্যালত্রিতিকে নয়ে।
ন বকত্রিতিকে বিগে ৬ ৬ দাতা পততি
তৎকণাং ॥”

বিভ্যালত্রিতী তওতগধী লোকের অভি-
সিক-সিদ্ধির অধিকুলে অগতুত ব্যয় করিতে

নাই। এমন কি, বক্রতী থল-ত্রাকরণকেও তৎৎ প্রত্যাখ্যান করিবে। বাস্তবিক মহাশক্তিগণকেও তৃষ্ণার জলদান উদার আর্থা-শাস্ত্রের বিধান; কিন্তু এ স্থলে “বার্গাপি” শব্দের দ্বারা একটু ‘অর্থবাদ’ করিয়া বিশেষটির বিশেষ গুরুত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে। আদান-প্রদানই জগতের ব্যাপার। অন্তর্বাহ্য-নির্কীর্ণশেষে উভয় জগতেই নিরন্তর আদান-প্রদানের বোগ-বিয়োগ-প্রবাহ বহিতেছে। সাধারণতঃ সাধারণ প্রায় সর্বদাই কোন না কোন আদান-প্রদানের অভিনয়ে অস্তিত্ব-নিহিত থাকে। এই জন্ত স্বতঃপতনশীল বা পদাঙ্গনশীল মানবের জন্ত এহেতু প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটু বেশি ‘কিনারী’ (margin) রাখিরা, নিবেশায়ক বেড়া দেওয়া আবশ্যিক; এবং এই জন্তই শাস্ত্রে অনেক স্থলে (স্বতঃসিদ্ধ সনাতন অধিগ-ধর্ম্মমূল বেদেও) ঐরূপ অর্থবাদ-বাক্যের আবশ্যিকতা হইয়াছে। ফলকথা, ‘ভক্ত-ভগবী’ থল জাতীয় মঙ্গলবাক্য লোক-জগতিকে তাহাদের বিশেষণ-স্বত্বের আহু-কূল্যার্থ কদাচ কিছুমাত্র (‘জলটুকুও’) দান করিবে না। উক্তব্য ব্যক্তি যদি সর্ববর্ণগুরু-ব্রাহ্মণ-বংশেও জন্মিরা থাকে, তবু সেও দানের সম্পূর্ণ অপাত্ত। ওরূপ অপাত্তে দানকারী দাতা তৎকালে পাতিত্যা প্রাপ্ত— অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তার্থ হন।

এখন মনে করুন, পূর্বকথিত বাউল-বৈষ্ণব-ককির-‘সামু’-‘ভাল’থেকে-বেদে, আবার প্রায় ব্যক্তিকারী, পরদারী, পরবহারী, হিসাবকারী, নিপাত্তারী,—অপচ হস্ত ধর্ম্মস্বাক্ষারী, নানা জাতীয় ‘পেশাদারী’

তিথারীকে ‘তিথারী বিদার’ মাত্র জানে যে আমরা দান করি, তাহা শুধু ‘মুষ্টিভিক্ষা’ হিসাবে পরিগণ্য, সমষ্টিতে যে নিপুল ধনের বিশিষ্ট অপব্যয়, তাহাতে আর গন্দেহ কি? এইরূপ মহানিষ্টকর অপব্যয়ের কর্তৃত্বাংশী-ভূত হওয়া কদাচ বাঞ্ছনীয় নহে। দেশের অনিষ্ট, জাতির অনিষ্ট, সমাজের অনিষ্ট—এবং উদ্বেত্ব নিব্বের ব্যক্তিগত পাপ ও পাতিত্বরূপ পরম অনিষ্ট—কেবল ধর্ম্ম-বিমুগ্ধতা, শাস্ত্রানভিজ্ঞতা ও উপেক্ষা-ঐদান্ত্রে যেন আমরা আর না ঘটাই। সামান্য দানেও যেন আমরা দেশ-কাল-পাত্র বিচার করিতে না তুলি। একবিন্দু গোমুত্র-মিশ্রণে যেমন প্রকাণ্ড এক জালা হৃৎক বিকৃত হয়, তক্রূপ অপাত্তে সামান্য মুষ্টিমের দানেও দাতার সমগ্র পুণ্য-জীবন ক্ষুর হয়। বিড়ালব্রতী—বক্রতী প্রভৃতি অপাত্তে “ন বার্গাপি প্রযচ্ছন্ত” বাক্যে যেখানে জলটুকু দেওয়া পর্যন্ত শাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সেখানে অস্বদেশে প্রায়শঃ ঐরূপ অপাত্তে ব্যবহারী তিথারী-গণকে অন্ন-বস্ত্র-অর্থ প্রভৃতি দানে ঐ সমস্ত অপাত্তবৃত্তির বিবর্ধনের আহুকূল্য করা, অসমর্থ-সেবার্থ অর্থ সমর্থকে দেওয়া এবং তদ্বারা দেশের প্রভূত ধনহানির অন্ততঃ আংশিক হেতুভূত হওয়াও কদাচ বুদ্ধিমান, ধর্ম্মার্থী ও দেশবিহীনবীর কর্তব্য নহে।

অপাত্তে দানে ও উক্ত অপাত্তগণের অহুপাত্তনে যে পরিমাণ ধনহানি ঘটে, সেই পরিমাণ ধনে দেশে অবশ্য-পর্যোক্ত-ক্রোধানার্থ কত অনাশ্রয়, দাতব্য ঐব্যালয়, বিদ্যালয়, সাধারণ পুস্তকালয়, ধর্ম্মশালা, ধর্ম্মশালা, জলাশয় ও প্রয়োজনীয় পথ-ঘাট

প্রভৃতি হটতে পারে; কঠ কপিড়ের কল, দিরাশলটির কারখান, অপর নিরিখ 'বদেদী' শিল্পশালা ও 'বদেদী' প্রচারপ্রস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা হটতে পারে। এতগুলি দেশহিতকর অমুষ্ঠানের উপযোগী বিপুল অর্থের অনাগম ও অর্পণের কেননা এই দেশের অপারে দান-প্রণয় ফলেই সংঘটিত হইতেছে; উহা আমাদের চিন্তাকরা ও প্রতিবিধানের ব্যয়তা করা একান্ত আবশ্যিক।

আমাদের হিন্দুর পক্ষে দানধর্ম সাধারণতঃ চতুর্বিভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ—অন্ধ-আহুর প্রভৃতি স্ত্র অশক্ত এবং যশাস্কি খাটরাও স্বীয় অবশ্য-পোশ্য পোষণে অসমর্থ দীন-গণকে দান। দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্ররক্ষক—ধর্ম-ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-শুরু-পুরোহিতকে দান। তৃতীয়তঃ ঈশ্বরোপাসনার্থ সংসারত্যাগী যথার্থ সাধু-সন্ন্যাসীকে দান এবং চতুর্থতঃ সাধারণ দেশহিতকর কার্যামুষ্ঠানে দান। পূর্বোক্ত কোনরূপ রাজস-তামসলক্ষণশূন্য এইরূপ দানই সাত্বিক দান এবং তাহাই যথার্থ দানধর্ম। এই চতুর্বিভাগের অতীত স্থলে দান কচিং ধর্ম্য হয়। অতএব পূর্বোক্ত অপাজ—ঐ পেশাদারী তিক্ক-মাজকে দান উক্ত চতুর্বিভাগ-বহিত্বৃত্ত বিধায়, উহা দানধর্ম নহে; পরন্তু উহা শাস্ত্র-বৃত্তি-সিদ্ধ প্রকৃত দানধর্মের ব্যতিচার রূপ পাণ্ডার মাজ।

অপমোক্ত দান সর্বপ্রতিসম্মত; কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র-ধর্মরক্ষক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃ-তিকে দান করিতে অবশ্য অস্ত্রধর্মী অর্ধতঃ বাধ্য নহে। কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র বৈরাগ্য সত্ত্বে গৃহস্থ, ধর্ম বৈরাগ্য বিপুল দিত্বত,

তাহাতে সংসার-চিন্তার নিশ্চিষ্ট ও জীবন-সংগ্রামে সংক্লিষ্ট জন দ্বারা তাহার যথার্থ সেবা অসম্ভব। এইজন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত প্রভৃতিকে নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব রাখিবার জন্য তাহাদের সংসার-পালন-ভার সমাজেরই গ্রহণ করা উচিত। একদিন সে উচিত সমাজে সুপালিত হইত। হিন্দুর সেই যথার্থ দানধর্ম আজ অবহেলিত, তাই হিন্দুসমাজের মস্তকস্বরূপ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের আজ এই বিকৃতি ও হর্গতি; এবং অনেকের প্রায় সাধারণ তিক্ক-বৃত্তিতে অবনতি! তারপর যথার্থ ধর্মার্থী, ভগবদ্ভজন্যার্থী, ঈশ্বরে সম্যকরূপে সমস্ত ভক্তকারী—'সন্ন্যাসী' সংস্কার কর্তৃক অধিকারিগণের পালনার্থে—অর্থাৎ সধু-সেবার্থে যে দান, তাহা দান-ধর্মের সর্বপ্রার্থ সাধকতা। চতুরাশ্রমের মধ্যে গৃহহাশ্রমই—ব্রহ্মচর্যা, বানপ্রস্থ ও তিক্ক এই অপর ত্রি-আশ্রমের প্রতিপাল-নার্থে ধর্মতঃ দারী। এই জন্য দানধর্মই গৃহহাশ্রমের নিত্য সম্প্রদায় সাধারণ ধর্ম। অতিথিরূপী সর্বস্বাশ্রমীকেই গৃহহাশ্রমী যথাসক্তি অন্নদান করিতে বাধ্য। অন্ততঃ আসন, উদক ও আদরবাক্য মাজে আতিথ্য প্রায় সবাইই সাধ্য।* শাস্ত্র-নির্দিষ্ট প্রকৃত-অতিথির পক্ষে, জাতি, আশ্রম ও দেশ-কাল-পাণ্ডি-বিচার নাই; কিন্তু

* "তৃণানিভূমিরূপকং বাক চতুর্থী চ স্নাত্তা। এতানপি সত্যং মেহে নো জিহ্বন্তে কদাচিত্য" সংলোকদের ঘরে আসন, হার ও জল এবং প্রায় সত্যকথা, এই চারিটি বস্তুর কখনও অভাৱ হয় না। (বেদধর্ম)

বর্ষখানে দেশ-কাল-পাজাহুগারে সেরূপ অতিথিও বিয়ল—আতিথাও অচল । পূর্বোক্ত 'পেশাদারী তিথারী'র দল আপ-নাধিগকে "অতিথ" বলিয়া, ইদানীং গৃহীকে দানধর্মের বাধ্য করার ইচ্ছিত করিলেও, গৃহী ধর্মতঃ তাহাতে বাধ্য নহে, এবং সেরূপ ব্যবসারী অতিথি-প্রত্যাখ্যানে গৃহীর কোনও প্রত্যাখ্যারেরই সম্ভাবনা নাই ; বরঞ্চ সেই সব অপাজাহুত্বানধিগগকে দান দ্বারা আতিথা-ধর্মের অনন্যবহারই প্রকৃত প্রত্যাখ্যারের কারণ ।

প্রাচীনতম বৈদিক স্মৃতি "গৃহস্থত্র"-প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রয়োজনীয় বচন-প্রমাণাদি প্রদর্শন-পূর্বক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার বেদেতিহাসিক সম্বন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বিড়ালতপস্বী বক্রতী তিথারী ব্রাহ্মণকেও তিকাদানাদি দ্বারা পোষণ করা দূরে থাকুক, তাহাকে গ্রাস হইতে নিরাসিত করিবে। পরে সে যদি অমৃতাপূর্বক নিজের ঐ কৃত্যবসার পরিচাণ করিয়া যথাবিহিত প্রারশ্চিত্তাদি করিলে, তবে তাহাকে পুনরায় সমাজে ও স্বদেশে গ্রহণ করা বাইতে পারে। যে সময়ে ভারত-ভাগ্য-গগনে গৌরবের মধ্যাহ্ন মর্ত্তিও-জ্যোতি, সেই সময়েরই এই রীতি। এখন সে রীতি অন্ত্যচলগত, ভারত মোহ-তিসিরাবৃত, সূত্ররং অন্ধকারে বে বা করে, কে তার কৈকিরং লর ?—কেনা তার প্রতীকার করিতে প্রস্তুত হয় ? একটা ভাল জিনিষ দীর্ঘকাল বাবত সংস্কারভাবে কলঙ্কিত বা অবিরুদ্ধন্যুক্ত হইয়া পড়ে। তদেবিরশি হইতে সব্বদে বিমুক্ত রাখিয়া হিতপদার্থের ব্যবহার বলার রাখা বাহনীর।

দানধর্ম ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত। বিবাহে দান, শ্রীকে দান, * সর্ক সংকার্যে দান ; ব্রত-পূজাদিতে তুরি দক্ষিণা, বক্ষাদিতে তুরি তুরি দক্ষিণা এবং সাধানগতঃ নিত্য নৈমিত্তিক বিবিধ-দান-দাক্ষিণ্য ভারত-সমাজে চির-প্রচলিত। প্রাচীন ভারতের "সন্তোষক্ষেত্র" ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এক অসাধারণ দান-ব্যাপার। কন্নীতবন বা 'কন্নতক' হওয়াও ভারত-প্রচলিত বাচক্কাভিপ্রেত দান নাম। এরূপ 'কন্নতক' হওয়া ও বপাসর্কর লুটাইরা দেওয়া বোধ হয় পৃথিবীর আর কুত্রাপি কদাপি হয় নাই। দানধর্মের দারীত্ব-বস্ত্রতার বা তন্মূলক ভাগবীকার-বাধ্যতার হরিশ্চন্দ্র ঋশান চণ্ডালের দান, শিবি রাজার স্বকারকর্তনে উল্লাস, দ্রাবণাণ্ডবের নিরাসিগন, বিপশ্চিতের 'রোরব' নরক দর্শন, জীমদেবের রাজ্যধন-দারগ্রহণ বিবর্জন, দশিচির অহিনাদার্ব আত্মজীবন বিবর্জন। পরার্থে ত্যাগ-সাজ্জাই দানধর্ম-তবেষ অন্তর্গত। ভারতের পুরাণেতিহাস তাহার বহু উজ্জল উদাহরণে অলঙ্কৃত। শাস্ত্রের শতবুধেদানধর্ম কীর্ষিত। "দীনেতো জবিণং দত্তাৎ" "সর্কস্ব শুরবে দদ্যাৎ" "দানংহি পরমং পুণ্যং—"ত্যাগোহি পরমংতপঃ"—"সর্কাণি পুণ্যানি বসন্তি দানে"—"তমষ্টং বনদীরতে"—"দাতা ধৃতঃ পুনঃ পুনঃ"—"দানং বিত্তাদুতং বাচয়সারিৎ সারমাহরেনং"—"সত্যং শৌচং বরা দানং

* পূর্বাঙ্গ শ্রীক্বের নামই "দানসাগর।" তথ্যজীক্ 'বাক্তণঃ' 'বুবাৎসর্গ' 'চক্ষসবেহু' 'বিলক্ষণা' প্রভৃতি সমস্তই কেবল দানেরই ব্যাপার।

ধর্মশাসনচর্চায়।” অধিক উদ্ধৃতি বাহ্যল। দাধর্ম-মহিমা বহু শাস্ত্রের পক্ষে পক্ষে ছেলে ছেলে বহু ভঙ্গ বিকীর্ণ। পারত্রিক স্বর্গ-সুখ ও ঐহিক আয়ুর্বুদ্ধি প্রভৃতিও প্রবৃত্তি-মার্গে দানধর্মের উদ্দীপক। “দাতা শতং জীবহু।” এই বেদবাক্যে সকাম দানধর্মের বিশেষ উদ্ভেদনা-বীজ নিহিত। লোকের হাজার হুঃখ-কষ্ট হউক, কিন্তু দীর্ঘজীবন সকলেরই আকাঙ্ক্ষিত। এই জন্তই বৃষি হুঃখী কাঠুরিয়া হুঃখের জ্বালার মূহুর্ত-প্রার্থনার বসকে ডাকিয়া, অবশেষে তাঁহাকে কাঠের বোঝাটা তুলিয়া দিতে অমরোধ করিয়া-ছিল। যে জীবন সুখী-হুঃখী-নির্কিশেষে সবারই প্রিয়, সবারই বাঞ্ছনীয়, সেই জীবন দানধর্মের দ্বারাই শতবর্ষস্থায়ী হয়, এই পুরা প্রচলিত বেদবাক্য-প্রভাবে হিন্দুর দাননীলতা সকাম মার্গেও সুনিহিত হইয়া-ছিল। পরে সাধক-পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ অধ্যা-জ্ঞানকে উহা নিকাম পরমধর্মে পরিণত হইয়াছিল। এহেন ঐহিক, পারত্রিক, ভৌতিক, আধ্যাত্মিক, সর্ববিধ শুভসাধক দান-ধর্ম বাহাতে শাস্ত্র-বৃত্তি-সম্মার্জিত, নিরুপক, নির্দোষ ও সুদেশ-কাল-পাত্র-বিহিত হয়, তদ্বিষয়ে সম্যক সচেষ্টি ও সতর্ক থাকি সর্বথা বাঞ্ছনীয়।

দান-সম্বন্ধে দেশ-কালের একটু ব্যত্যয় হইয়াও যদি পাত্র ঠিক হয়, তবু সে দান ‘মন্দের ভাল’ রূপে গণ্য হয়; কিন্তু অপাত্রে বা কুপাত্রে যে দান (দেশ-কালগত অক্ষয়তা, সফলতা) — সে দানই নহে, অত্যন্তের নিকাল। দান-বিষয়ে পাত্র-পোষ এ দেশে অনেক দিন হইতেই বিচার্য।

ইদানীং যেমন ‘ঐচ্ছন’ ধর্মধর্মজাধারী ব্যক্তিকারী পেশাদারী তিথারীর সংখ্যা অধিক, আবার অর্ধ সহস্রাক পূর্বে এদেশে তজ্জন আগমোক্ত তাত্ত্বিক শাস্ত্র সাধনধর্মী মন্ত্র মাংস-ভোজী ‘পঞ্চমকারে’ অচ্যুতস্ক ভণ্ড ভিক্ষকের সংখ্যাধিক্য ছিল। প্রাচীন উদ্ভট পণ্ড প্রভৃতিতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

“ভিক্ষো! মাংস-নিবেষণং প্রকুরবে ?

কিঞ্চিদ্র সন্তং বিনা।

মন্ত্রকার্পিতব প্রিয়ং ? প্রিয়মহো!

বারাঙ্গনাভিঃ সহ ॥

বেশ্যাপ্যর্কচিঃ, কুতস্তব ধনং ?

দ্যুতেন চৌর্ধ্যোণবা।

চৌর্ধ্যো দ্যুতে পরিগ্রহোহস্তি ভবতো ?

নষ্টস্ত কাষ্ঠ্যা গতিঃ ॥”

অর্থাৎ—

ও হে ভিক্ষু! তোমার কি মাংস-সেবা হয় ?

(হয় বটে,) কিন্তু তাহা মন্ত্র ছাড়া নয়।

মন্ত্রটিও তোমার কি প্রিয় তবে বটে ?

প্রিয়—আহা! যদি তাহা বেশ্যা-সঙ্গে ঘটে।

বেশ্যায় ত টাকা চায়, টাকা পোষা পাবে ?

জুমাখেলা—কিছা চুরী বিস্তার প্রভাবে।

জুমাখেলা—চুরীটাও চলে কি তোমার ?

তা যিনে নষ্ট লোকের উপায় কি আর ?

এ সব প্রাচীন চতুর্থাংশ ‘সন্ন্যাস’ ভেদ-ধারী তিথারীর নমুনা। আধুনিক আদর্শ আমাদের পূর্বোক্ত সেই ‘রত্নাবোজন-ভঙ্গনবীর’ ইত্যাদি উদ্ভট পক্ষে প্রকাশিত। ত্রীগৌরানন্দেবের শুভাবির্ভাব ও পরম প্রেম-গীলা-প্রভাবেই দু-এক শতাব্দী পরে ক্রমে সে স্মৃতি বদলিয়াছে। ক্রমে অবহেলায়—

অস্বাভাবিক সুপাত্রে আবর্জনা জমিয়াছে। সুক্ষেত্রে আগাছা উঠিয়াছে। আসলে নকল ঘটাইয়াছে। ভাগ জিনিস হলেই ক্রমে তার 'ভেল' হয়। সাচ্চা হলেই খুটা হয়। সোনা হলেই গিণ্টি হয়। সংসারের রীতিই এই। তাই শ্রীগোবিন্দদেবের পদ-রঙ্গ-পুত বঙ্গ-বক্ষে আজ ভণ্ড 'বৈষ্ণব' 'ভৈকদারী'র অফাণ্ড তাণ্ডবনীনা। ফলে অবাধ ভিক্ষা-দানাদি দ্বারা ইহাদের—এবং এতদ্বন্দ্বিত্য অস্ত্রান্ত পেশাদারী ভিক্ষারীদের পোষণ-প্রণা অধুনা আর অব্যাহত থাকি অতীব অস্বাভাবিক।

সাধারণতঃ ভিক্ষুকসকলেই নিন্দিত ও সমাজের অবজ্ঞাত অধস্তন অংশ।

"ত্বাদপি লঘুদূল স্ত্বাদপি চ বাচকঃ।

ন নীত বায়ুনা কস্মাৎ কিঞ্চিং প্রার্থনশক্তয়া॥"

তু স্বভাবতঃ লঘু বস্ত্র ; তা হতেও লঘু তুলা ; আবার তুলা হলেও লঘু ভিক্ষুক। তবে যে বাতাস তাকে উড়াইয়া লয় না, সেটা কেবল কিছু চাওয়ার ভয়ে। এই সব উদ্ভট পদ, "ভিক্ষারায় নৈব নৈবচ"—

"ধিক্ পরাপেক্ষণং দীনং বাচকং পুরুষাণমঃ"

"ধরণে বানি চিহ্নানি তানি চিহ্নানি বাচনে"

"বাচনং তামসং স্মৃতঃ" ইত্যাদি বহুতর

বচনাদিতে ভিক্ষুক স্বভাবতই নিন্দিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে আবার সেই ভিক্ষুক যদি ভণ্ডতা, ধলতা, আলস্য ও অনৈতিকতার পূর্ণ অপাজ্জবে পরিণত হয়, তবে দেশের প্রভূত ধনহানিজনিত বহুবিধ অনিষ্টের কারণ ঘটাইয়া, তাহার পোষণ-বিধান ও প্রসন্নদান 'মহু' প্রভৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রার্থণা শাস্ত্রের স্বর্ণমাজ মহুসোধিত নহে।

দানধর্ম্য অভাবগ্রস্তের অভাব মোচনো-দেশেই অমুঠের। উহা অক্ষমের পাণনাথেরই সক্ষমের সংকর্তব্য। দানে দৈন্ত-মোচন-শুণই বদান্ততা। অদৈন্ত, অনশক্তি ব্যাচ দয়া-দাক্ষিণ্যের লক্ষ্যভূত নহে। "দীনেভ্যো ভ্রুবিণং দস্তাদার্তং প্রতি দয়াং কুৰ্বা।" দরিদ্রকেই ধনদান করিবে ; আর্ন্ত আতুরের প্রতিই দয়া কর্তব্য।

"দরিদ্রাণ্ ভর কোস্তের সা প্রবচ্ছৎসরে ধনঃ।
ব্যাধিতস্তোষং পণ্যং নিরুজস্ত কিমৌবটঃ॥"

অর্থাৎ—

হে কোস্তের ! পোষ দীনগণে ;

সমর্থকে দেবিওনা ধনে।

ঔষধ রুগ্নেরি হিত মাধে ;

নীরোগের কি কাজ ঔষধে ?

যথা স্বভাবমোচনই যে স্থানে নিঃস্বার্থ দানের সর্ম্ম, তাহাই শাস্ত্রাত্মিন্দিত সার্বিক দানধর্ম্য। প্রাচীনকালে তাহার যে কিছু ব্যভিচার বা অপব্যবহার হইত, তাহা তাৎ-কালিক জীবিকা-সচ্ছল সমাজে কতক সহিত, কিন্তু এখন আর সহেনা। তখন একদিন 'টাকার আটগন চাউল' ছিল, আর এখন আট টাকার একগন বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। এখন ততুল ও টাকা পরস্পর স্থান-বিনিময় করিয়া বসিয়াছে। চাউলের স্থানে টাকা ও টাকার স্থানে চাউল আনিয়াছে। তাতে আবার অপর বিবিধ বিপত্তি বিপ্লবে দেশের এখন বিঘট সঙ্কটাবহ। এ অবস্থায় আমাদের দান-ধর্ম্যের সমস্বায়রূপ সংস্কার-ব্যবস্থা অবিলম্বে অবশ্য কর্তব্য। আবার বলি, এই ক্ষেত্রে অগোণে আন্দোলন-আন্দোলনা,

বক্তৃত্তা-রচনা, সত্য-গমিত্তি, পুস্তক পত্রিকাদি ও প্রচার-বিচারাদি আরম্ভ হউক। দানধর্মের চিরপ্রসিদ্ধ ভারতবর্ষ সুদেশ-কাল-পাত্র-বিচারিত্তি বিত্ত্বক দানধর্ম সাগনে সুসিদ্ধ হউক, পরমেশ-চরণে ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীঃ:—

প্রাচীন ভারতে ভক্ষর।

অতীত ও বর্তমানের তুলনার মানস আপনার সুক্তিগত্ৰ লাভ করে। অতীত, বর্তমানের অন্ধুরে জলসেচন করিয়াছিল, তজ্জন্ত বর্তমান অতীতের কাছে কৃতজ্ঞ, সুতরাংই বর্তমানের জীবনে অতীতের প্রোভাব-বিত্ত্বব অনন্যমাত্রার পরিমুট। অস্ত্র-দিকে বর্তমান, অতীতের সহস্রশতাব্দের একমাত্র আশ্রয়। বর্তমান রাজপুত্রার প্রশস্ত পুস্তপাত্র লইয়া ভক্তিভরে অতীতের চরণ উদ্দেশে অর্পণ করিতে প্রস্তুত। এই প্রবীণ-নবীনের সমালোচনা—মানব-জীবনে সুগান্তর আনয়ন করে। হের বর্জন ও উপাঙ্গের গ্রহণের মহামন্ত্র ত্রী তুলনার মাতৃকা-রত্নেই বিত্ত্বমান; তাহার উজ্জ্বলে কৃত-কাপিত্তা আগমন করে, ইত্য প্রা।

বর্তমান সমাজে দুই শ্রেণীর গোক দেখা যায়। একশ্রেণী অতীতের গৌরব-গৌরবে বিমুগ্ধ, অপর দল বর্তমানের মোহন সুবলীরবে মাত্ত্বিয়ার। একের দূরনির্গুপ্ত-মুটি পারিপার্শ্বিক পদার্থের প্রতি উদ্যোগী, সন্তের তীত্রহুঃ পার্শ্ব বস্ততেই নিবদ্ধ;

পক্ষান্তরে দূরদর্শনে অনিচ্ছ। এই ভাব-ধরের সংঘর্ষে তৃত্তীয় পক্ষ আবিষ্কৃত হয়। এই সম্প্রদায় যেমন পুরাতন পিশাচের পুত্রায় পরামুগ্ধ তেমনি নব দানবের সেবারও অনিচ্ছক। ইহাদের ধারণা, প্রাচীন-অগতের বক্ষেও প্রোভ-পদচিত্র পাওয়া যাইত, পৈশা-চিক অট্টহাসির অস্তিত্ত্ব ছিল; অধুনাতন সংসারেও দেবতার পদাক দৃষ্টিগোচর হয় অরসদীভের মুহূল শ্রোভ প্রত হয়।

প্রাচীন সময়ে, ভারতীয়গণ উন্নতির উত্তম শিকরে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই উক্তির সহিত অগতের সংশ্রব নাই। সত্য সত্যই, তেলঃপুত্র তপসীর পদতলে বসিয়া, ভারতীয় সমাজ অগতের বহু উচ্চজ্ঞানরত্ন সংগ্রহ করিয়া ছিল। কিন্তু, সে আদর্শ সমুন্নত সুগতা সমাজে, অগতের—অস্ত্রায়ের—অনাচারের—বাতিচারের লেশমাত্রও ছিল না, এরূপ কিরণ—কেবল প্রজাজাতের পরিচয় প্রদান করে। আলোক, অন্ধকারের অস্তিত্ত্ব প্রমাণ করে। অগতাজ্য বিখ-প্রষ্ঠার এমন সুকৌশলপূর্ণ স্থান, যে, এখানে পুণ্যের উজ্জ্বল মুষ্টি পাপের মলীমল-চিত্তকে অপেক্ষা করে; অধমের কঠোর কশা, উচ্ছ-অগতার উগ্ৰ কৃগতির প্রমাণ করে। মধুর মগর মাক্তের শান্তিধর্মের মল স্পন্দ, তীম গ্রীমের সূচনা করে। সমোমদ মিলন, অলক্ষ্য মর্মান্তিক বিরোগের সংযোগ স্থর পরিয়া আকর্ষণ করে। বস্ততঃ এ অগৎ বন্দমর, নিপ্লারিহীন শান্ত্তাব এ রাজ্যে কখনও আতিপা গ্রহণ করেন নাই।

প্রাচীন ব্যবহার-মাত্র-প্রণেতা মর্হর্ষি আর্ধ্য সত্যতার অরত্মুতিনাদের সত্যত্বেরও

তত্ত্বরূপের স্থপিত স্বর স্তমিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ব্যবহারশাস্ত্র দেশ-কাল ও সমাজবিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত;—এ শাস্ত্রের সমস্ত নিবেদন এবং অল্পজ্ঞা কোনও সমাজে কোনও সমাজের প্রত্যক্ষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিত। শাস্ত্রজ্ঞবর্গ অবগত আছেন, ব্যবহার শাস্ত্র (আইন) দৌকিক প্রয়োজন নিষ্পন্ন করে। পারমৌকিক প্রয়োজন এখানে নিত্যন্ত গোপনভাবে আপন সম্ভার প্রমাণ দেয়।

আর্য্য ব্যবহারশাস্ত্রে দুই ছর, তত্ত্বরূপে দ্বিবিধ, প্রকাশ-তত্ত্বরূপ ও অপ্ৰকাশ-তত্ত্বরূপ বা প্রচ্ছন্ন তত্ত্বরূপ। মর্ধ্বি বৃহস্পতি বলিতেছেন,—

প্রকাশশ্চাপ্ৰকাশশ্চ * তক্ষরাঃ ।
দ্বিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।

প্রজ্ঞানামর্ধ্যমায়ান্তিঃ প্রভিন্নাস্তে
সহস্রধা ।

নৈগমাঃ বৈদ্যকিতবাঃ সন্তোৎ-
কোচক-বঞ্চকাঃ ।

দৈবোৎপাতবিনোভদ্রাঃ শিল্পজ্ঞাঃ
প্রতিরূপকাঃ ।

অক্রিয়াকারিণশ্চৈব মধ্যস্থাঃ কূট-
সাক্ষিণঃ ।

প্রকাশতক্ষরাঃ হ্যেতে তথা কূহক-
জীবিনঃ ।

উক্তাংশের তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বরূপে দুই প্রকার, প্রকাশ-তত্ত্বরূপ ও অপ্ৰকাশ-তত্ত্বরূপ। জ্ঞান-শক্তি ও চাতুরীর ন্যূনামিক্য ও পার্শ্বিক্য বশতঃ, এই দুই শ্রেণী তত্ত্বরূপে সহস্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। এতদ্ব্যতিরেক

মধ্যে নৈগম, বৈদ্যকিতব, সন্তা, উৎকোচ-
ক্রোধী, বঞ্চক, দৈবোৎপাত-কপয়িতা,
শিল্পজ্ঞ, প্রতিরূপসিদ্ধতা, অনার্য্যকারিগণ,
মধ্যস্থ, কূটসাক্ষী ও কূহকজীবীগণ প্রকাশ-
তত্ত্বরূপ। ইহাদের চৌর্য্যো গোপন নাই ;
ইহারা জনসমাজে প্রাকান্তভাবে গিচরণ
করিয়া প্রকাণ্ডা মাধন করে। অজ্ঞাতদেশে
জন-নয়নের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া কাণ্ডা
করে না। 'নৈগম' অর্থে—দক্ষিণাত্যের
নয়গতি বৃক্ষমায়ের মন্ত্রী সর্পশাস্ত্রজ্ঞ মহামতি
মাধবাচার্য্য বুঝাইছেন—

“নৈগমাগাং সার্ধিকাঃ বণিক্ প্রভৃত্যয়ঃ”

বণিকসম্প্রদায় জীব্যের মূল্যের হানিবৃদ্ধি-
সংবাদ গোপন করিয়া, সকলে সন্নিহিত
হইয়া অধিকতর মূল্য নির্ধারণ দ্বারা, ভুল-
বজ ও মানের (বাটুবারার) কূটতার দ্বারা
অর্থাৎ 'ফের' ওরাগা দাঁড়ী ও 'কন্' বাটুবারা
ব্যবহার—কিবা 'পাকী'র নামে 'কাঁচী'
দেওয়া প্রভৃতির দ্বারা, প্রাকান্তভাবে তত্ত্বরূপ
মাধনঃ করে। যে ব্যক্তি চিকিৎসা-শাস্ত্র,
অস্ত্রপ্রয়োগ ও ভৈষজ্যপ্রণয়ন সমাক্ অবগত
না হইয়া, চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করে,
তাহার নাম "বৈদ্যকিতব।" কোনও কোনও
পণ্ডিতের মতে—'বৈদ্য' অর্থ—দৃষ্টিভিৎ-
সক ও 'কিতব' অর্থ—"বহুরূপী" মল। ইহাদের
কার্য্য ও সাধারণ্যে তত্ত্বরূপতা। 'সন্তা' বলিতে
বিচারমতীর সমস্ত ব্যার ; সম্ভাগণ বর্ডমান-
কালের 'জুরী'দের সমূহ ভিলেম। সন্তোরা
গোপনে একতর পক্ষের হিতার্থে কতসংকল্প
হট্টমু, প্রাকান্তভাবে বিচারালয়ে ভার, ধর্ম ও
বিধানশাস্ত্রের দোহাই দিয়া তত্ত্বরূপিত
চরিতার্থ করিতে পারেন। উৎকোচক

অর্থ 'সুস্পোষ'। রাজকর্ম্মাধিকৃত ব্যক্তি-
গণের, অপরাদিগম্প্রদায়ের নিকট হইতে
অলক্ষ্যভাবে অর্থগ্রহণের নাম উৎকোচ-
গ্রহণ। 'বঞ্চক' অর্থে জুরাচোর বৃত্তিতে
হইবে। কোনও মতে "সভ্যোৎকোচক-
বঞ্চকঃ"র অর্থ—উৎকোচক ও বঞ্চক সম্ব-
গণ। যে সম্য উৎকোচ গ্রহণ করিয়া স্বীকৃত
কার্যসম্পাদন করেন, তিনি 'উৎকোচক'
সভ্য, আর যে সভ্য উৎকোচ গ্রহণ করি-
য়াও স্বীকৃত কার্য করেন না, বঞ্চনা করেন,
তিনি 'বঞ্চক' সভ্য। এই ব্যাখ্যায়ের মধ্যে
কোনটী উপযুক্ত, তদ্বিষয়ে বিচারের ভার
নিজ পাঠকবর্গের উপর নিহত রহিল।
প্রকৃত প্রত্যয়ে—এই সকল কাণ্ড প্রকাশ
চৌর্য্য, তাগতে সম্পন্ন নাই। সাহারা
দৈবোৎপাতের সংবাদ ও প্রতীকারের
প্রচার দ্বারা সামাজিক নিরীহ ব্যক্তিবর্গের
নিকট হইতে ধন গ্রহণ করে, অগচ মোতি-
বিত্তাকুল নহে, তাহারা 'দৈবোৎপাতিন'।
অবিদ্যৎ অমিষ্টপাতের বর্ণনা ও অস্বাচিতভাবে
সমস্ত তদুপমাৰ্থে স্বস্তায়নাদি বাপদেশে
বাহারা শাস্তিপত্র সমাজে প্রচারনার জল
নিষ্কার করিয়া স্বার্থ-হীন করায়ত্ত করে,
তাহাদের কার্য যে চৌর্য্য, তাগতে সন্দে-
হের কনিকামাজও দৃষ্টিগোচর হয় না।
শিল্পক ব্যক্তি শিল্পাদি পদার্থে রাগোৎ-
কর্ষ সাধন দ্বারা তাহাকে 'স্বর্ণ' নামে বিক্রয়
করিয়া, অল্পজের নিকট হইতে অনায়াসে
আয়বন্ধা করে, সুতরাং শিল্পক প্রকাশিত্ত্বর।
'প্রতিকল্পক'—প্রতিকল্প-নির্মাণ—অর্থাৎ
আলিঙ্গ্য। মুদ্রা বা লেখ্যাদির প্রতিকল্প
নির্মাণপূর্বক সেই কৃত্রিম প্রতিকল্প গুরুত

পদার্থরূপে সাধারণ্যে প্রচার করিয়া,
তদ্বারা ক্রয়-বিক্রয়াদি নিষ্পাদন—চৌর্য্য
ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অকার্যকারিগণ
প্রকাশ্য চোর। মদ্যাহ ('মালিশ') পক্ষ-
পাত দ্বারা প্রকাশ্যরূপে চৌর্য্যাস্থান করিতে
পারেন। মিথ্যাসাক্ষীর নাম 'কুটসাক্ষী'।
কুহকজীবী—ইন্দ্রজালিৎ 'ভেদকীওয়াল'
বাজীকর। এই সমস্ত ব্যক্তি যে তক্ষর,
তাহা সর্বসম্মত।

প্রকাশিত্ত্বর বিষয়ে দেবর্ষি নারদের
উক্তিও সম্ভাষণরূপে উদ্ধৃত হইতেছে।—

“প্রকাশবঞ্চকাস্তত্র কুটমানভুলা-
শ্রিতাঃ ।

উৎকোচকাঃ সোপধিকাঃ কিতবাঃ
পণ্যযোষিতাঃ ।

প্রতিরূপকরাশৈশব মঙ্গলাদেশবৃত্তাঃ ।
ইত্যেবমাদয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রকাশাঃ
তক্ষরাঃ ভূবি ।”

কুটমান (কুম্বীটখার) ও কুটুল
(ফেব্‌ওয়াল দাঁড়ী) দ্বারা বাহারা ক্রয়
বিক্রয় করে—তাহারা, উৎকোচগ্রাহিণ, সোপধিক ও কিতবগণ বারবনিভাবুক,
প্রতিরূপনির্মাণকুল, মঙ্গলাদেশবৃত্তি মঙ্গ-
দায় ইত্যাদি প্রকাশ-তক্ষর জানিবে।
নারদের 'মঙ্গলাদেশবৃত্তি' ও বৃহস্পতির
'দৈবোৎপাতিন' অভিহিত। নারদ-বর্ণিত
'সোপধিক' বস্ত্রানবসুর্গের "আলদারোঙ্গা"
'আল এসেসর' ইত্যাদি। নিজে কসতর্পিন
কমচারী সাজিয়া, তৎকালে অস্বাচিত অর্থগ্রহণ
ইহাদের বৃত্তি। নারদের সময়ে, মদ্যাজের

ইন্দিরপুত্রের বিশেষ নিদর্শনরূপ পণ্য-নারী, প্রকাশিতস্বরূপ লাভ করিয়াছে। বৃহস্পতির সময়ে সে স'বাদ প্রস্তুত। আদর্শ-ভেদে এই নূতন গণনার উদ্ভব। বৃহস্পতির যুগে আদর্শ ছিল, "কাম এতৈকঃ পুরুষার্থঃ" বৃহস্পতির কামহায়ে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, সমাজ তখন পণ্যস্ত্রীর প্রতি নিতান্ত সহায়ত্বহীন ছিল না। যে সমাজে কাম, যৌক্তিক আগনে উপবিষ্ট, সে দেশের বিধান-শাস্ত্র মনে ২ পণ্যস্ত্রীর প্রতি অল্পা পকাশ করেন না।

অপ্রকাশ বা প্রচ্ছন্ন তন্ত্রের পরিচয় সহর্কি বৃহস্পতি বলিতেছেন —

সন্ধিক্ষিতঃ প্রান্তমুখো দ্বিচতুষ্পদ-
হারিণঃ ।

উৎক্রেপকাঃ শস্যহরাঃ ক্ষেয়াঃ
প্রচ্ছন্নতন্ত্রাঃ ।

সন্ধিক্ষিতী, প্রান্তমুখী, সহযাপণচোর, উৎ-
ক্রেপক, শস্যহর—ইহারা প্রচ্ছন্নতন্ত্র। সন্ধি-
ক্ষিত্ সিদ্ধচোর। যাহারা রজনীর অক্ষত্বের
জনচক্র অগোচরে গৃহের ভিত্তিতে সন্ধি
(সিদ্ধ) ধনন করিয়া, সন্ধিমার্গে গৃহের
অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অপহরণ করে,
তাহাদিগকে সন্ধিক্ষিত্ কহে। প্রান্তমুখ—
যাহারা বজ্রাদির প্রান্তে এখিত স্তব্ধাদি
ক্রমা প্রান্তেধন পূর্বক অপহরণ করে। এই
সম্প্রদায় 'গাটকাটা' 'পকেটকাটা' 'খুটকাটা'
ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাদেশিক নামে অভিহিত
হইয়া থাকে। পশু-মাংস-চোর তীরা-
ককাট্য রজনীপত জনগণ নিত্যম নিতৃতমুখে
সংক্রমণে অবস্থায় শয়ন করিলে, নীরবে

নিঃশব্দপদে বাগক, রমণী বা গণ্ড লইয়া
দূরে—অতিদূরে প্রস্থান করে। উৎক্রেপকগণ
গৃহস্থের অনবধান অচ্যুতকান করিয়া, সেই
সময়ে সহগা প্রাচীরাদি উল্লঙ্ঘন পূর্বক
ধনরত্ন গ্রহণ করিয়া গণায়ন করে। শস্যহর
তন্ত্র যাসিনীর অক্ষত্বেরে আপন অক্ষ
লুকাইয়া শস্তাগারের (গোলা, মস্কট
প্রভৃতির) তলদেশে ছিড় করিয়া নিঃশ
ধাতুপাত্ত স্থাপন করে, ছিড়পথে স্বতই
শান্তরাজী এই ধাতুপাত্তে পতিত হয়;—
অচিরে শস্তহর তন্ত্রকুল এই ধাতুপাত্ত লটরা
অভিলষিতভাবে প্রস্থান করে।

সর্কি-নাম এই সকল চোরের পতিত-
প্রাণে বলিতেছেন—

“মাধনাস্থিতাঃ রাত্নৌ বিচরন্তা-
বিভাবিতাঃ ।

অবিজ্ঞাতনিবাসাশ্চ ক্ষেয়াঃ প্রচ্ছন্ন-
তন্ত্রাঃ ।

উৎক্রেপকঃ সন্ধিভেতা পাস্ছউদ্-
প্রস্থিকাদয়ঃ ।

স্ত্রীপুংসয়োঃ পশুস্তেয়া চোরাঃ
নববিধাঃ স্মৃতাঃ ।”

উক্ত শ্লোকরাজীর তাৎপর্য এই যে,
প্রচ্ছন্ন-তন্ত্রগণ রজনীবোনে ভৌগিকার্থে-
পকরণ সমূহ গ্রহণ করিয়া, জনগণের অজাত-
সারে বিচরণ করে। প্রচ্ছন্নতন্ত্রের বাসস্থান
সাধারণের অজাত। তাহারা উৎক্রেপক,
সন্ধিভেতা, পাস্ছ, উদ্গ্রহিক, স্ত্রীহারী, পুরুষ
স্তেয়া, পশুচোর (পশুস্বকোত) রজনীপত
এবং অবিজ্ঞাতনিবাস—এই নববিধ। এই

মোক, বাস মহোদয়—দে নববিধ প্রজ্ঞা-
চোরের কথা বলিতেছেন, ইহার মধ্যে
'পাহ তরু' ও 'উদ্গ্রাহিক চোর' বাতীত
অপর সকলেই আমাদের পূর্ব পরিচিত । পাহ
তরু, অরণ্য-প্রান্তরাদির সমীপবর্ত্তি মার্গে
অপহৃত পাহুকুলের সর্ব্ব প্রহণ করে । উদ্-
গ্রাহিক অর্থ বাহার। গ্রহিণোচনপূর্ব্বক
চৌর্য্যনিষ্পাদন করে ;—ইহা 'দগকে বৃহস্পতি
'প্রাস্তমুখঃ' বলিয়াছেন । প্রথমে যে দুই প্রকার
চোরের কথা কথিত হইল, অর্থাৎ যাজ্ঞিতে
চৌর্য্যোপকরণ দটরা অজ্ঞাতে বিচরণ করে,
সুযোগ মত অপহরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং
বাহাদেয় বাসন্তান অবগত হওরা যায় না,
এই দুই দল—ইহাদের কার্য্যের পরিধি
পরিমিত নহে ।

মতান বৃহস্পতি প্রকাশ তন্ত্রগণের
যে শাস্তি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাও এখানে
প্ররোজনীর বোধে উদ্ধৃত হইতেছে ।—

সংসর্গ চিহ্নরূপৈশ্চ বিজ্ঞাতাঃ রাজ-
পুরুষৈঃ ।

প্রদাপ্যাপস্তুং দণ্ডাঃ দর্ম্মৈঃ শাস্ত্র-
প্রচোদিতৈঃ ।

প্রচ্ছাদ্য দোমং ব্যামিশ্রং পুনঃ
সংস্কৃত্য বিক্রয়ী ।

পণ্ড্যং তদ্বিশুণং দাপ্যঃ বণিগ্
দণ্ড্যশ্চ তৎসমম্ ।

অজ্ঞাতৌধিমস্তস্তু যশ্চ ন্যাধেরতস্ত-
বিৎ ।

রোগিনৌহর্ষং সন্মানস্তে স দণ্ড্য-
শ্চোরবদ্ ভিষক্ ।

কুটাকদেবিনঃ ক্ষুদ্রাঃ রাজভার্য্যা-
হরাশ্চ যেৎ

গণকাবঞ্চকাশ্চৈব দণ্ড্যাস্তে কিতবাঃ
স্মৃতাঃ ।

অম্মায়বাদিনঃ সত্যাঃ তথৈবোৎ-
কোচজীবিনঃ ।

বিশ্বস্তবঞ্চকাশ্চৈব নিক্ৰীণ্যাঃ সর্ব্ব-
এবতে ।

জ্যোতির্জ্ঞানং তথোৎপাতং অবি-
দিত্বা তু যো নৃণাং ।

ভাবয়ন্ত্যর্থলোভেন বিনেয়াস্তে
প্রযত্নতঃ ।

দণ্ডাজিনাধিভি যুক্তমাত্মানং দর্শ-
য়ন্তি যে ।

হিংসন্তুঃ ছদ্মনা নৃণাং বধ্যাস্তে
রাজপুরুষৈঃ ।

অল্পমূল্যস্ত সংস্কৃত্য নয়ন্তি বহু-
মূল্যতাং ।

স্ত্রীবালকান্ বঞ্চয়ন্তি দণ্ড্যাস্তেহ-
র্থাহুসাতঃ ।

হেমরত্নপ্রবালাদ্যান্ কুক্রিমান্
কূর্ব্বতে তু যে ।

ক্রেতুমূল্যং প্রদাপ্যাস্তে রাজ্ঞা
তদ্বিশুণং দমম্ ।

মধ্যস্থাঃ বঞ্চয়ন্ত্যেকং স্নেহলোভা-
দিনা যদা ।

সাক্ষিগণচান্যাধাক্রয়ঃ দাপ্যাস্তে
পং দমম্ ।

বৃহস্পতির উক্তির মর্ম এইরূপ—

রাজপুরুষগণ সংদর্শ, চিত্র ও রূপের দ্বারা এই তত্ত্বরসগণকে চিনিবেন। অসম্ভব ধন ধনবানীকে পদত্ব হইবে। রাজা তত্ত্বর-গণের বখাখাজ দণ্ডনিধান করিবেন। যে বণিক সংস্কার দ্বারা মদ্যের জবোর দোষ চাকিয়া, এই সমস্ত জব্যকে নিবেদন জব্য সমূহের সঙ্গে মিশাইয়া বিক্রয় করে, রাজা এই বণিকের নিকট হইতে ক্রেতৃপদত্ব পণ্য-মূল্যের বিত্ত্বণ দণ্ড গ্রহণ করিবেন। আর ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্য দিরা দোষবৎ জব্য ক্রয় করিয়াছে, তাহার বিত্ত্বণ মূল্যের পণ্যজব্য বণিক ক্রেতাকে প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। যে ব্যক্তি গুণি ব্যবহার ও মন্ত্রপ্রয়োগে অনভিজ্ঞ, ব্যাধির নিদান, পূর্ব-রূপ, রূপ, উপশর, সংপ্রাপ্তি সম্যক অবগত নয়, সে ('হাতুড়ে' চিকিৎসক) রোগীর অর্থ গ্রহণ করিলে, চোরবৎ দণ্ডাই হইবে। গৃহীত জব্যের নানাধিক্য-বশে প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস ও উত্তম সাহস চোরবৎ (১) কূটকদেবী (পাশা খেলার যে সকল ব্যক্তি 'ধরা' খেলে, তাহার

(১) সাক্ষিত্তিপনসাহসঃ দণ্ড উত্তমসাহসঃ।

তদর্কঃ মধ্যমঃ প্রোক্ত তদর্কমধ্যমঃ স্ততঃ।

অসীত্যাদিক সহস্রংপণ উত্তমসাহসদণ্ডের পরিমাণ, তদর্ক (চত্বারিংশদধিক পণপঞ্চ-শত) মধ্যমসাহস দণ্ডের ও তদর্ক (সপ্ত-ত্যাদিক দ্বিশতপণ) প্রথম বা অধ্যম সাহস দণ্ডের পরিমাণ। মতান্তরে "উত্তমসাহসে-দণ্ডঃ সহস্রপণমীরিতঃ। তদর্কঃ মধ্যমঃ প্রোক্তঃ তদর্কমধ্যমো মতঃ। সহস্রংপণ উত্তম-সাহসী, পঞ্চশতপণ মধ্যম ও সাক্ষিত্তিপন প্রথম বা অধ্যম সাহস।

কূটকদেবী; এখানে তাৎপর্যাত: সমস্ত 'জুয়া'খেলার অভিনয়ই দোষাই মনে হয়) ও রাজভাণ্ডার, বক্ষক, গণক, কিতব, মিথ্যানাদী সভ্য, উৎকোচগ্রাহিগণ, বিখাস-যাতকসুন্দ, ইহাদের সকলকেই রাজা নির্দা-সন-দণ্ড প্রদান করিবেন। বাহার জ্যোতি-র্কিত্ত্বা অতিক্রম নহে, অথচ উৎপাত বৃত্তান্ত খ্যাপন দ্বারা অর্থ গ্রহণ করে, রাজা যত্ন-সহকারে তাছাদিগকে দণ্ড দিবেন। বাহার ব্রহ্মচারিবেশ বা তিস্কুবেশ গ্রহণ করিয়া ছলে অর্থ গ্রহণ করে, তাহার রাজপুরুষগণের বখা হইবে। ব্যবহারশাস্ত্রে 'বধ' শব্দের অর্থ সর্স্বত্রই প্রাণবিনাশ ব্যাপার নয়। 'তাড়ন, অঙ্গচ্ছেদ, নগ্নীকরণ, গৃহতঙ্গ, সর্স্ব-স্বাদান, নির্দাসন, মস্তকমুণ্ডন, প্রাণহরণ ইত্যাদি ব্যবহারশাস্ত্রের 'বধ' শব্দের প্রতীপাত্ত। অপরাধের শুক্ল অহুসারে ইহার যে কোনওটা বা অবস্থাবিশেষে একা-ধিকটা দণ্ডরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। বাহার অন্নমূল্যজব্য সংস্কার করিয়া জী-বাগকাদিকে বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহার অর্থগ্রহণের পরিমাণ অহুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধ্যম সাহসাদি দণ্ডাই। কৃত্রিম সর্স্ব, রৌপ্য, প্রোবাল প্রভৃতি জব্য বাহার বিক্রয় করে, অথচ প্রকৃত সর্স্বাদির অহুরূপ মূল্য গ্রহণ করে, তাহাদের নিকট হইতে রাজা ক্রেতার মূল্য প্রত্যাৰ্পণ করাইবেন, এবং নিক্রেতাকে জব্যমূল্যের বিত্ত্বণ অর্থ দণ্ড করিবেন। মন্ত্রাঙ্গগণ যদি স্বজন-স্নেহ ও অর্থ-লোভে ঐকতর পক্ষকে বক্ষণ করে, আর সাক্ষিগণ যদি স্নেহ-লোভাদি কারণে অস্বপা (অসত্য) বলে, তবে তাহার (ঐ সভ্য ও সাক্ষিগণ) বিত্ত্বণ দণ্ডভাগী হইবে।

অগ্রকাশ-তত্ত্বরণের দণ্ডবিধান এসদে
পাচার্য্য বৃহস্পতি বলিতেছেন—

সন্ধিচ্ছেদকৃতো জ্ঞাত্বা শূলমাগ্রা-
হয়েৎ প্রভুঃ ।

তথা পশ্চামুখো বৃক্ষে গলং বদ্ধাবল-
স্বয়েৎ ।

মহুম্যহারিণো রাজ্ঞা দন্ধব্যাস্তে
কটামিনা ।

গোহর্ত্তুনাসিকাং ছিন্দ্যাৎ বধ্বা-
বাস্তসি মজ্জয়েৎ ।

উপেক্ষপকস্ত সন্দংশৈর্ভেত্তব্যো
রাজপুরুষৈঃ ।

ধাত্তহর্ত্তা দশগুণংদাপ্যঃ স্যাৎ
ত্রিগুণং দনম্ ।

সন্ধিচ্ছেদক তত্ত্বরণসংকে রাজা শূলে
আরোপণ করিবেন। বাহার্য্য পাহরণের
সর্ব্বত্র হরণ করে, সেই সকল চোরকে (গলায়
দড়ি বাধিয়া) বৃক্ষে অবলম্বিত করিবে,
(অর্থাৎ ফাঁস গাছে লটুকাইয়া মারিবে।)
মহুম্যহারণকারিগণের সর্ব্বাদ বীরণ-পত্রের
(বেণার পাতা) দ্বারা আবৃত করিয়া তাহা-
দিগকে অগ্নি সংযোগে দধ্ব করিবে। গো-
চোরের নসিকাকেছদন করিবে। অথবা
বন্ধন করিয়া ললে নিমজ্জিত করিয়া দণ্ডিত
করিবে। উৎকোপক তত্ত্বরণকে রাজপুরুষগণ
সন্দংশ (সাঁড়ানী) দ্বারা অদ ছিন্ন ভিন্ন
করিবে। ধাত্তচোর প্রাণত্যাগীকে গৃহীত
ধাত্তের দশগুণ ধাত্ত প্রদান করিতে, বাধ্য
হইবে। রাজা তাহার নিকট হইতে ত্রিগুণ
দণ্ড গ্রহণ করিবেন।

কেবল বে তত্ত্বরণকুল দণ্ডাই তাহা
নর, চোরগণের বাহার্য্য সহায়, তাহার্য্য
দণ্ডযোগ্য। এ বিধরে বাজবধ্য সংহিতায়
উক্তি এই—

ভক্তাবকাশায়ুদকমস্ত্রোপকরণ-
ব্যয়ন্ ।

চৌরস্ত দদতো হর্ত্তুঃ জ্ঞানতো
দন উত্তমঃ ।

বাহার্য্য চৌরকে 'চোর' বলিয়া অবনত
হইয়াও, তাহাকে অন্ন, বাসস্থান, অগ্নি,
জল, পরামর্শ ও অস্ত্রাদি উপকরণ দ্বারা
সাহায্য করে, তাহাদেরও দণ্ড উত্তমসাহস
অর্থাৎ ১০০ পণ।

সহর্ষি কাত্যায়নও বলিতেছেন,
চৌরাগান্তক্তদাঃ যেশ্চাস্তথাপ্যুদক-
দায়কাঃ ।

ভেত্তাতৈর্জ্বেব ভাণ্ডানাং প্রক্তিগ্রহণ
এবচ ।

সমদণ্ডা স্ততাঃ ছেতে যে চ প্রচ্ছা-
দয়স্তি তান্ ।

অর্থাৎ সাহার্য্য চৌরগণকে অন্ন ও জল
প্রদান করে, অপহৃতভাও ভেদকরে, অর্থাৎ
চোরের নিকট হইতে অপহৃতদ্রব্য গ্রহণ
বা ক্রয় করে (ইহাদিগকে স্থলবিশেষে
"থলেৎ" "পেলেৎ" ইত্যাদি নামে অভিহিত
করা হয়।) তাহার্য্য তত্ত্বরণের সমানদণ্ডকারী
হইবে। আর বাহার্য্য চৌরঃ প্রচ্ছাৎক,
অর্থাৎ চৌরকে লুকাইয়া রাখে, তাৎপর্য্যভঃ
চৌরকে সাধুরূপে প্রমাণ করিয়া চৌর্য্যের
প্রশ্ন প্রদান করে, তাহার্য্যও চৌর্য্যওভাগী।

চোরের সহায়তাকারী চোরবৎ দণ্ডার্থ ।
বাহারা চোরের প্রতি উদাসীন, শক্তি সবেও
চোরকে উপেক্ষা করে, তাহারাও চোর দণ্ড
দণ্ডনীয় । দেবর্ষি নারদের উক্তি—

শক্তাশ্চ য উপেক্ষ্যস্তেতেহপি ত-

দোষভাগিনঃ ।

উৎক্ৰোশতাঃ জনানাস্তু হ্রিয়মাণে
ধনে তথা ।

শ্রেয়স্বা যে নাভিধাবস্তি তেহপি
তদোষভাগিনঃ ।

বাহারা চোর ধরিতে সক্ষম হইয়াও
চোরকে উপেক্ষা করে, তাহারা চোরদণ্ডার্থ ।
ভক্তরগণ গৃহস্থের সর্বস্বহরণ করিয়া দ্রুতপদে
রজনীর সান্নাৎকারে অরণ্যে আশ্রিত হই-
তেছে, গৃহস্থ আর্তনাদে দিগন্তল মুখরিত
করিয়া সাহায্য আর্থনা করিতেছে, এমন
সময়ে এই উচ্চ টীংকারধ্বনি কর্ণগোচর
করিয়াও বাহারা সেইদিকে খাণ্ডিত হয় না,
তাহারাও দোষী, অপিচ চোরবৎ দণ্ডনীয় ।

যখন চোরের সখা পাওয়া যায় না,
তখন নিরীহ প্রথার সর্বস্বহরণের প্রতী-
কার কোথায় ? এই সমস্যার সমাধানে
বৌদ্ধের বাস্তবিক বলিতেছেন—

যাতিতেহপহ্নতে দোষো গ্রাম-

ভর্ত্তুরনির্গতে ।

বিবীতভর্ত্তুস্ত পথি চৌরাক্ত্তুর-
বীতকে ।

স্বনীক্ষি দদ্যাদ্ গ্রামস্ত পদং বা যজ্ঞ-
গচ্ছতি ।

পঞ্চ গ্রামোবহিঃ ক্রোশাৎ দশ-

গ্রাম্যথবা পুনঃ ।

উক্তভাষ্যের ভাংপর্য্য এই যে, গ্রাম
মধ্যে (বধ বা) অপহরণ সংঘটিত হইলে,
যদি চোর-পদচিহ্ন গ্রামের বাহিরে চৌরো-
পেক্ষাক্রমিত দোষের ভাগী দৃষ্ট না হয়,
তবে গ্রামপতি (মোড়ল) হয় চোর ধরির
রাজসমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন, নর স্বয়ং
অপহৃত দ্রব্য গৃহস্থকে প্রদান করিবেন ।
যদি বিবীত দেশে অপহরণ সংঘটিত হয় বা
অপহরণ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে বিবীত-স্বামী
চোর ধরিতে অথবা চোরিত দ্রব্য প্রদান
করিতে বাধ্য । বিবীত দেশ প্রচুর তৃণ-
কাঠপূর্ণ প্রদেশ।—বর্তমানকালের বন
বিভাগ । প্রাচীন সময়ে বন-বিভাগের
অধিকারীকে বিবীত-স্বামী কহিত । যদি
বিবীতদেশ ব্যতীত অন্যত্র পথে চৌর্য
সংঘটিত হয়, তবে চৌরোক্ত্য দোষভাগী ।
চৌরোক্তরণের জন্য যে রাজকর্মচারী
নিযুক্ত হইতেন, তাহার নাম চৌরোক্ত্য ।
পথে পথে তাহাদের অস্তচরস্বর্গ ভ্রমণ করিত ।
পথপার্শ্বে দূরে দূরে তাহাদের স্থান (থানা)
নির্দিষ্ট ছিল, সুতরাং পথে বা তৎসম্বন্ধিত
চৌর্যের জন্য মার্গপাল বা দিকপালই
চৌরোক্তরণ দোষী । গ্রামের বাহিরে গ্রাম-
পতির আধিপত্য নাই, গ্রাম্য শাস্তিরক্ষকগণ
সুতরাং সেখানে কার্যসাধনে অক্ষম । যদি
গ্রামসীমার চৌর্য হয়, চৌর্য-চিহ্ন গ্রাম-
ভিত্তিতে দৃষ্ট হয়, গ্রাম-বহির্ভাগে কোনও
চৌর্যালিক অবগত না হওয়া যায়, সেখানে
গ্রামবাসীগণ চোর ধরির দিতে বাধ্য, অথবা
অপহৃত দ্রব্য প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবে ।
সীমাহানে গ্রামপতির অধিকার অম, গ্রাম-
স্তরেও চোর-চিহ্ন পাওয়া যায় না, একপ

স্থলে গ্রামবাসিগণ দোষী। যদি গ্রাম হইতে বহির্গত হইরা চৌর-চিহ্ন অন্য গ্রামে গমন করে, তবে সেই গ্রাম চৌর অর্পণ করিতে বা চৌরকৃত প্রদান করিতে বাধ্য হইবে। যদি চৌর-চিহ্ন অবগত হওয়া না যায়, আর বহু গ্রাম মধ্যে গ্রাম হইতে ক্রোশাস্তরে চৌর্গাদি সংঘটন হয়, তবে পঞ্চ গ্রাম দোষী। অবস্থাবিশেষে সন্নিহিত দশ গ্রাম অপরাধী।

প্রাচীন সময়ে গ্রামে গ্রামে গ্রামাধিপতি, প্রতি পঞ্চ গ্রামে পঞ্চ-গ্রামপতি, প্রতি দশ গ্রামে দশ-গ্রামপতি, একরূপ শত গ্রামপতি, সশস্য গ্রামপতি নিযুক্ত হইতেন। ইহাদের বৃত্তি ব্যবস্থা ছিল, ইহারা রাজদণ্ড অধিকার ও ক্ষমতা পরিচালনের সহায় সৈন্য-শজাদি রাজকুল হইতে পাইতেন; অবস্থাবিশেষে নিজেস্বরাও ঐ সকল সংগ্রহ করিতেন। প্রত্যেকে স্ব স্ব অধিকারে শাস্তি স্থাপন, কয়, গুহ প্রভৃতি প্রেরণ করিয়া উচিত অংশ রাজকূলে প্রেরণ করিতেন; অবধারিত অংশ রাজাস্বত্বসম্মতে গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের অধীন শাস্তিরক্ষকেরা গ্রামের চৌর্গাদির প্রতীকায় করিত। গ্রামপতি প্রত্যেকের অসম্মত হইলে, উচ্চতর অধিকারীক সাহায্য পাইতেন। প্রাদেশিক শাস্তিরক্ষকগণ সর্গাজ পূর্ণাবেক্ষণ করিতেন। সর্গাপাল পণের শাস্তিরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। স্বীয় মণ্ডলে সামন্তরাজ অশান্তি নিবারণ করিতেন। ইহারা সকলে অশান্তিবারণে অক্ষম হইলে, স্বয়ং নৃপতি স্ব-শাস্তির দ্বারা ভয়াদির গ্রহণের চেষ্টা করিতেন। গ্রামপতি, দিক্‌পাল, সর্গাপাল, সামন্ত, বে কেষ

স্বকাৰ্যসাধনে অক্ষম হইত্ন না কেন, রাজ-শাসনে সকলেই প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতে (স্ব স্ব অধিকার ক্ষেত্রে) বাধ্য ছিলেন। কোনও মতে নিরীহ প্রজার অপচয় না হয়, শাস্তিরক্ষকেরা অমনোযোগ, উদাসীন্য, উপেক্ষা প্রভৃতি না করেন, একন্য তাঁহাদেরও দণ্ড বিধানের ব্যবস্থা। কোণায় কৃতসর্কস নিরপরাধ প্রজা শাস্তিরক্ষকের পূজা-পরিচর্যা জন্য ঋণ করিতেছে, আর কোণায় বা শাস্তিরক্ষক প্রজার তত্ত্বর সঞ্চালন করিয়া অপকৃত জ্রবা আনয়নে অক্ষম হইরা, স্বীয় সক্ষমত অথ দ্বারা প্রজার ক্ষতিপূরণ করিতেছেন! অধীনে ও নবীনে এই পার্থক্য।

শাস্তিরক্ষকের অধিকার ক্ষেত্রে যদি চৌর্গাদি উপস্থিত না হয়, তবে তিনি রাজকূলে পুরস্কারভাগী হইতেন। ইহাই প্রাচীন আর্থ-প্রথা। শুনিয়াছি, পাশ্চাত্য দেশের কোনও বৃহত্তর রাজ্যে প্রথা আছে, যে ৫২৭৪ রাষ্ট্র গৌড়ার অল্পতা থাকে, সে বর্ষে রাষ্ট্রীয় বাহ্য-বিধানকর্তৃগণ পুরস্কৃত হন। এরূপ হইলে, অধিবাসনের বসার্থ মর্যাদা সক্ষম হয়। শাস্তিরক্ষক স্বীয় অক্ষমতার প্রামাণিকত্বরূপ চৌরকৃত জ্রবা গৃহস্থকে প্রদান করিতে বাধ্য হইবেন, ইহা কত উচ্চতর সভ্য সমাজের ধরণ, তাহা আধুনিক শিক্ষিতগণ চিন্তা করিয়াছেন কি? শুধু এই পর্য্যন্ত নয়, যদি রাজা স্বয়ং চৌর সংগ্রহে সক্ষমকাৰ্য্য হন, তবে তিনি নিজ কোষ হইতে প্রজাকে অর্থ দিতে বাধ্য। কি স্বল্পর সম্ভার প্রথা! গৌতমের ধর্ম শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়—

চৌরহৃতমবজিতা যথাস্থানং গম-
য়েৎ স্বকোষান্না দদ্যাৎ ।

রাজ্য হৃত জয়া প্রাপ্ত হইয়া বণাস্থানে পাঠাইবেন । যদি চৌরোদ্ধারে অশক্ত হন, নিজ কোষ হইতে প্রজাকে প্রদান করিবেন । এক্ষণ রাজ্য কি মানব না দেবতা ? এক্ষণ রাজতন্ত্রে কি প্রজা স্বধী না অস্বধী ? এক্ষণ রাজশক্তির আশ্রয়-ছায়ার নিহিগিষ্টে এনার্কিষ্ট, সোসিয়ালিষ্ট, টোরোরিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন নামধারী বিপ্লবকারীদের আবির্ভাবের সম্ভাবনা কোথায় ? এক্ষণ রাজ্যকে যে প্রজা পরমেশ্বরের প্রতিনিধি মনে করে না, সে সত্য সত্যই হৃদয়হীন ।

চৌর-সংগ্রহের চৌরিত জয়া লাভের এক্ষণ ব্যবস্থা থাকায়, চৌর্যবৃত্তি সমাজে অন্নই আদিপিতা বিস্তার করিতে পারিয়াছিল; তাই প্রাচীনকালের একজন হিন্দু নৃপতি গর্ভ করিয়া বলিয়াছেন—

ন মে স্তেনোজনপদে ন কদর্যো
ন মদ্যপঃ ।

ন নাস্তিকঃ নানৃতীচ ন সৈরী
নাপি সৈরিণী ।

আমার জনপদে চোর নাই, কদর্য নাই (১) মদ্যপ নাই, নাস্তিক, মিথ্যা-

(১) আশ্বানং ধর্মকৃত্যক পুত্রদারাম্ভ পীড়য়েৎ । মোতাদ্য যঃ পিতরৌ ভৃত্যান্ স কদর্য ইতি স্মৃতঃ । যে পাপী ব্যক্তি নিজেকে, ধর্ম-কর্মকে, পুত্র, দারী, পিতা, মাতা, ভৃত্য প্রভৃতিকে মোত বশতঃ পীড়ন করে, সে “কদর্য” নামে অভিহিত হয় । বেদধর্মগীতক, সে যে পক্ষান্তরে আশ্বগীতক, তাহাতে স্বধীগণের সংশয় হয় না ।

বাদী নাই, বৈরী (যথেকাচারী) নাই, সৈরিণী বা ভ্রষ্টা নারী নাই । “ন নাস্তিকঃ নানৃতীচ” স্থানে অনেকে “নানাহিতা-মিনারজা পাঠ করেন, তাহার অর্থ এই যে, বাহার অস্বাধান করে নাই বা মজ্ঞ করে নাই, এক্ষণ ব্যক্তি আমাব জনপদে নাই । এক্ষণ রাজ্য কি ভুলগে নন্দন-কাননের পারিজাত-পরিমল বিস্তার করে না ? জ্ঞান, শিক্ষা, মনুষ্যত্বের বিকাশ বা ধর্মবুদ্ধি সমাজে কুকায়ের সংখ্যা হ্রাস করে । প্রথর শাসন, প্রথর পীড়ন, কঠোর দণ্ড, তীব্র তিরস্কার, তীতিপদর্শন সমাজে নৈতিকতা আনয়নে সম্যক কৃতকার্য হয়না । জ্ঞানের বিস্তার, ভ্যাগের—মহত্বের শিক্ষা, ধর্মের অনুষ্ঠান সমাজে পাবিত্যায় পুষ্প-বৃষ্টি আনয়ন করে ।

বৈদেশিক পর্যাটক সেই আর্থা সম্ভাভান সমাধি আশানে দগ্ধাধমান হইয়া যে দিন বলিয়া ছিলেন, ঈশ্বর শিক্ষায় ভারতীয়গণ মনুষ্যত্বের উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছেন । সমাজে চৌর্য নাই গৃহদ্বার অর্গলে উন্মুক্ত, গৃহস্থ শান্তিতে নিঃশঙ্কভাবে নিদ্রা বাটতেছে । প্রশস্ত রাজপংখ স্বর্ণালকার গতিত থাকিলেও কেহ তাহা গ্রহণ করেনা । কেবল রাজপুরুষগণ জয়া-স্বামীকে জামাই-বার উদ্দেশ্যে পটহ বোগে জনপদে সংবাদ ঘোষণা করে । বিবাদ-বিস্বাদের সংবাদ পাওয়া যায় না । প্রবন্ধনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া দুকর । দেশের সর্বত্র শান্তির সুবর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত । এ কর্না কি আনন্দের মঙ্গলবার্তা আনয়ন করে না ? এক্ষণ সমাজ কে না প্রার্থনা করে ?

সমাজ এত উন্নত, এত শিক্ষিত, এত সংঘত যে, নৈন্দোশক পর্য্যটকের চক্ষুঃ বিরলতম চৌধা প্রবন্ধাদির নিকৃতকক্ষে প্রবেশ করিতে পারে নাই। সে সমাজে ভ্রম ছিল, কিন্তু এত বিরল যে সমাজ-দর্শকের—দেশপর্থাটকের অঙ্গদ্বান সে পর্য্যন্ত পৌছায় নাই। প্রাচীন ও নূতনের তুলনার—অতীত ও বর্তমানের আলোচনার আমরা বুঝিতে পারি, আমরা কি চাই, আমাদের অভাব কোথায়? জাতীয় জীবনের এই অভাব মোচন প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শ্রী--ভারতী।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি ?

(পূর্ণাঙ্গুত্তি।)

—:~:~:~—

যদি বিশ্ব কতকগুলি অপরিবর্তনীয় নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়, যদি কার্য-কারণের সৰ্ব্ব অপরিবর্তনীয় হয়, তাহা হইলে তত্ত্বের স্থান কোথায়? এট প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, তত্ত্ব জিনিষটা কি, তাহা সৰ্ব্ব প্রথমে আলোচনা করা উচিত। পরা অঙ্গুত্তিকেই তত্ত্ব আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। পিতৃতত্ত্ব, মাতৃতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, রাজতত্ত্ব ইত্যাদি স্থলে আমরা তত্ত্ব শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া থাকি। স্থলবিশেষে অঙ্গুত্তি অন্য প্রকার আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুত্রের প্রতি যে অঙ্গুত্তি, সেই অঙ্গুত্তিকে আমরা বাৎসল্য আখ্যা দিয়া থাকি। ঐ প্রকার পায়ে

ভেদে এক অঙ্গুত্তি বিস্তার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে আমার চেয়ে বড়, তাঁর প্রতি অঙ্গুত্তি সাধারণতঃ তত্ত্ব শব্দের দ্বারা, যে আমার সমান, তাঁর প্রতি অঙ্গুত্তি প্রেম শব্দের দ্বারা, যে আমার ছোট, তাঁর প্রতি অঙ্গুত্তি মেহ শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। গুরুজনের প্রতি যে অঙ্গুত্তি, তাহা তত্ত্ব শব্দের দ্বারা সূচিত হইলেও, শাস্ত্রকারেরা তত্ত্ব শব্দের দ্বারা কেবল ঈশ্বরাত্ত্বি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শাণ্ডিল্য কহিয়াছেন—“স। পরা অঙ্গুত্তি ঈশ্বরে” অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি যে পরা অঙ্গুত্তি তাহাই তত্ত্ব। পরা অঙ্গুত্তি কাহাকে বলে? যে অঙ্গুত্তি অবিচলিত—অর্থাৎ সহজে টলিবার নহে, তাহাকেই পরা অঙ্গুত্তি বলা যাইতে পারে। তুমি সত্যবাদী, সত্যের প্রতি তোমার অঙ্গুত্তি পরা। সম্পদে বিপদে তুমি কখনও সত্য হইতে ত্রুট হইনা, সত্যই তোমার অতীষ্ট দেবতা, বন্ধু ও নেতা; সত্যই তোমার ঈশ্বর। সৰ্ব্বশাস্ত হইলেও তুমি কখনও সত্যের আশ্রয় ত্যাগ করিবে না; সহস্র বিপদেও সত্যই তোমার ঐকমার্জ শান্তিবাতা। সত্যের কোন তৈলচিহ্ন নাই, আলোক-চিহ্ন নাই, কোন প্রস্তর-স্মৃতি নাই, অথচ সত্যের সত্তা তুমি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পার। সত্য পুরুষবিশেষ না হইলেও, সত্যের নিকট তোমার সন্তক সৰ্ব্বদাই অবনত। বাহাকে আমরা দয়া বলি, তাহার কোন সন্তক আমরা দেখিতে পাইনা। অথচ দয়া কি, তাহা আমরা লক্ষ্যেই বুঝি এবং দয়ালু হইতে চেষ্টাও করি। আর একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে

দেখিতে পারিবে যে, সত্য, দয়া প্রভৃতির
যে কেবল সত্তা আছে, তাহা নহে, তাহা-
দের বাহু সূত্রও আছে। এক ব্যক্তি
নৃশংস, আর এক ব্যক্তি দয়ালু; নৃশংস
ব্যক্তিকে দেখিলেই তুমি বলিতে পারিবে
যে এ দয়ালু নহে। যদি দয়া ও নৃশংসতার
বাহু বিকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কোন্
ব্যক্তি নৃশংস, কোন্ ব্যক্তি দয়ালু, তাহা
তাহাদিগকে দেখিয়া বুঝা যাইত না।
ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; দেখি
কি? না তাঁহার নিরম। সেই নিরম অপরি-
বর্তনীয়। সেই নিরমই তাঁহার স্বরূপ।
সেই নিরমই তাঁহার বহির্বিকাশ। সেই নিরম
আমি সর্বত্র সব সময়ে দেখিতে পাঠি।
সেই নিরম আমি সর্বত্র এবং সর্বকালে
সেবা করিতে পারি। আপদে বিপদে
আমি সর্ব সময়েই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ
করিতে পারি। সেই নিরমের প্রতি অচলা
ভক্তিই নিরন্তর প্রতি অচলা ভক্তি। রাজার
প্রচারিত নিরম প্রতিপালন করাই রাজ-
ভক্তি। পিতৃ, মাতৃ শ্রুত আদেশ বা উপ-
দেশ প্রতিপালন করাই পিতৃ, মাতৃ বা
শ্রুতভক্তি। নৈকবেরা বলেন যে, নামে
ও নামীতে কোন ভেদ নাই। যেই কুক—
সেই কুকনাম। ইহার অর্থ কি? ইহার
অর্থ এই যে, শুণ ও ভগীতে—নিরম ও
নিরমতাতে কোন ভেদ নাই। শ্রীকৃষ্ণ নাই—
অপচ আছে। আছে কোথায়? পীতায়।
খুঁট নাই; আছে কোথায়? বাইবেলে।
বুদ্ধবৎ নাই; আছে কোথায়? ধর্মপদে।
একজন যদি কেবল মুখে বলে যে, সে
কুককে, খুঁটকে বা বুদ্ধকে ভক্তি করে,

অপচ তাঁহাদের উপদেশ অমান্য করে,
তাহা হইলে কি তাহাদিগকে কুক-খুঁট
বা বুদ্ধ-ভক্ত বলবে? ঈশ্বরের সত্তা
কোথায়? না তাঁহার নিরমে। সেই নিরম
বিশ্বজনীন এবং অপরিবর্তনীয়। সেই নিরম
অবশ্যই হইয়া, তাঁহার প্রতি একান্ত অমু-
রক্তিই ঈশ্বরামুরক্তি পা ভক্তি।

(ক্রমশঃ)

শান্তিন্যাস সূত্র

বা

ভক্তিসমীমাংসা।

—:~:~:~:—

- অপাত্তে ভক্তিজিহ্বাসা ॥ ১
না পরমাত্মরক্তিরীশ্বরে ॥ ২
তৎসংস্থাসুততোপদেশাৎ ॥ ৩
জ্ঞানমিতি চেম বিষতোহপি জ্ঞানসা
ভবনংস্থিতে ॥ ৪
ভয়োপকরাস ॥ ৫
যেব প্রতিপক্ষভাবাৎ রসশকাচ্চ রাগঃ ॥ ৬
ন ক্রিরাঙ্কতানপেক্ষণাজ্ঞানবৎ ॥ ৭
অতএব ফলানন্ত্যাম্ ॥ ৮
তবতঃ প্রপত্তিশকাচ্চ ন জ্ঞানমিতর-
প্রপত্তিবৎ ॥ ৯
সামুখ্যোত্তর্যাপেক্ষিবাৎ ॥ ১০
প্রকরণাচ্চ ॥ ১১
দর্শনফলমিতি চেম তেন ব্যবধানাৎ ॥ ১২
খুঁটাকাচ্চ ॥ ১৩
অতএব ভবভাবাবল্লবীনাং ॥ ১৪
ভক্ত্যা জানাতীতি চেমাত্তিভক্ত্যা সাহা-
য্যাৎ ॥ ১৫

প্রাপ্তকং চ ॥ ১৬
 এতেন বিকল্পোহপি প্রভাতঃ ॥ ১৭
 দেবত্মিনিত্তরশ্মিন্ মাণ্ডল্যাৎ ॥ ১৮
 যোগদুঃস্বার্থমপেক্ষণাৎ ধরাজবৎ ॥ ১৯
 গোপা তু সমাধিসিদ্ধিঃ ॥ ২০
 চেন্ন রাগধাদিতি চেন্নোত্তমাস্পদত্বাৎ সঙ্গ-
 বৎ ॥ ২১
 তদেব কশ্মিরজানিয়োগিত্য আধিক্য-
 শকাৎ ॥ ২২
 প্রাশ্ননিকপণাত্মাদাধিক্যসিদ্ধিঃ ॥ ২৩
 নৈব শ্রদ্ধা তু সাধারণ্যাৎ ॥ ২৪
 তস্যাং তেষে চানবস্থানাৎ ॥ ২৫
 ব্রহ্মকাণ্ড তু ততো তসামুজ্জায় সামা-
 ন্যাৎ ॥ ২৬
 বুদ্ধিতেতু পরিত্তিরাবিশুদ্ধেবপাতবৎ ॥ ২৭
 তদঙ্গনাং চ ॥ ২৮
 তাতৈনধ্বৰ্যাপরাং কাশাপঃ পরত্বাৎ ॥ ২৯
 অত্মৈকপরাং বাদরাধণঃ ॥ ৩০
 উত্তরপরাং শাণ্ডিলাঃ শঙ্কোপপত্তিত্যম্ ॥ ৩১
 নৈবমাদিসিদ্ধিসিদ্ধি চেন্নোত্তমানবদৈবশি-
 ট্যাৎ ॥ ৩২
 ন চ ক্লিষ্টঃ পরঃ সাদনস্তরঃ বিশেষাৎ ॥ ৩৩
 ঐশ্বর্যঃ তথেষি চেন্ন স্বাভাব্যাৎ ॥ ৩৪
 অপ্রতিবিদ্ধং পটৈশ্বর্যঃ তত্ত্বানাচ্চ নৈব-
 মিত্তরেবাম্ ॥ ৩৫
 সৰ্বানুতে কিসিতি চেটৈনবষুড্যানস্ত্যাৎ ॥ ৩৬
 প্রকৃত্যস্তরালদৈবকার্য্যঃ চিংগস্তেনানুস্বৰ্ভ-
 মন্যাৎ ॥ ৩৭
 তৎপ্রতিষ্ঠা গৃহীতবৎ ॥ ৩৮
 নিধোহপেক্ষণাহুভরম্ ॥ ৩৯
 চেত্যা চিত্তোৰ্ণ তৃতীরম্ ॥ ৪০
 বুকৌ চ সম্পরমাৎ ॥ ৪১

শক্তিধ্বান্নতং বেদাম্ ॥ ৪২
 তৎ পরিশুদ্ধিত গম্যা লোকবল্লিলেভ্যঃ ॥ ৪৩
 সম্মানবহমান প্রীতিবিরহেত্তরবিচিৎসাম-
 হিমখ্যাতি তদর্থপ্রাণস্থানতদীরতা সর্ব-
 তত্ত্বাবাপ্রাতিকুল্যাধীনি চ স্বয়মপেভ্যো
 বাহুল্যাৎ ॥ ৪৪
 দেবাদরস্ত নৈবম্ ॥ ৪৫
 তদ্বাক্যশেষাৎ প্রোচ্ছর্ভাভেবপি সা ॥ ৪৬
 জন্মকশ্মিরশ্চাজন্মশকাৎ ॥ ৪৭
 তচ্চ দিব্যং স্বশক্তি মাজ্জোত্তবাৎ ॥ ৪৮
 মুখাং তস্য হি কারুণ্যম্ ॥ ৪৯
 প্রাপিত্তিন্ন বিতৃত্তিবু ॥ ৫০
 ত্যতরাজসুসবরোঃ প্রতিবেদাচ্চ ॥ ৫১
 বাসুদেবেৎপীতি চেন্নাকারমাত্রত্বাৎ ॥ ৫২
 প্রোত্তিত্তিচ্চানাচ্চ ॥ ৫৩
 বুদ্ধিবু শ্রেষ্ঠেয়ন তৎ ॥ ৫৪
 এবং প্রসিক্বেচু চ ॥ ৫৫
 তক্ত্যা তজ্জনোপসংহারাদৌগ্যা পরা বৈত-
 ক্তত্বাৎ ॥ ৫৬
 রাগার্থপকৃতিসাহচর্য্যাচ্চেত্তরেবাম্ ॥ ৫৭
 অন্তরালে তু শেবাঃ স্যুরূপাস্যাদৌ চ
 কাণ্ডত্বাৎ ॥ ৫৮
 তাভ্যঃ পাবিত্র্যামুপক্রমাৎ ॥ ৫৯
 তাসু প্রাধানযোগাৎ ফলাধিক্যমেকৈ ॥ ৬০
 নান্নেতি জৈমিনিঃ সন্তবাৎ ॥ ৬১
 অত্রাজপ্রয়োগিনাং বধাকালসম্ভবগৃহাদি-
 বৎ ॥ ৬২
 ঐশ্বরতুট্টৈরেকেহপি বনী ॥ ৬৩
 অবচ্ছোহর্ষণস্য মুখম্ ॥ ৬৪
 ধ্যাননিয়মস্ত দৃষ্টসৌকর্য্যাৎ ॥ ৬৫
 তদ্যজিঃ পুজারানিত্তরেবং নৈবম্ ॥ ৬৬
 পাদোদকং তু পাদ্যদব্যাপ্তেঃ ॥ ৬৭

স্বয়মর্ষিতঃ গ্রাহমণিবেশনাং ॥ ৬৮
 নিমিত্ত শ্রাব্যাপক্কাদপরাধেষ্ণু ন্যনহা ॥ ৬৯
 পত্রাদেদার্মন্যথা হি নৈশিষ্টাচ্ ॥ ৭০
 অকৃতজ্ঞানাং পরহেতুকবাচ্ ক্রিয়ান্
 শ্রেয়স্য ॥ ৭১
 গোপাঃ শ্রেয়বিষয়িতরেণ স্তত্বার্থহাং সাহ-
 চর্যাম্ ॥ ৭২
 বহিরন্তরস্থভূতসমনেষ্টিসবৎ ॥ ৭৩
 স্মৃতিকীর্ত্তোঃ কথাশেষেচাত্তৌ প্রায়শ্চিত্তা-
 ভাবাৎ ॥ ৭৪
 ভূয়মানমুষ্টিতিরিত্তি চেদাপারায়ণ্যুপসং-
 রায়হৎসপি ॥ ৭৫
 লক্ষ্মণি তক্তাধিকারে মহৎক্ষেপকম্পয়গর্ব-
 হানাৎ ॥ ৭৬
 তৎ স্থানস্থানন্যাপর্গঃ স্থলে বাণীবৎ ॥ ৭৭
 অনিন্দ্যরোনাধিক্রিতে পারম্পর্যাং সামা-
 ন্যবৎ ॥ ৭৮
 অতো স্থনিপক্কাভাবান্যপি তল্লোকৈ ॥ ৭৯
 ক্রমৈকপত্ন্যপত্তেস্ত ॥ ৮০
 উৎক্রান্তিস্মৃতিবাক্যশেবাচ্ ॥ ৮১
 মহাপাতকিনাং স্বার্থৌ ॥ ৮২
 সৈবাত্তর্ভাবমীতার্থপত্যভিজ্ঞানাৎ ॥ ৮৩
 পরাঃ কৃষ্টৈব সর্বৈবাং তথাহাহ ॥ ৮৪
 তজনীয়েনাধিতীয়মদং কুংহস্য তৎস্বক-
 পাৎ ॥ ৮৫
 তচ্ছক্রির্মার্য জড় সামান্যাৎ ॥ ৮৬
 ব্যাপকত্বাধ্যাপ্যানাম্ ॥ ৮৭
 ন প্রাবিবৃদ্ধিতোহিসম্ভবাৎ ॥ ৮৮
 নির্ধারোচ্চাবৎ শ্রুতীশ্চ নির্ধীমীতে পিতৃ-
 বৎ ॥ ৮৯
 মিত্রোপদেশান্তেতি চেন্ন স্বয়ভাৎ ॥ ৯০
 কলমস্বাধারারণো দৃষ্টবাৎ ॥ ৯১

ব্যুৎক্রবাদপায়ত্বেণা দৃষ্টম্ ॥ ৯২
 তদৈক্যাং নানাটৈবকমুপধিময়োগহানাদা-
 দিত্যবৎ ॥ ৯৩
 পৃথগ্বিত্তি চেন্ন পরেণাসম্বন্ধত্যাং প্রকাশ-
 নাম্ ॥ ৯৪
 ন বিকারিণস্ত কারণবিকারাৎ ॥ ৯৫
 অনন্যভক্ত্যা তদ্বুদ্ধিবুদ্ধিলয়াদত্যস্তম্ ॥ ৯৬
 আয়ুষ্টিরমিতরেদাঃ তু হানিসনান্যাদভ্যৎ ॥ ৯৭
 সংস্থিতরেদাভক্তিঃ স্যাগ্নাজ্ঞানাৎ কারণা-
 দিক্বেঃ ॥ ৯৮
 জীণ্যোবাং শেন্জাণি শকলিকাকভেদাঙ্-
 জবৎ ॥ ৯৯
 আধিত্তিরোভাব বিকারাঃ স্থাঃ ক্রিয়-
 কলমস্বোপাৎ ॥ ১০০

প্রথম সূত্র—অপ শব্দের সাধারণ অর্থ
 অনন্তর। বেদান্তসূত্রে অপ শব্দের অর্থ
 এই যে, 'শমদমাদি যট সম্পত্তি' প্রাপ্তির
 পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে। তক্তির
 পক্ষে এ সবেব কিছু প্রয়োজন নাই।
 সূক্তির জন্য তক্তিপক্ষে পাপী পুণ্যবান,
 জ্ঞানী অজ্ঞান, সকলেরই তুল্য অধিকার
 আছে। অপ শব্দের দ্বারা তক্তিপক্ষে
 বাইবার সাধারণ অধিকার স্থচিত হইয়াছে।
 অপ শব্দের দ্বারা যে কারণে তক্তি-
 জিজ্ঞাসা হইতেছে, সেই কারণ স্থচিত
 হইতেছে। বদ্যপিও তক্তি-পণ স্মরণ্য এবং
 উহা দিয়া সকলেরই মোক্ষরূপ গন্তব্য স্থানে
 বাইবার অধিকার আছে, তথাপি তক্তি-
 পণের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ
 থাকায়, ভগবান শান্তিল্য দ্বি তক্তিসূত্র
 রচনা করিয়াছেন।

জানিবান ঈশ্বরক স্নিজ্ঞানো বলে।

সম্পূর্ণ হৃদয়ের অর্থ—বাক্যপ্রাপ্তির জন্য সকলেরই ভক্তিমাৰ্গ অবলম্বন করিবার অধিকার আছে, কিন্তু ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ থাকায়, আমি (অর্থাৎ গ্রন্থকার) ভক্তি সম্বন্ধে আগোচনার প্রবৃত্তি হইয়াছি।

দ্বিতীয় হৃদ—দ্বিতীয় হৃদে ভক্তি কি, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঈশ্বরে পরা—অর্থাৎ অত্যন্ত অমুরক্তিকেই ভক্তি বলে। বিবেক-বিহীন ব্যক্তিদিগের সাংসারিক বস্তুর প্রতি বেরূপ অত্যন্ত অমুরক্তি, ভগবানে যদি তরূপ অমুরক্তি লগে, তাহা হইলে তাহাকে ভক্তি বলা যায়। রূপণের বেরূপ ধনে আসক্তি, প্রেমিকের বেরূপ প্রেমাস্পদের প্রতি আসক্তি, ভক্তেরও ভগবানের প্রতি সেইরূপ আসক্তি। ইহাকেই পরা অমুরক্তি বা ভক্তি বলে। রূপণ ধনের জম্যই ধনকে ভালবাসে, ধনের দ্বারা তাহার আর কিছুই প্রাপ্তির বাসনা থাকে না; ধনের প্রতি তার যে ভালবাসা, তাহা অন্য কিছুই অপেক্ষা করে না। যথার্থ প্রেমিকেরও ঐরূপ। যথার্থ ভালবাসার নিকট স্বার্থ-গন্ধ নাই। ভগবানের প্রতি স্বার্থশূন্য বা নিকাম পরা অমুরক্তিকেই ভক্তি বন্দে। ভোগৈশ্বর্য-বাসনার ভগবানের যে ভজনা, তাহা এখানে আলোচ্য নহে। অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তি শব্দ বাচ্য।

তৃতীয় হৃদ—যে ব্যক্তি ভগবানে নির্ভর করেন (তৎসংস্থস্য ঋপদেশাৎ)—তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইন, শ্রুতিতে এইরূপ উপদেশ আছে। ভগবানের প্রতি ইহার সংস্থা বা নির্ভর; তিনি কোন কল আকাঙ্ক্ষা

করেন না; কিন্তু যে কার্যের যে ফল, তাহা অবশ্যস্বাভাবী। শ্রুতি বলেন যে, ভগবানে নির্ভর করিলেই অমৃতত্বপ্রাপ্তি হইবে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে—“অমৃতত্বং ফলমু-পদিশাতে।” শান্তিল্য ঋষি এই শ্রুতির স্মরণ করিয়াই তৃতীয় হৃদ রচনা করিয়াছেন। বেদান্তহৃদয়ের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের সপ্তম হৃদেও আছে—“তন্নিত্যম্য যোকোপদেশাৎ”।

প্রথম তিন হৃদের বিষয় ব্যাখ্যা—সোক্ষ-প্রাপ্তির জন্ম জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি, এই তিনটি পথ আছে। জ্ঞান ও কর্মমাৰ্গ অপেক্ষা ভক্তিমাৰ্গ সুগম্য। এই পথ এতই সরল ও সমান যে, অন্ধ-খঞ্জ প্রভৃতিও ইহা ধরিলে অনায়াসে অত্যাচ্ছ সোক্ষ-রূপ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইতে পারে। ইহাতে কোন কঠোর তপস্যা করিতে হয় না, সারা জীবন শাস্ত্র পড়িতে হয় না, কর্ম-কাতোপদিষ্ট অসংখ্য যাগ-যজ্ঞাদি করিতে হয় না। ভক্তিশ্রোতে একবার গা ঢালিয়া দিলে, মানব বিনা যত্নে, বিনা ক্লেশে ভবনদী পান্ন হইয়া সোক্ষধামে উপস্থিত হয়। ব্যক্তিগত ইচ্ছা বিসর্জন দিয়া, ভগবানের ইচ্ছার অধীন হইতে পারিলে, জীব অমৃত হয়। তখন সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়, সংসার দুরীভূত হয়, জ্ঞানচক্ষু উদ্বীলিত হয় এবং সর্বাসক্তি এক ভগবানেই কেন্দ্রীভূত হইয়া দাঁড়ায়। সে সময় জীবের যত্ন অতিথ থাকে না, ভগবানে তন্ময় হয়। লগৎ তখন ব্রহ্মস্বর হয় এবং তত্ত্ব আপনা হইতেই বলিয়া উঠেন—“তৎ স্বম্ অস্মি” অর্থাৎ হে জীব! তুমি সেই ব্রহ্ম।

চতুর্থ সূত্র—চতুর্থ সূত্রে জ্ঞানের সহিত ভক্তির পার্থক্য দেখান হইতেছে। “জ্ঞান-মিত্তিচের”, ভক্তি জ্ঞান নহে; কারণ ‘ষিষ-তোহপি’ শব্দরও—“জ্ঞানস্য তদসংস্থিতে, শব্দে জ্ঞানে ভক্তি পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে জানিতে পার, তুমি জানিলেই যে ভালবাস, এমন নহে; আমাকে ভেদে আমাকে ঘৃণাও করিতে পার; সুতরাং জ্ঞান এবং ভক্তি এক হইতে পারে না। ঈশ্বর যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং পালনকর্তা, এ বিষয়ে অনেকের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, তাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি না করিতে পারেন। ভগবানের প্রতি আস্থা জ্ঞান হইতে উদ্ধৃত নহে; উত্তর মূলে ভক্তি।

পঞ্চম সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহা সমর্থনার্থ পঞ্চম সূত্রে আর একটি যুক্তি দেওয়া হইয়াছে। ভক্তির যত আধিক্য হয়, জ্ঞানের তত উপকরণ বা ক্ষয় হয়। ভক্তির পাতকের সহিত যত তোমার সামীপ্য এবং সাহায্য হয়, ততই তাঁহার গহ্বরে তোমার জ্ঞান কমিয়া যায়। যখন তত্ত্বগত হয়, তখন তোমার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকায়, ভক্তির পাতকের জ্ঞান বলিয়া তোমার আর কিছু থাকে না; তখন বিষয়ী ও বিষয়, বর্তী ও কর্তা এক হইয়া যায়। তবু আপনাকে ভুলিয়া ভগবানে নিমজ্জিত হয়। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য শ্রীর পত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিয়াছিলেন যে, “হে মৈত্রেয়ী! দৈতজ্ঞান নষ্ট হইলে কে কাহাকে জানিবে?”

ষষ্ঠ সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহার আর একটি যুক্তি দেওয়া হইতেছে। জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহাদের দ্বন্দ্ব দ্বারাও তাহা

প্রমাণিত হয়। সুখ, দুঃখ, শীত, উষ্ণ প্রভৃতি পরস্পর দ্বন্দ্ব; অর্থাৎ শীতের দ্বন্দ্ব উষ্ণ, সুখের দ্বন্দ্ব দুঃখ। জ্ঞানের দ্বন্দ্ব অজ্ঞান এবং অমুরাগের বা রাগের দ্বন্দ্ব ঘেব এবং ঐ রাগ বা অমুরাগ—যাহা ‘রস’ শব্দের দ্বারা প্রকৃতিতে সূচিত হইয়াছে, তাহা জানাত্মক কোনও শব্দের দ্বারা সূচিত হয় নাই।

ভক্তি ও জ্ঞান এক নহে। পরামু-রক্তির নাম ভক্তি। অমুরক্তি বা রাগের উল্টা শব্দ ঘেব, অজ্ঞান নহে। এক ব্যক্তি অন্যকে জানিতে পারে, অথচ তাহার প্রতি ঘেব করিতে পারে; কিন্তু একজন অন্য একজনকে ভালবাসিবে, অথচ ঘৃণা করিবে— ইহা হইতে পারে না। এই অমুরাগ তৈত্তিরীয় প্রকৃতিতে ‘রস’ শব্দের দ্বারা সূচিত হইয়াছে—“রস হেচায়ং লক্ষ্মানন্দীভবতি।”

সপ্তম সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহা সপ্তম সূত্রে আর একটি যুক্তির দ্বারা সম-র্থিত হইয়াছে। জ্ঞান জিরাকৃত্য-সাপেক্ষ। ভক্তি তোমার কাণ্যের উপর নির্ভর করে না। সুতরাং জ্ঞান ও ভক্তি অর্জনের উপায় স্বতন্ত্র। ভক্তির প্রকৃতি বিচিত্র। সর্পদাই আমরা দেখিতে পাই, একজন একজনকে ভালবাসে, কিন্তু কেন যে ভালবাসে, সে তাহার কারণ বলিতে পারে না; ঐরূপ অনেক সময় আমরা অন্যকে যে ভালবাসি না, তাহার কারণও বলিতে পারি না। ভক্তির মূলে যে গুঢ় রহস্য রহিয়াছে, তাহা কেবল ভক্তরাই বুঝিতে পারেন।

অষ্টম সূত্র—অষ্টম সূত্রে বলা হইয়াছে— ভক্তির কল অনন্ত বা অসীম। ভক্তির

শ্রোতে পাই তাহাইরা দিলে তুমি বে
 কোথায় যাবে, তাহা তুমি নিজেই জান না।
 প্রেমাসুত পান করিয়া তজ্জের বে দশা
 হয়, তাহা তাঁহার ব্যক্ত করিবার সাধ্য
 নাই। তিনি আপনাতেই আপনি ভোর
 হইয়া থাকেন। তখন সগৌম কোন
 বস্তুই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে না।
 যিনি একবার অগৌম রাজ্যের সংশ্রবে
 আসিয়াছেন, সগৌম রাজ্য তাঁহাকে
 কি প্রকারে সম্বলিত করিবে? প্রতি বলেন,
 'বৎ জ্ঞান তৎ সুখং, নাহ্নে সুখমস্তি।' ব্রহ্ম
 ভিন্ন সুখতে সকলই অর, অর প্রাপ্তিতে
 সুখ নাই। সুখ নাই কেন? না তোমার
 মধ্যে যে অগৌম বস্তু আছে, তাহা সগৌমে
 লস্কট হইতে পারে না। তুমি যদি অদ্য
 সনৎ পুণ্ডরীকগুণের রাজা হও, তাহা
 হইলে চন্দ্রলোক, সূর্যালোক প্রভৃতির
 রাজ্যের জন্য কল্যাণ তোমার লাগনা হইবে।
 তোমার অভ্যন্তরে যে অগৌম বস্তু আছে,
 উহা অগৌম বস্তু প্রাপ্ত না হইলে কিছুতেই
 তৃপ্ত হইবে না। সুতরাং সগৌম বস্তু দ্বারা
 সম্বোধনের আশা নাই। হে জীব! সগৌম
 ভোগ করিয়া অগৌমের দিকে নেত্রপাত
 কর। ভক্তি-সুখা পান কর, ভক্তিই
 তোমাকে অনারাসে পশুনা স্থানে লটকা
 বাইবে। জ্ঞান গুরু; তুমি বেদ-বেদান্ত
 প্রভৃতি সৰ্ব্ব শাস্ত্রবেত্তা হইতে পার, কিন্তু
 তোমার চির জীবন ধ্রুবে বাইতে পারে।
 ভক্তির রাজ্যে সুখ নাই।
 নবম সূত্র—জ্ঞান যে ভক্তি নহে, তাহা
 নবম সূত্রে আছে একটি ভক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাত
 হইয়াছে। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে উদ্যোগ

শ্রোতে আছে—'বহুনাং জন্মানান্তে জ্ঞানবান
 বাৎপ্রাপদাতে। বাসুদেবঃ সৰ্ব্বমিতি স মহাত্মা
 সুহৃৎভঃ।' অনেক জন্মের অন্তে, জ্ঞানবান
 আমাদের প্রাপ্ত হয়। সকলই বাসুদেব,
 যিনি এই তত্ত্বজ্ঞানীপন্থার উপনীত হইয়াছেন,
 এইরূপ মহাত্মা সুহৃৎভঃ। শান্তিগ্য যিনি
 বলেন যে, ভক্তিতেই মুক্তি, সুতরাং জ্ঞানে
 মুক্তি হয়, এরূপ সমুদায় ভক্তের অর্থোক্তিকতা
 তিনি দেখাইয়াছেন। গীতার শ্রোতে—
 জ্ঞান দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়,
 এরূপ যদি তর্ক হয়, নবম সূত্রে
 যিনি তাহাই সীমাসী করিয়াছেন। তিনি
 বলেন যে "প্রপত্তি" শব্দ জ্ঞান বিষয়ে
 ব্যবহার কর, ভক্তি বিষয়ে হয় না। যথা—
 'কাটনৈষ্টৈষ্টৈষ্কৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যতেহস্তুদেবতাঃ'
 জ্ঞানের দ্বারা ক্রমে ভক্তি হইতে পারে,
 কিন্তু তদ্বারা মোক্ষ হয় না। গীতাক্ত
 প্রথম শ্রোতে বলা হইতেছে যে, বহু জন্মের
 পর জ্ঞানবান আমাদের পাঠিতে পারে,
 সুতরাং জ্ঞানের সাফল্য রূপ মোক্ষ নহে।
 অর্থাৎ জন্মজন্মান্তরে জ্ঞানী ভক্তি লাভ
 করিয়া মোক্ষ পাঠিতে পারে। ভক্তির
 সাফল্য রূপ মোক্ষ। এই সমুদয় তর্ক ও
 তাহার খণ্ডন সংক্ষেপে সূত্রে নিবদ্ধ
 হইয়াছে। 'ইতর' অর্থাৎ মোক্ষের 'প্রপত্তি'র
 দ্বারা জ্ঞানের 'প্রপত্তি' হয়, উভাতে মোক্ষ-
 প্রপত্তি হয় না। গীতার যে জ্ঞানবান বাহা
 পার, উক্ত হইয়াছে, উহা মোক্ষ নহে;
 কারণ বহু জন্মের আবশ্যক; কিন্তু 'সৰ্ব-
 মিতি' বাসুদেবঃ, তাৎপর্য ব্যক্তি অর্থাৎ
 ভক্ত সুহৃৎভঃ যে জিনিষ দ্বারা মোক্ষের
 বস্তু প্রাপ্তি হয়, তাহা ভক্তি হইতে পারে

না। আর প্রপত্তি শব্দের ব্যবহার মোক্ষ-
বিষয়ক বস্তু ভিন্ন অন্য স্থানেও ব্যবহৃত
হইরাছে। সুতরাং প্রপত্তি শব্দ ব্যবহারেও
জ্ঞান-যে ভক্তি নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল।

দশম সূত্র—ভক্তিই মুখা বা অন্যান্য
পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা অন্যান্য সকল
পথের যাত্রীরই ভক্তি-পথ দিয়া মোক্ষ-
ধামে বাইতে হইবে। প্রেমশূন্য জ্ঞানী
কেবল স্বল্পত তর্কের দাস হইয়া গার
জীবন চুখে যাপন করেন। যোগী প্রেমশূন্য
হইলে কেবল শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিয়া
জীবন-লীলা শেষ করেন। জ্ঞানীই হও
আর যোগীই হও, ভক্তি চাই।* যদি
কর্মের দ্বারা জগতের উপকার করিয়া
মোক্ষধামে বাইতে চাও, তাহা হইলে 'সর্গ-
মিতি বাসুদেব' জ্ঞান চাই; তাহা না হইলে
বিশ্বের জ্ঞাত প্রেম হইবে না, এবং প্রেম
না হইলে, নিকাম কর্ম হইবে না। ফল কথা—
ভক্তি চাইই চাই।

একাদশ সূত্র—একাদশ সূত্রে বলা হই-
তেছে যে—'প্রকরণ' হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা
প্রমাণিত হয়। এখানে যে প্রকরণের
কথা বলা হইয়াছে, উহা ছান্দোগ্য ঋত্বির
সুপ্রসিদ্ধ ঋতি, যথা—

"স রা এষ এবং পশ্যামেবমঘান এবং
বিজাননাস্মরতিরাশ্বক্রীড় আশ্বামিথুন অশ্বা-
নন্দ স বরাড় ভবতি।"

অর্থাৎ যিনি এইরূপ দৃষ্টি করেন, এইরূপ
মনন করেন, এইরূপ জানেন, তিনি আশ্ব-
রতি, আশ্বক্রীড়, আশ্বামিথুন, আশ্বানন্দ
হইয়া বরাট হইয়া। আশ্বা ভিন্ন অন্য
কোন বস্তুতে রতি হইলে মোক্ষ হয় না।

আশ্বরতি, আশ্বক্রীড়, আশ্বামিথুন, আশ্বানন্দ
এ সমূহই ভক্তিবাচক "পশ্যান্, মনান,
বিজানন" এইরূপ দেখে, মনন করে, জেনে,
তবে আশ্বরতি হলে, "বরাট" হওয়া যায়।
বরাট কে? না—সম্ভবতঃ হাত বরাট।
যিনি সম্ভবতঃ প্রকাশমান—অর্থাৎ প্রকাশের
জন্য অন্যের অপেক্ষা করেন না। বিবাহ
ভাবে বস্ত্রই ভগবানের প্রকাশে প্রকাশিত
হয়, ভগবান স্বপ্রকাশ। সুতরাং স্বপ্রকাশ
হইতেও হইলে, অর্থাৎ "ভক্তমানস" অদ-
কারী হইতে হইলে, রতি বা ভক্তি চাই।
জ্ঞানের স্থান নিয়ে। জ্ঞানে ক্রমে রতি
অগ্নিতে পারে, কিন্তু "সর্গমিতি বাসুদেব"
ভাবাপন্ন হইতে হইলে, রতিই চাই, অতএব
ভক্তি সর্গোপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দ্বাদশ সূত্র—দ্বাদশ সূত্রে একাদশ সূত্রের
অর্থ আর একটু প্রস্তুতি করা হইয়াছে।
"পশ্যান্" "মনান" এবং "বিজানন" শব্দ একা-
দশ সূত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। বলা বাইতে
পারে, দর্শন, মনন এবং জ্ঞান দ্বারাই
"বরাট" হওয়া যায়, কিন্তু তাহা নহে;
"দর্শন" আদির ফলে তাহা হয় না, ইহাই
ঋত্বির অংবেশ; কারণ "বরাট" শব্দ হইতে
উহাদের অনেক ব্যবধান হইয়াছে। ভক্তি-
বাচক শব্দের মধ্যে এবং বরাট শব্দের
মধ্যে ব্যবধান না থাকার, স্বাভা-
বিক ভক্তি দ্বারাই হয়, ঋতি ইহাই বলিতেছেন।

ত্রয়োদশ সূত্র—মোক্ষাদি বিবরে ঋত্বির
উপর আর কোন কথা চলে না, তথাপি
খবির বলিতেছেন—মানবজীবনে ইহা দৃষ্ট
হয় যে, জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ।
জ্ঞান ভক্তিপ্রাপ্তির একটি উপকরণ।

সাজ কাহারও সহিত তোমার পারচর হইল, তুমি তাহাকে জানিলে, তাহাকে কেনে তুমি তাহাকে ভালবাসিলে। এখানে 'ভালবাসা' হইল তোমার বাঞ্ছিত বস্তু, আর জ্ঞান হইল উপায় মাত্র। তুমি যাহাকে ভালবাসিলে, তাহাকে অজ্ঞবিস্তর জানা চাইতে চাই; একেবারে যাহার সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, তাহাকে তুমি কখনও ভালবাসিতে পার না। কিন্তু জ্ঞানের পরিণাম যে ভালবাসা হইবে, তাহা নাও হইতে পারে। উহার পরিণাম যে যাহা হইতে পারে।

চতুর্দশ সূত্র—জ্ঞান ভিন্নও যে দোষ হয়, তাহা চতুর্দশ সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বল্লভী বা ব্রহ্মগোপীদের জ্ঞান ছিল না, কিন্তু তাঁহার ভক্তিরাজ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ব্রহ্মগোপীদের কৃষ্ণোপেমা সর্বজনবিদিত। অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মগোপীদের কৃষ্ণোপেমের বিবিধ প্রকার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রন্থাদির সমাগর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া গোপী-প্রেমের নানাবিধ কল্পনিক অর্থ করা হইয়াছে। ভক্তিরাজ্যে গোপীদের স্থান অস্বাভাবিক। স্বয়ং চৈতন্যমাদেব গোপীদিগকে শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। গোপী-প্রেমে কাম-গন্ধ নাই। উহাতে কাম-গন্ধ থাকিলে, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ গোপীদের প্রদর্শিত পথ কখনও অহুমরণ করিতেন না। ভগবানকে বিবিধভাবে আরাধনা করা যায়। “শিতেন পুত্রং সপে-
ব গণ্ডাঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ান্বাহসি দেব সোতুসু”
তাঁহাকে পিতা বলিয়া, সখা বলিয়া, প্রিয়

বলিয়া উপাসনা করা যায়। নন্দ-বশোদা ভগবানের প্রতি পুত্র-বাৎসল্য দেখাইয়া যোগ প্রাপ্ত হইলেন; অর্জুন সখারূপে তাঁহাকে ভজনা করিয়া সংসার-বন্ধন ভিন্ন করেন; উদ্ধব, বিদুর প্রভৃতি তাঁহাকে প্রভু জ্ঞানে দাসরূপে সেবা করিয়া অমৃতত্বের অধিকারী হইলেন; নারদ, সনাতন প্রভৃতি মর্গ্যগণ তাঁহাকে শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানে উপাসনা করিয়া অমর হইয়াছেন। গোপীগণ পতি-রূপে ভগবানের ভজনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবেরা এই ভাবে 'মধুরভান' বলেন। মধুর ভানের অপব্যবহার দেখিয়া উহাকে দোষী করা যায় না। সকল ভাবেরই অপব্যবহার জগতে দৃষ্ট হয়। সর্ব ভাবের মধ্যে মার কথা এই যে, তোমার জীবনের ক্ষুদ্রত্ব, তাঁহার অসীমত্বের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া, তাহার সহিত আপনাকে মিশাইয়া দেও। গোপীরা কৃষ্ণবরী ছিলেন, তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ ছিল না। ইহা ভক্তির পরাকর্ষা।

পঞ্চদশ সূত্র—ভক্তির দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অর্থাৎ ভক্তি যেরূপ উপায় এবং জ্ঞান যে উদ্দেশ্য নহে, তাহা দেখাই-
বার জন্য পঞ্চদশ সূত্র। 'ভক্ত্যা সামভি-
জানাতি যাবানু বশ্চাম্মি তত্ততঃ। ততো
মাং তত্ততো জাহা বিশতে তদনন্তরম্।'
গীতার ষষ্ঠাংশ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোক অরণ
রাধিরা পঞ্চদশ সূত্র রচিত হইয়াছে।
গীতার ঐশ্লোক 'অভিজানাতি' শব্দ আছে।
উচার অর্থ এই যে, যিনি ভক্তি দ্বারা
আমাকে, (আমি কি এবং আমার তত্ত্ব কি,
তাহা) ভাল করিয়া জানেন, তিনি আমার

ভব্ অবগত হইয়া আমাতে প্রবেশ করেন । এ স্থলে অভিজ্ঞান শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । এক বস্তু পূর্বে জানিয়া তাহাকে যে পুনর্বার জানা, তাহাকেই অভিজ্ঞান বলে । প্রথমে ধাত্ত হইতে তুষ বাহির করিয়া ফেলা হয়, পরে ঐ ধাত্ত আবার কুটিলে উহা বিস্তৃত হয় । তক্রিও এই প্রকার । জ্ঞান যাহা আরম্ভ করে, তক্রি তাহা শেষ করে । সুতরাং তক্রির দ্বারা পুনর্বার ভাল করিয়া জানা হয় । জ্ঞান যাহা মোটামুটি জানে, তক্রি তাহা ভাল করিয়া জানিয়া আশ্বাসং করে, এই জন্তেই সূত্রেতে বলা হইতেছে যে, তক্রির দ্বারা যে জানে—অর্থাৎ তক্রি যে জ্ঞানের উপায়, তাহা নহে; কেননা জ্ঞা ধাতু—পূর্বে ‘অভি’ উপসর্গ-প্রয়োগ রহিয়াছে এবং উহার অর্থ জ্ঞাত বস্তু পুনর্বার জানা ।

ষোড়শ সূত্র—ষোড়শ সূত্রে বলা হইতেছে যে, তক্রিই বে উদ্দেশ্য এবং জ্ঞান যে উপায়, তাহা পূর্বে শ্লোকের অর্থাৎ অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৫ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । ৫৫ শ্লোক বলা “ব্রহ্মত্বঃ—প্রগল্ভা ন-শোচতি ন কাঙ্কতি । সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মতক্রিঃ লভতে পরাম্” ব্রহ্মত্বঃ প্রগল্ভা কখন শোকও করেন না, কখন আকাঙ্ক্ষাও করেন না; তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টিমান হইয়া তক্রি লাভ করেন । অতএব তক্রি মুখ্য এবং শ্রেষ্ঠ । জ্ঞান তক্রির একটা উপায় মাত্র ।

সপ্তদশ সূত্র—পূর্বে পূর্বে শ্লোকের দ্বারা জ্ঞান এবং তক্রির মধ্যে যে বিকল্প অর্থাৎ সন্দেহ ছিল, তাহা দূরীভূত হইল, অর্থাৎ

জ্ঞান যে তক্রি নহে, তক্রির একটা উপায় মাত্র, তাহাই স্থিরীকৃত হইল ।

অষ্টাদশ সূত্র—দেবতক্রি ঈশ্বরতক্রি নহে । অগ্ৰান্ত প্রকারের তক্রির সহিত দেবতক্রির উল্লেখ পাকায়—দেবতক্রি এবং ঈশ্বরতক্রি যে এক নহে, তাহা এট সূত্র বলা হইতেছে । ‘শ্বেত অশ্বতর’ শ্রুতিতে আছে—

‘নশ্চ দেবে পরা তক্রির্গণা দেবে তপা শুভৌ । তশ্চৈতে কথিতাঃ স্বর্থাঃ প্রকাশশ্চে মহাত্মনঃ ॥’

অর্থাৎ যাহার দেবে পরা তক্রি এবং যিনি শুক্রেতে ঐ প্রকার তক্রি, মহাত্মাদের মতে তিনি এই সমস্ত ফল প্রাপ্ত করেন । এই স্থানে দেবতক্রি, শুক্রেতক্রির সহিত একত্রে উল্লিখিত হওয়ার, উহা ঈশ্বরতক্রি বুঝায় না ।

উনবিংশ সূত্র—উনবিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে, যোগ প্রযোজের দ্বারা জ্ঞান এবং তক্রি উভয়কেই সাহায্য করে । প্রযোজক নিজে একটা স্বতন্ত্র বাগ নহে । ইহা বাজপের বাগাদির সাহায্য করে মাত্র, সুতরাং কেবল প্রযোজের দ্বারা কেহ কোন ফল পায় না; সাহায্যকারী বলিয়া প্রযোজের প্রয়োজন । শান্তিল্য বলেন যে, যোগও ঐ প্রকার, ইহা জ্ঞান এবং তক্রির সাহায্য করে মাত্র । চিত্তের একাগ্রতা জ্ঞান ও তক্রি, উভয়েরই জন্ত প্রয়োজন ।

বিংশ সূত্র—বিংশ সূত্রে বলা হইতেছে যে, সমাধিসিদ্ধি মুখ্য নহে, তক্রিই মুখ্য, সমাধিসিদ্ধি গোপ । পাতঞ্জল সূত্রে আছে যে, ঈশ্বর প্রণিধানের দ্বারা সমাধিসিদ্ধি হয় । সুতরাং ঈশ্বরপ্রণিধান বদি তক্রি

কর, তাহা হইলে ভক্তি গৌণ এবং সমাধি-
সিদ্ধি মুখ্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই
সুজের দ্বারা শান্তিলা দেবাটরাছেন যে,
ঈশ্বরপরিধান, ইহা ভক্তি নহে, ইহা
কেনন চিত্তবৈর্ষ্যের একটা উপায় মাত্র।
প্রতিপাদন যে ভক্তি নহে, তাহা পাতঞ্জল-
সূত্র হইতেও প্রমাণিত হয়। উহার পঞ্চ-
বিংশ সূত্রে দৃষ্ট হয়—“ক্লেশকর্মবিপাক-
শতৈবপরাশুইঃ পুরুষনিশেষ ঈশ্বরঃ” তৎ-
পরে ছাঁকরণ এবং সাতাইশ সূত্রে উক্ত
হইতেছে—“ওত্র নিরতিশয়ঃ সর্বজ্ঞ বীণম্ ॥
স পূর্ণমপি গুরুঃ কালানাচ্ছেরাৎ ॥” তৎ-
পরে বলা হইতেছে—“তস্ত বাচক প্রণবঃ।
তৎ অপনন্দবর্ধভাবনঃ ॥” অর্থাৎ ক্লেশ কর্ম
আদি দ্বারা অপরাশুই পুরুষবিশেষকে
ঈশ্বর বলা যায়। তাঁহাতে সর্বজ্ঞবীজ
নিরতিশয় ভাবে রহিয়াছে এবং তিনি
কালের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন হওয়ার সকলেরই
গুরু। প্রণব অর্থাৎ—ওকার তাঁহার
বাচক এবং সমাধি প্রাপ্তির জন্ত ঐ
প্রণব পুনঃ পুনঃ জপ এবং পুনঃ পুনঃ
ভাবনা করিতে হইবে। সমাধি বা চিত্তের
স্থিরতার দ্বারা ভক্তির সাহায্য হয় বটে,
কিন্তু ভক্তির অপেক্ষা ইহার স্থান নিয়ে
রহিয়াছে।

একবিংশ সূত্র—একবিংশ সূত্রে বলা
হইতেছে যে, ভক্তি রাগ বা অমুরাগাদিকা
হওয়ার চেহ নহে—কেননা ইচ্ছার আশ্পদ
বা পাত্র উত্তম। যেমন সঙ্গ সাজই দুঃ-
খের নহে; অসংসঙ্গই দুঃখের, তদ্রূপ উত্তম
পাত্রের অমুরাগ হওয়া দুঃখের নহে। যোগ-
শাস্ত্রে অমুরাগাদির দোষ কীর্ণিত হইয়াছে।

অবিজ্ঞা, (অজ্ঞান) অস্মিতা (আমি আছি,
এই জ্ঞান) রাগ বা অমুরাগ, ঘেব এবং
অভিনিবেশ, ইহার সমুদায় ক্লেশ, এ সমুদয়
পরিভাষ্য, কিন্তু শান্তিলা বলেন যে, ভক্তি
অমুরাগাদিকা বলিয়া, উহা পরিভাষ্য নহে।
যেমন অসংসঙ্গ আছে বলিয়া সংসঙ্গ
পরিভাষ্য নহে; পাপের প্রতি অমুরাগই
পরিভাষ্য এবং যোগশাস্ত্রে তাহাকেই
পরিভাষ্য করিতে বলা হইয়াছে।

ষাণ্ণিশ সূত্র—ষাণ্ণিশ সূত্রে বলা হই-
তেছে, কর্মী, জ্ঞানী, যোগী সকলের
অপেক্ষা তত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। ‘শব্দাৎ’ কেননা শাস্ত্রে
এইরূপ উল্লেখ আছে। গীতার উক্ত
হইয়াছে—

তপস্বিত্যোহহিকো যোগী যানিত্যোহপি
মত্যোহহিকঃ।
কো যোগী তস্যাদ্যোগী
ত্বাচ্ছুন ॥

যোগিনামপি সর্বথাঃ মদগতোনাস্তরাশ্রনা।
শ্রদ্ধাবান তজ্জতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ ॥

অর্থাৎ যোগী, তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্মী
হইতে শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী
হও। যোগী দ্বয়ের মধ্যেও যিনি অস্তরাশ্রয়
গতিত সংগত করেন এবং শ্রদ্ধাবান হইয়া
আমাকে ভক্তি করেন, তিনি যুক্ততম।
অতএব দৃষ্ট হইল যে, ভক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

যোগ, কর্ম, জ্ঞান, সকলেই তোমাকে
গন্তব্য পথের দিকে লইয়া যাইবে বটে, কিন্তু
সকল পথই ভক্তির প্রাপ্ত পথে বাইয়া
নিশিরাছে এবং ঐ পথ দিয়া যাইতেই হইবে।
জ্ঞানী অনেক সময় তর্কজালে জড়িত হইয়া
পাড়েন, তপস্বীরা শাস্ত্রীয়িক কষ্ট সাধনকেই
জীবনের চরম উদ্দেশ্য করিয়া লয়, কর্মীরা
কর্মফল প্রাপ্তি না হইয়া অনেক সময় বীত-
শ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, ভক্তির শক্তি অনির্করণীয়;
এপ্রোতে হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া থাকিলে,
ইহা আপনাই হইতেই গন্তব্য স্থানে পৌছিয়া
যেয়। (ক্রমঃ)

ত্রিহরিঃ

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিস্ট্রীকৃত ।)

হিন্দু-পত্রিকা ।



১৪শ বর্ষ, ১৪শ পঞ্চ,
১২শ সংখ্যা ।

চৈত্র ।

১৩১৪ সাল,
১৮২৯ শকাব্দা

শাণ্ডিল্য সূত্র

বা

ভক্তিগীমাংসা ।

(পূর্নামুত্তি ।)

ত্রয়োবিংশ সূত্র—ত্রয়োবিংশ সূত্রে বলা
হইতেছে যে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রমোত্তরের
ধারাও সন্ধ্যস্ত হইয়াছে । গীতার নিম্ন
লিখিত প্রমোত্তরের স্মরণ করিয়া সূত্রকার এ
সূত্র রচনা করিয়াছেন ।

প্রশ্ন—এবং সত্তত্তসূক্তা যে ভক্ত্যাঃ পৰ্ণ-
পাসতে ।

যে চাপ্যকরমব্যক্তং তেবাং কে বোগ
বিত্তমাঃ ॥

উত্তর—ম্ব্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যসূক্তা
উপাসতে ।

প্রদ্বরা পরমোশেতাতে সে যুক্ততমা
মতাঃ ।

যে ভক্তরমনির্দেশমব্যক্তং পৰ্ণ্যপাসতে
গৰ্ভগমচিন্ত্যাং চ কুটস্থমচলং জবম্ ॥
সংনিয়ম্য ইঞ্জিয়গ্রামং সৰ্বজ্ঞ সমবুদ্ধমঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সৰ্বভূতহিতৈ
রতাঃ ॥

ক্লেশাধিকতরস্তেবামব্যক্তাসক্তচেত-
সাম্ ।

অব্যক্তা হি গতিহুঃখং দেহবস্তির-
বাপ্যতে ॥

যে তু সৰ্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি সন্যাস্য
সংপরাঃ ।

জনন্যোঠৈনব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত
উপাসতে ॥

সমুদ্রের সমুদ্রের মূর্ত্যাসংসারগাগরাৎ।

চৈতন্যের চৈতন্যে পার্থক্যমধ্যবেশিত-
চেতনাম্ ॥

প্রশ্ন—যে সততযুক্ত ভক্তেরা তোমাকে উপাসনা করে এবং যাহারা অব্যক্ত এবং অক্ষর ইহাদের মধ্যে অধিক যোগবিৎ কে?

উত্তর—যাহারা আমাতে মন আবেশ করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরা শ্রদ্ধার সহিত আমাকে উপাসনা করেন তাহারাই আমার মতে অধিক যোগবিৎ।

যাহারা নির্দেশবিহীন অব্যক্ত সর্বগম অচিন্ত্য কুটম্ব অচল এবং ধ্রুব অক্ষরকে উপাসনা করেন, তাহারিও ইঞ্জিরগ্রাম সংযম পূর্বক সর্বত্র সমবুদ্ধি হইয়া এবং সর্ব ভূতের হিতে রত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তে যাহাদের চিত্ত আশ্রিত তাহাদের অধিকতর ক্রেশ হয় কারণ দেহী-দিগের অব্যক্ত পথ প্রাপ্ত হওয়া বড়ই দুঃখজনক। যাহারা আমাতে সকল কর্ম অর্পণ করিয়া মৎপর হয়েন এবং অস্ত্রান্ত সর্ব যোগ পরিত্যাগ করিয়া আমারই ধ্যান এবং উপাসনা করেন আমি সেই সকল আমাতে আবিষ্ট চিত্তদিগকে মৃত্যু সংসার গাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করিয়া থাকি।

চতুর্বিংশ সূত্র—ভক্তি শ্রদ্ধা নহে কারণ শ্রদ্ধার প্রয়োগ-সাধারণ ভাবে হইয়া থাকে। কর্মে শ্রদ্ধা গুরুতে শ্রদ্ধা ইত্যাদি শ্রদ্ধা শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রদ্ধা ভক্তি নহে; শ্রদ্ধা ভক্তির সাহায্য করে মাত্র।

পঞ্চবিংশ সূত্র—শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক হইলে অনবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। অনবস্থা কাহাকে বলে? কার্য ও কারণের অবি-

শ্রান্তিকে অনবস্থা বলে। “উপপাত্তো পশাদকমোরবিশ্রান্তিঃ”। গীতা বলে “শ্রদ্ধাবান্ ভক্ততে যো মাং মমে বুদ্ধ তমো মতঃ”। যিনি শ্রদ্ধাবান হইয়া আমাকে ভজনা করেন অর্থাৎ আমাকে ভক্তি করেন তিনিই আমার মতে বুদ্ধতম। এ স্থলে শ্রদ্ধা ভক্তির একটা উপায় মাত্র হুতরাং ইহা ভক্তি হইতে পারে না।

ষড়বিংশ সূত্র—ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তিতে প্রযুক্ত্য কারণ উভয়ই কর্মকাণ্ড এবং জ্ঞান কাণ্ডের পর বিবৃত হওয়ার তাহাদিগের মধ্যে সাদৃশ্য রক্ষিয়াছে। কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্মকাণ্ড ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। সর্বকাণ্ডের শেষেই ব্রহ্মকাণ্ডের কিস্তি হইয়া থাকে। শাণ্ডিল্য বলে যে ব্রহ্মসূত্রের বা বেদান্তের—“অথাভো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়। ব্রহ্মকে জানিবার লক্ষ্য ইহা হইতে পারে না। সকলেই ব্রহ্মকে জানেন। সকলেরই আত্ম জ্ঞান রহিয়াছে, আমি কে ইহা সকলেই জানেন এবং ইহা কেহই মনে করেন না যে আমি নাই, যদি আত্মজ্ঞান না থাকিত তাহা হইলে সকলেই মনে করিত আমি নাই।

আত্মাই ব্রহ্ম—“সর্বস্যাত্মাত্ম ব্রহ্মান্তিৎ-প্রসিদ্ধিঃ। সর্বো হি আত্মান্তিৎ প্রেতেতি, ন নাহসম্মীতি। যদি হি না আত্মান্তিৎ প্রসিদ্ধিঃ স্তাৎ সর্বোলোকে। নাহসম্মীতি প্রতীরাৎ। আত্মাচ ব্রহ্ম—শারীরকভাবাম্। অতএব এই ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা বস্তুরই ভক্তি জিজ্ঞাসা উহা ব্রহ্ম জানিবার লক্ষ্য নহে। ব্রহ্মকাণ্ড এবং ভক্তিকাণ্ড উভয়ই কর্মকাণ্ডের পর বিবৃত হইয়া থাকে।

সপ্তবিংশ সূত্র—যেমন তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ
আঘাত করিয়া বিস্তৃত করিতে হয় তদ্রূপ
ভক্তি ও বিস্তৃতা প্রাপ্ত হইবার পূর্বে
উহাতে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মান চাই।
শ্রবণ কীর্তন মনন এবং ধ্যানাদির দ্বারা
পুনঃ পুনঃ ভয় হইবার চেষ্টা করা চাই
এইরূপ করিতে করিতে ভক্তি বিস্তৃতা
প্রাপ্ত হয়।

অষ্টবিংশ সূত্র—ভক্তির অঙ্গ সমূহেরও
অনুষ্ঠান আবশ্যিক। সম দম, গুরু এবং
শাস্ত্রে শ্রদ্ধা ইত্যাদি ভক্তির অঙ্গ। এ
সমুদয়েরও প্রয়োজন।

উনত্রিংশ, ত্রিংশ এবং একত্রিংশ সূত্র—
কাম্প বলেন যে মুক্তির অঙ্গ ভগবানের
ঐশ্বর্য্য ধ্যান করিতে হইবে অর্থাৎ ভক্তি
ঐশ্বর্য্যপর। বাদরায়ণ বলেন যে ভক্তি
আত্মকপরা অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা
যে ভেদজ্ঞান তাহা নষ্ট করিয়া আত্মচিন্তা
করিতে হইবে। শান্তিল্য শব্দ এবং শ্রুতির
অনুশাসনে বলেন যে ভক্তি উভয়পরা অর্থাৎ
মুক্তি প্রাপ্তির অঙ্গ আত্মচিন্তাও যেরূপ
আবশ্যিক সেইরূপ ভগবানের ঐশ্বর্য্য চিন্তাও
আবশ্যিক।

কাম্প বৈতবাদী অর্থাৎ তাঁহার মতে
ব্রহ্ম ও জীব সত্য। বাদরায়ণ অবৈত-
বাদী, তাঁহার মতে সকলই ব্রহ্মের সূত্র
জীব ও ব্রহ্ম কোন ভেদ নাই। কাম্প
বলেন যে মুক্তি প্রাপ্তির অঙ্গ জীবের
ঐশ্বর্য্য চিন্তা আবশ্যিক। এই সংসার
অর্থে জীব পুনঃ পুনঃ জন্ম যুগ্মর দ্বারা
কিতাচিত হইতেছে, জীবের রূপা ভিন্ন
তাঁহার গত্যন্তর নাই। দীর্ঘদিনতবে

তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া থাক। তাঁহার
গুণ কীর্তন কর সর্বদা তাঁহাকে ধ্যান
কর—তিনি তোমার পাপ বিধোত করিয়া
অমর ধামে লইয়া যাইবেন। তাঁহার রূপাই
তোমার একমাত্র সখল। তাঁহার রূপাই
ভিন্ন তুমি নিজে কি করিতে পার?
তোমার কর্তৃত্বে এ জগতে কোন কার্য্য
সংসাধিত হইতে পার। অস্ত তুমি পৃথি-
বীর অধিপতি হইতে পার কিন্তু এক
মূর্ত্ত মধ্যে তোমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তুমি
পনের ভিখারী হইয়া যাইতে পার। অস্ত যে
ভিখারী আগামী কল্যাণে নুপতি। যোগে,
শোকে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, বা প্রকৃতি বিপ্লবে,
রণে, বনে কোন স্থানেই তুমি কেবল
আত্মনির্ভর করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পার
না। ভগবানের রূপাই তোমার একমাত্র
আশ্রয়। তাহাতে নির্ভর করিয়া পড়িয়া
থাক। তোমার গত্যন্তর নাই। এই হইল
কাম্পের কথা।

বাদরায়ণ বলেন যে সকলই ব্রহ্ম—
“সর্বং খবিনং ব্রহ্ম”। অজ্ঞান বা স্মৃতি
বশতঃই আমরা এই সত্যের উপলব্ধি করিতে
পারি না। আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন
ভেদ নাই। আত্মাই যদি ব্রহ্ম হইল তাহা
হইলে আত্মচিন্তা ভিন্ন অঙ্গ চিন্তা অনাব-
শ্যিক। অতএব স্মৃতি শূন্য ভেদে ফেল
এবং স্বাধীনতার বিস্তৃত বাধু সেবন করিয়া
মুক্তি রাজ্যে উপস্থিত হও।

মুক্তিই উভয়ের লক্ষ্য। কিন্তু একজন
বলেন ভগবানচিন্তা আর একজন বলেন
আত্মচিন্তা মুক্তির অঙ্গ প্রয়োজন। একটু
চিন্তা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে এই

মত্ততদ কেবল কপার সারপেচ। ভগ-
বানই যদি তোমার লক্ষ্য হয় এবং তিনিই
যদি তোমার জীবনের আদর্শ হন এবং
যদি তুমি তোমাকে তাঁহার অধরূপ করিয়া
গঠন করিতে আরম্ভ কর, তাহা হইলে
কালে তোমার ত্যসম্ব উপস্থিত হয়।
তোমার অস্তিত্ব তখন নিখরুণীকৃত অস্তিত্বে
নিমজ্জিত হইয়া যায়। তখন উপাস্ত
উপাসকের ভেদ থাকে না। জীবাত্মা
তখন ব্রহ্ম রূপে ডুবিয়া যায়। বাদরায়ণ
আম্র চিন্তার পক্ষপাতী, স্ক্যানের দ্বারা
আত্মা বিশুদ্ধ করিতে হয়, সোভাবরণ ফেলিয়া
দিতে হয়। অবিষ্টা তিরোহিত হইলে
জীবের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়। জীব তখন
পরম ধামে উপস্থিত হয়।

শাণ্ডিল্য ঋষি এই উভয় মতের মাসঙ্গত
করিয়াছেন। তিনি বলেন জীব ব্রহ্ম
যে ভেদ তাহাও সত্য এবং জীব ব্রহ্ম
যে অভেদ তাহাও সত্য। কপাটা হঠাৎ
কেমন লাগে, কিন্তু একটু বিবেচনা পূর্বক
দেখিলে ইহা অত্যন্ত বুদ্ধিবৃত্ত প্রতীয়মান
হইবে। প্রত্যেক বিষয়ে একটু চিন্তা না
নিত্য সত্য আছে, কিন্তু সে সত্য কি
তাহা আমাদের জানিবার অধিকার নাই।
দেশকাল দ্বারা অনন্যচ্ছিন্ন যে সত্য সে সত্যের
সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই কারণ
আমরা দেশ কালের দ্বারা সীমিত।

আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে এটা
আমাদের পক্ষে সত্য। সমুদয় মতেরই
একটা কার্যকরীত্ব আছে। তুমি বলিলে
সর্বং ধর্মিৎ ব্রহ্ম, সকলেই ব্রহ্ম। কেন
বলিলে? যদি ব্রহ্ম তিন্ন কোন বস্তু স্বীকার

কর, তাহা হইলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকেনা।
অসীমত্বের মধ্যে আর কিছু থাকিতে পারে
না, সুতরাং সকলেই যদি ব্রহ্ম হইল তাহা
হইলে তোমার আত্মাও ব্রহ্ম। তাহা
হইলে জীবের নৈতিক দায়িত্ব থাকিল না।
চোর বলিল যে তাহার কোন দায়িত্ব
নাই, ব্রহ্মই চোর। তর্কে বেশ শুনার
কিন্তু কার্যক্ষেত্রে চলে না। চুরি করিলেই
রাহদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে, কারাগারে
সাইতে হইবে। কার্যক্ষেত্রে তোমার
কার্যের জন্য তুমি দায়ী, ব্রহ্মের দোহাই
দিলে চলিবে না। সুতরাং সে স্থলে জীব
ও ব্রহ্ম পার্থক্য নাথ্য হইয়া স্বীকার করিতে
হয়। জ্যামিতির যে সত্যগুলি আমরা
কপি তাহাও ঠিক সত্য নহে, কারণ
একবারে সমস্তল ক্ষেত্র কৃত্রিমি পাওয়া
যায় না, আর একবারে সমস্তল ক্ষেত্র না
পাওয়া গেলে জিভুঞ্জর তিনটি কোন দুইটি
সমকোণের সমান হইবে না এবং একবারে
সমস্তল ক্ষেত্র না পাওয়া গেলে দুইটি
সমান্তরাল রেখা বর্ধিত হইলে কোন স্থলে
মিলিত হইতে পারে না। একরূপ হইতে
পারে না। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করিতেন
যে পৃথিবী এই বিশ্বের কেন্দ্রে এবং গ্রহ নক্ষ-
ত্রাদি পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে।
আধুনিকেরা বিশ্বাস করেন যে পৃথিবী
সৌর মণ্ডলের একটি গুরু মাত্র এবং সূর্যের
চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। প্রাচীনদিগের
নিকট তাহাদিগের মত অস্বাস্ত সত্য ছিল,
আমাদিগের নিকট আমাদিগের মত অস্বাস্ত
সত্য। কিছু দিন পরে মতান্তর উপস্থিত
হইয়া আমাদিগের মত স্বাস্ত স্থায় করিতে

পারে। স্মরণ্য কোন সত্যই যে চিরকালের
জ্ঞান সত্য তাহা চিরকালের জ্ঞান বলা
যাইতে পারে না। তৎকালীন জ্ঞানের
ধারাই তৎকালীন সত্যের বিচার হয়।
আমার জ্ঞানে যাহা সত্য তাহা আমার
নিকট সত্য। তোমার জ্ঞানে যাহা সত্য
তাহা তোমার নিকট সত্য। কিছুকাল
পরে তুমি আমার মতে আসিতে পার,
আমি তোমার মতে আসিতে পারি।
তুমি আমার ভুল দেখাইতে পার কিংবা
আমি তোমার ভুল দেখাইতে পারি।
কিন্তু অধিকার ভেদে জ্ঞানের তারতম্য
এবং জ্ঞানের ভেদ অনুসারে সত্যের ভেদ
চিরকালই থাকিবে। স্মরণ্য এ কথা
বলা যাইতে পারে যে ব্যবহারিক জগতে
জীবনের অসীম উন্নতি পথে তত্ত্ব অবস্থার
জ্ঞানে যাহা সত্য তাহাকেই সত্য বলা যায়
এবং ক্রমোন্নতি ক্রমে যাহারা উর্দ্ধে অবস্থিত
তাহারাই কেবল নিম্নস্থিতদিগের ভ্রম দেখিতে
পারেন কিন্তু নিম্নস্থিতদিগের জ্ঞানের বাহিরে
কোন কার্য্য করিবার উপায় নাই। এত-
দূরী সর্বাঙ্গ হইলে যে জ্ঞানানুসারেই সত্যের
নির্ধারণ হইয়া থাকে।

বেদান্তের মার্নানাদ চিন্তা করিয়া দেখ।
মার্নানাদে কি বলে? মার্নানাদে বলে—জগৎ
মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য। জগৎ মিথ্যা হইলে
জী, পুত্র, কন্যা, জাতি, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী
সবই মিথ্যা। জগৎ মিথ্যা হইলে গৃহ,
দ্বার, ধন, সম্পত্তি, গো, অশ্ব, হস্তি প্রভৃতি
সকলই মিথ্যা। কিন্তু আজ পুত্রটী মরিল
অমূল্য তুমি শোক বিহীন হইলে। মার্নানাদ
কেবল কথার রহিয়া গেল। আজ একটা

সম্পত্তি নষ্ট হইলে, অমনি তুমি দুঃখে নিমগ্ন
হইলে, মার্নানাদ সেই সময় মনে স্থান প
পাইল না। স্মরণ্য ব্যবহারিক জগতে
মার্নানাদ টিকে না। তবে কি মার্নানাদ
যথার্থই একটা ভুল, তাহাও নহে। অধি-
কার ভেদে হই সত্য এবং অধিকার ভেদে
ইহা মিথ্যা।

ব্যবহারিক জগতে আমরা কি দেখিতে
পাই? আজ যে জিনিষটা জীবনের একমাত্র
লক্ষ্য বিবেচনা করি, আগামী কলাই তাহা
অতি অুকিঞ্চৎকর বলিয়া পরিচায়
করিতেছি। যাহারা দনা ও পাশা খেণি-
য়াছেন তাহারা উপলক্ষ্য করিতে পারি-
য়াছেন যে পার্থিব কোন বস্তুই উচ্চাদের
ভ্রাম প্রিয় নহে। এরূপও দেখা গিয়াছে
যে পুত্র মৃত্যু শযায়, কিন্তু পিতা দনাত্ত
সমাপিত রহিয়াছেন। বালিকা পুতুল নিয়া
খেলিতে খেলিতে তন্মগ্ন হয়। পুতুলকে
নাওয়াচ্ছে, পাওয়াচ্ছে যুগপড়াচ্ছে ইত্যাদি—
বালিকা যাহা পুতুল নিয়া করে যুগী
গৃহিনী তাহা নিজের পুত্র কন্যা লটয়া
করেন, পুত্র কন্যা তখন পুতুলের স্থান
গ্রহণ করিয়াছেন। যুগী এখন মৃত্যু।
পুত্র কন্যারূপ পুতুলেরা এখন তাহাকে
আনন্দ দিতে পারে না, তিনি পরকাল চিন্তার
মগ্ন। নিরন্তরে যাহা সত্য তাহার উর্দ্ধ-
স্তরে তাহা মিথ্যা-মায়। বালিকার নিকট
পুতুলীকা জীড়া জীবনের একটা প্রধান
কাজ ছিল কিন্তু বালিকা মৃত্যু পদে আকড়া
হইয়াই বালিকার পুতুল জীড়াকে মিছা
কাজ মনে করিতে লাগিল-স্মরণ্য বেদে
স্তরে আছে সেই স্তরের জ্ঞানের ধারাই

তাঁহাকে সত্য নির্ধারণ করিতে হয় এবং উর্দ্ধতর-আরোহণ করিলে নিম্নস্তরের যে সত্য তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতীতি হয়। সুতরাং প্রত্যেক অবস্থার জ্ঞানই এক হিসাবে মিথ্যা এবং এক হিসাবে সত্য। নিকামোক্ষ অস্মা ব্যাবহারিক জগতে কর্ম দ্বারা যখন জ্ঞান লাভ করেন এবং উর্দ্ধ আরোহণ করেন, তখন তিনি কলাকার সত্যগুলি পশ্চাতে রাখিয়া অস্তকার সত্যগুলি নিজস্ব করেন এবং আপাতী কলাই হয়ত অস্তকার সত্যগুলি মিথ্যা জানিয়া নূতন সত্য উপনীত হইবেন। এরূপ বাটতে বাটতে যখন তিনি পরসে বাটরা উপস্থিত হইবেন, তখন তিনি পশ্চাৎস্থিত সমুদর সত্যগুলিকে মিথ্যা বলিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত ঐ পরম স্থানে উপস্থিত না হন, সেই পর্য্যন্ত তাহার নিজের বিকাশের জন্ত তিনি সাময়িক সত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং ঐ সত্য তাহার পক্ষে তৎকালে সত্য। আমরা যীর যীর জীবনে অধুতন করিয়া থাকি যে এক সময়ে আমাদের যে সত্যগুলি জীবনের উপযোগী ছিল তাহা আমরা পরিত্যাগ করিয়া নূতন সত্যের দ্বারা জীবন পরিচালিত করিতেছি। কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া গৃহী সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। উপবীত শিখা পরিত্যাগ করিলেন, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ আদি সমুদায় যজ্ঞ পরিত্যাগ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন "সোহং সোহং"। এই বাক্য যদি কেবল মৌখিক হয় তাহা হইলে সোহং বাক্য মিথ্যা, কিন্তু জীব যে অবস্থায় সোহং এর অধিকারী হয় সে অবস্থা

তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে সোহং বাক্য সত্য।

জীব ও ব্রহ্ম যে ভেদ ইহাও সত্য এবং জীব ও ব্রহ্ম যে এক ইহাও সত্য। কিন্তু অধিকার ভেদে সত্য। যে অবস্থায় জীব ব্রহ্ম এক সেই অবস্থার উপনীত হইলে জীব ব্রহ্ম যে স্বতন্ত্র তাহা মিথ্যা কিন্তু তাহার পূর্বে নহে। যদি জীব ব্রহ্মের ভেদ তুমি উপলব্ধি করিতে পারিয়া থাক তাহা হইলে তুমি জ্ঞান সত্য। কেবল মুখে তুমি বলিলে তোমার ব্রহ্ম জ্ঞান হইবে না তোমার যীর জীবনে উহার অধুতন জ্ঞাই। সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছেন—“এষ তু অতিবদতি যঃ সত্যোনাতিবদতি সোহং” যিনি সত্যের সহিত বলিতে পারেন সোহং তিনি যথার্থ অতিবাদী। অন্যকে স্বাক্ষে যে ভেদ নাই এ কথা সত্য কিন্তু তাহার পক্ষে সত্য যিনি জগৎ ব্রহ্ম ইহা যীর জীবনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন তাহার পক্ষে সত্য জীব যত দিন তদন্থা প্রাপ্ত না হয় ততদিন তুমাকে আদর্শ করিয়া যীর যীর অধিকার অধুগারে যীর যীর প্রীতিকর উপায়ের দ্বারা তাঁহার সন্নিহানে অগ্রসর হইতে হইবে। ছাকোগ্য উপনিষৎ বলেন—“সর্বং ধুবিনং ব্রহ্ম তজ্জলানীতি পাস্ত, উপাগীতি। অত্র খলু ক্রতুমরঃ পুরুষঃ যথা ক্রতুরশ্বিনোকে পুরুষো ভবতি তথেষঃ পোতা ভবতি সক্রতুঃকুবীতি।” সত্য সত্যই সকলই ব্রহ্ম। কারণ সকলেরই উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে, ব্রহ্মের দ্বারা স্থিতি এবং ব্রহ্মেতেই পর। অতএব তাঁহাকে পাস্ত এবং সংসৃত চিত্ত হইয়া উপাগম।

করিতে হইবে। জীব ব্রহ্মত্বের অর্থাৎ ইহ-
জীবনে তিনি যে বিষয়ে মন নিবিষ্ট করেন
পরকালেও তিনি তদ্রূপ হবেন। অতএব
ব্রহ্মকেই চিন্তা করা উচিত। সুতরাং
শাণ্ডিল্য বলেন যে শ্রুতি এবং যুক্তির
দ্বারা ভক্তি যে উত্তর পরা তাহা সাব্যস্ত
হইল। অর্থাৎ যেমন তাঁহার ঐশ্বর্য চিন্তা-
করা আনন্দক সেইরূপ আনন্দজ্ঞানের গাথন
করা কর্তব্য।

‘দ্ব্যজিংশ শব্দ—উপরে বাহা বলা হইয়াছে
তাঁহাতে যে কোন বিরোধ নাই দ্ব্যজিংশ
শব্দে তাঁহাই বলা হইতেছে। একবার
বল জীব ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই আর
একবার বল জীবব্রহ্মের উপাসনা করিবে।
এ কিরূপ কথা? ইহাতে এক বৈষম্য
উপস্থিত হইল সুতরাং তুমি যে
সংসংস্থাপন করিতে চাও তাঁহা অসিদ্ধ
হইল। জীব ব্রহ্মে ভেদ আছে স্বীকার
কর, জীব ব্রহ্মের উপাসনা করিবে এ কথা
মানিতে পারি। কিন্তু জীব ব্রহ্মে ভেদ
নাই অর্থাৎ জীব ব্রহ্মকে উপাসনা করিবে
এ যে বিষয় কথা। তদন্তরে শাণ্ডিল্য
বলিতেছেন যে ইহাতে কোন বৈষম্য হয় না
যেমন অভিজ্ঞানে জ্ঞানের বিষয় দুইটী
নয় একটী এবং পূর্বজ্ঞাত বস্তু এবং পর-
জ্ঞাত বস্তুর মধ্যে কোন বিবর্তন থাকে না।
তদ্রূপ জীব ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহাদের
মধ্যে পার্থক্য থাকে না। দেবদত্ত নামে
এক ব্যক্তিকে তুমি অনেক দিন পূর্বে
দেখিয়াছিলে তারপর তাঁহাকে তুমি
সিদ্ধান্ত ভংগের ঘটনায় একদিন তাঁহাকে
দেখিলে, ঘটনায় তাঁহাকে দেখিয়া অপরিস্রিত

ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এ
ভাল করিয়া দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল
কোণার ইহাকে দেখিয়াছি তখন পূর্ব
স্মৃতি জাগরিত হইল এবং তুমি বলিয়া
উঠিল যে এ সেই দেবদত্ত বাহাকে পূর্বে
দেখিয়াছিলাম। এখানে জ্ঞানের বিষয়
দুইটী দেবদত্ত নহে একটী দেবদত্ত। যখন
দেবদত্তকে প্রথম দেখিলাম তখন পূর্বে
যে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম তাঁহা আমার
মনেই ছিল না, যখন মনে হইল তখন
পূর্বকার দেবদত্ত এবং এখনকার দেবদত্ত
একই দেবদত্ত হই দেবদত্ত হইল না।
সুতরাং অভিজ্ঞানের যে বিষয় তাঁহা এক
হই নহে। অতীত বর্তমানের সহিত
মিলিয়া যায়। জীব যতক্ষণ অজ্ঞান অব-
স্থাতে থাকে তখন সে যে ব্রহ্ম এ জ্ঞান
তাঁহার হয় না। রাজপুত্র রাখালের ছেলের
সঙ্গে খেলা করে, রাখালের স্ত্রীকে মা বলে
রাখালকে বাবা বলে, সে মনে করে আমি
রাখালের ছেলে। প্রাজ্ঞা যখন জানিতে
পারিল যে রাখালের ঘরে রাজপুত্র আছে
তখন তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইল এবং
রাজপুত্র জানিতে পারিল যে সে রাজারই
ছেলে তখন সে জানিল যে আমিও রাখালের
ছেলে নয় আমি রাজারই ছেলে।

জীব ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই কিন্তু অজ্ঞান,
বশত সে মনে করে আমি স্বতন্ত্র, আমি
হিন্দু জীটান কি মুসলমান কিন্তু সেই তাঁহার
জ্ঞান হইল যে আমি ব্রহ্ম তখনই সে বলিয়া
উঠিল ‘শিবোহং’ ‘শিবোহং’ আমি
ব্রহ্মের কত্রি বৈশ্ব কিছই মুহি, আমি
ব্রহ্ম সুতরাং ব্রহ্ম আমি হইলেই জীব

ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান নষ্ট হয়। যতক্ষণ ভেদ-জ্ঞান, ততক্ষণ ভেদ, যখন ভেদজ্ঞান নাই, তখন ভেদও নাই।

ত্রয়োবিংশ সূত্র—জীবে ঈশ্বরে যদি কোন ভেদ না থাকিল, তাহা হইলে, জীবের জ্ঞান ঈশ্বরও ক্রেশাদির অধীন হইতে পারেনা—এইরূপ তর্কের প্রত্যুত্তরে এই সূত্র দ্বারা শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে তাহা হইতে পারে না, যেহেতু জীব উপাধিসূক্ত হইলেই ঈশ্বরের সহিত তাহার অভেদ সম্বন্ধিত হয়। উপাধিসূক্ত জীবে ক্রেশাদি পাকে না, এবং তখন জীবে ও ঈশ্বরে অভেদ হইলে ক্রেশাদি ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে পারে না।

চতুর্বিংশ সূত্র—যদি বল জীব ক্রেশা-ধীন নহে, তবে আমি বলি ঈশ্বরেরও ঐশ্বর্য্য নাই। এইরূপ তর্কের উত্তরে শাণ্ডিল্য বলিতেছেন যে না তাহা হইতে পারে না, কারণ ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বভাব। সুতরাং কোন সময়েতে ঈশ্বর ঐশ্বর্য্য বিহীন হইতে পারেন না।

পঞ্চত্রিংশ সূত্র—বস্তুপি ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অস্বীকার করা যায় না, কারণ ঐশ্বর্য্য তাহার স্বভাব, কিন্তু তাই বলিয়া জীবের পক্ষে ঐশ্বর্য্য স্বীকার করা যায় না। জীব মুক্ত হইলেই ঈশ্বরের সহিত তাহার অভেদ হয়, কিন্তু জীবের সাধারণ অবস্থা উপাধি অর্জিত; ঐশ্বর্য্য তাহার বাস্তবিক অবস্থা নহে।

ষড়ত্রিংশ সূত্র—জীব যদি ঈশ্বর হইয়া গেল, তাহা হইলে ঐশ্বরের প্রয়োজন কোথায় এই তর্কের উত্তরে শাণ্ডিল্য বলি-

তেছেন যে মানবের অনন্ত বৃদ্ধি। এমন একদিন কখনও হইতে পারে না, যেদিন সব যাহুয মুক্ত হইবে। সকল সময়েই অনেক অমুক্ত জীব থাকিবে তাহাদিগের পক্ষে ভগবানের ঐশ্বর্য্য চিন্তা অতীব প্রয়োজনীয়।

সপ্তত্রিংশ সূত্র—ঈশ্বর প্রকৃতির অন্তরাল হইতে কার্য্য করেন, এবং কেবল চিৎ সত্ত্ব দ্বারা বর্তমান থাকেন, সুতরাং প্রকৃতির বিকাশ ভগবানকে স্পর্শ করিতে পারে না। প্রকৃতি বা মায়ী এই বিশ্বের উপাদান কারণ। এই প্রকৃতি আবার অব্যক্ত অন্তরায় ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপ ব্রহ্মে লীন থাকে। ব্রহ্মের সত্ত্বা চিন্মাত্র। সুতরাং ব্রহ্ম প্রকৃতির জ্ঞান বিকারাধীন নহে। যখন প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থা হয়, তখন ব্যবহারিক জগতের সৃষ্টি হয়। যাহুক সম্বন্ধে তাহার যাহুশক্তি দ্বারা নানাবিধ অব্যক্ত পদার্থের সৃষ্টি করে, ব্রহ্মও তদ্রূপ প্রকৃতির শক্তির সাহায্যে এই ব্যবহারিক জগতের সৃষ্টি করেন। বিকার বা পরিণাম কেবল প্রকৃতিতেই প্রয়োজ্য। যখন ব্রহ্ম প্রকৃতিকে ব্যক্ত করেন, তখনই তিনি ঈশ্বর পদ বাচ্য করেন। প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তিমাত্র বলিয়া ব্রহ্মই জগতের যেমন নিমিত্ত কারণ, তদ্রূপ উপাদান কারণও বটে, কিন্তু স্থূলভাবে প্রকৃতিই জগতের উপাদান কারণ। শাণ্ডিল্য এ স্থলে বিবর্তবাদ ও পরিণাম বাদের—সামঞ্জস্য করিয়া গেলেন। বিকার বা পরিণাম প্রকৃতির কিন্তু প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বিবর্তন হেতু।

সং, অস্ত্রান্ত পদার্থ তাহার নিকট অসং ।
প্রত্যেক পদার্থই উহার কারণের নিকট
অসং, কারণের নিকট সং । প্রকৃতি ও
বাবসারিক জগতের পক্ষে সং ।

জিচক্ষারিংশ হৃদ্র—অস্ত্রান্ত প্রাসাদিক
বিষয়ের আলোচনা করিয়া, শান্তিগ্য এই-
ক্ষণ পুনর্কার মূল বিষয় অর্থাৎ ভক্তির
আলোচনার প্রবৃত্ত হইলেন । যাহুয়ের
তালবাসা যে সব চিত্র দ্বারা, ভক্তির পরি-
ত্বন্ধিও এই সব চিত্রদ্বারা বুঝিতে হইবে । যে
বাহাকে তালবাসে, সে তাহার নিকটে
থাকিতে চায়, তাহার শৃগকীর্তন শুনিতে
চায়, তাহার সেবা করিতে চায়, তাহা
হইতে দূরে থাকিলে অস্ত্রান্ত কষ্ট পায় ।
ভগবানের প্রতি ভক্তের ভাগবাসাও ঐরূপ ।

চতুঃক্ষারিংশ হৃদ্র—সম্মান, বহুমান,
শ্রীতি, নিরহ, (ইতর-বিচিকিৎসা) মহিমা-
খ্যাতি, তদর্থপ্রাপ্তমান, তদীরতা, সর্কৃত্তাব,
অপ্রতিকূলতা এবং অস্ত্রান্ত লক্ষণ, বাহা
বাহুলা আশকার বর্ণিত হইল না, ইহারাই
ভক্তির লক্ষণ ।

ঈশ্বরকে সম্মান করা, তাঁহার সহিত
বাহাদিগের কতকাংশে সাদৃশ্য আছে, তাঁহা-
দিগকে মান্ত করা; তাঁহার সান্নিধ্যে শ্রীতি-
অনুভব ও তাঁহার অভাবে বিরহ-দুঃখ;
ঈশ্বরাত্মিক পদার্থে ঔদাসীন্য, তাঁহার
মহিমাধোষণা, তাঁহার নিসিতই প্রাণধারণ
ও হিত; সর্বলই তাঁহার এবং তিনিই সমস্ত
এবং তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বিবেচ
না পক্ষভাবের অভাব এবং এই প্রেক্ষার
অন্যান্য লক্ষণ দ্বারা ভগবানের প্রতি
ভক্তি আনিতে পারা যায় ।

ভক্তির যে সমস্ত লক্ষণ বলা গেল, তাহা
ভক্তমায়েই লক্ষিত হয় । চৈতন্যদেব
'হাক্ক' 'হাক্ক' বলিয়া অনেক সময়
কীর্ষিতেন । অত্র লোকেরা তাঁহাকে বাতুল
বলিয়া বিবেচনা করিত । সাংসারিক লোক
স্বরূপ শ্রী-গুণের প্রতি আসক্ত, ভক্তেরাও
ভগবানের প্রতি ভক্তপ আসক্ত ।

পঞ্চচক্ষারিংশ হৃদ্র—দেবাদি ভক্তির
লক্ষণ নহে । দেব, ক্রোধ, হুগা ইত্যাদি
ভক্তির লক্ষণ নহে, এই হৃদ্রে তাহাই
বলা হইতেছে ।

ষট্চক্ষারিংশ হৃদ্র—ভক্তি যে কেবল
ঈশ্বরের প্রযুজ্য হয়, তাহা নহে; বাহার
ঈশ্বরের সঙ্গিত, তাঁহাদিগের পক্ষেও প্রযুজ্য ।
শ্রীকৃষ্ণ গীতার বলিতেছেন—সকল ধর্ম
পরিভ্যাগ করিয়া আমারই আশ্রয় গ্রহণ
কর । আমার ইহাও বলিরাছেন—

“দেবান দেবভ্যো যক্তি মত্তকা যক্তি ম্মানপি”
অর্থাৎ দেবতাদিগের উপাসকেরা দেবতা
দিগকে প্রাপ্ত হন, আমার ভক্তেরা আমাকে
প্রাপ্ত হন । সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ অবতার
হইলেও, তাঁহাতেও ভক্তি প্রযোজ্য । 'মত্তক'
শব্দের দ্বারা তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ।

সপ্তচক্ষারিংশ হৃদ্র—বাহার ভগবানের
দিব্য জ্ঞান ও কর্ম অবগত আছেন, তাঁহাদের
আর পুনর্কার জন্ম হয় না,—‘শিব’ অর্থাৎ
শ্রুতি এইরূপ উপদেশ দিরাছেন । গীতাও
'উপনিষৎ'রূপে শ্রুতির মধ্যে গণনীয় ।
গীতার উক্ত আছে—
'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যেবং যো বেতি স্তম্বতঃ ।
ভাক্ । বেৎপুনর্জন্ম নৈতি নাব্যেতি মোক্ষম্ ॥
যে যক্তি স্তম্বতঃ আবার জন্ম ক'র্ম

অবগত হইরাছেন, তিনি দেহভাগ করিয়া পুনর্জন্ম জন্ম গ্রহণ করেন না; যে অর্জুন! তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইলেন। সূত্রকার বলিতেছেন যে, ভগবানের জন্মগ্রহণ হুগ ভাবে বৃদ্ধিতে হইবে না। ভগবানের জন্ম হুগশরীরে নয়। কোন হুগদেহে ঐশী শক্তির প্রাপ্তি হইলে অবতার বলিয়া কথিত হয়।

অষ্টচত্বারিংশ সূত্র—ভগবানের যে অবতার, উহা দিব্য এবং উহা ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়। অগৎপ্রপঞ্চ ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত হয়; কিন্তু কি প্রকারে উহা উদ্ভূত, তাহা মাহুভের বুদ্ধির অগম্য। অবতারও ঐরূপ ভগবানের শক্তি হইতে উদ্ভূত এবং উহাও মাহুভের বুদ্ধির অগম্য। জীবের পুনর্জন্ম বেকরূপ জীবের কন্দোভূত, ভগবানের সেটরূপ নহে। গীতা বলেন—
‘অজোহপি সন্নবারায়া ভূতানামীথরোহপি সন্।
প্রকৃতিং বাসিগঠার সন্তবামান্মারয়া ॥’

বদিও আমি অজ, অব্যাবায়া ও সর্ক-ভূতের জীবুর, তথাপি প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আমি আত্মমারার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি।

উনপঞ্চাশৎ সূত্র—ভগবান যে জন্ম গ্রহণ করেন, সে কেবল তাঁতার করুণা বশতঃ। জীবের যে জন্ম, তাহা পূর্ককর্ষ বশতঃ, কিন্তু কর্ষ ভগবানকে স্পর্ষ করিতে পারে না। জীবের উপকারের জন্ত করুণাবশতঃ তিনি সন্ন-সন্ন-জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। গীতা বলেন—
‘বরাধীবা: হি ধর্মত মানির্ভগতি ভারত।
অভূখানিধর্মত ভবান্নানং সূতান্যহম্ ॥’

পরিজ্ঞাপার-সাধুনাং বিনাশার চ হুহুতাম্।
ধর্মসংহাপনার্থার সন্তবামি যুগে যুগে ॥”

যখনই ধর্মের মানি হয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি জন্ম গ্রহণ করি। সাধু-দিগের রক্ষার জন্ত, হুহুতদিগের বিনাশের জন্ত এবং ধর্মসংহাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি।

পঞ্চাশৎ সূত্র—তক্তি কিন্তু সাধারণতঃ ভগবানের বিভূতি পক্ষে প্রযোজ্য নহে; কারণ উহার অধিকাংশই প্রাণী।

ভগবানের বিভূতি সর্কজ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাক প্রকৃতির দোষণমূহ তাহাতে বর্ভমান থাকে। উপাত্ত অভ্যাস আদর্শের হওয়া চাই।

একপঞ্চাশৎ সূত্র—শ্রুত ও রাজাও ভগবানের বিভূতির মধ্যে উল্লিখিত হইরাছে, কিন্তু উহাদের প্রতি ভগবান জানে তক্তি নিবিদ্ধ। সূত্রায় অস্তান্ত বিভূতিও ভজা-তায় বলিয়া তাহাদিগের প্রতিও ভগবানের তুল্য তক্তি নিবিদ্ধ। গীতার লক্ষ্য অধ্যায়ে বিভূতির বর্ণনাই রহিরাছে, যথা—

“হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা ছান্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধাজতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যস্তো বিস্তরত মে ॥
অহমায়্যা শুড়াকেশ সর্বভূতাপরহিতঃ।
অহমাবিশচ মধ্যাক ভূতানামস্ত এব চ ॥
আদিত্যানামহংবিকুরোতিবাংরবিরংসুমান।
মরীচির্মকতামস্মিন নক্ষত্রাণামহং শশী।
বেদান্নাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মিন্নাগবঃ।
ইজিরণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা।
ক্ষত্রাণাং শকরশ্চাস্মি কিত্তেশো বীকরকসাম্।
বহুনাচঃ পাবকশ্চাস্মি বেকর শিখরিশািবহু।
পুরোধম্যক যুধাং বাং বিদি পার্ব বৃহস্পতিমুহু।
সেনানীমানহং কন্দঃ সন্নগামস্মি সাগরঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্তি শব্দ, তাহা গৌণ বুদ্ধিতে হইবে এবং উহা দ্বিতীয় ভক্তির ভেদ মাত্র। গীতার কয়েকটা শ্লোক স্বরণ করিয়া সূত্রকার ঐ স্বরণ রচনা করিয়াছেন। গীতার নবম অধ্যায়ের জয়োদয় শ্লোকে দৃষ্ট হয়,—

‘সহ্যাদানন্ত মাং পার্শ্বৈবীং প্রকৃতিসাম্প্রিতাঃ ।
ভক্ত্যান্তমনশো জ্ঞাস্তা ভূতাদিগমাম্ ॥’

অর্থাৎ হে পার্শ্ব! মহাশক্তি আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া আমাকে ভূতাদি অসার জানিয়া অনন্তমনা হইয়া আমার ভজন করেন। এখানে যে ভক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা মুখ্য। কিন্তু চতুর্দশ এবং ষড়ংশ শ্লোকে যে ভক্তির উল্লেখ হইয়াছে, উহা গৌণ।

চতুর্দশ শ্লোক—

‘সততং কীর্তয়ন্তো মাং বতন্তশ্চ দৃঢ়বতাঃ ।
ননস্তস্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিতাবৃত্তা উপাসতে ॥’

অর্থাৎ আমার মহিমা কীর্তন করিতে করিতে এবং দৃঢ়বতঃ ও বতী হইয়া এবং আমাকে নমস্কার করিতে করিতে নিতাবৃত্ত হইয়া ভক্তির সহিত আমার উপাসনা করেন।

ষড়ংশ শ্লোক—

‘পত্রং পুষ্পং ফলং তোরং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং তত্শ পছতমশ্রমি প্রসত্যাহ্বনঃ ॥’

যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল প্রদান করেন, আমি উহা— ভক্তির সহিত দেওয়া হয় বলিয়া, সেই প্রযত্নকার নিকট হইতে গ্রহণ করি। তৎপরে ঐনক্রিংশ শ্লোকে বলা হইতেছে :—

‘সৈবোহহং সর্বভূতেশু নমস্কোদ্যোতি নরিণাম্ ।
যৈভ্যমভিভূতাস্তে জাযিরি তে ভেদুচ্যাপ্যহম্ ॥’

আমি সর্বভূতেই সমস্তাধিপতি; আমার

কেহ দেওয়া-পায় নাই। বাগায় আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে, তাহারা আমাকে রহিম্মতে এবং আমি তাহাদিগকে বরিম্মতি।

সপ্তপঞ্চাশৎ শ্লোক—ভক্তি যে হলে অমুরক্তি—কীর্তনাদি দ্বারা সাধনীর উল্লেখ হয়, ঐ ভক্তির দ্বারা মুখ্য ভক্তি বুঝায় না।
গীতা ২। ৩৬ বলেন—

‘‘তানো জমীকেশ তব প্রকীর্ত্যা ।

জগৎ প্রজয়াতাতুরজ্যতে চ ॥’’

হে জমীকেশ! জগৎ তোমার মহিমা কীর্তনে প্রজয় হইবে এবং তোমাকে অমুরক্ত হইবে। এখানে মহিমা-কীর্তন উপায় মাত্র।

গীতার সেই শ্লোক আশ্রয় স্বরণ করন—

‘‘সততং কীর্তয়ন্তো মাং বতন্তশ্চ দৃঢ়বতাঃ ।
ননস্তস্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিতাবৃত্তা উপাসতে ॥’’

আমার মহিমা কীর্তন করিয়া, বতী এবং দৃঢ়বত হইয়া এবং আমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমাকে ভক্তির সহিত উপাসনা করে।

এখানে ভক্তি কীর্তনাদির সহিত উল্লিখিত হওয়ার উহা মুখ্য ভক্তি মতে।

অষ্টপঞ্চাশৎ শ্লোক—গীতার ৯ম অধ্যায়ে জয়োদয় এবং ঐনক্রিংশ শ্লোকের মধ্যে ভক্তিপ্রাপ্তির বিভিন্ন উপায় বর্ণিত হইয়াছে, কারণ ভগবানের উপাসনার তিন ভিন্ন অংশ রহিয়াছে।

জয়োদয় ও ঐনক্রিংশ শ্লোকেট মুখ্য ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। অতএব পূর্বোক্ত শ্লোক পুনরুক্ত করিতেছি, কথ্য—

•• গীতা ৯। ১৩ বলেন—

‘‘সহ্যাদানন্ত মাং পার্শ্বৈবীং প্রকৃতিসাম্প্রিতাঃ ।
ভক্ত্যান্তমনশো জ্ঞাস্তা ভূতাদিগমাম্ ॥’’

গীতা ৯।২৯ বলেন—

‘সমোহংসর্গভূতেষু নমেবেশ্বো’হস্তিন পিপ্রঃ ।
যে তজ্জন্তি কুমাং ভক্ত্যা ময়িতো ভেদুচাপাচম্ ॥

হে পার্থ, মহাত্মারা আমার দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া এবং আমাকে ভূতাদি অন্যর জানিরা অনন্তমনা হইরা আমার ভঙ্গনা করেন ।

আমি সর্গভূতেই সমান, আমার দেবা বা পিতা নাই, বাহারা ভক্তির সাহিত আমার ভঙ্গনা করে, তাহারা আমাতে আছে, আমি তাহাদিগেতে আছি ।

এই দুই শ্লোকেই মুখ্যা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, আর এই দুই শ্লোকের মধ্যে অর্থাৎ ১৪।১৭।২২।২৬।২৭।২৮ শ্লোকে যে ভক্তির উল্লেখ হইয়াছে, উহার মুখ্যা ভক্তি নহে; মুখ্যা ভক্তি প্রাপ্তির উপায় মাত্র ।

উনষষ্টি সূত্র—এই সমুদায় উপায় অবলম্বন করিলে আত্মার বিগুণ্ডি জন্মে এবং তাহা হইতে মুখ্যা ভক্তির উদয় হয় ।

ষষ্টি সূত্র—কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, এই সমুদায় উপায়ের সাহিত ভক্তি শব্দ সংযুক্ত থাকার, তাহাতে ফলাধিকা হয়। যেমন ‘ভক্তির সহিত আমাকে নমস্কার করে’ ইত্যাদি স্থলের ভক্তি মুখ্যা ভক্তি নহে, কিন্তু ভক্তি শব্দের উল্লেখ থাকার কোন কোন আচার্য্যের মতে উহাতে অধিক ফল হয় ।

একষষ্টি সূত্র—জৈমিনি বলেন যে, এই সমুদায় ভক্তি প্রাপ্তির উপায়ের সাহিত ভক্তি শব্দ উল্লিখিত হইবার, ঐ ঐ স্থলে ভক্তি শব্দ ব্যতিরিক্ত উপায়ই বুঝতে হইবে ।

ত্রয়োদশ হইতে অষ্টবিংশতি সূত্রে মুখ্যা ভক্তি লাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সমুদায় স্থলে ‘ভক্তি’ শব্দের ও প্রয়োগ দেখা যায় । শাণ্ডিল্য বলেন যে, ঐ সমুদায় ভক্তি মুখ্যা ভক্তি নহে, উহার গৌণী ভক্তি ।

অনেক আচার্য্যেরা বলেন যে, উহারও মুখ্যা ভক্তি, এবং ভক্তি লাভের উপায়ের সহিত উহার যে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, উহা দ্বারা উপাসকদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। স্বমত পোষণ করিবার জন্য শাণ্ডিল্য আচার্য্য জৈমিনির মত এখানে উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন যে, জৈমিনিও উহাদিগকে গৌণী ভক্তি বলিয়াছেন। যেমন যে স্থলে ভক্তির সহিত নমস্কার করা বলা হইয়াছে, সেস্থলে ভক্তি আর নমস্কার একই জিনিষ। যেমন যেস্থলে ভক্তির সহিত পত্র পুষ্প-ফল প্রদানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ স্থলে ভক্তি ঐ পত্র-পুষ্পাদি প্রদান ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

দ্বিষষ্টি সূত্র—একখানি গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে, গৃহী যেমন যথাকালসম্ভব তাহার উপকরণাদি সংগ্রহ করেন, ভক্তির সম্বন্ধেও তদ্রূপ করিতে হয়। সমুদায় দ্রব্য এক সময়ে সংগ্রহ হয় না, তথাপি গৃহনির্মাণ-কার্য চলিতে পারে; ভক্তির সম্বন্ধেও তদ্রূপ ।

ঊনষষ্টি সূত্র—ভক্তিলাভের বহুবিধ উপায় আছে। কেহবা সকলগুলি, কেহবা অনেকগুলি, কেহবা উহার একটি মাত্র উপায় সম্বল করিয়াও ভক্তি লাভ করিতে পারেন। ভগবান তুই হইলে, উহার একটির দ্বারাও কার্য্য হয় ।

দরিদ্রের হুঃখ মোচনের জন্য ধনী যত উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, কোন নীঃস্ব ব্যক্তি তাহা পারে না, কিন্তু সে যদি তাহার সাধ্যানুসারে দরিদ্র-হুঃখ মোচনের চেষ্টা করে, তাহা হইলেই তাহার পক্ষে বখেট। ধনী শত মুদ্রা দান করিয়া যে ফল পান, দরিদ্র ব্যক্তি এক কণদিক দানেও ওদধিক ফল পাইতে পারে। কেহবা শত শত ফুল দিয়া পূজা করে, কেহবা স্বদভাবে কেবল জলধারা পূজা সমাপন করে। সার কথা এই যে, ভগবানকে লক্ষ্য করা চাই। ভগবান গীতার বলিয়াছেন,—

'যৎ করোষি বদনাসি যজ্জুহোষি মদনাসি যৎ।
যৎ তপস্তসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ'মর্পণম্ ॥'।

হে কোন্তেয়, তুমি যাহা কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যে তপস্তা কর, তাহা সকলই আমাকে অর্পণ করিও।

চতুঃষষ্টি সূত্র—সকল কার্যই ভগবানের উদ্দেশ্যে করিলে, অবদ্ব বা অনাগক্তি জন্মে। মানব যখন তাহার ক্ষুদ্র ভুলিয়া বাইরা বিখ্যাতির সহিত আপনাকে সন্মিলিত করিতে পারে, তখনই সে আসক্তি-শূন্য হয়। গায়ক যেমন বেহালা-তবুরা প্রভৃতি বস্তুর সাহায্যে সংগীত আরম্ভ করে; স্বীর কণ্ঠস্বর-ক্রমশঃ বস্তুর স্বরের সহিত মিলায়, সাধকও সেইরূপ ক্রমশঃ বিখ্যাতির সহিত স্বীরাত্মার মিলন সংঘটন করেন। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিবরে স্বার্থ ভ্যাগ করিতে করিতে বৃহৎ বৃহৎ বিবরেও স্বার্থ ভ্যাগ করা যায়। একেবারেই অনাগক্তি হয় না; কিন্তু ভগবানের সূতা সর্বভূতে

উপলব্ধি করিয়া ক্রমে ক্রমে সর্ব বিবর 'ত্রক্ষার্পণং' করিতে হয়।

পঞ্চষষ্টি সূত্র—ধ্যানের যে নিয়ম হইয়াছে, সে কেবল চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের জন্য।

ভগবানের ধ্যান করিতে হইবে। ভগবানকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধ্যান করা যায়। যে তাবটি বাহার শ্রীতকর, তিনি সেই তাবটি স্বপ্নে ধারণ করিয়া তাঁহার ধ্যান করিবেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রত জন্মে; তাহা হইতে ক্রমে সমাধি লাভ হয়। সমাধি হইতে আত্মার শক্তিবৃদ্ধি হয়।

ষড়ষষ্টি সূত্র—গীতার যে 'মদ্যাজি' শব্দ আছে, তাহারারা ভগবানের উপাসনাই বুঝায়; উহা দ্বারা ছাগাদি বধ বুঝায় না। গীতা বলেন—'যান্তি মদ্যাজিনোহাগ-মাম্' অর্থাৎ আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হন। এই স্থলে জীবহিংসার কোন উপদেশ নাই।

সপ্তষষ্টি সূত্র—'পাদোদক' বলিতে কেবল পাদস্পৃষ্ট জল বুঝিতে হইবেনা, কারণ তাহাতে অব্যাপ্তি দোষ হয়। উহা 'লক্ষ্যক দেশে লক্ষণস্তাবর্তমানম্'—জ্ঞানশাস্ত্রে ইত্যাকে অব্যাপ্তি বলে। আমি যদি বলি যে—কল দেশে যে বাস করে, সেই বাদালী; কিন্তু এই লক্ষণ দ্বারা বদদেশে বাস করে না, এমন বাদালী বাদ পড়িয়া যায়, সুতরাং উহারে অব্যাপ্তি দোষ হইল। শালগ্রাম শিলার পাদ নাই, সুতরাং শালগ্রাম শিলা-স্পৃষ্ট জল কেমন করিয়া পাদোদক হইবে? অতএব 'পাদোদক' বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, উহা পদের ব্যবহার জগৎই মনস্থ করা হইয়াছিল।

অষ্টমী সূর দেবতাদিগকে বাহা অর্পণ করা হয়, তাহা গ্রহণ করা যায় কিনা, ভৎসনকে বলা হইতেছে যে, তাহা গ্রহণ করা যাবে ইহাতে কোন পাণ নাই। যখন উপাসনাকে কিছু দেওয়া হইল, তখন উহাতে ভৌমার বাসিধ মটি; তখন উহার প্রণাম প্রদান উহা গ্রহণ করা যায়।

উনসপ্ততি সূত্র—দেবার্চনাদিকে যে সপ্ত বিধি আছে, তাহা—প্রতিপালন নামে পরিণে অপরাধ হয়। ঐ পাণ দুই প্রকার। এক হচ্ছে বীর কাগ্যাক্রমিত, আর একটা হচ্ছে অর্চনার উপকরণের নোবাক্রমিত। অর্চনার বিধি পালন করা উচিত, কারণ উহাতে মনের সংশয় হয়।

সপ্ততি সূত্র—পত্রাদি দ্বারাতে সমুদয় অর্চনার উপকরণই বলা যাইতেছে।

একসপ্ততি সূত্র—এই সমুদয় কার্যের দ্বারা ভগবানের প্রতিভক্তি অগ্নে, তজ্জন্ত ইহা অত্রাত কার্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কেবল কুপায়ল দ্বারা পূজা করিলে যে কোন দল হয়, তাহা নহে; পূজার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দিক প্রবৃত্তিও চাই। কপোতাদি মন্দিরে বাস করে এবং সংস্কার পলাকলে থাকে, কিন্তু তাহাদের কোন দল হয় না। কেবল উপাসনার নিরমাদি পালন করা যথেষ্ট নহে; উপাসনাদেশভার অর্পণ আশ্রয়সাধন করা আবশ্যিক। লংঘনে আসন্ন যে সপ্তত কার্য করি, তাহা কর্তব্য জানে করিলে ভগবানের উপাসনা করা হয়। নিম্নোক্ত কার্য কেবল কখনোমাত্র কল্যাণ করিবার কারণ, কখনো মর্ষ্যগোচর।

বিদগ্ধতি সূত্র—সীতার তর্জনা প্রদান

উপাসকের উল্লেখ আছে। ভগবৎ চতুর্থ প্রকার উপাসক প্রথম তিন প্রকার উপাসক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাদিগের প্রণাম্য বৈধ প্রণয় তিন প্রকার উপাসক চতুর্থ প্রকার উপাসকের সহিত একত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

সীতা বশেন—

“চতুর্ধা ভবন্তে মাং জনাঃ স্কন্ধিনোহর্জুন।
 “অর্চো দ্বিজাঃ সর্বাধীঃ জানী চ ত্তরতর্কতাঃ।”
 “হে অর্জুন! চার প্রকার স্কন্ধিমান লোকেরা—সাম্যকোভবনাকসে, বনা—অর্চ, দ্বিজাঃ, সর্বাধী এবং জানী। এই চার প্রকার উপাসকের মধ্যে জানীরই সর্বা-
 গেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জানী কখনও কলাকাজ্য করেন না; তাহারি মুখে হুংসে সর্কামছার তক্তির জন্ত ভগবানের উপাসনা করেন। এই জন্ত সীতার উক্ত হইয়াছে—“জানী সীতার বৎ মতম্।” জানীকে আমি আমার নিজের আচার্য্যর জায় করি।

দ্বয়ঃসপ্ততি সূত্র—সর্ষেটি এবং গণের স্তর প্রথম কীর্তনাদি কার্য তক্তির ব্যক্তির এবং তক্তিব্যক্তির, উভয় স্থানেই রহিয়াছে। পাপমিমাচনের জন্ত যে বক্ত করা হয়, তাহাকে সর্ষেটি ময়ল এবং সে পাপময় বাহির করিবার জন্ত যে বক্ত করা হয়, তাহাকে সর্ষ বা বৃহস্পতি সর্ষ বলা হয়। সর্ষেটি বক্ত কর্তব্য সর্ষের সর্ষিত একত্র সম্পাদিত হয়, অবশ্য সর্ষত্রয় সম্পাদিত হয় এবং সে বর্ষসের সর্ষক সর্ষিত একত্র সম্পাদিত হয়। সর্ষক সর্ষক সর্ষক সম্পাদিত হয়।

এই সমস্ত কার্যের দ্বারা ভগবানে ভক্তিও হইতে পারে কিংবা ঐহিক ফলও পাওয়া যায়।

‘দেবদা মাং প্রপঞ্চন্তে তাত্ত্বপৈব ভদ্রামাংমা’

অর্থাৎ যে ভাবে যে আমার নিকট আসে, আমি তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করি।

চতুর্থিকগুণ্ডিত হুত্র—পূর্বে প্রবন্ধ-কীর্তনাদির কথা বলা হইয়াছে। উহার পাপের প্রারম্ভিত স্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার খীর খীর কার্যজনিত যে পাপ, তাহার জন্ম দায়ী; অতএব ভোমার পাপের জন্ম তুমি দায়ী। শাস্ত্রে পাপের বহুবিধ প্রারম্ভিত লিখিত হইয়াছে।

শাস্ত্রিয়া বলেন—ভগবানের নাম-কীর্তনাদি কবিলে পাপের প্রারম্ভিত হয়।

‘পাপে শুক্রণি শুক্রণি লব্ধ্বি চ লঘুত্বপি ।
প্রারম্ভিতানি বৈবজের জন্তঃ স্বামিজুগাদনঃ ॥
প্রারম্ভিতান্ত্রশেষাণি তপঃ কর্মাস্তকানি বৈ ।
যানি তেবামশেষাণি কৃষ্ণাহুস্বরণঃ পরম্ ॥’

স্বাদি শুক্র পাপে শুক্র বস্তু এবং লঘু পাপে লঘু দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। সমুদায় প্রারম্ভিতের মধ্যে ভগবানের নাম কীর্তন করাই প্রেষ্ঠ প্রারম্ভিত।

পর্বা কালে নদীর জল আবিল হয়, কিন্তু বর্ষা-কালে উহার আবিলতা আর থাকে না। সেই সমর কর্তী নীচে পড়িয়া যায় এবং জলের নীচে পর্য্যন্ত দেখা যায়। মনও ঐরূপ। মন শান্ত হইলে, বাসু-কণার দ্বারা পাপ-নিকল নীচে পড়িয়া যায়। অস্ত্র-করণ বিভিন্ন প্রকারে শান্ত করা যায়। ভগবানের নামকীর্তন করা উহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

পঞ্চাঃপ্রতি হুত্র—যদি বল যে, ভগবানের নামকীর্তন কবিলে পাপ নষ্ট হয়, তাহা হইলে শুক্লতর পাপ করিয়া কঠোর প্রারম্ভিতের প্রয়োজন হইল না এবং তাহা হইলে পাপের বৃদ্ধি হইতে পারে। তদন্তরে বলা হইতেছে যে, ভগবানের নাম করা যে কঠোর নহে, তাহা নহে, কারণ প্রারম্ভিত একবার করিতে হয়, কিন্তু ভগবানের নাম আনয়ন করিতে হয়।

ষট্টিগুণ্ডিত হুত্র—তজ্ঞাপিকারের অস্ত্রভেদেই অধিক ত্যাগ হয় এবং অজ্ঞাত প্রারম্ভিতের মারোজন ঘটে না। গীতা বলেন—

‘সর্ব্ববর্ষান্ পরিত্যজ্য মানেকং পরণং ব্রহ্ম ।
অহং স্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষমিখ্যামি মাভুচ্যে ॥’

সর্ব্ববর্ষ পরিত্যাজ করিয়া আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর; আমি তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে পরিমাণ করিব। অতএব যদি ভগবানের উপর নির্ভর করিলে কঠোর প্রারম্ভিতের প্রয়োজন না হয়, তাহাজেও কোম ক্ষতি দেখা যায় না; কারণ উহাজেও পাপ নষ্ট হইয়া যায়।

সপ্তমগুণ্ডিত হুত্র—থলে—অর্থাৎ বলিরামে যে রাণী—অর্থাৎ যে কঠিনও থাকে, তাহাও যুগকঠোর দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রারম্ভিত-স্থানে ভগবানের নাম-কীর্তনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিকুপূরণ বলেন—
‘কৃত্তে পাপেহুতাপোঠের বস্য পুংসঃ প্রারম্ভিতে ।
প্রারম্ভিতং তু ত্তৈত্বকং হরিত্বংস্বরণং পরম্ ॥
শ্রবণ করিয়া বাহার অহুতাপ হয়, তাহার পক্ষে ভগবানের নাম-কীর্তনই শ্রেষ্ঠব্যক্তি ব্যবস্থা।

অষ্টমশক্তি সূত্র—শাস্ত্র অনুসারে তনোপুণ-
সম্পন্ন ব্যক্তির বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নের
অধিকার নাই; কিন্তু অন্যান্য সৰ্ব্বকার্যে
তাহাদের অধিকার আছে। তজ্জিগর্থে
ঐরূপ অন্যান্য সৰ্ব্ব বিষয়ের ন্যায় নিম্ন
শ্রেণীদিগেরও অধিকার আছে।

ঊনাদীতি সূত্র—বাহারা তজ্জি বিষয়ে
ইহকালে একবারে পরিপকতা প্রাপ্ত হন
নাই, তাহাদেরও পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়
না; তাহারা পরলোকে ঈশ্বরের সমীপে
গিয়া তজ্জি বিষয়ে পরিপকতা লাভ করেন।

অশীতি সূত্র—বাহারা তজ্জিমার্গ অব-
লম্বন না করিয়া অন্তমার্গ অবলম্বন করেন,
তাঁহাদের পক্ষে ইহ জগতে মোক্ষপাপ্তির
ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা রহিয়াছে। কিন্তু এই
ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা তজ্জিমার্গ-অবলম্বীদিগের
পক্ষে নহে। তজ্জিমার্গ অবলম্বীরা ইহকালে
মোক্ষ প্রাপ্ত না হইলেও, তাহাদের পুনর্জন্ম
হয় না।

একাদশীতি, দ্বাদশীতি সূত্র—স্মৃতিতেও এই
ক্রমোন্নতির কথা বিবৃত হইয়াছে। গীতার
অষ্টম অধ্যায়ে, ২৩ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।
সহস্রপাতশীদিগের পক্ষে ব্যবস্থা আর্জ-
সিগের ব্যবস্থার স্তার। গীতা বলেন—

“অপিচ্ছেৎ সুহৃদাচারো ভক্ততে সামনস্ততাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সমাধ্যাবসিতো হি সঃ ॥

কি প্রং ভবতি ধর্মাস্মা শখ্জাস্তি নিগচ্ছতি।

কৌন্তেজঃপ্রতিমানীহিন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি।

মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্চিত্তা যেহপিহ্মাঃ পাপ-

বোনরঃ।

ঈরো বৈশ্চাত্তখা শূত্রোভেৎপি বাস্তি পরাং

পতিব্ধা”

যদি কেহ অত্যন্ত দুর্বাচার হয়, সেও
যদি অল্প কাহাকে উপাসনা না করিয়া,
কেবল মাত্র আমাকে উপাসনা করে, তাহা
হইলে তাহাকে সাধু জ্ঞান করিতে হইবে;
কারণ তিনি সম্যক্ ব্যবসিত। তিনি
শীঘ্রই ধর্মাস্মা হন এবং শাস্তি প্রাপ্ত করেন।
হে কৌন্তেজ! আমার তজ্জি কখনও নষ্ট হন
না। বাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে,
হে পার্থ! তাহারা পাপযোনি, জ্ঞী, বৈশ্চ
কিংবা শূত্র হইলেও পরগতি প্রাপ্ত হয়।

জয়োহনীতি সূত্র—গীতার সর্ম্ম গ্রহণ
করিলে বৃদ্ধা যায় যে, ভগবানে একান্ত
নির্ভরতাবই ভক্তি। তাই ভগবদ্ভক্তি—“সর্ব-
ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, মামেকং শরণং ব্রজ।”

চতুরশীতি সূত্র—ভক্তি হইতেই সকলেই
মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। গীতা বলেন—

“ভক্তিং ময়ি পরাং কৃৎস্না মামেটৈশ্চ্যতাসংপরম্।”

প্রত্যেকেই আমার প্রতি পরাভক্তি
লাভ করিয়া আমাকে লাভ করিবে, ইহাতে
সন্দেহ নাই।

পঞ্চাদশীতি, ষড়শীতি, সপ্তাদশীতি সূত্র—এই
বিষয়গণ ভগবান্ হইতে পূণক’ নয়, সফ-
লই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার শক্তিকে মায়ী
বলা যায়, কারণ জড়ের সহিতও সঞ্চ
আছে। ব্যাপক সত্য বলিয়া ব্যাপ্যও সত্য।

সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্মই এই বিশ্বের
নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। বাহা আছে,
তাহা চিরকালই আছে। বাহা নাই, তাহা
কখনও ছিলও না, এখনও নাই, কখনও
হইবেও না। গীতোক্তি—“না সত্যো
বিভভেহতানো নাভানো বিভভে সত্যঃ।”

সুতরাং সকলই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া

উঁহার সহিত অঙ্গীকার। ব্রহ্মের যে শক্তি সূত্র, তাহাকে মারা বলে। এই জগৎ-প্রপঞ্চ মারা হইতে উদ্ধৃত। মারা যখন ব্রহ্মে অব্যক্ত অবস্থাতে থাকেন, তখন জগৎ নাই। অব্যক্ত ব্যক্ত হইলেই জগৎ প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। এই মারার অস্তিত্ব আছে ও বলা যায়, নাট ও বলা যায়। যখন ব্রহ্মে লীন থাকে, তখন ইহার অস্তিত্ব নাই, যখন ব্যক্ত হয়, তখন ইহার অস্তিত্ব আছে। এই জন্ত বেদে মারার নাম 'সদসদাঙ্গিকা'। মারার ব্যক্ত অবস্থায় জগৎ-প্রপঞ্চ এবং ব্যক্ত অবস্থায়ই নাম-রূপাদি দৃষ্ট হয়। তখন একই সং পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয়। এই জগৎ-প্রপঞ্চ ব্যক্ত, ব্রহ্ম সত্য ব্যাপক। ব্যাপক—অর্থাৎ ব্রহ্ম সং বলিয়া ব্যাপ্য—অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চ সং। সাধারণতঃ ব্রহ্মকে নিমিত্ত-কারণ এবং মারাকে জগতের উপাদান-কারণ বলা হয়; কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণ। ব্রহ্মের কোন পরিবর্তন নাই, কিন্তু মারায় সদাসর্বদা পরিবর্তন হইতেছে।

অষ্টাশীতি, উননবতি সূত্র—এই বিশ্ব কোন প্রাণি-বুদ্ধি-উদ্ধৃত হয় নাই; কারণ উহা অসম্ভব যে—জগৎ নির্মাণ করিয়া তিনি পিতার জ্ঞান শ্রুতি উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মহেশ্বর-বুদ্ধি অতি গৌমানন্দ। এই বিশ্ব সৃষ্টি করা দূরে থাক্, অতিশয় জ্ঞানী ব্যক্তিরও একটা সামান্য বালুকণার ভয় অবগত নহেন। সুতরাং যে বুদ্ধি-বলে এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা মহান্ এবং অসীম। পিতা যেমন পুত্রের কল্যাণার্থে সর্বদা ব্যস্ত, ভগবানও সেইরূপ এই বিশ্বের কল্যাণার্থে সর্বদা ব্যস্ত।

নবতি সূত্র—জীবহিংসা দি করা বাইতে পারে, একরূপ উপদেশ অনেক হলে আছে, কিন্তু সে সকল উপদেশ স্মরণ। জীবন ধারণ করিতে হইলে, মহেশ্বরের অন্ততঃ জল পান করিতে হয় ও বায়ু গ্রহণ করিতে হয় ও কিছু না কিছু খাইতে হয়, তাহাতে জীবহিংসা অনিবার্য। তাহাতে যে পাপ হয়, তদ্বিচারার্থে গৃহস্থের "পঞ্চসূনা বজ্র" পরিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বেদে যে প্রাণিহিংসার উপদেশ রহিয়াছে, একপাঠিক নহে। বেদার্থ সম্যক্ বুঝিতে না পারিধাই ঐক্য বিবেচনা করা হয়।

একনবতি সূত্র—বাদরায়ণ বলেন, সর্বকলই তাঁহা হইতে উদ্ধৃত হয়। বেদান্ত সূত্রের প্রথম পাদে ২য় সূত্রে আছে—“জনাচ্ছ বতঃ ইতি”—উঁহার বিশদ ব্যাখ্যা এই যে, যে সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ কারণ হইতে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হইয়া থাকে এবং যে বিশ্ব নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত ভাব ধারণ করে এবং বাহ্যতে বহুবিধ কৰ্ত্তা ও ভোক্তা আছে এবং বাহ্য কর্মফলের আধার স্বরূপ, যে কর্মফল সমূহের ভিন্ন ভিন্ন দেশ, কাল ও কারণ রহিয়াছে এবং যে দেশ-কাল-পাত্রেয় ব্যবস্থা মনের অগম্য, সেই কারণই ব্রহ্ম। সুতরাং ভগবানই সর্ব কর্মফলদাতা। এই জন্তই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন, মানবের কর্মেই অধিকার আছে, কলে অধিকার নাই।

দ্বিনবতি সূত্র—সৃষ্টি যে ক্রম-অনুসারে হয়, তাহার বিপরীত ক্রমে তাহার লয়। সৃষ্টির ক্রম বর্ণা—ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি

হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথ্বী; এবং লক্ষের জন্ম, পৃথ্বী জগতে, জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশেতে, আকাশ প্রকৃতিতে এক প্রকৃতি ত্রয়ে লয় প্রাপ্ত হয়।

ক্রয়নবতি সূত্র—উপাধিবাগে কা হানিতে সুর্য্যের জ্ঞান একই বস্তু দেখায়। জগতে একমাত্র পদার্থ, কিন্তু উপাধির ভিন্নতা বস্তুতঃ বহু প্রতীকমান হয়। একই তত্ত্ব প্রকল্পিত সপ্তম সপ্তম যেমন বহু দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ চক্রগতিতে একই ব্রহ্মসত্ত্ব বিবিধ প্রতীকমান হয়।

চতুর্দশতি সূত্র—ব্রহ্ম যদি বিদ্য হইতে তিন্ন হইত, তাহা হইলে বিদ্যের সত্যিত কি বস্তু থাকে? অতএব তিনি বিদ্য হইতে তিন্ন নহেন। বৈতনাদ্বারা বলেন যে, বিদ্য ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ; অর্থাৎ স্রষ্টা সৃষ্টি-ব্যাপার হইতে বস্তুতঃ। যদি বিশ্বের সুগ কারণের বস্তুতঃ সত্য স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সৃষ্টি-পারমার্থে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ, এই দুই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম সগীত হইয়া পড়েন অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব থাকে না। অতএব ব্রহ্ম তিন্ন অস্ত কোন পদার্থই নাই এবং তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, ইহাই স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্চদশতি সূত্র—ব্রহ্ম বিকারের অধীন নহেন। অতরাং ব্রহ্মপদার্থের বিকার হইতে জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে, একথা বলা বাট্‌ইয়া পারি না। জগৎ ব্রহ্মের অসংখ্য বস্তুগণের সম্মিলন হইতে উদ্ভূত।

ষট্‌দশতি সূত্র—অত্যন্ত তত্ত্বি কাম্য ত্রয়েতে বুদ্ধি-লয় হেতু তাহারও একই সংঘটিত হয়। শ্রীভা বলেন—

“পুরুষঃ সগরঃ পার্থ তজ্জা লভস্বনভ্রাতা।
বস্ত্রাশুঃতানি তুতানিগেন সর্গসিদ্ধং তৎস্মা।”

তে পার্থ! দেই পরপুরুষকে তত্ত্বি করাই পাওয়া যায়। উচিতাই সকল তুত বিস্তারিত আছে ও তাহা করাই সর্গ প্রাপ্তি পরিচালিত হইয়াছে।

সপ্তদশতি সূত্র—ভক্তের দীর্ঘায়ু হইতে পারেন। কিন্তু তখন উচিতদের কোন কাশনা থাকে না। সকল কাশনাই ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হইয়া, অস্ত কোন কাশনা থাকে না।

অষ্টদশতি সূত্র—ভক্তির অভাবেই জন্ম-মৃত্যু প্রহরণ হইয়া থাকে, জ্ঞানের অভাবে নহে। পূর্বেই দেখান হইয়াছে যে, তত্ত্বি ও জ্ঞান এক নহে এবং তত্ত্বি হইতে মুক্ত হয়। অতরাং জ্ঞানীগণের ভক্তির অভাবে জন্মমৃত্যু প্রহরণ করিতে হয়।

নবদশতি সূত্র—কাত্তের জ্ঞান মানবেরও জ্ঞানময়; যথা, বেদ, শ্রুতি বা শব্দ, লিঙ্গ বা অণুমান, অক্ষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান।

শততম সূত্র—স্বাধিকার ও তিরোভাব কার্য-কারণের সংযোগ হইতে উদ্ভূত হয়। কিন্তু আপাততঃ তাহার ব্রহ্মের বিকার বলিয়া বোধ হয়। একটা মুগ্ধ ঘট লগ; কৃষ্ণকার টাকাক ঘট করিবার পূর্বে টাকাক যে অস্তিত্ব ছিল না, একথা বলা যায় না; কারণ ইচ্ছা তখন সৃষ্টকার ছিল, সৃষ্টকা সৃষ্ট হইবার পূর্বে সৃষ্টিকা সৃষ্টকার কারণে ছিল; এইরূপে ঘট যে কোন সময়ে ছিল না,

তারা বলা যায় না। ভবিষ্যতে যে বটে থাকিবে না, উহাও বলা যায় না। ভাঙ্গিয়া গেলে, উহা ধুলি-পরিণাম বা অল্প কোন রূপান্তর প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ভাঙ্গা-হচ্ছে গড়া হচ্ছে এইরূপ কার্য-কারণের মোগে একই পদার্থ বহুবিধ প্রতীয়মান হয় + (ক্রমশঃ)

ধ্যান

৮ —

মানব-মনের পাঁচ প্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। উহার যথাক্রমে ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। সাধারণতঃ মন কখন চঞ্চল, কখন আচ্ছন্ন, কখন পাশাপাশি রূপে স্থিরতাব ও চঞ্চলতাব—এইরূপ ভাবেই থাকে। এই সমস্ত ভাবের নাম ক্ষিপ্ত, মুঢ় ও বিক্ষিপ্ত। আর মনের একতান অবস্থা বা একভাবে নিমগ্ন থাকিয়া অন্তর্জিতিকে একাগ্রতাব বলে। একাগ্র ভাব লাভ হইলে, ধ্যান নামে সমুদ্র যোগাঙ্গের আঁধারতাপান সহজ হইয়া আসে। এই 'একাগ্র' ও 'নিরুদ্ধ' নামক অবস্থাদ্বয়ই যোগপনের অল্পকূল।

“তত্র প্রতৈত্যকতানতা ধ্যানম্”

(মহর্ষিপতঞ্জলিঃ)

ভাষ্যম্—নাতিচক্রে, নামাগ্রা, জদয়-পুণ্ডরীকে, স্কন্ধি, জ্যোতিষ, নামিকাগ্রে,

+ অরুণ্ডলর স্থপ মর্ষ দেওয়া হইল। বারাস্তরে অরুণ্ডলির পদপাঠ ও মাতোক স্ত্রের অবিকল বঙ্গভাষা এবং সমগ্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

কিহ্বাগ্রে, মোমাগমনস্ত পতাত্তৈকতানতা-সদৃশঃ প্ৰবাহঃ প্ৰত্যাহস্তরেন অপগামুস্তৌ ধ্যানম্।’ (ভোক্তবুধ্যাদিনী চ); —

‘মত্র চিত্তং ধৃৎ তত্র যা প্ৰত্যাহনাং জ্ঞানবুধীনাং একতানতা মন্ত্রমনপেটিকা কনি-মরতা তৎ ধ্যানম্ যদেব পার্ণায়ামবলম্বনী-কৃতং তদাকারান্ধারিতশ্চিত্তবৃত্তিঃশ্চৎ অন-স্তরিতা প্ৰবহতি তৎধ্যানম্।’

‘নাতিচক্রনামাগ্রৌ দেশে যত্র চিত্তং ধৃৎ তত্র পতায়স্ত জ্ঞানস্ত যা একতানতা বিগদৃশপরিণামপরিহারধারেণ যদেব পার-ণায়ী অবলম্বনীকৃতং তদবলম্বনতঃস্বয়ং নির-স্তরমুৎপাদিতঃ সা ধ্যানম্ উচ্যতে।’

“তচ্চ ধ্যেয়ধ্যানখ্যাতৃকুষ্টিমং।”

নাতিচক্রে, জদয়-পুণ্ডরীকে, স্কন্ধি-জ্যোতিষ, নামিকাগ্রে, কিহ্বাগ্রে কিবা অল্প কোন বাহু-বায়-ইহাদের মধ্যে কোন এক দেশ বা বিষয়ে চিত্তবৃত্তির একতানতা, (কোন রূপ প্রবৃত্ত ব্যতিরেকে যে এক বিশ-য়তা), তাহাকে ধ্যান বলে। চিত্ত বাহ্য অবলম্বন করিয়া পারণা অতীত করিতে রত হয়, সেই ধ্যেয় পদার্থ চিত্তে বিগদৃশ পরিণাম পরিহারপূর্বক যখন নিরস্তর উৎপন্ন হইতে থাকে, তখন তাহাকে ধ্যান বলে। ধ্যান-কালে অল্প কোন প্ৰত্যাহ বা জ্ঞান থাকে না। ধ্যান-কালে চিত্তবৃত্তির সদৃশ পরিণাম থাকে বটে কিন্তু বিগদৃশ পরিণামের একেদারেই পরিহার হয়। ধ্যান-কালে চিত্তবৃত্তির একটা মাত্র সদৃশ প্রবাহ জন্মিলে থাকে ও তখন চিত্তবৃত্তি কোন এক বিষয়ে বৃত্ত হইলে, একাকারিত-ও অন্তর্ভুক্তরূপে প্রবাহিত হয়।

পুরাণতত্ত্বদর্শী গারুড়ে বলিয়াছেন,
‘প্রাণান্নামৈষাদশভির্থাব্যং কালঃ কৃতোত্তবেৎ।
স তাব্যং কালপর্যাপ্তং মনো ব্রহ্মণধারণয়েৎ ॥’

অর্থাৎ দ্বাদশবার প্রাণান্নামে এক ধারণা
হয়। দ্বাদশবার ধারণার একবার ধ্যান
হয়। অন্যত্র ইহাকে ধ্যানের সামাজ্যলক্ষণ
বলিতে হইবে। বিশেষ লক্ষণ সূত্রে উক্ত
হইয়াছে। ধ্যানের লক্ষণ সম্বন্ধে অপর
কেহ কেহ বলেন,

যাহা হইতে আত্মপত্যাক জন্মে, তাহাকেই
ধ্যান বলে।

‘ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।’

মনে মনে আত্মার স্বরূপচিত্তাকেও
ধ্যান বলে।

“ধ্যানমায়ত্ত্বপুরুষস্ত বেষরনঃ মনসা খলু”

সুগ, স্মৃতিভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। সগুণ
ও নিগুণ ভেদেও ধ্যান দ্বিবিধ। আবার
সুগধ্যান, জ্যোতির্ধ্যান ও স্মৃতিধ্যান, এই
ত্রিধা ধ্যানপ্রণাণ আছে। যথা,

“সগুণং নিগুণং তচ্চ সগুণং বহুণঃ স্মৃৎ”

“সুগং জ্যোতিস্তথা স্মৃৎধ্যানস্ত ত্রিবিধং
বিদুঃ। সুগং মূর্ত্তিময়ং পোক্তং জ্যোতি-
স্তেন্দ্রোমরত্বপা। স্মৃৎং বিন্দুময়ং ব্রহ্ম কুণ্ডলী
পরদেবতা।”

বাহাতে মূর্ত্তিময় ইষ্ট দেবতাকে বা পরম
শুককে ভাবনা করা যায়, তাহার নাম
সুগধ্যান, যাহাওয়ার তেন্দ্রোমর ব্রহ্ম বা
প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতি-
ধ্যান বলে এবং যাহা হইতে বিন্দুময় ব্রহ্ম
বা কুণ্ডলিনী পুঞ্জির দর্শন করিবার ক্ষমতা
জন্মে, তাহাকে স্মৃতিধ্যান বলে। জাহা হইলে
স্মৃতিধ্যান বৃষ্টিতে হইলে ‘বিন্দু ও কুণ্ডলী’
পদার্থ কি, তাহা অগ্রে বুঝা উচিত।

বিন্দুই পরমব্রহ্ম। যাহার দৈর্ঘ্য নাই
প্রস্থ নাই, উচ্চতা নাই, এবংবিধ স্ক্রুতম
পদার্থের নাম বিন্দু। এই বিন্দু ভিত্তমান
হইয়া অবাক্রমরূপ অপরব্রহ্ম উৎপন্ন
হইয়াছেন এবং এই অপর ব্রহ্মই ‘শব্দব্রহ্ম’
নামে অভিহিত হ’ন।

‘ভিত্তমানাৎ পরাধিক্কারবাক্রাঙ্কানবরোহভবৎ।
শব্দব্রহ্মেতি তং প্রাহঃ সর্বাগমবিশারদাঃ ॥

শব্দব্রহ্মেতি শব্দার্থং শব্দমিত্যপরে জগুঃ।

ন চি তেভ্যাং তয়োঃ সি ‘ব্রহ্ম ১৩ স্বাদভয়োরপি।

চৈতন্ত্যং সর্বভূতানাং শব্দব্রহ্মেতিমমতিঃ”।

পরমবিন্দু ভিত্তমান হইয়া অবাক্রমরূপ
অপরপঞ্চ উৎপন্ন হইলেন। আগমবিশারদ
মহাত্মাগণ ইহাকেই ‘শব্দব্রহ্ম’ বলিয়া নির্দেশ
করিয়াছেন। শব্দক্ষেটাবাদীরা শব্দকে
এবং অর্থক্ষেটাবাদীরা অর্থকে শব্দব্রহ্ম বলেন;
কিন্তু তাহাদের কোনটাহেই তাঁহাদের
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। কারণ
শব্দ ও শব্দার্থ, উভয়ই জড় পদার্থ।
তত্ত্বজ্ঞানচারাজ ‘সারদাতিলকে’ বলিয়াছেন,
যিনি সর্বভূতের চৈতন্ত্যরূপ, তিনিই শব্দব্রহ্ম।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও শব্দার্থ
যদ্বারা প্রকাশিত হইতেছে, তিনিই শব্দব্রহ্ম।
পরম শব্দ ও শব্দের অর্থ শব্দব্রহ্মের বিরাট
মূর্ত্তির অন্তর্গত। সুতরাং শব্দ বা শব্দার্থকে
শব্দব্রহ্ম বলাতে তাদৃশ দোষ হয় নাই।
কারণ অর্থ ও চৈতন্ত্য সমবেত শব্দ এবং
শব্দও চৈতন্ত্য সমবেত অর্থ অন্যত্রই শব্দব্রহ্ম
হইতে পারেন। জগতে শব্দব্রহ্ম হইতে
ভিন্ন কোন শব্দ নাই ও কোন পদার্থও
নাই। ব্রহ্ম বখন অহুপহিত ও নিজের
ধাকেন, তখন তাহাকে পরমব্রহ্ম বা পরপ্রাণ

বলা যায়। ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিতে উপস্থিত
অথবা প্রকৃতিস্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করিতে
থাকেন, তখন প্রকৃতি-পুরুষ, মহত্ত্ব, অহ-
কারত্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর অবশি এই
ত্ৰয় জগৎ পর্যান্ত সমুদায়ই অপরব্রহ্ম;
শব্দব্রহ্ম ও অপর প্রণব শব্দে অভিহিত হন।
অনুপস্থিত চৈতন্য ও উপস্থিত চৈতন্য অর্থাৎ
পরপ্রণব বা পরমব্রহ্ম এবং অপর প্রণব বা
শব্দব্রহ্ম এতদুভয়ের সমষ্টিকে মহা প্রণব বলা
যায়।

বিন্দুই ব্রহ্ম স্বরূপ; ইহাই জগৎসাক্ষী,
সর্বব্যাপী ও মহেশ্বর। তত্ত্বজ্ঞমহারাজ
'সারদাতিলকে' একস্থানে বলিয়াছেন,
'অপবিন্দ্বান্যনঃশব্দোঃ কালবন্ধোঃ কলাত্মাঃ।
বভূব চ জগৎ সাক্ষী সর্বব্যাপী মহেশ্বরঃ ॥
মহেশ্বরাত্তবেদীশত্বতো রুদ্রস্ত সন্তব্যঃ।
ততোবিষ্ণুস্ততো ব্রহ্ম তেবাসেব সমুদ্ভবঃ ॥

কালের মহারাজার শক্তির সহিত একী-
ভূত বিন্দুরূপ পরম শিব (ব্রহ্ম) হইতে জগৎ-
সাক্ষী, সর্বব্যাপী, মহেশ্বর উৎপন্ন হইলেন।
মহেশ্বর হইতে ঈশ্বর, ঈশ্বর হইতে রুদ্র,
রুদ্র হইতে বিষ্ণু বিষ্ণু হইতে ব্রহ্মা উৎ-
পন্ন হইয়াছেন।

প্রকৃতি বা আত্মাশক্তির গুণ-কোভ
উপস্থিত হইলে (তৎপ্রসূত মহাকালসহকারে)
তাহা হইতে মহত্ত্বের উদ্ভব হয়। এই
মহত্ত্বের অপর নাম বৃহত্ত্ব বা নাদ।
সব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণভেদে
নাদ আবার ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ নাদ হইতে
সাত্বিক বিন্দু, রাজসিক বিন্দু ও তামসিক
বিন্দু। এই ত্রিবিধ বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে।
আত্মোত্তরা এই ত্রিবিধ বিন্দুকে সাত্বিক

অহকার, রাজসিক অহকার ও তামসিক
অহকার বলিয়া থাকেন। কথিত আছে,
"সক্তিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেস্বরাৎ।
আসীচ্ছকিত্ততো নাদো নাদাভিন্দু সমুদ্ভবঃ ॥
পরশক্তিগমঃ সাক্ষাৎ ত্রিধাসৌ ভিষ্ণুতেপুনঃ।
বিন্দুনাাদৌজ্জমিতি তত্ত্ব ভেদাগমীরিতাঃ ॥
বিন্দুশিবাত্মকং বীজং শক্তির্নাদস্তরোমিণঃ।
সমবায়ঃ সমাখ্যাঃ সর্বাগমনিশারদৈঃ ॥
রৌত্রীবিন্দোত্ততো নাদাৎ জ্যোষ্ঠা বীজাদ-
জারতা।

রাসা তাভাঃ সমুৎপন্নী রুদ্রব্রহ্মরমাধিপাঃ।
তে জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ায়নো বহীর্ধর্কণরূপিণঃ ॥"

সক্তিদানন্দময়ী আত্মাশক্তি হইতে নাদ
বা মহত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। গেই নাদ
হইতে বিন্দু বা অহকার তহের উৎপত্তি
হইয়াছে। সাত্বিক বিন্দু বিন্দু, রাজসিক
বিন্দু বীজ এবং তামসিক বিন্দু নাদ নামে
অভিহিত হন। এই বিন্দু, বীজ ও নাদের
মধ্যে বিন্দুই শিবস্বরূপ চিন্ময়; বীজ
শক্তি স্বরূপ প্রকৃতি এবং নাদ উত্তরাত্মক
শিব-শক্তির সমবায় স্বরূপ।

বিন্দু হইতে রৌত্রী শক্তি, নাদ হইতে
জ্যোষ্ঠা শক্তি এবং বীজ হইতে বামা শক্তি
উৎপন্ন হইলেন। এই রৌত্রী শক্তি হইতে
রুদ্র, জ্যোষ্ঠা শক্তি হইতে ব্রহ্মা এবং বামা
শক্তি হইতে বিষ্ণু উৎপন্ন হইয়াছেন।
ত্রিবিধ মহত্ত্ব এবং ত্রিবিধ বিন্দু-ব্রহ্ম
বিষ্ণু মহেশ্বরের বীজ মাত্র।

এই রুদ্র জ্ঞানশক্তি স্বরূপ, ব্রহ্মা ইচ্ছা-
শক্তিস্বরূপ এবং বিষ্ণু ক্রিয়াস্বরূপ। রুদ্র-
বলি-মূর্তি ও সংহারকর্তা, ব্রহ্মা চন্দ্রমূর্তি ও
সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু স্বর্গ্য-মূর্তি ও পালনকর্তা—

ভক্ত মহারাজ 'ক্রিয়ামারে' বলিয়াছেন—
 'বিন্দু শিবায়কগুণীগং শক্ত্যায়কং স্তম্।
 তরোর্বোপে ভবেন্নাদভেভো। জাতা জ্ঞিশক্তমঃ ॥'

বিন্দু শিবায়ক, বীজ শক্ত্যায়ক ও নাদ শিবশক্ত্যায়ক। এই বিন্দু, বীজ এবং নাদ হইতে ত্রিশক্তি অর্থাৎ জ্ঞান, ইচ্ছা এবং ক্রিয়া নামক শক্তিত্রয়ের উদ্ভব হইয়াছে। এখানে ক্রয়, ব্রহ্ম ও বিষ্ণুর উল্লেখ না থাকিলেও, তাঁহারা যে ঐ শক্তি-ত্রয় হইতে অতিরিক্ত, ইহা বুঝা যায়। মূল প্রকৃতির সহিত সাক্ষদানন্দ্রঞ্জের বেরূপ কোন ভেদ নাই এবং উত্তরে বেরূপ তাদাত্ম্য-ভাবে অবস্থিত করেন, সেইরূপ জ্ঞানশক্তির সহিত ক্রয়, ইচ্ছাশক্তির সহিত ব্রহ্ম এবং ক্রিয়ামাত্রের সহিত বিন্দু তাদাত্ম্যভাবে প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। যোগী মহারাজ পোরন্দ্রদেব ক্রয় ব্রহ্ম-বিষ্ণুর উল্লেখ না করিয়া শক্তি-ত্রয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ইচ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানঃ গৌরী ব্রাহ্মী চ
 বৈকণ্ঠী ।
 ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা লোকৈ তৎপরঃ জ্যোতি-
 রোমিতি ॥"

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়ামাত্র, গৌরী, ব্রাহ্মী ও বৈকণ্ঠী নামে অভিহিত হ'ল। এই ত্রিধা শক্তি হইতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রায় কার্য সম্পন্ন হইতেছে।

এই ত্রিধাশক্তির পরমপ্রোতি ও প্রণব। যোগী মহারাজও বলিয়াছেন,
 "নমঃ শিবায় স্তরবে নাদবিন্দুকণাক্ষণে।
 নিঃস্রবৎ পবনং বাতি নিত্যং ব্রহ্ম পরায়ণং ॥"
 "নাদবিন্দুকণাক্ষণে স্তরবে নমঃ"

নাদবিন্দুকণা বাঁহার স্বরূপ এবং বিংশতি শব্দকে প্রণাম। কাঃশ্র-ঘণ্টার শব্দকে অমুরাগবৃত্ত করিয়া যে শব্দ, তাহার নাম নাদ ("কাঃশ্রঘণ্টানিহাদবদমুরাগঃ নারিঃ)। ইহা কখন মত্তভূঙ্গের স্তার শব্দ অল্পকরণ করে, কখন বা বেণু-বাণীরবে স্তার বোধ হয়। কখন মেঘ-ধ্বনি, কখন বা ঘণ্টা-ধ্বনয় শব্দরূপ উপজিত করে। এই নাদ ও বিন্দু চিন্তা করিলে সংসারানুককার নাশ হয়। মত্তভূঙ্গবেণুগীর্ণা সদৃশঃ প্রথমো ধ্বনিঃ ।
 এবমভ্যাগন্তঃ পশ্চাৎ সংসারধ্বাস্তনাশনং ॥
 ঘণ্টারবসমঃ পশ্চাৎ ধ্বনির্মেষরবোপমঃ ॥
 ধ্বনৌ ভঙ্গিনু মনো দম্বা যদা ভিত্তি নির্ভরম্ ॥
 অমুরাগের উত্তরতাবী ধ্বনিকে বিন্দু বলে। 'কলা পাদৈকদেশঃ' নামের অংশ বিশেষের নামই কলা। গুরু নাদ, বিন্দু ও কলা-য়ক অর্থাৎ নাদ-বিন্দু-কলাই তাঁহার স্বরূপ। এই নাদ ও বিন্দু ইহার শক্তি স্বরূপ; ও মূর্তিমতী, ইহাদের মূর্তি, বীজ, চক্র ও অস্থিভেদের প্রণাবী গুরু শব্দ নিকট হইতে জানিয়া দইতে হয়।

মহর্ষিও বলিয়াছেন, "স পূর্বেষামপি গুরুকালেনাবচ্ছেদাৎ" গুরুই শাক্যং ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরই শাক্যং গুরুস্বরূপ। কাল সকল পদার্থেরই অবচ্ছেদক, কিন্তু সেই অবার মহাপুরুষের কোন অবচ্ছেদ নাই বলিয়া তিনি সকলের গুরু।

বিন্দু ও নাদকে স্থির করিতে পারিলে পরমানন্দ লাভ করিতে পারা যায়। তত্ত্বজ্ঞ প্রাণারামপারাম যোগী ও সাধকগণ বিন্দু স্থির করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন। যোগী মহারাজ বৃত্তারাম বলেন,

“মনঃটৈর্হর্ষো হিরো বাহুততো বিন্দুঃ হিরো
ভবেৎ ।

বিন্দুটৈর্হর্ষাৎ সর্গাসক্তং পিণ্ডটৈর্হর্ষাৎ প্রজারতে ॥
ইন্দ্রিয়াণাং মনো নাথো মনোনাথস্ত যাকৃতঃ ।
যাকৃতস্ত লয়ো নাথঃ স লয়ো নামসাম্প্রিতঃ ॥”

চিহ্নটৈর্হর্ষা সম্পাদিত হইলে, স্থিরীভূত
প্রাণবায়ু বিন্দুস্থিরীকরণে আশুকুণ্ডা প্রবান
করিয়া থাকে । যখন বিন্দু স্থিরীভূত হয়,
তখনই দেহ স্থির হয় । দেহ স্থির থাকিলে
জীবনশক্তি লাভ ঘটে । মনের লয় হইলে
প্রাণ স্থিরভাবে থাকে; আর প্রাণ স্থির
হইলেই দেহ স্থিরভাবে থাকে । মনের
লয়পাপ্ত অবস্থাকেই নাম বলে । ইহা
ছায়া বুঝা যায় যে নাদাবস্থা লাভ ঘটিলে বা
প্রাণবায়ু স্থির হইলে অর্থাৎ সমাধি লাভ
করিলে, বিশ্বপরিপালিকা শক্তি স্তম্ভ গভমধী
দেবী জগদ্ধাত্রী এক কলাগময় শব্দ
সমুৎপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যকে
আনন্দে পরিপূর্ণ রাখিতেছেন ইহা অশুভূত
হইবে ।

তত্ত্বপারদর্শী মহাশয় তাঁহার সংহিতাগ্রন্থে
বর্ণিতাছেন,

বিন্দুঃ শিবো রজঃ শক্তিক্রমোর্মণনং স্বরম্ ।
স্বপ্রভূতানি জারন্তে স্বশক্তাশ্চক্রপমা ॥

বিন্দু শিব এবং রজঃ শক্তি-স্বরূপ ।
এই প্রকৃতি-পুরুষের মিলনে অর্থাৎ পর-
মাত্মা স্বর স্বকীর শক্তিকে স্বীকার করিয়া,
বহুরূপে প্রকাশ পাইলেন ।

‘শাস্ত্রীঃ সূত্রিকাং কৃষা আত্মপ্রত্যক্ষমানয়েৎ ।

বিন্দুব্রহ্ম পরম্ভূতী মনস্তত্র নিরোজয়েৎ ॥’

আত্মপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে শাস্ত্রী

সুদূর অশুভান করিতে হয় । তৎপরে

বিন্দুময় ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করিয়া বিন্দুময় ব্রহ্ম
মনকে নিয়োজিত করিতে হয় ।

যোগী মহারাজ সংহিতাগ্রন্থে “আত্ম-
সাক্ষাৎকরণ ও নাদাভ্যাসদ্বায়েন” উপায় সম্বন্ধে
বলিয়াছেন,

“অসুষ্ঠাভ্যাসুতেশোভে তর্জনীভ্যাং দ্বিগো-
চনে ।

নামারক্ষু চ মধ্যাভ্যাসু স্তম্ভাভ্যাং বদনে দৃঢ়ং ॥

নিক্রধান্ মাকৃতং যোগী বর্দেবঃ কুরুতেভূষণম্ ।

তদা লক্ষণমাস্ত্রানং কোষ্ঠীকরণং প্রপশ্যতি ॥

তত্তেজো দৃশ্যতে শেন লক্ষণাং নিরাবিলম্ ।

নাদঃ সংজারতে তস্ত ক্রমেণাভ্যাগতশ্চ বৈ ॥

মত্তভূকবেধুণীগাদৃশ + + নির্ভরম ।

তদা সংজারতে তস্য লক্ষণ্য মম বসন্তে ॥

তত্র নাদে বদা চিত্তং রমতে যোগিনোভূষণম্ ।

বিন্দুভ্যা সফলং বাহুং নাদেন সহ শামতি ॥

এতদভ্যাগযোগেন লিঙ্গা সম্যক্ গুণান্ বহুন্ ॥

সর্কারস্তপরিভ্যাগী চিদাকাশে বিলীয়তে ॥

নামনং সিদ্ধাদৃশং ন কুন্ত সদৃশং বশম্ ।

ন পেচরী মদা যজ্ঞা ন নাদাদৃশো লয়ঃ ॥

“স্বকং বিন্দুকং মধ্যম্য”

“বায়ভাগেছ’পি তদ্বিন্দুনীষা”

“বিন্দুনিধুময়ো জেরো রজঃ সূর্য্যাময়স্তথা ।

উভয়োর্মেগনং কাৰ্ধ্যং স্বপ্নীরে প্রযত্নতঃ ॥

অহং বিন্দুরজঃ শক্তিক্রমোর্মণনং বদা ।

যোগিনাং সাধনবতঃ তবৈচ্ছিবাসংপুস্তক্যে ॥

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ ।

তদ্ব্যবহিত প্রবন্ধেন কুরুতে বিন্দুধারণম্ ॥

জারতে ত্রিতরে লোকো বিন্দুনা নাজসংশর ।

এতচ্ছাস্ত্রমর্দা যোগী বিন্দুধারণমাচরেৎ ॥

সিদ্ধে বিন্দৌ মহারয়ে কিং ন শিখ্যতি কুন্তলে ।

বস্ত্র প্রসাদান্নহিমা সমাপ্যে ভ্রাদুশী ভবেৎ ॥

বিন্দুঃ করোতি সর্কেবাঃ স্মৃৎঃ দুঃখক
সংস্থিতম্ ॥”

একারণে বিন্দুঃ যোগী প্রধা-
রয়েৎ ।”

“গতঃ বিন্দুঃ স্বকং যোগী বক্রয়েৎ যোনি-
মুদ্রয়াঃ ।”

“শুক্লপদ্বিষ্টমার্গেন প্রত্যহং যঃ সমাচরেৎ ।
বিন্দুসিদ্ধির্ভবেত্তস্য মহাসিদ্ধিঃ প্রদারিকা ॥”

সিদ্ধে বিন্দৌ মহাসিদ্ধিঃ কিং ন সিধ্যতি ভূতলে ।

বিন্দুরূপং মহাদেবং ব্যোমাকারং সূর্য্যশিখং ।
সুদক্ষটিকসক্ষাং বালেন্দ্রুভূতমৌলিনং ॥
গন্ধবক্তৃষুতং সৌম্যং দশবাহুং ত্রিলোচনং ।
সর্কীয়ুধোদ্যতকরং সর্কীভরণভূষিতং ॥

প্রণবেদৈব কার্য্যাণি স্নেহে সংহত্য কারণে
প্রণবস্য তু নাদাস্তে পরমানন্দবিগ্রহং ॥

স্বঃ তন্নাং প্রণবেদৈব প্রাণায়ামৈমজ্জি-
ভিজ্জিতিঃ ।

ব্রহ্মাদিকার্য্যরূপাণি স্নেহে সংহত্য কারণে ॥
বিস্তরচেতসা পশ্য নাদাস্তে পরমায়নি ।
তস্মিন্নর্থে বদন্ত্যন্যে যোগিনো ব্রহ্মনিধরারঃ ॥”

অর্করাশ্মিতে যোগী কুন্তুনাং শব্দবর্জ্জিতে ।
কর্ণোপিধার হৃতাভ্যাং কুর্ধ্যাৎ পুনরুকুন্তকং ॥
লুণ্ঠরাদ্বন্ধিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং শুভং ।

প্রথমং বিক্রো বীনাধকং বংশীনাদং ততঃ পরম্ ॥
মেঘধ্বজং রত্নরীষটীকাং সান্ততঃ পরং ।
ভূরীভৈরীমুদ্রাদ্বিনি নাদানকহুশুভিঃ ॥

এষু নানাবিধং নাদং জারতে নিত্যমভ্যাসৎ ।
অনহিতস্য পক্ষ্য তস্য পক্ষ্য যো ধ্বনিঃ ॥

ধ্বনেরন্তর্গতং জ্যোতির্জ্যোতেরন্তর্গতং মনঃ ॥
তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিক্রোঃ পরমং পদং ।”
“প্রানাপাগ্যো নাদবিন্দুজীবাশ্চ পরমাশ্চরণী ।
সিলিভা ঘটতে যন্মাত্সাটৈর্ঘট উচ্যতে ॥”

কুণ্ডলী ।

পরমা প্রকৃতি কুলকুণ্ডলিনীকে কুণ্ডলী-
শক্তি বলে। ইনিই চিচ্ছক্তি মহামায়া ।
এই কুণ্ডলীশক্তি সেরুদগুহু অষ্টচক্রে অষ্টধা
অবস্থিতি করিতেছেন ।

“তন্ত্রোক্তে বিষতন্ত্রনোদরলগৎসুস্মা-
জগন্মোহিনী, ব্রহ্মদ্বারমুখং মুখেন মধুরং
সাজ্জাদয়ন্তী স্বয়ং । শশ্বাবর্তনিভা নবীনা
চপলামালা বিলাসাম্পদাশ্রুতা মর্পসমা শিরো-
পরিণলগৎসার্কজিবৃত্তাকৃতিঃ ॥”

স্বঃসু শিবের উপরিভাগে সুগলতন্ত্রমদ্বী
অতি সুস্মা ও জগন্মোহিনী মহামায়া আছেন ;
যিনি যেছাপূর্বক বদন বিস্তার পূর্বক অমৃত-
ক্ষরণ রক্তদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া স্বয়ং
তন্মধুরামৃত পান করিতেছেন এবং শঙ্কগহ্বর
বেষ্টনবৎ মহাকালকে বেষ্টন করিয়া অব-
স্থিত আছেন ও নবীন বিজ্ঞান্যায়ার জ্ঞান
বিলাসমানা হইয়া তিনি সর্পের জ্ঞান নিদ্রিতা
আছেন ও মস্তকের উপরে প্রকাশমান যে
সাদ্বজ্জিবেষ্টন তাহার জ্ঞান আকার ধারণ
করিয়া আছেন ।

“কুণ্ডলী কুলকুণ্ডলী চ মধুরঃ মতালি-
মালাসুটঃ, বাচঃ কোমলকাব্যাবক্রচনা-
ভেদাভিভেদক্রমৈঃ । শাসোচ্ছাপবিবর্তনেন
জগতাং জীবো বধা ধার্য্যতে, সা সূলাযুদ-
গহ্বরে বিলসতি প্রৌঢ়াবদীষ্ঠাবণী ॥

কমনীয় কাব্যকলাপের প্রবন্ধ রচনা কালে যেমন তাহাদের ভেদ ও অতিভেদ দৃষ্ট হয় ও উক্তরূপ মন্ত অগ্নিসমূহ যেরূপ এক অব্যক্ত ধ্বনি করে সেটরূপ কুলকুণ্ডলিনী দেবী মূলাধ্বজ মধ্যে এক অব্যক্ত মধুব ধ্বনি করিতেছেন। কুলকুণ্ডলিনী দেবীর ঝাং ও উচ্ছ্বাসের বিবর্তন বা পমনাগমন হেতু সংসারের জীব সমূহ প্রাণ ধারণে সমর্থ হইতেছে। সেই দেবী মূলাধ্বজ প্রবৃত্তি ও উত্তর দীপ্তি শ্রেণীর স্তায় শোভা পাইতেছেন।

“তন্মধ্যে পরমা কলাতিকুশলা হুস্মাতি-হুস্মা পরা, নিত্যানন্দপরম্পরাতি চপলাসালী লসদীধিতিঃ। ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহমেব সকলঃ যন্তাগরা ভাগতে সেরঃ শ্রীপরমেশ্বরী বিজ-য়তে নিত্যপ্রবোধোদরায়।”

এই কুণ্ডলিনী শক্তিই পরমা কলা; ঠনি অতিশয় বা চাম জ্ঞানদায়িকা ও স্বয়ং হুস্মাতিহুস্মারূপা; ইনি পরা ও নিত্যানন্দ-সমুৎসর্গা; চপলার স্তায় প্রকাশমানা কুল-কুণ্ডলিনী দেবী নিজের দেহপ্রভায় ব্রহ্মাণ্ড কষ্টাহ উদ্ভাসিত করিতেছেন; সেই নিত্য-জ্ঞান-প্রকাশিনী কুলকুণ্ডলিনী দেবী বিশেষ রূপে অরমুক্ত হউন।

হুকারেণৈব দেবীঃ যমনিয়মসমাত্যাস-শীলঃ সুনীলো, জাহা শ্রীনাথবক্তঃ ক্রম-পিচ মহামোক্ষবস্ত্রপ্রকাশঃ। ব্রহ্মস্বরস্ত মধ্যে বিচরতুস্তরং শুকবুদ্ধিপ্রভাবো, তিহ্মা তল্লিঙ্গরূপঃ পবনবহনয়োরাক্রমে-ণৈবতস্তাং।

যট্টক্রের ক্রমাবগতি মোক্ষবস্ত্র-প্রকাশক। শুকসুখ হইতে উহা জানিয়া লইয়া বসন্তলিঙ্গকে সাক্ষিভিত্ত বেষ্টনে গচ্ছ

করিয়া হিতা এবং বায়ু ও অগ্নি দ্বারা প্রবৃত্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে শুকবুদ্ধিপ্রভাব, যমনিয়মসমাত্যাসশীল সাধক হুকার পূর্কক মূলাধার পদ্ম হইতে মহস্রদল পদ্মে নীত করিবে।

‘তিহ্মা লিঙ্গরূপঃ তৎ পরমরগশিবে হুস্ম-ধামি প্রদীপ্তে, সা দেবী শুকসত্তা তড়িদিব বিলসৎ তন্তরূপবরূপা। ব্রহ্মাধারাঃ শিরারাঃ সকলসরসিঙ্গং প্রাণা দেবীপ্যতে তৎ, সোক্তানন্দসরুপং যট্টমতি সহসা হুস্মতাঃ হুস্মপ্রেতা।’

সেই কুণ্ডলিনী দেবী যট্টক্রভেদকালে মূলাধার পদ্ম হুস্মন্তু, অনাহত পদ্ম হুবাধাধা লিঙ্গ ও ক্রমসাহ্য ইতরাধা শিবরূপকে ভেদ করিয়া ব্রহ্মনাড়ীস্থিত মহস্রদল পদ্মে গমাগমন করতঃ পরমরগসর শিবের সহিত বিশেষরূপে শোভা পান। তিনি শুকসত্তা, তন্তরূপবরূপা ও তড়িতের স্তায় শোভমানা এবং সেই দেবী মূলাধারাদিপদ্মে কণকাল মাত্র অবস্থান করিয়া মহস্রদল পদ্মেতেই নিরন্তর দীপ্তমানা থাকেন।

‘নীতা তাং কুলকুণ্ডলীং নবরসং জীবন-সাক্ষিঃ সূখী, সোক্ষে ধামনি শুকপদ্মাদনে শৈবে পরে ষামিনি। ধারেনদিষ্টফলপ্রদীঃ শুগবতীঃ চৈতন্তরূপাঃ পরাঃ, যোগীশো শুকপাদপদ্মধুঁসলালদী সমাধৌ বৃতঃ।’

যিনি চৈতন্তরূপিনী ও সাধকের ইষ্টফল-দায়িনী সেই কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে, শুক-পাদপদ্মে ধ্যানপরায়ণ যোগীশ্রেষ্ঠ সূখী সাধক, জীবের সহিত শিবসদৃশি সোক্ষ-ধারেন লীলা করত মহস্রদল পদ্মে ধ্যান করিবেন।

লাক্ষ্যভং পরমামৃতং পরশিবং পৌত্রা
 ততঃ কুণ্ডলী, পূর্ণানন্দসহোদধাৎ কুলগণ-
 স্মূল বিশেষে স্মরণী। তদ্বিনামৃৎধারমা
 স্থিরমতিঃ গন্তপ্যৈকৈকতং যোগী যোগ-
 পরম্পরাবিদিত্রাঃ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিতং।

তদনন্তর স্মরণী কুণ্ডলিনী দেবী পরম-
 হংস হইতে অলঙ্কৃত পরমামৃত পান করিয়া
 পূর্ণানন্দের উৎপত্তিদায়ক কুলগণ না শুশ্রু-
 মার্গে দ্বারা পুনরায় সুখাদারে পবেশ করেন।
 পরে স্থিরমতি যোগী যোগপরম্পরাজ্ঞম
 ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডস্থিত দিয়া স্মৃতিদারা দ্বারা
 দেবতাসমূহ সন্তর্পিত করেন।

অস্তোক্ত-কুণ্ডলীস্থানং নাভেভিস্ত্যগমোক্তিতঃ।
 অষ্টপাত্তিরূপা সা অষ্টমা কুণ্ডলাকৃতঃ ॥

এই মূলচক্রের উর্দ্ধদিকে এবং নাভির
 তির্ণীক্ উর্দ্ধ ও নিম্নদিকে কুণ্ডলীরস্থান।
 উহা অষ্ট পাত্তিরূপা ও অষ্টকুণ্ডলাকৃত।

‘তত্র কন্যং সমাঙ্কাতঃ তত্রোপে কুণ্ডলী
 সদা। সংবেষ্টা সকলা নাড়ীঃ সাষ্টধাকুটীনা-
 কৃতঃ। মুখে নিমেষে তৎ পৃচ্ছৎ সুষুম্না-
 নিবহে স্থিতা। সূত্র্য নারোগমা হেমা-
 স্মরণী পতরা সরা ॥ অচিবং সন্ধিসংস্থানা-
 য়গদেবী বীজগঞ্জকা। জ্ঞেয়া শক্তি-
 রিয়ং বিকোণিষ্ঠরা স্বর্ণভ বরা। গবং-
 রজস্বশেষতি গুণত্রয়িকবরা ॥’

• কন্দের দ্বার চতুঃসূত্র মূলগ্রন্থি মধ্যে
 কুলকুণ্ডলিনী দেবী নিম্নত অবস্থান করি-
 তেছেন; এই কুণ্ডলীদেবী এক মূর্তি
 দ্বারা অষ্টচক্রে অষ্টমা কুটীনা হটমা সুষুম্না
 নাড়ীর সকল অংশে বস্টন করিয়া রহি-
 য়াছেন, এবং অপর মূর্তি দ্বারা নিজবহনে
 নিজপৃচ্ছ প্রদান পূর্ণক সঙ্কেতপ্রদর্শকরা

হটমা সুষুম্নলিঙ্গ বেষ্টন সহকারে ব্রহ্মাণ্ড
 রেণি পূর্ণক সুষুম্নামুখে অবস্থিত করিয়ে-
 ছেন। দেবী কুলকুণ্ডলিনী প্রায়শঃ সর্পের
 আকার ধারণ করিয়া নিজ পত্যায় দেবীপা-
 মান হটমা নিজা বাটেতেছেন। ইহার
 অবয়ব সংস্থান সকল ঐনিকল সর্পের অমূ-
 রূপ; টনিকৈ বাক্যাবিষ্টাঃ ক্রী কাগ্দেবীঃ
 হেই হটতেই সকলের বাক্যস্বৃষ্টি হয়।
 ইনি বর্ষসরী ও সমগ্র বীজসন্নবরণা,
 ইহার বর্ষ কাঙ্কনের দ্বার ভাবয়। টনি
 মধ্য রজ, স্তমঃ এট শুণ্ডজের মূল এবং
 টনিকৈ সর্পাংশে নিম্নশক্তি বলিয়া কথিত
 হটমা পশ্চেষ্ট।

‘কুলাকিতা সূর্ণাভং সুষুম্নলিঙ্গমকৃতম্।
 ধিরগো বজ্রসিদ্ধেহস্তি ডাকিনী বজ্রদেবতা।
 তৎ পশ্চমধাগা যোনিমন্ত্র কুণ্ডলিনী স্থিতা ॥’

এই সুখাদার পশ্চই সাধারণতঃ কুল
 বলিয়া প্রসিদ্ধ ও ইহার সূর্ণবর্তুল বর্ষ,
 ইহাতে সুষুম্নলিঙ্গ বিরাজমান আছেন।
 এই স্থানে দিবও নামে একসিদ্ধলিঙ্গ ও
 দেবতা ডাকিনী শক্ত আছেন। এই
 পশ্চমধো চতুঃস্থান পরা মণ্ডল তন্মধ্যে ত্রিকোণ
 যোনি মণ্ডল বিদমান আছে। ঐ ত্রিকোণ
 মণ্ডলের অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী দেবী স সূ-
 লিঙ্গ বেষ্টন করত অবস্থান করিতেছেন।

‘তত এনাখিলা নাড়ী নিরুদ্রা চাষ্টে-
 বেষ্টনম্। উয়ং কুণ্ডলিনীশক্তি রক্ষুং
 ভাগতি নাত্তপা ॥ যদা পূর্ণাসু সন্ধাসু
 সংনিককোহনিল স্তদা বন্দত্যাগে কুণ্ডলিভা
 সুনং রক্ষুবিভর্তব্যং ॥’

‘চিত্তবৃত্তিদর্শা লীলা কুলাধ্যো লক্ষ্মণেশ্বরে।
 তদা সমাধিসাধেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥’

নিরন্তর কৃতপানার্জ্জবদ্বিস্বরণং ভবেৎ ।
 তদা বিচিনসামর্থ্যং যোগিনা ভবতি ফ্রং ॥
 তস্মাদ্ভাষিতপীমুখং পিবদ্যোগী নিরন্তরম্ ।
 মুক্তোমুখ্যং বিধায় সঃ কুণ্ডং জিত্বা সরো-
 রুহে ॥

অত্র কুণ্ডলিনী শক্তিগমঃ যাকি কুলাতিমা ॥”
 ব্রহ্মরন্ধ্রে স্মরণাধাং মৃণালান্তবরস্ববৎ ।
 নাদোৎপত্তিঃ সেনৈব শুভ্রফটিকসম্ভিতা ॥
 আম্বুদ্ধৌ বর্ততে নাদো বীণাদগুণতথতঃ ।
 শঙ্খাবনিভঙ্কাদৌ মধো মেঘধ্বনিগণা ॥
 বোমরকুণ্ডগতে নাদে গিরিপ্রস্রবণঃ যথা ।
 বোমরকুণ্ডগতে বায়ৌ চিত্তে চাস্মিতসংপ্রিতঃ ॥
 যোগিনিস্বপ্নে হ্রস্ব বদন্তি শমচেতসীঃ ।
 তদাবন্দী ভবেদ্বদী বায়ুস্তন জিত্বোভবেৎ ॥”
 ‘পীঠজয়ং ততশ্চৈর্দ্বয়ং নিরুজং যোগচিন্তকৈঃ ।
 তদ্বিন্দনান শক্ত্যাগো ভাষণেন্দ্র বাবদ্বিতঃ ॥”
 “কুণ্ডলীতাপনং বায়োব্রহ্মবন্দু প্রবেশনম্ ”
 “কুণ্ডল্যপি মহাসায়া কৈলাসে সা বিগীরতে”

“ইয়ং কুণ্ডলিনী শক্তীরকুণ্ডং তাজতি নানাথা ।
 “বিন্দুত্যাগে কুণ্ডলিন্যা সূত্রং বন্ধুপ্রতিভবেৎ ।”

কুণ্ডলী ও বিন্দুর বিষয়ে সংক্ষেপতঃ
 বর্ণনা করিয়া এখন মগুণ ও নিগুণ ধ্যানের
 বিষয় বলা যাচ্ছে ।

(নিগুণ ও মগুণ ধ্যান)

নিগুণ ধ্যান এক প্রকার । ব্রহ্মকে
 নিগুণ ভাবিয়া যখন চিন্তা অভ্যাস করা যায়
 তখন ইহাকে নিগুণ ধ্যান বলা হইয়া থাকে ।
 নিগুণ ধ্যান অর্থাৎ অজ্ঞান করিতে হইলে
 শরীরতত্ত্ব বিশেষরূপে জানা আবশ্যিক । মর্ষ

স্থানভুলি, নানাদি দগের সংস্থান অর্থাৎ প্রধান
 স্থানান নাড়াগুল কোন ভাবে থাকিয়া
 বিরূপ ভাবে বায়ু পরিচালিত করে এবং
 প্রাণ অপানাদি বায়ু কোন্ কোন্ স্থানে
 থাকিয়া বিরূপ কাণ্ড কবে তাহা বিশেষ
 রূপে জানা আবশ্যিক । যোগী যাক্ষ ক্য
 বর্ণিয়াছেন,

‘মর্ষস্থানানি নাড়ীনাং সংস্থানক পুণক পুণক ।
 বায়ুনাং স্থান কাম্যেণ স্তত্রাকর্য্যাবেদনম্ ॥’
 মর্ষস্থান, নাড়ী সমূহের পুণক পুণক
 সংস্থান, বায়ু সমূহের অবস্থিত স্থান ও মর্ষ
 প্রভৃতি আবেদন বা আত্মজ্ঞান-মূলক
 ক্রিয়াবোগ প্রথমে অবগত হইবে । এবং বিশ
 ক্রিয়া সমূহ মগুণ ধ্যানের আশ্রয় কার্য্যই
 সম্পন্ন হয় । সাধক এইরূপ মগুণ ধ্যানে
 অত্যন্ত হটলে পরে নিগুণ ধ্যানে মগুণ
 হন । যোগী যাক্ষক্য বলেন,

‘এবং ত্রোতা তর্ষয়ং শুক্রং মর্ষগং বোমাদৃঢ়তঃ ।
 অত্রাশ্রমচলং নিতামাদিমথাস্তার্জ্জিতং ॥
 হুনাং স্মরণনাকাশমসংস্পৃশ্রমচক্ষুণং ।
 ন কমাং ন চ গন্ধাপাসপ্রাথোমণৌগমঃ ॥

অনন্দমজরঃ সত্যং সদস্যং সর্গকারণং ।
 মপাধারঃ জগদ্রূপমমূর্ত্তিমজসম্যয়ম্ ॥
 অদৃশ্যং দৃশ্যমন্তঃস্বং বহিঃস্বং সর্গতোমুপদৃষ্ট
 সর্গদৃষ্ট মগুণঃ পাদং সর্গস্পৃষ্ট সর্গতঃ শিরঃ ॥
 ব্রহ্ম ব্রহ্মসদস্যঃ মাতাঃ মাতঃ সর্গবেদনং ভবেৎ ।
 তদেতং নিগুণং ধ্যানমিতি ব্রহ্মবেদো পিতঃ ॥

যিনি জ্যোতির্ষয় ; নির্গম ; আকাশের
 ছায় সর্গজগাদী ; দৃঢ় ; অত্যন্ত নিশ্চল ; সনা-
 তন্ত্র ; ষাটশ আদি, মধ্য ও অন্ত নাড়ী ; যিনি
 ইচ্ছামাজেই হুণ ও হুণ উভয়বিধ মুক্তিই
 পরিগ্রহ করেন ; যিনি স্বর্গকাশপ্রতি ;

অলংকৃত্য; চক্ষুঃ অংগাচর; মিনি রণ ও গন্ধ
 তমাজ হইতে কির; অংগের; অক্ষুপস;
 আনন্দময়, অরর ও গতা অরুপ; যিনি
 নিতা অনিতা সমস্ত পদার্থের কারণ, সর্বা-
 ধার, অগ্ৰাণ, অমূর্ত, অজ ও অসার, যিনি
 অদৃশ্য হইয়াও অক্ষরে ও বাচ্যের দৃশ্য হন;
 যিনি সর্বভোগ্য, সর্বভোগ্যে দৃষ্টি, সর্বভোগ্যে
 সর্বভোগ্যী পরবশের স্বরূপ; তাঁহাতে
 সমাধিত হইয়াও এইরূপে চিন্তন করা
 যায় এবং আসিত সেই প্রকারে এক প্রকার
 অক্ষুপস করা যায়, ব্রহ্মজ্ঞানীরা এইরূপে তাহাকে
 নিস্তরণ ধ্যান করেন।

সমস্ত ধ্যান বহুবিধ। পরম পুরুষ
 বাহুদেবেকে শুকপদেশ ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন
 ভাবে মূর্ত্ত করিয়া ধ্যান করাকে
 সমস্ত ধ্যান বলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি
 উল্লেখ করা যাউক।

(অপনা) পরমাছান পরমানন্দনিগ্রহঃ ।
 শুকপদেশাৎ বিজ্ঞান পুরুষ ক্রমপিঙ্গলঃ ॥
 ব্রহ্ম ব্রহ্মপুত্র যস্মিন দেহবাক্য স্তমধাসে ।
 অভ্যানাৎ সং পপাশ্চ স্তমঃ সংসারং সজং ॥

সাধুধনেয়া শুকপদেশ দ্বারা পরমানন্দ-
 মূর্ত্তি রূক্ষ ও পিঙ্গল বর্ণ পরমপুরুষ পরমা-
 ছানকে ভদ্র বোগে ও শুভ্র আনিয়া এই ক্ষুদ্র
 ব্রহ্মপুরুষ দেখে অভ্যাগ যোগে তাহাকে
 সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন।

স্বংপদ্যে ষ্টদলোৎপেত কন্দমগাৎ সমুখিতঃ ।
 স্বাদশাঃ পদনালোহে অশ্চরুতরুণমুখ্যে ॥

প্রাণাচার্টম বৃক্মিতে কে স্নানারিত বর্গিকৈ ।
 বাহুদেবে অমদ্যানিঃ নারায়ণমজং বিভুঃ ॥
 চতুর্ভুগমুনারাণ শম্বঃ ক্রগদাধরং ।
 কিরীটেকল্পধরং পদপত্রনিভেক্ষণং ॥

শ্রীং পংসপক্ষমঃ শ্রীশং পূর্ণচক্রনিভাননং ।
 পদ্মদ্বাদশদলোভাঃ স্তমগমঃ শুচিস্মিতং ॥
 শুকক্ষটিকমকাশং পীতবাসপমচূড়ং ।
 পদ্মকুণ্ডলপদম্বন্দঃ পরমাছানমধ্যম্ ॥
 প্রভাশ্চির্ভাদরুপং পরিভঃ পুরুষে স্তমম্ ॥
 মনমালোক্য দেবেশং সর্গীভূতজদিহিতং ।
 সোহংমায়েতি বিজ্ঞানং সস্তমং ধ্যানমুচ্যেত ॥
 কন্দমগা হতে সমুখিত, দ্বাদশাঙ্গু-
 পরিমিত নাপবিশিষ্ট, চতুরাঙ্গু পরিমিত
 উর্ধ্বমুখ, কেশরযুক্ত কর্ণিকা সমন্বিত, প্রাণা-
 রাম দ্বারা বিকশিত, অষ্টদল জংপদ্ম মধ্যে
 শম্ব চক্র ও গদাধারী, কেশুর ও কিরীট
 দ্বারা অংকিত, পদ্মপলাশলোচন, পূর্ণচক্রানন,
 পদ্মেণ ত্রাশ পদযুগলে শোভিত, চতুর্ভুজ
 শ্রীংসামাক্রিত বকতল, মনোহর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ
 বিশিষ্ট, প্রথম মূর্ত্তি, নির্মল হস্ত যুক্ত,
 নিস্তর ফটিক তুলা দেহ, পীতবাস, পদ্মে দর
 মদৃশ শোভন গুঠ এবং স্বকীয় প্রভায়
 প্রদীপ কান্তি বিশিষ্ট, সর্গপাণীর হৃদয়স্থিত,
 পুরুষশ্রেষ্ঠ, দেবপতি, অচূত, অজ, অসার,
 জগতের সৃষ্টি কারণ, বিভু, বাহুদেব, সাক্ষী-
 পতি নারায়ণকে সাধকগণ মানসে সন্দর্শন
 করিয়া, সেই পরমাছাই আসি, উদ্বৃণ-
 ভাবে বে দর্শন করেন তাহাকে সমস্ত
 ধ্যান বলে।

স্বংগরোকহমধোহস্মিন প্রকৃত্যাম্বিককর্ষিকৈ
 অষ্টৈর্গদালোগেতে বিভ্রাকেরমসঃবুতে ॥
 জ্ঞাননালে বৃহৎকন্দে প্রাণারামপ্রবোধিতৈ ।
 নিখার্চবঃ মহান কঃ জগন্তং বিশ্বচোমুখং ।
 বৈশ্বানরং জগদ্যোনিঃ শিখাত্বাননীধরং ॥
 তাপরন্তং স্বকং দেহমাপাদতম্রকৃতং ॥
 নির্বীতদীপবৎ স্মিতুঃ দীপমং স্ব্যবাহনং ॥

দৃষ্ট। তত্ত্ব শিখা মধ্যে পরমাঙ্গানগকরণ ।
 নীলগেতারদগমধ্যস্থং বিভ্রাজ্জেন্থেব ভাবরণ ॥
 শীবারশুকবক্রণং পীতভং সর্করারণং ।
 জ্ঞান্য বৈখাননঃ দেবং সোহংম্যেতি য়
 মতিঃ ॥

সঞ্জ্ঞেশুত্বেমং হেং ধ্যানং বেদবিদ্যো বিজ্ঞঃ ।
 বৈখাননরত্বং সংপ্রাপ্য মুক্তি তেনৈবগচ্ছতি ॥”

অত্রত্যাগ্যক, কর্ণিকাশুক, অষ্টৈশ্বর্য-
 দলোপেত, বিভ্রাজ্জেন্থেব, জ্ঞাননাল
 নামে জ্বংগরোবরের মধ্যে যে এক বৃহৎ
 কন্দ আছে এবং যে জ্ঞানপদ্ম প্রাণায়াম
 যোগে বিকশিত হইয়া উঠে সেই কন্দগম্য
 মধ্যে সর্কর দীপায়ান, বিশ্বতোমুখ, জগদ্-
 বোনি, শিখাত্মু (অগ্নিশিখার জ্বার শরীর)
 আপদ-মস্তক দেহের সস্তাপরক্ষাকর্তা,
 নির্কীত দীপের জ্বার নিশ্চল গেট বৈখানন-
 রূপী প্রজলিত মহাবীজ হব্যবাক্তনকে
 অবলোকন করিয়া, তদীয় শিখাভাঙ্গরে
 নীলজলদঃখাগতা বিভ্রাজ্জতার জ্বার দীপ্তি-
 মান, নীার ও শুক সঙ্গ পীত বর্ণ,
 চরচরের কারণ, বৈখাননরূপী অক্ষর
 দেবতাপরমাঙ্গাকে জ্ঞাত হইয়া, সেই
 আত্মাই আমি, এইরূপ চিন্তা করাকেই
 ব্রহ্মবাদীশ্বপ সঞ্জ্ঞ ধ্যান বলিয়া উল্লেখ
 করিয়াছেন। (এতদ্বারা অগ্নির সাক্ষর্য লাভ
 করিয়া মুক্ত হওয়ার ব্যয়) ।

(“অর্থনা) মণ্ডলং পশোদামিত্য মহামতেঃ ।
 আঙ্গানং সর্করগন্তঃ পুরুষং হেমরূপিণং ॥
 হিরণ্যশুককেশকং হিরণ্যমবৎ হরিণং ।
 যথাসং চতুর্ভক্ং সৃষ্টিহিত্যস্ত কারণং ॥
 পদ্মানবিতং সোধ্যং প্রব্রাজ্জনিভাননং ।
 পদ্মোদরগম্যতাং সর্করলোকাতরপ্রং ॥

জ্ঞানিত সর্কদা সর্কঃ মুদয়ং ক্রমাংসিকারঃ ।
 ভাসয়ন্তঃ জগৎ সর্কং দৃষ্ট্বোণেটকগাং ককং ॥
 সোহংম্যস্মীতি য়া মুক্তিঃ সা চ ধ্যানেন প্রাপ্যতে ॥
 এব এব তু সোক্ষণ্য মহামার্গস্থপোপথেন ॥
 ধ্যানেনানেনৈন সৌরোণ মুক্তিং যামাতি অরমঃ ॥

যিনি চর'চরের আত্মা, চিরণ্য বর্ণ পুরুষ,
 যাহার কেশ, শরু ও নখ সমুচ্চ হিরণ্যম, যিনি
 পাপত্ব, চতুর্ভুপ এবং রূপোপরি আণীন,
 গম্যগনে সংহত, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও
 প্রণয়ের চেতু, যিনি সূক্ষ্ম, যাহার মুদ
 মণ্ডল পক্ষ্ম পদ্মের ন্যায়, যাহার ললাটের
 আভা পদ্মগন্তেব আভা সঙ্গ, যিনি সপ-
 লোকে অভয় দান করিতেছেন, দর্শনীল
 মুনিরা সর্কদা যাহাকে দেখিতে পান, যিনি
 সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত কারণেছেন এবং
 সর্ক লোকের অধিবীণ সাক্ষী স্বরূপ, সাধক
 সেই পুরুষকে আদিভা মণ্ডলে দর্শন
 করিবেন এবং দর্শন পূর্ক সেই আদিভা-
 ময়ই আমি এইরূপ অরুভব করিবেন। ইহঃ
 সঞ্জ্ঞ ধ্যান মধ্যে এক প্রশস্ত ধ্যান বলিয়া
 গণ্য হয় ও তাহা মুক্তির চরম চেতু বলিয়া
 পণ্ডিতগণ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়। অথবা
 “ক্রবোর্ম্যোহস্তরাঙ্গান্য ভারুপং সপকারণং ।
 স্থাপুণ্যম্ হি পর্গন্তং মধ্যমেহাং সমুখং
 জগৎ কারণমবাক্তং জলস্তমসিতৌজসং ॥
 মনসালোক্য সোহংম্যামিতোতদ্ ধ্যান
 মুত্তমম্ ॥”

যিনি দেহ মধ্যে হইতে উচ্চিত হইয়া
 মুক্তি পর্গান্ত স্থাপুণ্য নিশ্চল ভাবে দীপ্তি
 পুটেছেন—সর্কারণ, অবাক্ত, অসি-
 তৌজস, জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই স্তরাস্ত্রাটিক
 জ্ঞানন সৃষ্টি হারা ক্রমুগলেত্বে মধ্যস্থত্বে ধ্যান

কৃষি পরে সেই পরমায়াই আমি জীর্ণ
অমৃতন করিবেন। ইহাও উৎকৃষ্ট ধ্যানের
মধ্যে পরিণত হইয়া থাকে।

অথবা বক্রপর্শ্বাক্ষর শিখিনীকৃতনিগ্রহং ।

শিব এন অরং ভূত্বা নাগাগ্রোরোপিতেকগঃ ॥

নিশিকারং পরং শাস্ত্রং পরমায়ায়ানসূচাতং ॥

ভাক্রপমমৃতং ধ্যানেৎ ক্রমোর্মধ্যে বরাননে ।

সোহহমাস্ম্যেতি বা বুদ্ধিঃ সা চ ধ্যানে-পশ-

ম্যাক ॥

শিখিনীকৃত শরীরে, বক্র পদ্মাগনে, মহা-
দেবের স্তম্ভ নিজেতে শাস্ত্র ও সমাধিত
করিয়া নাগাগ্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন।
ক্রমের মধ্যে নির্দিকার, শাস্ত্র, কটু
পরমায়ায়াকে জ্যোতির্ঘর ও অমৃত বক্রপ-
মনে করিয়া ধ্যান করিবে এবং সেই পর-
মায়াই আমি একরূপ জ্ঞান করিবেন। ইহাও
এক প্রকার পশু ধ্যান।

অথবাষ্টদ্বলোপেতে কণিকাকেশমসম্বিত ।

উরিসং হৃদয়ান্তোজ্রে সোমসপ্তলমধ্যগে ॥

স্বাস্থানমর্ভকাকারং ভোক্তৃকশিগমক্ষরং ।

সুধারসং নিমুক্ত্বিঃ শশিরস্মিত্তিরাবৃতং ॥

বোড়শচ্ছদসংযুক্তশিরঃ পদ্মাদধোমুখাৎ ।

নির্গতামৃতপারভিঃ সহস্রাভিঃ সমস্ততঃ ॥

প্রাণিতঃ পুরুষং তত্র কল্পসিদ্ধা সমাহিতঃ ।

তেনামৃতরসেনৈব গাজোপালেকলেবরে ॥

অহসেন পরব্রহ্ম পবমাস্থান্যারং ।

এবং বর্ষদনং তচ্চ সপ্তং ধ্যানসূচাতে ॥

কণিকা ও কেশর সম্বিত অষ্টদল
ছদপথে চন্দ্রমণ্ডল মধ্যবর্তী অর্ভকাকার,
ভোক্তৃকশ, অক্ষর, আস্থাকে অমৃতস্রাবী
চৈত্র কিশর ধারা প্রাণিত এবং শিরঃস্থিত
অধোমুখীন বোড়শদল পদ্ম হইতে বিগলিত

অমৃত ধারা সমুৎ ধারা সহস্র প্রকারে চতু-
র্দিকে পরিপ্লুত জলবিরা আমিই সেই অমৃত
পরমায়া পরব্রহ্ম এইরূপ ধ্যান করিবেন।
সপ্তপ ধ্যানের মধ্যেও ইহাও এক প্রকার
উৎকৃষ্ট ধ্যান। (প্রকাশ্যরানি বর্ণা)—

‘স্বকীরহৃদয় ধ্যানেৎ ক্রমোর্মধ্যে সমুত্তমম্ ।

তন্মধ্যে রক্তরীপস্ত হৃদয়ালুকাময়ং ॥

চতুর্দিক্ নীপতর্কবহুপুঙ্গু সমম্বিতঃ ।

নীপোপাবনস কুলে বেষ্টিতং পরিখাইব ॥

সালতীমল্লিকাজাতীকেশটৈশ্চম্পটৈকস্তপাশ

পারিজাতৈঃশটৈঃ পদ্মোর্মধ্যোমোদিত দিম্বুটৈঃ

তন্মধ্যে সাস্ত্রৈর্দ্যোগী কল্পবক্ষং মনোহরং ।

চতুঃশাখা চতুর্দৈবং তিত্যপুঙ্গুফলাষিতং ॥

ক্রসরাঃ কৈকিলা স্তত্র শুক্লস্তি নিগদস্তিচ ।

ধ্যানেতত্র তিরো ভূত্বা মহাপাণিকামগুণং ॥

তন্মধ্যে তু স্মেৎ যোগী পর্যাক্ষং হৃদমনোহরং ।

তত্রেষ্টদেবতাং ধ্যানেৎ সদ্ধানং শুক্লভাষিতং ।

যদা দেনস্ত যক্রুপং বণা ভূষণবাহনং ।’

‘সহস্রারে মহাপদ্ম কণিকারঃ বিচিত্তস্ত্রৈঃ ।

বিগম্যসিতংপদ্মং দ্বাদশৈর্দগমংমুতং ॥

শুরুপং সহাতেজা দ্বাদশৈর্দগভাষিতঃ ।

‘হসক্ষমলবরং হসখ্যেৎ’ বর্ণাক্ষেপং ॥

তন্মধ্যে কণিকারাস্ত্র অকথাং দেখ্যক্রমং ।

‘হলাক্ষ’কোণসংযুক্তং প্রেণবং তত্রবর্ত্তত ॥

নাদবিন্দুময়ং গীতং ধ্যানেতক্রমমনোহরং ।

তত্রোপরি হংসমুখাং পাদুকৃতক্রবর্ত্ততে ॥

ধ্যানেতত্র শুক্লদেবং দ্বিভুগক জিলোচনং ।

বেতাধরপয়ং দেবং শুক্লগন্ধামুলেপনং ।

শুরুপুঙ্গুময়ং গাণ্যং রক্তশক্তি সম্বিতং ।

এবদ্বিধগুণ ধ্যানাৎ স্থলধ্যানং প্রেসিধ্যতি ॥

(ক্রমশঃ)

শঙ্কর-সেনক ত্রৈতী শতাব্দী—

